জওহরলাল নেহরু
আত্ম-চরিত

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
কর্তৃক অনূদিত

পরিবেশক
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার সরকার

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন

কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৪

দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩ ২

তৃতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৫

চতুর্থ মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৭১

মূল্য : ১২·০০

লোকান্তরিতা

কমলাকে

ভূমিকা

এই গ্রন্থের সমগ্র অংশই কারাগারে লিখিত হইয়াছে। কেবল পুনশ্চ এবং ১৯৩৪-এর জুন হইতে ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বর্ণনায় দুই এক স্থানে সামান্য পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। ইহা লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে কোন নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত রাখা, দীর্ঘ কারাবাসের নিঃসঙ্গতার মধ্যে ইহার প্রয়োজন ছিল। যাহার সহিত আমার ব্যক্তিগত যোগ রহিয়াছে, ভারতের সেই অতীত ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করিয়া যাহাতে উহা আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি সে উদ্দেশ্যও ছিল। আত্ম-জিজ্ঞাসার ভাব লইয়া আমি লিখিতে আরম্ভ করি, শেষ পর্যন্ত বহুলাংশে সেই ভাবই রহিয়া গিয়াছে। পাঠকদের সম্পর্কে সতত সচেতন থাকিয়া আমি ইহা লিখি নাই; কিন্তু যদি কোন পাঠকের কথা মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা আমার স্বদেশের নরনারী। বিদেশী পাঠকদের জন্য লিখিলে হয়ত আমি স্বতন্ত্রভাবে লিখিতাম অথবা ভিন্নরূপ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করিতাম; বর্ণনামুখে যে সকল বিষয় উপেক্ষা করিয়া গিয়াছি হয়ত সেগুলির উপর বিশেষ জোর দিতাম, আবার যে সকল বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি তাহা সংক্ষেপে করিতাম। শেষোক্ত প্রকারের বর্ণনায় অ-ভারতীয় পাঠকেরা উপভোগ করিবার কিছুই না পাইতে পারেন অথবা উহা অনাবশ্যক মনে করিতে পারেন অথবা তর্ক বা আলোচনার অযোগ্য মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমার মনে হয় ভারতে এখনও ঐগুলির উপযোগিতা রহিয়াছে। আমাদের ঘরোয়া রাজনীতি এবং বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনাগুলিকেও বাহিরের লোকেরা অনাবশ্যক বা অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে করিবেন।

আমি আশা করি পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, এই গ্রন্থখানি আমার জীবনের এক বিশেষ দুঃখপূর্ণ সময়ে লিখিত। ইহার মধ্যে তাহার ছাপ বিদ্যমান। যদি অধিকতর স্বাভাবিক অবস্থায় লিখিতে পারিতাম, তাহা হইলে ইহা হয়ত স্বতন্ত্র রকমের হইত এবং সম্ভবতঃ স্থানে স্থানে অধিকতর সংযত হইত। তথাপি আমি বর্তমান আকারেই ইহা প্রকাশের সঙ্কল্প করিলাম, কেন না লেখার সময় আমার মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছে, কেহ কেহ তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন।

আমার নিজের মানসিক বিকাশ ও পরিণতিকে অনুসরণ করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, ভারতের আধুনিক ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করি নাই। এই বর্ণনার মধ্যে ঐরূপ যাহা সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া কোন কোন পাঠক বিভ্রান্ত হইতে পারেন এবং ইহার যাহা প্রাপ্য নহে তাহার অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে পারেন। অতএব আমি তাঁহাদের সাবধান করিয়া দিয়া বলিতে চাহি, এই বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে একদেশদর্শী এবং অনিবার্যরূপেই ইহাতে আত্মকীর্তন আসিয়া পড়িয়াছে; ইহাতে অনেক গুরুতর ঘটনার একেবারেই উল্লেখ করি নাই; অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি যাঁহারা ঘটনার স্রোত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অল্পই বলিয়াছি। অতীত ঘটনার প্রকৃত আলোচনায় ইহা অমার্জনীয় হইতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত বিবৃতিতে এ প্রশ্রয়টুকু পাইবার আশা রাখি। যাঁহারা আমাদের আধুনিক অতীত সম্পর্কে প্রকৃতভাবে অধ্যয়ন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। যাহা হউক, এই গ্রন্থ ও অন্যান্য আত্মকথা তাঁহারা পরিপূরক

হিসাবে পাঠ করিতে পারেন এবং ইহা বাস্তব ঘটনা বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া মনে করি।

আমার গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র, যে সমস্ত সহকর্মীর সহিত আমি দীর্ঘকাল একত্রে কাজ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের অনেকের কথা আমি সরলভাবে আলোচনা করিয়াছি; আমি দল বা ব্যক্তিরও সমালোচনা করিয়াছি, সম্ভবতঃ স্থানে স্থানে তাহা তীব্র হইয়াছে। কিন্তু এই সমালোচনার ফলে তাঁহাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা হারাই নাই। আমার মনে হয় যাঁহারা জনসাধারণের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি এবং যে জনসাধারণের তাঁহারা সেবা করেন, তাহাদের প্রতি সরল ব্যবহার করা ভাল। বাহ্য ভদ্রতা এবং অশোভনীয় ও কখনও বা বিরক্তিকর প্রশ্ন এড়াইয়া যাওয়ার দ্বারা পরস্পরকে এবং উপস্থিত সমস্যাকে প্রকৃতভাবে বুঝিবার সুবিধা হয় না। পরস্পরের ভেদ ও ঐক্য ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়ার উপরই প্রকৃত সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত এবং যতই অসুবিধাজনক হউক না কেন সর্বদাই বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন হওয়া উচিত। যাহা হউক, আমার বিশ্বাস আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেশমাত্র ঈর্ষা বা দ্বেষ নাই।

আমি ইচ্ছা করিয়াই ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যাপারগুলি আলোচনা করি নাই, তবে সাধারণভাবে ও পরোক্ষভাবে উহা উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। কারাগারে বসিয়া উহা সম্যকরূপে আলোচনা করার অবস্থা আমার ছিল না অথবা আমার কি করা উচিত তাহাও স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। এমন কি কারামুক্তির পর বাহিরে আসিয়াও এবিষয়ে নূতন কোন আলোচনা এই গ্রন্থে সংযোগ করা সমীচীন মনে করি নাই। যাহা আমি লিখিয়াছি, তাহার সহিত উহার সামঞ্জস্য হইবে না বলিয়াই মনে করি। অতএব এই 'আত্ম চরিত' ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি রেখাচিত্র, অতীতের অসম্পূর্ণ বিবরণ এবং বর্তমানের সীমা-রেখায় আসিয়াও, সাবধানতা সহকারে তাহা হইতে স্বতন্ত্রই রহিয়া গেল।

বাদেনউইলার
২রা জানুয়ারী, ১৯৩৬

জওহরলাল নেহরু

অনুবাদকের নিবেদন

একদিন পণ্ডিত জওহরলালের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে অনুরোধ আসিল, তাঁহার আত্ম-চরিত অনুবাদের ভার যদি আমি গ্রহণ করি, তাহা হইলে তিনি আনন্দিত হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে বোলপুর 'শান্তিনিকেতন' হইতে শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ লিখিলেন, আপনাকে স্বীকার করিতেই হইবে, আপনি ছাড়া ইত্যাদি। বুঝিলাম, এড়াইবার পথ আমার বন্ধুরা পূর্বেই বন্ধ করিয়াছেন। সঙ্কোচ ও দ্বিধার সহিত কার্যভার গ্রহণ করিলাম। জওহরলালের চিন্তা ও আবেগের সতেজ বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী, তাঁহার রচনা-নৈপুণ্য, তাঁহার ভাষার সুসম্পূর্ণ সহজ শিষ্টতা, ভাষান্তরিত করিতে গিয়া যথাযথভাবে ফুটাইয়া তোলা দুঃসাধ্য এবং অনুবাদকের ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ; দ্বিধা-সঙ্কোচের কারণ ইহাই। দ্রুত অনুবাদ করিতে গিয়া মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য কতখানি রক্ষা করিতে পারিয়াছি সে বিচারের ভার পাঠকগণের উপরই অর্পণ করিলাম।

কোন ভারতবাসী লিখিত আত্ম-চরিত ইতিপূর্বে স্বদেশ ও বিদেশে এমন সমাদর লাভ করে নাই। বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র এই গ্রন্থখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে। ভারতেও হিন্দী, উর্দু, গুজরাটি, মারাঠী, তামিল, মালায়ালাম প্রভৃতি ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। অতএব বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের হস্তে এই সর্বজন-সমাদৃত এবং শত্রুমিত্র-প্রশংসিত গ্রন্থখানি উপহার দিতে সক্ষম হইয়া আমি আনন্দ ও গর্ব বোধ করিতেছি।

জওহরলাল নবভারতের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষার মূর্ত বিগ্রহ। জীবন-প্রভাতেই তিনি দুর্লভের কামনায় অধীর হইয়া দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছেন। তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাস, চিন্তা ও চরিত্রের উদ্দাম গতি-বেগের সহিত সংগ্রামের ইতিহাস, বঞ্চিত ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত, রুচি ও প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য সত্ত্বেও নিজেকে একাত্ম করিবার ইতিহাস কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত কাহিনী নহে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের এক গৌরবময় অধ্যায়। বাঙ্গলার স্বাধীনতাকামী জাগ্রত যুবকগণ শুনিবেন, ইহার মধ্যে তাঁহাদেরই দুরাকাঙ্ক্ষায় দুঃসাহসী হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। ভারতবর্ষের অপমানাহত চিত্তের অবরুদ্ধ বেদনাকে বরণ করিয়া ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মত জীবনের এই শোকহীন ভয়হীন অনন্যসাধারণ অভ্যুদয়ের বার্তা, আমার দুর্বল লেখনী যদি বিকৃত বা আড়ষ্ট না করিয়া থাকে তাহা হইলেই আমার এই কঠিন শ্রম সার্থক হইবে।

জওহরলালের প্রতি শ্রদ্ধা ও আমার প্রতি স্নেহ বশতঃ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুদ্রণ, প্রচ্ছদপট, কাগজ, চিত্র প্রভৃতি যথাসাধ্য সুন্দর ও শোভন করিতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ইংরাজী পুস্তকে যে সকল ছবি আছে, তাহা ছাড়াও আরও তিনখানি নূতন ছবি ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজী গ্রন্থের আকার ও আয়তনের সহিত এই গ্রন্থের সমতা রক্ষার জন্য তিনি স্থানীয় কাগজের কল হইতে অনুরূপ আকারে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করাইয়াছেন। ইহার জন্য গ্রন্থ

প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। তবে তাঁহার সযত্ন চেষ্টা ব্যতীত এত বড় গ্রন্থের মূল্য এত সুলভ করা সম্ভবপর হইত না। নিবেদন ইতি—

১লা বৈশাখ, ১৩৪৪ সাল
আনন্দবাজার পত্রিকা কার্যালয়

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইবার পর কতকগুলি অনিবার্য কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব হইল, এজন্য আমি পাঠক সাধারণের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। প্রথমতঃ এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশে যে পরিমাণ ও আয়তনের কাগজ প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘকাল বিনা বিচারে আটক থাকায় আমরা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন করিতে পারি নাই। কারাগার হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া মুক্তি পাইবার পরই শ্রীযুক্ত মজুমদার গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

প্রথম সংস্করণে কতকগুলি মারাত্মক ছাপার ভুল ছিল, এবার যথাসাধ্য তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে সন্দেহ হইয়াছে সেইখানেই মূল ইংরাজী গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি। এই অনুবাদ-গ্রন্থখানিকে নির্ভুল এবং যথাযথ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। আমাদের একমাত্র দুর্ভাগ্য, যাঁহার হস্তে দ্বিতীয় সংস্করণ তুলিয়া দিতে পারিলে কৃতার্থ হইতাম, সেই বহুজনবন্দিত আমাদের প্রিয় নেতা জওহরলাল আজ আহাম্মদনগর দুর্গে বন্দী। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র-নীতিতে ভাবী সমাজের অন্যতম মনীষী চিন্তানায়করূপে পৃথিবীর বিদ্বজ্জন সমাজে সমাদৃত জওহরলালের বন্দী-জীবন কেবল ভারতের দুর্ভাগ্য নহে, সমসাময়িক বৃটেনের শাসকশ্রেণীর অপরাধী বিবেকেরও দুশ্চিন্তার স্থল। অন্ধকার দুর্যোগের অবসানে মেঘমুক্ত নির্মল আকাশের প্রসন্ন সূর্যালোকে তাঁহাকে বরণ করিবার প্রত্যাশা পোষণ করিয়া, তাঁহার সংগ্রামবহুল অতীত জীবন-কাহিনী দেশবাসীর হস্তে শ্রদ্ধার সহিত তুলিয়া দিলাম।

৩বি সদানন্দ রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩৫২ সাল

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অতীতের বহু সাম্রাজ্যের শ্মশান ও স্মৃতিকাগার দিল্লী-নগরীর ধূলিতলে সর্বশেষ রাজপ্রতাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-গরিমা সহস্তে সমাধি রচনা করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হইলেও, সমগ্রভাবে আমরা পরশাসনমুক্ত—স্বাধীন। ভারতবাসীর স্বাধীনতাযুদ্ধের সেনাপতি জওহরলাল আজ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার বহুযুদ্ধের কিণাঙ্কিত হস্তে আমরা নূতন মহাভারত রচনার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছি। সর্বশেষ বন্দী-জীবন আহাম্মদনগর দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি আজ জাতির হৃদয়-দুর্গের প্রিয়তম বন্দী। প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের নিষ্ঠুর হস্ত জাতির জনক গান্ধিজীকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবার পর, নবীন ভারত শোক ও ক্রোধ সংযত করিয়া জওহরলালের অনুগামী। একদিন যিনি "স্বপ্নরাজ্য-সঞ্চরণশীল কল্পনাবিলাসী আদর্শবাদী" বলিয়া বিজ্ঞজনের নিকট করুণা ও উপহাসের পাত্র ছিলেন, আজ নবীন রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে আমরা দেখিতেছি, তিনি কর্মকুশল আত্মবিশ্বাসে স্বপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক। আজ স্বাধীন ভারতে মনুষ্যত্ব ও মাতৃভূমির নবাগত সেবকগণ, তাহাদের প্রিয় নেতার সংগ্রামবহুল অতীত জীবন-কাহিনী পাঠ করুক; তাঁহার চিন্তাধারার পরিচয় লাভ করুক; নির্যাতীত অধিকারবঞ্চিত জনসাধারণকে কিভাবে ভালবাসিতে হয়, তাহা শিক্ষা করুক: বহু স্ববিরোধিতা ও অসামঞ্জস্যে ভরা জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে সঞ্চিত ক্লেদপঙ্ক অপসারিত করিবার জন্য জওহরলালের মতই কঠিন সঙ্কল্প গ্রহণ করুক।

'পাঁচ বৎসর পর' এই অধ্যায়টি ১৯৪২-এর ইংরাজী সংস্করণে সংযোজিত হয়। এই সংস্করণে তাহা যোগ করা হইল। ফলে ১৯৪০ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত জওহরলালের চিন্তাধারা ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

৩/বি সদানন্দ রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩৫৫ সাল

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

১। কাশ্মীর হইতে অবতরণ — ১—৫

নেহরু-পরিবারের দিল্লী আগমন—১৮৫৭-র বিদ্রোহ—আগ্রায় মতিলালের জন্ম—এলাহাবাদে আগমন—পিতার শিক্ষা ও আইন ব্যবসায়—জওহরলালের জন্ম।

২। শৈশব কাল — ৫—৯

ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজ ও ফিরিঙ্গীদের ব্যবহার—বাল্যজীবনের চপলতা—অন্তঃপুরের ধর্মভাব—সামাজিক পূজা উৎসব—কাশ্মীরী নারীদের স্বাধীনতা—পিতৃ-স্নেহ।

৩। থিয়োজফি — ৯—১৩

আনন্দ ভবন—কনিষ্ঠা ভগ্নীর জন্ম—পিতার বিলাতযাত্রা—ইংরাজ গৃহ-শিক্ষক—বাল্যের পাঠস্পৃহা—থিয়োজফিতে অনুরাগ—মিসেস্ বেশান্তের বক্তৃতা শ্রবণ—থিয়োজফিতে দীক্ষা গ্রহণ—রুশ-জাপান যুদ্ধ—জাতীয়-ভাবের প্রথম উন্মেষ—বিলাতযাত্রা।

৪। হ্যারো ও কেম্ব্রিজ — ১৩—২২

লণ্ডন—ডাঃ আনসারীর সহিত সাক্ষাৎ—হ্যারো স্কুলে যোগদান—ছাত্রজীবনের চাপল্য—হ্যারো হইতে বিদায়—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়—যৌন অভিজ্ঞতার কথা—বিলাস-বিহ্বলতা—'ভারতীয় মজলিস'—বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিকদের দর্শনলাভ—পিতার মডারেট মনোবৃত্তিতে বিরক্তি—জাতীয়দল ও তিলক—কেম্ব্রিজ ত্যাগ—ব্যারিস্টারী পাশ—নরওয়ে ভ্রমণ।

৫। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও ভারতে মহাযুদ্ধের সমসাময়িক রাজনীতি — ২২—৩০

বাঁকীপুরে কংগ্রেস—গোখলে ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু—হাইকোর্টে যোগদান—ইংরাজ কর্মচারীদের মানসিক অবস্থা—শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর বক্তৃতা শুনিয়া দুঃখ—মহাযুদ্ধ ও ভারতরক্ষা আইন—হোমরুল লীগ—মডারেটদের মনোভাব—জনসভায় প্রথম বক্তৃতা—পিতার মানসিক দ্বন্দ্ব—লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস ও গান্ধিজীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ—সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি অনুরক্তি—স্যর রাসবিহারী ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ।

৬। আমার বিবাহ ও হিমালয় ভ্রমণ — ৩০—৩২

বিবাহ—কাশ্মীর ভ্রমণ।

৭। গান্ধিজীর অভ্যুদয়—সত্যাগ্রহ ও অমৃতসর — ৩২—৩৮

ভারতে অবরুদ্ধ উত্তেজনা—খিলাফত লইয়া মুসলমানদের বিক্ষোভ—রৌলাট বিল—গান্ধিজীর আইন অমান্য প্রস্তাব—পিতার সত্যাগ্রহে বিমুখতা—পিতার সহিত মতভেদ—সত্যাগ্রহ দিবস—[illegible] বাগ—পাঞ্জাবে সামরিক আইন—কংগ্রেসের

বিষয় | পৃষ্ঠা

অনুসন্ধান কমিটি—দি ইণ্ডিপেনডেণ্ট পত্রিকা—পিতার সভাপতিত্বে অমৃতসর কংগ্রেস—মহাত্মাজীর বিলাতযাত্রা—খিলাফৎ কমিটির দাবী—মুসলিম লীগের সভায় অভিজ্ঞতা—গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা।

৮। আমার বহিষ্কার এবং তাহার ফলাফল — ৩৮—৪৪

মডারেট ও চরমপন্থী—জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র—মাতা ও স্ত্রীসহ মুসৌরী যাত্রা—সরকারী নিষেধাজ্ঞা ও বহিষ্কার—আদেশ প্রত্যাহার—কৃষক আন্দোলনের প্রথম অভিজ্ঞতা—কৃষক-নেতা রামচন্দ্র—পল্লীভ্রমণ—কৃষক ও রায়তদের অবস্থা।

৯। কৃষকদের মধ্যে ভ্রমণ — ৪৪—৪৯

পল্লীতে ভ্রমণ-কষ্ট—জনসভায় বক্তৃতা অভ্যাস—তালুকদার ও জমিদার—অসহযোগ আন্দোলন—গভর্ণমেণ্টের সহিত কৃষকদের সংঘর্ষ—রায়বেরেলীতে গুলিবর্ষণ—গ্রেফ্তারের ধুম—ফৈজাবাদ কৃষক আন্দোলন মন্দীভূত।

১০। অসহযোগ — ৫০—৫৮

কলিকাতা বিশেষ কংগ্রেস—লালাজী—সি. আর. দাশ ও পিতার বন্ধুত্ব—কংগ্রেসের নব রূপান্তর—আইন সভা নির্বাচন বর্জন—মিঃ জিন্নার মনোভাব—মডারেটগণের কংগ্রেস বিরোধিতা—১৯২১-এর জাগরণ—ব্রিটিশ শাসকদের উপর প্রতিক্রিয়া—কংগ্রেস ও খিলাফৎ—রাজনীতিক ধর্মভাবের আধিক্য—অহিংসার নৈতিক আদর্শ।

১১। ১৯২১ এবং প্রথম কারাদণ্ড — ৫৯—৬৪

হিন্দু মুসলমান মিলন—গান্ধিজীর অহিংসার আদর্শ—সরকারী দমননীতি—যুবরাজের অভ্যর্থনা বয়কট—বাঙলা ও যুক্ত-প্রদেশে গ্রেফ্তার ও কারাদণ্ড—চৌরীচাওরা—গান্ধিজীর নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি প্রত্যাহার ও কারাদণ্ড।

১২। অহিংসা ও তরবারির পথ — ৬৪—৭১

গান্ধিজীর অহিংসানীতি—চৌরীচাওরার প্রতিক্রিয়া—আমার ও পিতার কারাদণ্ড—কারামুক্তি ও আহম্মদাবাদে গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ—আবার গ্রেফ্তার ও কারাদণ্ড।

১৩। লক্ষ্ণৌ জেল — ৭১—৭৭

কারাগার সম্পর্কে অপরিচয়ের ভীতি—কারাগারে প্রবেশের প্রথম অভিজ্ঞতা—অসহযোগী বন্দীদের প্রতি কারাকর্তৃপক্ষের ব্যবহার—নৈমিত্তিক কার্য—জনশূন্য ব্যারাকে বাস—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ব্যাকুলতা—জেলে কঠোরতা—রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার।

১৪। কারামুক্তি — ৭৮—৮৩

কারামুক্তির প্রথম অনুভূতি—কংগ্রেসে অবসাদ—স্বাধীনতা প্রস্তাব লইয়া মতভেদ—দেশবন্ধু ও পিতার চিন্তাধারা—পরিবর্তন বিরোধী ও স্বরাজপন্থী—কংগ্রেসের মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রবেশ—হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার গ্রীমউড মীয়ার্স-এর পত্র—তাঁহার সহিত

বিষয় পৃষ্ঠা

আলোচনা—মন্ত্রিত্বের প্রলোভন—যুক্ত-প্রদেশে মন্ত্রিত্ব-বিভ্রাট—স্বরাজ্যদলের ফলে মন্ত্রীদের ক্ষমতা হ্রাস।

১৫। সন্দেহ ও সংঘর্ষ — ৮৩—৮৭

কংগ্রেসী রাজনীতিতে অবসাদ—স্বরাজ্যদলে যোগদানে অনিচ্ছা—পিতা ও দেশবন্ধুর বন্ধুত্ব এবং চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য—আমাদের পারিবারিক জীবনে পরিবর্তন—পিতার উপর নির্ভরতার দুঃখ—কংগ্রেসের সম্পাদকদিগকে বেতন দিবার প্রস্তাব—পিতার আপত্তি—কংগ্রেসে দলাদলি।

১৬। নাভার কৌতুক — ৮৭—৯৩

পঞ্জাবে আকালী শিখ আন্দোলন—দিল্লী বিশেষ কংগ্রেসের পর জাইটো যাত্রা—গ্রেফ্‌তার—নাভা জেলের অভিজ্ঞতা—নাভা আদালতে বিচার বিভ্রাট—পিতার উৎকণ্ঠা ও নাভা আগমন—দেশীয় রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা—নাভার সিভিলিয়ন ব্রিটিশ শাসকের কাণ্ড—বিচার শেষ ও অকস্মাৎ কারামুক্তি—আত্মদৌর্বল্য।

১৭। কোকোনদ ও মৌলানা মহম্মদ আলী — ৯৪—৯৯

কোকোনদ কংগ্রেস—মহম্মদ আলীর আমার প্রতি অনুরাগ—আমাদের মধ্যে ধর্ম-সম্পর্কিত আলোচনা—তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের গভীরতা—তাঁহার ক্রমে কংগ্রেস ত্যাগ—হিন্দুস্থানী সেবাদল গঠন—এলাহাবাদে কুম্ভ মেলা—পুলিশের নিষেধাজ্ঞা—মালব্যজীর সত্যাগ্রহ—অবশেষে নিষ্পত্তি।

১৮। আমার পিতা ও গান্ধিজী — ৯৯—১০৭

কারাগারে গান্ধিজীর পীড়া—পুণা হাসপাতালে অস্ত্রোপচার—পিতা ও আমার পুণা যাত্রা—গান্ধিজীর কারামুক্তি—জুহুতে সমুদ্রতীরে অবস্থান—গান্ধিজীর সহিত আলোচনা ও মতভেদ—স্বরাজ্যদলের বাধা প্রদান নীতির ফল—আহমদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির স্মরণীয় অধিবেশন—গোপীনাথ সাহার প্রস্তাব লইয়া তীব্র মতভেদ—খাদি ও চরকা—স্বরাজীদের সহিত গান্ধিজীর আপোষরফা—গান্ধিজীর সহিত পিতার পুনরায় মিলন—গান্ধিজীর প্রতি পিতার শ্রদ্ধা—পিতার সহিত তাঁহার চরিত্রের পার্থক্য—স্বরাজ্যদলের দৌর্বল্য—বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসীদের সরকারী চাকুরী গ্রহণ ও তাহার ফল—কানপুর কংগ্রেস—পিতার অসুস্থতা—হিমালয়ে বিশ্রাম—দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ ও পিতার শোক—আমাদের কলিকাতা যাত্রা।

১৯। উদ্দাম সাম্প্রদায়িকতা — ১০৮—১১৪

আমার টাইফয়েড রোগ ও আরোগ্য লাভ—হিন্দু-মুসলমান সমস্যা—দাঙ্গা-হাঙ্গামা—সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রাবল্য—কংগ্রেসের বিপত্তি—ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতি ও প্রতিক্রিয়ার উপরে নির্ভরতা—সাম্প্রদায়িকতার মূলে—রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতা—অপ্রত্যাশিত ধর্মান্দোলন—কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান—ঐক্য সম্মেলন ও তাহার ব্যর্থতা—এলাহাবাদে হিন্দু-মুসলমান কলহ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
২০। মিউনিসিপালিটির কাজ	১১৪—১১৯
এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির সভাপতিত্ব—মিউনিসিপালিটির ত্রুটী—সরকারী হস্তক্ষেপ—ট্যাক্স ধার্যে পক্ষপাতিত্ব—স্বায়ত্ত শাসনের ব্যর্থতা—কংগ্রেসের প্রভাব দূর করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা—কলিকাতা কর্পোরেশনের আইন সংস্কার—কংগ্রেস কর্মীদের চাকুরী হইতে বঞ্চিত করা—আমার পদত্যাগ—পত্নীর পীড়া—স্ত্রী-কন্যাসহ ইউরোপ যাত্রা।	
২১। ইউরোপে	১১৯—১২৫
তের বৎসর পরের ইউরোপ—জেনেভায় শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সহিত সাক্ষাৎ—রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ—মাদাম কামা—মৌলবী ওবেইদুল্লা, মৌলবী বরকতউল্লা—বার্লিনে ভারতীয় বিপ্লবী দল, তাঁহাদের দুরবস্থা—হরদয়াল—বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—মানবেন্দ্রনাথ রায়—নির্বাসিত ভারতীয়দের অবস্থা—অক্সফোর্ড গ্রুপ আন্দোলন।	
২২। ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক	১২৫—১৩০
ইংলণ্ডে গমন—খনি শ্রমিকদের ধর্মঘট—ভারতের রাজনীতি—কংগ্রেস বিরোধী নূতন জাতীয় দল—মালব্যজীর চরিত্র ও দৃষ্টি-ভঙ্গী—লালা লাজপৎ রায়ের রাজনীতি—ক্রমবর্ধিত সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য—স্বরাজ্য দল ও জাতীয় দলে বিরোধ—স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ড।	
২৩। ব্রুসেলস্-এ নির্যাতিত সম্মেলন	১৩০—১৩৪
সম্মেলনের প্রতিনিধিদের পরিচয়—জর্জ ল্যান্সবেরির সভাপতিত্ব—স্থায়ী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিষ্ঠান গঠন—পাশ্চাত্য রাজনীতির অভিজ্ঞতা লাভ—ইউরোপে গোয়েন্দার কৌতুক—দিল্লী-চুক্তিতে স্বাক্ষর করায় সঙ্ঘ হইতে আমার বহিষ্কার—পিতার ইউরোপে আগমন—আমাদের মস্কো যাত্রা—সোভিয়েট বোধ ব্যবস্থা পরিদর্শন——সাইমন কমিশন ঘোষণা—লণ্ডনে স্যর জন সাইমনের সহিত সাক্ষাৎ—মান্দ্রাজ কংগ্রেসের জন্য দ্রুত ভারতে প্রত্যাবর্তন।	
২৪। ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং রাজনীতিতে যোগদান	১৩৪—১৪০
ইউরোপের অভিজ্ঞতা—মান্দ্রাজ কংগ্রেস—স্বাধীনতার প্রস্তাব—সাইমন কমিশন বয়কট প্রস্তাব—কংগ্রেসের সম্পাদকত্ব গ্রহণ—দিল্লীতে হাকিম আজমল খাঁর মৃত্যু—আমার আহিন্দ্ সংস্কারের সমালোচনা—১৯২৮-এর রাজনীতি, শ্রমিক-কৃষক-চাঞ্চল্য ও যুব-আন্দোলন—"Go back Simon"—সর্বদল সম্মেলনী—লক্ষ্ণৌ অধিবেশন—ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ গঠন—সাইমন কমিশনের বিরূপ অভ্যর্থনা—লাহোরে লালাজী পুলিশের প্রহারে আহত হওয়ার ফলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ—লালাজীর মৃত্যু—ভগৎসিং ও টেরোরিজম্।	
২৫। যষ্টি সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা	১৪০—১৪৬
লক্ষ্ণৌয়ে বয়কটের আয়োজন—প্রথম পুলিশের প্রহারের অভিজ্ঞতা—পিতার উৎকণ্ঠা ও লক্ষ্ণৌ আগমন—পুলিশের কংগ্রেস মিছিল আক্রমণ ও আমার মনোভাব—কমিশনের স্বতন্ত্র পথে প্রস্থান—গোবিন্দবল্লভ পন্থ গুরুতর আহত—পুলিশের নিষ্ঠুরতা—এই সংঘর্ষের পরিণাম কি?	

বিষয়	পৃষ্ঠা

২৬। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস — ১৪৭—১৫৩

রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের চিন্তাধারা—ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ—ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লীগের পরিণতি—আমার গ্রেফ্‌তারের গুজব—আসন্ন কলিকাতা কংগ্রেস—পিতার সহিত মতভেদ—সর্বদল সম্মেলনের রিপোর্টে ক্ষোভ—ঝরিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদান—শ্রমিক আন্দোলনের ভাবধারা—আমার সভাপতিত্ব—ভারতে মালিক মনোবৃত্তি—শ্রমিক নেতাদের গ্রেফ্‌তার ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সূচনা—আইনজীবীদের অর্থলালসা—মীরাট মামলা তদ্বিরের অভিজ্ঞতা।

২৭। ঝটিকার পূর্বাভাস — ১৫৪—১৬২

আইন সভাগুলির শোচনীয় পরিণতি—নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যর্থতা—গান্ধিজীর খাদি প্রচার ও জনসাধারণের উপর অপূর্ব প্রভাব—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ও অনশন ধর্মঘট—কারাগারে ভগৎসিং ও যতীন দাসের সহিত সাক্ষাৎ—যতীন দাসের মৃত্যু—গান্ধিজীর অস্বীকৃতিতে আমাকে সভাপতি নির্বাচন—নির্বাচনে আমার বিরক্তি ও পরে আত্মসম্বরণ—পিতার আনন্দ—বড়লাট কর্তৃক গোলটেবিল বৈঠক ঘোষণা—দিল্লীতে নেতৃসম্মেলন—সহযোগিতার সর্ত রচনা—আপোষের সর্বশেষ চেষ্টা—গান্ধিজী এবং পিতার বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ—আলোচনার নিষ্ফলতা—নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব—শ্রমিক কংগ্রেসের সহিত জাতীয় কংগ্রেসের স্বাতন্ত্র্য—শ্রমিক নেতাদের মতভেদের ফলে শ্রমিক কংগ্রেসে বিরোধ ও বিচ্ছেদ।

২৮। স্বাধীনতা এবং তাহার পর — ১৬২—১৬৮

লাহোর কংগ্রেসের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা—পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব—খাঁ আবদুল গফুর খাঁ ও সীমান্তের কংগ্রেসকর্মিগণ—২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবস ঘোষণা—এলাহাবাদে কুম্ভ মেলা—আনন্দ ভবনে জনতার ভীড়—আমার জনপ্রিয়তা—আমার ও পিতার সম্পর্কে অলীক কাহিনী—বীরপূজায় আমি কি গর্বিত?—আমার জনপ্রিয়তায় পরিবারবর্গের পরিহাস—মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাত।

২৯। আইন অমান্যের সূচনা — ১৬৮—১৭৪

পূর্ণ স্বাধীনতা-দিবসের প্রেরণা—গান্ধিজীর নেতৃত্ব গ্রহণ—লবণ আইন ভঙ্গ প্রস্তাব—গান্ধিজীর সহিত বড়লাটের পত্র বিনিময়—ডাণ্ডী অভিযান—কংগ্রেসের সংঘর্ষের ব্যবস্থা—জাম্বুসারে গান্ধিজীর সহিত আমার ও পিতার সাক্ষাৎ—গান্ধিজী কর্তৃক লবণ আইন ভঙ্গ—দেশব্যাপী আন্দোলনের বন্যা—১৪ই এপ্রিল আমার গ্রেফ্‌তার—আমার জননী ও পত্নীর পিকেটিংয়ে যোগদান—পেশোয়ারে পাঠানদের উপর গুলিবর্ষণ—গাড়োয়ালী সৈন্যদের গুলিবর্ষণে অস্বীকৃতি—বহুতর অর্ডিন্যান্স জারী—সংবাদপত্র দলন—গান্ধিজীর গ্রেফ্‌তার—পিতার বোম্বাই গমন ও প্রত্যাবর্তনের পথে গ্রেফ্‌তার।

৩০। নৈনী জেলে — ১৭৫—১৮২

বিভিন্ন কারাবাসের অভিজ্ঞতা—যাবজ্জীবন দণ্ডিত বন্দীদের মনোভাব—সাধারণ কয়েদীদের জীবনযাত্রা—ভারতীয় জেলের

বিষয়	পৃষ্ঠা
অব্যবস্থা—কারাবিধির অমানুষিক কঠোরতা—ইউরোপীয়ান কয়েদীদের বিশেষ সুবিধা—কয়েদীদের দয়া-দাক্ষিণ্য—বাহিরের ঘটনাবলীতে দুশ্চিন্তা।	
৩১। এরোডায় আপোষের কথাবার্তা	১৮২—১৮৯
সপ্রু জয়াকরের দৌত্য—বোম্বাইয়ে পিতার বিবৃতি—জেলে সপ্রু জয়াকরের সাক্ষাৎ—আমার ও পিতার পুণা যাত্রা—এরোডা জেলে নেতৃবৃন্দের বৈঠক—পিতার খাদ্য লইয়া কারাধ্যক্ষ কর্ণেল মার্টিনের বিস্ময়—নৈনীতে প্রত্যাবর্তন—পিতার শারীরিক অসুস্থতার জন্য কারামুক্তি—ট্যাক্স ও খাজনা বন্ধ আন্দোলন—আমার কারামুক্তি—কৃষকদের মধ্যে প্রচার কার্য—মুসৌরীতে পিতার সহিত সাক্ষাৎ—এলাহাবাদে পুনরায় গ্রেফ্‌তার।	
৩২। যুক্ত-প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন	১৮৯—১৯৭
জেলে বিচার—পঞ্চমবার কারাদণ্ড—পীড়িত পিতার কর্মোৎসাহ—পিতার কলিকাতা যাত্রা—আমার কারাদণ্ডে খাজনাবন্ধ আন্দোলনে নূতন উৎসাহ—কৃষক বিদ্রোহের আশঙ্কা—ভারতে আন্দোলন মন্দীভূত—প্রবল দমননীতি—রাজনৈতিক বন্দীদের বেত্রদণ্ড—নৈনীজেলে মালব্যজী—১৯৩১-এর ১লা জানুয়ারী কমলার গ্রেফ্‌তার—সে সংবাদে পিতার উৎকণ্ঠা ও এলাহাবাদ প্রত্যাবর্তন—নৈনীজেলে পিতার সহিত সাক্ষাৎ—লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক—শাস্ত্রীর বক্তৃতায় বিক্ষোভ—পিতার রোগ-বৃদ্ধি ও আমার অকস্মাৎ কারামুক্তি।	
৩৩। পিতৃ-বিয়োগ	১৯৮—২০০
গান্ধিজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের কারামুক্তি—নেতৃবৃন্দের এলাহাবাদ আগমন—রোগের সহিত পিতার সংগ্রাম—সহকর্মীদের সহিত সাক্ষাৎ—কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে তাঁহার নিস্পৃহ ভাব—পিতাকে লইয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা—৫ই ফেব্রুয়ারী পিতৃ-বিয়োগ—শবদেহ লইয়া এলাহাবাদ যাত্রা—গান্ধিজীর সম্মুখে গঙ্গাতীরে চিতা নির্বাণ।	
৩৪। দিল্লী-চুক্তি	২০১—২০৯
বৈঠকী সদস্যদের ভারতে প্রত্যাবর্তন—গান্ধিজীর দিল্লীযাত্রা—বড়লাটের সহিত আলোচনার সূচনা—দিল্লীতে রাজনৈতিক আলোচনা—গান্ধিজী ও গণতন্ত্র—গান্ধিজী ও ভারতের ধর্মভাব—জনসাধারণের উপর তাঁহার প্রভাব—গান্ধী-আরুইন আলোচনা—৪ঠা মার্চ মধ্যরাত্রিতে গান্ধিজীর চুক্তির সর্তে সম্মতি—আন্দোলনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া।	
৩৫। করাচী কংগ্রেস	২১০—২১৮
চুক্তির ফলে আমার বিমর্ষভাব—বন্দীদের মুক্তিসমস্যা—ভগৎসিংহের মৃত্যুদণ্ড মকুবে গভর্ণমেন্টের অস্বীকৃতি—টেররিস্ট মনোবৃত্তি—চন্দ্রশেখর আজাদ—বিপ্লবীচিহ্নিত স্মারক—আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত—অনেকস্থলে সরকারী কর্মচারীদের ক্রোধ—যুক্ত-প্রদেশের কৃষক সমস্যা—করাচী কংগ্রেস—মৌলিক অধিকারের প্রস্তাব—এলাহাবাদে মানবেন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাতের কথা—পঞ্জাবের অহ্‌রার দল—কানপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী নিহত।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৬। দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম	২১৯—২২২
পত্নী ও কন্যাসহ সিংহলযাত্রা—অনুরাধাপুর দর্শন—নিউরারা ইলিয়া স্বাস্থ্যাবাস—বৌদ্ধভিক্ষু—কিশোর বালকের উক্তি—দক্ষিণ ভারতের দেশীয় রাজ্য—হায়দ্রাবাদে শ্রীযুক্তা নাইডুর আতিথ্য গ্রহণ—বোম্বাই আগমন।	
৩৭। সন্ধিকালের সংঘর্ষ	২২২—২৩০
গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধিজীর যাত্রায় সমস্যা—সরকারী দমননীতি ও শাসকগণের মনোভাব—বাঙলায় দমননীতি—যুক্ত-প্রদেশের কৃষক সমস্যা—সীমান্তের দমননীতি—"সীমান্ত গান্ধী"—সাম্প্রদায়িক সমস্যা—রাজকর্মচারীদের চুক্তিভঙ্গ—জগদ্ব্যাপী অর্থ-সঙ্কট ও পল্লীর দুরবস্থা—কংগ্রেসকর্মীদের উপর দোষারোপ—বিরোধ—সিমলায় গিয়া নিষ্ফল আলোচনা—অবশেষে গান্ধিজীর বিলাত যাত্রা।	
৩৮। গোলটেবিল বৈঠক	২৩১—২৩৯
গান্ধিজী সম্পর্কে ইংরাজ সাংবাদিকের মিথ্যাপ্রচার—কংগ্রেস ও গান্ধিজী সম্পর্কে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে আজগুবী গল্প রটনা—গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণের উদ্দেশ্য—প্রতিক্রিয়াশীল সদস্যদের মনোবৃত্তি—কায়েমী স্বার্থবাদীদের কাণ্ড—বৈঠকে স্বদেশবিরুদ্ধতা—মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সহিত ব্রিটিশ স্বার্থের মিলন—সুবিধাবাদীদের চক্রান্তে বৈঠক ব্যর্থ।	
৩৯। যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা	২৩৯—২৫১
কৃষক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—মন্দার ফল—ক্রমবর্ধিত কৃষিঋণ—কৃষকদের দাবী—প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মনোভাব—আইনী ও বে-আইনী পীড়ন—নিরাশ কৃষকদের অভিযোগ—জোর জুলুমের কথা—সরকারী প্রস্তাব ও কংগ্রেসের মনোভাব—দিল্লীতে অর্ডিন্যান্স পুনঃপ্রয়োগের জন্য তোড়জোড়—খাজনা মাপের পরোয়ানা ও ভীতি প্রদর্শন—কংগ্রেস ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আপোষের বাধা।	
৪০। সন্ধির অবসান	২৫২—২৫৮
বাঙলায় দুরবস্থা—হিজলী বন্দিশালায় গুলিবর্ষণ—চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মচারী হত্যা—প্রতিশোধ প্রবৃত্তি ও সহর লুণ্ঠন—১৯৩১-এর নভেম্বরে কলিকাতা যাত্রা—টেররিস্ট যুবকদের সহিত সাক্ষাৎ—এলাহাবাদে কৃষক সম্মেলন—কর্ণাটক যাত্রা—বোম্বাই-এলাহাবাদের পথে নিষেধাজ্ঞা—এটোয়ার প্রাদেশিক সম্মেলন সমস্যা—সীমান্তে অর্ডিন্যান্স জারী—গ্রেফ্তার ও আমার কারাগার।	
৪১। গ্রেফ্তার, বাজেয়াপ্ত, অর্ডিন্যান্স	২৫৮—২৬১
গান্ধিজীর প্রত্যাবর্তন—সাক্ষাৎ প্রস্তাবে বড়লাটের অস্বীকৃতি—গান্ধিজীর গ্রেফ্তার ও চারিটি নূতন অর্ডিন্যান্স—ভারতে অর্ধ-সামরিক শাসন—আমার ও শেরোয়ানীর কারাদণ্ড—জেলে জন-সমাজের সাড়া—দুই জাতীয় কারাদণ্ড—বাহিরের জগতের উৎকণ্ঠা।	

বিষয় — পৃষ্ঠা

৪২। আত্মপ্রচারের ধূম — ২৬১—২৭০

সরকারী কংগ্রেস নিন্দা—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকার বিষোদ্গার—জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র—মান্দ্রাজের 'হিন্দু'—পূর্ব হইতে প্রস্তুত গভর্ণমেণ্টের আক্রমণ—বাজেয়াপ্তের ধূম—অনিচ্ছুক কংগ্রেসের নিরুৎসাহ—ধনীদের সম্পত্তি ও টাকা বাজেয়াপ্তির ভয়—নারী-বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার—যুক্ত-প্রদেশে খাজনা মাপ—গভর্ণমেণ্টের স্নায়বিক দৌর্বল্য—কৃষক পল্লীতে ক্রোক ও বাজেয়াপ্তি—"আনন্দ ভবন" দখল—আয়কর না দেওয়ায় আমার মোটর গাড়ী ও আসবাব ক্রোক ও নীলাম—জাতীয় পতাকার অপমান—আমার মাতাকে পুলিশের বেত্রাঘাত ও তাহার ফল।

৪৩। বেরিলী ও দেরাদুন জেল — ২৭১—২৭৯

দেরাদুন জেলে বদলী—জাতীয় সংগ্রামের সমালোচনা ও অভিজ্ঞতা—সংগ্রাম পরিচালনে ব্যয়ের কথা—সরকার পক্ষীয় ও সুবিধাবাদী-দের মনোভাব—মডারেট ও ব্যক্তিস্বাধীনতা—ভারতীয় দমননীতি ও ব্রিটিশ মনোভাব—তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক—বাংলায় দমননীতির তীব্রতা—কারাগারে দেশসেবক নরনারীদের লাঞ্ছনা—জেলের কঠোরতার তীব্রতা।

৪৪। জেলে মানব প্রকৃতি — ২৭৯—২৮৫

বেরিলী জেল হইতে দেরাদুন যাত্রা—পুলিস সুপারিনটেনডেণ্টের মানবতা ও সৌজন্য—আমরা ও ইংরাজ—জেলে দুর্ব্যবহারের ফলে মাতা ও পত্নীর সাতমাস দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ—জেলের সঙ্গিগণ—দৈনন্দিন কাজ—কারাবিধির সমালোচনা।

৪৫। কারাগারে জীবজন্তু — ২৮৫—২৯১

বোলতা, ভীমরুল, উইপোকা—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—চামচিকা, টিকটিকি, কাঠবিড়ালি, ময়না, টিয়াপাখী, পাপিয়া, বানর, বৃশ্চিক, বজ্রকীট ও কুকুর।

৪৬। সংঘর্ষ — ২৯১—২৯৯

দিল্লীতে ও কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের চেষ্টা—আন্দোলন মন্দীভূত—সমাজতন্ত্রবাদ ও কম্যুনিজম—সোভিয়েট রুশিয়া—মার্কসীয় মতবাদ ও দর্শন—আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ—কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদ—গান্ধিজী ও কম্যুনিস্টদের সমালোচনা—কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট—ভারতের ধনী সম্প্রদায়—কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের চরিত্র।

৪৭। ধর্ম কি? — ২৯৯—৩০৮

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে গান্ধিজীর অনশন—দেশব্যাপী চাঞ্চল্য—কারাগারে বসিয়া উৎকণ্ঠা—পুণাচুক্তি—আবার একুশ দিন উপবাস—ধর্মের গোঁড়ামী—প্রণালীবদ্ধ ধর্ম—খৃষ্টানধর্ম ও সাম্রাজ্যবাদ—চার্চের মনোভাব—ধর্ম ও আত্মোন্নতি—গান্ধিজী ও ধর্ম—ধার্মিকের লক্ষণ।

৪৮। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দ্বৈতনীতি — ৩০৯—৩২১

হরিজন আন্দোলন—আমার বিস্ময় ও বিরক্তি—মন্দির প্রবেশ বিল ও সরকারী মনোভাব—সমাজ সংস্কারের বাধা—গান্ধিজীর কারামুক্তি

বিষয়	পৃষ্ঠা
—সাময়িক ভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত—পুণাবৈঠক—আবার গান্ধিজীর বড়লাটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা ও প্রত্যাখ্যান লাভ—হোয়াইট পেপার—লিবারেলদের মত ও মনোভাব—মিঃ শাস্ত্রীর বক্তৃতার সমালোচনা—দমননীতির উলঙ্গরূপ।	
৪৯। দীর্ঘকারাদণ্ডের অবসান	৩২১—৩২৪
জে. এম. সেনগুপ্তের মৃত্যু—ভারতীয় মধ্যশ্রেণীর ভোজনবিলাস—আমার খাদ্য—ব্যায়াম—গান্ধিজীর পুনরায় গ্রেফ্তার ও কারাদণ্ড—অনশন ব্রত—নৈনীজেল হইতে কারামুক্তি।	
৫০। গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ	৩২৪—৩৩২
দীর্ঘকাল তীব্র দমননীতির ফল—ইংরাজ মহলে নাৎসী মনোবৃত্তি—কারামুক্তির পরের অবস্থা—সেন্সর কড়াকড়ি—পারিবারিক আর্থিক অবস্থা—পুণাযাত্রা ও গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ—গান্ধিজীর সমস্যা—বোম্বাই আগমন—উদয়শঙ্করের নৃত্যদর্শন—নাটক ও যাত্রাভিনয়—সমাজতন্ত্রীদল—ভারতীয় সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্টদের গান্ধিজীর বিরুদ্ধ সমালোচনা—তাঁহাদের চিন্তার ত্রুটী।	
৫১। লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গী	৩৩২—৩৩৮
পুণার সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ—ভারতীয় লিবারেলগণ—তাঁহাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা—প্রাচীন কালের বিশ্বাস—মডারেটদের সংযম ও ন্যায়বুদ্ধি।	
৫২। স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন	৩৩৮—৩৪৬
কংগ্রেস ও মধ্যশ্রেণী—ভারতপ্রবাসী ইংরাজদের চিন্তাধারা—মডারেট-গণ ও কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য—ইংরাজ ও ইংলণ্ডের প্রতি আমার মনোভাব—ব্যক্তিগত ভাবে ইংলণ্ডের নিকট আমার ঋণ—সাম্রাজ্যবাদ ও সহযোগিতা—স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিকতা—নূতন রাষ্ট্র না নূতন শাসন প্রণালী?—ব্রিটিশ শ্রমিকদল—মডারেটীয় নিয়মতান্ত্রিকতা।	
৫৩। প্রাচীন ও নবীন ভারত	৩৪৬—৩৫২
জাতীয়তাবাদের গোড়ার কথা—বিগত শতাব্দীতে শিক্ষিত ভারত-বাসীর ব্রিটিশ মতবাদ গ্রহণ—ব্রিটিশ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ—অতীত ভারতের গর্ব ও গৌরব—ভারত ও ইতালীর সাদৃশ্য—ভারত মাতা—প্রাচীন সংস্কৃতি ও নবীন ভাবধারা।	
৫৪। ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ	৩৫২—৩৬৬
ব্রিটিশ অধিকারের প্রথম ফল—কয়যুগের প্রতিক্রিয়া—বর্তমান যুগের অনুপযোগী শাসনপ্রণালী—শান্তি ও রাজনৈতিক ঐক্য—অনগ্রসর ভারতের অবস্থা—ভয়াবহ দারিদ্র্য—বৈদেশিক অধীনতার ফল—নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের চরিত্রদৌর্বল্য—সিভিল সার্ভিসের দোষগুণ—তাঁহাদের আত্মাভিমান—ভারতের জনসংখ্যা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ—সামরিক চতুরী—প্রধান সেনাপতির আস্ফালন—সামরিক মনোবৃত্তির সমালোচনা—ব্রিটিশ শাসনের আত্মপরীক্ষা।	

বিষয় — পৃষ্ঠা

৫৫। অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমস্যা — ৩৬৬—৩৭২

"ভারত কোন্ পথে"—আমার ভগ্নী কৃষ্ণার অসবর্ণ বিবাহ—লাটিন অক্ষর প্রচারের বাধা—ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে ইংরাজদের বিকৃত ধারণা—হিন্দুস্থানী ভাষা—কাশীতে হিন্দী লিখন পদ্ধতির আলোচনা।

৫৬। সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া — ৩৭৩—৩৮৫

বিঠলভাই প্যাটেলের মৃত্যু—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা—হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িকতা—মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁর রাজনীতি—আলীগড় কলেজ—আগা খাঁর নেতৃত্ব—অসহযোগ আন্দোলন—সাম্প্রদায়িকতার নব রূপান্তর—গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিক্রিয়াপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদ—হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি।

৫৭। বন্ধ পথ — ৩৮৫—৩৯২

আমার গ্রেফ্তার সম্বন্ধে জনরব—এলাহাবাদে কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন—সংবাদপত্রে প্রবন্ধ ও বিবৃতি প্রকাশ—আশাভঙ্গজনিত দুঃখ—আমার সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার—পারিবারিক অর্থাভাব—কমলার চিকিৎসার্থ কলিকাতা যাত্রা।

৫৮। ভূমিকম্প — ৩৯২—৪০১

এলাহাবাদে ভূমিকম্প—কলিকাতার সহকর্মীদের সহিত আলোচনা—টেরোরিজম্—জনসভায় তিনটি বক্তৃতা দান—কবি রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করিবার জন্য শান্তিনিকেতন যাত্রা—পাটনা ও মজঃফরপুরে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা দর্শন—ভূমিকম্প ও বিহার গভর্ণমেন্টের নিশ্চেষ্টতার সমালোচনা—সরকারী কর্মচারী মহলে বিক্ষোভ—দশদিন ভূকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলে ভ্রমণ—রিলিফ কমিটি ও সেবাকার্যের বিবরণ—ভূমিকম্প "অস্পৃশ্যতা পাপের" শাস্তি—গান্ধিজীর মন্তব্যে আমার বিহ্বলতা—এলাহাবাদ প্রত্যাবর্তন—পুনরায় গ্রেফ্তার।

৫৯। আলীপুর জেল — ৪০২—৪০৫

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেল—ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত—দুই বৎসর কারাদণ্ড লাভ—সপ্তমবার জেলে প্রবেশ—আলীপুর জেল—আভ্যন্তরীণ অবস্থা—সরকার সেলাম।

৬০। গণতন্ত্র—প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে — ৪০৬—৪১১

১৯৩৪-এ ইউরোপের অশান্তি—ফাসিস্ত প্রতিক্রিয়া—ব্রিটিশ জাতির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা—ভারতে স্বৈর শাসন—সাম্প্রদায়িকতা ও গণতন্ত্র।

৬১। বিবাদ — ৪১১—৪২০

আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সংবাদ—আইন সভায় প্রবেশের জল্পনা কল্পনা—গান্ধিজীর বিবৃতি পাঠে অবসাদ—গান্ধিজীর সহিত আমাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য—ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের উপর আমার ক্ষোভ—গান্ধিজীর নীতিবাদ।

বিষয় | পৃষ্ঠা

৬২। স্ববিরোধিতা — ৪২১—৪৪০

গান্ধিজীর চিন্তা ও চরিত্র—তাঁহার মানসিক গঠন—সমাজতন্ত্রবাদ ও গান্ধিজী—যন্ত্রযুগের নূতন সমস্যা—গান্ধিজীর কার্যপদ্ধতি—চরকা, তাঁত ও খাদি—কুটীর শিল্প—কল-কারখানা-ভীতি—গান্ধিজীর স্ববিরোধিতা—ভারতীয় দেশীয় রাষ্ট্রগুলির স্বৈর শাসন—গান্ধিজী ও দেশীয় রাজন্য—দেশীয় রাজ্যের ব্রিটিশ কর্মচারী—কংগ্রেস ও দেশীয় রাজ্য—গান্ধিজী ও জমিদারী প্রথা।

৬৩। হৃদয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ — ৪৪০—৪৫৪

গান্ধিজীর অহিংসা-নীতি—অহিংসা নীতির সমালোচনা—অহিংসা ও সত্য কি এক কথা?—সমাজ ও রাষ্ট্র হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত—বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা—ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বলপ্রয়োগ—সুবিধাভোগী শ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্তন—অহিংস আন্দোলনের প্রভাব—উহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা—গান্ধিজীর নীতি ও বাস্তব অবস্থা—প্রাচ্যের নব রূপান্তর—বলপ্রয়োগের গুরুত্ব—সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনে অহিংসার শক্তি সীমাবদ্ধ—শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা।

৬৪। পুনরায় দেরা জেলে — ৪৫৪—৪৬১

কলিকাতা হইতে বদলী—দেরা জেলে কঠোর ব্যবস্থা—কমলার পীড়া ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে দুশ্চিন্তা—আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার ও কংগ্রেসে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রভাব—আমার মানসিক অবসাদ—কার্যকরী সমিতির সমাজতন্ত্রবাদ ভীতি—কার্যকরী সমিতির নরম পন্থা—গভর্ণমেণ্টের জয়গর্ব—আত্মচরিত লেখা আরম্ভ—কমলার পীড়া—এগার দিন ছুটি।

৬৫। এগার দিন — ৪৬১—৪৬৫

রোগশয্যায় কমলা—আমাদের বিবাহিত জীবন—পুরাতন স্মৃতি—বাহিরের ঘটনা সম্পর্কে মত প্রকাশে অনিচ্ছা—কংগ্রেসী কলহ দেখিয়া বিষাদ—পুলিশের সহিত নৈনী জেলে গমন।

৬৬। কারাগারে প্রত্যাবর্তন — ৪৬৫—৪৭০

কমলার পীড়ায় দুশ্চিন্তা—অক্টোবরে কমলার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ—কমলার ভাওয়ালি যাত্রা—আমার আলমোড়া জেলে গমন—পর্বত দর্শনে আনন্দ—খাঁ আব্দুল গফুর খাঁর গ্রেফ্‌তার ও কারাদণ্ডের সংবাদ—আলমোড়া জেল হইতে ভাওয়ালিতে কমলার সহিত সাক্ষাৎ।

৬৭। কতকগুলি আধুনিক ঘটনা — ৪৭১—৪৯০

বোম্বাই কংগ্রেস—ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন—কংগ্রেস জাতীয় দল—কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা—বাংলার প্রতি বিশেষ অবিচার—হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম কন্‌ফারেন্সের প্রগতিবিরোধী মনোবৃত্তি—জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির রিপোর্ট—অটাওয়া চুক্তির ফল—প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদ—মডারেটদের বিক্ষোভ—যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা—সরকারী দমননীতির অবাধ প্রয়োগ—আমাদের রাজনীতিকদের জাগতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতা—অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন—নূতন সমাজ ব্যবস্থার আবশ্যকতা—বিশেষ স্বার্থ সম্বন্ধে ভীতি—সমাজতন্ত্রবাদের প্রয়োজন—ভারতে কৃষক ও শ্রমিকদের দুর্গতি—উদ্ধারের পথ—ব্রিটিশ

বিষয় পৃষ্ঠা

সাম্রাজ্যবাদ ও কায়েমী স্বার্থ—কার্ল মার্কসের মতবাদ—সোভিয়েট রুশিয়া—ভারতের সমস্যা—কম্যুনিজম নহে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ—"জুগুলি"।

৬৮। উপসংহার ৪৯০—৪৯৩

আত্মবিশ্লেষণ—রামস্বামী আয়ারের মত—বর্তমানের সংশয় ও ভবিষ্যতের আশা।

পুনশ্চ ৪৯৩—৪৯৪

কোয়েটা ভূমিকম্প—কারামুক্তি—পীড়িতা পত্নীকে দেখিবার জন্য জার্মানী যাত্রা।

পাঁচ বৎসর পর ৪৯৫—৫০৯

মানসিক অশান্তি—আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতিক্রিয়া—স্বদেশে প্রত্যাবর্তন—কংগ্রেসের সভাপতিত্ব—কংগ্রেসী কার্যধারায় নৈরাশ্য—নূতন শাসনতন্ত্র—নির্বাচনী প্রচারকার্য—ভারত ভ্রমণ—কংগ্রেস মন্ত্রী মণ্ডলের কার্য—গভর্ণমেণ্টের বিরোধিতা—ইউরোপ যাত্রা—বার্সিলোনা, লণ্ডন, পারী—মুসলিম লীগের রাজনীতি—ত্রিপুরী কংগ্রেস—সুভাষচন্দ্র বসু—দেশীয় রাজ্য—জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি—চীন ভ্রমণ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব—ভারতের অচল অবস্থা—রাজাগোপালাচারীর আপোষ প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

পরিশিষ্ট—ক : স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প-বাক্য (২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০) ৫১০—৫১১

পরিশিষ্ট—খ : শান্তি স্থাপনের সর্ত সম্পর্কে লিখিত পত্র (১৫ই আগস্ট, ১৯৩০) ৫১২—৫১৪

পরিশিষ্ট—গ : স্মারক-প্রস্তাব (২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩১) ৫১৪—৫১৫

পরিশিষ্ট—ঘ : জীবনের পথ পরিক্রমা ৫১৬—৫১৮

চিত্র-সূচী

পৃষ্ঠা

গ্রন্থকারের পিতা : পণ্ডিত মতিলাল নেহরু — মুখ-চিত্র

জওহরলালের মাতা স্বরূপরাণী নেহরু — ১

গ্রন্থকার — ৩২

স্ত্রী ও কন্যাসহ জওহরলাল — ৩৩

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সদনে জওহরলাল — ৫২

জনসভায় বক্তৃতা — ৫৩

লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯) : সভাপতি জওহরলাল নেহরু দণ্ডায়মান — ৫৩

জওহরলাল নেহরু (১৯৩০) — ৯৬

কমলা নেহরু — ৯৭

ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী : জওহরলালের কন্যা — ১৬৮

মহিলা সত্যাগ্রহিগণ : মধ্যস্থলে শ্রীমতী কমলা নেহরু উপবিষ্টা — ১৬৯

১৯৩০ সালে জওহরলাল নেহরুর বিচার — ১৭৬
(১) বিচার : পণ্ডিত মতিলাল জওহরলালের পার্শ্বে উপবিষ্ট
(২) পুত্রের সহিত দেখা করিবার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নৈনী জেলে ৬নং ব্যারাকে যাইতেছেন

জওহরলাল নেহরুর বিচার (১৯৩০) : বন্ধুগণ বিচার দেখিবার জন্য নৈনী জেলের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন — ১৭৭

গোলটেবিল বৈঠক হইতে প্রত্যাগত মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎলাভের জন্য বোম্বাই যাত্রাকালে চিওকী ষ্টেশনে গৃহীত জওহরলালের ফটো; জওহরলাল ও মিঃ শেরোয়ানীর (তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান) পরবর্তী ষ্টেশনে গ্রেফ্‌তার হইয়া এলাহাবাদে প্রত্যাবর্তন — ২৫৬

করাচী কংগ্রেস : জওহরলাল জাতীয় পতাকা উত্তোলন লক্ষ্য করিতেছেন — ২৫৭

আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা : সংগ্রামের প্রারম্ভে মাল্যভূষিত জওহরলাল এবং কমলা নেহরু — ২৫৭

জওহরলাল নেহরু

—আত্ম-চরিত—

'পাঁচ বৎসর পর'
নূতন অধ্যায়টি
সংযোজিত

১

কাশ্মীর হইতে অবতরণ

"কোন লোকের পক্ষে নিজের বিষয় লিখিতে যাওয়া যেমন তৃপ্তিকর, তেমনি কঠিন। নিজের কোন অকীর্তির কথা বলিতে গেলে বুকে যেমন বাজে, তেমনি আত্মপ্রশংসাও পাঠকগণের নিকট কর্ণ-পীড়াদায়ক।"

—আব্রাহাম লিঙ্কন।

বড়-ঘরের একমাত্র পুত্রের অতিরিক্ত আদরে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক; বিশেষতঃ ভারতবর্ষে। জন্মের পর এগার বৎসর পর্যন্ত সে-ই যদি একমাত্র সন্তান হয়, তাহা হইলে অত্যধিক প্রশ্রয়ের পরিমাণ হইতে তাহার পক্ষে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। আমার কনিষ্ঠা ভগিনীদ্বয় আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আমাদের প্রত্যেক দুইজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধানও কয়েক বৎসর করিয়া। অতএব, সমবয়সী সাথীর অভাবে আমার শৈশবজীবন একাকী নিঃসঙ্গভাবে কাটাইতে হইয়াছে। আমাকে বাল্যকালে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অথবা কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার জন্য দেওয়া হয় নাই বলিয়া বিদ্যালয়ের সাথীদের সহিত মিশিবারও সুযোগ পাই নাই। আমার শিক্ষার ভার গৃহশিক্ষয়িত্রী ও গৃহশিক্ষকগণের হাতে দিয়া সকলে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আমাদের গৃহে লোকের অভাব ছিল না। সাধারণ হিন্দুপরিবারের মতই আমাদেরও জ্ঞাতি ভ্রাতাভগ্নী ও কুটুম্ব স্বজনে পরিবৃত পরিবার। কিন্তু আমার জেঠাত ভাইরা তখন কেহ কলেজে কেহ বা ইস্কুলে পড়িতেন। তাঁহাদের সহিত আমার বয়সের ব্যবধান এত অধিক ছিল যে, তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের সহিত খেলিবার অথবা মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার অযোগ্য মনে করিতেন। কাজেই বৃহৎ পরিবারের মধ্যেও আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করিতাম এবং একাকীই কোন খেয়াল বা খেলা লইয়া সময় কাটাইতাম।

আমরা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। দুইশত বৎসর পূর্বে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যশঃ ও ঐশ্বর্যের অনুসন্ধানে পর্বতের উপত্যকা হইতে সমৃদ্ধিশালী সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। ঔরঙ্গজেব তখন মৃত, মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ, ফারুকসিয়ার তখন দিল্লীর সিংহাসনে। আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা কাউল সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় পণ্ডিতরূপে কাশ্মীরে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট ফারুকসিয়ার যখন কাশ্মীরে যান, তখন তিনি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সম্রাটের অনুরোধে তিনি পরিবারবর্গ সহ ১৭১৬ সালে দিল্লী চলিয়া আসেন। দিল্লীতে তিনি একটি খালের ধারে আবাসবাটী ও জায়গীর পান। এই খাল (নহর) হইতেই রাজা কাউলের নামের সহিত "নেহরু" উপাধি যুক্ত হয়। কাউল ছিল আমাদের পারিবারিক উপাধি—তাহা দাঁড়াইল কাউল নেহরু। পরবর্তী কালে কাউল পরিত্যক্ত হইল, রহিল নেহরু।

সেই রাজনৈতিক অব্যবস্থার দিনে বহু ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া নেহরু পরিবারের জায়গীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া অবশেষে বিলুপ্ত হইল। আমার প্রপিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ নেহরু দিল্লীর তথাকথিত সম্রাট দরবারে 'সরকার কোম্পানীর' উকীল

নিয্ক্ত হইলেন। আমার পিতামহ গঙ্গাধর নেহর্ ১৮৫৭ সালে বিরাট বিদ্রোহের প্র্বকাল পর্যন্ত কিছ্দিন দিল্লীর কোতোয়াল ছিলেন। ১৮৬১ সালে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে তাঁহার ম্ত্যু হয়।

১৮৫৭-র বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সহিত আমাদের পরিবারের সম্পর্ক শেষ হয় এবং ইহার ফলে আমাদের পারিবারিক প্রাচীন কাগজপত্র দলিলাদি নষ্ট হইয়া যায়। সমস্ত ভূসম্পত্তি প্রায় বিনষ্ট হওয়ায়, আমাদের পরিবার অন্যান্য বহ্তর গ্হহারাদের সহিত যোগ দিয়া প্রাচীন রাজধানী ছাড়িয়া আগ্রায় চলিয়া আসেন। তখনও আমাদের পিতার জন্ম হয় নাই। কিন্তু আমার দ্ই জ্যেষ্ঠতাত তখন য্বক এবং তাঁহারা কিছ্ ইংরাজীও শিখিয়াছিলেন। এই ইংরাজী জ্ঞানের জন্য আমার ছোট জেঠা মহাশয় এবং আমাদের পরিবারের আরও কয়েকজন এক আকস্মিক ও শোচনীয় ম্ত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। দিল্লী হইতে আগ্রার পথে তাঁহার সহিত অন্যান্যের সঙ্গে তাঁহাদের কনিষ্ঠা ভগ্নীও ছিলেন। এই অল্পবয়স্কা বালিকা অন্যান্য কাশ্মীরী বালিকার মতই অসামান্য র্পসী ছিলেন। পথে কয়েকজন ইংরাজসৈন্য আমার পিসীমার র্পলাবণ্য দর্শনে মনে করিল, জেঠামহাশয় কোন ইংরেজ বালিকাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছেন। তখনকার দিনে এইর্প অভিযোগের বিচার ও শাস্তি কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হইত এবং হয়তো অল্পকাল মধ্যেই জেঠামহাশয় ও অন্যান্য সঙ্গীদের পথিপার্শ্বস্থ ব্ক্ষে ঝ্লাইয়া ফাঁসী দেওয়া হইত। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে, জেঠামহাশয় ইংরাজী জানিতেন। তাহার ফলে বিচারে কিছ্ বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে তাঁহাদের পরিচিত একজন ঘটনাক্রমে সেই পথে আসিয়া পড়ায়, তিনি তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

আগ্রায় তাঁহারা কিছ্কাল বাস করিলেন। এই আগ্রায়, ১৮৬১-র ৬ই মে আমার পিতা ভূমিষ্ঠ হন।* আমার পিতার জন্মের তিন মাস প্র্বেই আমার পিতামহ লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। পিতামহের যে ক্ষ্দ্র চিত্র আমাদের গ্হে রহিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, তাঁহার পরিধানে মোগল দরবারের পোষাক, হাতে বাঁকা তরবারি; দেখিলে মোগল অভিজাত বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু তাঁহার অবয়বে কাশ্মীরী ছাপ স্স্পষ্ট।

পরিবার প্রতিপালনের ভার পড়িল আমার দ্ই জেঠার উপর। পিতা তখন শিশ্। সর্বজ্যেষ্ঠ বংশীধর নেহর্ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করিলেন। নানাস্থানে বদলী হওয়ার ফলে তিনি অধিকাংশ সময়েই পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতেন। মধ্যম নন্দলাল নেহর্ দেশীয় রাজ্যে চাকরী গ্রহণ করেন। ইনি দশ বৎসর রাজপ্তানার খেতরী রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। পরে আইন পড়িয়া আগ্রায় আইন ব্যবসায়ে প্রব্ত্ত হন। আমার পিতা ইঁহারই স্নেহচ্ছায়ে লালিতপালিত। ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি অন্রাগ ছিল গভীর। পিতার স্নেহ, ভ্রাতার প্রীতি-মিশ্রিত সে এক আশ্চর্য নিবিড় সম্পর্ক। সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া পিতা ছিলেন পিতামহীর আদরের দ্লাল। এই ব্দ্ধা মহিলার ছিল স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। তাঁহার অভিপ্রায়কে অবহেলা করা কঠিন ছিল। তাঁহার পরলোকগমনের পর অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও প্রাচীনা কাশ্মীরী মহিলারাও তাঁহার প্রখর কর্তৃত্বাভিমান ভুলিতে পারেন নাই।

জেঠামহাশয় নবপ্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টে যোগ দিলেন। হাইকোর্ট আগ্রা হইতে

---

* এক আশ্চর্য ও কৌত্হলোদ্দীপক সৌসাদ্শ্য এই যে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ঠিক এই বৎসরের ঐ মাসের ঐ তারিখে ভূমিষ্ঠ হন।

এলাহাবাদে উঠিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবারবর্গও এলাহাবাদে উঠিয়া আসিলেন। তখন হইতেই এলাহাবাদে আমরা স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলাম। বহুবর্ষ পরে এইখানেই আমার জন্ম হয়। ক্রমে পশার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জেঠা-মহাশয় স্থানীয় ব্যবহারজীবীদের অন্যতম প্রধান হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে আমার পিতা কাণপুর ও এলাহাবাদে স্কুল ও কলেজের শিক্ষায় অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি বাল্যকালে পার্শী ও আরবী ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। তারপর কিশোর বয়সে তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই বয়সেই তিনি পার্শীভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। আরবীতেও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। এই কারণে প্রাচীনগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন কিন্তু ইহা সত্ত্বেও স্কুল কলেজের ছাত্রজীবনে তিনি বিবিধ নষ্টামী ও দুষ্টামীর জন্য খ্যাতিমান হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ভাল ছেলের আদর্শ কোন দিনই ছিলেন না। লেখাপড়া অপেক্ষা খেলাধূলা এবং সঙ্গীদের সহিত নানা দুঃসাহসিক অভিযান করিতেই তিনি ভালবাসিতেন। কলেজের দুর্দান্ত ছেলেদের দলের তিনি ছিলেন নেতা, যখন একমাত্র কলিকাতা ও বোম্বাই ব্যতীত অন্যত্র ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য বেশভূষা ও আচার ব্যবহারের অনুকরণের রেওয়াজ হয় নাই, সেই সময়েই তিনি উহার প্রতি আকৃষ্ট হন। জেদী ও দুর্দান্ত হইলেও তিনি ইউরোপীয়ান অধ্যাপকদের প্রিয় ছিলেন এবং সর্বদাই সদয় ব্যবহার পাইতেন; তাঁহার তেজস্বিতা তাঁহাদের ভাল লাগিত। তিনি মেধাবী ছিলেন বলিয়া মাঝে মাঝে পড়াশুনা করিয়া অমনোযোগিতার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতেন। কাজেই ক্লাসেও তিনি ভাল ভাবেই কাটাইতে যাইতেন। পরবর্তী কালে তিনি তাঁহার অধ্যাপকদিগের অন্যতম এলাহাবাদ মুর সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ হ্যারিসনের কথা আমাদের নিকট সম্ভ্রমভরে উল্লেখ করিতেন। তাঁহার ছাত্রজীবনে উক্ত অধ্যাপকের লেখা একখানি পত্র তিনি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন।

বিশেষ কৃতিত্ব না দেখাইলেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি একে একে উত্তীর্ণ হন। বি. এ. পরীক্ষা আসিল। তিনি দেখিলেন পড়া তৈরী হয় নাই। প্রথম দিন প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ভাবিলেন, পাশ করিবার আশা আর নাই। ইহা ভাবিয়া তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। পরীক্ষা-গৃহের পরিবর্তে, তাজমহলে গিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন (তখন আগ্রায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইত)। তিনি পরীক্ষা দিতেছেন না জানিতে পারিয়া তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে ডাকিয়া ভর্ৎসনা করিলেন এবং বলিলেন যে, প্রথম প্রশ্নপত্রের উত্তর ভালই হইয়াছে। অন্যান্য প্রশ্নপত্রের উত্তর না দেওয়া অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ হইল। যাহা হউক আমার পিতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এইখানেই শেষ। তিনি আর কখনও বি. এ. পরীক্ষা দেন নাই।

ইহার পর তিনি জীবিকা অর্জনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বভাবতই আইন ব্যবসায়ের কথা তাঁহার মনে পড়িল। ভারতবর্ষে কেবলমাত্র আইন ব্যবসায়েই প্রতিভা ও যোগ্যতার পুরস্কার আছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দৃষ্টান্তও তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই ছিল। তিনি হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষা দিলেন। পাশ তো হইলেনই উপরন্তু সর্বপ্রথম হইয়া একটি স্বর্ণ-পদক লাভ করিলেন। তিনি মনোমত পথ খুঁজিয়া পাইয়া সুখী হইলেন এবং তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল, আইন ব্যবসায়ে সাফল্য সুনিশ্চিত। তিনি কাণপুরে জিলা আদালতে ওকালতী আরম্ভ করিলেন এবং সাফল্য লাভের আগ্রহে কঠিন পরিশ্রমে অল্প দিনেই কিছু প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্রীড়াপ্রীতি ও অন্যান্য আমোদেও কিছু ব্যয় হইত, কুস্তী ও দঙ্গলে তাঁহার বিশেষ অনুরক্তি ছিল। সে সময় কাণপুর কুস্তী-

প্রতিযোগিতা খেলার জন্য বিখ্যাত ছিল।

কাণপুরে তিন বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়া পিতা এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগ দিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পণ্ডিত নন্দলালের সহসা মৃত্যু হইল। পিতা শোকাবেগে মূহ্যমান হইলেন। পিতৃতুল্য স্নেহময় ভ্রাতার মৃত্যু, কেবল তাঁহারই বিয়োগব্যথা নহে, একটি বৃহৎ পরিবারের যিনি কর্তা এবং যাঁহার উপার্জন সর্বাধিক, তাঁহার অভাবে সমস্ত ভারও পিতার স্কন্ধে পড়িল।

সাফল্যের দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া তিনি কর্ম-সাগরে ডুবিলেন; নিজেকে সকল বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্বশক্তি ব্যবসায়ে নিয়োগ করিলেন। জেঠা মহাশয়ের মক্কেলগণ প্রায় সকলেই তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার সাফল্যের আশা অল্পদিনেই সফল হইল। অর্থাগমের সহিত নূতন কাজও আসিতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ উকীলরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। এই সাফল্যের মূল্যস্বরূপ তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি সমস্ত কামনা আইনরূপী প্রিয়ার হস্তে সমর্পণ করিলেন। কি জনহিতকর, কি ব্যক্তিগত আর কোন কাজের অবসর তাঁহার রহিল না। ছুটির দিন অথবা আদালতের অবকাশ সময়েও তিনি আইন ব্যবসায়ে ডুবিয়া থাকিতেন। তখন ভারতীয় রাষ্ট্র-সভা (কংগ্রেস) সমবেত ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তিনি প্রথমদিকে কয়েকটি অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের প্রতি একপ্রকার মানসিক আনুগত্যও তাঁহার ছিল। কিন্তু তখনকার দিনে কংগ্রেসের কাজে তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখান নাই। তিনি আইন ব্যবসায় লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। রাজনীতি ও সাধারণের কাজ সম্পর্কে সে সময় তাঁহার কোন নিশ্চিত ধারণা ছিল না। তখন ঐ সকল বিষয়ে তিনি খুব অল্পই খোঁজ খবর রাখিতেন বলিয়া ঐ দিকে আকৃষ্ট হন নাই। কোন আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানে অপরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া যোগ দিবার মত মানসিক অবস্থা তাঁহার ছিল না। তাঁহার বাল্য ও প্রথম যৌবনের যুদ্ধপ্রিয় প্রকৃতি বাহ্যতঃ শান্ত বোধ হইলেও উহা এক নবীন রূপান্তরে নব নব জয়ের পথে আত্মপ্রকাশ করিল। এই শক্তিই ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া তিনি সাফল্য লাভ করিলেন। সাফল্যের সহিত আসিল সার্থক আত্মাভিমান ও আত্মপ্রত্যয়। তিনি সংগ্রাম—বাধা ও বিপত্তির সহিত সংগ্রাম ভালবাসিতেন। অথচ আশ্চর্য এই, রাষ্ট্রক্ষেত্রকে এই কালে তিনি পরিহার করিয়া চলিতেন। অবশ্য তৎকালে কংগ্রেসে রাজনৈতিক সংগ্রাম-প্রবণতা অতি অল্পই ছিল। যাহাই হউক, সে ভূমি ছিল তাঁহার অপরিচিত, আইন ব্যবসায়গত কঠিন পরিশ্রমেই তিনি মগ্ন থাকিতেন। সাফল্যের প্রত্যেকটি সোপান দৃঢ় পদে অতিক্রম করিয়া তিনি ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিলেন। অপরের অনুগ্রহে নহে, পরের পরিশ্রম আত্মসাৎ করিয়াও নহে। তিনি মনে করিতেন, ইহা তাঁহার স্বকীয় বুদ্ধি ও শৌর্যবলে।

অবশ্য তিনি সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী হইলেও ইংরাজ এবং ইংরাজ চরিত্রের প্রশংসা করিতেন। তিনি ভাবিতেন, তাঁহার স্বদেশবাসীর যে অধঃপতন ঘটিয়াছে, বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা তাহারই ফল। যে সকল রাজনীতিক কোন কাজ না করিয়া কেবল কথা বলিতেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার মনে একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল। অথচ কথা ছাড়া আর কি করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরও কোন ধারণা ছিল না। নিজের সাফল্যের গর্বে তিনি ইহাও মনে করিতেন যে, যাহারা জীবনযুদ্ধে সফলকাম হয় নাই (অবশ্য সকলে নহে) এমন লোকেরাই রাজনীতি চর্চা করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ আয় বৃদ্ধির ফলে আমাদের জীবনযাত্রারও অনেক পরিবর্তন হইল।

আয় বৃদ্ধির অর্থই ব্যয় বৃদ্ধি। বিত্ত সঞ্চয় করাকে, পিতা নিজের ইচ্ছামত ও প্রয়োজনমত অর্থ উপার্জন করিবার ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাস বলিয়া মনে করিতেন। আমোদপ্রিয় এবং বিলাসপ্রিয় পিতা উপার্জিত অর্থ অজস্রভাবে ব্যয় করিতে কোন কুণ্ঠাই বোধ করিতেন না। এইরূপে ক্রমশঃ আমাদের পারিবারিক জীবন পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। এবং এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই আমার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছে।*

২

শৈশবকাল

আমাদের সযত্নলালিত শৈশব কাল ঘটনাবৈচিত্র্যহীন। মনে আছে, এই সময় আমার দাদারা যে সকল বিষয় আলাপ করিতেন, তাহার অধিকাংশই আমি বুঝিতাম না। সময় সময় ভারতবাসীদের প্রতি ইংরাজ ও ইউরেশিয়ানদের উদ্ধত ও অপমান-সূচক ব্যবহারের বিষয় আলোচনা হইত এবং সিদ্ধান্ত হইত, প্রত্যেক ভারতবাসীরই কর্তব্য ইহা সহ্য না করিয়া প্রতিবাদ করা। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এই শ্রেণীর সংঘর্ষ অতি সচরাচর ঘটনা বলিয়া প্রায়ই আলোচনা হইত। যখনই কোন ইংরাজ ভারতবাসীকে হত্যা করিত, ইংরাজ জুরীর বিচারে সে অব্যাহতি পাইত। রেলের কামরা ইউরোপীয়ানদের জন্য স্বতন্ত্র করা ছিল। যত ভীড়ই হউক না কেন, ঐ কামরা একেবারে শূন্য থাকিলেও, কোন ভারতবাসীকে তথায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। ইয়োরোপীয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট নহে, এমন কোন কামরায় যদি দৈবাৎ কোন ইংরাজ যাত্রী থাকিতেন, তাহা হইলেও সেখানে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। সাধারণ ভ্রমণ-উদ্যান ও অন্যান্য স্থানেও শ্বেতাঙ্গদের জন্য চেয়ার বেঞ্চ নির্দিষ্ট থাকিত। বিদেশী শাসকগণের এই সকল দুর্ব্যবহারের কথায় আমি ক্রুদ্ধ হইতাম; কোন ভারতীয় ইহার প্রতিশোধ লইয়াছে, একথা শুনিলে আনন্দ হইত। মাঝে মাঝেই আমার দাদারা অথবা তাঁহাদের বন্ধুদের সহিত এই শ্রেণীর কলহ ঘটিত এবং তাহা লইয়া আমরা উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করিতাম। আমার এক দাদা খুব বলিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি ইচ্ছা করিয়া ইংরাজ এবং অধিকাংশ সময়ে ইউরেশিয়ানদের সহিত ঝগড়া বাধাইতেন। ইউরেশিয়ানরা শাসকজাতির সহিত স্বজাতিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য ইংরাজ শাসক ও বণিক অপেক্ষা অধিকতর রূঢ় অভদ্র ব্যবহার করিত। এই সকল কলহের অধিকাংশই রেল ভ্রমণকালে ঘটিত।

ইংরাজ শাসক ও তাহাদের ব্যবহারের জন্য আমার চিত্তে বিক্ষোভের সঞ্চার হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, ব্যক্তিবিশেষ ইংরাজের প্রতি আমার মনে কোন বিরূপভাব ছিল না। আমার ইংরাজ শিক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং মাঝে মাঝে পিতার ইংরাজ বন্ধুরা আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। মনে মনে আমি ইংরাজদিগকে শ্রদ্ধা করিতাম।

সন্ধ্যাবেলা পিতার বৈঠকখানায় বন্ধু সমাগম হইত। দিবসের কর্মক্লান্তির পর তাঁহারা বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। পিতার উচ্চহাস্যে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত।

---

* এলাহাবাদে ইংরেজী ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর ১৯৪৬ সম্বতের বদি মার্গশীর্ষ ৭ই তারিখে আমার জন্ম হয়।

তাঁহার প্রাণখোলা হাসি এলাহাবাদের সকলেই জানিত। আমি মাঝে মাঝে তাঁহাদের পর্দার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতাম এবং এই সকল বড় বড় লোকেরা কি কথাবার্তা বলেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। কখন ধরা পড়িলে, কেহ আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেন। সলজ্জ ভীরুতার সহিত কিয়ৎকাল পিতার ক্রোড়ে বসিয়া চলিয়া আসিতাম। একদিন দেখি, পিতা ক্লারেট বা ঐ জাতীয় এক প্রকার রক্তবর্ণ মদ্যপান করিতেছেন। হুইস্কীর নাম আমি জানিতাম, কেননা প্রায়ই পিতা বন্ধুগণের সহিত হুইস্কী পান করিতেন। কিন্তু লোহিত বর্ণের তরল পানীয় দেখিয়া আমি ভয় পাইলাম এবং দৌড়াইয়া গিয়া মাকে বলিলাম, বাবা রক্তপান করিতেছেন।

আমি অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলাম। আমার দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন শক্তি সাহস ও প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধির প্রতীক। অন্যান্য যাঁহাদের দেখিতাম, তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করিতাম। ভাবিতাম, আমি বড় হইলে বাবার মত হইব। ভক্তি ভালবাসা থাকিলেও আমি বাবাকে ভয় করিতাম। যখন তিনি চাকর বাকর বা অন্য কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন, তখন তাঁহাকে আমার ভয়ঙ্কর মনে হইত। তাঁহার ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখিয়া আমি ভয়ে কাঁপিতাম। চাকরের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে মনে মনে রাগও হইত। পিতার মত আশ্চর্য মেজাজ আমি কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি অতিমাত্রায় রঙ্গপ্রিয় ছিলেন এবং নিজেকে সম্বরণ করিবার মত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিও তাঁহার ছিল। প্রায়ই তিনি আত্মসম্বরণ করিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজেকে সংযত করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরে তিনি ধৈর্য হারাইয়া পূর্বের মত রূঢ়তা কদাচিৎ দেখাইতেন।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, একবার পিতা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। আমি তখন পাঁচ কি ছয় বৎসরের। একদিন দেখি, পিতার অফিসঘরের টেবিলের উপর দুইটি ফাউণ্টেন পেন রহিয়াছে। দেখিয়া লোভ হইল। মনে মনে ভাবিলাম, বাবার তো একসঙ্গে দুইটা কলমের দরকার নাই; কাজেই একটি আমি তুলিয়া লইলাম। পরে দেখি, বাড়ীময় হারান কলম খুঁজিবার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে,—আমি ভয় পাইলাম, কিন্তু কিছু বলিলাম না। কলমটি পাওয়া গেল এবং আমি যে অপরাধী তাহাও জানিতে কাহারও বাকী রহিল না। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে ভীষণ প্রহার করিলেন। বেদনায় ক্ষোভে অপমানে অধীর হইয়া আমি মার নিকট ছুটিয়া গেলাম। আমার শরীরের বেদনা-স্থানগুলিতে কয়েকদিন ক্রীম প্রভৃতি মালিশ করিতে হইয়াছিল।

এই শাসনের জন্য পিতার প্রতি আমার মন মোটেই বিরক্ত হয় নাই। আমার মনে হয়, তখন আমি ভাবিতাম, প্রহারের মাত্রা একটু বেশী হইলেও শাস্তি ঠিকই হইয়াছে। আমার শ্রদ্ধাভক্তি চিরদিন প্রবল থাকিলেও তাহা ভয়মিশ্রিত ছিল। কিন্তু মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল অন্যরূপ। মাকে আমি মোটেই ভয় করিতাম না। কেননা, আমি জানিতাম, আমি যাহা করিব তিনি তাহাতে সায় দিবেন। আমার প্রতি তাঁহার নির্বিচার স্নেহের আতিশয্যের সুযোগ লইয়া আমিও যথেষ্ট আবদার করিতাম। বাবা অপেক্ষা মাকেই আমি বেশী চিনিতাম; মার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশী। যে কথা আমি বাবাকে বলিতে পারিতাম না, তাহা অনায়াসে মাকে বলিতাম। মা ছোটখাট ছিলেন এবং ফিটফাট থাকিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই লম্বায় আমি মার প্রায় সমান হইয়া উঠিলাম। এবং তাঁহাকে আমার সমকক্ষ বলিয়াই মনে করিতাম। মায়ের রূপলাবণ্য, তাঁহার বালিকাসুলভ ছোট ছোট হাত পা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতাম। আমার মাতামহকুল কাশ্মীর হইতে অপেক্ষাকৃত নবাগত, মাত্র দুই পুরুষ পূর্বে তাঁহারা জন্মভূমি হইতে আসিয়াছিলেন।

বাল্যকালে মনের কথা বলিবার আর একজন সঙ্গী ছিলেন। তিনি বাবার মুন্সী; মুন্সী মোবারক আলী। তিনি বদায়ুনের এক ধনী পরিবারের বংশধর। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহে এই পরিবারের সর্বনাশ হয়। ইংরাজ সিপাহিরা এই পরিবারের অনেককেই সমূলে উৎসন্ন করিয়াছিল। সেই দুঃখস্মৃতি তাঁহাকে ধীর গম্ভীর এবং সকলের প্রতি সদয় করিয়াছিল। বিশেষতঃ ছেলেপিলে তিনি বড় ভালবাসিতেন। যখনই আমি অসুখী হইতাম অথবা বিপদে পড়িতাম, তখনই তাঁহার নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটিয়া যাইতাম। তাঁহার সুন্দর পক্ক শ্মশ্রু দেখিয়া আমি মনে করিতাম, তিনি অতি প্রাচীন কালের লোক। তিনি অনেক প্রাচীন কাহিনী জানিতেন। আমি গল্প বলিবার জন্য আবদার করিতাম। তিনি আরব্য উপন্যাস অথবা অন্যান্য কাহিনী, কিম্বা ১৮৫৭-৫৮র ঘটনা বলিতেন। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপলক নেত্রে সেই সকল আশ্চর্য গল্প শুনিতাম। আমি যথেষ্ট বড় হইবার পর "মুন্সীজীর" মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি বহুমূল্য সম্পদের মত এখনও আমার মনে উজ্জ্বল রহিয়াছে।

অন্তঃপুরে মা ও জেঠিমাদের নিকট আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব উপাখ্যান শুনিতাম। নন্দলাল নেহরুর পত্নী, আমার জেঠিমা প্রাচীন পুরাণ ও গল্পের ভাণ্ডার ছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়া শুনিয়া আমি ভারতীয় পুরাণশাস্ত্র এবং উপকথায় অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম।

ধর্ম সম্বন্ধে আমার ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। আমি উহা স্ত্রীলোকের ব্যাপার বলিয়া মনে করিতাম। বাবা এবং আমার জেঠাতো ভাইরা ইহা লইয়া ঠাট্টা তামাসা করিতেন এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতেন।

বাড়ীর মেয়েরা পাল-পার্বণে ব্রত-পূজাদির অনুষ্ঠান করিতেন। যদিও ঐগুলি আমার ভাল লাগিত তথাপি বয়স্কদের অনুকরণ করিয়া ঐগুলির প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিতাম। প্রায়ই মা ও জেঠিমাদের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইতাম। তাঁহাদের সহিত এলাহাবাদ ও বারাণসীতে মন্দিরে দেবদর্শনও করিতাম। বিখ্যাত সাধু সন্ন্যাসীর দর্শনেও আমি তাঁহাদের সঙ্গী হইতাম। কিন্তু এই সকল ঘটনা আমার চিত্তে বিশেষ রেখাপাত করে নাই।

ইহা ছাড়া বড় বড় উৎসবে আমোদ হইত। হোলীর দিনে সমগ্র নগরী উৎসব কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিত, আমরা রং ও আবীর ছিটাইয়া আনন্দ করিতাম। দেওয়ালী রাত্রে গৃহে গৃহে সহস্র সহস্র স্তিমিত-ভাতি মৃৎপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিত। জন্মাষ্টমীতে কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষ্যে মধ্যরাত্রে বিশেষ পূজার আয়োজন হইত (আমাদের পক্ষে ততক্ষণ জাগিয়া থাকা কঠিন হইত)। দশহরা ও রামলীলায় শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয় প্রভৃতি প্রাচীন কাহিনীর জীবন্ত চিত্র মূক অভিনেতাগণ কর্তৃক অভিনীত হইত। বড় বড় মঞ্চের উপর সীতা রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি থাকিত। সেইগুলি লইয়া শোভাযাত্রা হইত। বিশাল জনতা তাহা দেখিবার জন্য সমবেত হইত। মহরমের দিন আমরা ছেলের দল রেশমী পোষাক পরিয়া সুদূর আরবের হাসান হোসেনের দুঃখস্মৃতিমণ্ডিত শোকযাত্রা দেখিতে যাইতাম। বৎসরে দুইবার ঈদের সময় মুন্সীজী উত্তম বসন পরিয়া জুম্মা-মসজিদে নামাজ পড়িতে যাইতেন। সেদিন তাঁহার বাড়ীতে আমরা বিবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করিতাম। ইহা ছাড়া হিন্দু-পঞ্জিকানুযায়ী রক্ষাবন্ধন, ভাইফোঁটা প্রভৃতি ছোটখাট উৎসব হইত।

আমাদের এবং অন্যান্য কাশ্মীর পরিবারে আরও কতকগুলি উৎসব হয়, যাহা এ অঞ্চলের হিন্দুরা পালন করেন না। তাহার মধ্যে প্রধান হইল, নওরোজ; সম্বৎ বৎসরের প্রথম দিবস। এই বিশেষ দিবসে আমরা নববস্ত্র পরিধান করিতাম, বাড়ীর

ছেলেপিলেরা ঐদিন কিছু কিছু পয়সাও পাইত।

কিন্তু সমস্ত উৎসবের মধ্যে, আমার জন্মদিনের বাৎসরিক অনুষ্ঠানটিই আমার সর্বাধিক প্রিয় ছিল, এই উৎসবের নায়ক আমি স্বয়ং। এই দিন আমার আনন্দ ও উৎসাহের অন্ত থাকিত না। অতি প্রত্যূষে এক বৃহৎ তুলাদণ্ডে গম ও অন্যান্য দ্রব্য দিয়া আমাকে ওজন করা হইত; ঐগুলি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরিত হইত। আমি উৎকৃষ্ট নব বসন ভূষণে সজ্জিত হইতাম এবং অনেক উপহার পাইতাম। অপরাহ্নে নিমন্ত্রণ-সভা হইত। আমার জন্যই এই উৎসব, এই গর্বে আমার বুক ভরিয়া উঠিত। কিন্তু আমার বড় দুঃখ হইত, জন্মদিন মাত্র বৎসরে একটি। যাহাতে ঘন ঘন আমার জন্মোৎসব হয়. সেজন্য আবদার করিতাম। তখন বুঝিতাম না যে এমন দিন আসিবে, যখন প্রত্যেকটি জন্মদিন বয়োবৃদ্ধির অপ্রীতিকর বার্তা স্মরণ করাইয়া দিবে।

আত্মীয়স্বজন বা কোন বন্ধুজনের বিবাহে আমরা সপরিবারে দূরবর্তী সহরে যাইতাম। এই ভ্রমণ বড় আনন্দের হইত। বিবাহোৎসবে ছেলেপিলেদের উপর শাসন শিথিল হইত। আমরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতাম। "সাদিখানা"য় (নিমন্ত্রিত কুটুম্বদের আবাসস্থল) বহু পরিবারকে একত্র ভীড় করিয়া থাকিতে হইত; কাজেই অনেক ছেলেমেয়ের জটলা হইত। এই শ্রেণীর ঘটনায় আমি আর নিঃসঙ্গতা বোধ করিতাম না। প্রাণ ভরিয়া খেলাধূলা ও উপদ্রব করিতাম, অশান্তপনার জন্য জ্যেষ্ঠরা কচিৎ ধমকও দিতেন।

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে আমাদের দেশে বিবাহব্যাপারে অপব্যয় ও অতিরিক্ত জাঁক-জমক হইয়া থাকে। ইহা নিন্দার্হ সন্দেহ নাই। অপব্যয় ছাড়াও এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান হয়, যাহা অত্যন্ত স্থূলরুচির পরিচায়ক। ইহার মধ্যে না আছে সৌন্দর্যবোধ, না আছে রুচির উৎকর্ষতা (ব্যতিক্রমও যে নাই তাহা নহে), কিন্তু ইহার জন্য প্রধান অপরাধী, মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোক। অবশ্য দরিদ্ররাও অপব্যয়ী. এমন কি ঋণ করিয়াও অপব্যয় করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সামাজিক প্রথা ও নিয়মের জন্যই জনসাধারণ দরিদ্র। ইহার চেয়ে অযৌক্তিক কথা আর কিছু নাই। ইঁহারা ভুলিয়া যান, দরিদ্রের জীবনযাত্রা বিরস ও বৈচিত্র্যহীন। কদাচিৎ একটি বিবাহোৎসবে সঙ্গীত ও ভোজের ধূমধাম হয়: ইহা তাহাদের অবিরত হৃদয়হীন শ্রমের মধ্যে দুদণ্ডের দুঃখ-বিস্মৃতি। প্রাত্যহিক জীবনের নিরানন্দ একঘেয়েমী হইতে একটু আনন্দের অবকাশ। যাহাদের জীবনে হাসিবার অবসর অতি অল্পই মিলে, কে এমন নিষ্ঠুর যে তাহাদিগকে এই সামান্য আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিবে? অপব্যয় নিবারণ কর, বৃথা জাঁকজমক কমাইয়া দাও (দরিদ্রের অভাব-অনটন-পূর্ণ ক্ষুদ্র আয়োজন সম্বন্ধে ঐ সকল বড় বড় শব্দ প্রয়োগ করা নির্বুদ্ধিতামাত্র), কিন্তু তাহাদের জীবনকে অধিকতর নীরস ও আনন্দহীন করিও না।

মধ্যশ্রেণীর স্বপক্ষেও বলিবার আছে। অপচয় অপব্যয় ছাড়িয়া দিলেও এই সকল বিবাহ বৃহৎ সামাজিক সম্মেলন। এখানে বহু দিবসের ব্যবধানে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ও পুরাতন বন্ধুদের মিলন হয়। এরূপ সকলের একত্রে মিলন অন্যত্র সহজ নহে। এই জন্যই বিবাহে মিলনোৎসব এত জনপ্রিয়। সামাজিক সম্মেলন হিসাবে আধুনিক রাজনৈতিক সম্মেলন, কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স অবশ্য কোন কোন দিক দিয়া বিবাহের মিলনোৎসবকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

ভারতে বিশেষতঃ উত্তর ভারতে অন্যান্য অপেক্ষা কাশ্মীরীদের একটি বিশেষ সুবিধা আছে। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পর্দাপ্রথা মানেন না। ভারতের সমতল ক্ষেত্রে যাঁহারা অ-কাশ্মীরী অথবা অন্যান্যের সঙ্গে ব্যবহারকালে তাঁহাদিগকে অংশতঃ পর্দাপ্রথা গ্রহণ করিতে হইয়াছে. কেননা যে অঞ্চলে আসিয়া অধিকাংশ কাশ্মীরী

বাস করিতেছিলেন, সেখানে পর্দাপ্রথা সামাজিক মর্যাদা ও আভিজাত্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু নিজেদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে অবাধ মেলামেশার কোন বাধাই ছিল না। যে কোন কাশ্মীরী অপর কাশ্মীরীর অন্তঃপুরে গিয়া পুরমহিলাদের সহিত শিষ্টালাপ ইত্যাদি করিতে পারেন। ভোজসভায় বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে স্ত্রীপুরুষ একত্রে আহারাদি করেন। কেবল মেয়েদের বসিবার আসন স্বতন্ত্র থাকে। বালক বালিকাদের মধ্যে সে রকম পার্থক্য করা হয় না। তবে আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝায় ইহা তাহা নহে।

এমনি ভাবেই আমার বাল্যজীবন কাটিয়াছে। আমাদের বৃহৎ পরিবারে মাঝে মাঝে পারিবারিক কলহ হইত। যখন এই শ্রেণীর কলহে বাড়াবাড়ি হইত, তখন তাহা পিতার কানে উঠিত। তিনি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া ভাবিতেন, স্ত্রীলোকদের নির্বুদ্ধিতার জন্যই এরূপ ঘটিয়া থাকে। আসলে কি ঘটিয়াছে আমি কিছুই বুঝিতাম না। ভাবিতাম, নিশ্চয়ই এমন কিছু অন্যায় ঘটিয়াছে, যাহার জন্য পরস্পরের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ অথবা কথাবার্তা বন্ধ হইয়াছে। আমি ইহাতে অত্যন্ত অসুখী বোধ করিতাম। কিন্তু যখন পিতা হস্তক্ষেপ করিতেন তখন সব ঠিক হইয়া যাইত।

এক সময়ের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা স্মরণ আছে। তখন আমার বয়স সাত কি আট বৎসর। এলাহাবাদের অশ্বারোহী সৈন্যদলের একজন সোয়ারের সহিত আমি প্রত্যহ অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে যাইতাম। আমার একটি আরবী টাট্টুঘোড়া ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলাম। ঘোড়া দৌড়াইয়া সোজা বাড়ীতে উপস্থিত—তাহার পৃষ্ঠে আমি নাই। পিতা তখন বন্ধুদের লইয়া টেনিস খেলিতেছিলেন। শূন্য ঘোড়া দেখিয়া একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। পিতা সদলবলে বিভিন্ন যানবাহনে একটা ছোটখাট শোভাযাত্রা করিয়া আমাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। পথেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল; আমি যেন যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিতেছি, এমন ভাবে তাঁহারা আমাকে সমাদর করিলেন।

৩

থিয়োজফি

আমার দশ বৎসর বয়সে, আমরা আমাদের নূতন ও বৃহৎ বাড়ীতে উঠিয়া আসিলাম। বাবা এই বাড়ীর নাম রাখিলেন, "আনন্দভবন"। এই বাড়ীতে বৃহৎ উদ্যান এবং সাঁতার কাটিবার একটি জলাশয় ছিল। নূতন বাড়ীতে আসিয়া আমার কি আনন্দ! তখনও নূতন বাড়ী তৈয়ার চলিতেছিল, চারিদিকে খননকার্য ও নির্মাণকার্যের কলরব। রাজমজুরদের কাজকর্ম দেখিতে আমার বড় ভাল লাগিত।

সাঁতার দিবার জলাশয়টি বেশ বড় রকমের। অল্পদিনের মধ্যেই আমি সাঁতার শিখিলাম এবং জলে ডুবিয়া ভাসিয়া বড় আমোদ পাইতাম। গ্রীষ্মকালে দীর্ঘ দিবসে যখন তখন দিনে কয়েকবার করিয়া স্নান করিতাম। অপরাহ্নে বাবার বন্ধুরা স্নান করিতে আসিতেন। জলাশয়ের উপর এবং আমাদের বাড়ীতে বিজলি বাতি জ্বলিত। তখনকার এলাহাবাদে এ এক নূতন ব্যাপার। এই স্নানার্থীদের দলে মিশিয়া স্নান করা, যাহারা সাঁতার জানিতেন না তাঁহাদের অতর্কিতে টানিয়া অথবা ধাক্কা দিয়া ভয় দেখান, একটা উপভোগ্য ব্যাপার ছিল। আমার বিশেষভাবে মনে আছে, তখন ডাঃ তেজবাহাদুর সপ্রু এলাহাবাদের নূতন উকীল। তিনি সাঁতার

জানিতেন না, শিখিবার কোন ইচ্ছাও ছিল না। তিনি প্রথম সোপানের আধহাত জলে বসিতেন, কিছুতেই দ্বিতীয় সোপান পর্যন্ত নামিতে চাহিতেন না, কেহ টানাটানি করিলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেন। পিতাও সাঁতার জানিতেন না। তবে তিনি দাঁতে দাঁত চাপিয়া অতি কষ্টে কোমরজল পর্যন্ত যাইতেন।

এই সময় বুয়োর যুদ্ধ চলিতেছিল। আমি আগ্রহ সহকারে যুদ্ধের বিষয় শুনিতাম এবং আমার সহানুভূতি ছিল বুয়োরদের দিকে। যুদ্ধের সংবাদ জানিবার আগ্রহে এই সময় আমি সংবাদপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করি।

এই সময় আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জন্ম আমার নিকট একটা নূতন আকর্ষণের বিষয় হইল। সকলেরই ভাই বোন আছে আমার নাই, এই ক্ষোভ আমার মনকে পীড়া দিত। একটি ছোট্ট ভাই কিম্বা ভগ্নীর আগমন সম্ভাবনায় আমার মনের ভার লঘু হইয়া গেল। পিতা তখন ইয়োরোপে। আমার মনে আছে সংবাদের জন্য অধীরভাবে বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় ডাক্তারদের মধ্যে একজন বাহির হইয়া বলিলেন, হয়তো ঠাট্টা করিয়াই বলিলেন, তোমার পক্ষে আনন্দের সংবাদ, পিতার বিষয়ে ভাগ বসাইবার জন্য পুত্র সন্তান হয় নাই। এমন নীচ স্বার্থপরতা আমি অন্তরে পোষণ করি, এমন কথা কেহ কল্পনা করিতে পারে, এই কথা ভাবিয়া আমার মন তিক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

পিতার বিলাতযাত্রা লইয়া ভারতের কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ-সমাজে তুমুল কোলাহল উঠিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া পিতা প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকার করিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি এবং কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিষণ নারায়ণ দার আইন পড়িবার জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্ত করা সত্ত্বেও সমাজের গোঁড়ারা তাঁহার সহিত সামাজিক ব্যবহার করেন নাই, তাঁহাকে 'একঘরে' করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ সমাজ কম বেশী দুই ভাগে বিভক্ত হয়, পরে অনেক শিক্ষার্থী কাশ্মীরী যুবক ইয়োরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সংস্কারক-দলে যোগ দিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠান একটা প্রহসন মাত্র, ইহার সহিত ধর্মের কোন সম্বন্ধ ছিল না। ইহা সমাজের সমষ্টির অভিপ্রায়ের বাহ্য আনুগত্য স্বীকার মাত্র। প্রায়শ্চিত্তের পর প্রত্যেকেই কোন বাঁধাবাঁধি মানিতেন না, স্বচ্ছন্দে অ-ব্রাহ্মণ এবং অ-হিন্দুদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া খাদ্য পানীয় গ্রহণ করিতেন।

পিতা তাহাও করিলেন না। লোক-দেখান তথাকথিত শুদ্ধি প্রায়শ্চিত্ত করিতে তিনি একেবারেই অস্বীকার করিলেন। পিতার এই অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব লইয়া তুমুল আলোচনা চলিল এবং অবশেষে একদল কাশ্মীরী পিতার পক্ষ অবলম্বন করায় তৃতীয় দল গঠিত হইল। অবশ্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুরাতন বাঁধাবাঁধি শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তিনদল পরস্পরের সহিত মিশিয়া গেল। বহু কাশ্মীরী ছাত্র-ছাত্রী ইয়োরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করিয়া ফিরিয়াছেন, প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নও কাহারও মনে উদিত হয় নাই। মুষ্টিমেয় গোঁড়া বিশেষভাবে প্রাচীনা মহিলাগণ ব্যতীত খাওয়া দাওয়ার বাঁধাবাঁধি নাই বলিলেই হয়। অ-কাশ্মীরী, মুসলমান, অ-ভারতীয় সকলের সহিতই একত্র ভোজন সচরাচর চলিয়া থাকে। কাশ্মীরী মহিলারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সম্মুখেও পর্দাপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছেন। ১৯৩০-এর রাজনৈতিক আলোড়নে পর্দাপ্রথা নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়াছে। অসবর্ণ বিবাহ জনপ্রিয় না হইলেও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। আমার দুই ভগ্নীর বিবাহ অ-কাশ্মীরীর সহিতই হইয়াছে এবং আমাদের পরিবারের একজন যুবক একটি হাঙ্গেরীয় তরুণীকে বিবাহ করিয়াছেন। সম্প্রদায় হিসাবে এই কিশোর

দেশে আমাদের সংখ্যা অতি কম। ধর্মের বাধা অপেক্ষা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য রক্ষার আগ্রহই অসবর্ণ বিবাহের বাধা। কাশ্মীরীরা অনেকে তাঁহাদের আকৃতির আর্যসুলভ বৈশিষ্ট্য রক্ষার পক্ষপাতী। ভারতীয় ও অভারতীয় মানব-সমুদ্রে মিশিয়া যাইবার ভয়ে তাঁহারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্বদাই সচেতন।

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের মধ্যে, প্রায় শতবর্ষ পূর্বে সম্ভবতঃ মির্জা মোহনলাল কাশ্মীরীই (নিজের দত্ত উপাধি) প্রথম পাশ্চাত্য দেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লী মিশন কলেজের ছাত্র। যৌবনে তিনি বুদ্ধিমান ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। পার্শী-দোভাষী রূপে তিনি ব্রিটিশ মিশনের সহিত কাবুলে যান। তিনি মধ্য এশিয়া ও পারস্যের বহু স্থল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন, যোগাড়যন্ত্র করিয়া একটি বিবাহ করিতেন। সাধারণতঃ অভিজাত পরিবারের কন্যাই তিনি বিবাহ করিতেন। অবশেষে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া পারস্য রাজপরিবারের এক যুবতীকে বিবাহ করেন। এই জন্যই তাঁহার উপাধি 'মির্জা'। তিনি ইয়োরোপেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণকাহিনী মনোরম ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।

এগার বৎসর বয়সের সময় ফার্ডিনান্দ টি ব্রুক্স আমার নূতন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার পিতা আইরিশ, মাতা ফরাসী কি বেলজিয়ান্ ছিলেন। ইনি একজন উৎসাহী থিয়োজফিস্ট এবং মিসেস্ অ্যানি বেশান্ত ইঁহার জন্য পিতার নিকট সুপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় তিন বৎসর ছিলেন এবং নানাদিক দিয়া আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময় হিন্দী সংস্কৃত পড়াইবার জন্য একজন স্নেহশীল বৃদ্ধ পণ্ডিতও আমার শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের চেষ্টায় তিনি আমাকে অতি সামান্য সংস্কৃতও শিখাইতে সক্ষম হইলেন না। পরবর্তী কালে হ্যারোতে যতটুকু ল্যাটিন ভাষা পড়িয়াছিলাম, আমার সংস্কৃত বিদ্যা তাহার অধিক নহে। দোষ অবশ্য আমারই। নূতন ভাষা শিখিবার নিপুণতা আমার নাই, আর ব্যাকরণে কিছুতেই আমার মন বসিত না।

এফ্ টি ব্রুক্স্ আমার মনে পাঠস্পৃহা জাগাইয়া তুলিলেন। এই কালে অনিয়মিতভাবে বহু ইংরাজী বই আমি পড়িয়াছি। শিশু সাহিত্যে আমার বেশ দখল ছিল। 'দি জাঙ্গল বুক' 'কিম' এবং লুইস ক্যারোলের বইগুলি আমার বড় প্রিয় ছিল। গুস্তাব ডোরের সচিত্র "ডন কুইক্সট" পড়িয়া আমি মুগ্ধ হইতাম। ফ্রিডিয়ফ ন্যানসানের "ফারদেস্ট নর্থ" এক অজ্ঞাত রহস্যময় দেশে ভ্রমণস্পৃহা আমার চিত্তে বলবতী করিয়া তুলিল। স্কট, ডিকেন্স্, থ্যাকারে, এইচ জি ওয়েলসের উপন্যাস, মার্ক টোয়েন এবং শার্লক হোমসের গল্প অনেক পড়িয়াছি। "প্রিজ্নার অফ্ জেন্দা" পড়িয়া আমি রোমাঞ্চিত হইতাম। জেরোম কে জেরোমের "থ্রি মেন ইন এ বোট" আমার নিকট তখন সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গরসের পুস্তক ছিল। আর একখানা বই-এর কথা মনে আছে, দ্যু মোরিয়ারের "ট্রিল্‌বি", এবং "পিটার ইবেটসন"। এই সময় কবিতার প্রতিও অনুরাগ হয়। বহু বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্যেও অদ্যাবধি এই অনুরাগ আমি হারাই নাই।

ব্রুক্স আমার বিজ্ঞান শিক্ষারও প্রথম পথপ্রদর্শক। আমার একটি ছোট্ট 'লেবরেটরি' করিয়াছিলাম। সেইখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের অনেক প্রাথমিক পরীক্ষাকার্যে রত থাকিতাম।

সাধারণ লেখাপড়া ছাড়াও ব্রুক্সের প্রভাবে আমি থিয়োজফির প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। কিছুকাল এই আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁহার কক্ষে থিয়োজফিস্ট-দের সাপ্তাহিক বৈঠকে আমিও উপস্থিত থাকিতাম এবং ক্রমে থিয়োজফির

কতকগ্লি বাঁধাব্লি এবং ভাব আয়ত্ত করিলাম। সেখানে দার্শনিক আলোচনা, প্নর্জন্ম, স্ক্ষ্মদেহ, অশরীরী প্রাণী, আত্মার স্ক্ষ্মজ্যোতিঃ প্রভৃতি আলোচনা হইত। প্রসঙ্গতঃ মাদাম ব্লাভস্কী ও অন্যান্য থিয়োজফিস্টদের বড় বড় বই-এর কথা তো উঠিতই, তাহা ছাড়া হিন্দ্শাস্ত্র, বৌদ্ধদের 'ধর্মপদ' 'পিথাগোরাস' টায়নার টানার এপোলিয়নস ও অন্যান্য দার্শনিক ও মহাত্মার বিষয় আলোচনা হইত। আমি অতি অল্পই ব্ঝিতাম, কিন্তু অতীন্দ্রিয় রহস্যের মোহে ম্গ্ধ হইয়া ভাবিতাম, স্ষ্টির সমস্ত রহস্য এই উপায়েই জানা যাইবে। জীবনে এই প্রথম আমি ধর্ম ও পরলোক সম্বন্ধে সচেতনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। বিশেষভাবে হিন্দ্ধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। আচার অন্ষ্ঠানের জন্য নহে—মহান উপনিষদ ও ভগবদ্গীতার জন্য। অবশ্য আমি উহা ব্ঝিতে পারিতাম না, তথাপি উহা অপ্র্ব বলিয়া মনে হইত। আমি স্বপ্নে জ্যোতির্ময় দেহধারীদের দেখিতাম, নিজেও দ্র দ্রান্তরে উড়িতাম। আকাশে উড়িবার (কোন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত) স্বপ্ন আমি আজীবন প্রায়ই দেখিয়া থাকি। মাঝে মাঝে এই স্বপ্ন এত স্স্পষ্ট ও বাস্তব বলিয়া মনে হয় যে, আমি নিম্নে ধরণীর বিশাল বিস্তারে প্রত্যেকটি বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পাই। আমি জানি না আধ্নিককালের ফ্রয়েড ও অন্যান্য স্বপ্ন-ব্যাখ্যাতারা ইহার কি ব্যাখ্যা করিবেন।

এই সময় মিসেস অ্যানি বেশান্ত এলাহাবাদে আসিয়া থিয়োজফি সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বাগ্মিতায় আমার অন্তর গভীর ভাবে আলোড়িত হইত, আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত গ্হে ফিরিতাম। আমি থিয়োজফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদানের সংকল্প করিলাম। তখন আমার বয়স মাত্র তের বৎসর। যখন পিতার অন্মতি প্রার্থনা করিলাম, তিনি হাসিয়া সম্মতি দিলেন। মনে হইল, ব্যাপারটিকে তিনি মোটেই গ্র্তর বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহার তুচ্ছতাচ্ছিল্যে আমি একট্ ব্যথিত হইলাম। আমার পক্ষে তিনি অনেকদিক দিয়া মহান হইলেও আমি তাঁহার আধ্যাত্মিক অন্রাগের অভাব দেখিয়া দ্ঃখিত হইলাম। কিন্তু কার্যতঃ তিনি একজন প্রাতন থিয়োজফিস্ট এবং যখন মাদাম ব্লাভাস্কি ভারতে আসিয়াছিলেন তখনই তিনি উক্ত সমিতিতে যোগদান করেন। ধর্মান্রাগ অপেক্ষা কৌত্হলবশেই তিনি উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং অল্পদিনেই থিয়োজফির সংস্রব ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য বন্ধ্রা যাঁহারা তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা উহার সহিত যুক্ত থাকিয়া সমিতির উপদেশক-মণ্ডলীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

তের বৎসর বয়সে আমি থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হইলাম। স্বয়ং মিসেস বেশান্ত আমাকে দীক্ষা দিলেন। তিনি কতকগ্লি ভাল ভাল উপদেশ দিলেন এবং কয়েকটি রহস্যময় ম্দ্রা শিখাইয়া দিলেন। আমি এক অপ্র্ব ভাবাবেগ অন্ভব করিলাম। আমি কাশীতে থিয়োজফি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলাম এবং শ্মশ্রল-বদন কর্ণেল অলকটকে দেখিয়াছিলাম। ত্রিশ বৎসর পর, বাল্যকাল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা কঠিন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, থিয়োজফিতে অন্প্রাণিত হইয়া আমার চোখে ম্খে একটা নিরীহ ও নিস্তেজ ভাব দেখা দিল। ধার্মিকদের মধ্যে থিয়োজফিস্ট নরনারীদের মধ্যে ইহা সচরাচর দেখা যায়। আমি একজন বিশিষ্ট ধর্মসাধক, এই ধারণায় সর্বদা ভগমগ থাকিতাম। আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সমবয়সী ছেলেমেয়েরা আমার সহিত মিশিতে চাহিত না।

ইহার কিছ্দিন পরেই এফ টি ব্রুকস্ আমাকে ছাড়িয়া গেলেন, থিয়োজফির সহিত আমার সম্পর্কও ফ্রাইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে (ইংলণ্ডে স্কুলে যোগ

দেওয়ার জন্যও বটে) আমার জীবন হইতে থিয়োজফির ছাপ একেবারেই মুছিয়া গেল। তথাপি এই কয় বৎসরে আমি ব্রুকসের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট ছিলাম এবং তাঁহার ও থিয়োজফির নিকট আমি ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি সঙ্কোচের সহিত বলিব, পরে থিয়োজফিস্টদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমিয়া গেল। আমি দেখিলাম, তাঁহারা অতি সাধারণ নরনারী মাত্র, কোন মহৎ আদর্শ সাধনের জন্য চিহ্নিত নহেন। তাঁহারাও বিপদের পরিবর্তে আরাম চাহেন; আত্মোৎসর্গকারীর বিঘ্নবহুল জীবন অপেক্ষা নিরাপদ জীবনই তাঁহাদের কাম্য। কিন্তু মিসেস বেশান্তের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল।

ইহার পরেই রুশ-জাপান যুদ্ধ আমার জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা. জাপানের জয় লাভে আমি উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। প্রত্যহ আগ্রহ সহকারে নূতন সংবাদের জন্য সংবাদপত্রের অপেক্ষা করিতাম। আমি জাপান সম্বন্ধে কতকগুলি বই কিনিয়া আনিলাম, কিছু কিছু পড়িলামও। জাপানের ইতিহাসের গহনে পথ হারাইলেও প্রাচীন বীরত্বের কাহিনী এবং লাফ্‌কাদিওহার্ণের বর্ণনাভঙ্গী আমার ভাল লাগিত।

জাতীয়তার ভাবধারায় আমি অনুপ্রাণিত হইলাম। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ইয়োরোপের অধীনতা পাশ হইতে এশিয়ার মুক্তি লইয়া জল্পনা কল্পনা করিতাম। তরবারী হস্তে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছি, এই কল্পনা করিয়া আমি দুঃসাহসিক বীরত্বের স্বপ্ন দেখিতাম।

আমি চতুর্দশবর্ষে উত্তীর্ণ হইলাম। আমাদের পারিবারিক জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। আমার বড় ভাইরা উপার্জনক্ষম হইয়া পৃথক বাটী নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নূতন চিন্তা, নানা অস্পষ্ট কামনা আমার মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এবং মেয়েদের প্রতি আমি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তখনও আমি মেয়ে অপেক্ষা ছেলেদের সহিত খেলাধূলাই ভালবাসিতাম; মেয়েদের দলে মেশা আত্মমর্যাদার দিক দিয়া অনুচিত মনে করিতাম। কিন্তু কাশ্মীরী নিমন্ত্রণ সভায় বা অন্যত্র যেখানে সুন্দরী বালিকার অসম্ভাব হইত না, সেখানে একটি দৃষ্টি বা একটু স্পর্শে আমার চিত্ত পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিত।

১৯০৫ সালের মে মাসে পনর বৎসর বয়সে আমি, পিতামাতা ও আমার শিশু ভগ্নীসহ ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম।

৪

হ্যারো ও কেম্ব্রিজ

মে মাসের শেষভাগে একদিন আমরা লণ্ডনে পৌঁছিলাম। ডোভার হইতে আসিবার সময় ট্রেনে, সুসিমার জলযুদ্ধে জাপানের জয়লাভের কাহিনী পাঠ করিলাম। আমার মন অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। পরদিন আমরা ডার্বির ঘোড়দৌড় দেখিয়া আসিলাম। লণ্ডনে আসিবার কয়েকদিন পরই ডাঃ এম এ আনসারীর সহিত দেখা হইল। তখন তিনি যুবক, বেশ ফিটফাট ও বুদ্ধিমান। কৃতিত্বের সহিত কয়েকটি পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি তখন লণ্ডনে এক হাসপাতালে "হাউস সার্জনের" কার্য করিতেছিলেন।

আমার সৌভাগ্য, হ্যারো-স্কুলে একটি জায়গা খালি ছিল বলিয়া ভর্তি হইতে পারিলাম। কেমনা, আমার বয়স তখন পনর, স্কুলের নিয়মানুসারে ভর্তি হইবার

নির্দিষ্ট বয়স অপেক্ষা একটু বেশী। বাবা অন্যান্য সকলকে লইয়া ইয়োরোপ ভ্রমণে চলিয়া গেলেন এবং কয়েক মাস পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

জীবনে কখনও একাকী এমন অপরিচিতদের মধ্যে বাস করি নাই। নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হইতে লাগিল, বাড়ীর কথা বেশী করিয়া মনে পড়িল। কিন্তু এ ভাব বেশী দিন রহিল না। বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রা, পড়াশুনা ও ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইলাম। কিন্তু তবু ঠিক যেন মিলিল না। সর্বদাই মনে হইত, আমি ইহাদের মত নহি; তাহারাও আমার সম্বন্ধে হয়তো তাহাই মনে করিত। কাজেই আমাকে অনেকটা একা থাকিতে হইত। কিন্তু মোটামুটি আমি উৎসাহের সহিত খেলাধুলায় যোগ দিতাম। যদিও বিশেষ কোন ক্রীড়ানৈপুণ্য আমার ছিল না, তথাপি সকলে বুঝিত, আমি সহজে হটিবার পাত্র নহি।

ভাল লাটিন জানিতাম না বলিয়া আমাকে প্রথমে নিম্নশ্রেণীতে যোগ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আমি উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম। সম্ভবতঃ অনেক বিষয়ে, বিশেষতঃ সাধারণ জ্ঞানে, আমার বয়সের তুলনায় আমি অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমার জ্ঞানান্বেষণের পরিধি ছিল অধিকতর বিস্তীর্ণ এবং আমি অন্যান্য সহপাঠিগণ অপেক্ষা অধিক পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করিতাম। পিতার নিকট পত্রে আমি লিখিতাম, অধিকাংশ ইংরাজ বালকই এত অজ্ঞ যে, খেলাধুলা ছাড়া অন্য বিষয়ে আলাপ করিতে জানে না। ইহার ব্যতিক্রমও অবশ্য ছিল, উপরের শ্রেণীতে উঠিয়া তাহা বুঝিয়াছিলাম।

আমার যতদূর স্মরণ হয় ১৯০৫-এর শেষ ভাগে ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন ব্যাপারে আমি কৌতূহলী হইলাম : সেবার উদারনৈতিক দলের জয় হল। ১৯০৬-এর প্রারম্ভে একদিন শিক্ষক মহাশয় নূতন গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, ছাত্রদের মধ্যে কেবলমাত্র আমিই ঐ বিষয়ে খুঁটিনাটি সংবাদ রাখি। আমি তাঁহাকে ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান মন্ত্রীসভার প্রত্যেকের নাম বলিয়াছিলাম।

রাজনীতি ছাড়া আর একটি বিষয়ে আমি আকৃষ্ট হইলাম। সে হইল বিমান বিদ্যার ক্রমোন্নতি। তখনকার দিনে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এবং সান্তোস দুমোঁ (পরে ফ্যারমান, ল্যাথাম ব্লেরিয়া) খ্যাতিমান হইয়াছেন। উৎসাহের আতিশয্যে হ্যারো হইতে পিতার নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলাম যে শীঘ্রই আমি প্রতি সপ্তাহের শেষে বিমানযোগে ভারতে ঘুরিয়া আসিতে পারিব।

আমার সময় হ্যারোতে ৪।৫ জন ভারতীয় ছাত্র ছিল। তাহারা অন্য ছাত্রাবাসে থাকিত, তাহাদের সহিত কদাচিৎ দেখা হইত। আমাদের বাড়ীতে (প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের) বরোদার গাইকোয়াড়ের এক পুত্র ছিলেন। তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। ভাল ক্রিকেট খেলিতে পারিতেন বলিয়া তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। আমি আসিবার অল্পকালের মধ্যেই তিনি চলিয়া যান। তারপর আসিল কাপুরথালার মহারাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরমজিৎ সিংহ (বর্তমান যুবরাজ)। বেচারা যেন জলের মাছ ডাঙ্গায় পড়িয়াছে, সর্বদাই সে অসন্তুষ্ট, ছেলেদের সহিত মোটেই মেলামেশা করিতে পারিত না। ছেলেরাও তাহার পিছনে লাগিত এবং তাহার ভাবভঙ্গীর অনুসরণ করিয়া ভেঙ্গাচাইত। সে ক্ষেপিয়া গিয়া ধৈর্য হারাইত এবং বলিত তাহাদিগকে একবার কাপুরথালায় পাইলে দেখিয়া লইবে। বলা বাহুল্য ইহাতে সে অব্যাহতি পাইত না। ইতিপূর্বে কিছুকাল সে ফ্রান্সে ছিল এবং ফরাসী ভাষা অনর্গল বলিতে পারিত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ইংলণ্ডে সাধারণ বিদ্যালয়-গুলিতে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা এমন বিচিত্র যে, ফরাসীভাষার ক্লাসে

এই বিদ্যা তাহার কোন কাজেই আসিত না।

একদিন এক কৌতুককর ঘটনা ঘটিল। মধ্যরাত্রে তত্ত্বাবধায়ক আসিয়া আমাদের প্রত্যেকের কক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিলেন। শুনিলাম, পরমজিৎ সিংহ তাহার সোনাবাঁধান সুন্দর বেতখানা হারাইয়াছে। কিন্তু তল্লাসীতেও পাওয়া গেল না। দুই তিন দিন পরে হ্যারো ও ইটনের মধ্যে লর্ড্‌স্‌-এর মাঠে ম্যাচ্‌-খেলা হয়; ইহার অব্যবহিত পরেই বেতখানা মালিকের কক্ষেই পাওয়া গেল। বোঝা গেল, কেহ লর্ডসের মাঠে একটু বাবুগিরি করিয়া ছড়িখানা ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে।

আমাদের আবাসে ও অন্যান্য ছাত্রাবাসে কয়েকজন ইহুদী ছাত্র ছিল। বাহিরে তাহারা মোটামুটি ভাল ব্যবহার পাইলেও—তলে তলে ইহুদী-বিদ্বেষ ছিল যথেষ্ট। ইহারা 'অভিশপ্ত ইহুদী', এই ভাব আমার মধ্যেও অজ্ঞাতসারে সংক্রামিত হইল,—এরূপ মনোভাব পোষণ করা দোষের কিছু নহে এইরূপ মনে করিলাম। কিন্তু কখনও আমি ইহুদীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি নাই এবং পরবর্তীকালে কয়েকজন ইহুদীকে আমি বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম।

এই নূতন জীবন আমার অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। হ্যারো আমার ভাল লাগিত, কিন্তু মনে হইতে লাগিল, এখানকার শিক্ষার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম। ১৯০৬-০৭ সালে ভারতের সংবাদে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইত। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত খবর বাহির হইত, কিন্তু তাহা হইতেই অনুমান করিতে পারিতাম বাঙ্গলা, পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে বড় বড ব্যাপার ঘটিতেছে। লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিংহের নির্বাসন, বাঙ্গলার তুমুল আলোড়ন, পুণায় তিলকের নাম,—স্বদেশী ও বয়কট; এই সকল সংবাদে আমার অন্তর বিচলিত হইত; কিন্তু হ্যারোতে এমন কেহ ছিল না, যাহার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলি। ছুটির দিনে আমার জ্ঞাতিভ্রাতা বা ভারতীয় বন্ধুদের সহিত দেখা হইলে মনের ভার লঘু করিবার সুযোগ পাইতাম।

স্কুলে জি এস ট্রিভিলিয়নের গ্যারিবল্ডী গ্রন্থাবলীর একখণ্ড উপহার পাইয়াছিলাম। পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম এবং অন্য দুইখণ্ড গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গ্যারিবল্ডীর সমগ্র কাহিনী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলাম। আমার মানসপটে ভারতেও স্বাধীনতার যুদ্ধের অনুরূপ বীরত্বপূর্ণ ঘটনার চিত্র ভাসিয়া উঠিত এবং আমার চিন্তায় ভারত ও ইতালী যেন আশ্চর্যভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। এমন বৃহৎ ভাবের পক্ষে হ্যারোর পরিসর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ,—আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর বিস্তৃতির মধ্যে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। আমার অনুরোধে পিতা সম্মত হইলেন;—মাত্র দুইবৎসর অধ্যয়ন করিয়া (সাধারণতঃ ইহার চেয়ে বেশী দিন থাকিতে হয়) আমি হ্যারো হইতে বিদায় লইলাম।

আমি স্বেচ্ছায় হ্যারো ত্যাগ করিতেছি। অথচ বিদায়ের মুহূর্তে আমার চিত্ত বিষন্ন, চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। স্থানটির প্রতি আমার মমতা জন্মিয়াছিল এবং এখান হইতে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হইল। তথাপি হ্যারো ছাড়িবার সময় আমি কতখানি দুঃখিত হইয়াছিলাম, তাহাই ভাবি। হ্যারোর পরম্পরাগত রীতি ও সুর যাহার সহিত আমার প্রাণগত যোগ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার জন্য দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক।

এইবার কেম্‌ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজ। ১৯০৭-এর অক্টোবরের প্রারম্ভ, আমার বয়স সতের বৎসর, অথবা আঠার বৎসরের কাছাকাছি। এখন আমি "আণ্ডার গ্রাজুয়েট",—ভাবিয়া উৎফুল্ল। স্কুলের তুলনায় ইচ্ছামত কাজ করিবার স্বাধীনতা এখানে কত বেশী। কৈশোরের বন্ধনশৃঙ্খল খসিয়া গেল, আমি এখন নিজেকে

বয়স্ক যুবক বলিয়া দাবী করিতে পারি। আত্মাভিমানগর্বিত ভঙ্গীতে আমি কেম্‌ব্রিজের বৃহৎ চত্বরে, সংকীর্ণ পথে ভ্রমণ করিতাম, পরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম।

কেম্‌ব্রিজে তিন বৎসর ছিলাম। এই শান্তিপূর্ণ তিনটি বৎসরে বিশেষ কোন বিরক্তির কারণ ঘটে নাই, মন্থরগতিতে দিনগুলি কাটিয়াছে। বহু বন্ধু সমাগম, কিছু পড়াশুনা ও খেলাধূলা এবং ক্রমশঃ জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিধির বিস্তার—তিনটি বৎসর কত আনন্দের! আমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 'ট্রাইপোস' লইয়াছিলাম। আমার বিষয় ছিল, রসায়ন, ভূবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা; কিন্তু আমার আগ্রহ ঐগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কেম্‌ব্রিজে অথবা ছুটির সময় লণ্ডনে অথবা কোন স্থানে এমন অনেকের সহিত দেখা হইত, যাঁহারা বিবিধ গ্রন্থ, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিতেন। এই সকল বাজারচলন ফ্যাসন-দুরস্ত অভিজাতভঙ্গীর আলোচনায় প্রথম প্রথম আমি একটু বিব্রত হইতাম। কিন্তু কয়েকখানি বই পড়িয়া সমসাময়িক আলোচনার বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করিলাম। আলোচনাকালে অজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া মোটামুটি কাজ চালাইয়া যাইতে পারিতাম। এইভাবে জার্মান দার্শনিক নীট্‌সে (কেম্‌ব্রিজে ইহাকে লইয়া আলোচনার বেজায় ধূম), বার্ণাড্‌ শ'এর পুস্তকের ভূমিকা এবং লোজ ডিকিনসনের নবপ্রকাশিত পুস্তক লইয়া আমরা আলোচনা করিতাম। আমরা নিজেদের বেশ কূটতার্কিক মনে করিতাম এবং শ্রেষ্ঠত্বাভিমান লইয়া যৌন বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে লম্বা লম্বা কথা বলিতাম। কখনও বা আইভান ব্লক, হ্যাভলক এলিস্‌, ক্রাফট্‌, এবিং অথবা অটো বুইনিংগার প্রভৃতি বড় বড় নামের বুকুনি ছাড়িতাম। আমরা ভাবিতাম, বিশেষজ্ঞ ছাড়া ঐ বিষয়ে অন্যান্যের যতটুকু জানা উচিত, আমাদের জ্ঞান তদপেক্ষা কম নহে।

কিন্তু কার্যতঃ লম্বা লম্বা কথা বলিলেও যৌনব্যাপারে আমরা অধিকাংশই ছিলাম ভীরু। অন্ততঃ আমার অবস্থা ছিল তাহাই। অনেক বৎসর পর্যন্ত কেম্‌ব্রিজ ছাড়িবার পরেও আমার যৌন অভিজ্ঞতা কেবল পুঁথিলব্ধ মতবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেন যে এরূপ ছিল তাহা বলা একটু কঠিন। আমরা প্রায় সকলেই স্ত্রীজাতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করিতাম, এই ব্যাপারে আমাদের মনে কোন পাপবোধও ছিল না। আমার মনে তো ছিলই না. উপরন্তু ধর্মের নিষেধও ছিল না। আমরা বলিতাম, ইহা সুনীতিও নহে, দুর্নীতিও নহে—ইহা প্রেমাসক্তি মাত্র। তথাপি এক স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ আমি ইহা হইতে দূরে থাকিতাম এবং সচরাচর ইহা তৃপ্তির জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয় তাহার উপর আমার বিতৃষ্ণা ছিল। আমার ছাত্রজীবনে আমি অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলাম, সম্ভবতঃ আমার নিঃসঙ্গ শৈশবজীবনই ইহার কারণ।

এইকালে জীবন সম্পর্কে আমি একপ্রকার অস্পষ্ট সুখবাদী ছিলাম। যৌবনের স্বাভাবিক আবেগ ও অস্কার ওয়াইল্ড এবং ওয়ালটার প্যাটারের প্রভাব আমাকে ঐরূপ করিয়াছিল। আনন্দ সম্ভোগ ও বিলাসী জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে একটা গালভরা গ্রীক-দার্শনিক নাম দেওয়া সহজ ও তৃপ্তিপ্রদ। কিন্তু আমার জীবনে ইহা ছাড়াও স্বতন্ত্র একটা ভাব ছিল, যাহার জন্য আমি বিলাসীদিগের প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ অনুভব করিতাম না। ধর্মানুরক্তির অভাব এবং ধর্মের অত্যাচারের প্রতি বিতৃষ্ণার ফলে আমি স্বাভাবিকভাবেই অন্য কোন আদর্শের অনুসন্ধান করিতাম। কিন্তু আমার পল্লবগ্রাহিতা ছিল, কোন কিছুই তলাইয়া দেখিতাম না। জীবনের সৌন্দর্যানুভূতিই আমাকে আকর্ষণ করিত। স্থূল ও অমার্জিত রুচির

ভোগলিপ্সাকে সংযত করিয়া জীবন যাপন এবং জীবনের বহুমুখী কর্ম-প্রেরণার মধ্যে পূর্ণ উপভোগের আকর্ষণ ছিল বলিয়া আমি জীবন ভোগ করিয়াছি এবং তাহার মধ্যে যে কিছু পাপ আছে, এমন কথা ভাবিতে আমি অস্বীকার করিয়াছি। পিতার ন্যায় আমার মধ্যেও দ্যূতক্রীড়কের মনোবৃত্তি রহিয়াছে। প্রথমে অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছি। তারপর জীবনের বৃহত্তর ব্যাপারেও মহত্তর পণ রাখিয়াছি। ১৯০৭-০৮ সালে ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে অভাবনীয় ঘটনার সমাবেশ হইতেছিল, তাহার মধ্যে দুঃসাহসিকের ভূমিকায় অভিনয় করিবার যে প্রবল প্রেরণা অনুভব করিতাম তাহা নিশ্চয়ই সুখী ও বিলাসী জীবনের প্রতি অনুরাগের চিহ্ন নহে। এই সব বিমিশ্র ও স্ববিরোধী আকাঙ্ক্ষায় আমার মন উন্দাম হইয়া থাকিত। চিন্তার শৃঙ্খলাহীন অস্পষ্টতা সত্ত্বেও আমি বিশেষ উৎকণ্ঠা অনুভব করিতাম না, কেননা স্থিরসঙ্কল্প লইয়া কার্য করার দিন তখনও বহু দূরে। তখন, কি দৈহিক কি মানসিক জীবন মধুময়, নিত্য নূতন জ্ঞানলাভ, অনুভূতি ও আবিষ্কারের আনন্দ। কত কিছু করিতে হইবে, কত জানিবার দেখিবার বুঝিবার রহিয়াছে। শীতকালের দীর্ঘ সন্ধ্যায় অগ্নিকুণ্ড ঘিরিয়া আমাদের মন্থর আলোচনা ক্রমে গভীর হইয়া আসিত, অধিক রাত্রিতে আগুন নিভিয়া গেলে আমাদের চৈতন্য হইত, শীতকম্পিত দেহে অনিচ্ছার সহিত শয্যায় গমন করিতাম। সময় সময় আলোচনা-প্রসঙ্গে মুখর তর্কের উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠিত। কিন্তু এ সকলই কথার কথা ছিল। মানবজীবনের সমস্যাগুলি লইয়া আলোচনার ভাণে আমরা খেলা করিতাম মাত্র, কেননা তখনও আমাদের জীবনে ঐ সমস্যাগুলি বাস্তবরূপ গ্রহণ করে নাই, জগতের কর্মপ্রবাহের জটিল জালে তখনও আমরা জড়াইয়া পড়ি নাই। শীঘ্রই এই জগতের উপর মৃত্যুর কৃষ্ণচ্ছায়া ঘনাইয়া উঠিবে,—মৃত্যু, হত্যা ও ধ্বংসের বিভীষিকার সম্মুখে জগতের যুবকগণ ব্যথিত ও পীড়িত হইবে, ইহা তখনও ভবিষ্যতের যবনিকায় আবৃত। আমরা দেখিতে পাইতাম নিশ্চিত উন্নতির ধারায় সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা, যাহাতে স্বচ্ছল অবস্থার যে কোন ব্যক্তিই সুখী হইতে পারে।

এইকালে সুখবাদ বা অনুরূপ যে সকল ধারণায় আমি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলাম, তাহা লিপিবন্ধ করিলাম বলিয়া যদি কেহ মনে করেন যে ঐ সকল বিষয়ে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল, তাহা হইলে ভুল করা হইবে। বস্তুতঃ এ সব বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কথা আমি চিন্তাও করিতাম না। ঐগুলি অনির্দিষ্ট কৌতূহলের মত আমার মনের মধ্যে লঘুভাবে ভাসিয়া উঠিত, কালক্রমে তাহা অল্পাধিক দাগ রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। এই সকল বিষয় অনুধ্যান করিয়া কখনও আমি মনকে ভারাক্রান্ত করি নাই। কর্তব্যকার্য, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদে জীবন বেশ স্বচ্ছন্দ ছিল, কেবল ভারতের রাজনৈতিক সংঘর্ষের সংবাদে মাঝে মাঝে চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতাম। কেম্‌ব্রিজে যে সকল রাজনৈতিক গ্রন্থ পাঠে আমি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে মেরিডিথ টাউনসেণ্ডের "এশিয়া এবং ইয়োরোপ" উল্লেখযোগ্য।

১৯০৭ সাল হইতে কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে অশান্তির আলোড়ন চলিতেছিল। ১৮৫৭র বিদ্রোহের পর এই প্রথম বৈদেশিক শাসনের নিকট অপ্রতিবাদে নত হইতে ভারত অস্বীকার করিল। তিলকের কার্যপদ্ধতি ও কারাদণ্ড, অরবিন্দ ঘোষ এবং বাঙ্গলার স্বদেশী ও বয়কটের সঙ্কল্প প্রভৃতি সংবাদে ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতীয় আমরা অত্যন্ত উত্তেজনা বোধ করিতাম। আমরা প্রায় সকলেই তখন তিলকপন্থী অথবা চরমপন্থী (তৎকালীন প্রচলিত নাম) হইয়া পড়িয়াছিলাম।

কেম্‌ব্রিজে ভারতীয়দের "মজলিস" নামে একটি সমিতি ছিল। এখানে আমরা

প্রায়শঃ রাজনীতিচর্চা করিতাম, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষের সহিত সম্পর্কহীন তর্ক মাত্র। পার্লামেণ্ট অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়নের আলোচনাভঙ্গী, বক্তৃতাকালে অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতির অন,করণের দিকেই আমরা বেশী ঝোঁক দিতাম, বিষয়বস্তু হইত গৌণ। আমি প্রায়ই মজলিসে থাকিতাম, কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে আমি এখানে কদাচিৎ বক্তৃতা করিয়াছি। আমি লজ্জা ও সঙ্কোচ কিছ,তেই অতিক্রম করিতে পারিতাম না। কলেজের তর্কসভায়ও এই কারণে আমি বিব্রত হইতাম। এখানে নিয়ম ছিল, নির্দিষ্ট সময়ে বৎসরে একেবারেই বক্তৃতা না করিলে জরিমানা দিতে হয়! আমি প্রায়ই জরিমানা দিয়াছি।

আমার মনে আছে এডুইন মণ্টেগ, প্রায়ই আমাদের তর্কসভায় আসিতেন। তিনি উত্তরকালে ভারতসচিব হইয়াছিলেন। তিনি ট্রিনিটি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং কেম্‌ব্রিজ কেন্দ্র হইতে পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন। তাঁহার নিকটই আমি প্রথম বিশ্বাসের আধ,নিক সংজ্ঞা শ্রবণ করি। তোমার য,ক্তি যাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে না, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন; অতএব যাহা য,ক্তি-অন,মোদিত, সেখানে অন্ধবিশ্বাসের কথা উঠিতেই পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়া, তৎকালীন কতকগ,লি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে আমি সত্য বলিয়া মনে করিতাম। উনবিংশ শতাব্দীর এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান ও জগত সম্পর্কে কতকগ,লি স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, যাহা আজকাল নাই।

মজলিসে অথবা ঘরোয়া আলাপে ভারতীয় ছাত্রেরা ভারতীয় রাজনীতি আলোচনায় তীব্র ভাষা ব্যবহার করিত। এমন কি তৎকালীন বঙ্গদেশে আরব্ধ হিংসাম,লক কার্যেরও কেহ কেহ প্রশংসা করিতেন। পরবর্তীকালে আমি দেখিয়াছি, ইঁহারাই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়াছেন, হাইকোর্টের জজ অথবা শান্তশিষ্ট ব্যারিস্টার ইত্যাদি হইয়াছেন। এই সকল বৈঠকী চরমপন্থীদের মধ্যে দ,ই একজন ব্যতীত পরবর্তীকালে কেহই ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই।

কেম্‌ব্রিজে কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিকের দর্শন পাইয়াছিলাম। আমরা তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেও আমাদের মনে একটা হামবড়া ভাব ছিল। আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতিব পরিধি বিস্তীর্ণ এবং আমরা অধিকতর উদারতার সহিত কোন বিষয় দেখিতে পারি, এমন অহমিকা আমাদের মনে ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায় এবং গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে কেম্‌ব্রিজে আসিয়াছিলেন। আমরা একটি বসিবার ঘরে বিপিন পালকে অভ্যর্থনা করিলাম। সেখানে আমরা ১০।১২ জন উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু তিনি এমন গর্জন করিয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন যেন তিনি দশ সহস্র শ্রোতার সম্ম,খে জনসভায় বক্তৃতা করিতেছেন! সেই প্রচণ্ড কণ্ঠস্বরের কোলাহলে আমি ব,ঝিতে পারিলাম না তিনি কি বলিতেছেন। লাজপৎ রায় বেশ শান্ত গম্ভীরভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। আমি পিতার নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলাম যে, বিপিনবাব, অপেক্ষা লাজপৎ রায়কেই আমার বেশী ভাল লাগিল; ইহা শ,নিয়া তিনি খ,সী হইয়াছিলেন। কেননা তৎকালে তিনি বাঙ্গলার চরমপন্থীদের পছন্দ করিতেন না। গোখ্‌লে কেম্‌ব্রিজে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। এ বিষয়ে আমার এই মাত্র মনে আছে যে, বক্তৃতার শেষে এ এম খাজা তাঁহাকে কতকগ,লি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নোত্তর এমনভাবে চলিতে লাগিল যে আমরা ভুলিয়া গেলাম, কি লইয়া ইহার আরম্ভ এবং বিষয় কি ছিল।

ভারতীয় সমাজে হরদয়ালের খ,ব খ্যাতি ছিল। আমি কেম্‌ব্রিজে যোগ দিবার

কিছুকাল পূর্বে তিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন। আমি যখন হ্যারোর ছাত্র ছিলাম, তখন লণ্ডনে ইঁহাকে দুই তিনবার দেখিয়াছি।

কেম্‌ব্রিজে আমার সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই পরে ভারতীয় কংগ্রেস-রাজনীতিতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি যাইবার কিছুকাল পরেই জে এম সেনগুপ্ত কেম্‌ব্রিজ ত্যাগ করেন, সয়েফউদ্দিন কিচলু, সৈয়দ মহাম্মদ এবং তাসাদ্দুক আহম্মদ শেরওয়ানী আমার সমসাময়িক ছিলেন। বর্তমানে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এম সুলেমানও তখন কেম্‌ব্রিজে অধ্যয়ন করিতেন। অন্যান্য সমসাময়িকগণ বর্তমানে মন্ত্রীপদ ও সিভিল সার্ভিস আলো করিয়া আছেন।

লণ্ডনে থাকিতে আমরা শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা এবং তাঁহার 'ভারতভবনের' কথা শুনিতাম, কিন্তু কখনও তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই, আমি ভারতভবনেও যাই নাই, তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান সোসিয়লজিস্ট' মধ্যে মধ্যে দেখিতাম। দীর্ঘকাল পরে ১৯২৬ সালে জেনেভায় শ্যামজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তখনও তাঁহার পকেট 'ইণ্ডিয়ান সোসিয়লজিস্টের' পুরাতন খাতায় বোঝাই ছিল এবং যে ভারতীয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইত তাহাদের প্রায় প্রত্যেককেই তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিতেন।

লণ্ডনে তখন ইণ্ডিয়া অফিস একটি ভারতীয় ছাত্রবিভাগ খুলিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রই মনে করিত এবং মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল যে, ইহা গুপ্তচর দিয়া ছাত্রদের গতিবিধির উপর নজর রাখিবার কৌশলমাত্র। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্রকে ইহা ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক সহ্য করিতে হইত। কেননা ইহার সুপারিশ ব্যতীত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থায়, পিতা রাজনৈতিক আন্দোলনে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার মতভেদ থাকিলেও আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি স্বাভাবিকভাবেই মডারেট দলে যোগদান করেন। ইঁহাদের অনেককে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে জানিতেন এবং অনেকেই তাঁহার সমব্যবসায়ী ছিলেন। যুক্তপ্রদেশের এক প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির আসন হইতে তিনি বাঙ্গলা ও মহারাষ্ট্রের চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯০৭ সালে সুরাটে যখন কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গিয়া নিছক মডারেট সমিতিতে পর্যবসিত হয় তখন তিনিও উহাতে উপস্থিত ছিলেন।

সুরাট কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই এইচ ডাবলিউ নেভিনসন কিছুদিনের জন্য এলাহাবাদে তাঁহার ভবনে অতিথি হন। তাঁহার ভারতবর্ষ সম্পর্কিত পুস্তকে তিনি পিতার বিষয় লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বদান্যতা ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই তিনি মডারেট।" কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা! এক রাজনীতি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়েই পিতা তখন মডারেট ছিলেন না এবং ধীরে ধীরে এই মডারেট মনোবৃত্তিও কালে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে গভীর ভাবপ্রবণতা, তীব্র আবেগ, অসীম আত্মমর্যাদাবোধ এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ছিল এবং ইহা নিশ্চয়ই মডারেট ছাঁচের বিপরীত। তথাপি ১৯০৭-০৮ সালে এবং তাহার পরও কয়েক বৎসর তিনি মডারেটদের মধ্যেও মডারেট ছিলেন। চরমপন্থীদের প্রতি তাঁহার চিত্ত তিক্ত ছিল, যদিও আমার বিশ্বাস তিলককে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন।

ইহার কারণ কি? আইন ও নিয়মতান্ত্রিকতা ছিল তাঁহার শিক্ষার ভিত্তি।

তিনি আইনজ্ঞ ও নিয়মতান্ত্রিকের দৃষ্টি দ্বারাই রাজনীতি বিচার করিতেন। কঠিন ও তীব্র বাক্যের পশ্চাতে যদি বাক্যানুযায়ী কার্য না থাকে, তবে তাহা নিষ্ফল, ইহাই তাঁহার স্পষ্ট ধারণা ছিল। কোন কার্যকরী কর্মপ্রচেষ্টা তিনি দেখিতে পান নাই। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা আমরা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিব, এমন ভরসা তাঁহার ছিল না। এই আন্দোলনের ভিত্তিতে যে ধর্মমূলক জাতীয়তাবাদ ছিল, তাহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। ভারতে পুনরায় প্রাচীন যুগ ফিরাইয়া আনিবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাঁহার ছিল না। প্রাচীনযুগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতিও ছিল না, ধারণাও ছিল অল্প, বরঞ্চ উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া জাতিভেদ ও অন্যান্য কতকগুলি প্রাচীন প্রথার উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা ছিল; পাশ্চাত্যের উন্নতির প্রতি তিনি গভীর আকর্ষণ অনুভব করিতেন এবং ভাবিতেন, ইংলণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দ্বারা আমরাও সমুন্নত হইব।

সামাজিক দিক হইতে দেখিলে ১৯০৭-এর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নিশ্চিত-রূপেই প্রগতিবিরোধী। ভারতে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে নবজাতীয়তাবাদ ধর্মের ভিত্তির উপরই স্থাপিত হইয়াছিল। সামাজিক ব্যাপারে মডারেটগণ অনেক বেশী অগ্রসর ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের কোন যোগ ছিল না। মডারেটগণ কিয়ৎ পরিমাণে উচ্চমধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি। উচ্চমধ্যশ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন অর্থনৈতিক আদর্শ তাঁহারা চিন্তা করিতেন না। মডারেটগণ জাতিভেদ প্রথার কাঠিন্য ভাঙ্গিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার এবং উন্নতিবিরোধী প্রাচীন সামাজিক প্রথা বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন।

আমি কেম্‌ব্রিজে থাকিতেই প্রশ্ন উঠিল, ভবিষ্যতে আমি কি করিব। কিছুদিন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কথা আলোচনা চলিল, তখনকার দিনে উহার একটা আকর্ষণ ছিল। কিন্তু কি পিতার কি আমার এ বিষয়ে ঔৎসুক্য ছিল না বলিয়া কথাটা চাপা পড়িল। ইহার আরও কারণ এই যে আমার বয়স কম ছিল, যদি আমাকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে হয় তাহা হইলে কেম্‌ব্রিজের উপাধি পরীক্ষার পরও তিন চার বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। কেম্‌ব্রিজের উপাধি পাইবার সময় আমার বয়স ছিল বিশ বৎসর; তখন সিভিল সার্ভিসের নির্দিষ্ট বয়স ছিল ২২ হইতে ২৪। পরীক্ষায় কৃতকার্য হইলে আরও এক বৎসর ইংলণ্ডে থাকিতে হইবে। ইংলণ্ডে দীর্ঘ প্রবাসের ফলে আমাদের পরিবারস্থ সকলেই আমার দেশে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি যদি সিভিল সার্ভিসে যোগ দেই তাহা হইলে পরিবার ও গৃহ হইতে দূরে নানাস্থানে চাকুরী করিতে হইবে, পিতা একথাও চিন্তা করিয়াছিলেন। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর, আমার পিতামাতা উভয়েই আমাকে নিকটে রাখিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। এই সকল কারণে সিভিল সার্ভিস অপেক্ষা পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বন করাই স্থির হইল,—আমি 'ইনার টেম্পল'-এ যোগ দিলাম। আমার ক্রমবর্ধিত চরমপন্থী রাজনৈতিক মত সত্ত্বেও আমি সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ভারতীয় শাসনযন্ত্রের চাকার দাঁতে পরিণত হইতে তখন তীব্র আপত্তি বোধ করি নাই, ইহাই আশ্চর্য। পরবর্তী-কালে এই প্রস্তাব আমার নিকট কি বিসদৃশ না মনে হইত!

১৯১০-এ আমি উপাধি লইয়া কেম্‌ব্রিজ ত্যাগ করিলাম। বিজ্ঞানের 'ট্রাইপোস' পরীক্ষায় আমি সাধারণভাবে পাশ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর "অনার্স" পাইয়াছিলাম। ইহার পর দুই বৎসর আমি লণ্ডনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। আইন পরীক্ষাগুলি একের পর আর সাধারণভাবেই উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। অবসর ছিল প্রচুর—সময়ের স্রোতে গা ভাসান দিয়া থাকিতাম। সাধারণভাবে কিছু পড়াশুনা, 'ফেবিয়ান' ও

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ লইয়া নাড়াচাড়া, সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া আলোচনায় সময় কাটিত। আয়র্লণ্ডের নারীদের ভোটাধিকারলাভের আন্দোলনও বিশেষভাবে আমি লক্ষ্য করিতাম। ১৯১০-এর গ্রীষ্মকালে আয়র্লণ্ডে ভ্রমণকালে আমি সিন-ফিন আন্দোলনের সূচনা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

লণ্ডনে হ্যারোর কয়েকজন পুরাতন বন্ধুর সাহচর্যে ব্যয়বহুল বিলাসে মাতিলাম। আমি পিতার নিকট হইতে প্রচুর মাসোহারা পাইতাম, সময় সময় তাহাতেও কুলাইত না। বাবা টের পাইয়া আমার চরিত্র খারাপ হইতেছে ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। কিন্তু কার্যতঃ বড়রকম কিছুই করিতে পারি নাই। যাহাদিগকে চল্‌তি ভাষায় বলে "সহুরে বাবু", সেই সকল ধনী অথচ মস্তিষ্কহীন ইংরাজদের চালচলন নকল করিবার চেষ্টা করিতাম মাত্র। লক্ষ্যহীন আয়েসী জীবন আমাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, ইহা বলাই বাহুল্য। ক্রমে ইহাতে আমার উৎসাহ কমিয়া আসিল বটে, কিন্তু মনে হইতে লাগিল আমি যেন অহঙ্কারী হইয়া উঠিতেছি।

ছুটিতে আমি মাঝে মাঝে ইয়োরোপে বেড়াইয়াছি। ১৯০৯-এর গ্রীষ্মকালে পিতার সহিত আমি যখন বার্লিনে, তখন কাউন্ট জেপীলিন কনস্‌টান্স হ্রদ তীরবর্তী ফ্রিডরিকসাফেন হইতে তাঁহার নবনির্মিত বিমানপোতে বার্লিনে আসিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস ইহাই তাঁহার প্রথম শূন্যমার্গে দীর্ঘপথ অতিক্রম। এই উপলক্ষ্যে বিশাল জনতা হইয়াছিল এবং স্বয়ং কাইজার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। দশ বিশ লাখ লোক বার্লিনের টেম্পল হফ ময়দানে জমায়েৎ হইয়াছিল। জেপীলিনখানি নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া আমাদের মাথার উপরে চক্রাকারে ঘুরিয়া সাবলীল গতিতে অবতরণ করিয়াছিল। ঐ দিন হোটেল আদলনের কর্তারা প্রত্যেক বাসিন্দাকে কাউন্ট জেপীলিনের একখানা সুন্দর চিত্র উপহার দিয়াছিলেন। ঐ চিত্রখানি এখনও আমার নিকট আছে।

ইহার দুইমাস পরে পারী নগরীতে আমি প্রথম 'এফেল টাওয়ার' বেষ্টন করিয়া এরোপ্লেন উড়িতে দেখি। আমার মনে হয়, বিমান চালক ছিলেন কঁৎ দ্য লাবের। আঠারো বৎসর পরে, আমি যখন পারীতে, তখন আটলাণ্টিকের অপর তীর হইতে লিণ্ডবার্গ উড়িয়া আসিয়া জয়গৌরব লাভ করিয়াছিলেন।

১৯১০ সালে কেম্‌ব্রিজ হইতে পাশ করিবার অব্যবহিত পরে নরওয়েতে সঙ্গীদের সহিত অনন্দভ্রমণ কালে একবার আশ্চর্যরূপে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। পদব্রজে পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করিয়া আমাদের গন্তব্যস্থলে একটি ছোট হোটেলে ক্লান্তদেহে উপস্থিত হইলাম। আমরা স্নান করিতে চাহি শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য; এমন কথা এখানে কেহ শুনে নাই এবং হোটেলেও তেমন বন্দোবস্ত ছিল না। হোটেলের লোকেরা বলিল, নিকটবর্তী একটা পার্বত্য নির্ঝরিণীতে আমরা স্নান করিতে পারি। হোটেলের সৌজন্যে টেবিল ঢাকিবার কাপড় ও তোয়ালে লইয়া আমি ও একজন ইংরাজ যুবক স্নান করিতে চলিলাম। অদূরবর্তী তুষার স্তূপ হইতে গলিত জলধারার পুষ্ট নির্ঝরিণী তীব্রবেগে কলকল ধ্বনি করিয়া প্রবাহিতা। আমি জলে নামিলাম। জল গভীর না হইলেও তুষার-শীতল এবং তলদেশ অতি-মাত্রায় পিচ্ছল। পদস্খলিত হইয়া আমি পড়িয়া গেলাম, ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর জমিয়া গেল, হাত পা নাড়িবার শক্তি নাই। পায়ের উপর দাঁড়াইতে না পারিয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম। আমার ইংরাজ সঙ্গী কোনমতে জল হইতে উঠিয়া তীর ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিল এবং অনেক কষ্টে আমার পা ধরিয়া জল হইতে টানিয়া তুলিল। পরে আমরা বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলাম। আমাদের সম্মুখে দুই

তিনশত গজ পরেই এই গিরি-নির্ঝরিণী পর্বতগাত্র হইতে সোজা নীচে নামিয়া গিয়াছে। এই জলপ্রপাতটি এ অঞ্চলে একটা দেখিবার বস্তু।

১৯১২-র গ্রীষ্মকালে আমি ব্যারিষ্টারী পাশ করিলাম এবং আমার সাতবৎসর ইংলণ্ড-প্রবাস সমাপ্ত করিয়া শরৎকালে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলাম। এই কালে আরও দুইবার আমি ছুটিতে দেশে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এইবার স্থায়ীভাবে প্রত্যাবর্তন! বোম্বাই বন্দরে নামিয়া আমার মনে হইল, আমি একটি সাধারণ বালকমাত্র, আমার মধ্যে প্রশংসার কিছুই নাই।

৫

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং ভারতে মহাযুদ্ধের সমসাময়িক রাজনীতি

১৯১২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন মন্দীভূত। তিলক কারাগারে—উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে চরমপন্থীরা (জাতীয়দল) ছত্রভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষাকৃত শান্ত। মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার লইয়া মডারেটগণ বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছেন। প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য —বিশেষভাবে দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের জন্য কিছু আন্দোলন ছিল। কংগ্রেস মডারেটদলের বার্ষিক মজলিসে পরিণত। সেখানে কতকগুলি দুর্বল প্রস্তাব গৃহীত হইত—উহা লইয়া কোন উৎসাহ দেখা যাইত না।

১৯১২-র বড়দিনে আমি প্রতিনিধি হইয়া বাঁকীপুর কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলাম। ইহা ইংরাজী শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর সম্মেলন, ইংরাজী কেতাদুরস্ত ফিটফাট পোষাকের ছড়াছড়ি। ইহা রাজনৈতিক উৎসাহ ও উদ্দীপনাহীন সামাজিক সম্মেলন মাত্র। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সদ্য প্রত্যাগত গোখ্লে ইঁহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং এই অধিবেশনে তিনিই ছিলেন সকলের শীর্ষস্থানীয়। যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি রাজনীতি ও জনসাধারণের কাজ একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তেজস্বী ও মনস্বী গোখ্লে তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার মানসিক বল ও শক্তিমত্তা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম।

গোখ্লের বাঁকীপুর ত্যাগ করার প্রাক্কালে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসাবে তিনি একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা পাইয়াছিলেন। তাঁহার শরীরও ভাল ছিল না, অবাঞ্ছনীয় লোকসঙ্গেও তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতেন। কংগ্রেসের কয়েকদিনের পরিশ্রমের পর তিনি একা শান্তিতে রেলে ভ্রমণ করার সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট কামরায় উঠিলেন, কিন্তু অবশিষ্ট গাড়ীতে কলিকাতার প্রতিনিধিদের বেজায় ভীড়। কিছুক্ষণ পর ভূপেন্দ্রনাথ বসু (পরে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য) আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ঐ কামরায় আরোহণ করিতে পারেন কিনা। গোখ্লে অবাক, তিনি জানিতেন বসু মহাশয়ের মুখ খুলিলে রক্ষা নাই, কিন্তু তথাপি রাজী হইতে হইল। কয়েক মিনিট পরেই বসু মহাশয় আবার আসিয়া গোখ্লেকে বলিলেন, যদি তাঁহার একজন বন্ধুও এই কামরায় আসেন তাহা হইলে কি তাঁহার কোন আপত্তি আছে। বিনয়ী গোখ্লে আপত্তি করিতে পারিলেন না। গাড়ীতে উঠিয়া বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, তিনি ও তাঁহার বন্ধু উপরের 'বার্থে' শুইতে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করেন: কাজেই গোখ্লে যদি কিছু মনে না করেন, তাহা হইলে তিনি উপরে উঠিলে তাঁহারা নীচের দুইটি 'বার্থ' অধিকার

করিতে পারেন। বেচারা গোখলে অগত্যা উপরে উঠিলেন এবং অশান্তিতে রাত্রি কাটাইলেন।

আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আমি হাইকোর্টে যোগ দিলাম। কাজেও কতকটা মন বসিল। ইউরোপ হইতে ফিরিয়া কয়েক মাস বেশ আনন্দে কাটিল; বাড়ীতে ফিরিয়া পুরাতন পরিচয় নূতন করিয়া ঝালাইয়া লইয়া আমি সুখী হইলাম। কিন্তু সাধারণ আইনজীবীদের ন্যায় আমার এই জীবনযাত্রার নূতনত্বের মোহ ক্রমশঃ দূর হইল, মনে হইতে লাগিল, এক লক্ষ্যহীন বিরস গতানুগতিকতার মধ্যে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকার কোন সার্থকতা নাই। আমার ধারণা, পারিপার্শ্বিকের প্রতি এই অসন্তোষ আমার দো-আঁসলা অর্থাৎ মিশ্র শিক্ষার ফল। সাত বৎসর ইংলণ্ডে বাস করার ফলে আমার যে সকল অভ্যাস ও সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছিল, বর্তমানের সহিত তাহা সামঞ্জস্যহীন। আমাদের বাড়ীর ব্যবস্থা ও আবহাওয়া মোটামুটি ভালই ছিল। বাহিরে বার-লাইব্রেরী এবং ক্লাবে একই শ্রেণীর লোকের সহিত দেখা হইত, একই পুরাতন কথা—অধিকাংশই আইন ব্যবসায় সংক্রান্ত,—বার বার আলোচনা হইত। এই আবহাওয়ায় মানসিক উৎকর্ষ সাধনের কিছুই নাই, আমার নিকট জীবন বিস্বাদ হইয়া উঠিল। এমন কি অবসর বিনোদনের বিশেষ কোন আমোদ প্রমোদও ছিল না।

ই. এম. ফ্রস্টার, সম্প্রতি প্রকাশিত জি. লোজ ডিকিনসনের জীবন চরিতে লিখিয়াছেন, ভারত সম্বন্ধে তিনি (ডিকিনসন) একদা বলিয়াছিলেন, “কেন উভয় জাতির মধ্যে মিলন হয় না? কারণ অতি স্পষ্ট, ভারতবাসীর সঙ্গ ইংরাজদের নিকট পীড়াদায়ক। এই অকাট্য সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।” সম্ভবতঃ অধিকাংশ ইংরাজই ঐরূপ বোধ করেন এবং ইহা কিছু আশ্চর্য নহে। ফ্রস্টার অন্যত্র লিখিয়াছিলেন, প্রত্যেক ইংরাজই নিজেকে জবরদখলী সৈন্যদলের (army of occupation) একজন সৈনিক বলিয়া মনে করে এবং সঙ্গতভাবেই তদনুরূপ আচরণ ও ব্যবহার করিয়া থাকে। এই অবস্থায় দুইটি জাতির মধ্যে স্বাভাবিক ও বাধাহীন সম্পর্ক কিছুতেই স্থাপিত হইতে পারে না। ইংরাজ ও ভারতবাসী পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচারের ভাণ অভিনয় করিয়া থাকেন, কাজেই পরস্পর স্বাভাবিক ভাবে মিলিত হইবার অক্ষমতার অস্বস্তি অনুভব করিয়া থাকেন। একের অপরকে ভাল লাগে না—এড়াইতে পারিলে উভয়েই আরাম বোধ করেন।

সাধারণতঃ ইংরাজেরা সরকারী পরিমণ্ডলের সহিত সংশ্লিষ্ট একদল ভারতীয়ের সহিত মিশিয়া থাকে, কদাচিৎ এমন ভারতবাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, যাহার সঙ্গ সত্যই লোভনীয়। কিন্তু সেরূপ লোক পাওয়া গেলেও মন খুলিয়া মিশিবার সুবিধা হয় না। ব্রিটিশ শাসনের আমলে ব্রিটিশ ও ভারতীয় শাসকমণ্ডলীর নানাকারণে প্রাধান্য ঘটিয়াছে; এমন কি, তাঁহাদের সামাজিক মর্যাদাও কম নহে; কিন্তু এই শাসকশ্রেণী অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন, স্থূল-রুচি এবং সঙ্কীর্ণচেতা। এমন কি, শিক্ষিত বুদ্ধিমান ইংরাজ যুবকও ভারতে আসিয়া অল্পদিনেই বুদ্ধি ও সংস্কৃতির দিক দিয়া অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়েন, জীবন্ত আদর্শ ও আন্দোলনের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। সমস্তদিন আফিসে অফুরান ফাইল ঘাঁটিয়া অপরাহ্নে একটু ব্যায়াম বা ভ্রমণ করিয়া তিনি চলিতেন ক্লাবে, সেখানে সমশ্রেণীর চাকুরীয়াদের সহিত মেলামেশা, হুইস্কী পান, ‘পাঞ্চ’ বা অনুরূপ. ইংলণ্ডের সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঠ। তিনি কদাচিৎ বই পড়েন, পড়িলেও পুরাতন প্রিয় পুস্তক লইয়াই সম্ভবতঃ নাড়াচাড়া করেন। এইভাবে মানসিক অধঃপতনের জন্য তিনি ভারতবর্ষের আবহাওয়ার দোষ দেন, এবং তাঁহাকে উদ্ধার

করিবার অপরাধে 'এজিটেটর'দের (আন্দোলনকারী) অভিসম্পাত করেন। তিনি ইহা বুঝিতে পারেন না যে, ভারতের স্বৈরশাসনতন্ত্র এবং বাঁধাধরা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি—যাহার তিনি একটি ক্ষুদ্র অংশ—ইহার জন্য দায়ী।

মাঝে মাঝে ছুটি, বিলাত গমন (ফার্লো) সত্ত্বেও ইংরাজ কর্মচারীদের যদি এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে তাঁহার অধীন অথবা সমকক্ষ ভারতীয় কর্মচারীদের অবস্থাও বিশেষ ভাল নহে, কেননা তাহারা জ্ঞাতসারেই ইংরাজদের আদবকায়দা নকল করিয়া নিজেদের ঐ ছাঁচে গড়িয়া তোলে। সাম্রাজ্যের রাজধানী নয়াদিল্লীতে ইংরাজ ও ভারতীয় উচ্চ চাকুরীয়া মহলে অবিশ্রান্ত পদোন্নতি, ছুটির নিয়ম, ফার্লো, বদলি, চাকুরীয়া মহলের তদ্বির ও পক্ষপাতিত্বের কেলেঙ্কারীর কথার আলোচনা চলে,—ইহার মত নীরস অভিজ্ঞতা অল্পই আছে।

সরকারী চাকুরীয়া মহলের এই মানসিক আবহাওয়ার দ্বারা কলিকাতা-বোম্বাই-এর মত সহরের কিয়দংশ ছাড়া, ভারতের মধ্যশ্রেণী বিশেষভাবে ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রভাবান্বিত। বৃত্তিজীবী, উকীল, ডাক্তার ও অন্যান্য অনেকে, এমন কি, আধা-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়তনগুলি পর্যন্ত এই মনোভাবে আপ্লুত। এই সকল লোক, জনসাধারণ, এমন কি, নিম্ন-মধ্যশ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র জগতে বাস করেন। রাজনীতি সমাজের এই স্তরেই সীমাবদ্ধ। ১৯০৬ সাল হইতে বাঙ্গলার জাতীয় আন্দোলনের আলোড়ন প্রথম নিম্ন-মধ্যশ্রেণীতে এক নবজীবনের চেতনা সঞ্চার করে এবং ইহা কতকাংশে জনসাধারণকেও প্রভাবিত করে। ইহাই উত্তরকালে গান্ধিজীর* নেতৃত্বে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। জাতীয়তাবাদ প্রাণপ্রদ হইলেও ইহা সঙ্কীর্ণ মতবাদ এবং ইহা সমস্ত শক্তি এমনভাবে আকর্ষণ করে যে, অন্যান্য কার্যের অবসর থাকে না।

বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রথম কয়েক বৎসর আমার জীবন বিতৃষ্ণার সহিত কাটিয়াছে, আইন ব্যবসায়েও আমি তেমন উৎসাহ বোধ করিতাম না। রাজনীতি বলিতে আমি বুঝিতাম, বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণশীল জাতীয়তামূলক কার্যপদ্ধতি, কিন্তু তখনকার অবস্থা ইহার অনুকূল ছিল না। আমি কংগ্রেসে যোগদান করিলাম, ইহার সাময়িক সভা সমিতিতেও উপস্থিত থাকিতাম। ফিজিতে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা লইয়া আন্দোলনে আমি উৎসাহের সহিত কঠিন পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু ইহা সাময়িক কাজ মাত্র।

অবসর বিনোদনের জন্য আমি কখনও কখনও শিকারে যাইতাম কিন্তু ইহাতে আমার বিশেষ যোগ্যতাও ছিল না, আকর্ষণও ছিল না। অরণ্য ও ভ্রমণই আমি ভালবাসিতাম, প্রাণীহত্যায় আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। অহিংস শিকারী বলিয়া আমার খ্যাতি রটিয়াছিল। একবার মাত্র দৈবক্রমে কাশ্মীরে আমি একটি ভল্লুক বধ করিয়াছিলাম। একবার একটি কৃষ্ণসার মৃগশিশু শিকার করিয়া, আমার শিকারে যে সামান্য উৎসাহ ছিল তাহাও নিভিয়া গেল। সেই মরণাহত নিরীহ মৃগশিশু আমার পায়ের তলায় পড়িয়া অশ্রুসজল আয়তনেত্রে করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই কাতর দৃষ্টির স্মৃতি এখনও আমাকে প্রায়ই উন্মনা করিয়া তোলে।

---

* এই পুস্তকে আমি মিঃ বা মহাত্মা না লিখিয়া সর্বত্র "গান্ধিজী" লিখিয়াছি। অনেক ইংরেজ লেখক "জী" অর্থে বিশেষ আদরের ডাক বুঝেন। কিন্তু ভারতে "জী" সর্বত্র সকলের প্রতিই নির্বিচারে প্রযুক্ত হয়। ইহা সম্মান ও শ্রদ্ধাবাচক, আমার ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছি সংস্কৃত "আর্য" শব্দ প্রাকৃত ভাষায় "অজ্জ" হয়, তাহাই অপভ্রংশে জী।

এই সময়ে আমি গোখ্‌লের "সার্ভেন্ট অফ্‌ ইণ্ডিয়া সোসাইটির" প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। এই সমিতির রাজনীতি অতিমাত্রায় নরমপন্থী এবং তখন আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করার কোন সঙ্কল্প ছিল না বলিয়া ঐ সমিতিতে যোগ দিবার কথা আমি চিন্তাও করি নাই। তবে ঐ সমিতির সদস্যগণকে আমি শ্রদ্ধা করিতাম, কেননা তাঁহারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন লইয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সম্যক্‌ পথে পরিচালিত না হইলেও দেশে ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে অন্ততঃ অনন্যচিত্ত হইয়া সরল ও অনলস কর্ম করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

যাহা হউক, এই কালে রাজনীতির সহিত সম্পর্কহীন একটা সামান্য ব্যাপারে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর কথায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছিলাম। এলাহাবাদের এক ছাত্রসভায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করিবে, অনুগত থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল নিয়মাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, যত্নসহকারে তাহা পালন করিবে। এই শ্রেণীর নিরীহ উপদেশ আমার মোটেই ভাল লাগে না। প্রভুত্বের নিকট সর্বদাই নত থাকিবে, এই ভাবের উপর জোর দিয়া বাজারচলন গতানুগতিক উপদেশ দান অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়। ভারতে প্রচলিত আধা-সরকারী আবহাওয়ার ফলেই ইহা সম্ভব হয়, আমার ইহাই ধারণা। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী বলিতে লাগিলেন,—ছাত্ররা পরস্পরের অন্যায়, ভুল, ত্রুটি, স্খলন অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে জানাইবে। অর্থাৎ সাদা কথায়, তাহারা গোপনে পরস্পরের উপর নজর রাখিবে এবং গুপ্তচরের কাজ করিবে। অবশ্য শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী এমন নিরাবরণ ভাষা ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু আমি উহার অর্থ স্পষ্ট করিয়াই বুঝিলাম এবং একজন খ্যাতনামা নেতা যে ছাত্রদের বন্ধুভাবে এমন উপদেশ দিতে পারেন, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। আমি তখন সবেমাত্র ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়াছি এবং সেখানকার স্কুল কলেজে আমি এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছি যে, প্রাণান্তেও সহপাঠীর ত্রুটি ভুল উদ্ঘাটন করিবে না। কাহারও উপর গোপনে নজর রাখিয়া এবং তাহার কার্যকলাপ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিয়া একজন সঙ্গীকে বিপদে ফেলার মত শিষ্টনীতিবিরুদ্ধ পাপ অধিক আর কিছুই নাই। সহসা এই আদর্শের বিপরীত উক্তি শুনিয়া আমি ব্যথিত হইলাম। বুঝিলাম, আমি যাহা শিক্ষা পাইয়াছি, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীর নীতির সহিত তাহার পার্থক্য কত অধিক।

মহাযুদ্ধ আসিল—আমরা সচকিত হইলাম। প্রথমে আমাদের জীবনযাত্রায় ইহার বিশেষ প্রভাব দেখা যায় নাই—যুদ্ধের ভয়াবহ প্রচণ্ডতার স্বরূপ ভারতবর্ষ তখনও উপলব্ধি করে নাই। রাজনৈতিক আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া যেন মিলাইয়া গেল। ভারত রক্ষা আইন (ইংলণ্ডের দেশ রক্ষা আইনের অনুরূপ) সমস্ত দেশকে মুষ্টিকবলে চাপিয়া ধরিল। মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষে ষড়যন্ত্র ও গুলি করিয়া গুপ্তহত্যার বিবরণ প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং পাঞ্জাবে রংরুট সংগ্রহের জবরদস্তীমূলক ব্যবস্থার কথাও শোনা গেল।

বাহিরে উচ্চকণ্ঠে রাজভক্তি প্রচারের অন্তরালে ব্রিটিশের প্রতি সহানুভূতি অতি অল্পই ছিল। জার্মানীর জয়লাভের বার্তা শুনিয়া কি মডারেট কি চরমপন্থী সকলেই তখন সন্তুষ্ট হইতেন। অবশ্য জার্মানীর প্রতি কাহারও অনুরাগ ছিল না, আমাদের শাসকবর্গ শিক্ষালাভ করুক, এই আগ্রহই সকলের মনে ছিল। ইহা দুর্বল ও নিরুপায় মানবের পরের দ্বারা প্রতিশোধ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাইবার ইচ্ছার অভিব্যক্তি। আমরা অনেকে নানা বিমিশ্র ভাব লইয়া যুদ্ধ আহব পর্যালোচনা করিতাম। মহাযুদ্ধে জিস্ত সকল জাতির মধ্যে আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতি সম্ভবতঃ ফরাসীর দিকে ছিল। মিত্রশক্তিপুঞ্জের অনুকূলে বিরামহীন নির্লজ্জ

প্রচারকার্য কিয়ৎপরিমাণে সফল হইলেও আমরা উহার উপর ততটা গর্ত্ব আরোপ করিতাম না।

ক্রমশঃ রাজনৈতিক জীবনে চেতনার সঞ্চার হইল। কারামুক্তির পর তিলক হোমর্ল লীগ স্থাপন করিলেন; মিসেস বেশান্তও আর একটি হোমর্ল লীগ প্রতিষ্ঠা করিলেন। আমি দুই দলেই যোগ দিলাম, কিন্তু বিশেষভাবে মিসেস বেশান্তের লীগের পক্ষে কার্য করিতে লাগিলাম। মিসেস বেশান্ত ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ক্রমশঃ অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বেশ উৎসাহ দেখা গেল, মুসলিম লীগও কংগ্রেসের সহিত সমান তালে চলিতে লাগিল। দেশের আবহাওয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, যুবকগণ অধীর আবেগে ভবিষ্যতের মহৎ সম্ভাবনা প্রত্যাশা করিতে লাগিল। মিসেস বেশান্ত অন্তরীণে আবদ্ধা হওয়ায় শিক্ষিত সম্প্রদায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, দেশের সর্বত্র হোমর্ল লীগ জাঁকিয়া উঠিল। ১৯০৭ সাল হইতে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত পুরাতন চরমপন্থীরা হোমর্ল লীগে যোগ দিলেন, মধ্যশ্রেণীর বহু লোক আসিয়া লীগের সদস্য হইলেন। হোমর্ল লীগে জনসাধারণ যোগ দেয় নাই।

মিসেস বেশান্তের অন্তরীণে অনেক প্রবীণ ব্যক্তি এবং কয়েকজন মডারেট নেতা পর্যন্ত বিচলিত হইলেন। আমার মনে আছে, এই অন্তরীণের কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা উত্তেজিত হইলাম। কিন্তু অন্তরীণের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী সহসা নীরব হইয়া গেলেন। যখন কাজের সময় আসিল তখন তিনি পিছাইয়া গেলেন। তাঁহার এই নীরবতায় দেশে নৈরাশ্য ও ক্ষোভের সঞ্চার হইল। যখন পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন তখনই তাঁহাকে পাওয়া গেল না। এই ঘটনার পর হইতে আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী কর্মক্ষেত্রের মানুষ নহেন, সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাজ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

অন্যান্য মডারেট নেতাদের মধ্যে কেহ আগাইয়া চলিলেন, কেহ বা পিছাইয়া পড়িলেন, কেহ কেহ দক্ষিণে সরিয়া রহিলেন। তখন গভর্ণমেণ্ট ইয়োরোপীয় ডিফেন্স ফোর্সের অনুকরণে মধ্যশ্রেণীর ভারতীয় যুবকদিগকে লইয়া একটি রক্ষীসেনাদল গড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন. ইহা লইয়া দেশে বেশ আলোচনা চলিতেছিল। এই ভারতীয় রক্ষীসৈন্যদলের প্রতি ইয়োরোপীয় দলের তুলনায় নানাভাবে পৃথক ব্যবহার করা হইত, এজন্য আমরা অনেকে অনুভব করিলাম, যতদিন ঐ সকল অপমানজনক পার্থক্য দূর করা না হইতেছে ততদিন আমাদের সহযোগিতা করা উচিত নহে। যুক্তপ্রদেশে অনেক আলোচনার পর সহযোগিতা করাই স্থির হইল। এই ব্যবস্থার মধ্যেও যুবকদের সামরিক শিক্ষা লাভের সুযোগ গ্রহণ করা কর্তব্য বলিয়া স্থির হইল। নূতন সৈন্যদলে যোগ দিবার জন্য আমি আবেদন করিলাম এবং ইহা কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য আমরা এলাহাবাদে একটি সমিতিও গঠন করিলাম। ঠিক এই সময় মিসেস বেশান্তের অন্তরীণের সংবাদ আসিল। সামরিক উত্তেজনায় আমি উদ্যোগী হইয়া গভর্ণমেণ্টের কার্যের প্রতিবাদস্বরূপ রক্ষীসৈন্যদল সংক্রান্ত সভা সমিতি ও কার্যপ্রণালী স্থগিত রাখিতে সদস্যদিগকে সম্মত করাইলাম। সদস্যদিগের মধ্যে আমার পিতা, ডাঃ তেজবাহাদুর সপ্রু, মিঃ সি ওয়াই চিন্তামণি ও অন্যান্য মডারেট নেতারা ছিলেন। ঐ মর্মে এক সাধারণ বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করা হইল। কিন্তু যুদ্ধের সময় এই শ্রেণীর কাজের জন্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে অনেকেই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

মিসেস বেশান্তের অন্তরীণের ফলে আমার পিতা ও অন্যান্য মডারেট নেতারা

হোমরুল লীগে যোগদান করিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে প্রায় সমস্ত মডারেটই লীগের সদস্যপদে ইস্তফা দিলেন। আমার পিতা রহিয়া গেলেন এবং এলাহাবাদ শাখার সভাপতি হইলেন।

ধীরে ধীরে আমার পিতা গোঁড়া মডারেট দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। যেখানে কর্তৃপক্ষ সতত আমাদের আবেদনে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, সেখানে অতিমাত্রায় আনুগত্য স্বীকারের বিরুদ্ধে তাঁহার স্বভাব বিদ্রোহ করিল। প্রাচীন চরমপন্থী নেতাদের বাক্য ও কার্যপ্রণালী তাঁহার নিকট অপ্রীতিকর ছিল বলিয়া সেদিকেও তিনি ঝুঁকিলেন না। মিসেস বেশান্তের অন্তরীণ ও পরবর্তী ঘটনাবলীতে তাঁহার মধ্যে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল, কিন্তু তিনি কৃতনিশ্চয় হইয়া পুরোভাগে আসিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এই কালে তিনি বলিতেন, মডারেটদের কর্মনীতি কোন কাজের নহে, তবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মীমাংসা ব্যতীত, কার্যতঃ বড় কিছু করা কঠিন। তিনি আমাদের নিকট বলিতেন এই সমস্যার মীমাংসা হইলে তিনি যুবকদের দলে যোগ দিবেন। আমাদের বাড়ীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যে মিলিত পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়, তাহা ১৯১৬র লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গৃহীত হওয়ায় পিতা খুব খুসী হইলেন। তিনি দেখিলেন মিলিতভাবে কার্য করিবার সুযোগ আসিয়াছে। মডারেট দলের প্রাচীন সহকর্মীদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভারত-সচিব এডুইন মণ্টেগুর ভারতে আগমনের সময় পর্যন্ত তাঁহারা কোন প্রকারে একত্র ছিলেন। কিন্তু মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মতভেদ দেখা দিল। ১৯১৮র গ্রীষ্মকালে পিতার সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌ-এ আহূত প্রাদেশিক সম্মেলনে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিল। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হইবে আশঙ্কা করিয়া মডারেটগণ এই সম্মেলন বয়কট করিলেন। পরে তাঁহারা এই প্রস্তাব আলোচনার জন্য আহূত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনও বয়কট করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে মডারেটবৃন্দ আর কংগ্রেসে যোগ দেন নাই।

মডারেটগণের নিঃশব্দে কংগ্রেসত্যাগ, জনসভায় অনুপস্থিতি, অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধেও স্বমত সমর্থন ও প্রচারের উৎসাহহীনতা আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত অগৌরবের বলিয়া মনে হইল। দেশকর্মীর পক্ষে ইহা অশোভনীয়। কেবল আমার নহে, অধিকাংশ দেশবাসীর মতও ইহাই। মডারেটগণ যে ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎসাদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই ভীরুতাও তাহার অন্যতম কারণ। মডারেট দল সম্মিলিত ভাবে কংগ্রেস বয়কট করিবার পর শ্রীযুত শাস্ত্রী কয়েকটি অধিবেশনে যোগ দিয়া তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন; এই কারণে তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধাও লাভ করিয়াছিলেন।

মহাযুদ্ধের প্রথমভাগে আমার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বা জনহিতকর কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। আমি সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিতাম না। বক্তৃতা করিতে আমার ভয় ও সঙ্কোচ বোধ হইত। আমি জনসভায় ইংরেজীতে বক্তৃতা করা পছন্দ করিতাম না, কিন্তু হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা করিবার নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধেও সন্দিহান ছিলাম। এই কালের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মনে পড়ে। ১৯১৫ সালে, ঠিক তারিখ মনে নাই, আমি এলাহাবাদের এক জনসভায় প্রথম বক্তৃতা করি। সংবাদপত্র দমনের নূতন আইনের প্রতিবাদে ঐ সভা আহূত হয়। আমি সংক্ষেপে ইংরাজীতে কিছু বলিলাম। সভার শেষে সকলের সম্মুখে বক্তৃতামঞ্চের উপর আমাকে বিব্রত ও অপ্রস্তুত করিয়া ডাঃ তেজবাহাদুর সপ্রু আমাকে আলিঙ্গন ও

চুম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ইহা আমার বক্তব্য বিষয় অথবা বলিবার ভঙ্গীর জন্য নহে, তাঁহার আনন্দের কারণ এই যে, জনসাধারণের কাজে আর একজন নূতন কর্মী পাওয়া গেল। তখন জনসাধারণের কাজ বলিতে বক্তৃতা করাই বুঝাইত। এই কালে আমরা অর্থাৎ এলাহাবাদের অনেক যুবক মনে করিতাম, ডাঃ সপ্রু রাজনীতিক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রগামী মতের অনুসরণ করিবেন। সহরের মডারেটদের মধ্যে তিনিই ছিলেন ভাবপ্রবণ এবং সময় সময় অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া উঠিতেন, তাঁহার সহিত তুলনায় পিতাকে অত্যন্ত শীতল মনে হইত; যদিও বাহ্য আবরণের অন্তরালে প্রচুর অগ্নি ছিল। কিন্তু পিতার ইচ্ছাকে অবনমিত করার আশা আমরা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম এবং কার্যতঃ ডাঃ সপ্রুর নিকটই অধিক প্রত্যাশা করিতাম। দীর্ঘকাল জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকেও আমরা শ্রদ্ধা করিতাম, তাঁহার সহিত প্রায়ই দীর্ঘ আলোচনা করিতাম; নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সাহসিকতার পথে দেশকে পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতাম।

এই সময় আমাদের গৃহে রাজনীতি আলোচনা বড় শান্তির ব্যাপার ছিল না। প্রায়ই আলোচনা গুরুতর আকার ধারণ করিত এবং আবহাওয়া গরম হইয়া উঠিত। আমি বাক্যমাত্রে পর্যবসিত রাজনীতির সমালোচনা এবং কর্মের আগ্রহ প্রকাশ করিতাম দেখিয়া পিতা বুঝিতে পারিলেন আমি ক্রমশঃ চরমপন্থী হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু কার্যতঃ কি করা উচিত, তাহা আমার নিকট স্পষ্ট ছিল না; পিতা অনুমান করিলেন, কতিপয় বাঙ্গালী যুবকের মত আমিও হিংসাপন্থী হইয়া পড়িতেছি। ইহাতে পিতা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। কিন্তু কার্যতঃ আমার ও পথে আকর্ষণ ছিল না। বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থার বশ্যতা স্বীকার না করিয়া কিছু করা কর্তব্য, এই চিন্তায় আমি ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিলাম। সমগ্র জাতির কল্যাণে কোন সাফল্যপূর্ণ কার্য সহজ মনে হইত না বটে, তবে কি ব্যক্তির জীবনে কি জাতির জীবনে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামশীল মনোভাব পোষণ করা আত্মমর্যাদা ও জাতীয় মর্যাদার দ্যোতক বলিয়া মনে হইত। মডারেটনীতিতে বিরক্ত পিতার মধ্যেও মানসিক দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। কিন্তু কোন পথ সম্বন্ধে যে পর্যন্ত না তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হন, ততক্ষণ ক্ষেত্র পরিবর্তন করিবার মত লোক তিনি ছিলেন না। তাঁহার প্রত্যেক পদক্ষেপের পশ্চাতে রহিয়াছে, মানসিক সংগ্রামের তিক্ত ও কঠিন অভিজ্ঞান। নিজের প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন, পশ্চাতে ফিরিবার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া। কোন সাময়িক উত্তেজনার বশে নহে, বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়াই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার তীব্র আত্মমর্যাদাজ্ঞান আর তাঁহাকে পিছনে চাহিবার অবসর দেয় নাই।

মিসেস বেশান্তের অন্তরীণ হইতেই তাঁহার রাজনৈতিক মত পরিবর্তিত হইতে থাকে; ক্রমে তিনি তাঁহার মডারেট সঙ্গীদের পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইলেন। অবশেষে ১৯১৯র পাঞ্জাবের বিষাদপূর্ণ ঘটনা তাঁহাকে আইন-ব্যবসায় ও অভ্যস্ত জীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিল। তিনি গান্ধিজী প্রবর্তিত নূতন আন্দোলনের সহিত নিজের ভাগ্যসূত্র গাঁথিয়া লইলেন।

কিন্তু ইহা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। ১৯১৫-১৬—এই সময় তিনি কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। একদিকে সংশয়সঙ্কুলতা, অন্যদিকে আমার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা—এই মানসিক অবস্থায় তিনি কোন বিষয়ে ধীরভাবে আলোচনা করিতে পারিতেন না। প্রায়ই তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিত, আমাদের আলোচনা সহসা বন্ধ হইয়া যাইত।

১৯১৬র বড়দিনে লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে গান্ধিজীর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ

হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম, কিন্তু আমাদের মত যুবকদের নিকট তিনি সুদূর স্বতন্ত্র এবং রাজনীতির সহিত সম্পর্কহীনরূপেই প্রতিভাত হইতেন। তখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা ব্যতীত, কংগ্রেসে জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কিত কোন আলোচনায় যোগ দিতেন না। ইহার কিছুকাল পরে চম্পারণ জিলায় নীলকরদের বিরুদ্ধে তাঁহার পরিচালনায় কৃষক আন্দোলনের সাফল্য দেখিয়া আমরা উৎসাহিত হইলাম। আমরা বুঝিলাম, তিনি তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার অবলম্বিত উপায় ভারতেও প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং তাহাতে সাফল্যের সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর, এলাহাবাদে সরোজিনী নাইডুর কয়েকটি আবেগময়ী বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই বক্তৃতাগুলিতে জাতীয়ভাব ও দেশাত্মবোধের পরিপূর্ণ প্রেরণা ছিল। আমি এই কালে খাঁটি জাতীয়তাবাদী হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার কলেজ-জীবনের অস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক ভাবগুলি প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। ১৯১৬ সালে আইরিশ-নেতা রোজার কেস্‌মেণ্ট বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া যে অপূর্ব বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা যেন উজ্জ্বল অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিল, পরাধীন জাতির সন্তানকে কি ভাবে অনুভব করিতে হয়। আয়র্ল্যাণ্ড ঈস্টার বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরও কি সে অপূর্ব সাহসিকতা, যাহা ব্যর্থতাকে ব্যঙ্গ করিয়া জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিতে পারে, কোন বাহুবল জাতির অপরাজিত আত্মাকে ধ্বংস করিতে পারে না।

আমার তৎকালীন এই মানসিক অবস্থার মধ্যেও আমি নূতন করিয়া সমাজতান্ত্রিক গ্রন্থ পড়িতে লাগিলাম, এবং সুপ্ত প্রাচীনভাবগুলি পুনরায় মস্তিষ্কে আলোড়ন উপস্থিত করিল। কিন্তু ইহা অস্পষ্ট, মানবতা ও আদর্শবাদ মাত্র, খাঁটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ নহে। মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পরেও বারট্রাণ্ড রাসেলের বইগুলি পড়িতে আমার খুব ভাল লাগিত।

এই সকল চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত মানসিক দ্বন্দ্বে আমি আইন ব্যবসায়ের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। আর কিছু করিবার নাই বলিয়াই ইহাতে লিপ্ত রহিলাম, কিন্তু আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, আমার চিত্ত জনসাধারণের কাজে বিশেষতঃ সংঘর্ষমূলক রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য যেরূপ ব্যাকুল, তাহার সহিত আইনজীবীর কর্তব্যের সামঞ্জস্য হইবে না। ইহা কোন নীতির প্রশ্ন নহে, সময় ও শক্তির প্রশ্ন। কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবহারজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষ, কি কারণে জানি না, আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ হইয়াছিলেন, আইনব্যবসায়ে কি করিয়া উন্নতি করিতে হয়, সে বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। বিশেষভাবে, তিনি আমাকে আমার পছন্দমত আইনবিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, নবীনদের পক্ষে নিজেকে প্রস্তুত করিবার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তিনি আমাকে গ্রন্থ লিখিতে সাহায্য করিবেন এবং উহা সংশোধন করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাঁহার এই আগ্রহ সমস্তই নিষ্ফল হইল, কেননা, আইনের বই লিখিয়া সময় ও শক্তির অপব্যবহার করিবার মত বিরক্তিকর কিছু আমি ভাবিতেই পারি না।

বৃদ্ধ বয়সে স্যার রাসবিহারীর মেজাজ অত্যন্ত খিট্‌খিটে হইয়াছিল; অল্পেই তিনি ধৈর্য হারাইতেন, এজন্য 'জুনিয়র ব্যারিস্টারেরা' তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। তাঁহার দুর্বলতা ও ত্রুটী সত্ত্বেও, তাঁহার মধ্যে আকর্ষণের অনেক কিছু ছিল এবং আমার তাঁহাকে ভাল লাগিত। পিতা এবং আমি সিমলায় একবার তাঁহার অতিথি হইয়াছিলাম, (১৯১৮ সাল, তখন সবেমাত্র মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত

হইয়াছে) একদিন তিনি নৈশভোজনে কয়েকজন বন্ধুকে আহ্বান করেন, তাহার মধ্যে মিঃ খাপার্দেও ছিলেন। ভোজনান্তে স্যার রাসবিহারী ও মিঃ খাপার্দের তর্কযুদ্ধ মুখর হইয়া উঠিল। একজন হইলেন খাঁটি মডারেট এবং মিঃ খাপার্দে তৎকালে একজন প্রধান তিলক-পন্থী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। পরবর্তী কালে অবশ্য তিনি ঘুঘুর মত নিরীহ এবং মডারেট অপেক্ষাও মডারেট হইয়াছিলেন। মিঃ খাপার্দে, গোখ্লের (কয়েক বৎসর পূর্বে মৃত) সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন, তিনি ছিলেন ব্রিটিশ গুপ্তচর; একবার লণ্ডনে তিনি আমার পিছনে লাগিয়াছিলেন। স্যার রাসবিহারী এই মন্তব্য বরদাস্ত করিতে পারিলেন না, তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, গোখ্লে তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু এবং তাঁহার মত উন্নতহৃদয় ব্যক্তি তিনি অল্পই দেখিয়াছেন, এহেন লোকের বিরুদ্ধে এমন কথা তিনি কিছুতেই মানিবেন না। তখন তিনি তুলিলেন শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর কথা। যদিও স্যার রাসবিহারী এ প্রসঙ্গও পছন্দ করিলেন না, তবে পূর্বের ন্যায় ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তিনি শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে যে গোখ্লের ন্যায় শ্রদ্ধা করেন না, ইহা স্পষ্টই বোঝা গেল। তিনি বলিলেন, যতদিন গোখ্লে জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি সার্ভেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পর উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তারপর মিঃ খাপার্দে তুলনা করিযা তিলকের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, ইঁনি একজন প্রকৃত পুরুষসিংহ, ইঁহার ব্যক্তিত্ব অতি প্রখর এবং ইঁনি একজন প্রকৃত সাধু। "সাধু?" স্যার রাসবিহারী দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "সাধুদের আমি ঘৃণা করি, উহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।"

৬

আমার বিবাহ ও হিমালয় ভ্রমণ

১৯১৬ সালে দিল্লী সহরে আমার বিবাহ হয়। সেদিন বাসন্তী পঞ্চমী,—বসন্ত ঋতুর প্রথম দিবস। এই বৎসর গ্রীষ্মকালে আমরা কাশ্মীরে কাটাইয়াছি। আমাদের পরিবারবর্গ উপত্যকায় রহিলেন। আমি ও আমার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা কয়েক সপ্তাহ পর্বতমালার মধ্য দিয়া লাডকের রাস্তা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। জগতের উর্ধ্বলোকে সঙ্কীর্ণ নির্জন গিরিপথে ভ্রমণের ইহাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, এই পথ দূরে তিব্বতের মালভূমি পর্যন্ত প্রসারিত। জোজিলা গিরিসঙ্কটের শীর্ষে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, নিম্নে শ্যামল গিরিমালা, উর্ধ্বে নিরাবরণ হিমশীতল শৃঙ্গরাজি। আমরা উর্ধ্বে উঠিতে লাগিলাম, সঙ্কীর্ণ পথ, দুই দিকে তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, সম্মুখে চিরতুষার। বাতাস শীতল তীক্ষ্ণস্পর্শ হইলেও দিবাভাগে সূর্যতাপ মনোরম। বাতাস এত স্বচ্ছ যে কোনও বস্তুর দূরত্ব সম্বন্ধে ভ্রম হয়। যাহাকে নিকটবর্তী বলিয়া মনে হইতেছে, বস্তুতঃ তাহা বহুদূরে। ক্রমে আমরা অগ্রসর হইলাম। পথ তরুগুল্মহীন, উলঙ্গ পর্বত বরফে আচ্ছন্ন। কচিৎ কোথাও নয়নানন্দকর পুষ্পসম্ভার। প্রকৃতির বন্য নির্জনতায় এক অপূর্ব তৃপ্তিলাভ করিলাম; আমার শিরায় শিরায় শক্তির অনুভূতি, হৃদয়ে আনন্দের উচ্ছ্বাস।

এই ভ্রমণকালে আমি এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। জোজিলা গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিবার পর সন্ডংক্ত মাতায়নে আসিয়া শুনিলাম বিখ্যাত

অমরনাথ গুহা মাত্র আট মাইল দূরে। সম্মুখে ছিল তুষার-মৌলি এক বৃহৎ পর্বত, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? আট মাইল কত সামান্য। অনভিজ্ঞতাজনিত উৎসাহে আমরা যাত্রা স্থির করিলাম। আমাদের বস্ত্রাবাস (সমুদ্র তীর হইতে ১১৫০০ ফুট ঊর্ধ্বে স্থাপিত) ত্যাগ করিয়া আমরা ক্ষুদ্র দলটি লইয়া পর্বতে উঠিতে লাগিলাম। স্থানীয় এক মেষপালক আমাদের পথপ্রদর্শক হইল।

কতকগুলি তুষার চাপ আমরা দড়ির সাহায্যে অতিক্রম করিলাম, ক্রমে পথক্লেশ বাড়িতে লাগিল, শ্বাসকষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের কয়েকজন কুলির বোঝা ভারী না থাকা সত্ত্বেও নাকমুখ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ক্রমে বরফ পড়িতে লাগিল, তুষারবর্ত্মও পিচ্ছিল হইয়া উঠিল। আমরা অবসন্ন দেহে অত্যন্ত ক্লেশ ও সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তথাপি নির্বোধ জিদ ছাড়িতে পারিলাম না। ভোর চারিটার সময় আমরা বস্ত্রাবাস ত্যাগ করিয়াছিলাম। বার ঘণ্টা অবিশ্রান্ত পর্বত আরোহণ করিয়া এক বৃহৎ তুষারক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। চারিদিকে তুষারপর্বত বেষ্টিত এই রম্যভূমি যেন একটি মণিখচিত মুকুট অথবা একখণ্ড দেবলোক। কিন্তু সহসা বরফ পড়িতে লাগিল। কুয়াসায় এই মনোহর দৃশ্য ঢাকিয়া গেল। আমার ধারণা আমরা ১৫ কি ১৬ হাজার ফুট ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিলাম। এমন কি আমরা অমরনাথ গুহা ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়া পড়িয়াছি। এখন আমাদিগকে অর্ধমাইলব্যাপী তুষারক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া গুহার অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইতে হইবে। এবার আর চড়াই নাই এই আশ্বাসে কতকটা লঘু হৃদয়ে আমরা যাত্রা করিলাম। কিন্তু ইহাতেও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। পথে বহুতর ফাটল এবং সদ্যপতিত বরফে আবৃত বিপদসঙ্কুল স্থান ছিল। সদ্যপতিত বরফই আমাকে ব্যর্থমনোরথ করিল। কেবল পা বাড়াইয়াছি, নূতন বরফ সরিয়া গেল, আমি এক বৃহৎ খালের মধ্যে পড়িলাম। সেই অতলে যদি তলাইয়া যাইতাম তাহা হইলে আমার দেহ ভবিষ্যতের ভৌগোলিক যুগের জন্য বরফে সুরক্ষিত থাকিত। এক হাতে দড়ি ও অন্য হাতে পর্বতগাত্রের প্রান্ত ধরিয়া সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। সঙ্গীরা আমাকে টানিয়া তুলিল। আমরা ঘাবড়াইয়া গেলাম কিন্তু সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম না। ক্রমে তুষারের ফাটল সংখ্যায় অধিক ও বিস্তীর্ণ হইয়া দেখা দিতে লাগিল, ঐগুলি উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত কোনও সাজসরঞ্জাম আমাদের ছিল না। অগত্যা শ্রান্ত ও ক্লান্তদেহে নৈরাশ্য লইয়া আমাদের ফিরিতে হইল, অমরনাথ গুহা আর দেখা হইল না।

কাশ্মীরের গিরি অরণ্য উপত্যকা এমনভাবে আমাকে মুগ্ধ করিল যে, সঙ্কল্প করিলাম শীঘ্রই পুনরায় ফিরিয়া আসিব। তারপর তিব্বতের মনোহর মানসসরোবর তুষারশৃঙ্গ কৈলাসগিরি দর্শনলালসা আমাকে কত দিন অধীর করিয়া তুলিয়াছে; কত ভ্রমণতালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্তু আঠার বৎসরেও সে সাধ পূর্ণ হয় নাই! এমন কি, যে কাশ্মীর দেখিবার জন্য প্রায়ই আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, ক্রমশঃ রাজনীতি ও জনসাধারণের জটিল কাজে জড়াইয়া পড়িয়া সে সাধও পূর্ণ করিতে পারি নাই; পর্বতারোহণ কিম্বা সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়া আমার ভ্রমণতৃষ্ণা কারাগারে আসিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু এখনও মনে মনে অনেক সঙ্কল্প করি। কারাগারে কেহ আমাকে এ আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না এবং কল্পনা ছাড়া কারাগারে আর কি-ই বা করিবার আছে? আমার ঈপ্সিত সেই সরোবর সেই পর্বত দেখিবার জন্য আমি যেদিন হিমগিরির ক্রোড়ে ভ্রমণ করিব, আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু জীবন বহিয়া চলিয়াছে,—যৌবনও চলিয়াছে প্রৌঢ়ত্বের অভিমুখে, তাহাও পরিণামে একদিন বার্ধক্য আনিবে, তখন কি কৈলাস

কি মানসসরোবর—ভ্রমণের সামর্থ্য থাকিবে না, কিন্তু যদি তাহা নাও দেখিতে পাই তথাপি কল্পনায় আনন্দ আছে।

"আমার মানসপটে ঐ পর্বতশিখর অটলোন্নত। সন্ধ্যারক্তরাগে তাহাদের দুর্গম দুরারোহ স্থানগুলি আবৃত। এবং আমার আত্মা আঁখিপ্রান্তে বসিয়া সেই চিরশান্ত তুষার তৃষ্ণায় অধীর।" —ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার।

৭

গান্ধিজীর অভ্যুদয়—সত্যাগ্রহ ও অমৃতসর

মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষে এক অবরুদ্ধ উত্তেজনা দেখা গেল। কলকারখানা প্রসারলাভ করিয়াছে,—ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য বর্ধিত হইয়াছে। শীর্ষস্থানীয় এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তি অধিকতর ক্ষমতার জন্য লুব্ধ এবং অধিকতর উপার্জনের আশায় সঞ্চিত অর্থ খাটাইবার সুবিধা খুঁজিতে ব্যস্ত। এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত বিশাল জনসঙ্ঘ যে দুর্বহ ভারে পিষ্ট হইতেছিল তাহা হইতে মুক্তির আশায় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সর্বত্র শাসনতন্ত্রের এক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, যাহা দ্বারা কতক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন পাওয়া যাইবে এবং তাহার ফলে অনেক নূতন কর্ম জুটিবে, অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইবে। শান্তিপূর্ণ ও সম্পূর্ণরূপে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতির বিষয় লোকে আলোচনা করিতেছিল। আনুষঙ্গিক কিছু অশান্তি জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করিয়া কৃষকদের মধ্যে দেখা যাইতেছিল। পাঞ্জাবের পল্লীঅঞ্চলে বলপূর্বক রংরুট সংগ্রহের তিক্তস্মৃতি তখনও বিদ্যমান। "কামাগাটা মারু" জাহাজে আগত পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে দলননীতি ও অপরাপর ষড়যন্ত্রের মামলায় অসন্তোষ বিস্তৃত হইয়াছিল। বৈদেশিক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত সৈনিকেরা আর পূর্বের মত যন্ত্রবৎ আদেশপালনকারী নহে। তাহাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছিল ও তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ ছিল। তুরস্কের প্রতি ব্যবহার ও খিলাফৎ সমস্যা লইয়া মুসলমানদের মধ্যেও ক্রোধ ও উত্তেজনার সঞ্চার হইতেছিল। তুরস্কের সহিত সন্ধিপত্র তখন স্বাক্ষরিত হয় নাই বটে, কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব বুঝা যাইতেছিল। এই কারণে তাহারা উত্তেজিত হইয়াও তখনও অপেক্ষা করিতেছিল।

ভয় ও উৎকণ্ঠামিশ্রিত আশা লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ এক বৃহৎ প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় রাওলাট বিল আসিল। ইহার মধ্যে প্রচলিত আইনের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বিনা বিচারে গ্রেফ্‌তার ও বন্দী করিবার ধারা ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে এক ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের তরঙ্গ উঠিল, এমন কি মডারেটগণ পর্যন্ত সমস্ত শক্তি লইয়া এই প্রতিবাদে যোগ দিলেন। সকল শ্রেণীর সকল মতের ভারতবাসীর এই দেশব্যাপী প্রতিবাদ সত্ত্বেও শাসকগণ এই বিল আইনে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। তবে জনমতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য উহার পরমায়ু মাত্র তিন বৎসর করা হইল। আজ পনর বৎসর পরে এই বিল ও তৎসংক্রান্ত আন্দোলনের কথা চিন্তা করিলে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। ঐ বিল আইনে পরিণত হইবার তিন বৎসরের মধ্যে কখনও উহা প্রয়োগ করা হয় নাই, অথচ এই তিন বৎসরে যে অশান্তি আলোড়ন দেখা গিয়াছে ১৮৫৭র বিদ্রোহের পর ভারতে

আর তাহা দেখা যায় নাই। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সম্মিলিত জনমত অগ্রাহ্য করিয়া যে আইন পাশ করিলেন, অথচ প্রয়োগ করিলেন না—তাহাই এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। অশান্তি সৃষ্টি করাই এই শ্রেণীর আইনের উদ্দেশ্য যে-কেহ এইরূপ ভাবিতে পারে! আজ পনর বৎসর পরেও আমরা দেখিতেছি, রাউলাট আইন অপেক্ষাও কঠোর বহুতর আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে এবং তাহার প্রয়োগও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। যে সকল নূতন আইন ও অর্ডিনান্সের আওতায় আমরা ব্রিটিশ শাসনের আশীর্বাদ লাভ করিতেছি তাহাদের সহিত তুলনায় রাউলাট বিল তো স্বাধীনতার ছাড়পত্র। অবশ্য তখনকার সহিত তুলনায় এখন পার্থক্য অনেক বেশী। ১৯১৯ সাল হইতে আমরা মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড পরিকল্পনানুযায়ী এক দফা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেছি, এখন শুনিতেছি আর এক দফা পাইবার সময় আসন্ন। আমরা উন্নতি লাভ করিতেছি!

১৯১৯র প্রথমভাগে গান্ধিজীর কঠিন পীড়া হয়। তিনি রোগশয্যা হইতে বড়লাটের নিকট আবেদন করেন যে, তিনি যেন রাউলাট বিলে সম্মতিদান না করেন। অন্যান্যের মত এই আবেদনেও উপেক্ষা প্রদর্শিত হইল। গান্ধিজী নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রথম নিখিল ভারতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি সত্যাগ্রহ সভা স্থাপন করিলেন। সদস্যগণ রাউলাট আইন ও কতকগুলি নির্দিষ্ট দুর্নীতিমূলক আইন অমান্য করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা স্বেচ্ছায় প্রকাশ্যভাবে কারাবরণ করিবেন।

এই প্রস্তাব প্রথম যখন আমি সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম তখন আমার মন হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। অবশেষে পথের সন্ধান মিলিল। এই স্পষ্ট সরল কর্মপদ্ধতি হয় তো বা কার্যকরী হইতে পারে। আমি উৎসাহে মাতিয়া উঠিলাম, অবিলম্বে সত্যাগ্রহ সভায় যোগ দিবার সংকল্প করিলাম। আইনভঙ্গ কারাগমন প্রভৃতির পরিণাম কি, সে চিন্তাও মনে হইল না। আমার মনে হইল যেন কিছুই গ্রাহ্য করি না। কিন্তু সহসা আমার উৎসাহ নিভিয়া গেল। আমি বুঝিলাম ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আমার পিতা এই নূতন ভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। নূতন কিছু লইয়া সহসা মাতিয়া উঠা তাঁহার স্বভাব নহে। অগ্রসর হইবার পূর্বে তিনি সাবধানতার সহিত ভাবিবাৎ চিন্তা করেন। সত্যাগ্রহ সভা ও তাহার কার্যপদ্ধতি তিনি যত চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই ইহা তাঁহার অপছন্দ হইতে লাগিল। কতকগুলি লোক জেলে গেলে কি লাভ হইবে এবং গভর্ণমেণ্টের উপরই বা তাহার প্রভাব কতটুকু। ইহা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহার মন সায় দিল না। আমি জেলে যাইব ইহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে হইল। তখনও জেলে যাওয়ার পালা শুরু হয় নাই এবং ধারণা অত্যন্ত বিরক্তিকর ছিল। পিতা তাঁহার সন্তানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তাঁহার স্নেহ বাহিরে প্রকাশ পাইত না। কিন্তু সংযমের অন্তরালে তাহা অত্যন্ত গভীর ছিল।

কিছুদিন ধরিয়া মানসিক দ্বন্দ্ব চলিল এবং উভয়েই অনুভব করিলাম যে বৃহৎ একটা কিছু আসিতেছে যাহা আমাদের বর্তমান জীবনের ধারাকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিবে। আমরা পরস্পরের মনোভাব সম্পর্কে যথাসম্ভব সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলাম। যদি পারিতাম তাহা হইলে তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা লাঘব করিতাম কিন্তু আমার চিত্তও সত্যাগ্রহকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। আমরা উভয়েই সন্তপ্তচিত্তে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। মর্মবেদনায় কাতর হইয়া রাত্রির পর রাত্রি আমি বহুক্ষণ ভ্রমণ করিতাম —কোন পথে মুক্তি? আর পিতা—আমি পরে আবিষ্কার করিলাম—রাত্রে মেঝেতে

শ্ইয়া পরীক্ষা করিতেন আমি কারাগারে গেলে কঠিন ম্ত্তিকাশয়নে কির্প বেদনা পাইব!

পিতার অন্রোধে গান্ধিজী এলাহাবাদে আসিলেন। উভয়ের মধ্যে আলোচনা-কালে আমি উপস্থিত ছিলাম না। এই আলোচনার ফলে গান্ধিজী আমাকে এই বিষয় লইয়া তাড়াতাড়ি কিছ্ করিতে অথবা পিতার মনে আঘাত করিতে নিষেধ করিলেন। আমি ইহাতে খ্সী হইলাম না কিন্তু ভারতে তাহার পর যে সব ঘটনা ঘটিল তাহার ফলে অবস্থার পরিবর্তন হইল এবং সত্যাগ্রহ সভার কার্য বন্ধ হইয়া গেল।

সত্যাগ্রহ দিবস—নিখিল ভারত হরতাল এবং সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ—দিল্লী ও অম্তসরে প্লিশ ও সৈন্যদলের গ্লিবর্ষণ—বহ্লোক হতাহত—অম্তসর এবং আহম্মদাবাদে জনতার উপদ্রব—জালিয়ানালাবাগের হত্যাকাণ্ড—পাঞ্জাবে সামরিক আইনের ভয়াবহ অত্যাচার ও অপমান। পাঞ্জাব সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। বহির্জগতের দ্ষ্টির বাহিরে কি ঘটিতেছে কিছ্ই বোঝা গেল না। পাঞ্জাবের কোন সংবাদ পাওয়া দ্র্হ হইয়া উঠিল, পাঞ্জাবে গমনাগমন নিষিদ্ধ হইল। যে দ্ই-চারিজন ব্যক্তি সেই নরক হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহারা এত ভীতিবিহ্বল যে কোন ঘটনারই পরিষ্কার বিবরণ দিতে পারিল না। অসহায় অক্ষমের মত আমরা তিক্ত হ্দয়ে সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম মাত্র। আমরা কেহ কেহ সামরিক আইনের বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ্যভাবে পাঞ্জাবের পীড়িত অঞ্চলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলাম কিন্তু আমাদিগকে নিবারণ করা হইল এবং ইতিমধ্যে সাহায্য প্রদান এবং অন্সন্ধান করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একটি শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইল। প্রধান প্রধান অঞ্চলে সামরিক আইন প্রত্যাহ্ত এবং প্লিশের বাধা অপসারিত হইবামাত্র বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা এবং অন্যান্য সকলে পাঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। সাহায্যদান এবং অন্সন্ধান কার্যের স্চনা হইল।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সাহায্যপ্রদানের ভার লইলেন, অন্সন্ধানের ভার প্রধানতঃ আমার পিতা ও চিত্তরঞ্জন দাশের উপর অর্পিত হইল। গান্ধিজীও পরিদর্শন করিতে লাগিলেন এবং সকলে প্রয়োজন মত তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দেশবন্ধ্ দাশ বিশেষভাবে অম্তসর অঞ্চলের ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নির্দেশ অন্সারে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আমাকে তাঁহার সহকারী নিয্ক্ত করা হইল। তাঁহার সহিত একত্রে এবং তাঁহার অধীনে কার্য করার স্যোগ আমার জীবনে এই প্রথম আসিল। ম্ল্যবান অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও বর্ধিত হইল। জালিয়ানালাবাগ এবং যে গলিতে মান্ষকে ব্কে হাঁটিয়া চলিতে বাধ্য করা হইত তৎসম্পর্কিত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের সম্ম্খেই গ্হীত হইয়াছিল এবং পরে তাহা কংগ্রেস অন্সন্ধান সমিতির রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। আমরা তথাকথিত বাগটি বহ্বার পরিদর্শন করিয়াছি এবং ইহার প্রত্যেক অংশ তন্নতন্ন করিয়া অন্সন্ধান করিয়াছি।

কথা উঠিয়াছিল, মনে হয় মিঃ এডওয়ার্ড টমসনই কথাটা তুলিয়াছিলেন যে, জেনারেল ডায়ারের ধারণা ছিল, বাগ হইতে বাহির হইবার অন্য পথ আছে, এই কারণেই তিনি দীর্ঘকাল গ্লিবর্ষণ করিয়াছিলেন। এমন কি, তাহাই যদি ডায়ারের ধারণা হয় এবং কার্যতঃ নির্গমন পথ থাকিয়াই থাকে, তব্ তাঁহার দায়িত্ব লঘ্ হয় না। তাঁহার এর্প ধারণা ছিল ইহা অতি আশ্চর্যের কথা। তিনি যে উচ্চভূমির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন সেখানে যে-কেহ দাঁড়াইলে সমস্তটা মাঠ পরিষ্কারর্পে

দেখিতে পাইবে এবং আরও দেখিবে, স্থানটি চারিদিকে কয়েকতলা উঁচু বাড়ীতে ঘেরা। কেবল একশত ফুটের মত জায়গায় কোন বাড়ী ছিল না, পাঁচ ফুট উচ্চ দেয়াল ছিল। যখন অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণে মরণাহত জনতা পলাইবার পথ পাইল না তখন সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রাচীরের দিকে ধাবিত হইল এবং উহা লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিল, জনতার পলায়ন বন্ধ করিবার জন্য দেয়ালের দিকে লক্ষ্য করিয়া (আমাদের গৃহীত সাক্ষ্য হইতে এবং প্রাচীরে অসংখ্য বুলেটের দাগ হইতে) গুলিবর্ষণ করা হইয়াছিল।

ঘটনার অবসানে দেয়ালের দুই পার্শ্বে হতাহত নরদেহ বড় বড় স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। বৎসরের শেষে (১৯১৯) আমি অমৃতসর হইতে রাত্রির ট্রেনে দিল্লী আসিতেছিলাম, কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উপরের একখানি বার্থ ব্যতীত আর সবগুলিই নিদ্রিত যাত্রীরা দখল করিয়া ফেলিয়াছেন। আমি উপরের খালি বার্থ দখল করিলাম। প্রভাতে দেখিলাম আমার সহযাত্রী সকলেই সামরিক কর্মচারী, তাঁহাদের মধ্যে একজন বড় গলায় অহঙ্কারের স্বরে কথা বলিতেছিলেন। আমার চিনিতে বিলম্ব হইল না যে ইনিই ডায়ার—জালিয়ানালাবাগের বীর। তিনি অমৃতসরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছিলেন, কেমন করিয়া সমস্ত সহর তাহার করায়ত্ত হইয়াছিল, বিদ্রোহী নগরীকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিবার কি আগ্রহ তিনি অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু কেবল করুণা বশতঃই তাহা করেন নাই। বুঝিলাম, তিনি হাণ্টার অনুসন্ধান কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়া লাহোর হইতে ফিরিতেছেন। তাঁহার নির্মম হাবভাব ও কথাবলার ভঙ্গীতে আমি মর্মাহত হইলাম। লাল ডোরাকাটা পায়জামা ও ড্রেসিংগাউন পরিয়া তিনি দিল্লী স্টেশনে নামিলেন।

পাঞ্জাবে অনুসন্ধানকালে গান্ধিজীকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমাদের কমিটিতে তিনি প্রায়ই এমন অভিনব প্রস্তাব তুলিতেন যে, কমিটি তাহা অনুমোদন করিতে পারিতেন না কিন্তু তিনি যুক্তিতর্ক সহকারে ঐগুলি গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন এবং পরবর্তী ঘটনায় তাঁহার দূরদর্শিতা আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির উপর আমার বিশ্বাস জন্মিল।

পাঞ্জাবের ঘটনা এবং অনুসন্ধান আমার পিতার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। তাঁহার আইন ও নিয়মতন্ত্রনিষ্ঠার দৃঢ়ভিত্তি ইহাতে বিচলিত হইল। তাঁহার মন পরবর্তীকালের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে তিনি প্রাচীন মডারেটীয় ভূমি হইতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এলাহাবাদের প্রধান মডারেট সংবাদপত্র 'দি লীডার'-এর উপর বিরক্ত হইয়া তিনি ১৯১৯-এর গোড়ায় এলাহাবাদ হইতে 'দি ইন্‌ডিপেণ্ডেন্ট' নামক একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কাগজখানি জনপ্রিয়তার দিক দিয়া সাফল্য লাভ করিল।

কিন্তু সূচনা হইতেই পরিচালনা ব্যাপারে এক আশ্চর্য অক্ষমতা ইহার প্রতিষ্ঠার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই পত্রিকার সহিত জড়িত ডাইরেক্টরগণ, সম্পাদকগণ এবং কার্যপরিচালনা বিভাগ সকলেই ইহার জন্য অল্পবিস্তর দায়ী। আমিও ইহার একজন ডাইরেক্টর ছিলাম। কিন্তু এই কাজে আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। সমস্ত ঝঞ্ঝাট, কাগজ সংক্রান্ত গণ্ডগোলের নৈশ দুঃস্বপ্নের মত আমাকে ভারাক্রান্ত করিল। আমি এবং পিতা পাঞ্জাবে চলিয়া গেলাম। আমাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতির মধ্যে কাগজের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া অবশেষে উহা অর্থসঙ্কটে পতিত হইল। ১৯২০-২১এ যদিও ইহা একবার মাথাচাড়া দিয়াছিল, কিন্তু এই আঘাত সামলাইতে পারিল না। অবশেষে ১৯২৩এ ইহা বন্ধ

হইয়া গেল; সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর অভিজ্ঞতা আমার চিত্তে যে ভীতির সঞ্চার করিল, তাহার ফলে সংবাদপত্রের ডাইরেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আমি বরাবর অস্বীকার করিয়াছি। অবশ্য কারাগার এবং বাহিরের অন্যান্য কার্যে উহা করা আমার পক্ষে সম্ভবপরও ছিল না।

১৯১৯-এর বড়দিনে পিতা অমৃতসর কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। পাঞ্জাবের সামরিক আইনের ফলে যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য পিতা 'মডারেট' ও 'লিবারেল'দিগের নিকট আবেগময় আবেদন প্রেরণ করিলেন। (এখন হইতে 'মডারেটগণ' নিজেদের 'লিবারেল' এই নামে পরিচয় দিতে লাগিলেন)। পিতা লিখিলেন, "পাঞ্জাবের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়" তাঁহাদের আহ্বান করিতেছে। কিন্তু পিতা অভিপ্রেত উত্তর পাইলেন না। মডারেটগণ যোগ দিতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহারা তখন নূতন 'রিফর্মের' প্রতি লালায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এই প্রত্যাখ্যানে পিতা আহত হইলেন এবং তাঁহার ও লিবারেলদের মধ্যে ব্যবধান বিস্তৃততর হইল।

অমৃতসর কংগ্রেস প্রথম গান্ধী কংগ্রেস। লোকমান্য তিলকও এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিনিধি এবং সমবেত বিশাল জনতা যে গান্ধিজীর নেতৃত্বের জন্যই উৎসুক হইতেছিল তাহাতে লেশ মাত্রও সন্দেহ ছিল না। "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" ধ্বনিতে এই সময় হইতেই ভারতীয় রাজনৈতিক গগন মুখরিত হইতে থাকে। সদ্য অন্তরীণমুক্ত আলী-ভ্রাতৃদ্বয় আসিয়া কংগ্রেসে যোগদান করিলেন এবং জাতীয় আন্দোলন নূতন সুরে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

মহম্মদ আলী শীঘ্রই খিলাফত ডেপুটেশন লইয়া ইয়োরোপে চলিয়া গেলেন। ভারতীয় খিলাফত কমিটি ক্রমে ক্রমে গান্ধিজীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার অহিংস অসহযোগের ভাব লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিল। ১৯২০-এর জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে খিলাফত নেতৃবৃন্দ ও মৌলবী উলেমাদের একটি সভার কথা আমার মনে আছে। কথা হইল, বড়লাটের নিকট এক খিলাফত ডেপুটেশন প্রেরিত হইবে, গান্ধিজীও তাহাতে যোগ দিবেন। গান্ধিজী দিল্লী আসিবার পূর্বেই প্রচলিত নিয়মানুসারে আবেদনের একখানা খসড়া বড়লাটের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। গান্ধিজী আসিয়া খসড়াখানি পাঠ করিয়া তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিলেন এমন কি ইহাও বলিলেন, উহা বিশেষভাবে পরিবর্তিত না হইলে তিনি ডেপুটেশনে যোগ দিবেন না। তাঁহার আপত্তির কারণ এই যে, খসড়াখানিতে অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর করা হইয়াছে মুসলমানদের সর্বনিম্ন দাবী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহার মতে ইহা কি বড়লাট কি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট, কি জনসাধারণ, এমন কি তাঁহাদের নিজেদের প্রতিও সুবিচার করা হয় নাই। অসম্ভব অতিরিক্ত দাবী করিয়া তাহার জন্য চেষ্টা না করা অপেক্ষা স্পষ্টভাবে সর্বনিম্ন দাবী উল্লেখ করিয়া তাহা পূরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা ভাল। যদি সত্যই তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন তাহা হইলে ইহাই একমাত্র সঙ্গত ও সম্মানজনক পন্থা।

এই শ্রেণীর যুক্তি ভারতের রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অভিনব। আমরা বাহুল্য বাগাড়ম্বর ও আলঙ্কারিক ভাষায় অভ্যস্ত এবং সর্বদাই দরকষাকষি করিয়া জিতিয়া যাইবার মতলব আমাদের মনের মধ্যে থাকে। যাহা হউক, গান্ধিজীর মতই গৃহীত হইল। তিনি বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিত খসড়ার দুটি

ও অস্পষ্টতা উল্লেখ করিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং উহার সহিত আরও কয়েকটি নূতন বিষয় জুড়িয়া দিলেন। ইহাতে তিনি সর্বনিম্ন দাবী উল্লেখ করিলেন। উত্তরে বড়লাট নূতন বিষয়গুলি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া জানাইলেন যে, পূর্বের খসড়াই যথেষ্ট। গান্ধিজী ভাবিলেন, তাঁহার ও খিলাফত কমিটির মনোভাব স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তিনি ডেপুটেশনে যোগ দিলেন।

ইহা স্পষ্টই বোঝা গেল যে, গভর্ণমেণ্ট খিলাফত কমিটির দাবী মানিয়া লইবেন না এবং সংঘর্ষ অনিবার্য। মৌলবী উলেমাদের সহিত দীর্ঘ আলোচনা শুরু হইল, অহিংসা ও অসহযোগ, বিশেষভাবে অহিংসা লইয়া বিচার চলিল। গান্ধিজী তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, অহিংসা সর্বতোভাবে গ্রহণ করিবার প্রতিশ্রুতি যদি তাঁহারা দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের সহিত যোগ দিবেন। কিন্তু অহিংসা সম্বন্ধে কোন দ্বিধা সঙ্কোচ অথবা আপোষের ভাব থাকিতে পারিবে না। মৌলবীদের পক্ষে এই নীতি পূর্ণরূপে বুঝিয়া ওঠা সহজ ছিল না, তথাপি তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা মূলনীতি হিসাবে নহে, কৌশলরূপেই ইহাকে গ্রহণ করিবেন, কেননা, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বলপ্রয়োগ করা তাঁহাদের ধর্মে নিষিদ্ধ নহে। ১৯২০ সালে রাজনৈতিক ও খিলাফত আন্দোলন একই লক্ষ্যে পাশাপাশি চলিতে লাগিল। কংগ্রেস গান্ধিজীর অসহযোগ গ্রহণ করায় উভয় আন্দোলন মিলিত হইল। খিলাফত কমিটি প্রথম এই কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং ১লা আগস্ট হইতে আন্দোলন আরম্ভ হইবে বলিয়া ঘোষিত হয়।

বৎসরের প্রথম ভাগে এলাহাবাদে এই কার্যপদ্ধতি বিবেচনা করিবার জন্য মুসলমানদের এক সভা (আমার মনে হয়, মুসলিম লীগের কাউন্সিল) আহূত হইয়াছিল। সৈয়দ রেজা আলীর গৃহে অধিবেশন হয়। মৌলানা মহম্মদ আলী তখন ইয়োরোপে; কিন্তু সৌকত আলী উপস্থিত ছিলেন। এই সভার কথা আমার মনে আছে, কেননা ইহার আলোচনা দেখিয়া আমি অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছিলাম। সৌকত আলী অবশ্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন কিন্তু অন্যান্য সকলে বিরসবদনে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইতেছিলেন না অথচ ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার মত মনোভাবও তাঁহাদের ছিল না। এই শ্রেণীর লোক কি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনা করিতে সক্ষম? গান্ধিজী বক্তৃতা করিলেন, তাহা শুনিয়া প্রত্যেকের মুখে অধিকতর ভীতির ছায়া ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার বক্তৃতায় নেতৃত্বের আত্মপ্রত্যয় ছিল, তিনি বিনয়ী অথচ কঠিন হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, তাঁহার বাক্য মৃদুমধুর অথচ অনমনীয় ও ঐকান্তিক। তাঁহার দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও গভীর অথচ তাহার মধ্যে তীক্ষ্ণশক্তি ও দৃঢ়সঙ্কল্পের বহ্নি। তিনি বলিলেন, এক শক্তিমান বিরুদ্ধবাদীর সহিত বৃহৎ সংঘর্ষের সূত্রপাত হইবে, আপনারা যদি ইহা চাহেন তাহা হইলে সর্বস্ব হারাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আপনাদিগকে অহিংসা ও অন্যান্য শৃঙ্খলা যথাযথ ভাবে পালন করিতে হইবে। যুদ্ধ বাধিলে সামরিক আইন অনিবার্য হইয়া উঠে। আমাদের অহিংস যুদ্ধেও যদি আমরা জয়লাভ করিতে চাহি তাহা হইলে আমাদিগকে একনায়কত্ব ও সামরিক আইনের অনুরূপ কঠিন শৃঙ্খলা অঙ্গীকার করিতে হইবে। আপনারা আমাকে পদাঘাতে তাড়াইয়া দিতে পারেন, আমার মস্তক দাবী করিতে পারেন, অথবা ইচ্ছামত যে-কোন শাস্তি দিতে পারেন কিন্তু যতদিন আপনারা আমাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিবেন ততদিন আমার সর্ত মানিতে হইবে, আমার একনায়কত্ব স্বীকার করিতে

হইবে, সামরিক আইনের দৃঢ়শৃঙ্খলা মানিতে হইবে। কিন্তু একনায়কত্ব থাকিবে আপনাদের সদিচ্ছা, সহযোগিতা ও স্বেচ্ছায় স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে মুহূর্তে ইচ্ছা আমার ভাবান্তর দেখিলে আমাকে দূরে নিক্ষেপ করিবেন, আমি কোন অভিযোগ করিব না।

এই শ্রেণীর সামরিক উপমা ও অনমনীয় আবেগময় দৃঢ়তা দেখিয়া অধিকাংশ শ্রোতারই বুক কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু সৌকত আলী সংশয়াতুরদের পিঠ চাপড়াইয়া খাড়া রাখিলেন। যখন ভোটের সময় আসিল তখন অধিকাংশই নিরীহ ও সলজ্জভাবে প্রস্তাবের পক্ষে ভোগ দিলেন এবং ইহা যুদ্ধেরই জন্য।

সভা হইতে বাহিরে আসিয়া আমি গান্ধিজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক বৃহৎ সংঘর্ষের কি ইহাই পথ? আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম উৎসাহ উদ্দীপনাময় ভাষা, জ্বলন্ত চক্ষু, কিন্তু তাহার পরিবর্তে দেখিলাম একদল ভীরু নিষ্প্রভ মধ্যবয়স্ক লোক। ইহারা কেবল জনমতের ভয়ে ভোট দিয়াছে। অবশ্য মুসলিম লীগের এই সকল সদস্যের অতি অল্প সংখ্যক লোকেই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকে নিরাপদ সরকারী চাকুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলিম লীগ তখন এবং পরবর্তীকালেও মুসলমান জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় ছিল না। ১৯২০-এর খিলাফত কমিটি প্রকৃত শক্তিশালী ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল এবং এই কমিটি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

১লা আগস্ট গান্ধিজী অসহযোগ আন্দোলনের উদ্বোধন দিবস বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অবশ্য উহা তখনও কংগ্রেসে আলোচিত ও গৃহীত হয় নাই। ঐ দিবসই লোকমান্য তিলক বোম্বাইয়ে দেহত্যাগ করেন এবং সিন্ধুভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ঐ দিন গান্ধিজী বোম্বাইয়ে উপস্থিত হন। সর্বজনপ্রিয় পরলোকগত মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য বোম্বাই সহরে লক্ষ লক্ষ নরনারীর শোকযাত্রায় আমিও গান্ধিজীর সহিত যোগ দিয়াছিলাম।

৮

আমার বহিষ্কার এবং তাহার ফলাফল

আমার রাজনীতি, আমার শ্রেণীর অর্থাৎ—বুর্জোয়া-রাজনীতি। অবশ্য তখন (এখনও বহুল পরিমাণে) রাজনৈতিক আন্দোলন মধ্যশ্রেণীর আন্দোলন। কি মডারেট, কি চরমপন্থী—একই শ্রেণীভুক্ত এবং স্বীয় শ্রেণীগত উন্নতিতে আগ্রহান্বিত; কেবল পথ বিভিন্ন। মডারেটরা বিশেষভাবে মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি। এই শ্রেণী বৃটিশ শাসনের আমলে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, ইহারা বর্তমান প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ বিপন্ন হইবার আশঙ্কায় সহসা কোনও গুরুতর পরিবর্তনের বিরোধী, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ও বড় জমিদারশ্রেণীর সহিত ইহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। চরমপন্থীদলে মধ্যশ্রেণীর নিম্নতর স্তরের প্রতিনিধিও ছিল। ইহা ছাড়া যুদ্ধের ফলে বর্ধিত কারখানার শ্রমিকদের কতকগুলি স্থানীয় সমিতি ছিল, কিন্তু তাহার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না। কৃষক শ্রেণী অন্ধ, দারিদ্র্য-পীড়িত, অদৃষ্ট-নির্ভর, নিশ্চেষ্ট এবং প্রত্যেকের দ্বারাই শোষিত—গভর্ণমেন্ট, জমিদার, কুসিদজীবী, ক্ষুদ্র কর্মচারী, পুলিশ, উকীল, পুরোহিত; মোল্লা।

সংবাদপত্রের পাঠকগণ বুঝিতেই পারিবেন না যে, ভারতে বিশাল কৃষকশ্রেণী এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক রহিয়াছে কিংবা তাহাদের কোন মূল্য আছে। ইংরাজ পরিচালিত এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি বড় বড় রাজপুরুষদের কথা, বৃহৎ নগরীর ইংরাজদের সামাজিক জীবন, শৈলনিবাসগুলির খানাপিনা, নিমন্ত্রণ সভা, রঙ্গিন পোষাকে বলনৃত্য এবং সখের নাট্যাভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণে পূর্ণ থাকে। ভারতবাসীর দিক হইতে ভারতীয় রাজনীতি আলোচনা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন। এমন কি কংগ্রেসের অধিবেশনের বিবরণও শেষের দিকের পাতায় সংক্ষেপে প্রকাশিত হয়। এই সংবাদগুলির কোন মূল্য আছে তাঁহারা স্বীকার করেন না। কিন্তু যখন কোন খ্যাত কি অখ্যাত ভারতীয়, কংগ্রেসকে গালি দিয়া অথবা তাহার ঔদ্ধত্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া কোনও প্রবন্ধ লেখেন তাহা সাদরে প্রকাশিত হয়। সময় সময় ধর্মঘটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়, দাঙ্গাহাঙ্গামা ব্যতীত পল্লী অঞ্চলের সংবাদগুলিকে কদাচিৎ প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি এংলো-ইণ্ডিয়ান ঢোলের নকল করিলেও জাতীয় আন্দোলনকে বহুলাংশে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া ভারতীয়দের বড় অথবা ছোট চাকুরীতে নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি প্রভৃতি লইয়া আলোচনা হয় এবং কোন কর্মচারীর বিদায় সম্বর্ধনায় যখন "অতিরিক্ত উৎসাহের সঞ্চার" হইতেই হইবে, তখন তাহাও প্রাধান্য দিয়া প্রকাশ করা হয়। গভর্ণমেণ্ট যখন পল্লীঅঞ্চলে জরীপের কাজ আরম্ভ করেন, যাহার ফলে সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি অনিবার্য তখন জমিদারদের পকেটে হাত পড়ে বলিয়া কাগজে হৈ চৈ শুরু হয়। গরীব কৃষকের ইহার মধ্যে স্থান নাই। এই সকল খবরের কাগজের মালিক ও পরিচালক জমিদার ও ব্যবসায়ীরা এবং এইগুলিকে আমরা "ন্যাশনালিস্ট" বা জাতীয়তাবাদী পত্রিকা বলিয়া থাকি।

প্রথম দিকে কংগ্রেস যে সব অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাবী করিয়া প্রতি বৎসর প্রস্তাব পাশ করিত, যাহাতে জমিদারদিগের স্থায়ী অধিকার সাব্যস্ত হয়। রায়তদের কথা উল্লেখ করা হইত না।

কিন্তু গত বিশ বৎসরে জাতীয় আন্দোলনের প্রসারতা হেতু অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, এখন ভারতীয় পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিবার জন্য ইংরাজ-চালিত পত্রিকাগুলি পর্যন্ত ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যার জন্য কিছু স্থান দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও তাঁহারা নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী করিয়া থাকেন। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টি কিয়ৎ পরিমাণে উদার হইয়াছে, কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতি সদয় সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়; কেননা বর্তমানে ইহা একটা ফ্যাসান এবং তাহাদের পাঠকেরাও কৃষি ও কারখানার সমস্যা লইয়া ইদানীং আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্বের মত এখনও তাঁহারা তাঁহাদের মালিক ভারতীয় ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থই সমর্থন করিয়া থাকেন। বহু দেশীয় নৃপতিও এই সকল সংবাদপত্রে টাকা খাটাইয়া থাকেন এবং টাকার পূর্ণ সার্থকতা লাভের দিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে। তথাপি এই শ্রেণীর সংবাদপত্র নিজেদের কংগ্রেসপন্থী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন যদিও তাঁহাদের পরিচালকগণ কংগ্রেসের সদস্য পর্যন্ত নহেন। কিন্তু কংগ্রেস জনপ্রিয় বলিয়া অনেক ব্যক্তি ও দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐ নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন; অবশ্য যে সকল সংবাদপত্র অধিকতর অগ্রসর হইতে চায় তাহাদিগকে মোটা জরিমানা, এমন কি, কঠোর প্রেস আইন ও সংবাদ-নিয়ন্ত্রণের চাপে অপঘাত মৃত্যুর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়।

১৯২০ সালে কারখানার শ্রমিক অথবা কৃষিমজুরদের অবস্থা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। আমার রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিধি মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই

সীমাবন্ধ ছিল। অবশ্য আমি ভয়াবহ দারিদ্র্য ও দ্ঃখের কথা জানিতাম ও ভাবিতাম ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলে তাহার প্রথম কর্তব্য হইবে এই দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং তাহার সহিত অপরিহার্য মধ্যশ্রেণীর প্রভুত্ব আমার নিকট পরবর্তী সোপান বলিয়া মনে হইত। গান্ধিজীর চম্পারণ (বিহার) এবং কায়রার (গ্জরাট) কৃষক আন্দোলনের পর আমি কৃষকদের সমস্যাগ্লির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিলাম। কিন্তু ১৯২০-এর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর এবং আগতপ্রায় অসহযোগ আন্দোলনের সম্ভাবনা তখন আমার মনের সবখানি জ্ড়িয়া ছিল।

পরবর্তীকালে রাজনীতিক্ষেত্রে গ্র্দায়িত্ব গ্রহণ করিবার একান্ত আকাঙ্ক্ষা আমি এই সময় হইতেই অন্ভব করিতে লাগিলাম। একদিন আমার ইচ্ছার বির্দ্ধেই আমি সহসা কৃষকদের সংস্পর্শে আসিলাম, ইহা এক আশ্চর্য ঘটনা।

আমার মাতা এবং কমলা (আমার স্ত্রী) অস্স্থ বলিয়া ১৯২০-এর মে মাসের প্রথমে তাঁহাদিগকে লইয়া ম্সৌরীতে গেলাম। আমার পিতা তখন একজন বড় রাজার মামলা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহার বির্দ্ধে ছিলেন মিঃ সি. আর. দাশ। আমরা ম্সৌরীর স্যভয় হোটেলে উঠিলাম। তখন ইংরাজ ও আফগান প্রতিনিধিদের মধ্যে সন্ধির কথাবার্তা ম্সৌরীতে চলিতেছিল। (আমান্ল্লার সিংহাসন আরোহণের পর ১৯১৯এ আফগান য্দ্ধের অব্যবহিত পরের ঘটনা) আফগান প্রতিনিধিরাও স্যভয় হোটেলে ছিলেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিতেন, স্বতন্ত্র ভোজন করিতেন এবং কখনও সাধারণ বৈঠকখানায় আসিতেন না। আমার তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কৌত্হল ছিল না। এক মাসের মধ্যে কদাচিৎ কাহাকেও দেখিয়াছি। দেখা হইলেও কোন সম্ভাষণাদি হয় নাই। সহসা একদিন সন্ধ্যাবেলা প্লিশ স্পারিন্টেনডেন্ট আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের একখানি পত্র দেখাইয়া বলিলেন যে, আপনি আফগান প্রতিনিধিদের কোনও সংস্পর্শে আসিবেন না—এই মর্মে প্রতিশ্র্তি লইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। ইহা আমার নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য মনে হইল। কেননা এক মাস অবস্থানের মধ্যে আমি তাহাদের সহিত দেখা পর্যন্ত করি নাই। ভবিষ্যতেও সে সম্ভাবনা অল্প। স্পারিন্টেনডেন্টও সেকথা জানিতেন; কেননা তিনি প্রতিনিধিদের উপর নজর রাখিতেন। তাহা ছাড়া গোয়েন্দাবিভাগের অসংখ্য গ্প্তচরের তো কথাই নাই। কিন্তু প্রতিশ্র্তি দেওয়া আমার প্রকৃতিবির্দ্ধ। আমি তাঁহাকে তাহা বলিলাম। তিনি আমাকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও দ্নের স্পারিন্টেনডেন্টের সহিত দেখা করিতে বলিলেন। আমি তাহাও করিলাম। কিন্তু কিছ্তেই যখন আমি প্রতিশ্র্তি দিতে সম্মত হইলাম না, তখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেরাদ্ন ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য আমার উপর বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হইল। ইহার অর্থ আমাকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ম্সৌরী ত্যাগ করিতে হইবে। র্গ্না মাতা ও স্ত্রীকে ফেলিয়া চলিয়া আসাটা আমার ভাল বোধ হইল না। অন্য দিকে আদেশ অমান্য করাও সংগত মনে করিলাম না। তখনও সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের কথা উঠে নাই। অগত্যা আমি ম্সৌরী ত্যাগ করিলাম।

য্ক্ত প্রদেশের তদানীন্তন গভর্ণর স্যার হারকুর্ট বাটলারের সহিত আমার পিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহাকে বন্ধ্ভাবে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি (স্যার হারকুর্ট) এর্প নির্বোধ আদেশ দেন নাই। নিশ্চয় সিমলায় কোন উর্বর মস্তিষ্কে ইহার জন্ম হইয়াছে। স্যার হারকুর্ট উত্তরে লিখিলেন যে এমন নির্দোষ আদেশ জওহরলাল সহজেই মান্য করিতে পারিত এবং তাহাতে

তাহার মর্যাদার কোন লাঘব ঘটিত না। পিতা উত্তরে তাঁহার সহিত ভিন্ন মত অবলম্বন করিলেন, এবং লিখিলেন, যদিও ইচ্ছা করিয়া আদেশ ভঙ্গের উদ্দেশ্য জওহরলালের নাই তবুও তাহার মাতা ও স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আদেশ থাকুক বা না থাকুক সে মুসৌরীতে ফিরিয়া যাইবে। তাহাই ঘটিল। আমার মাতার শারীরিক অবস্থা মন্দ, খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ আমি ও পিতা মুসৌরী যাত্রা করিলাম। যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে আমরা তারে সংবাদ পাইলাম আদেশ প্রত্যাহৃত হইয়াছে। মুসৌরীতে পৌঁছিয়া পরদিন প্রভাতে প্রথম যাঁহার সহিত আমার দেখা হইল তিনি একজন আফগান, আমার শিশুকন্যাকে কোলে লইয়া হোটেলের উঠানে দাঁড়াইয়া আছেন। জানিলাম, তিনি একজন সচিব ও আফগান প্রতিনিধিদলের সদস্য। আমার বহিষ্কারের অব্যবহিত পরেই সংবাদ-পত্রে তাহা পাঠ করিয়া তাঁহারা কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং প্রতিনিধি দলের নেতা প্রত্যহ একঝুড়ি ফল ও পুষ্পাদি আমার মাতার নিকট পাঠাইতেন।

পিতা ও আমি পরে দুই-একজন প্রতিনিধির সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমাদিগকে আফগানিস্থানে যাইবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সুযোগ আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। এবং আমি জানি না সে দেশের নূতন আমলে এখনও সে নিমন্ত্রণের মেয়াদ আছে কি না।

মুসৌরী হইতে বহিষ্কারের আদেশের ফলে আমাকে দুই সপ্তাহ এলাহাবাদে থাকিতে হইয়াছিল। এই সময় আমি কৃষক আন্দোলনে জড়াইয়া পড়িলাম। পরবর্তী কালে এই ঘনিষ্ঠতা আমার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সময় সময় বিস্মিত হইয়া ভাবি বহিষ্কারের ফলে যদি এই সময় আমি এলাহাবাদে না থাকিতাম তাহা হইলে এই যোগাযোগ ঘটিত না। হইতে পারে শীঘ্র বা বিলম্বে আমি কৃষক আন্দোলনে গিয়া পড়িতাম কিন্তু তাহার কারণ ও ভঙ্গী হইত স্বতন্ত্র এবং আমার মনে প্রতিক্রিয়াও হইত অন্য রকমের।

যতদূর স্মরণ হয়, ১৯২০-এর জুন মাসের প্রথম ভাগে প্রায় ২ শত কৃষক প্রতাপগড় জিলার পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী পল্লী-অঞ্চল হইতে এলাহাবাদ সহরে হাঁটিয়া আসিয়াছিল। স্থানীয় প্রধান রাজনীতিকগণের দৃষ্টি তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি আকর্ষণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদের নেতা ছিল রামচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি। সে অবশ্য স্থানীয় কৃষক ছিল না; আমি শুনিলাম, কৃষকেরা যমুনার কোনও একটি ঘাটে নদীতীরে আস্তানা ফেলিয়াছে। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তাহাদের সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাহারা আমাদিগকে তালুকদারদের জোর করিয়া টাকা আদায়ের কথা, অমানুষিক অত্যাচারের কথা এবং তাহাদের অবস্থা যে কিরূপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা করিল। তাহারা আমাদের নিকট প্রার্থনা করিল, যাহাতে আমরা তাহাদের সহিত গিয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধান করি। এইভাবে এলাহাবাদ আসায় তালুকদারদের ক্রুদ্ধ প্রতিশোধ প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করিবার আবেদনও তাহারা জানাইল। তাহারা কোন যুক্তি মানিতে চাহে না, আমাদিগকে অন্ধ আবেগে আঁকড়াইয়া ধরিল, অগত্যা আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম দুই দিনের মধ্যেই তাহাদের অঞ্চলে যাইব।

রেলওয়ে, এমন কি, পাকা রাস্তা হইতে বহুদূরের গ্রামগুলিতে আমি কতিপয় সহকর্মীসহ তিনদিন যাপন করিলাম। ইহা আমার নিকট নূতন আবিষ্কার। আমি দেখিলাম, পল্লীবাসীরা এক অপূর্ব উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিল। মুখে মুখে সংবাদ দিলে বিশাল জনতা হইত, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লোকমুখে সংবাদ ছুটিত, কুটির ত্যাগ করিয়া পিপীলিকাশ্রেণীর মত নরনারী

বালকবালিকা প্রান্তর পথ বাহিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইত। অথবা 'সীতারাম' বলিয়া একবার চীৎকার করাই যথেষ্ট—'সীতা রা-আ-ম' আকাশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া দূরদূরান্তে জনসঙ্ঘকে উচ্চকিত করিয়া তুলিত; জলস্রোতের মত জনস্রোত ছুটিয়া আসিত। এই সকল নরনারীর পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন, বদনে জ্বলন্ত উৎসাহ, নয়নে এক মহৎ সম্ভাবনার প্রত্যাশা-দীপ্তি, যেন এই মুহূর্তেই কোনও ইন্দ্রজাল ঘটিবে, তাহাদের দীর্ঘ দুঃখনিশার অবসান হইবে।

তাহাদের স্নেহ আমাদের উপর বর্ষিত হইল। তাহারা প্রীতিস্নিগ্ধ আশাপূর্ণ নয়নে আমাদের মুখের পানে চাহিল, যেন আমরা আশার সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। যেন আমরা তাহাদিগকে প্রত্যাশিত সুখস্বর্গে লইয়া যাইবার অগ্রদূত। তাহাদের পানে চাহিয়া তাহাদের দুর্দশা ও অজস্র কৃতজ্ঞতায় আমি লজ্জায় দুঃখে মরমে মরিয়া গেলাম, নিজের স্বচ্ছন্দ সুখী আরামের জীবনের জন্য লজ্জা বোধ করিলাম। ভারতের অর্ধনগ্ন এই বিশাল জনসঙ্ঘকে অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের নাগরিক সঙ্কীর্ণ রাজনীতির জন্য লজ্জিত হইলাম। ভারতের এই অসহনীয় দারিদ্র্য ও অধঃপতন দেখিয়া ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইলাম, নগ্ন ক্ষুধিত বক্র মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে অসহায় ভারতের এক নবীন চিত্র আমার মানসপটে উদিত হইল। নগরীর এই ক্ষণিকের অতিথির প্রতি তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া আমি বিব্রত হইলাম এবং অভিনব দায়িত্ব ভাবিয়া ভীত হইলাম। তাহাদের অনন্ত দুঃখকাহিনী শুনিলাম, ক্রমবর্ধিত খাজনা, বে-আইনী আবোয়াব, জমি ও মৃৎকুটীর হইতে উচ্ছেদ; চারি দিকে মাংসপ্রত্যাশী শকুনের দল—জমিদারের গোমস্তা, মহাজন ও পুলিশ। উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা উৎপন্ন হয় তাহা তাহাদের নহে, তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার পদাঘাত, গালি এবং ক্ষুধিত উদর। উপস্থিত কৃষকগণের মধ্যে অনেকেই ভূমিশূন্য, জমিদার তাহাদের উচ্ছেদ করিয়াছে, দাঁড়াইবার মত এক কানি জমি কি একটি কুটির পর্যন্ত নাই। জমি উর্বর, খাজনা অত্যধিক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত এবং জমির উমেদার কম নহে। সকলেই জমির কাঙ্গাল, এই অবস্থার সুযোগ লইয়া জমিদারেরা আইন-নির্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি করিতে অক্ষম হইয়া নানাপ্রকার বে-আইনী আবোয়াব দাবী করিয়া থাকে। রায়তেরা উপায়ান্তরহীন হইয়া মহাজনের নিকট টাকা কর্জ করিয়া জমিদারের অন্যায্য দাবী পূরণ করে এবং পরে দেনা শোধ দিতে না পারিয়া এবং খাজনা দিতে অপারগ হইয়া ভূমি হইতে উৎখাত হইয়া সর্বস্বান্ত হয়।

এই প্রথা দীর্ঘকাল চলিয়া আসিতেছে এবং কৃষকগণেরও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের সূচনা হইয়াছে অনেকদিন। হঠাৎ কি ঘটিল যাহার ফলে পল্লী অঞ্চলে এই জাগরণ? আর্থিক অবস্থা, অবশ্য অযোধ্যার সর্বত্রই একরূপ। ১৯২০—২১-এর কৃষক আন্দোলন প্রধানতঃ প্রতাপগড়, রায়বেরিলি ও ফৈজাবাদ এই তিনটি জেলায় আবদ্ধ ছিল। ইহা একটি ব্যক্তি—রামচন্দ্রের নেতৃত্বের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। লোকে তাহাকে বলিত বাবা রামচন্দ্র।

রামচন্দ্র ছিল মহারাষ্ট্রবাসী। সে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হইয়া ফিজিতে গিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সে গ্রামে গ্রামে তুলসীদাসের রামায়ণ গান করিত ও কৃষকগণের দুঃখদুর্দশার কথা শুনিত। সে সামান্য লেখাপড়া জানিত এবং কিয়ৎপরিমাণে কৃষকদিগকে ঠকাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিত কিন্তু সঙ্ঘ গড়িবার ক্ষমতা ছিল তাহার আশ্চর্য। সে কৃষকদিগকে ঘন ঘন সভা করিয়া নিজেদের দুঃখদুর্দশার আলোচনা করিতে শিখাইয়াছিল এবং এইভাবে তাহাদের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি জাগাইয়াছিল। মাঝে মাঝে বৃহৎ

জনসভায় আসিয়া তাহারা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে চেতনা লাভ করিত। "সীতারাম" বহুকাল প্রচলিত সাধারণ ধ্বনি, কিন্তু রামচন্দ্র তাহার মধ্যে সংগ্রামের দ্যোতনা সঞ্চার করিয়াছিল, উহা বিপদসূচক সঙ্কেতধ্বনির অনুরূপ করিয়া তুলিয়াছিল এবং গ্রামগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল। ফৈজাবাদ, প্রতাপগড়, রায়বেরিলি সীতারামের প্রাচীন কাহিনীতে পরিপূর্ণ—এই জেলাগুলি ছিল প্রাচীন অযোধ্যা রাজ্য—এবং জনসাধারণের প্রিয় পুস্তক হইল তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ। রামচন্দ্র এই রামায়ণ আবৃত্তি করিত এবং বক্তৃতা কালে তুলসীদাসের বচন উদ্ধৃত করিত। কৃষকদিগকে বহুল পরিমাণে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সে তাহাদিগকে অনেকপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল এবং কাল্পনিক আশায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার কোনও নির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি ছিল না, সে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া অপরের স্কন্ধে দায়িত্ব নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিত। এই কারণেই সে কৃষকদিগকে এলাহাবাদে লইয়া আসিয়াছিল, যাহাতে লোকে তাহাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়।

রামচন্দ্র আরও এক বৎসর কাল কৃষক আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। দুইবার কি তিনবার জেলেও গিয়াছে, কিন্তু পরে দেখা গেল, সে যেমন দায়িত্বজ্ঞানহীন, তেমনি বিশ্বাসের অযোগ্য।

অযোধ্যা কৃষক আন্দোলনের উপযুক্ত ভূমি। ইহা তালুকদারের দেশ। তাঁহারা নিজেদের "ব্যারনস্ অফ আউধ" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। জমিদারীপ্রথা এখানে সর্বাধিক কদর্যরূপে বিকশিত। জমিদারের শোষণ ক্রমশঃ অসহ্য হইতেছে, ভূমিশূন্য কৃষকের সংখ্যা বাড়িতেছে, এবং এখানে প্রজারা একই শ্রেণীর বলিয়া অবস্থা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার অনুকূল।

ভারতবর্ষকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়, একদিকে জমিদারী প্রথা ও বড় বড় জমিদার, অন্যদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষী-মালিক। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও আবার রহিয়াছে। বাঙলা, বিহার, আগ্রা ও অযোধ্যা লইয়া যুক্তপ্রদেশে জমিদারী প্রথা প্রচলিত। কৃষক-মালিকদের অবস্থা তুলনায় ভাল হইলেও সেখানেও দুঃখ দুর্দশা আছে। পাঞ্জাব ও গুজরাটের কৃষকগণ (চাষী-মালিক) জমিদারী অঞ্চলের রায়ত হইতে বেশী সুবিধা পাইয়া থাকে। জমিদারীর অধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজা আছে—দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত, স্বত্বহীন রায়ত, জোতদারের অধীনে কোর্ফা প্রজা প্রভৃতি। ইহাদের পরস্পরের স্বার্থ এত বিপরীত ও স্বার্থবিরোধী যে তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না। যাহা হউক অযোধ্যায় ১৯২০-এ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা দীর্ঘ মেয়াদী প্রজা ছিল না, অধিকাংশই অল্পদিনের চুক্তিবদ্ধ প্রজা এবং যে-কেহ অধিক নজর দিতে রাজী হইত, প্রজাকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাকে জমি দেওয়া হইত। এখানে প্রধানতঃ একই শ্রেণীর প্রজা বলিয়া উহাদিগকে সম্মিলিত চেষ্টার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করা সহজ।

কার্যতঃ অযোধ্যার স্বল্প মেয়াদী প্রজাদেরও অধিকারের কোন স্থায়িত্ব ছিল না। জমিদারেরা খাজনা লইয়া কখনও দাখিলা দেন না; প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার ইচ্ছা হইলে জমিদার সহজেই বাকী খাজনার কথা তুলিতে পারে। এবং প্রজার পক্ষে খাজনা আদায় দেওয়া প্রমাণ করা অসম্ভব। খাজনা ছাড়াও নানাবিধ অদ্ভুত নজর আবোয়াব প্রভৃতি আছে। আমি শুনিয়াছি, কোন এক তালুকে পঞ্চাশটি বিভিন্ন দফায় ঐ শ্রেণীর আবোয়াব আদায় করা হয়। সম্ভবতঃ এই সংখ্যা অতিশয়োক্তি মাত্র। কিন্তু তালুকদারেরা নানা বিশেষ ব্যাপারে প্রজাদিগকে অর্থ দিতে বাধ্য করেন, ইহা কাহারও অজানা নাই। পরিবারে বিবাহের কালে, বিলাতে

প্রত্রের শিক্ষার ব্যয়, গভর্ণর কিংবা উচ্চ রাজকর্মচারীদের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের ব্যয়, হাতী অথবা মোটরগাড়ী কিনিবার অর্থ প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হয়। এইসব বলপর্বক অর্থ আদায়ের অদ্ভুত অদ্ভুত নামও আছে। যথা—মোটরানা, হাতীয়ানা প্রভৃতি।

অতএব অযোধ্যায় যে কৃষক আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? আমার নিকট সর্বাধিক আশ্চর্য এই যে নগরের সাহায্য, কিংবা রাজনৈতিকগণের হস্তক্ষেপ ব্যতীত স্বাভাবিক ভাবে আন্দোলন এত ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই কৃষক আন্দোলন কংগ্রেস হইতে সম্পর্ণ ভিন্ন, এবং ইহার সহিত আগতপ্রায় অসহযোগের প্রায় কোন সম্পর্ক ছিল না। অথবা আরও সত্য করিয়া বলিলে বলা যায়, এই দুই শক্তিশালী আন্দোলনের মূলে একই কারণ। কৃষকেরা অবশ্য গান্ধিজীর ঘোষিত ১৯১৯-এর বড় বড় হরতালে যোগ দিয়াছিল। এবং তাঁহার নাম গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করিত।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল বৃহৎ প্রজা আন্দোলনের সম্পর্কে সহরবাসীরা গভীরভাবে অজ্ঞ; কোন সংবাদপত্রে ইহার এক ছত্র সংবাদও বাহির হয় না। পল্লী অঞ্চল সম্বন্ধে ইহাদের কোন কৌতূহল নাই। আমি নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, আমরা জনসাধারণ হইতে কত বিচ্ছিন্ন এবং সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জগতে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্দোলন আবদ্ধ।

৯

কৃষকদের মধ্যে ভ্রমণ

তিনদিন গ্রামে থাকিয়া আমি এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলাম। তারপর আরও কয়েকবার গ্রামে গিয়াছি। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণকালে আমরা কৃষকদের সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছি। তাহাদের সহিত মৃৎকুটিরে শয়ন করিয়াছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিয়াছি, ছোট-বড় সভায় বক্তৃতা করিয়াছি। আমরা একখানি হাল্কা মোটর গাড়ী লইয়া গিয়াছিলাম, যাহাতে গাড়ীখানি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে পারে সেজন্য শত শত কৃষক সারারাত্রি জাগিয়া মাঠের মধ্যে অস্থায়ী পথ প্রস্তুত করিয়াছে। যদি কোন জায়গায় গাড়ী না চলিত তখন তাহারা আগ্রহসহকারে গাড়ীখানি ঘাড়ে করিয়া পার করিয়া দিয়াছে। এই কারণে গাড়ী ছাড়িয়া পদব্রজেই আমরা অধিকাংশ স্থানে গিয়াছি। আমরা যেখানেই গিয়াছি সেইখানেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ, গোয়েন্দা এবং লক্ষ্ণৌ হইতে প্রেরিত একজন ডেপুটী কালেক্টর উপস্থিত থাকিতেন। চষা জমি ও বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়া আমাদের অবিশ্রান্ত ভ্রমণের ফলে সে বেচারাও হয়রান হইয়া উঠিল। আমাদের ও কৃষকদের উপর তাহাদের বিরক্তির পরিসীমা ছিল না। লক্ষ্ণৌয়ের ডেপুটী কালেক্টর কতকটা মেয়েলী ধরণের যুবক, তাহার পায়ে ছিল পাকা চামড়ার 'পাম্‌সু'। বেচারা মাঝে মাঝেই আমাদের আরও ধীরে চলিতে অনুরোধ করিত, অবশেষে তাল রাখিতে না পারিয়া সে সরিয়া পড়িল।

তখন জুন মাস, গ্রীষ্মকাল! সূর্যের উত্তাপ প্রখর অগ্নিবর্ষী। ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার পর তপ্ত মধ্যাহ্নে, এভাবে ভ্রমণ করিতে আমি অনভ্যস্ত। প্রত্যেক গ্রীষ্মকালই আমি শৈলাবাসে অতিবাহিত করিয়াছি। আর এখন সারাদিন আমি

প্রচণ্ড সূর্যালোকে ভ্রমণ করিতেছি। মাথায় টুপীর পরিবর্তে একখানি ছোট গামছা জড়াইয়া লইয়াছি। আমার মনে তখন এত চিন্তা ছিল যে অসহ্য গরমের কথা ভাবিবারও অবসর পাই নাই। এলাহাবাদে ফিরিয়া দেহে ও মুখে সূর্যতাপ-সঞ্জাত কাল দাগ দেখিয়া বুঝিলাম যে শরীরের উপর দিয়া কি গিয়াছে। তবুও আমি সুখী। কেননা আমি বুঝিলাম কৃষকদের মত আমারও তাপসহনশীলতা আছে। আমার রৌদ্রভীতি নিতান্ত অর্থহীন। অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি, প্রখর উত্তাপ এবং প্রচণ্ড শীত আমি অনায়াসে সহ্য করিতে পারি। এই কারণেই কি কার্যক্ষেত্রে কি কারাগারে আমি বিশেষ অসুবিধা বোধ করি নাই। অবশ্য আমার শরীরও বেশ কার্যক্ষম এবং আমি প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম করিয়া থাকি বলিয়াই উহা সম্ভব হইয়াছে। আমার পিতা একজন ব্যায়ামবীর ছিলেন এবং আজীবন নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে আমি এই শিক্ষা পাইয়াছিলাম। আমার পিতার যখন চুল পাকিয়া গিয়াছে, যখন তাঁহার মুখে দুশ্চিন্তা ও বেদনার কুঞ্চিত রেখা কাটিয়া বসিয়াছে, তখনও—তাঁহার মৃত্যুর দুই-এক বৎসর পূর্বেও, মুখের সহিত তুলনায় তাঁহার দেহ বিশ বৎসর নবীন বলিয়া প্রতিভাত হইত।

১৯২০-এর জুন মাসে আমার প্রতাপগড় ভ্রমণের পূর্বেও আমি মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়াছি এবং কৃষকদের সহিত আলাপ করিয়াছি, বড় বড় মেলায় গঙ্গাতীরে হাজার হাজার কৃষক দেখিয়াছি এবং তাহাদের মধ্যে 'হোম রুল' আন্দোলনের প্রচার কার্য চালাইয়াছি। তখনও আমি ইহাদের পুরাপুরি বুঝিতে পারি নাই। ভারতে কৃষক যে কি তাহা ধারণা করিতে পারি নাই। আমাদের শ্রেণীর অনেকের মতই ইহাদের আমি স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিয়াছি। কিন্তু প্রতাপগড় জিলার গ্রাম পরিভ্রমণের পর আমার এক নূতন অনুভূতি আসিল। আমার ধ্যানে ভারতবর্ষের এই নগ্নদেহ ক্ষুধিত জনসাধারণ ছাড়া আর কিছু রহিল না, দেশব্যাপী নূতনভাবের প্রেরণাতেই হউক কিংবা আমার মনের ঋজুতা বশতঃই হউক, যে চিত্র আমি দেখিলাম, যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিলাম, তাহা চিরদিনের মত আমার মনে দৃঢ়াঙ্কিত হইল।

কৃষকেরা আমার লজ্জা সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেওয়াইয়া ছাড়িল। ইতঃপূর্বে আমি কদাচিৎ প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিয়াছি। বক্তৃতার সময় উপস্থিত হইলেই আমার ভয় হইত। বিশেষভাবে হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা করিতে ঘাবড়াইয়া যাইতাম। কিন্তু তখন তাহাই রেওয়াজ ছিল। কৃষক সভায় অব্যাহতি পাওয়া কঠিন এবং এই সকল দরিদ্র, সরল লোকের নিকট লজ্জা সঙ্কোচের কি-ই বা আছে। আমার বাগ্মিতা কৌশল কিছুমাত্র জানা ছিল না। আমি মানুষের সহিত মানুষ যেমন সাধারণ ভাবে কথা বলে তেমনি করিয়া তাহাদের নিকট আমার মনের কথা, আমার হৃদয়ের আবেগ ব্যক্ত করিতাম। লোকসংখ্যা দশজন হউক বা দশ হাজারই হউক আমি ব্যক্তিগত কথোপকথনের ভঙ্গীতেই বক্তৃতা করিতাম। ত্রুটী ভুল সত্ত্বেও কোথাও বাধিয়া যাইত না। আমি অনর্গল বলিতাম। সম্ভবতঃ তাহাদের অনেকেই আমার অধিকাংশ কথা বুঝিত না। আমার ভাষা আমাদের চিন্তাধারা কৃষকদের নিকট সহজ নহে। আমার কণ্ঠস্বর উচ্চ নহে বলিয়া অনেকে শুনিতে পাইত না। কিন্তু যাঁহাকে তাহারা ভালবাসে, বিশ্বাস করে তাঁহার এই সকল ত্রুটি গণনার মধ্যেই আনে না।

আমি মুসৌরীতে মা ও স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া গেলাম। কিন্তু কৃষকেরা আমার চিত্ত অধিকার করিয়া রহিল। আমি ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। ফিরিয়া আসিয়াই আমি গ্রামে ভ্রমণ আরম্ভ করিলাম এবং কৃষক আন্দোলনের শক্তির বিকাশ

লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। পদদলিত কৃষকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিতেছে, সে সোজা হইয়া মাথা তুলিয়া হাঁটিতে পারে, তাহার জমিদারের গোমস্তা ও প্‌লিশভীতি বহ্‌লাংশে হ্রাস পাইয়াছে। কাহাকেও জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইলে অপরে তাহা পাইবার জন্য লালায়িত হয় না। জমিদারের পাইক-বরকন্দাজের মারপিট এবং বে-আইনি অর্থ আদায়ও অনেক কমিয়া গিয়াছে। যখনই এর্‌প ঘটিত তখনই তাহারা অন্‌সন্ধান করিয়া প্রতিকারের আবেদন করিত। ইহাতে জমিদারের কর্মচারী ও প্‌লিশেরা কতক পরিমাণে শঙ্কিত হইল। তাল্‌কদারেরাও ভয় পাইলেন, এবং তাঁহারা কৃষক আন্দোলনকে আক্রমণ না করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টও অযোধ্যায় রায়তারী আইন সংশোধনের প্রতিশ্র্‌তি দিলেন।

জমির মালিক এবং নিজেদের "জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতা" মনে করিয়া গর্বিত তাল্‌কদার ও জমিদারগণ ব্‌টিশ গভর্ণমেণ্টের আদ্‌রে দ্‌লাল। গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগের জন্য বিশেষ শিক্ষা ও লালন পালনের ব্যবস্থা করিয়া অথবা না করিয়া এমন ভাবে মাথা খাইয়া রাখিয়াছেন যে, শ্রেণীহিসাবে ইহাদের ব্‌দ্ধি সম্প্‌র্ণর্‌পে দেউলিয়া। অন্যান্য দেশের জমিদারেরা প্রজাদের যৎকিঞ্চিৎ হিত করিয়া থাকে, কিন্তু ইঁহারা প্রজাদের জন্য কিছ্‌ই করেন না, কেবল জমি ও প্রজার উপর পরগাছার মত অবস্থান করেন। ইঁহাদের কাজ হইল স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের তোষামোদে তুষ্ট রাখা। সরকারী কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্ব ব্যতিত ইঁহাদের টিঁকিয়া থাকা কঠিন। বিশেষ অধিকার ও স্‌বিধা রক্ষার জন্য ইঁহারা অবিরত সরকারী মহলে আনাগোনা করেন।

জমিদার বলিতে সকলেই এমন কিছ্‌ বড় বড় ভূম্যধিকারী নহে। 'রায়তারী' প্রদেশগ্‌লিতে 'জমিদার' বলিতে কৃষক-মালিকদের ব্‌ঝায়। এমন কি, যেখানে জমিদারী প্রথা আছে, সেখানেও ম্‌ষ্টিমেয় বড় জমিদার বাদ দিলে শত শত মাঝারি মধ্যস্বত্ব ভোগী, এবং সহস্র সহস্র এমন জমিদার আছে, যাহাদের অবস্থা দারিদ্র্য-পীড়িত সাধারণ রায়তেরই মত। আমি যতদ্‌র জানি তাহাতে য্‌ক্তপ্রদেশে মোট প্রায় পনর লক্ষ জমিদার আছে। ইহাদের শতকরা নব্ব্‌ই জনই দরিদ্র কৃষকের মত, অবশিষ্ট অংশের অবস্থা মোটাম্‌টি ভাল। একট্‌ বড় গোছের জমিদারের সংখ্যা সমস্ত প্রদেশে প্রায় পাঁচ হাজার হইবে এবং ইহাদেরও শতকরা দশ জন মাত্র জমিদার ও তাল্‌কদার। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষ্‌দে জমিদার অপেক্ষা বড় জোতদারের অবস্থা অনেক ভাল। এই সকল গরীব জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী জোতদার, শিক্ষার দিক দিয়া অনগ্রসর হইলেও সাধারণতঃ এই শ্রেণীর নরনারী ব্‌দ্ধিমান, এবং উপয্‌ক্ত শিক্ষা পাইলে ইহারা অনেক উন্নত হইতে পারে। ইহারা জাতীয় আন্দোলনে উৎসাহের সহিত অংশ গ্রহণ করে। কয়েকজন ব্যতীত বড় জমিদার বা তাল্‌কদার কখনও তাহা করেন না। আভিজাত্যের স্বাভাবিক গ্‌ণও ইহাদের মধ্যে নাই। শ্রেণী-হিসাবে ইহাদের শারীরিক ও মানসিক অবনতি অতি শোচনীয়। ইহাদের দিন ফ্‌রাইয়াছে। যতদিন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মত বাহিরের শক্তি ইহাদিগকে রক্ষা করিবে, ততদিন কোনমতে টিঁকিয়া থাকিবে মাত্র।

১৯২১ সালে সমস্ত য্‌ক্তপ্রদেশ আমার কর্মক্ষেত্র হইলেও আমি মাঝে মাঝে পল্লীতে যাইতাম। তখন অসহযোগ আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার বার্তা স্‌দ্‌র পল্লীতেও গিয়া পেঁাছিয়াছে। প্রত্যেক জিলার কংগ্রেসকর্মীরা ন্‌তন বাণী প্রচারের জন্য পল্লীতে যাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের দ্‌র্দশার প্রতিকার হইবে এমন আশ্বাসও দিতেন। স্বরাজ শব্দটি ছিল ব্যাপক, উহাতে সমস্তই ব্‌ঝাইত। অসহযোগ ও কৃষক আন্দোলন যদিও স্বতন্ত্র তথাপি আমাদের প্রদেশে উহা মিলিত

মিশ্রিত হইয়া একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কংগ্রেসের প্রচার-কার্যের ফলে মামলা-মোকদ্দমা যথেষ্ট কমিয়া গেল, আপোষ-রফার জন্য গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠিত হইল। কংগ্রেসের প্রভাবে আবহাওয়া শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কেননা, কংগ্রেসকর্মীরা অভিনব অহিংসনীতির উপর সর্বাধিক জোর দিতেন। অহিংসনীতি যে সকলে সম্যকভাবে বুঝিত তাহা নহে, তথাপি ইহার প্রভাবে কৃষকেরা হিংসামূলক অনুষ্ঠান হইতে বিরত ছিল।

এই সাফল্য সামান্য নহে। কৃষক চাঞ্চল্য প্রায়শঃই হিংসামূলক উপদ্রবের ও বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। অযোধ্যার অংশবিশেষে কৃষকগণ এইকালে অসহিষ্ণু উত্তেজনায় মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। একটি স্ফুলিঙ্গে দাবানল জ্বলিয়া উঠিতে পারিত, তথাপি তাহারা আশ্চর্যরূপে শান্ত ছিল। কেবল একটি বলপ্রয়োগের কথা আমার মনে আছে। একজন তালুকদার তাহার নিজের বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যখন গল্পগুজব করিতেছিল সেই সময় একজন কৃষক আসিয়া তাহাকে স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার ও অসৎ জীবন যাপনের জন্য ভর্ৎসনা করিয়া তাহার মুখে চপেটাঘাত করে।

আর এক শ্রেণীর উপদ্রব দেখা দিল, যাহার ফলে গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ বাধিল কিন্তু এই সংঘর্ষ অনিবার্য, কেননা, সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকগণের ক্রমবর্ধিত শক্তি গভর্ণমেণ্ট উপেক্ষা করিতে পারে না। কৃষকেরা দলে দলে সভায় যোগ দিবার জন্য বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই সকল জনসভায় ৬০।৭০ হাজার পর্যন্ত লোক হইত, তাহাদিগকে হটান কঠিন। যাহা কেহ কখনও শোনে নাই তাহাই ঘটিতে লাগিল, অর্থাৎ তাহারা প্রকাশ্যভাবে রেলকর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করিয়া বলিতে লাগিল যে পুরাতন দিন চলিয়া গিয়াছে। কাহার প্ররোচনায় তাহারা বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করিতে লাগিল আমি জানি না, আমরা তাহাদিগকে ইহা বলি নাই। সহসা শুনিলাম যে তাহারা ঐরূপ করিতেছে। অবশ্য রেলকর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করায় ইহা রহিত হইল। ১৯২০র শরৎকালে (যখন আমি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য কলিকাতায় ছিলাম) কয়েকজন কৃষক-নেতা সামান্য অপরাধে গ্রেপ্তার হয়। প্রতাপগড় সহরে তাহাদের বিচার হইবে স্থির হইয়াছিল। বিচারের দিন চারিদিক হইতে বিশাল জনতা আসিয়া জেলের দরজা হইতে আদালত প্রাঙ্গণ পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিল। ম্যাজিস্ট্রেট ভীত হইয়া সেদিনের মত বিচার স্থগিত রাখিলেন, কিন্তু জনতা বাড়িতে লাগিল। এবং কারাগার প্রায় ঘিরিয়া ফেলিল। কৃষকেরা এক মুষ্টি ভাজা চানা খাইয়া অনায়াসে কয়েকদিন কাটাইতে পারে। অবশেষে সম্ভবতঃ জেলের মধ্যেই কোন রকমে বিচার সারিয়া কৃষক-নেতাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ঘটনাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু কৃষকেরা ইহাকে একটা প্রকাণ্ড জয় বলিয়া মনে করিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, কেবলমাত্র জনসংখ্যার জোরেই তাহারা তাহাদের দাবী পূরণ করিয়া লইতে পারে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের নিকট এই ঔদ্ধত্য অসহ্য হইয়া উঠিল। এবং অনুরূপ আর একটি ঘটনার ফল হইল স্বতন্ত্র। ১৯২১র জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে নাগপুর কংগ্রেস হইতে এলাহাবাদে ফিরিবার পরেই রায়বেরিলি হইতে তারযোগে অনুরোধ আসিল, আমি যেন অবিলম্বে তথায় যাত্রা করি, কেননা, গোলযোগের আশঙ্কা আছে। আমি পরদিনই রওনা হইলাম। গিয়া দেখি কয়েকদিন পূর্বে কয়েকজন প্রধান কৃষক গ্রেপ্তার হইয়া স্থানীয় জেল হাজতে আটক আছে। প্রতাপগড়ে তাহাদের সাফল্য এবং অবলম্বিত কৌশলের কথা স্মরণ করিয়া দলে দলে কৃষক রায়বেরিলি সহরে আসিতে লাগিল। কিন্তু এবার গভর্ণমেণ্ট পূর্ব হইতে অতিরিক্ত

প্লিশ ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কৃষকদের সহরে প্রবেশে বাধা দিলেন। সহরের বাহিরে একটি ছোট নদীর অপর পারে অধিকাংশ কৃষককে থামাইয়া রাখা হইল। অবশ্য অনেকে নানা পথ দিয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছিল। স্টেশনে নামিয়া সমস্ত অবস্থা শ্নিয়া যেখানে সৈনিকেরা কৃষকদের পথরোধ করিয়া আছে, তাড়াতাড়ি সেই নদীর দিকে অগ্রসর হইলাম। পথে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে আমাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি লেখা এক পত্র পাইলাম। আমি সেই নোটিশের পশ্চাতে উত্তরে লিখিলাম যে, কোন আইনের কোন ধারায় তিনি আমাকে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন তাহা আমি জানিতে চাই এবং তাহা না জানা পর্যন্ত আমি বিরত হইব না। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া অপর তীরে গ্লিবর্ষণের শব্দ আমার কানে আসিল। সেতুর ম্খে সৈন্যদল আমার গতিরোধ করিল। অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় নদীর ধারে শস্যক্ষেত্রে ল্কায়িত ভীত কৃষকগণ দলে দলে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের ভয় দ্র করিবার জন্য ও তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য আমি এখানেই প্রায় দ্ই হাজার কৃষক লইয়া একটি সভা করিলাম। ইহা এক অস্বাভাবিক অবস্থা। ক্ষ্দ্র নদীর অপর পারে তখন তাহাদেরই ভাইদের উপর গ্লি বর্ষিত হইতেছে এবং প্রত্যেক স্থানেই সৈন্যদল টহল দিতেছে। কিন্তু সভার উদ্দেশ্য সফল হইল, কৃষকেরা আশ্বস্ত হইল। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট গ্লিবর্ষণের স্থল হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার অন্রোধে তাঁহার সঙ্গে আমি তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। সেখানে তিনি নানা অছিলায় আমাকে দ্ই ঘণ্টা আটক রাখিলেন। ব্ঝিলাম, তিনি কৃষকগণ এবং সহরের সহকর্মীদের নিকট হইতে আমাকে সরাইয়া রাখিতে চাহেন।

আমরা পরে দেখিলাম গ্লির আঘাতে বহ্লোক মারা গিয়াছে। কৃষকেরা যদিও ছত্রভঙ্গ হইতে বা ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়াছিল তথাপি তাহারা বরাবর শান্তিপূর্ণ ছিল; আমার বিশ্বাস যে আমি কিম্বা তাহাদের বিশ্বাসভাজন কেহ তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিলে তাহারা তাহা পালন করিত। কিন্তু যাহাদের উপর তাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদের নির্দেশ মানিতে তাহারা অস্বীকার করিয়াছিল। একজন প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যাজিস্ট্রেটকে আমি না আসা পর্যন্ত কিছ্কাল অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহা তিনি শোনেন নাই। যেখানে তিনি নিজে ব্যর্থ হইতেছেন সেখানে একজন 'এজিটেটর' সাফল্য লাভ করিবে ইহা অসহ্য। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের মর্যাদাবোধ স্বতন্ত্র।

রায়বেরিলী জেলায় দ্ইবার কৃষকদের উপর গ্লি চলিয়াছিল কিন্তু তাহা হইতে শোচনীয় ব্যাপার চলিল। প্রত্যেক প্রধান কৃষক-কর্মী ও গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের সদস্য একটা ভীতির রাজত্বে বাস করিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট কৃষক আন্দোলন ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কংগ্রেসের প্রচারকার্যের ফলে তখন চরকা প্রচলন হইতেছিল। এই চরকাই সিডিশনের প্রতীক হইয়া উঠিল। চরকার মালিককে বিপদে পড়িতে হইত এবং প্রায়ই চরকা পোড়াইয়া ফেলা হইত। এইর্পে গভর্ণমেণ্ট রায়বেরিলী ও প্রতাপগড় জেলার পল্লী অঞ্চলে শত শত ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিয়া ও অন্যান্য উপায়ে কৃষক ও কংগ্রেস আন্দোলন দমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত কর্মীরা প্রায় সকলেই উভয় আন্দোলনের সহিত য্ক্ত ছিলেন।

ইহার পরেই, ১৯২১ সালে, ফৈজাবাদ জিলা ব্যাপক দমননীতির স্বাদ পাইল। এখানে অশান্তি ঘটিল এক অদ্ভুত কারণে। কতকগ্লি গ্রামের কৃষকেরা একত্রিত হইয়া এক তাল্কদারের বাড়ী ল্ট করে। পরে প্রকাশ পাইল, ঐ তাল্কদারের শত্রপক্ষীয় আর এক জমিদারের কর্মচারীরা প্ররোচনা দিয়া এই কার্য ঘটাইয়াছিল।

এই অজ্ঞ গরীব কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদিগকে লুট করিতে বলিয়াছেন এবং সেই আদেশ পালন করিবার জন্য তাহারা "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" বলিতে বলিতে লুট করিয়াছিল।

এই সংবাদ শুনিয়া আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলাম এবং দুই এক দিনের মধ্যেই ফৈজাবাদ জিলার আকবরপুরের নিকটবর্তী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। সেই দিনই আমি এক সভা আহ্বান করিলাম। ঘটনাস্থলে আট-দশ মাইল দূরবর্তী গ্রামসমূহ হইতে পর্যন্ত লোক আসিল, সভায় পাঁচ-ছয় হাজার লোক হইল। আমি কঠিন ভাষায় তিরস্কার করিলাম,—এই অপকার্যের দ্বারা তোমরা তোমাদিগকে ও আমার উদ্দেশ্যকে কলঙ্কিত করিয়াছ। তোমাদের প্রকাশ্যে অপরাধ স্বীকার করা উচিত (তখন আমি আমার জ্ঞানবিশ্বাস মতে গান্ধিজীর সত্যাগ্রহে অনুপ্রাণিত ছিলাম)। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, যাহারা লুণ্ঠনে যোগ দিয়াছিল তাহারা হস্ত উত্তোলন করুক। আশ্চর্য এই, তৎক্ষণাৎ সভামধ্যে বহুতর পুলিশকর্মচারীর সম্মুখেই বিশ-পঁচিশ জন হাত তুলিল। ইহার অর্থ তাহারা বিপদ ডাকিয়া আনিল।

পরে ঘরোয়া আলোচনায় তাহারা সরল ভাষায় ঘটনার বিবরণ আমাকে জানাইল। আরও জানইল, কিরূপে তাহারা বিপথগামী হইয়াছিল। তাহাদের জন্য আমি দুঃখিত হইলাম। এই সকল নির্বোধ সরল লোকের দীর্ঘকারাবাসের নিমিত্তের ভাগী হইয়া আমি অনুতপ্ত হইলাম। যাহারা এই বিপদে জড়াইয়া পড়িল তাহাদের সংখ্যা পঁচিশ-ত্রিশ জনের বেশী হইবে না। এই জিলার কৃষক-আন্দোলনকে পিষিয়া মারিবার এমন মহাসুযোগ কর্তৃপক্ষ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিলেন। প্রায় এক হাজার লোক গ্রেফ্‌তার হইল। জিলার জেলখানা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া মামলা চলিল। অনেকে মামলা চলিবার সময় কারাগারেই প্রাণত্যাগ করিল, অনেকের দীর্ঘ কারাদণ্ড হইল। পরে আমি যখন কারাগারে তখন তাহাদের কয়েকজনের সহিত দেখা হইয়াছিল। বালক ও যুবকেরা তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ কারাগারে কাটাইতেছে!

ভারতীয় কৃষকদের সহ্য করিবার বা দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা অতি অল্প। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ হারায়, তথাপি ইহা আশ্চর্য যে, গভর্ণমেণ্ট ও জমিদারদের সম্মিলিত চাপ এক বৎসর কাল তাহারা প্রতিরোধ করিয়াছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের দৃঢ় আক্রমণের সম্মুখে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল, পরিণামে তাহাদের আন্দোলনের মেরুদণ্ড সাময়িক ভাবে ভাঙিয়া গেল। ভাঙিলেও আন্দোলন মরিল না। পূর্বের উৎসাহ ও জনতা না থাকিলেও অধিকাংশ গ্রামেই পুরাতন কর্মীরা ভয়ে বিহ্বল না হইয়া অল্প অল্প কাজ চালাইয়াছে। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই ঘটনা ১৯২১-র শেষভাগে কংগ্রেসের কারাগমন সিদ্ধান্তের পূর্বে ঘটিয়াছিল। পূর্ব বৎসরের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও কৃষকেরা এই আন্দোলনেও যোগ দিয়াছিল।

কৃষক আন্দোলনে ভীত হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাড়াতাড়ি ভূমিসংক্রান্ত আইন প্রণয়নে ব্রতী হইলেন। ইহাতে কৃষকের অবস্থার উন্নতির প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল বটে, কিন্তু যখন দেখা গেল, আন্দোলন আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে তখন আইনের ধারাগুলি নরম হইয়া গেল। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইল এই যে, অযোধ্যার কৃষকগণ জমির উপর জীবনস্বত্ব পাইল। ইহা শুনিতে মনোহর হইলেও পরে দেখা গেল, কৃষকের অবস্থার কোন ইতরবিশেষ হয় নাই। অযোধ্যার কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ অল্পপরিমাণে রহিয়াই গেল। ১৯২৯-এ যখন জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কট দেখা গেল তখন শস্যের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় আবার একটি সঙ্কট আসন্ন হইল।

১০

অসহযোগ

অযোধ্যার কৃষক আন্দোলনের কথা একটু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছি। এই আন্দোলনে আমার চক্ষু হইতে একটা আবরণ সরিয়া গেল। ভারতীয় সমস্যার একটা প্রধান দিক আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এতদিন জাতীয়তাবাদীরা ইহার প্রতি প্রায় কোন দৃষ্টি দেন নাই। এক অন্তর্নিহিত গভীর অসন্তোষের লক্ষণরূপে ভারতের সর্বত্রই কৃষকদের মধ্যে অশান্তি সচরাচর ঘটিয়া থাকে; ১৯২০-২১-এর অযোধ্যার একাংশের এই কৃষক আন্দোলন তাহারই অংশ মাত্র। তাহা হইলেও ইহার মধ্যে ভাবিবার ও শিখিবার অনেক কিছু ছিল। এই আন্দোলনের সূচনায় ইহার সহিত রাজনীতি বা রাজনীতিকগণের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং ইহার গতিপথেও রাজনীতিক বা বাহিরের লোকের প্রভাব যৎসামান্য। নিখিল ভারতীয় দৃষ্টিতে ইহা স্থানীয়-ব্যাপার মাত্র; বাহিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইহা অল্পই সক্ষম হইয়াছে। এমন কি, যুক্তপ্রদেশের সংবাদপত্রগুলি ইহাকে একরূপ উপেক্ষাই করিয়াছে। কেননা সম্পাদকগণ এবং তাঁহাদের নাগরিক পাঠকগণের নিকট অর্ধনগ্ন কৃষকদের কার্যাবলীর রাজনৈতিক অথবা অন্য কোন গুরুত্ব নাই।

পাঞ্জাব ও খিলাফতের অবিচার এবং সেই অন্যায়ের প্রতিকার স্বরূপ অসহযোগই তখন মুখ্য আলোচনার বিষয়। জাতীয় স্বাধীনতা বা স্বরাজের উপর তখন বেশী জোর দেওয়া হইত না। গান্ধিজীও অনির্দিষ্ট বৃহৎ উদ্দেশ্য পছন্দ করিতেন না। তিনি সর্বদাই সুনির্দিষ্ট কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্যের উপর ঐকান্তিক জোর দেওয়া পছন্দ করেন। তৎসত্ত্বেও জনসাধারণের চিন্তায় কথায় স্বরাজ শব্দটি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ও অসংখ্য সভা-সমিতিতে স্বরাজের কথা উল্লিখিত হইত। ১৯২০-র শরৎকালে কলিকাতায় কর্মপদ্ধতি ও বিশেষভাবে অসহযোগের কথা আলোচনার জন্য কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহূত হইল। দীর্ঘকাল নির্বাসনের পর আমেরিকা হইতে সদ্যপ্রত্যাগত লালা লাজপত রায় হইলেন সভাপতি। অসহযোগ প্রস্তাবের নূতন ধারা তিনি পছন্দ করিলেন না এবং প্রতিবাদ করিলেন। ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে তিনি একজন চরমপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার সাধারণ মনোভাব ছিল নিয়মতান্ত্রিক ও মডারেট। শতাব্দীর প্রথমভাগে লোকমান্য তিলক ও অন্যান্য চরমপন্থীদের সহিত তিনি ঘটনাচক্রে মিশিয়া গিয়াছিলেন; নিজের কোনও মর্মগত বিশ্বাস হইতে নহে। কিন্তু দীর্ঘকাল বিদেশে থকার জন্য অনেক ভারতীয় নেতা অপেক্ষা তাঁহার অর্থনৈতিক ও সামাজিক-দৃষ্টি অধিকতর উদার ছিল।

উইলফ্রেড্ স্কাউয়েন ব্লান্ট্ তাঁহার রোজনামচায় (সম্ভবতঃ ১৯০৯) গোখ্লে এবং লালাজীর সহিত সাক্ষাতের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি উভয়কেই অতি সাবধানী এবং বাস্তবের সম্মুখীন হইতে ভীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি লালাজী তৎকালে অধিকাংশ ভারতীয় নেতাদের অপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন। ব্লান্টের বিবৃতি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তৎকালে আমাদের রাজনৈতিক ধারণা কত নিম্নস্তরের এবং আমাদের নেতারা কিরূপ ছিলেন তাহা একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ বিদেশীর দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে ইহার কি বিপুল পরিবর্তন হইয়াছে!

একমাত্র লালাজী নহেন, আরও অনেক শক্তিশালী ব্যক্তিও প্রতিবাদী হইলেন।

একবাক্যে, কংগ্রেসের প্রবীণ সেনানায়কগণ একযোগে গান্ধিজীর অসহযোগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিলেন। মিঃ সি. আর. দাশ হইলেন বিরুদ্ধ দলের নেতা।* তিনি অবশ্য প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত ভাবের বিরোধী ছিলেন না। ঐ প্রস্তাব মত কার্য করিতে, এমন কি তদপেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকারের জন্যও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার প্রধান আপত্তির বিষয় ছিল, নূতন আইন সভাগুলি বর্জন-প্রস্তাবে।

প্রধান প্রধান প্রবীণদের মধ্যে তখন একমাত্র আমার পিতাই গান্ধিজীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে ইহা সহজ ছিল না। যে সকল কারণে তাঁহার প্রাচীন সহকর্মীগণ বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার দ্বারা তিনিও প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মত তিনিও এই অভিনব পথে নিরুদ্দেশ যাত্রায় দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ইহার ফলে জীবনের অভ্যস্ত গতিপথ পরিবর্তিত হইবে, তথাপি তিনি কার্যতঃ কিছু করিবার অনিবার্য আবেগ অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চিন্তাধারার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও এই প্রস্তাবের মধ্যে তিনি প্রণালীবদ্ধ কর্মের সন্ধান পাইয়াছিলেন। নিজের মনকে প্রস্তুত করিতে তাঁহার অনেক সময় লাগিয়াছিল। গান্ধিজী ও মিঃ সি. আর. দাশের সহিত তাঁহার দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। মফঃস্বলে একটা বড় মামলার দুই পক্ষে তিনি ও মিঃ দাশ ছিলেন। মামলা ছাড়িয়া দিয়া ক্ষতি স্বীকার করা লইল। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ হয় নাই, বরঞ্চ তাঁহারা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত মতভেদের ফলে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মূল প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁহারা ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেন। তিন মাস পরে তাঁহারা নাগপুর কংগ্রেসে পুনরায় মিলিত হইলেন ও তখন হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইয়া একত্রে কার্য করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশেষ কংগ্রেসের পূর্বে পিতার সহিত আমার কদাচিৎ দেখা হইত। কিন্তু যখনই দেখা হইত তখনই লক্ষ্য করিতাম এই সকল সমস্যা লইয়া তিনি অত্যন্ত বিব্রত। সমস্যার জাতীয় দিক ছাড়াও একটা ব্যক্তিগত দিক ছিল। অসহযোগ করিলে আইন ব্যবসায় বর্জন করিতে হইবে। তাঁহার অর্থ অর্থনৈতিক জীবনকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে, ষাট বৎসর বয়সে ইহা সহজ নহে। পুরাতন রাজনৈতিক বন্ধুগণ, ব্যবসায়, অভ্যস্ত সামাজিক জীবন, ব্যয়বহুল বিলাসব্যসন—এ সকলই ছাড়িতে হইবে। আর্থিক সমস্যাও কম নহে। তাঁহার আইন ব্যবসায়ের উপার্জন বন্ধ হইলে জীবনযাত্রার বহুল অংশে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে।

কিন্তু এসকল সত্ত্বেও তাঁহার যুক্তিবাদ, তাঁহার তীব্র আত্মমর্যাদাজ্ঞান, তাঁহার আত্মগরিমা তাঁহাকে নূতন আন্দোলনে একান্তভাবে টানিয়া লইয়া গেল। পাঞ্জাবের অত্যাচার এবং তৎপূর্ববর্তী বহু ঘটনায় তাঁহার চিত্তে ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছিল, অন্যায় অবিচার ও জাতীয় অমর্যাদায় তাঁহার চিত্ত তিক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা প্রকাশের পথ কোথায়? আকস্মিক উত্তেজনায় কিছু করিবার মত লোক তিনি নহেন। আইনজীবীর সুনিয়ন্ত্রিত বুদ্ধির দ্বারা সকল দিক তুলনামূলে করিয়া বিচার করিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসিলেন এবং গান্ধিজীর সহিত আন্দোলনে যোগ দিলেন।

গান্ধিজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণা দুইই ছিল প্রবল। যে ব্যক্তির প্রতি তাঁহার মন বিতৃষ্ণ হইত,

---

* কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধতায় নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সংশোধক প্রস্তাব আনিয়াছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল।—অনুবাদক।

তাহার সহিত তিনি কিছ‍ুতেই ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে পারিতেন না। কিন্তু ইহা এক আশ্চর্য সম্মিলন। একজন কঠোর তপস্বী অন্যজন ভোগবাদী; একজনের দৈহিক ভোগ-বাসনা বর্জিত ধর্মজীবন, অপরের জীবনে ইন্দ্রিয়গ্রাম ও ভোগবাসনা স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক এবং পরলোক সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপহীন অবজ্ঞা। মনস্তত্ত্বের ভাষায় একজন অন্তর্ম‍ুখ অপরে বহির্ম‍ুখ। কিন্তু উদ্দেশ্যের ঐক্য তাঁহাদিগকে একত্র মিলিত করিল। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক মতভেদ ঘটিলেও তাঁহাদের বন্ধ‍ুত্ব অক্ষ‍ুন্ন ছিল।

ওয়াল্টার পেটার তাঁহার একখানি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তপস্বী ও ভোগীর জীবনের সাধনপথ, প্রকৃতি, স্বতন্ত্র ও বিরোধী হইলেও উভয়ের দ‍ৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতার মধ্যে এক আশ্চর্য সৌসাদ‍ৃশ্য বিদ্যমান। উভয়ের প্রকৃতি নীচতাবর্জিত বলিয়া পরস্পরকে জানিতে ও ব‍ুঝিতে স‍ুবিধা হয়, যাহা সাধারণ বিষয়ী লোকের পক্ষে সহজসাধ্য নহে।

কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনের পর কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধী-য‍ুগ প্রবর্তিত হইল। দেশবন্ধ‍ু চিত্তরঞ্জন দাশ ও আমার পিতার নেতৃত্বে চালিত স্বরাজ্য দলের অভ্যুদয়ের পর গান্ধিজী তাঁহাদের স‍ুযোগ দিয়া অল্পকালের জন্য সরিয়া দাঁড়াইলেও তাঁহার ধারাই চলিতেছিল। কংগ্রেসের ভোল ফিরিয়া গেল। ইয়োরোপীয় পোষাক অন্তর্হিত হইয়া আসিল খাদি। নিম্ন-মধ্যশ্রেণী হইতে আগত এক ন‍ূতন প্রতিনিধি দল দেখা দিল। কংগ্রেসের ভাষা হইল হিন্দ‍ুস্থানী অথবা যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইত সেই প্রদেশের ভাষা। জাতীয় কার্যে বিদেশীয় ভাষা ব্যবহারে আপত্তি বাড়িতে লাগিল। অধিকাংশ প্রতিনিধি ইংরাজী জানিত না। এক ন‍ূতন উত্তেজনা, ন‍ূতন আগ্রহ কংগ্রেস সম্মেলনে প্রত্যক্ষ করা গেল। কংগ্রেসের অধিবেশনের পর গান্ধিজী 'অম‍ৃতবাজার পত্রিকা'র প্রবীণ সম্পাদক মতিলাল ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। তখন তিনি ম‍ৃত্যুশয্যায়। মতিবাব‍ু গান্ধিজী ও তাঁহার আন্দোলনকে আশীর্বাদ করিলেন ও বলিলেন, 'আমার দিন ফ‍ুরাইয়াছে। ইহলোক ছাড়িয়া কোথায় যাইব জানি না, তবে আমার একমাত্র সন্তোষ, যেখানেই যাইব সেখানে নিশ্চয়ই ব‍ৃটিশ সাম্রাজ্য নাই। এতদিন পর এই সাম্রাজ্যের বন্ধন-ম‍ুক্তি!'

কলিকাতা হইতে ফিরিবার পথে আমি গান্ধিজীর সহিত শান্তিনিকেতনে গিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার সর্বজনপ্রিয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা 'বড়দাদার' দর্শনলাভ করিলাম। সেখানে আমরা কয়েকদিন কাটাইলাম। এই সময় সি. এফ. এন্ড‍্র‍ুজ আমাকে কয়েকখানি বই উপহার দিয়াছিলেন। আফ্রিকার সাম্রাজ্যনীতির ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এ বইগ‍ুলি পড়িয়া আমি যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে মোরেল রচিত 'ব্ল্যাক ম্যান্‌স বার্ডন' নামক বইখানি পড়িয়া আমার মন আলোড়িত হইয়াছিল।

এই সময় ভারতের স্বাধীনতা সমর্থন করিয়া সি. এফ. এন্ড‍্র‍ুজ একখানি প‍ুস্তিকা লেখেন। সিলির ভারত সম্পর্কিত রচনার উপর ভিত্তি করিয়া এই স‍ুন্দর প্রবন্ধটি লেখা হইয়াছিল। স্বাধীনতার স্বপক্ষে অখণ্ডনীয় য‍ুক্তির অবতারণা করিয়া তিনি এই প্রবন্ধে ভারতের মর্মকথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমাদের চিত্তের গভীর আলোড়ন এবং অনির্দিষ্ট আশা আবেগময়ী ভাষায় ফ‍ুটাইয়া তুলিয়াছিলেন; কোনও অর্থনৈতিক সমস্যা অথবা সমাজতন্ত্রবাদের অবতারণা তিনি করেন নাই। ইহা নিছক সহজ জাতীয়তাবাদ। ইহা ভারতের তীব্র অপমান বোধ হইতে নিষ্কৃতির উগ্র আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের অধোগতির স্রোত র‍ুদ্ধ করিবার আবেগ। বিদেশী ও

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সদনে জওহরলাল
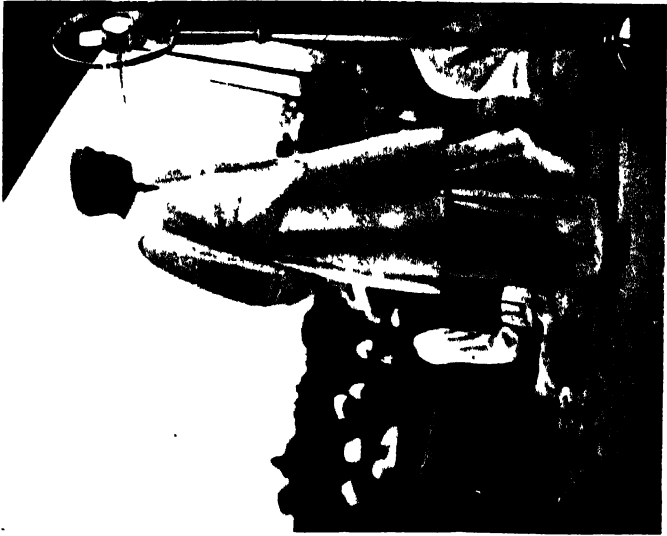
জনসভায় বক্তৃতা
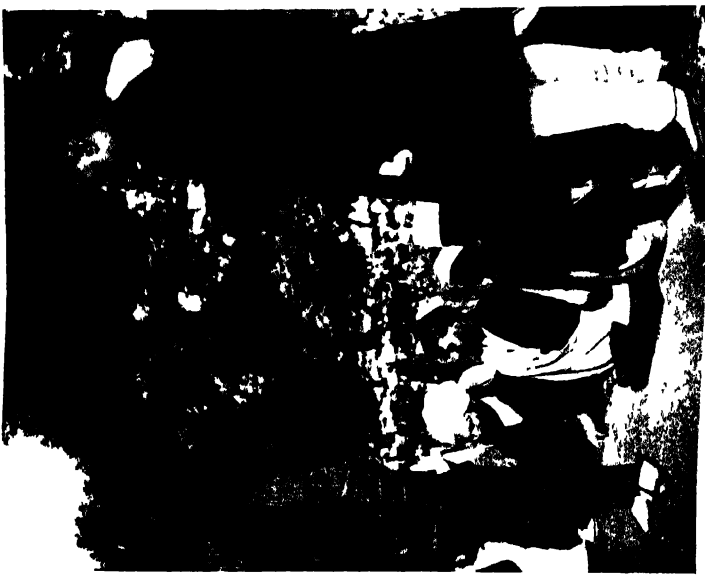
লাহোর কংগ্রেস ১৯২৯
সভাপতি জওহরলাল নেহরু দণ্ডায়মান

শাসকসম্প্রদায়ের সন্তান হইয়াও তিনি যে আমাদের মনের কথার এমন হুবহু প্রতিধ্বনি করিতে পারিলেন ইহা আশ্চর্য। সিলি বহুপূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন যে, "বিদেশী শাসনকে সমর্থন দ্বারা অব্যাহত রাখিবার যে লজ্জা তাহাই অসহযোগের প্রসূতি" এবং এন্ড্রুজও লিখিয়াছেন, "আভ্যন্তরীণ শক্তিকে জাগ্রত করাই আত্মপ্রতিষ্ঠার এক মাত্র পথ। ভারতের আত্মার মধ্য হইতেই প্রস্ফুরণের প্রচণ্ড শক্তিকে জাগ্রত করিয়া আলোড়ন আনিতে হইবে। বাহির হইতে আগত কোন ঘোষণা, অনুগ্রহ, পুরস্কার বা ঋণ দ্বারা ইহা সম্ভব নহে। ইহা কেবলমাত্র ভিতর হইতেই সম্ভব। অতএব আমি মানসিক অপূর্ব তৃপ্তি লইয়া দুর্বহ ভারমুক্তির প্রচেষ্টায় আত্মিক শক্তির এই প্রস্ফুরণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। মহাত্মা গান্ধী ভারতের কর্ণে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন,—'মুক্ত হও, ক্রীতদাস থাকিও না!' ভারতবর্ষে চেতনা সঞ্চার হইতেছে। সহসা সঞ্চালিত দেহে বন্ধনশৃঙ্খল শিথিল হইতেছে এবং স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হইল!"

পরবর্তী তিন মাস কাল সমগ্র দেশে অসহযোগ আন্দোলন অগ্রসর হইতে লাগিল। নূতন আইন-সভার নির্বাচন বর্জন আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিল। কিন্তু আইন-সভায় প্রবেশার্থী প্রত্যেককে নিবারণ করা কিংবা সদস্যপদ শূন্য রাখা সম্ভবপর নহে। মুষ্টিমেয় ভোটার যাহাকে খুসী নির্বাচিত করিতে পারে এবং অন্য প্রার্থীর অভাবে যে-কেহ বিনা বাধায় নির্বাচিত হইতে পারে। অধিকাংশ ভোটারই ভোট দিতে বিরত রহিল এবং দেশের তীব্র মনোভাব দেখিয়া অনেকেই প্রার্থী হইলেন না। ভোট গ্রহণের দিন স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল এলাহাবাদে উপস্থিত ছিলেন এবং ভোট কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বয়কটের আশ্চর্য সাফল্যে তিনি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এলাহাবাদ সহরের পনর মাইল দূরবর্তী এক গ্রাম্য ভোটকেন্দ্রে তিনি একজন ভোটারও দেখিতে পান নাই। তাঁহার এই অভিজ্ঞতার কথা ভারত সম্পর্কিত এক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা কংগ্রেসে মিঃ সি. আর. দাশ ও আরও অনেকে বয়কটের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও তাঁহারা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছিলেন। নির্বাচন শেষ হইলে মতভেদের কারণ অন্তর্হিত হইল। ১৯২০-র ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে পুরাতন কংগ্রেস নেতারা অসহযোগের ভূমিতে আসিয়া মিলিত হইলেন। আন্দোলনের আশ্চর্য সাফল্যে অনেকের সংশয় দ্বিধা দূর হইল।

কলিকাতা কংগ্রেসের পর কয়েকজন খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় নেতা কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন, মিঃ এম এ জিন্না তাঁহাদের অন্যতম। সরোজিনী নাইডু তাঁহাকে বলিতেন, "হিন্দু-মুসলমান মিলনের দূত।" অতীতে তাঁহার চেষ্টায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মিলন হইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেসের নবরূপান্তর—অসহযোগ ও নূতন নিয়মতন্ত্রদ্বারা কংগ্রেসকে জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার চেষ্টা তিনি অনুমোদন করিলেন না। বাহ্যতঃ রাজনৈতিক কারণে হইলেও আসলে তাঁহার কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার কারণ রাজনৈতিক নহে। এখন কংগ্রেসে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার মত অগ্রসর নহেন। নূতন কংগ্রেসের সহিত তাঁহার প্রকৃতিগত ঐক্য সম্ভব হইল না। খদ্দর পরিহিত জনসাধারণ হিন্দি বক্তৃতা দাবী করিয়া থাকে, ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। জনসাধারণের উৎসাহ তাঁহার নিকট ইতর জনতার ভাবাতিশয্য বলিয়া মনে হইল। লণ্ডনের 'সেভিল রো' কিংবা 'বণ্ড স্ট্রীটের' সহিত কুটীর সমন্বিত ভারতীয় গ্রামের যে পার্থক্য, জনসাধারণের সহিত তাঁহার পার্থক্য সেইরূপ। তিনি একবার একান্তে বলিয়াছিলেন, অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ না করিলে কাহাকেও কংগ্রেসে

লওয়া উচিত নহে। এই প্রস্তাব তিনি ঐকান্তিকভাবে করিয়াছিলেন কি-না জানি না, তবে ইহার সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য ছিল। এইরূপে তিনি কংগ্রেস হইতে সরিয়া গেলেন। এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রে সৈন্যহীন সেনাপতির মত একক হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তীকালে এই পুরাতন মিলনের দূত অতিমাত্রায় প্রগতিবিরোধী মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

অবশ্য 'মডারেট' বা 'লিবারেল'দের সহিত কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক রহিল না, তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের সহিত যোগ দিয়া নূতন শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিত্ব ও অন্যান্য উচ্চপদ গ্রহণ করিলেন এবং অসহযোগ ও কংগ্রেস দমনে সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিছু শাসন সংস্কার পাইয়াই তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল। কাজেই তাঁহাদের আন্দোলনের আর প্রয়োজনীয়তা রহিল না। যখন সমস্ত দেশ উৎসাহে অধীর ও আমূল পরিবর্তন-প্রয়াসী, তখন তাঁহারা প্রকাশ্যে পরিবর্তন-বিরোধী হইয়া গভর্ণমেণ্টের অংশ রূপে পরিবর্তিত হইলেন। জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিল এবং ক্রমে তাঁহারা সমস্যাগুলিকে শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। দল বলিয়া তাঁহাদের কিছু রহিল না, বড় বড় নগরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব রহিল মাত্র। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নির্দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের দূত হইয়া ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, গভর্ণমেণ্টের বিরোধিতার জন্য কংগ্রেস এবং তাঁহার স্বদেশবাসীর নিন্দাপ্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তথাপি লিবারেলগণ সুখী হইলেন না। নিজের স্বদেশবাসী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জনসাধারণের ক্রুদ্ধ বিরোধকে চোখ কান বুজিয়া অস্বীকার করিলেও তাহা অত্যন্ত তিক্ত এবং অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা, গণ-আন্দোলন সংশয়াতুরদিগকে ক্ষমা করে না। গান্ধিজীর পুনঃ পুনঃ সাবধান বাণীর ফলে অসহযোগ আন্দোলন তাহার বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতি সদয় ও ভদ্র ছিল, অন্যথা কি হইত বলা যায় না। এক দিকে আন্দোলন তাহার সমর্থকদিগের মধ্যে যেমন নূতন জীবনীশক্তির উদ্বোধন করিল, তেমনই অন্য দিকে বিরুদ্ধবাদীরা এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নির্জীব হইয়া অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। গণজাগরণ ও প্রকৃত বৈপ্লবিক আন্দোলন সর্বত্রই দ্বি-ধার তরবারির মত কাজ করিয়া থাকে; একদিকে ইহা গণনায়কদের ব্যক্তিত্বকে সচেতন করিয়া তোলে, অন্যদিকে বিরুদ্ধবাদীদিগের মানসিক অবস্থা নিস্তেজ করিয়া ফেলে। এই কারণে কেহ কেহ যে অসহযোগ আন্দোলন পরমতঅসহিষ্ণু এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া কর্ম ও মতের প্রাণহীন সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চাহে, এই অভিযোগ করিয়া থাকেন ইহা সত্য, কিন্তু সে সত্য এই যে, অসহযোগ আন্দোলন গণআন্দোলন এবং ইহার নেতার প্রখর ব্যক্তিত্ব ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অপূর্ব প্রেরণায় উদ্বোধিত করিয়াছিল।

জনসাধারণের উপর ইহার আশ্চর্য প্রভাবও এক মর্মান্তিক সত্য। পাষাণভার ঠেলিয়া ফেলিয়া এক মহান ভাব ও উন্মাদনায় স্বাধীনতার নবীন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। ভয়ের দুর্বহ ভার দূরে সরিয়া গেল, তাহারা ঋজু মেরুদণ্ড লইয়া শির উন্নত করিল। সুদূর পল্লীর বাজারে অতি সাধারণ লোকেরাও কংগ্রেস, স্বরাজ, পাঞ্জাব ও খিলাফতের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। (নাগপুরে কংগ্রেসেই প্রথম স্বরাজ লাভ লক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়)। পল্লী অঞ্চলে 'খিলাফৎ' শব্দটির এক অভিনব অর্থ করা হইত। জনসাধারণ মনে করিত ইহা উর্দু শব্দ 'খিলাফ' হইতে আসিয়াছে। তাহার অর্থ বাধা দেওয়া—বিরোধিতা করা। তাহারা ধরিয়া লইল, ইহার অর্থ গভর্ণমেণ্টের বিরোধিতা করা। অগণিত সভা-সমিতির মধ্য দিয়া

জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান বিস্তৃত হইতে লাগিল। এবং তাহারা নিজেদের বিশেষ অর্থনৈতিক দুর্গতির বিষয় আলোচনা করিতে শিখিল।

কংগ্রেস কার্যপদ্ধতি লইয়া সমস্ত ১৯২১ সন আমাদের এক অপূর্ব উন্মাদনার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে। আশা উৎসাহ ও উত্তেজনার অন্ত ছিল না। মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আত্মসমর্পণের আনন্দে আমরা অভিভূত হইয়াছি। কোন সন্দেহ, কোন দ্বিধা আমাদের ছিল না। সম্মুখে প্রশস্ত পথ—পরস্পরের সহযোগিতা ও উৎসাহের সাহায্যে আমরা সৈনিকের দর্প লইয়া অগ্রসর হইয়াছি, যে শ্রম কখনও কল্পনা করি নাই আমরা ততোধিক শ্রম করিয়াছি। আমরা জানিতাম, গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য—আসন্ন। সেই জন্য কর্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইবার পূর্বে যতটা সম্ভব কাজ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম।

সর্বোপরি স্বাধীনতার অনুভূতি, স্বাধীনতার গর্বে আমাদের মন ভরিয়া উঠিল। অতীত দিনের আশাভঙ্গজনিত মনের দুর্বহ ভার অন্তর্হিত হইল। ফিস্ ফাস্ করিয়া কথা বলা, শাসকবর্গের দণ্ড এড়াইবার জন্য ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আইনসঙ্গত বক্তৃতা করার প্রয়োজন আর রহিল না। আমরা যাহা ভাবিতাম, তাহাই উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিতাম। ফল যাহাই হউক কি আসে যায়? কারাগার? তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য অধিকতর সাফল্য লাভ করিবে। অগণিত গুপ্তচর এবং গোয়েন্দা বিভাগের ব্যক্তিরা আমাদের পিছনে পিছনে সর্বদাই ঘুরিত। এই বেচারাদের কি দুরবস্থা! কেননা আবিষ্কার করিবার মত গোপন কোন কিছুই নাই। কারণ আমাদের মন মুখ ছিল এক।

আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভারতবর্ষের এই দ্রুত পরিবর্তন দেখিয়া আমরা বিশ্বাস করিতাম স্বাধীনতা নিকটবর্তী হইতেছে। আমাদের রাজনৈতিক কার্যের সাফল্যে আমরা আনন্দিত হইতাম। আমাদের উদ্দেশ্য ও উপায় বিরুদ্ধ দল অপেক্ষা উন্নততর। এজন্য আমরা তাহাদের অপেক্ষা নৈতিক দিক দিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠতর মনে করিতাম। এক অভিনব পন্থার আবিষ্কারক আমাদের নেতার জন্য আমরা গর্ব বোধ করিতাম। এই গর্ব সময় সময় আমাদিগকে ধর্মোন্মাদনার মত অভিভূত করিত। চারিদিকের সংঘর্ষের মধ্যেও এবং সংঘর্ষে রত থাকিয়াও আমরা এক অপূর্ব মানসিক শান্তি অনুভব করিতাম।

আমাদের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট বিহ্বল হইলেন। তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না যে কি ঘটিতেছে। মনে হইতে লাগিল, ভারতবর্ষে তাঁহাদের পরিচিত প্রাচীন ব্যবস্থা ওলট পালট হইয়া যাইতেছে। সর্বত্র এক আক্রমণোন্মুখ শক্তির বিকাশ এবং নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়, ব্রিটিশ শাসনের যে প্রধান স্তম্ভ—মর্যাদা, তাহাই যেন মুষড়াইয়া পড়িল। অতি সামান্য পরিমাণ দমননীতি আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করিল। বড় বড় নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু করিতে গভর্ণমেণ্ট দীর্ঘকাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কি প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইতে পারে তাহা তাঁহারা ভাবিয়া পাইলেন না। ভারতীয় সৈন্যদলকে কি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়? পুলিশ কি আমাদের আদেশ পালন করিবে? ভাইসরয় লর্ড রেডিং ১৯২১-এর ডিসেম্বর মাসে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা "হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়" (puzzled and perplexed)।

১৯২১-এর গ্রীষ্মকালে যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট, জিলা কর্মচারিদের নিকট একখানি কৌতুককর ইস্তাহার প্রেরণ করেন। পরে উহা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল। 'শত্রুরাই' (অর্থাৎ কংগ্রেস) আগ্ বাড়াইয়া সব কিছু করিতেছে, এজন্য উহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছিল। সরকারের তরফ হইতে কিছু করিবার জন্য

নানা উপায় চিন্তা করা চলিতে লাগিল। ইহার ফলেই হাস্যকর 'আমান সভার' সৃষ্টি। লোকের বিশ্বাস, এই উপায়ে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত একজন মডারেট মন্ত্রীর আবিষ্কার।

বহু ব্রিটিশ শাসকের মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। চাপ অত্যন্ত অধিক। ক্রমবর্ধিত বিরোধিতা এবং অবাধ্যতা যেন বর্ষার কালো মেঘের মত সরকারী চিত্তগগন ছাইয়া ফেলিল। শান্তিপূর্ণ ও অহিংস আন্দোলনকে বলপূর্বক দাবাইয়া দিবার কোন পথ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না। সাধারণ ইংরাজগণ অহিংসাতে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা উহাকে এক কৌশলপূর্ণ আবরণ মনে করিতেন এবং ভাবিতেন ইহার অন্তরালে এক হিংসামূলক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতেছে। রহস্যময় প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্যের বদ্ধমূল ধারণার মধ্যে লালিত-পালিত ইংরাজ সন্তান বাল্যকাল হইতেই এরূপ ভাবিতে অভ্যস্ত হয়। সে মনে করে, বাজারে সঙ্কীর্ণ গলিপথে না জানি কত গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। এইরূপে কল্পিত রহস্যাবৃত দেশ সম্পর্কে ইংরাজ কদাচিৎ সরলভাবে চিন্তা করিতে পারে। প্রাচ্যবাসীও যে রহস্যহীন সাধারণ মানুষ তাহা বুঝিবার জন্য সে চেষ্টাও করে না। সে প্রাচ্যবাসীর সংশ্রব হইতে দূরে সরিয়া থাকে। গুপ্তচর ও গুপ্তসমিতি ঘটিত গল্প ও উপন্যাস হইতে ধারণা সংগ্রহ করিয়া কল্পনায় শিহরিয়া উঠে। ১৯১৯-এর এপ্রিলে পাঞ্জাবে তাহাই ঘটিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ ইংরাজগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া সর্বত্র বিপদের বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আয়োজন হইয়া যেন এক দ্বিতীয় বিদ্রোহ আসন্ন। যে-কোনও উপায়ে আত্মরক্ষা করিবার অন্ধ আদিম মনোবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া তাঁহারা এক ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করিলেন যাহা উত্তরকালে জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং অমৃতসরের বুকেহাঁটা গলিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৯২১ সালে শাসক ও শাসিতের মনোমালিন্য চরমে উঠিয়াছিল। শাসকগণের বিরক্তি, ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবার কারণেরও অভাব ছিল না। যাহা কার্যতঃ ঘটিতেছিল তাহাকে কল্পনায় তাহারা আরও বড় করিয়া দেখিতেছিল। শাসকগণের কল্পনার আতিশয্যের একটি দৃষ্টান্ত আমার মনে আছে। ১৯২১ সালে ১০ই মে এলাহাবাদে আমাদের ভগ্নী স্বরূপের বিবাহ স্থির হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বিবাহ উপলক্ষ্যে সাধারণভাবে সম্বৎ পঞ্জিকানুসারে এই শুভদিন নির্ধারিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে গান্ধিজী ও অন্যান্য প্রধান নেতাগণ ও আলি ভ্রাতৃদ্বয় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সুবিধার জন্য এ সময় এলাহাবাদে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশনও নির্ধারিত হইয়াছিল। বাহিরের খ্যাতনামা নেতাদের আগমনের সুযোগে স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীরা বেশ জাঁকজমকের সহিত একটি জিলা সম্মেলনের ব্যবস্থা করিলেন। চারিদিকের গ্রাম হইতে বহু কৃষক ইহাতে যোগ দিবে, এইরূপ প্রত্যাশা ছিল।

এই সকল রাজনৈতিক সম্মেলনের আয়োজনে এলাহাবাদে যথেষ্ট পরিমাণে গণ্ডগোল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। ইহাতে কতকগুলি লোকের টনক নড়িয়া উঠিল। একদিন আমার এক ব্যারিস্টার বন্ধুর নিকট শুনিলাম, অনেক ইংরাজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া মনে করিতেছেন শীঘ্রই এই নগরে একটা উলটপালট উপস্থিত হইবে। তাঁহারা ভারতীয় ভৃত্যদিগকে অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন, পকেটে রিভলভার লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাও কিম্বদন্তসূত্রে জানা গেল যে স্থানীয় ইংরাজ বাসিন্দারা যাহাতে এলাহাবাদ দুর্গে আশ্রয় লইতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমি আশ্চর্য হইলাম এবং এই শ্রেণীর ধারণা

কেমন করিয়া সম্ভব হইল ভাবিয়া পাইলাম না। অহিংসা মন্ত্রের ঋষি যখন স্বয়ং আসিতেছেন তখন এই ঘুমন্ত শান্তিপূর্ণ এলাহাবাদ নগরীতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্ভবপর, ইহা বাতুলের কল্পনা। এমন কি, ইহা পর্যন্ত কানাকানি হইয়াছিল যে ১০ই মে (ঘটনাক্রমে আমার ভগ্নীর বিবাহের জন্য নির্ধারিত দিবস) ১৮৫৭-এর মিরাট বিদ্রোহের দিবস এবং স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে।

১৯২১ সালে খিলাফত আন্দোলনকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে বহু সংখ্যক মৌলবী ও মুসলমান ধর্মপ্রচারক রাজনৈতিক সংঘর্ষে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা আন্দোলনের উপর ধর্মের রং চড়াইতেন যাহাতে মুসলমান জনতা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইত। অনেক পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন মুসলমান, যাঁহারা ধর্ম লইয়া মাথা ঘামাইতেন না তাঁহারাও দাড়ি রাখিতে আরম্ভ করিলেন এবং ধর্মাচরণে নৈষ্ঠিক হইয়া উঠিলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাবের ক্রমপ্রসার ও নূতন নূতন চিন্তার ফলে যে মৌলবীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বাভাবিকরূপে কমিয়া আসিতেছিল তাহারা পুনরায় প্রবল হইয়া মুসলমান সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মনের ধর্মপ্রবণতা হইল ইহার সহায়ক, গান্ধিজীও ঐরূপ এবং তিনিও মৌলবী ও মৌলানাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

বলা বাহুল্য, গান্ধিজী সর্বদাই আন্দোলনের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভঙ্গীর উপর জোর দিতেন। তাঁহার অবশ্য ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। তথাপি সমগ্র আন্দোলনের মধ্যে এক ধর্মের জাগরণ অনুভূত হইল এবং জনসাধারণের মধ্যেও এই আন্দোলন ধর্মজীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগাইল। অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মী স্বাভাবিকরূপেই গান্ধিজীর জীবনাদর্শে নিজেদের জীবন গড়িতে লাগিলেন, এমন কি, তাঁহার ভাষা পর্যন্ত নকল করিতেন। কিন্তু গান্ধিজীর প্রধান সহকর্মীরা—কার্যকরী সমিতির সদস্যেরা, অর্থাৎ আমার পিতা, দেশবন্ধু দাশ* এবং অন্যান্য সকলে সাধারণভাবে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহারা রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে রাজনৈতিক ভিত্তিতেই বিবেচনা করিতেন। তাঁহারা জনসভায় বক্তৃতায় ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন না। কিন্তু বাক্য অপেক্ষা তাঁহাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের প্রভাবই ছিল বেশী। জগতের লোক যাহা কামনা করে সেই ঐহিক সুখ তাঁহারা বহুলাংশে ত্যাগ করিয়া সাধারণ জীবন যাপন করিতেন। ইহাকে লোকে ধর্মের লক্ষণ বলিয়াই মনে করিত এবং ইহা ধর্মভাব জাগরণের সহায়ক হইয়াছিল।

কি হিন্দু কি মুসলমান—আমাদের রাজনীতির মধ্যে এই ধর্মভাবের আধিক্য দেখিয়া আমি বিব্রত হইলাম। আমার ইহা ভাল লাগিত না। অধিকাংশ মৌলবী, মৌলানা, স্বামিজীরা জনসভায় যে ভাবে বক্তৃতা করিতেন তাহা আমার নিকট ক্লেশকর মনে হইত। তাঁহারা ইতিহাস, সমাজনীতি, অর্থনীতির সহিত ধর্মের গুড়ন-পাড়ন দিয়া সরল ভাবে চিন্তা করিবার পথ রুদ্ধ করিতেন। আমার নিকট ইহা অন্যায় বলিয়া মনে হইত। গান্ধিজীর কতকগুলি উক্তিও আমার কানে বাজিত। তিনি প্রথমেই রামরাজ ও সত্যযুগ ফিরাইয়া আনিবার কথা উল্লেখ করিতেন, কিন্তু ইহা নিবারণ করিবার শক্তি আমার ছিল না। জনসাধারণের সুপরিচিত ও সহজবোধ্য বলিয়াই গান্ধিজী ঐ শ্রেণীর উক্তি করিয়া থাকেন, ইহা মনে করিয়া আমি সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিতাম। জনসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিবার তাঁহার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

কিন্তু ইহা লইয়া আমি বেশী মাথা ঘামাইতাম না। আমার হাতে ছিল বহু

---

* দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সম্পর্কে একথা বলা চলে না।—অনুবাদক

কাজ, আমি মনে করিতাম আন্দোলনের অগ্রগতির তুলনায় এ সকল বিষয় অতি তুচ্ছ। বৃহৎ আন্দোলনে সকল শ্রেণীর সকল মতের লোকই যোগ দিয়া থাকে। যদি আমাদের মূল লক্ষ্য অব্যাহত থাকে, এই সব ছোটখাট বিক্ষোভ ও সঙ্কীর্ণতাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু গান্ধিজী এক দুর্বোধ্য বিস্ময়! সময় সময় তাঁহার ভাষা একজন আধুনিকের পক্ষে বোঝা কঠিন হইত। কিন্তু তিনি একজন মহান ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তি, তাঁহার যশস্বী নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা লইয়া আমরা প্রায় নির্বিচারে, অন্ততঃ সাময়িকভাবে, তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। সময় সময় আমরা নিজেদের মধ্যে রহস্যচ্ছলে তাঁহার খেয়াল ও বিশেষত্বগুলি আলোচনা করিতাম, যখন স্বরাজ আসিবে তখন ঐসব খেয়ালে উৎসাহ দিব না।

আমাদের মধ্যে অনেকে রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও তাঁহার বিশিষ্ট ধর্মমতের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে ধর্মভাব আমার মধ্যে সঞ্চারিত না হইলেও ইহার পরোক্ষ প্রভাব হইতে আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারি নাই। ধর্মের বাহ্য আচরণের উপর আমার কোনও আকর্ষণ ছিল না। তথাকথিত ধার্মিকরূপে জনসাধারণকে ভুলাইবার চেষ্টা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করিতাম। কিন্তু তথাপি এই বিষয়ে আমার মনের উগ্রতা কমিয়া গেল। ১৯২১ সালে আমার মনে ধর্মজীবনের নিয়মানুবর্তিতার একটা ছাপ পড়িয়াছিল যাহা আশৈশব কখনও অনুভব করি নাই। কিন্তু তথাপি ধর্ম হইতে আমি দূরেই ছিলাম।

আমাদের আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের নৈতিক বিধিবন্ধ সংযমপ্রণালী আমার ভাল লাগিত। অহিংসার পথকে আমি কোন দিনই চরমভাবে গ্রহণ করি নাই, কিন্তু ক্রমে ইহার উপর আমার আস্থা বাড়িয়াছিল। আমাদের বর্তমান অবস্থায় এবং আমাদের পরম্পরাগত সংস্কারের প্রভাবে আমাদের পক্ষে ইহাই প্রকৃত পথ, আমার মনে এইরূপ বিশ্বাসই জন্মিয়াছিল। সঙ্কীর্ণ ধর্মমতের ঊর্ধ্বে থাকিয়া রাজনীতিকে আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত করিবার আদর্শ আমার ভালই মনে হইত। মহৎ উদ্দেশ্য মহান উপায়েই সিদ্ধ হয়। ইহা যে কেবল একটা নৈতিক পথ তাহা নহে, বাস্তব রাজনীতিতেও ইহার মূল্য আছে; কেননা উপায় যদি ভাল না হয় তাহা হইলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া নূতন বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। তখন আমার মনে হইত, পঙ্কিল পথ অবলম্বন কি ব্যক্তি কি জাতির পক্ষে মর্যাদাহানিকর ও অশোভনীয়। পঙ্কিল পথের কলঙ্কমালিন্য হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি? যদি আমরা নত হইয়া সরীসৃপের মত চলি তাহা হইলে আত্মমর্যাদার সহিত উন্নতশিরে কেমন করিয়া অগ্রসর হইব?

তখন এইরূপে অনেক চিন্তা করিতাম। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে আমার প্রার্থিত বস্তু পাইলাম। জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্য—দুর্বলের শোষণের অবসান—আমার মনের মধ্যে এক অপূর্ব তৃপ্তি আনিল। আমি যেন ব্যক্তিগতভাবে মুক্তির স্বাদ পাইলাম। আমি এত উল্লসিত হইলাম যে, ব্যর্থতার সম্ভাবনা পর্যন্ত গণনার মধ্যে আনিলাম না, ভাবিতাম ব্যর্থতা আসিলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী হইবে। ভাগবত-গীতার দার্শনিক তত্ত্ব আমি বুঝিতামও না কিম্বা উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টাও করিতাম না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গান্ধিজীর আশ্রমিক প্রার্থনায় যোগ দিয়া গীতার শ্লোক পাঠ করিতাম। যাহার মধ্যে মানবজীবনের আদর্শের ইঙ্গিত ছিল—ধীর, বিগতস্পৃহ ও অনুদ্বিগ্ন হইয়া কর্তব্য কর্ম কর, ফলের জন্য লুব্ধ হইও না—আমার অধীর ও অশান্ত চিত্ত এই আদর্শে আকৃষ্ট হইত!

১১

১৯২১ এবং প্রথম কারাদণ্ড

১৯২১ আমাদের নিকট এক স্মরণীয় বৎসর। জাতীয়তা, রাজনীতি, ধর্ম, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ এবং ধর্মান্ধ গোঁড়ামির এক আশ্চর্য মিলন মিশ্রণ। এই পটভূমিকার উপর পল্লীতে কৃষকচাঞ্চল্য এবং বৃহৎ নগরীগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন মাথা তুলিতেছিল। জাতীয়তা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অস্পষ্ট অথচ গভীর ব্যাপক আদর্শবাদ এই সকল বিভিন্ন এবং স্থানে স্থানে স্ববিরোধী অসন্তোষ-গুলিকে একই কেন্দ্রে মিলিত করিতে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল। এই জাতীয়তাবাদ একটা মিলিত শক্তি, ইহার পশ্চাতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে প্রসারিত-দৃষ্টি মুসলমান জাতীয়তাবাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সময়ের গুণে ইহা এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কিছুকালের জন্য ইহা পরস্পর মিলিয়া একত্রে চলিতে লাগিল। সর্বত্র 'হিন্দু-মুসলমান কি জয়' ধ্বনি। গান্ধিজী এই বিচিত্র বিভিন্ন শ্রেণীর জনসঙ্ঘকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ইহা আশ্চর্য। (অন্য এক নেতার সম্পর্কে কথিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়) গান্ধিজী "জনসাধারণের বিমূঢ় আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক।"

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ঘটনা হইল এই, এই সকল আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ বৈদেশিক শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও ইহার মধ্যে বিশেষ বিদ্বেষের ভাব ছিল না। জাতীয়তাবাদের মূলে রহিয়াছে এক বিরুদ্ধভাব। পরজাতিবিদ্বেষ ও ঘৃণার মধ্যেই, বিশেষতঃ পরাধীন দেশে বিদেশী শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধতার মধ্যেই, ইহা পরিপুষ্ট ও সঞ্জীবিত হইয়া থাকে। ১৯২১-এর ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছিল, কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় পতিত অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা অতি আশ্চর্যরূপে অল্প ছিল, গান্ধিজীর অহিংসা নীতির প্রয়োগ-তত্ত্ব-ব্যাখ্যার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল নিঃসন্দেহ। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে জাগ্রত দেশব্যাপী শক্তির অনুভূতি এবং অদূর ভবিষ্যতেই সাফল্যের উপর পূর্ণ বিশ্বাসই ইহার অন্যতম কারণ। যখন আমরা কুশলতার সহিত কার্য করিতেছি এবং সিদ্ধির সম্ভাবনা আসন্ন তখন আমরা কেন বৃথা বিদ্বেষের বশে ক্রুদ্ধ হইব? আমরা ভাবিতাম উদারতা দেখাইলেও আমাদের ক্ষতি নাই। যদিও আমাদের কার্যধারা সতর্ক ও নিয়মানুগ ছিল তথাপি আমাদের যে সকল স্বদেশবাসী বিরুদ্ধ দলে যোগ দিয়া জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি আমরা উদার ছিলাম না। এখানে ক্রোধ ও বিদ্বেষের কথা ছিল না, কেননা, তাহারা এতই নগণ্য শক্তি যে, আমরা তাহাদিগকে অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিতাম। কিন্তু তাহাদের দুর্বলতা, সুবিধাবাদ, আত্মমর্যাদা ও জাতীয় সম্মানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমরা তাহাদিগকে আন্তরিক ঘৃণা করিতাম।

আমরা কর্মের আনন্দে মাতিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম কিন্তু আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এখন আশ্চর্য হইয়া ভাবি, তখন আমাদের আন্দোলনের কি তত্ত্বের দিক, কি দার্শনিক দিক কিম্বা আমাদের নিশ্চিত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা কেন করি নাই। অবশ্য আমরা সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে স্বরাজের কথা বলিতাম কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী উহার ব্যাখ্যা করিতাম। আন্দোলনের অংশবিশেষ বলিয়া ইহাকে রাজনৈতিক

স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী বলিয়া মনে করিতেন এবং আমরা জনসভায় তাহাই বলিতাম। আমরা অনেক ভাবিতাম, ইহার ফলে কৃষক ও শ্রমিকদের বোঝা অনেকাংশে লাঘব হইবে। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ নেতা স্বরাজ বলিতে স্বাধীনতা অপেক্ষা অনেক কম ব্ঝিতেন। গান্ধিজী নির্দ্বিগ্ন চিত্তে বিষয়টিকে অস্পষ্ট করিয়া রাখিতেন এবং এ বিষয়ে কোনও স্স্পষ্ট চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেন না। কিন্তু তিনি সর্বদাই দরিদ্রদের স্খস্বিধার কথা উল্লেখ করিতেন বলিয়া আমরা স্বস্তি বোধ করিতাম, অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি ধনীদিগকেও যথোচিত আশ্বাস দিতেন। গান্ধিজী কখনও কোন সমস্যাকে য্ক্তিবাদের দিক হইতে দেখিতেন না, তিনি চরিত্র ও ধর্মের উপর ঝোঁক দিতেন। ভারতীয় জনসাধারণের চরিত্র ও সাহসিকতাকে তিনি আশ্চর্যর্পে দৃঢ় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা কি সাহসিকতা কি চরিত্র কোনটাই অর্জন করিতে পারেন নাই অথচ মনে করিতেন শিথিল ও স্থ্লদেহের নিরীহ অভিব্যক্তিই ধার্মিকের লক্ষণ।

গান্ধী-নির্দিষ্ট সংযমের আদর্শে অন্প্রাণিত জনসঙ্ঘকে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইলাম। পদদলিত অধঃপতিত ছত্রভঙ্গ জনসাধারণ সহসা মের্দণ্ড সোজা করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল এবং অপ্র্ব শৃঙ্খলার সহিত ঐক্যবদ্ধ কার্য করিতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম, এই কার্যপ্রণালী জনগণের শক্তিকে দ্র্দমনীয় করিয়া তুলিবে। কাজের পশ্চাতে যে চিন্তা থাকা আবশ্যক, আমরা তাহা ভুলিয়া গেলাম। আমরা ভুলিয়া গেলাম যে, মতবাদ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেতনা না থাকিলে জনসাধারণের এই শক্তি ও উৎসাহ বাষ্পের মত উবিয়া যাইবে। আমাদের আন্দোলনের প্নর্ত্থানবাদী দল কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ইঁহারা এই ভাবের সৃষ্টি করিলেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন অথবা অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য অহিংস কার্যপ্রণালী একটা ন্তন বাণী, যাহা ভারতবাসীর নিকট হইতে জগৎ শিক্ষালাভ করিবে। সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের চিত্তে, আমরাই ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্বাচিত বলিয়া যে কৌতুককর ভ্রান্ত ধারণা থাকে, আমরাও অনেকাংশে ঐর্প ধারণার বশবর্তী হইয়া পড়িলাম। য্দ্ধ বা অন্যান্য সহিংস শক্তির অন্র্প অহিংসাও একটি নৈতিক অস্ত্র। ইহা যে কেবল নীতিসঙ্গত তাহা নহে, কার্যকরীও বটে। আমার বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই যন্ত্র ও আধ্নিক সভ্যতা সম্বন্ধে গান্ধিজীর প্রাতন মতবাদ মানিয়া লইয়াছিল। আমরা ভাবিতাম, তিনি নিজেও উহা অবাস্তব কল্পনা এবং আধ্নিককালে কার্যে পরিণত করা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেন। আমরা নিশ্চয়ই আধ্নিক সভ্যতার আবিষ্কারগ্লি বর্জন করিবার পক্ষপাতী ছিলাম না; আমরা ভাবিতাম, ভারতের অবস্থা ও প্রয়োজন অন্যায়ী ঐগ্লি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা সম্ভবপর। ব্যক্তিগতভাবে আমার বৃহৎ কলকারখানা ও দ্রুত ভ্রমণের উপর একটা আকর্ষণ আছে, তথাপি মহাত্মা গান্ধীর মতবাদে অনেকেই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এবং যন্ত্র ও তাহার পরিণাম সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিতেন। একদল চাহিলেন ভবিষ্যতের দিকে আর একদল অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণ্ হইয়া তাঁহারা একই উদ্দেশ্যে কার্য করিতে লাগিলেন এবং অবলীলাক্রমে ত্যাগ স্বীকার ও দ্ঃখ বরণ করিতে লাগিলেন।

আমি সম্প্র্ণর্পে আন্দোলনের মধ্যে আরও অন্যান্যের মতই ডুবিয়া গেলাম। প্রাতন বন্ধ্বান্ধব, বিশ্রম্ভালাপ, খেলাধ্লা, প্স্তক পাঠ—এ সকলই আমাকে

ছাড়িতে হইল। এমন কি, আমাদের কাজের খবর ছাড়া সংবাদপত্রও ভাল করিয়া পড়িবার সময় পাইতাম না। এ কাল পর্যন্ত জগদ্ব্যাপারের গতি ও পরিণতিগুলির সহিত পরিচিত থাকার জন্য কিছু কিছু সমসাময়িক পুস্তক পাঠ করিয়াছি। কিন্তু এখন আর তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না, আমার পারিবারিক জীবনের বন্ধন দৃঢ় হইলেও আমি আমার পরিবারবর্গ স্ত্রী ও কন্যাকে প্রায় ভুলিয়া থাকিতাম। বহুদিন পরে এই কালের কথা ভাবিতে গিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি যে, আমার পত্নী কি আশ্চর্য ধৈর্যসহকারে আমার এই অবজ্ঞা সহ্য করিয়াছেন। আফিস, কমিটি এবং জনতা—এই তিন লইয়া আমার দিন কাটিত। 'পল্লীতে প্রচার করা' ইহাই ছিল আন্দোলনের বাণী এবং আমরা মাইলের পর মাইল পদব্রজে শস্যক্ষেত্র, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া দূর দূরান্তরে গ্রামে যাইতাম এবং কৃষকসভায় বক্তৃতা করিতাম, জনগণের চিত্তের আবেগ আমাকে মুগ্ধ করিত। জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তির অনুভূতিতে আমি পুলকিত হইতাম, জনতার মনোভাব আমি ক্রমে বুঝিতে লাগিলাম। সহরের জনতা ও কৃষকদের মধ্যে পার্থক্য আমি বুঝিতে লাগিলাম। বৃহৎ জনতার ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি, ধূলি এবং অন্যান্য অসুবিধার মধ্যেও আমি বেশ আরাম বোধ করিতাম। অবশ্য তাহাদের শৃঙ্খলার অভাব মাঝে মাঝে আমাকে বিরক্ত করিত। ইহার পর আমি কয়েকবার ক্রুদ্ধ ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন জনতার সম্মুখীন হইয়াছি, তাহাদের উত্তেজনা একটা স্ফুলিঙ্গে জ্বলিয়া উঠিতে পারিত কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাসের বশে আমি অবিচলিত থাকিয়াছি। আমি জনতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সোজা তাহাদের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইতাম; তাহার ফলে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারই পাইয়াছি। এমন কি মতে না মিলিলেও ভিন্ন ব্যবহার পাই নাই। কিন্তু জনতা অস্থির ও চপলমতি, হয়ত ভবিষ্যতের গর্ভে আমার জন্য ভিন্ন রূপ অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

আমি জনসাধারণের মধ্যে মিশিয়াছি, জনসাধারণও আমাকে গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি আমি তাহাদের সহিত এক হইতে পারি নাই, নিজেকে সর্বদাই স্বতন্ত্র ভাবিয়াছি। আমার স্বতন্ত্র মানসিক স্তর হইতে জনসাধারণকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখিতাম। আমার এই বিস্ময় চিরদিনের যে, আমি আমার চারিদিকের সহস্র সহস্র ব্যক্তি হইতে সকল দিক দিয়াই পৃথক,—অভ্যাস পৃথক, আকাঙ্ক্ষা পৃথক, মানসিক ও সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক, অথচ কেমন করিয়া ইহাদের সদিচ্ছা ও বিশ্বাস অর্জন করিলাম। আমি যাহা নই তাহারা কি তাহাই ভাবিয়া আমাকে গ্রহণ করিয়াছিল? যখন তাহারা আমাকে ভাল করিয়া জানিবে, তখনও কি সহ্য করিবে? আমি কি মিথ্যা ছলনায় তাহাদের সদিচ্ছা লাভ করিয়াছি? আমি সরলভাবে সোজাসুজি তাহাদের সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি, এমন কি সময় সময় কর্কশ বাক্য ব্যবহার করিয়াছি, তাহাদের মজ্জাগত বিশ্বাস ও কথাগুলির তীব্র সমালোচনা করিয়াছি, কিন্তু তাহারা আমাকে অকাতরে সহ্য করিয়াছে। তথাপি আমার মন হইতে এই ধারণা গেল না, তাহাদের এই যে স্নেহ তাহা আমি যাহা তাহার প্রতি নহে, তাহারা কল্পনায় আমার এক স্বতন্ত্র মূর্তি গড়িয়া ভালবাসিয়াছে। এই কল্পনাগঠিত মূর্তি কতদিন থাকিবে এবং কেনই বা থাকিবে, যখন উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে তখন তাহারা দেখিবে বাস্তব মূর্তি এবং তার পর? আমার মধ্যে অনেক লঘু চাপল্য আছে কিন্তু এই সকল জনতার সম্মুখে অহঙ্কারের প্রশ্ন আসিতেই পারে না। আমাদের মধ্যশ্রেণীর অনেকে যেমন নিজেদের জনসাধারণ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন সেরূপ কোন স্থূল রুচি বা অভিনয়ের ভাবও আমাতে ছিল না। এই জনতা নির্বোধ, ব্যক্তিগতভাবে বৈচিত্র্যহীন

কিন্তু তাহাদের বৃহৎ সম্মেলন আমার চিত্তকে করুণায় দ্রব এবং প্রত্যাসন্ন দুঃখের ছায়ায় ঘনায়মান করিয়া তুলিত।

কিন্তু যেখানে বক্তৃতামঞ্চের উপর আমাদের বিশিষ্ট কর্মীদের লইয়া আমরা রাজনৈতিক সম্মেলন করিতাম তাহা ছিল স্বতন্ত্র, সেখানে অভিনয়ের ভঙ্গী, নিজেকে জাহির করিবার স্থূল রুচি এবং ফেনায়িত ভাষায় বক্তৃতা করিবার কোন অভাব হইত না। এ বিষয়ে আমরা সকলেই অল্পাধিক দোষী, কিন্তু ছোটখাট খিলাফৎ নেতাদের এ বিষয়ে জুড়ি ছিল না। বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করা কঠিন এবং আমাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকের এমন আত্মপ্রচারের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল; কাজেই আমরা বাহিরে গম্ভীর ও ভব্য হইয়া নেতার ভাবভঙ্গী নকল করিতে চেষ্টা করিতাম। কোন উচ্ছ্বাস বা লঘুচাপল্য প্রকাশ না পায় সেদিকে সচেষ্ট থাকিতাম। আমরা হাঁটিবার সময়, বসিবার সময় ও কথা বলিবার সময় হিসাব করিয়া চলিতাম। সহস্র সহস্র চক্ষু যে আমাদের দেখিতেছে সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকিতাম। আমাদের বক্তৃতা প্রায়ই খুব জোরাল হইত। কিন্তু তাহা এলোমেলো ও লক্ষ্যহীন। অপরে যেমন করিয়া দেখে তেমন করিয়া নিজেকে দেখা কঠিন। সেইজন্য নিজেকে সমালোচনা করিতে অক্ষম হইয়া আমি অপরের ভাবভঙ্গীগুলি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিতাম। ইহাতে আমি প্রচুর আমোদ পাইতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতাম, হয়ত-বা আমার ভাবভঙ্গী অপরের নিকট ঐরূপ হাস্যোদ্দীপক মনে হয়।

সমস্ত ১৯২১ সাল ধরিয়া কংগ্রেসকর্মীদের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড চলিতে লাগিল। কিন্তু তখনও ব্যাপকভাবে ধরপাকড় আরম্ভ হয় নাই। ভারতীয় সৈন্যদলে অসন্তোষ সৃষ্টির অভিযোগে আলী-ভ্রাতৃদ্বয় দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। যে বক্তৃতার জন্য তাঁহাদের কারাদণ্ড হইল তাহা শত শত বক্তৃতামঞ্চ হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি কর্তৃক পঠিত হইল। আমার কতকগুলি বক্তৃতার জন্য শীঘ্রই রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হইবে, গ্রীষ্মকালে এরূপ গুজব শুনিলাম, কিন্তু কার্যতঃ সেরূপ কিছু ঘটিল না। বৎসরের শেষভাগে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল, ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে সর্ববিধ সম্বর্ধনা বর্জন করিবার জন্য কংগ্রেস অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন। নভেম্বর মাসের শেষভাগে বাঙ্গলার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বে-আইনী ঘোষিত হইল। যুক্তপ্রদেশেও অনুরূপ ইস্তাহার জারী হইল। দেশবন্ধু দাশ বাঙ্গলায় এক উদ্দীপনাময়ী বাণী প্রচার করিলেন, "আমি দেহে লৌহশৃঙ্খলভার এবং মণিবন্ধে হাতকড়ির স্পর্শ অনুভব করিতেছি। ইহা পরাধীনতার বন্ধনের বেদনা। সমস্ত ভারতবর্ষই এক বৃহৎ কারাগার। কংগ্রেসের কার্য চালাইতে হইবে। আমি বন্দী হই কি বাহিরে থাকি, কি আসে যায়? আমি বাঁচি কিংবা মরি তাহাতেও কিছু আসে যায় না।"

আমরা যুক্তপ্রদেশে সরকারী ইস্তাহারের প্রত্যুত্তর দিলাম। ঘোষণা করিলাম, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী পূর্বের মতই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য করিবে। দৈনিক সংবাদপত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের নাম প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত তালিকায় সর্বশীর্ষে আমার পিতার নাম দেওয়া হইল। তিনি স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন না। কেবল গভর্ণমেণ্টের আদেশ অবজ্ঞা করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দিয়া নিজের নাম দিলেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে আমাদের প্রদেশে যুবরাজ আসিবার কয়েক দিন পূর্বে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার আরম্ভ হইল।

আমরা বুঝিলাম, এতদিনে সঙ্কট ঘনাইয়া আসিল; কংগ্রেসের সহিত গভর্ণমেণ্টের অনিবার্য সংঘর্ষ আসন্ন। তখনও কারাগার অজ্ঞাত স্থান, সেখানে

যাওয়া এক অভিনব অভিজ্ঞতা। একদিন এলাহাবাদের কংগ্রেস আফিসে বসিয়া আমি বাকী কাজ শেষ করিতেছি, এমন সময় একজন কেরাণী উত্তেজিত ভাবে আসিয়া বলিলেন, 'পুলিশ খানাতল্লাসীর পরোয়ানা লইয়া আসিয়াছে এবং আফিস-বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে'। এই অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম, কাজেই আমিও একটু বিচলিত হইলাম। কিন্তু ইচ্ছা হইল পুলিশের আনাগোনায় অবিচলিত থাকিয়া বাহিরে ধীর স্থির এবং দৃঢ়তা দেখাই। এই জন্য আমি একজন কেরাণীকে খানাতল্লাসীর সময় পুলিশের সঙ্গে থাকিতে বলিলাম এবং বাকী সকলকে পুলিশের আগমন উপেক্ষা করিয়া নির্বিকার ভাবে কাজ করিয়া যাইতে বলিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একজন বন্ধু ও সহকর্মী একজন পুলিশ কর্মচারীর সহিত আমার নিকট বিদায় লইতে আসিলেন, তাঁহাকে আফিসের বাহিরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। এই অভিনব ঘটনাকেও আমি অত্যন্ত অহঙ্কারের সহিত প্রতি দিনের তুচ্ছ ব্যাপারের মতই মনে করিলাম এবং আমার সহকর্মীর প্রতি অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখাইলাম। তখন আমি একখানা চিঠি লিখিতেছিলাম। যেন ব্যাপার কিছুই নহে এরূপ ভাব দেখাইয়া আমার বন্ধু ও পুলিশ কর্মচারীকে পত্র লেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলাম। ক্রমে সহরের অন্যান্য গ্রেপ্তারের সংবাদ আসিতে লাগিল। অবশেষে আমি বাড়ীতে কী হইতেছে জানিবার জন্য রওনা হইলাম। গিয়া দেখি যে, বৃহৎ বাড়ীর কতকাংশে পুলিশ খানাতল্লাসী আরম্ভ করিয়াছে এবং জানিলাম যে, তাহারা আমাকে ও পিতাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আসিয়াছে।

যুবরাজের অভ্যর্থনা বর্জন করিবার কার্যপ্রণালী ইহার চেয়ে আর কোন উপায়েই আমরা সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিতাম না। তাঁহাকে যেখানেই লইয়া যাওয়া হইয়াছে, সেইখানেই তিনি হরতাল এবং জনশূন্য রাস্তা দেখিয়াছেন। তিনি যেদিন এলাহাবাদে আসিলেন সেদিন সমগ্র নগরী মৃতের মত নিস্তব্ধ ছিল। কয়েকদিন পরে তিনি যখন কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন, সেই বিশাল নগরীর মুখর কর্মকোলাহল সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। যুবরাজের পক্ষে ইহা সহ্য করা কঠিন। কিন্তু এজন্য তাঁহার কোন দোষ নাই। তাঁহার প্রতি কোন বিরুদ্ধ ভাব কাহারও মনেই ছিল না। যুবরাজের ব্যক্তিত্বের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের বিশীর্ণ মর্যাদা চাঙ্গা করিয়া তুলিবার বিরুদ্ধেই ভারতবাসী বিক্ষোভ দেখাইয়াছিল।

সমস্ত দেশে বিশেষভাবে বাঙ্গলা ও যুক্তপ্রদেশে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের ধুম পড়িয়া গেল। এই দুই প্রদেশের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী ও নেতারা বন্দী হইলেন। সহস্র সহস্র নেতা ও যুবক কারাগারে চলিয়া গেলেন। প্রথমতঃ সহরের অধিবাসীরাই অগ্রসর হইল। কারাযাত্রী অজস্র স্বেচ্ছাসেবকের যেন শেষ নাই। যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস-কমিটির সভা যখন চলিতেছিল, তখন একযোগে সমস্ত সদস্য (৫৫ জন) গ্রেপ্তার হইলেন। যাঁহারা কোন দিন কংগ্রেস অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন নাই তাঁহারাও গ্রেপ্তার হইবার জন্য জিদ দেখাইতে লাগিলেন। এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে, গভর্ণমেণ্টের আফিসের কেরাণী আফিস হইতে বাড়ীতে ফিরিবার পথে জনসাধারণের উৎসাহের স্রোতে ভাসিয়া বাড়ীতে না গিয়া কারাগারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যুবক ও বালকেরা পুলিশের কয়েদী গাড়ীতে উঠিয়া বসিত এবং কিছুতেই নামিতে চাহিত না। প্রত্যেক দিন অপরাহ্নে আমরা জেলের ভিতরে বসিয়া শুনিতাম লরীর পর লরী বোঝাই বন্দীরা জয়ধ্বনি দিতে দিতে কারাগারে প্রবেশ করিতেছে। জেলখানা বোঝাই হইয়া গেল। জেলকর্মচারীরা এই অসম্ভব অবস্থায় কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। পুলিশ লরী বোঝাই বন্দী আনিয়া চালানে

কেবল মাত্র সংখ্যা উল্লেখ করিয়া জেলে জমা দিয়াছে। নামধামের কোন খোঁজ নাই। এই অভূতপূর্ব অবস্থায় জেলকর্মচারীরা এই অগণিত বন্দী লইয়া কি করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেননা, জেলসংক্রান্ত আইন-কানুনে এমন নামধামহীন দলবন্ধ বন্দীদের গ্রহণ করার কোন উল্লেখ নাই।

গভর্ণমেণ্ট নির্বিচারে গ্রেপ্তারের নীতি ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র কংগ্রেসকর্মীদের গ্রেপ্তার করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের উত্তেজনার প্রথম আবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল এবং অধিকাংশ বিশ্বস্ত কর্মীই জেলে যাওয়ার ফলে বাইরে একটা অনিশ্চিত অসহায় ভাব দেখা গেল। কিন্তু বাহ্যতঃ এইরূপ হইলেও ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ বিক্ষোভ নানা বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ১৯২১-এর ডিসেম্বর এবং ১৯২২-এর জানুয়ারী মাসে অসহযোগ আন্দোলনও সংশ্লিষ্ট আন্দোলনে প্রায় ত্রিশ হাজার ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন অধিকাংশ নেতা ও কর্মী কারাগারে তখনও এই আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধী বাহিরে থাকিয়া নির্দেশ ও উপদেশ দিয়া জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করিতেছিলেন। এবং অবাঞ্ছনীয় অনেক ব্যাপারকে সংযত করিতেছিলেন। ভারতীয় সৈন্য এবং পুলিশের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে, এই আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট তখনও তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন নাই।

সহসা ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে ঘটনার স্রোত ফিরিয়া গেল। আমরা কারাগৃহে বিস্ময়বিমূঢ় আতঙ্কে শুনিলাম, গান্ধিজী নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি প্রত্যাহার করিয়াছেন, সংঘর্ষমূলক আন্দোলন স্থগিত হইয়াছে। আমরা সংবাদপত্রে পড়িলাম, 'চৌরীচাওরা' গ্রামে জনতা পুলিশের উপর প্রতিশোধ লইবার আক্রোশে থানায় আগুন দিয়া ছয়-সাত জন পুলিশকে পোড়াইয়া মারিয়াছে। আন্দোলন বন্ধ হওয়ার ইহাই কারণ।

যখন আন্দোলন সকল দিক দিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং আমরা প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য লাভ করিতেছি, এমন সময় এভাবে আন্দোলন বন্ধ হওয়ায় আমরা ক্রুদ্ধ হইলাম। কিন্তু কারাগারে বসিয়া আমাদের এই ক্রোধ ও নৈরাশ্য কোন কাজেই আসিল না। নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি স্থগিত হইল। অসহযোগ আন্দোলন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। বহুকাল উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার পর গভর্ণমেণ্ট স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন এবং ইহার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরেই গান্ধিজী বন্দী হইলেন এবং সুদীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

১২

অহিংসা ও তরবারির পথ

চৌরীচাওরার দুর্ঘটনার পর সহসা আন্দোলন স্থগিত হওয়ায় কংগ্রেসের খ্যাতনামা নেতা মাত্রেই বিক্ষুব্ধ হইলেন,—অবশ্য গান্ধিজী রহিলেন অবিচলিত। আমার পিতা (তখন কারাগারে) অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। যুবকেরা স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর উত্তেজিত হইল। ইহার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। আন্দোলন স্থগিত রাখার যে যুক্তি দেওয়া হইল এবং তাহার ফল কি হইবে ইহা ভাবিয়া আমরা অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট হইলাম। চৌরীচাওরার ঘটনা শোচনীয় সন্দেহ নাই এবং ইহা অহিংস আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী,

কিন্তু সুদূরে পল্লীগ্রামের এক উন্মত্ত কৃষক জনতার কার্যের ফলে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও বন্ধ থাকিবে কেন? কোন স্থানে হঠাৎ হিংসামূলক কার্য ঘটিলে ইহাই যদি তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হয় তাহা হইলে অহিংস সংঘর্ষের নীতি ও প্রয়োগ-কৌশলের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি আছে। আমাদের মনে হইল, এই শ্রেণীর অপ্রত্যাশিত ঘটনা একেবারেই ঘটিবে না, এমন কোন নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া অসম্ভব। ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি নরনারীকে অহিংসার তত্ত্ব ও আচরণে সুশিক্ষিত করিয়া তাহার পর কি আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে? এমন কি, তাহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি আমাদের মধ্যে কয়জন বলিতে পারে যে, পুলিশের চরম দুর্ব্যবহারের সম্মুখেও সম্পূর্ণ শান্তভাবে অবস্থান করিবে? যদি ইহাতেও আমরা সক্ষম হই তাহা হইলেও অসংখ্য প্ররোচক চর এবং ঐ শ্রেণীর বর্ণচোরা যাহারা আন্দোলনে যোগ দিয়া নিজেরা বলপ্রয়োগ করিবে এবং অপরকেও বলপ্রয়োগ করিতে উত্তেজিত করিবে, তাহাদিগকে এড়ান যাইবে কিরূপে? অতএব ইহাই যদি আমাদের কার্যের একমাত্র মানদণ্ড হয় তাহা হইলে অহিংস প্রতিরোধের উপায় সর্বদাই ব্যর্থ হইবে।

এই উপায়ের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করিয়াই আমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলাম এবং কংগ্রেসও ইহা গ্রহণ করিয়াছিল। গান্ধিজী এই নীতি দেশের সম্মুখে কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত উপায়রূপেই স্থাপন করেন নাই, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অধিকতর কার্যকরী বলিয়াই উপস্থিত করিয়াছিলেন। 'অহিংসা' এই নামটি নীতিবাচক হইলেও ইহা এক সক্রিয় উপায় এবং অত্যাচারীর নিকট নিরীহভাবে বশ্যতা-স্বীকারের বিপরীত। ইহা কাপুরুষের কর্মবিমুখতা নহে, ইহা শক্তিমানের অন্যায় ও জাতীয় পরাধীনতার বিরুদ্ধে ভ্রূক্ষেপহীন উপেক্ষা। কিন্তু যদি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বন্ধুর ছদ্মবেশে,—আমাদের শত্রুও হইতে পারে—তাহাদের হঠকারিতায় আমাদের আন্দোলন বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে তাহা হইলে সাহসী ও শক্তিমানের মূল্য কি?

গান্ধিজী তাঁহার অতুলনীয় বাগ্মিতা দ্বারা শান্তিপূর্ণ অসহযোগ এবং অহিংসার পথ সকলকে গ্রহণ করিতে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা সরল আড়ম্বরহীন, তাঁহার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট এবং নিরুদ্বিগ্ন। কিন্তু বাহিরে তিনি ধীর প্রশান্ত হইলেও তাঁহার অন্তরে ছিল বহ্নিজ্বালাদীপ্ত পুঞ্জীভূত আবেগ, তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত প্রত্যেকটি শব্দ আমাদের হৃদয়ে ও মনে শরবৎ বিদ্ধ হইয়া এক অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করিত। তাঁহার নির্দেশিত পথ কঠিন ও বিঘ্নবহুল কিন্তু তাহা বীরের পথ। মনে হইত, ইহা আমাদিগকে প্রার্থিত স্বাধীনতার স্বর্গে লইয়া যাইবে। এই আশায় বুক বাঁধিয়া আমরা অগ্রসর হইয়াছিলাম। ১৯২০ সালে তিনি "তরবারির পথ" শীর্ষক এক বিখ্যাত প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"যেখানে সমস্যা কাপুরুষতা না বলপ্রয়োগ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি সেখানে বলপ্রয়োগ করিতেই বলিব......ভারতবর্ষ কাপুরুষের মত নিরুপায় হইয়া অসীম অমর্যাদা বহন করিতেছে, এই দৃশ্য অপেক্ষা বরং আমি দেখিতে চাই, সে তরবারি হস্তে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অহিংসা হিংসা হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর এবং শাস্তিদান অপেক্ষা ক্ষমা অধিকতর পৌরুষব্যঞ্জক। ক্ষমা বীরস্য ভূষণম্।

"কিন্তু যেখানে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রয়োগ করা হয় না,—ক্ষমা সেইখানেই। নিরুপায় ভীরুর ক্ষমার ভাণ অর্থহীন। মার্জার কর্তৃক ছিন্নবিচ্ছিন্ন মূষিক কখনই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে না......কিন্তু আমি

ভারতবর্ষকে এত অসহায় মনে করি না, নিজেকেও তাহা ভাবি না।

"আমাকে কেহ ভুল ব্ঝিবেন না, শক্তি কেবল দৈহিক বল হইতে আসে না, অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি হইতেই উহা আসিয়া থাকে.........

"আমি স্বপ্নবিলাসী নহি। আমি নিজেকে একজন কুশলকর্মা আদর্শবাদী বলিয়া দাবী করি। অহিংসা কেবল ঋষি ও ম্নিগণের ধর্ম নহে—ইহা সাধারণ মান্ষেরও ধর্ম। বলপ্রয়োগ পশ্র ধর্ম—মান্ষের ধর্ম অহিংসা। পশ্র মধ্যে আত্মিক শক্তি নিদ্রিত, সে বাহ্বল ছাড়া আর কিছ্ ব্ঝে না, কিন্তু মান্ষের মর্যাদা তাহাকে উচ্চতর নীতি—আত্মিক শক্তি গ্রহণ করিতে প্রেরণা দেয়।

"এই কারণে আমি ভারতবর্ষের সম্ম্খে আত্মোৎসর্গের স্প্রাচীন নীতি উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। সত্যাগ্রহের ম্ল এবং শাখাপ্রশাখা, অসহযোগ, নির্পদ্রব প্রতিরোধ, প্রাচীন আত্মসংযমের ন্তন নাম মাত্র। যে সকল ঋষি চারিদিকে হিংসার মধ্যেও অহিংসানীতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহারা নিউটন অপেক্ষাও অধিকতর প্রতিভাশালী, তাঁহারা ওয়েলিংটন অপেক্ষাও বড় যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহারা অস্ত্রপ্রয়োগ-কৌশলী হইয়াও উহার অপ্রয়োজনীয়তা অন্ভব করিয়াছিলেন এবং শ্রান্ত ক্লান্ত জগৎকে শিখাইয়াছিলেন যে ম্ক্তির পথ অহিংসার মধ্য দিয়া, হিংসার মধ্য দিয়া নহে।

"অহিংসার সক্রিয় অবস্থা হইল—সচেতনভাবে দ্ঃখ বরণ করা। ইহা অন্যায়কারীর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ নহে, ইহা অত্যাচারীর ইচ্ছার বির্দ্ধে নিজের আত্মার শক্তি প্রয়োগ করা। এই নীতি দ্বারা জীবন গঠন করিয়া তুলিলে একক নিঃসঙ্গ ব্যক্তিও অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে উপেক্ষা করিয়াও নিজের সম্মান, নিজের ধর্ম, নিজের আত্মাকে রক্ষা করিতে পারে এবং সেই সাম্রাজ্যকে ধ্বংস ও প্নর্গঠন করিতে পারে।

"অতএব অহিংসা দ্র্বলের ধর্ম বলিয়া আমি ভারতবাসীকে গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। আমার ইচ্ছা, ভারতবর্ষ নিজের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে সম্প্র্ণ সচেতন থাকিয়াই অহিংস আচরণ কর্ক। আমি দেখিতে চাই, ভারতবর্ষ তাহার অপরাজিত আত্মাকে চিন্ক,—যাহা সমস্ত শারীরিক দৌর্বল্যের ঊর্ধ্বে জয়গৌরবে সম্ন্নত এবং যাহা সমগ্র জগতের পাশববল প্রতিহত করিতে পারে......

"আমি সিন্ফিন্ আন্দোলন হইতে অসহযোগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখি, ইহা হিংসার সহিত পাশাপাশি আন্দোলনর্পে চলিতে পারে না। যাহারা হিংসাম্লক কার্যে বিশ্বাসী তাহাদিগকে আমি এই শান্তিপ্র্ণ অসহযোগ আন্দোলনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিতেছি, ইহা কখনও আভ্যন্তরিক দ্র্বলতায় ব্যর্থ হইবে না, কেবল উপয্ক্ত সাড়ার অভাবেই ইহা ব্যর্থ হইতে পারে এবং তাহাই প্রকৃত সঙ্কটের সময়। অনেক উন্নতহ্দয় ব্যক্তি জাতীয় অপমান আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদের ক্রোধের চরিতার্থতা খ্ঁজিতেছেন, তাঁহারা হিংসা অবলম্বন করিবেন কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁহারা তাঁহাদিগকে অথবা তাঁহাদের দেশকে অন্যায় হইতে ম্ক্ত না করিয়াই বিনষ্ট হইবেন। ভারতবর্ষ তরবারির পথ গ্রহণ করিলে সাময়িক জয়লাভ করিতে পারে কিন্তু সেই ভারতবর্ষে আমার গর্ব করিবার কিছ্ই থাকিবে না। আমি ভারতবর্ষের ভক্ত, কেননা, আমার সমস্তই তাহার দান, আমি প্র্ণভাবে বিশ্বাস করি, সমগ্র জগৎকে দিবার জন্য তাহার এক বার্তা আছে।"

এই সকল য্ক্তিতে আমরা বিচলিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কি আমরা, কি সমগ্রভাবে জাতীয় কংগ্রেস, অহিংস উপায়কে ধর্মের মত অথবা সংশয়হীন ম্লমন্ত্রর্পে গ্রহণ করে নাই, করা সম্ভবপরও ছিল না। বিশেষ ফললাভের জন্য

ইহা একটি উপায়রূপে অবলম্বিত হইয়াছিল এবং সেই ফলের দ্বারাই ইহার চূড়ান্ত বিচার সম্ভব। ব্যক্তিবিশেষ ইহাকে ধর্মের মত অথবা অভ্যাজ্য মূলমন্ত্রের মত গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক থাকিয়া তাহা পারে না। চৌরীচাওরা এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাগুলি দেখিয়া আমরা অহিংস উপায়ের সার্থকতা নূতন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত রাখা সম্পর্কে গান্ধিজীর যুক্তিই যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা সর্বদাই এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে যাহার ফলে আন্দোলন ত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। অহিংস উপায়ের মধ্যেই ত্রুটি রহিয়াছে, না গান্ধিজী যেভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাই ভুল? যাহাই হউক, তিনিই ইহার আবিষ্কারক ও স্রষ্টা, অতএব ইহার ভাল মন্দ বিচার করিবার তিনি অপেক্ষা আর কে আছে? তিনি না থাকিলে আমাদের আন্দোলন কোথায় থাকিত?

বহুবর্ষ পরে ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বে গান্ধিজী সন্তোষজনকভাবে এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিলেন, কোন স্থানে বলপ্রয়োগের আকস্মিক ঘটনার ফলে আন্দোলন ত্যাগ করা হইবে না। ঐ শ্রেণীর অপরিহার্য ঘটনার ফলে যদি অহিংস উপায়ে সংঘর্ষ অচল হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সর্বত্রই অহিংসা একটি আদর্শ উপায় নহে। কিন্তু গান্ধিজী ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার নিকট অহিংস উপায় অভ্রান্ত এবং যে কোন অবস্থায়, এমন কি, বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থায়ও, সীমাবদ্ধভাবে ইহা লইয়া কার্য করা যাইতে পারে। অহিংস নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া গান্ধিজী যে এই ব্যাখ্যা দিলেন তাহা তাঁহার মানসিক ক্রমবিকাশের ফল কি না আমি জানি না। ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি বর্জনের কারণ কার্যতঃ কেবলমাত্র 'চৌরীচাওরা' নহে, অথচ অধিকাংশ লোকের তাহাই বিশ্বাস। 'চৌরীচাওরা' একটা চরম পরিণতি মাত্র। গান্ধিজী প্রায়ই তাঁহার বিবেকের অনুভূতি অনুযায়ী কার্য করিয়া থাকেন। জনসাধারণের সহিত দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতার ফলে অন্যান্য মহান জননেতাগণের মতই সাধারণের চিন্তা কর্মপ্রবণতা এবং তাহাদের শক্তিসম্পর্কে সম্যক ধারণা করিবার তাঁহার এক আশ্চর্য শক্তি জন্মিয়াছিল। এই অনুভূতির আবেগই তাঁহার কর্মের নিয়ামক। পরে অবশ্য বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ সহকর্মীদিগকে প্রবোধ দিবার জন্য তাঁহার অনুভূতিলব্ধ সিদ্ধান্তকে তিনি যুক্তির আবরণ দিতে চেষ্টা করেন। এই আবরণ প্রায়ই অসম্পূর্ণ হইত। 'চৌরীচাওরা'র পর আমাদের এইরূপই মনে হইয়াছিল। তখন আমাদের আন্দোলন দৃশ্যতঃ শক্তিশালী এবং দেশব্যাপী উৎসাহসত্ত্বেও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত সঙ্ঘ ও শৃঙ্খলা বিলুপ্ত হইতেছিল। আমাদের কর্মীরা সকলেই কারাগারে এবং জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আন্দোলন পরিচালনা করিবার অল্প শিক্ষাই পাইয়াছিল। যে কোন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া কংগ্রেস-কমিটির ভার গ্রহণ করিত। প্রকৃত প্রস্তাবে বহু অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি, এমন কি, প্ররোচক গুপ্তচরেরা পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়া কংগ্রেস ও খিলাফত পরিচালনা করিতে লাগিল। ইহাদিগকে সংযত করিবার কোন উপায় ছিল না।

অবশ্য বৃহৎ আন্দোলনে এরূপ ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। নেতাদিগকে সর্বাগ্রে কারাগারে যাইতে হইবে এবং কাজ চালাইবার জন্য অপরের উপর বিশ্বাস করিতে হইবে। জনসাধারণকে বড়জোর কতকগুলি সহজ কাজ করিতে ও কোন কোন কাজ হইতে বিরত থাকিতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ১৯৩০-এর পূর্বে কয়েক

বৎসর ধরিয়া এই শ্রেণীর কিছু শিক্ষা আমরা দিয়াছিলাম। তাহার ফলে ১৯৩০ এবং ১৯৩২-এর আইন অমান্য আন্দোলন সঙ্ঘবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী হইয়াছিল। ১৯২১-২২-এ ইহার অভাব ছিল, তখন জনসাধারণের উৎসাহ উত্তেজনার পশ্চাতে বিশেষ কিছুই ছিল না। অতএব আন্দোলন চলিলে যে নানাস্থানে বলপ্রয়োগ ও উৎপাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত ইহা নিঃসন্দেহ ও তাহার ফলে গভর্ণমেন্ট রক্তাক্ত উপায়ে তাহা দমন করিয়া ফেলিয়া এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিত যাহার প্রতিক্রিয়ায় জনসাধারণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত।

এই সকল যুক্তি এবং ঘটনা গান্ধিজীর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং এই সূত্র ধরিয়া অহিংস উপায়ে আন্দোলন পরিচালনার ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা অভ্রান্ত। ক্রমাবনতি নিরোধ করিয়া তিনি নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এক স্বতন্ত্র ভূমি হইতে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত অহিংসা নীতির কোনও সম্পর্ক নাই। দুই কূল বজায় রাখিয়া এখানে চলা কঠিন। অবশ্য আকস্মিক হিংসার প্রতিক্রিয়ায় রক্তাক্ত দমননীতি অবলম্বিত হইলেও জাতীয় আন্দোলন একেবারে নিভিয়া যাইত না, কেননা, এই শ্রেণীর আন্দোলন ভস্মরাশির মধ্য হইতেও পুনরায় জ্বলিয়া উঠে। সময় সময় সাময়িক অবসাদের দিনে সমস্যাগুলি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় এবং চিত্তে দৃঢ়তার সঞ্চার হয়। সাময়িক অবসাদ বা আপাতপরাজয় বড় কথা নহে, আদর্শ ও কর্মনীতি বড় কথা। জনসাধারণ যদি কর্মনীতিকে কলঙ্কমুক্ত রাখিতে পারে তাহা হইলে অল্পদিনেই অবসাদ দূর হইয়া যায়। ১৯২১-২২-এ আমাদের কর্মনীতি ও উদ্দেশ্য কি ছিল? আমাদের অস্পষ্ট স্বরাজ এবং অহিংস সংঘর্ষের পশ্চাতে কোন সুস্পষ্ট মতবাদ ছিল না। যদি ব্যাপকভাবে আকস্মিক বলপ্রয়োগের প্রাদুর্ভাব ঘটিত তাহা হইলে অহিংসনীতি স্বভাবতঃই বিনষ্ট হইত এবং পূর্বকথিত স্বরাজেও আঁকড়িয়া ধরিবার কিছু থাকিত না। সাধারণতঃ দীর্ঘকাল আন্দোলন চালাইবার মত পর্যাপ্ত শক্তি জনসাধারণের নাই। কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি এবং বিদেশী শাসনের প্রতি অসন্তোষ যতই ব্যাপক হউক না কেন আমাদের উপযুক্ত মেরুদণ্ড ও সঙ্ঘশক্তি ছিল না। এমন আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এমন কি, যাহারা সাময়িক উত্তেজনায় কারাগারে আসিয়াছিল তাহারা শীঘ্রই একটা মিটমাট প্রত্যাশা করিত।

অতএব একটা নৈরাশ্যজনিত প্রতিক্রিয়াসত্ত্বেও ১৯২২-এ নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঠিকই হইয়াছিল; তবে মনে হয় ইহা আরও সুষ্ঠুভাবে করা যাইত।

যাহা হউক, সহসা আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হওয়ার প্রতিক্রিয়ার মুখে উহাই সম্ভবতঃ দেশে এক নূতন বিপত্তির সৃষ্টি করিল। রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিষ্ফল ও আকস্মিক হিংসা বন্ধ হইলেও অবরুদ্ধ হিংসা বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল এবং সম্ভবতঃ পরবর্তী কয়েক বৎসরে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ ইহার ফলেই তীব্র হইয়াছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী বিভিন্নশ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিশাল জনসঙ্ঘ-সমর্থিত অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের চাপে লুকাইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, এই অবস্থার সুযোগে তাহারা বাহিরে আসিল। গুপ্তচরগণ এবং যাহারা কলহ বাধাইয়া কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে চাহে এরূপ অনেকে কাজে লাগিয়া গেল। মোপলা বিদ্রোহ ও অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার সহিত উহার দমন—বন্ধদ্বার রেলওয়ে মালগাড়ীতে বোঝাই মোপলা বন্দীদের শোচনীয় মৃত্যু—সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ প্রচারকারীদিগকে একটা সুযোগ দিল। যদি নিরুপদ্রব

প্রতিরোধ স্থগিত করা না হইত এবং যদি গভর্ণমেণ্ট আন্দোলন দমন করিয়া ফেলিতেন তাহা হইলে হয়তো এত সাম্প্রদায়িক তিক্ততা দেখা দিত না এবং পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য এত উৎসাহ অবশিষ্ট থাকিত না।

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রত্যাহৃত হইবার পর আর একটি ঘটনার ফল ভিন্নরূপ হইতে পারিত। নিরুপদ্রব প্রতিরোধের প্রথম তরঙ্গে গভর্ণমেণ্ট চমকিত ও ভীত হইলেন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড রেডিং প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিলেন, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। তখন যুবরাজ ভারতবর্ষে, তাঁহার এই উপস্থিতির ফলে গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব অনেকখানি বাড়িয়াছিল। ১৯২১-এর ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হইবার কিঞ্চিৎ পরেই গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সহিত আপোষের জন্য চেষ্টিত হইলেন। যুবরাজের কলিকাতা আগমন উপলক্ষেই ইহার সূচনা হইল। দেশবন্ধু দাশের (তখন তিনি জেলে) সহিত বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের কিছু ঘরোয়া আলোচনা হইল। গভর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি ক্ষুদ্র গোলটেবিল বৈঠক বসাইবার প্রস্তাব উঠিল। গান্ধিজী দাবী করিলেন, এই বৈঠকে করাচীতে বন্দী মৌলানা মহম্মদ আলীকেও উপস্থিত থাকিবার সুযোগ দিতে হইবে। এই দাবীর ফলেই প্রস্তাব ফাঁসিয়া গেল। গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই সম্মত হইলেন না। গান্ধিজীর এই মনোভাব দেশবন্ধু দাশের মনঃপূত হয় নাই। তিনি কারার বাহিরে আসিয়া প্রকাশ্যে ইহার সমালোচনা করিলেন এবং বলিলেন, গান্ধিজী ভুল করিয়াছেন। আমরা অনেকে (তখন জেলে) ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ না জানার দরুণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক, ইহা মনে হইল তখন ঐ শ্রেণীর সম্মেলনের সার্থকতা অতি অল্পই। যুবরাজের কলিকাতা পরিদর্শন ব্যাপারটা ভালভাবে নির্বাহ করিবার জন্যই গভর্ণমেণ্ট উদ্‌গ্রীব ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আমাদের মূল সমস্যাগুলির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। নয় বৎসর পরে যখন কংগ্রেস ও জাতি অধিকতর শক্তিশালী তখনও দেখা গিয়াছে যে, এই শ্রেণীর সম্মেলনে বিশেষ কোনও ফল হয় নাই। কিন্তু ইহা ছাড়িয়া দিলেও আমার নিকট গান্ধিজীর, মহম্মদ আলীর উপস্থিতির দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইয়াছিল। কেবল কংগ্রেস নেতারূপে নহে, সমস্ত খিলাফতের প্রশ্ন কংগ্রেসের এক মুখ্য সমস্যা, তখন খিলাফত নেতারূপেও তাঁহার উপস্থিতির একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে একজন সহকর্মীকে বর্জন করিতে হয় এমন কোনও কর্মকৌশলই প্রশস্ত নহে। গভর্ণমেণ্ট যে তাঁহাকে কারামুক্তি দিতে স্বীকৃত হইলেন না তাহা হইতেই বোঝা গেল যে, সম্মেলনে কোনও ফললাভের সম্ভাবনা নাই।

আমি ও পিতা বিভিন্ন অপরাধে ও বিভিন্ন ধারায় ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম। বিচার একটা প্রহসনের অভিনয় মাত্র এবং আমরা নিয়মমত উহাতে কোন অংশ গ্রহণ করি নাই। অবশ্য আমাদের কার্যপদ্ধতি ও বক্তৃতায় অতি সহজেই দণ্ড দিবার মত অনেক উপাদান ছিল। কিন্তু কার্যতঃ যে অভিযোগ করা হইল তাহা অপূর্ব! বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘের সদস্যরূপে পিতাকে বিচার করা হইল এবং এই অপরাধের প্রমাণস্বরূপে তাঁহার হিন্দীতে দস্তখত করা একখানি বিজ্ঞপ্তিপত্র দাখিল করা হইল। দস্তখত তাঁহার নিজের সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি ইতিপূর্বে কদাচিৎ হিন্দীতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অতি অল্প লোকই তাঁহার হিন্দী দস্তখত সনাক্ত করিতে পারে। ছিন্ন মলিন বসন পরিহিত একটি ভদ্রলোককে হাজির করা হইল এবং সে পরখ করিয়া দস্তখত সনাক্ত করিল। লোকটি নিতান্ত নিরক্ষর; কেননা, সে কাগজটি

উল্টা করিয়া ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছিল। পিতার বিচারকালে আমার চারি বৎসরের কন্যার অদৃষ্টে প্রথম আদালতের কাঠগড়ায় উঠিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমার পিতা বিচারকালে তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন।

আমার অপরাধ হইল হরতালের বিজ্ঞাপন বিলি করা। তখনকার আইনে ইহা অপরাধ ছিল না। অবশ্য ইদানিং ডোমিনিয়ান্ স্টেটাসের দিকে আমাদের দ্রুত অগ্রসর হওয়ার ফলে উহা এখন বে-আইনী হইয়াছে। যাহা হউক, আমার কারাদণ্ড হইল। তিন মাস পরে কারাগারে যখন আমি পিতা ও অন্যান্যের সহিত আছি, তখন শুনিলাম যে, কোনও কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আমার কারাদণ্ড ভুল হইয়াছে এবং আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আমি আশ্চর্য হইলাম; কেননা, আমার পক্ষ হইতে কেহ কোন তদ্বির করে নাই। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রত্যাহারের ফলেই বিচারফল পুনঃপরীক্ষা কার্যে নবচেতনার সঞ্চার হইয়াছিল। পিতাকে ছাড়িয়া বিষণ্ণচিত্তে কারাগার হইতে বহির্গত হইলাম।

কারাগার হইতে বাহির হইয়াই আমি আহম্মদাবাদে গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাতের সংকল্প করিলাম। কিন্তু আমি উপস্থিত হইবার পূর্বেই তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। আমি সবরমতি জেলে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমি তাঁহার বিচারকালে উপস্থিত ছিলাম। ইহা এক চিরস্মরণীয় ঘটনা এবং যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেহই জীবনে বিস্মৃত হইবেন না। ইংরাজ জজ মর্যাদার সহিত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। আদালতে গান্ধিজীর বিবৃতি সকলকে বিচলিত করিয়াছিল। আমরা আলোড়িত হৃদয় লইয়া বিচারগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তাঁহার মূর্তি এবং জীবন্ত ভাষা মানসপটে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

আহম্মদাবাদ হইতে ফিরিলাম। বন্ধু ও সহকর্মীগণ কারাগারে, নিঃসঙ্গ একাকীত্ব আমাকে পীড়িত করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত। অতএব পুনরায় আত্মনিয়োগ করিলাম। বিদেশী বস্ত্র বয়কট আন্দোলনের দিকে আমার ঝোঁক পড়িল। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত হইলেও ইহা চলিতেছিল। এলাহাবাদের প্রায় সমস্ত বস্ত্রব্যবসায়ীই বিদেশী বস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহারা একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। এই সমিতির নিয়ম ছিল যে, কেহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে তাহাকে অর্থদণ্ড দিতে হইবে। আমি দেখিলাম, কতকগুলি বড় বড় বস্ত্রব্যবসায়ী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিতেছেন। যাঁহারা প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছেন ইহা তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার। আমরা তর্ক-বিতর্ক করিলাম, কোন ফল হইল না। বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতিও বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। আমরা স্থির করিলাম, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর দোকানে পিকেটিং করা হইবে। পিকেটিং-এর ইঙ্গিতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; তাঁহারা জরিমানা দিয়া নূতন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন। জরিমানার টাকা বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতি গ্রহণ করিলেন।

আমি এবং যে সকল সহকর্মী ব্যবসায়ীদের সহিত কথাবার্তায় যোগ দিয়াছিলাম, ইহার দুই-তিন দিন পরেই সকলে মিলিয়া গ্রেপ্তার হইলাম। আমাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ভীতিপ্রদর্শন ও জবরদস্তি করিয়া টাকা আদায়ের অভিযোগ উপস্থিত করা হইল। আমাকে রাজদ্রোহ প্রচার ও আরও কয়েকটি অপরাধে অভিযুক্ত করা হইল। আমি আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া আদালতে একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি দিলাম। আমাকে তিন দফায় শাস্তি দেওয়া হইল। বলপ্রয়োগ ও অর্থ আদায়ের অভিযোগ

রহিল কিন্তু রাজদ্রোহের অভিযোগ প্রত্যাহৃত হইল। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, আমার শাস্তি কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছিলেন। আমার যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে তিন দফার মধ্যে, দুই দফায় আঠার মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল, তবে উভয় দণ্ড একসঙ্গে চলিবে ইহাই ছিল আদেশ। আমার মোট কারাদণ্ড হইল এক বৎসর নয় মাস। ইহাই আমার দ্বিতীয় বার শাস্তি। প্রায় ছয় সপ্তাহ বাহিরে কাটাইয়া আমি পুনরায় কারাগারে ফিরিয়া গেলাম।

১৩

লক্ষ্ণৌ জেল

রাজনৈতিক অপরাধে কারাদণ্ড ১৯২১-এর ভারতবর্ষে কিছু নূতন ঘটনা নহে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতেই লোকে বিশেষভাবে ক্রমাগত জেলে যাইতেছিল। ইহার অধিকাংশ কারাদণ্ডই অত্যন্ত দীর্ঘ। বিনাবিচারে অন্তরীণে আবদ্ধ করার ব্যবস্থাও ছিল। সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক লোকমান্য তিলক পরিণত বয়সে দীর্ঘ ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় অন্তরীণ ও কারাদণ্ড মুহুর্মুহু ঘটিতে লাগিল, ষড়যন্ত্রের মামলা সচরাচরের ঘটনা হইয়া উঠিল। সাধারণতঃ মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে উহার পরিণতি ঘটিত। মহাযুদ্ধের সময় আলী-ভ্রাতৃদ্বয় ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পাঞ্জাবে সামরিক আইনের আমলে বহুলোকের ডাক পড়িল। ষড়যন্ত্রের মামলায় এবং সরাসরি জঙ্গীবিচারে বহুলোক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। কাজেই রাজনৈতিক অপরাধে কারাদণ্ড ভারতে সচরাচর ঘটনাই হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে কেহ স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে নাই। ইতিপূর্বে কোন ব্যক্তির রাজনৈতিক কার্যকলাপ অথবা গোয়েন্দা পুলিশের কোপদৃষ্টির ফলে কারাদণ্ডের সম্ভাবনা ঘটিত কিন্তু তখন আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা চলিত। অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গান্ধিজী ও তাঁহার সহস্র সহস্র অনুচর স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন।

১৯২১-এ কারাগার ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। কারাগারের নির্মম লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যখন একজন নূতন কয়েদীকে গ্রাস করে, তাহার পর কি ঘটে অল্প লোকেই তাহা জানিত। আমরা কল্পনা করিতাম কয়েদীরা অত্যন্ত বেপরোয়া এবং ভয়ঙ্কর প্রকৃতির দুষ্ট লোক। সেখানে নির্জনতা, অপমান, নির্যাতন এবং সর্বোপরি অনিশ্চিতের ভীতি রহিয়াছে, ইহাই আমাদের ধারণা ছিল। ১৯২০ সাল হইতে ক্রমাগত জেলে যাওয়ার জল্পনা কল্পনা ও বহুসংখ্যক সহকর্মীর কারাগমনের ফলে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত ঘৃণা ও আপত্তির তীব্রতা মন্দীভূত হইয়াছিল। কিন্তু মনে মনে নিজেকে যতই প্রস্তুত করা যাউক না কেন, প্রথম লৌহদ্বার-পথে প্রবেশকালে মানসিক উত্তেজনা ও অনিশ্চিত প্রত্যাশার আবেগ হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। ইহার পর গত তের বৎসরে কার্যতঃ দণ্ডবিধি আইনের বহু বিভিন্ন ধারায় দণ্ডিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনৈতিক অপরাধে অন্ততঃ তিন লক্ষ নরনারী কারাগারে গিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক বারম্বার কারাগৃহে গিয়াছেন, কারাভ্যন্তরে কি আছে তাহাও

তাহাদের উত্তমর্পে জানা ছিল। সেই অস্বাভাবিক নিরানন্দ নির্যাতন এবং ভয়াবহ বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রার সহিত নিজেকে যতটুকু খাপ খাওয়াইতে পারা যায় সে চেষ্টা সকলেই অল্পবিস্তর করিয়াছেন। অভ্যাসে মানুষের অনেক কিছুই সহিয়া যায়। আমরাও ক্রমে ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু তথাপি যতবার জেলে গিয়াছি, দ্বারদেশে সেই পুরাতন উত্তেজনার অনুভূতি জাগিয়াছে—রক্তে জাগিয়াছে চাঞ্চল্য। লোকজন, যানবাহন, তরুলতা, বিস্তীর্ণ প্রসারিত প্রান্তর,—দীর্ঘকাল যাহাদের সহিত অদর্শন ঘটিবে এমন পরিচিত মুখগুলি সর্বশেষ বার দেখিবার জন্য চক্ষু আপনা হইতেই পিছনে ফিরিয়া চাহিত। প্রথম কারাদণ্ড লইয়া যখন জেলে গিয়াছিলাম তখনকার দিনগুলি আমাদের ও কারাকর্মচারীদের উভয় পক্ষেরই অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার দিন। দলে দলে নূতন ধরণের বন্দীদের আগমনে জেল কর্মচারীদের অবস্থা প্রায় অচল হইয়া উঠিল। এই নবাগতদের প্রতিদিন বর্ধিত বিপুল সংখ্যা এক অভূতপূর্ব বন্যার মত মনে হইতে লাগিল, যাহা পরম্পরাগত সমস্ত প্রাচীন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিবে। নবাগতদের লইয়া বিব্রত হইবার আরও কারণ এই যে, ইহার মধ্যে সকল শ্রেণীর লোক থাকিলেও অধিকাংশ মধ্যশ্রেণীর। যাহা হউক, সকল শ্রেণীর সমবায়ে গঠিত এই নবাগত দলের একটি বিষয়ে ঐক্য ছিল, তাহারা সাধারণ কয়েদী হইতে সম্পূর্ণর্পে পৃথক্ এবং তাহাদের প্রতি চিরাচরিত আচরণ করা সহজ নহে। কর্তৃপক্ষ ইহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে কি করা যাইতে পারে তাহার কোনও নজিরও নাই, অভিজ্ঞতাও নাই। সাধারণ কংগ্রেস বন্দীরা নিরীহ ও মোলায়েম প্রকৃতির লোক ছিল না এবং কারাপ্রাচীরের মধ্যেও তাহারা সংখ্যাধিক্যের শক্তি অনুভব করিত। কারাভ্যন্তরে কি ঘটিতেছে সে সম্পর্কে জনসাধারণের জাগ্রত কৌতূহল এবং বাহিরের আন্দোলনও গণনার বিষয় ছিল। এই শ্রেণীর উগ্র মনোভাব সত্ত্বেও সাধারণতঃ আমরা কারাকর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতাই করিতাম। আমাদের সাহায্য না পাইলে কর্মচারীরা আরও বেশী মুস্কিলে পড়িতেন। প্রায়শঃই জেলারের অনুরোধে বিভিন্ন ব্যারাকে গিয়া আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে শান্ত করিতে হইত কিম্বা কোনও নিয়ম মানিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইত।

আমরা স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়াছি। অনেক স্বেচ্ছাসেবক আবার পাকেচক্রে বিনাকারাদণ্ডেই জেলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অতএব পলায়ন করিবার প্রশ্ন এখানে উঠিতেই পারে না। যদি কেহ বাহিরে যাইতে চাহে তবে তাহার পক্ষে অনুতপ্ত হওয়া কিম্বা ভবিষ্যতে কোন আইন-বিরোধী কার্য করিব না, এইর্প প্রতিশ্রুতি দিলেই যথেষ্ট হইত। পলায়নের চেষ্টা অত্যন্ত কলঙ্কজনক বলিয়া বিবেচিত হইত এবং উহা আইন অমান্য জনিত আন্দোলন হইতে পলায়নেরই অনুর্প ছিল। আমাদের লক্ষ্ণৌ জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনি প্রায়ই জেলারকে (ইনি একজন খান সাহেব) বলিতেন যে, তিনি যদি কতকগুলি কংগ্রেস বন্দীকে পলায়ন করিবার সুযোগ দিতে কৃতকার্য হন তাহা হইলে তিনি (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) গভর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার খান বাহাদুর উপাধির জন্য সুপারিশ করিবেন।

আমাদের অধিকাংশ বন্দীকে কারাগারের মধ্যভাগে বড় বড় ব্যারাকে রাখা হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে আঠার জনকে বাছিয়া লইয়া সম্ভবতঃ কিছু ভাল ব্যবহারের জন্য এক পুরাতন তাঁতশালায় জায়গা দেওয়া হইয়াছিল। আমার পিতা, দুইজন সম্পর্কিত ভ্রাতা এবং আমি স্বতন্ত্রভাবে বিশ ফুট দীর্ঘ এবং ষোল ফুট

প্রশস্ত একটি চালাঘরে স্থান পাইয়াছি। জেলের মধ্যে এক ব্যারাক হইতে অন্য ব্যারাকে যাইবার স্বাধীনতা আমাদের ছিল। বাহিরের আত্মীয় স্বজনের সহিত প্রায়ই দেখা করিতে দেওয়া হইত। আমরা দৈনিক সংবাদপত্র পাইতাম। তাহাতে নূতন নূতন গ্রেফতার এবং আন্দোলনের সংবাদ কারাজীবনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত। আলাপ-আলোচনায় আমাদের অনেক সময় কাটিত। লেখাপড়া করিবার সময় আমি অতি অল্পই পাইতাম।

আমি সকালবেলায় উঠিয়া আমাদের চালা ঘরখানি ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতাম। পিতার ও আমার নিজের কাপড় কাচিতাম এবং কিছু সময় চরকার সূতা কাটিতাম। তখন শীতকাল, উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমরা স্বেচ্ছাসেবকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার অধিকার পাইয়াছিলাম। যাহারা নিরক্ষর তাহাদিগকে আমরা কিছু হিন্দী ও উর্দু এবং অন্যান্য প্রাথমিক বিষয় শিক্ষা দিতাম। সন্ধ্যাবেলায় আমরা 'ভলিবল' খেলিতাম।*

ক্রমে কড়াকড়ি বাড়িতে লাগিল। আমাদের সীমানার বাহিরে গিয়া অন্য ব্যারাকে স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত দেখা করা বন্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে পড়াইবার কাজও ফুরাইল।

মার্চ মাসের প্রথম ভাগে জেল হইতে বাহির হইয়া ছয়-সাত সপ্তাহ পরে এপ্রিল মাসে আমি পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। পিতাকে নৈনিতাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং তাঁহার প্রস্থানের পরই নূতন নিয়ম জারী হইয়াছে। পূর্বে আমি যেখানে থাকিতাম, সেই বৃহৎ তাঁতশালা হইতে সমস্ত বন্দীকে লইয়া জেলের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড ব্যারাকে স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে। ব্যারাকগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে জেলের মধ্যে ক্ষুদ্র জেল। এক ব্যারাক হইতে অন্য ব্যারাকে সংবাদ আদান প্রদানের কোন উপায় ছিল না। দেখাশুনা এবং চিঠিপত্রের আদান প্রদান সঙ্কুচিত করিয়া মাসে একবার করা হইল। খাদ্যদ্রব্য অতি সাধারণ, তবে আমরা প্রয়োজন মত খাদ্য বাহির হইতে আনিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম।

আমি যে ব্যারাকে ছিলাম সেখানে প্রায় পঞ্চাশজন বন্দী ছিলেন। আমাদের বিছানাগুলির ব্যবধান ছিল তিন চার ফুট মাত্র। এজন্য আমাদিগকে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, ব্যারাকে অনেকে আমার পরিচিত এবং বন্ধু ছিলেন। কিন্তু দিবারাত্র গোপনীয়তার একান্ত অভাব সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন। জনতা সারাক্ষণ চাহিয়া আছে। একই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতা, ইহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন নিরালা কোণ নাই। আমরা প্রকাশ্যে একত্রে স্নান করিতাম, কাপড় ধুইতাম, ব্যায়ামের জন্য ব্যারাকের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতাম এবং বিরক্তি ও ক্লান্তির শেষ সীমা পর্যন্ত আলাপ অথবা তর্ক করিতাম। তর্ক করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতাম। পারিবারিক জীবনের নিরানন্দগুলি এখানে শত গুণে বেশী, অথচ তাহার কমনীয়তা এবং পারস্পরিক সন্তোষ প্রায় নাই।

---

* সংবাদপত্রে একটি ভিত্তিশূন্য গল্প প্রচারিত হইয়াছিল এবং পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ঐ গল্প প্রচার হয়। গল্পটা এই যে, যুক্তপ্রদেশের তদানীন্তন গভর্ণর স্যার হারকোর্ট বাটলার জেলখানায় আমার পিতার জন্য 'স্যাম্পেন' (মদ) পাঠাইতেন। স্যার হারকোর্ট কারাগারে আমার পিতার জন্য কোন উপঢৌকনই পাঠান নাই। অথবা অন্য কেহ তাঁহার জন্য 'স্যাম্পেন' বা কোনজাতীয় কোন পানীয় প্রেরণ করেন নাই। কংগ্রেসে অসহযোগ গৃহীত হইবার পর ১৯২০ সালে পিতা মদ্য পান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এই কারণে তিনি মদ্য গ্রহণ করিতেন না।

এখানে বিভিন্ন র্চির নানা শ্রেণীর লোক। ইহা সকলের পক্ষেই মানসিক যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া উঠিত এবং এখানে নির্জনতার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিতাম। আমার পরবর্তী কারাজীবনে অবশ্য আমি নির্জনতা ও গোপনীয়তা যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছি। যখন মাসের পর মাস কদাচিৎ কোনও কারাকর্মচারী ব্যতীত আর কাহারও দর্শন পাই নাই, তখন কিন্তু ইহাতে ও অন্য প্রকার মনোবেদনায় কাতর হইয়া মনোমত ব্যক্তির সংগ লাভের জন্য কাতর হইতাম। সেই নিঃসংগ অবস্থায় ১৯২২-এর লক্ষ্মৌ জেলে জনতার হট্টগোলের মধ্যেও ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইত। তথাপি আমি মনে মনে জানি, যদি লেখাপড়ার স্ববিধা থাকে তাহা হইলে নির্জনতাই আমার অধিকতর কাম্য।

অবশ্য একথা আমি বলিব যে, আমার সংগীদের ব্যবহার ভদ্র এবং আনন্দদায়ক ছিল এবং আমরা পরস্পর প্রীতির সহিত বাস করিয়াছি। কিন্তু মনে হয়, কখনও কখনও পরস্পরের সংগে বিরক্তি আনিত এবং দ্রে সরিয়া একট্ নির্জনে যাইতে ইচ্ছা হইত। ব্যারাকের বাহিরে প্রাচীরের ধারে গিয়া ফাঁকা জায়গাট্কুতে একট্ নির্জনতার স্বাদ পাইতাম। তখন বর্ষাকাল, আকাশে মেঘ থাকিত বলিয়া ইহার স্যোগ গ্রহণ করিতাম। কি স্র্যতাপ, এমন কি, ব্ষ্টিতে ভিজিয়াও যতটা সময় পারিতাম ব্যারাকের বাহিরে থাকিতে চেষ্টা করিতাম।

সেই ফাঁকা জায়গাট্কুতে শ্ইয়া আমি উর্ধ্বে আকাশের মেঘের দিকে চাহিতাম। জীবনে কখনও এমন আগ্রহ লইয়া আকাশে মেঘমালার বর্ণবৈচিত্র্যের এত র্প দেখি নাই। "পরিবর্তিত মেঘমালায় ষড়্ঋতুর আবর্তবিলাস দেখিতে দেখিতে শ্ইয়া থাকাও মধ্ময়। সময়ের কি আনন্দময় সম্ভোগ।"

কিন্তু হায়! আমাদের নিকট সময় সম্ভোগের ছিল না। ইহা ছিল দ্বর্বহ ভার। যখন আমি বর্ষার মেঘপ্ঞ্জের দ্রত পরিবর্তনলীলা দেখিয়া কাটাইতাম তখনই ক্লান্তি মোচনের আনন্দে মন ভরিয়া উঠিত। এ যেন বন্দী-জীবনের বন্ধন ম্ক্তির আবিষ্কারের আনন্দ। আমি বলিতে পারি না যে, এই বিশেষ বর্ষাকালটি কেন এমন করিয়া আমার চিত্ত হরণ করিল, কেমনা, ইহার প্র্বে ও পরে আর কোন বর্ষায়ই আমি এমন অভিভূত হই নাই। আমি পর্বতশিখরে ও সম্দ্রগর্ভে বহ্বার ম্গ্ধ নেত্রে স্র্যোদয় এবং স্র্যাস্ত দেখিয়াছি। তাহার আলোকধারায় স্নান করিয়াছি। সে র্প-সমারোহে সমস্ত হ্দয় ও মন প্লকে ন্ত্য করিয়াছে। কিন্তু তাহাও ক্ষণিকের। দর্শনেই সব ফ্রাইয়া গিয়াছে। মন সহজেই বিষয়ান্তরে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই কারাগারে স্র্যোদয় নাই, স্র্যাস্তও নাই; দিগন্তরেখা আমাদের চক্ষ্র সম্ম্খ হইতে আব্ত। প্রভাত উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রচণ্ড স্র্য কারাপ্রাচীরে ভাসিয়া উঠে। কোথাও কোন বর্ণবৈচিত্র্য নাই। কারাপ্রাচীর ও ব্যারাকে শ্রীহীন ধ্সর বর্ণ দেখিতে দেখিতে চক্ষ্ ক্লান্ত এবং পীড়িত হয়। আলো ও আঁধারের খেলা এবং রঙের ল্কোচুরি দেখিবার জন্য ক্ষ্বিত দ্ষ্টি ব্যাকুল হইয়া উঠে। বর্ষার মেঘ মন্থর গতিতে আকাশে ভাসিয়া চলে, ক্ষণে ক্ষণে আকার ও আকৃতির কত পরিবর্তন, বহ্ বিচিত্র বর্ণের সে কি সমারোহ! বিস্মিত আনন্দে আমি যেন একপ্রকার ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতাম। কখনও কখনও বিদীর্ণ মেঘের অন্তরালে গভীর নীল আকাশখণ্ড যেন অনন্তের আভাস আনিত—বর্ষার সে এক বিশিষ্ট দ্শ্য।

ক্রমে আমাদের উপর বিধিনিষেধের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কঠোরতর নিয়ম প্রবর্তিত হইল। আমাদের আন্দোলনের পাল্টা জবাবে গভর্নমেন্ট যেন জানাইয়া দিতে চাহিলেন যে, তাঁহাদের বির্দ্ধতা করিবার জন্য আমাদের উপযুক্ত শাস্তির

তাঁহারা কি পরিমাণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই সকল নূতন বিধি এবং তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতি লইয়া জেলকর্মী ও রাজবন্দীদের মধ্যে বিরোধ বাধিল। তখন আমরা ঐ জেলে কয়েক শত বন্দী ছিলাম। আমরা প্রায় সকলেই নূতন ব্যবস্থার প্রতিবাদ স্বরূপ কয়েক মাসের জন্য বাহিরে আত্মীয় বন্ধুদের সহিত দেখা করা বন্ধ করিয়া দিলাম। এই অশান্তির জন্য আমরা কয়েকজন দায়ী, ইহা স্থির করিয়া কারা কর্তৃপক্ষ আমাদের সাত জনকে ব্যারাক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া জেলের একপ্রান্তে লইয়া গেলেন। অর্থাৎ পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, মহাদেব দেশাই, জর্জ জোশেফ্, বালকৃষ্ণ শর্মা, দেবদাস গান্ধী এবং আমাকে স্বতন্ত্র করা হইল।

আমাদিগকে একটি অপরিসর স্থানে রাখা হইল। এইখানে অনেকগুলি অসুবিধাও ছিল, মোটের উপর এই পরিবর্তনে আমি সুখী হইলাম। এখানে জনতার হট্টগোল নাই। আমরা অনেক শান্তির ও গোপনীয়তার সুযোগ পাইলাম। পড়াশুনা করিবারও সময় পাওয়া গেল। জেলের অন্যান্য অংশে অবস্থিত আমাদের সহকর্মীদের সহিত বিচ্ছেদ তো ঘটিলই, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে খবরের কাগজ দেওয়া বন্ধ করার ফলে বহির্জগত হইতেও আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইলাম।

সংবাদপত্র না পাইলেও বাহিরের কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম। জেলের কড়াকড়ির মধ্য দিয়াও সর্বদাই কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। আমাদের মাসিক দেখাসাক্ষাৎ ও পত্রের মধ্যেও অসংলগ্ন ও টুকরা টুকরা সংবাদ মিলিত। আমরা বুঝিলাম, বাহিরের আন্দোলনে ভাটার টান ধরিয়াছে। সে ইন্দ্রজালের মুহূর্তে অবসান, সাফল্য অস্পষ্ট ভবিষ্যতে সরিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস পরিবর্তনপ্রয়াসী ও পরিবর্তন-বিরোধী দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল। এক দলের নেতা হইয়াছেন দেশবন্ধু দাশ এবং আমার পিতা। তাঁহাদের মতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক আইন-সভার নির্বাচনে যোগ দেওয়া উচিত এবং সম্ভব হইলে ঐগুলি দখল করা উচিত। রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে চালিত অপর দল অসহযোগের পুরাতন কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন প্রস্তাবমাত্রেরই বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। অবশ্য গান্ধিজী তখন কারাগারে ছিলেন। আন্দোলনের মহোচ্চ আদর্শের উত্তালতরঙ্গ যাহা আমাদিগকে ঊর্ধ্বে তুলিয়াছিল তাহাই ভাটার টানে ক্ষুদ্র কলহ এবং ক্ষমতা-লাভের ষড়যন্ত্রের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করিল। আমরা বুঝিলাম, উত্তেজনার মুহূর্তে মহৎ ও দুঃসাহসিক কাজ করা যত সহজ, উত্তেজনা নিভিয়া গেলে তাহা তত সহজ নহে। বাহির হইতে আগত সংবাদে আমরা দমিয়া গেলাম এবং কারাজীবনে স্বভাবতই যে সব উপহাস ও বিদ্রূপ সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার ফলেও জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিল। তথাপি অন্তরে অন্তরে এ সান্ত্বনাই পাইলাম যে, আমরা আমাদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়াছি এবং ফলাফলের দিকে না তাকাইয়া যথাকর্তব্য পালন করিয়াছি। ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট, কিন্তু আর যাহাই ঘটুক না কেন, আমাদের জীবনের অধিকাংশ ভাগ যে কারাগারে কাটাইতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমাদের মধ্যে এই শ্রেণীর আলোচনা চলিত, বিশেষভাবে আমার মনে আছে, একদিন জর্জ জোশেফের সহিত আলোচনার পর আমরা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম। এই ঘটনার পর জোশেফ ক্রমে আমাদের আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া গিয়া আমাদের কার্যাবলীর একজন উগ্র সমালোচক হইয়াছেন। লক্ষ্ণৌ জেলের সিভিল ওয়ার্ডে এক শরৎ সন্ধ্যায় বসিয়া আমরা যে আলোচনা করিয়াছিলাম তাহা কি তাঁহার মনে আছে?

আমরা ধারাবাহিকরূপে কাজ ও ব্যায়াম করিতে লাগিলাম। ব্যায়ামের জন্য আমরা প্রাচীর-ঘেরা জায়গাটুকুতে চক্রাকারে দৌড়াইতাম অথবা আমাদের ইয়ার্ডের

ক্প হইতে প্রকাণ্ড চামড়ার থলিয়ায় করিয়া জল তুলিতাম। যে ভাবে দ্ইটি বলদ একত্র করিয়া জল তোলা হয় আমরাও সেই ভাবে দ্ই জন করিয়া জল তুলিতে লাগিয়া যাইতাম। এই জল সেচন করিয়া আমাদের উঠানে একটি ছোট্ট তরকারির বাগান করিয়াছিলাম। আমরা প্রায় সকলেই প্রত্যহ কিছ্কাল স্তা কাটিতাম। কিন্তু এই শীতকালের দীর্ঘ অপরাহ্নে প্স্তক পাঠ করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। স্পারিন্টেন্ডেন্ট যখনই আমাদের ইয়ার্ডে আসিতেন তখনই দেখিতেন যে আমি পড়িতেছি। এত বেশী পড়াশ্নায় মনোযোগ বোধ হয় তাঁহার ভাল লাগিত না। একদিন এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজে বার বৎসর বয়সেই সাধারণ পড়াশ্নার পাঠ চুকাইয়া দিয়াছেন। এই সংযমের ফলে সেই সাহসী ইংরাজ কর্ণেল নিশ্চয়ই বিরক্তিকর অনেক চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহাতেই ভবিষ্যতে তিনি য্ক্তপ্রদেশের কারাগার-সম্হের ইন্সপেক্টরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ শীত সন্ধ্যায় নির্মল আকাশে তারকারাজির প্রতি আমরা চাহিয়া থাকিতাম। সৌরমণ্ডলের মানচিত্র হইতে অনেকগ্লির নাম ও অবস্থান আমরা চিনিয়াছিলাম। রাত্রে পরিচিত তারকাগ্লির উদয়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করিতাম এবং দেখামাত্র প্রাতন বন্ধ্দর্শনের মত আনন্দ হইত। এই ভাবে দিন কাটে, দিন সপ্তাহ হয়, সপ্তাহ মাস হয়, মাসের পর মাস যায়, এক বাঁধাধরা জীবনযাত্রায় আমরা ক্রমেই অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম! বাহিরে আমাদের কাজের ভার লইয়াছেন নারীরা—আমাদের জননী, জায়া ও ভগিনীগণ। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় তাঁহারা বিরক্ত, প্রিয়জন কারাগারে রহিয়াছে, দৈহিক স্বাধীনতা তাঁহাদের নিকট ভর্ৎসনার ন্যায় মনে হইতে লাগিল।

১৯২১-এর ডিসেম্বরে আমাদের প্রথম গ্রেফতারের পর হইতে প্লিশ প্রায়ই আমাদের এলাহাবাদের বাড়ী আনন্দভবনে আসিত। আমার ও পিতার জরিমানার টাকা আদায় করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কংগ্রেসের নিয়ম ছিল স্বেচ্ছায় জরিমানা না দেওয়া। কাজেই প্লিশ দিনের পর দিন আসিয়া ক্রোক্ করিত এবং কিছ্ কিছ্ আসবাবপত্র লইয়া যাইত। আমার চারি বৎসরের কন্যা ইন্দিরা এই ক্রমাগত জিনিষপত্র অপসরণ ও নষ্ট করায় মহা বিরক্ত হইয়া প্লিশের কার্যের প্রতিবাদ করিত ও তাহার তীব্র অসন্তোষ জ্ঞাপন করিত। আমার আশঙ্কা হয়, ভবিষ্যৎ জীবনে সাধারণ প্লিশবাহিনী সম্পর্কে তাহার ধারণার উপর এই বাল্যস্মৃতির প্রভাব থাকিবে।

জেলে আমাদিগকে সাধারণ অ-রাজনৈতিক কয়েদীদের হইতে পৃথক রাখার চেষ্টা করা হইত। এইজন্য কতকগ্লি জেল রাজনৈতিকদের জন্য পৃথকর্পে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণর্পে পৃথক করা অসম্ভব এবং আমরা প্রায়ই তাহাদের সংস্পর্শে আসিতাম এবং তৎকালীন কারাজীবনের বাস্তব কাহিনীসকল তাহাদের নিকট প্রত্যক্ষভাবে শ্নিতাম। ইহা দৈহিক অত্যাচার, অবৈধ উপায়ে পদলাভের চেষ্টা ও উৎকোচ প্রদানের মর্মন্তুদ কাহিনী। খাদ্যর্পে যাহা দেওয়া হয় তাহা অতি নিকৃষ্ট। আমি প্নঃ প্নঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহা অখাদ্য। সাধারণতঃ কারাকর্মচারীরা অল্পবেতনভোগী ও অকর্মণ্য। ইহারা নানা ছলনায় কয়েদী এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজনের উপর জ্লুম করিয়া অর্থ আদায় করিয়া থাকে। জেলার তাহার সহকারী এবং ওয়ার্ডারগণের যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা জেল ম্যান্য়েলে উল্লেখ আছে তাহা এত বিভিন্ন প্রকার ও বিচিত্র যে, কোন এক ব্যক্তির পক্ষে বিবেক ও যোগ্যতার সহিত তাহা যথাযথ পালন করা প্রায় অসম্ভব। য্ক্তপ্রদেশে (সম্ভবতঃ অন্যান্য প্রদেশেও) জেলের পরিচালনা কার্যের

সাধারণ নিয়মের সহিত কয়েদীর চরিত্র সংশোধন সদ্ব্যবহার শিক্ষাদান কিম্বা কার্যকরী কোন ব্যবসায় শিখাইবার কোন সম্পর্ক নাই। কারাগারে পরিশ্রম করাইবার উদ্দেশ্যই হইল কয়েদী হয়রান করা।* তাহাকে ভয় দেখাইয়া অন্ধ আনুগত্যে অবনত করিতেই হইবে; উদ্দেশ্য, সে যেন কারাগার হইতে এমন ভয় ও বিভীষিকার স্মৃতি লইয়া যায় যে, যাহাতে কারাগারের স্মৃতি স্মরণ করিবামাত্র কোন অপরাধ করিতে তাহার হৃৎকম্প হয়।

ইদানীং কারাব্যবস্থার কিঞ্চিৎ সংস্কার হইয়াছে। খাদ্য একটু ভাল হইয়াছে, কয়েদীদের কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে। রাজনৈতিক বন্দীরা কারামুক্ত হইয়া বাহিরে আন্দোলন করার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ওয়ার্ডারেরা যাহাতে "সরকারের" প্রতি বিশ্বস্ত থাকে সেজন্য তাহাদিগকে প্ররোচিত করিবার জন্য বেতনও বেশ ভালভাবে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বালক ও তরুণ কয়েদীদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার অন্তত সামান্য চেষ্টাও আজকাল করা হইতেছে। কিন্তু এ সকল পরিবর্তন ভাল হইলেও সমস্যাকে অল্পই স্পর্শ করিয়াছে। পুরাতন ধারা সমানভাবেই চলিতেছে।

অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দীই সাধারণ কয়েদীর মতন ব্যবহার পাইয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ সুবিধা বা সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার পাইতেন না কিন্তু তাঁহারা বুদ্ধিমান এবং দৃঢ়-চরিত্র বলিয়া তাঁহাদিগকে দিয়া যাহা খুসী করান কিম্বা টাকাকড়ি আদায় করা সহজ ছিল না। এই কারণে কারাকর্মচারীরা তাঁহাদিগকে বিষদৃষ্টিতে দেখিত। জেলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ কি অনুরূপ কোন সুযোগ পাইলেই ইহাদিগকে কঠিন দণ্ড দেওয়া হইত। এইরূপ শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে পনর-ষোল বৎসর বয়স্ক এক যুবককে (সে নিজের নাম বলিত আজাদ) বেত্রদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল। তাহাকে উলঙ্গ করিয়া চাবুক মারার তেকাঠায় বাঁধা হইল, প্রত্যেকটি বেত্রাঘাত যখনই তাহার দেহে কাটিয়া বসিতে লাগিল, সে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল, "মহাত্মা গান্ধীকি জয়।" অজ্ঞান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বালক ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে এই বালকই এক টেরোরিস্ট দলের নেতা হইয়াছিল।

---

* যুক্তপ্রদেশের জেল ম্যানুয়েলের ১৮৭ ধারায় ছিল—(নূতন সংস্করণে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে) "জেলে দৈহিক পরিশ্রমকে কেবল কার্যকরী মনে করিলেই চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য শাস্তি। অথবা ইহাকে লাভজনক করিবার প্রশ্নকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। জেলের কাজের প্রধান ও মুখ্য লক্ষ্য হইবে এই যে, ইহাকে বিরক্তিকর কঠোর এবং অন্যায়কারীর পক্ষে ভীতিপ্রদ করিতে হইবে।"

ইহার সহিত দুনিয়ার সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের ফৌজদারী আইনের তুলনা করা যাইতে পারে,—

১ ধারা—"সমাজরক্ষামূলক উপায়গুলির এরূপ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে যাহার ফলে দৈহিক যন্ত্রণা, মনুষ্যোচিত মর্যাদার লাঘব ঘটে কিম্বা প্রতিশোধমূলক বা শাস্তিমূলক।

২৩ ধারা—"সমাজরক্ষার উদ্দেশ্য হইবে অন্যায়কারীকে অন্যায়কর্মপ্রবণতা হইতে নিবৃত্ত রাখা। কয়েদীর উপর কোন প্রকার পীড়ন চলিবে না কিম্বা তাহাকে অপমানজনক ও পাশবিক দুর্ব্যবহার করিতে যেন না দেওয়া হয়।"

১৪

কারামুক্তি

জেলে মানুষ অনেক কিছু হইতেই বঞ্চিত হয় কিন্তু তাহার মধ্যেও নারীর কণ্ঠস্বর ও শিশুর হাসির অভাবই বেশী করিয়া মনে পড়ে। জেলের দৈনন্দিন শব্দ শ্রুতিসুখকর নহে। জেলের কথাবার্তা কর্কশ, ভয়চকিত এবং ভাষা ইতর ও অশ্লীল। আমার মনে আছে, একদিন হঠাৎ এক নূতন অভাব বোধ করিলাম। লক্ষ্ণৌ জেলে সহসা আমার মনে হইল সাত-আট মাস আমি কুকুরের ডাক শুনি নাই।

১৯২৩-এর জানুয়ারী মাসের শেষ দিন আমরা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পাইলাম। লক্ষ্ণৌ জেলে তখন "বিশেষ শ্রেণীর" বন্দীসংখ্যা একশত হইতে দুই শতের মধ্যে ছিল। ১৯২১-২২ ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে যাঁহারা এক বৎসর ও তাহার কম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাঁহারা দণ্ড ভোগান্তের পূর্বেই মুক্তি পাইয়াছিলেন; কেবল যাঁহাদের দীর্ঘ কারাদণ্ড হইয়াছিল অথবা যাঁহারা দ্বিতীয়বার ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এখানে কেবল তাঁহারাই ছিলেন। এই আকস্মিক কারামুক্তিতে আমরা বিস্মিত হইলাম। এই সাধারণ দণ্ড মকুবের সংবাদ আমরা পূর্বে পাই নাই। স্থানীয় প্রাদেশিক আইন সভায় রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার একটা প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সরকারী শাসন-পরিষদ কদাচিৎ এরূপ দাবী গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। যাহা হউক, গভর্ণমেন্টের দিক দিয়া এখন সুসময়। কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু না করিয়া এখন আত্মকলহে মগ্ন এবং খ্যাতনামা কোন কংগ্রেসকর্মী এ সময় জেলের মধ্যে ছিলেন না বলিয়াই এই দয়াটুকু দেখান হইল।

কারান্ধার হইতে বাহির হইবার প্রথম মুহূর্তে একটা তৃপ্তি ও আনন্দময় চাঞ্চল্য বোধ হইয়া থাকে। মুক্ত বায়ু, অবারিত মাঠ, রাজপথের গতিশীল জনতা ও যানবাহন, পুরাতন বন্ধুদের সহিত মিলন, এই সমস্ত মিলিয়া এক অপূর্ব উন্মাদনা আনিয়া দেয়। বহির্জগতের সহিত প্রথম সংঘাতে মন উদ্বেল হইয়া উঠে। কিন্তু এই উৎফুল্ল আবেগ অতি ক্ষণস্থায়ী, কেননা, কংগ্রেসী রাজনীতির অবস্থা অত্যন্ত নিরুৎসাহজনক হইয়া উঠিয়াছিল। আদর্শবাদের পরিবর্তে জটিল চক্রান্ত এবং বিভিন্ন উপদলগুলি যে সকল উপায়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা দেখিয়া ভাবপ্রবণ ব্যক্তিরা রাজনীতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

আমি নিজে কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধ মতই পোষণ করিতাম, কেননা, ইহার ফলে কৌশলের নামে আপোষ রফার মধ্যে পড়িতে হইবে এবং আমাদের উদ্দেশ্য ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িবে। কিন্তু কার্যতঃ তখন দেশের সম্মুখে কোন কার্যপ্রণালী ছিল না। পরিবর্তনবিরোধীরা গঠনমূলক কার্যের উপর জোর দিতে লাগিলেন। ইহা মুখ্যতঃ সমাজ-সংস্কারমূলক পদ্ধতি মাত্র। ইহার স্বপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, ইহার দ্বারা কর্মীরা জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহারা রাজনৈতিক কার্যক্রমে বিশ্বাসী তাঁহারা ইহাতে সুখী হইতে পারিলেন না। অথচ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্যের অসাফল্যের প্রতিক্রিয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কিছুকালের জন্য পার্লামেন্টীয় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়া চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই নূতন

আন্দোলনের নেতৃদ্বয় দেশবন্ধু দাশ ও আমার পিতা যে কার্যপদ্ধতি নির্দেশ করিলেন তাহা সহযোগিতা অথবা গঠনমূলক নহে, তাহা বাধাপ্রদান ও উপেক্ষা করার নীতি।

দেশবন্ধু জাতীয় সংগ্রামকে আইন সভার মধ্যেই লইয়া যাইবার পক্ষপাতী ছিলেন। আমার পিতারও অল্পবিস্তর সেইরূপ ইচ্ছা ছিল তবে তিনি গান্ধিজীর মত মানিয়া লইয়া ১৯২০-এ আইন সভা বর্জনে সম্মতি দিয়াছিলেন। তিনি জাতীয় আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে উৎসুক ছিলেন এবং তখন ইহার একমাত্র পথ ছিল গান্ধী-নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা। সিন্‌ফিন্‌গণ যেমন পার্লামেণ্টের আসনগুলি দখল করিয়া হাউস্ অফ কমন্সে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন; যুবকগণের মধ্যে অনেকে সেইরূপ কৌশলের কথা চিন্তা করিতেন। ১৯২০-এর গ্রীষ্মকালে এই প্রকার বর্জন গ্রহণ করিবার জন্য গান্ধিজী অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বীকৃত হন নাই। মহম্মদ আলী তখন খিলাফত ডেপুটেশন লইয়া ইউরোপে। তিনিও ফিরিয়া আসিয়া বয়কট ও বর্জনের পদ্ধতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সিন্‌ফিন্ পদ্ধতির উপর তাঁহারও ঝোঁক ছিল। কিন্তু এবিষয়ে কাহারও ব্যক্তিগত চিন্তা বা ধারণার কোনই মূল্য নাই, কেননা, পরিণামে গান্ধিজীর মতই বলবত্তর হইত। তিনিই আন্দোলনের স্রষ্টা; কাজেই খুঁটিনাটি সকল বিষয়েই তাঁহার স্বাধীনতা থাকা উচিত, এইরূপই সকলে মনে করিতেন। সিন্‌ফিন্ পদ্ধতির বিরুদ্ধে (হিংসামূলক কার্যের সহিত সংস্রব ছাড়াও) তাঁহার প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, ভোট দিও না, নির্বাচন-কেন্দ্রে উপস্থিত হইও না—ইহা জনসাধারণ যত সহজে বুঝিবে সিন্‌ফিন্ পদ্ধতি তত সহজে ধরিতে পারিবে না। আইন সভায় নির্বাচিত হইয়া প্রবেশ করিতে বিরত থাকিলে জনসাধারণের চিত্ত বিভ্রান্ত হইবে। এবং আরও কথা এই, যাঁহারা নির্বাচিত হইবেন তাঁহারা স্বভাবতই আইন সভায় যাইতে চাহিবেন এবং তাঁহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা কঠিন হইবে। আন্দোলনের শৃঙ্খলা এবং শক্তি এমন ছিল না যে দীর্ঘকাল তাঁহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা যাইতে পারে। আইন সভার মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারী অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত হইয়া অধঃপতনের দিকে অনেকেই গড়াইয়া যাইত। এই সকল যুক্তির সারবত্তা আমরা পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বরাজ্য দল আইন সভায় প্রবেশ করার পর ইহার অনেক কথাই সত্যে পরিণত হইয়াছিল। তথাপি ১৯২০ সালে কংগ্রেস যদি আইন সভাগুলি দখল করিতে চেষ্টা করিত তাহা হইলে ফল কি হইত ইহা মাঝে মাঝে মনে হয়। খিলাফত কমিটির সহায়তায় তখন কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রত্যেকটি নির্বাচিত আসন লাভ করিতে পারিত, ইহা নিঃসন্দেহ। আজ (আগষ্ট ১৯৩৪) পুনরায় কংগ্রেস কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য প্রেরণের কথা চলিতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে একটি পার্লামেণ্টারি বোর্ডও সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ১৯২০-এর পর নানা ঘটনায় আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ফাটলগুলির ব্যবধান ও গভীরতা বাড়িয়াছে। নির্বাচনে কংগ্রেস যে সাফল্যই লাভ করুক না কেন, ১৯২০-এ যাহা হইতে পারিত বর্তমানে তাহা সম্ভব নহে।

জেল হইতে বাহির হইবার পর আমি আরও কয়েকজনের সহিত মিলিত হইয়া দুই যুধ্যমান দলের সহিত আপসরফার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কোনই ফল হইল না; আমি পরিবর্তনপ্রয়াসী ও পরিবর্তনবিরোধী উভয়দলের রাজনীতির উপরই বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকরূপে আমি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনকার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। গত বৎসরের আন্দোলনে

পর অনেক কিছুই করিবার ছিল। আমি খুব খাটিতে লাগিলাম; কিন্তু এই কাজের কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল না। আমার মন শিথিল হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় একটা নূতন কাজ জুটিয়া গেল। আমার মুক্তির কয়েক সপ্তাহ পরেই আমাকে টানিয়া লইয়া এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির মাথায় বসাইয়া দেওয়া হইল। এই নির্বাচন এত আকস্মিক যে সভা আরম্ভের ৪৫ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত আমার নাম কেহ উল্লেখ করেন নাই, এমন কি, সম্ভবতঃ ভাবেনও নাই। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসপক্ষীয়েরা স্থির করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কাহারও সাফল্যের সম্ভাবনা নাই।

এই বৎসর দেশের নানাস্থানে কংগ্রেসের নেতারা মিউনিসিপালিটির সভাপতি হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু কলিকাতার মেয়র, ভিটলভাই প্যাটেল বোম্বাই কর্পোরেশনের সভাপতি এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আহম্মদাবাদের সভাপতি হইলেন। যুক্তপ্রদেশেও বড় বড় মিউনিসিপালিটিগুলির চেয়ারম্যানের পদে কংগ্রেসপন্থীরাই অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

মিউনিসিপালিটির বিভিন্ন বিভাগের কার্যে আমি ক্রমশঃ বেশী সময় দিতে লাগিলাম এবং কতকগুলি সমস্যার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। আমি অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া মিউনিসিপালিটি সংস্কারে বড় বড় পরিকল্পনা করিলাম। কিন্তু পরে দেখিলাম ভারতীয় মিউনিসিপালিটিগুলি যেভাবে গঠিত তাহাতে চমকপ্রদ বড় বড় সংস্কারের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। অবশ্য করিবার অনেক কিছুই ছিল। যন্ত্রটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং উহার গতি বাড়াইবার জন্য আমি কঠিন পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। এদিকে কংগ্রেসেরও কাজ বাড়িল। প্রাদেশিক সম্পাদকের দায়িত্বের উপর নিখিল ভারতীয় সম্পাদকের ভারও গ্রহণ করিতে হইল। এই সকল বিভিন্ন কাজে আমাকে প্রত্যহ প্রায় ১৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত এবং দিবাবসানে আমি ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়িতাম।

জেল হইতে বাড়ী ফিরিয়া যে পত্রখানি আমার প্রথম চোখে পড়িল তাহা এলাহাবাদ হাইকোর্টের তখনকার বিচারপতি স্যর গ্রীমউড্ মিয়ারস্-এর লেখা। পত্রখানিতে আমি ছাড়া পাইবার কয়েকদিন পূর্বের তারিখ ছিল। বুঝিলাম তিনি ছাড়া পাওয়ার খবর পূর্বেই জানিতেন। তাঁহার পত্রের সৌজন্যপূর্ণ ভাষা এবং মাঝে মাঝে আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার সহৃদয় আমন্ত্রণে আমি একটু বিস্মিত হইলাম। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নাই বলিলেই হয়। তিনি ১৯১৯-এ যখন এলাহাবাদে আসেন তখন আমি আইন ব্যবসায় প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছি। আমার মনে আছে, তাঁহার আদালতে মাত্র একদিন আমি কোনও মামলায় সওয়াল জবাব করিয়াছিলাম এবং সে-ই আমার হাইকোর্টে সর্বশেষ উপস্থিতি। কোন কোন কারণে হয়ত বা তিনি আমাকে ভাল করিয়া না জানিয়াই আমার প্রতি অনুকূল ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল—একথা তিনি পরে বলিলেন যে, আমি বড় বেশী অগ্রসর হইব, সেইজন্য তিনি আমার উপর সংপ্রভাব বিস্তার করিয়া আমাকে ব্রিটিশ সদিচ্ছা বুঝাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত কৌশলের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে অধিকাংশ ইংরেজের এই ধারণা যে, ভারতের সাধারণ "চরমপন্থী" রাজনৈতিকদের ব্রিটিশ বিরোধী হইবার কারণ যে তাঁহারা সামাজিক ব্যাপারে ইংরেজের নিকট খারাপ ব্যবহার পাইয়াছেন। ইহাই ক্রোধ বিরক্তি এবং চরমপন্থার কারণ। একটা গল্প প্রচলিত আছে এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও বলিয়া থাকেন যে, আমার পিতা কোনও ইংরেজ ক্লাবের সদস্য নির্বাচিত হইতে না পারিয়া ব্রিটিশ বিরোধী ও চরমপন্থী হইয়াছেন।

এই গল্পটির কোন ভিত্তি নাই এবং ইহা সম্পূর্ণ এক পৃথক ঘটনার অপলাপ মাত্র * কিন্তু অধিকাংশ ইংরেজের নিকট জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তির এই শ্রেণীর যুক্তি ও ব্যাখ্যা সত্য হউক মিথ্যা হউক, সহজ ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে পিতার অথবা আমার এমন কোনও কারণ ছিল না; ব্যক্তিগতভাবে আমরা ইংরাজের নিকট ভদ্র ব্যবহারই পাইয়াছি এবং খোলাখুলিভাবে মিশিয়াছি। তবুও সমস্ত ভারতীয়ের মতই জাতিগত পরাধীনতা সম্পর্কে আমরা সচেতন ছিলাম এবং তাহার জন্য অন্তরে ক্রোধ ও তিক্ততাও ছিল। আমি অকপট চিত্তে স্বীকার করিতেছি, এমন কি, এখনও একজন ইংরেজের সহিত আমি প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারি; অবশ্য তিনি যদি একজন সরকারী কর্মচারী না হন এবং মুরুব্বিয়ানা ভঙ্গী না দেখান। যদি তাহাও হয়, তাহা হইলেও সে মেলামেশায় আমোদের কোন অভাব হয় না। সম্ভবতঃ মডারেট বা ঐ জাতীয় যাঁহারা ভারতে ইংরাজের সহিত রাজনৈতিক সহযোগিতা করিয়া থাকেন তাঁহাদের অপেক্ষা আমার সহিত ইংরাজ স্বভাবের সৌসাদৃশ্য অনেক অধিক।

স্যর গ্রীমউড্ ভাবিলেন, বন্ধুভাবে মিলন এবং সরল সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা তিনি আমার মন হইতে তিক্ততার মূল কারণগুলি দূর করিবেন। তাঁহার সহিত আমার কয়েকবার দেখা হইয়াছিল। কোন মিউনিসিপালিটির ট্যাক্সের প্রতিবাদ করিবার অছিলায় তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে অপর সব বিষয়েও আলোচনা করিতেন। একদিন তিনি ভারতীয় মডারেটদিগকে অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন। ভীরু, কাপুরুষ, সুবিধাবাদীর দল, চরিত্র ও মেরুদণ্ডহীন—এই সকল কথা অত্যন্ত ঘৃণার সহিত বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মনে কর যে এই লোকগুলির উপর আমাদের কোন শ্রদ্ধা আছে? আমি আশ্চর্য হইলাম, এ কথা আমাকে বলিবার প্রয়োজন কি? সম্ভবতঃ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এই শ্রেণীর কথায় আমি খুব সুখী হইব। কথায় কথায় তিনি নূতন কাউন্সিল এবং মন্ত্রীদের কথা তুলিলেন। দেশের সেবা করিবার জন্য এই সব মন্ত্রীর কত সুযোগ তাহাও উল্লেখ করিলেন। শিক্ষা দেশের একটা প্রধান ও মুখ্য সমস্যা। একজন শিক্ষামন্ত্রী যদি নিজের ইচ্ছামত কাজ করিবার স্বাধীনতা পান তাহা কি লক্ষ লক্ষ মানবের ভবিষ্যৎ নিরূপণে একটা উপযুক্ত সুযোগ নহে? জীবনে এমন সুযোগ কয়জন পায়? তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন—মনে কর তোমার মত একজন লোক—বুদ্ধি, চরিত্র, আদর্শবাদ এবং কর্মোৎসাহ যাহার আছে তাহাকে যদি এই প্রদেশের শিক্ষার ভার দেওয়া হয় তাহা হইলে তোমার মত লোক কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে না? তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, অল্প দিন পূর্বে তাঁহার সহিত গভর্নরের সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং নিজের উদ্দেশ্য মত কাজ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাকে দেওয়া হইবে। সম্ভবতঃ তিনি বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন এবং বলিলেন তিনি সরকারীভাবে কিছু বলিতেছেন না, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত প্রস্তাব মাত্র।

স্যর গ্রীমউডের এই কূট কৌশলপূর্ণ প্রস্তাবটি হইতে অবশ্য আমি পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। মন্ত্রীরূপে গভর্নমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করার কথা ত আমি ভাবিতেই পারি না এবং নিশ্চয়ই ইহার মত ঘৃণার্হ আমার নিকট আর কিছু নাই। কিন্তু তখন এবং পরবর্তীকালেও কিছু স্থায়ী প্রত্যক্ষ গঠনমূলক কাজের

---

* ৩৮ অধ্যায়ে পাদটীকায় এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

জন্য আমার মনে মাঝে মাঝে আকাঙ্ক্ষা জাগিত। মানুষের পক্ষে ধ্বংসমূলক আন্দোলন এবং অসহযোগ স্বাভাবিক কার্যপদ্ধতি নয়। কিন্তু আমাদের ভাগ্য এরূপ যে ধ্বংস ও সংঘর্ষের মরুভূমি অতিক্রম করিয়াই আমাদিগকে সেইখানে যাইতে হইবে, যেখানে আমরা গঠনমূলক কিছু করিতে পারিব। হয়ত আমাদের অধিকাংশের শক্তিসামর্থ্য ও জীবন এই শিথিল বালুকারাশির মধ্য দিয়া সংঘর্ষ ও ক্লান্তিতেই নিঃশেষিত হইবে এবং গঠন করিবে আমাদের পুত্র অথবা পুত্রের পুত্রগণ।

ঐ কালে মন্ত্রীগিরি কত সস্তা ছিল,—অন্ততঃ যুক্তপ্রদেশে। যে দুইজন মডারেট মন্ত্রী অসহযোগ আন্দোলনের কালে কার্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মেয়াদ ফুরাইল। কংগ্রেসী আন্দোলন যখন বর্তমান অবস্থার পক্ষে বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠিয়াছিল তখন গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস দমনে মডারেট মন্ত্রীদের কাজে লাগাইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা সম্মান পাইতেন, সরকারী শাসন পরিষদও তাঁহাদের শ্রদ্ধা করিয়া চলিতেন। সেই দুর্দিনে গভর্ণমেণ্টের সমর্থকরূপে মন্ত্রীদিগকেই তাঁহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। মন্ত্রীরা সম্ভবতঃ মনে করিতেন, এই সম্মান ও শ্রদ্ধা তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য। কংগ্রেসের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হইতেই যে গভর্ণমেণ্ট এইরূপ করিতেছেন তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। যখন আক্রমণ বন্ধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মডারেট মন্ত্রীদের মূল্যও গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিতে একদম কমিয়া গেল। সহসা দেখা গেল, সম্মান ও শ্রদ্ধা বলিয়া কিছু অবশিষ্ট নাই। মন্ত্রীরা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন কিন্তু সে নিষ্ফল আক্রোশ তাঁহাদের কোন কাজেই আসিল না। শীঘ্রই তাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তারপর নূতন মন্ত্রীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সহসা কৃতকার্য হইলেন না। আইন সভার মুষ্টিমেয় মডারেট তাঁহাদের সহকর্মীর প্রতি দুর্ব্যবহারে সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া সরিয়া রহিলেন। অবশিষ্ট সদস্যগণের অধিকাংশই জমিদার, তাহার মধ্যে মোটামুটি লেখাপড়া জানেন এরূপ লোকের সংখ্যাও অতি কম। কংগ্রেস আইন সভা বর্জন করায় সেখানে বহু বিচিত্র লোকের আশ্চর্য সম্মেলন ঘটিয়াছিল।

এই সময় অথবা কিছুদিন পরে যুক্তপ্রদেশে একজন ব্যক্তিকে মন্ত্রীগিরি দেওয়ার প্রস্তাব সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি নাকি উত্তর দিয়াছিলেন যে, তিনি এত লঘুচিত্ত নহেন যে নিজেকে একজন মস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন; তবে তাঁহার কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, হইতে পারে তাহা সাধারণ লোক অপেক্ষা একটু বেশী, অন্ততঃ তাঁহার ধারণা এ খ্যাতিটুকু তাঁহার আছে। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মন্ত্রী করিয়া কি জগতের সম্মুখে একজন নিরেট মূর্খ বলিয়া পরিচিত করিতে চান?

এই প্রতিবাদের কিছু কারণ ছিল। মডারেট মন্ত্রীরা সঙ্কীর্ণচেতা, রাজনীতি বা সামাজিক ব্যাপারে উদারদৃষ্টিহীন। অবশ্য এ দোষ তাঁহাদের নয়, ইহা তাঁহাদের বন্ধ্যা মডারেটীয় নীতির ফল। যাহা হউক, সাধারণ চাকুরীজীবী বা বৃত্তিজীবীদের দক্ষতা তাঁহাদের ছিল এবং দৈনন্দিন কাজ তাঁহারা বিবেক বুদ্ধি অনুসারে চালাইয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহাদের পর যাঁহারা জমিদারশ্রেণী হইতে আসিলেন তাঁহাদের শিক্ষাও সাধারণভাবে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমার মতে তাঁহাদিগকে লিখিতে পড়িতে জানেন এই মাত্র বলা চলে, তাহার বেশী নহে। গভর্ণর এই ভদ্রলোকদিগকে উচ্চপদে মনোনীত করিয়া যেন দেখাইতে লাগিলেন ভারতীয়েরা কত অবোধ, কত অপদার্থ। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, "ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন তখন

সব বিষয়েই সাহস করা যাইতে পারে, নারীর পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই।"
—রিচার্ড গারনেট্।

শিক্ষা থাক আর নাই থাক, এই সব মন্ত্রীর হাতে জমিদারদের ভোট ছিল এবং ই'হারা সরকারী কর্মচারীদিগকে সুন্দর সুন্দর বাগান পার্টিতে আপ্যায়িত করিতে পারিতেন। অনশনক্লিষ্ট প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থের ইহা অপেক্ষা অধিক কি সদ্ব্যয় হইতে পারে?

১৫

সন্দেহ ও সংঘর্ষ

অশান্তিজনক সমস্যাগুলি ভুলিয়া থাকিবার জন্য আমি নানারকম কাজ করিতে লাগিলাম। কিন্তু এড়ান কঠিন; স্বাভাবিক ভাবেই মনে যে সকল প্রশ্ন ভাসিয়া উঠে, তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর খুঁজিয়া পাই না। এখন যাহা করিতেছি তাহা কেবল নিজেকে ভুলাইবার জন্য, ইহার মধ্যে ১৯২০-২১-এর মত প্রাণের পরিপূর্ণ বিকাশ নাই। তখনকার দিনে যে বর্মে আত্মরক্ষা করিতাম, সেই আবরণ ত্যাগ করিয়া আমি ভারত ও জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। এখন অনেক পরিবর্তন দেখি, যাহা পূর্বে লক্ষ্য করি নাই, নূতন আদর্শ নূতন বিষয় আলোকের পরিবর্তে সংশয়ের অন্ধকারই ঘনাইয়া তুলে। গান্ধিজীর নেতৃত্বের উপর আমার অবিচলিত আস্থা সত্ত্বেও আমি তাঁহার কার্যপদ্ধতির কোন কোন অংশ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বিচার করিয়া দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি তখনও কারাগারে আমাদের আয়ত্তের বাহিরে, তাঁহার উপদেশ পাওয়া সম্ভবপর নহে। আমি দেখিলাম কংগ্রেসে দুই দলই—কাউন্সিলগামী দল এবং পরিবর্তনবিরোধী দল কোনই কাজ করিতেছেন না। প্রথমোক্ত দল ক্রমশঃ সংস্কারপন্থী ও নিয়মতান্ত্রিক হইয়া পড়িতেছেন এবং তাহার ফল আমার নিকট চোরাগলিতে আটকাইয়া পড়িবার মত বোধ হইল। পরিবর্তনবিরোধীরা মহাত্মাজীর একনিষ্ঠ অনুচর বলিয়া কথিত হইতেন; কিন্তু মহাপুরুষদের অন্যান্য শিষ্যগণের মতই তাঁহারাও তাঁহার শিক্ষার মূলভাব ছাড়িয়া বাহিরের খোসা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন তেজস্বিতা ছিল না, কার্যতঃ তাঁহারা অত্যন্ত নিরীহ সদাশয় সমাজসংস্কারক মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের এক সুবিধা ছিল, স্বরাজীরা যখন আইন সভায় নিয়মতান্ত্রিক কলকৌশল লইয়া সারাক্ষণ ব্যাপৃত ছিলেন তখন তাঁহারা (পরিবর্তনবিরোধী) কৃষকসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমার কারামুক্তির কিছুকাল পরেই দেশবন্ধু দাশ আমাকে স্বরাজ্য দলে যোগ দেওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার যুক্তির নিকট আমি আত্মসমর্পণ না করিলেও আমি যে কি করিব সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা আমার ছিল না। আমার পিতা এইকালে স্বরাজ্য দল লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আশ্চর্য উল্লেখযোগ্য যে, তিনি কখনও আমাকে উক্ত দলে লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই অথবা কোন প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। ইহা সত্য যে, আমি তাঁহার সহিত এই দলে যোগ দিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার অসাধারণ সুবিবেচনা ছিল বলিয়াই তিনি

এ বিষয়ে আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।

এই কালে আমার পিতার সহিত দেশবন্ধু দাশের বন্ধুত্ব অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এই বন্ধুত্বের মধ্যে রাজনৈতিক সহকর্মীর সম্পর্ক অপেক্ষা অনেক বেশী কিছু ছিল। তাঁহাদের পরস্পরের অনুরাগ ও নিবিড় প্রীতি দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য হইলাম, কেননা পরিণত বয়সে এরূপ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব কদাচিত হইয়া থাকে। পিতার বহু পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন এবং লঘুভাবে সকলের সহিত মিশিবার ক্ষমতাও ছিল তাঁহার অসাধারণ। কিন্তু বন্ধুত্ব হইতে তিনি সতর্ক থাকিতেন এবং শেষ বয়সে জীবন ও মানুষের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তথাপি তাঁহার ও দেশবন্ধুর মধ্যে কোন ব্যবধান রহিল না এবং তাঁহারা পরস্পরকে হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিলেন। আমার পিতা বয়সে নয় বৎসরের বড় হইলেও দুইজনের মধ্যে শরীরের তুলনায়, পিতার স্বাস্থ্য ও শক্তি বেশী ছিল। যদিও তাঁহারা উভয়েই আইনজীবী ও ঐ ব্যবসায়ে একই প্রকার সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি অনেক দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ আইনব্যবসায়ী হইলেও কবি ছিলেন এবং কবির অবেগ লইয়া সব কিছু দেখিতেন। আমি শুনিয়াছি, তিনি বাংলায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়াছিলেন। তিনি বাগ্মী ও ধর্মপ্রবণ ছিলেন। আমার পিতা অত্যন্ত বাস্তববাদী এবং কবিত্বহীন কঠোর ছিলেন। কাজকর্ম ও সঙ্ঘ গঠনাদি বিষয়ে তিনি নিপুণ ছিলেন কিন্তু তাঁহার মধ্যে ধর্মভাব ছিল না বলিলেই হয়। তিনি ছিলেন যোদ্ধা—আঘাত করিতে বা পাইতে সর্বদাই প্রস্তুত। তিনি যাহাদিগকে নির্বোধ মনে করিতেন তাহাদের সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন না; করিলেও সন্তোষের সহিত করিতেন না এবং তিনি প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিবার প্রবল উত্তেজনায় তিনি কর্ম করিতেন। এইরূপে আমার পিতা ও দেশবন্ধুর চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও স্বরাজ্য দলের যুগ্ম নেতারূপে তাঁহারা আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা একে অন্যের চরিত্রগত ত্রুটি ও অভাব কতক পরিমাণে পরিপূরণ করিতেন এবং তাঁহারা পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। এমন কি, পূর্ব হইতে পরামর্শ না করিয়াও কোন বিবৃতি বা ঘোষণাপত্রে একে অন্যের নাম ব্যবহার করিতে পারিবেন পরস্পরকে এইরূপ অধিকার পর্যন্ত দিয়াছিলেন।

স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা শক্তি ও দেশের নিকট মর্যাদার পশ্চাতে এই ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের গভীর প্রেরণা ছিল। স্বরাজ্য দলের সূচনাতেই ইহার মধ্যে ভাঙ্গনের বীজ ছিল, কেননা, কাউন্সিলের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত উন্নতির সম্ভাবনা দেখিয়া অনেক ভাগ্যান্বেষী ও সুবিধাবাদী এই দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতায় উন্মুখ কয়েক জন খাঁটি মডারেটও এই দলে ছিলেন। নির্বাচনের পরেই এই সকল মনোভাব উপরে ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু দলের নেতৃত্ব ইহা দৃঢ় হস্তে দমন করিয়া ফেলিলেন। আমার পিতা ঘোষণা করিলেন "ব্যাধিদুষ্ট অঙ্গ ছেদন করিতেও" তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না এবং তিনি এই ঘোষণানুযায়ী কার্য করিয়াছিলেন।

১৯২৩-এর পর হইতে পারিবারিক জীবনে আমি অনেক শান্তি ও আনন্দ পাইয়াছি, যদিও তাহা উপভোগের সময় আমার অতি কম ছিল। সৌভাগ্যক্রমে পরিবারস্থ সকলের নিকটেই আমি স্নেহ প্রীতি ভালবাসা পাইয়াছি এবং দুশ্চিন্তা ও দুর্দিনে সকলেই আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, আশ্রয় দিয়াছেন। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জিত হই। ১৯২০ হইতে আমার পত্নীর যত্নে ব্যবহারের নিকট আমি কত ঋণী। পার্বতী ও

ভাবপ্রবণা হইয়াও তিনি আমার খেয়াল-খুশী অকাতরে সহ্য করিয়াছেন এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে আমাকে শান্তি আরাম ও আনন্দ দিয়াছেন।

১৯২০-এর পর আমাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল। ইহা পূর্বাপেক্ষা অনেক আড়ম্বরহীন এবং চাকরবাকরের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছিল, তথাপি প্রয়োজনীয় আরামের অভাব ছিল না। অনাবশ্যক আড়ম্বর কমাইবার জন্য এবং অংশতঃ প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহের জন্য গাড়ী, ঘোড়া এবং আমাদের নূতন জীবনযাত্রার পক্ষে অনাবশ্যক ও সামঞ্জস্যহীন আসবাবপত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল। আমাদের কতক আসবাবপত্র পুলিস ক্রোক করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সকল আসবাবপত্র এবং মালীর অভাবে আমাদের ভবনের পূর্বের শ্রী আর রহিল না, বাগান জঙ্গল হইয়া উঠিল। প্রায় তিন বৎসর বাড়ী ও বাগানের দিকে কোন দৃষ্টিই দেওয়া হয় নাই। অতিমাত্রায় ব্যয়বাহুল্যে অভ্যস্ত পিতা এই সব ব্যয়সঙ্কোচ পছন্দ করিতেন না। এ জন্য তিনি ঘরে বসিয়া অবসর সময়ে আইনের পরামর্শ দিয়া অর্থ উপার্জনের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তিনি অতি অল্প সময়ই দিতে পারিতেন, তথাপি তাঁহার উপার্জন মন্দ হইত না।

অর্থের জন্য পিতার উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া আমি অস্বাচ্ছন্দ্য ও একটু নিরানন্দ বোধ করিতাম। আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করার পর, আমার নিজের বস্তুতঃ কোন আয়ই ছিল না। শেয়ার হইতে যে মুনাফা আসিত তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। আমার স্ত্রীর এবং আমার বিশেষ ব্যয়ভূষণ ছিল না। বরঞ্চ আমাদের ব্যয়ের অল্পতা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হইতাম। ১৯২১ সালেই আমি ইহা অনুভব করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। খাদি কাপড় এবং রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণে অতি অল্প অর্থেরই দরকার হইয়া থাকে। কিন্তু পিতার সহিত বাস করার ফলে তখন আমি বুঝিতে পারিতাম না গৃহস্থালীর অগণিত ব্যয় একত্র করিলে তাহা কি পরিমাণ মোটা অঙ্কে পৌঁছায়। যে কোন প্রকারেই হউক অর্থচিন্তা কখনও আমাকে বিব্রত করে নাই। আমার বিশ্বাস, আবশ্যক অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা আমার আছে এবং আমরা তুলনায় অনেক কম খরচে চালাইয়া লইতে পারি।

আমরা পিতার বিশেষ ভারস্বরূপ ছিলাম না। এমন কি, ইহার আভাস ইঙ্গিতেই তিনি হয়ত অত্যন্ত ব্যথিত হইবেন; তথাপি এই অবস্থা আমার ভাল বোধ হইত না। কিন্তু পরবর্তী তিন বৎসর কাল ইহা চিন্তা করিয়াছি কিন্তু কোন মীমাংসা পাই নাই। উপার্জন করিবার উদ্দেশ্যে একটা কাজ অবশ্য আমি সহজেই যোগাড় করিতে পারিতাম কিন্তু তাহা হইলে সাধারণের কাজে যে সময় ব্যয় করিতেছি তাহা হয় ছাড়িতে হয়, না হয় কমাইয়া দিতে হয়। তখন আমার সমস্ত সময় কংগ্রেস ও মিউনিসিপালিটির কার্যে নিযুক্ত ছিল। অর্থোপার্জনের জন্য এই কাজ ছাড়িয়া দেওয়া আমার ভাল বোধ হইল না। বড় বড় ব্যবসায়ীর কারখানা হইতে মোটা উপার্জনের যে সকল সুবিধাজনক প্রস্তাব আসিয়াছিল এই কারণে তাহা গ্রহণ করিলাম না। বৃহৎ ব্যবসায়ের সহিত যুক্ত হওয়াটাই আমি পছন্দ করিলাম না। পুনরায় আইন ব্যবসায়ে ফিরিয়া যাওয়ার প্রশ্ন অবশ্য উঠিতেই পারে না। আইন ব্যবসায়ের প্রতি আমার ঔদাসীন্য ক্রমেই বাড়িতেছিল।

১৯২৪-এর কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদকদিগকে বেতন দিবার একটি প্রস্তাব উঠিয়াছিল। আমি তখন একজন সাধারণ সম্পাদক ছিলাম এবং এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করিয়াছিলাম। আমার মনে হইল, কাহাকেও সারাক্ষণ খাটাইয়া লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহের মত বৃত্তি না দেওয়া অন্যায়। অথবা উপার্জন না করিয়াও চলে এমন লোক নির্বাচিত করিতে হয়। এই শ্রেণীর ভদ্রলোকদের অবশ্য আছে

বটে কিন্তু সম্ভবতঃ রাজনীতির দিক হইতে তাঁহারা বাঞ্ছনীয় নহেন এবং কোন কার্যের জন্য তাঁহাদিগকে দায়ী করাও যায় না। কংগ্রেস অবশ্য বেশী দিতে পারিত না। কংগ্রেসের বৃত্তির হার অত্যন্ত কম ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে (গভর্ণমেণ্টের না হইলেও) বেতন লওয়ার বিরুদ্ধে এক অন্যায় এবং সম্পূর্ণ অযৌক্তিক সংস্কার আছে। পিতাও আমার বেতন লইবার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিলেন। আমার সহযোগী সম্পাদকের অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তথাপি তিনি কংগ্রেসের নিকট বেতন লওয়া আত্মমর্যাদার পক্ষে হানিজনক মনে করিলেন। কাজেই এই ব্যাপারে আমার মর্যাদাবোধ না থাকিলেও এবং আমি বেতন লইতে সম্পূর্ণ উৎসুক থাকিলেও সে আশা ছাড়িতে হইল।

একদিন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পিতার নিকট কথাটা তুলিলাম। এই নির্ভরতা যে ভাল লাগিতেছে না তাহাও তিনি আঘাত না পান এইরূপ মৃদুভাবে কথাটা উত্থাপন করিলাম। তিনি আমাকে বুঝাইলেন, সামান্য কয়েকটা টাকা উপার্জনের জন্য জনসাধারণের কাজ ছাড়িয়া সময় ব্যয় করিলে আমার পক্ষে নির্বোধের কাজ হইবে। আমার এবং আমার স্ত্রীর এক বৎসরের প্রয়োজন তিনি কয়েকদিনেই উপার্জন করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার তর্কের মধ্যে যুক্তি ছিল কিন্তু আমি তৃপ্ত হইলাম না। তথাপি তাঁহার উপদেশ মতই চলিতে লাগিলাম।

এই সকল পারিবারিক ব্যাপার এবং টাকাকড়ির দুশ্চিন্তা ১৯২৩-এর প্রারম্ভ হইতে ১৯২৫-এর শেষ পর্যন্ত চলিল। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ঘটনারও পরিবর্তন হইতে লাগিল এবং আমিও একরূপ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিভিন্ন লোকের সহিত মিলিত হইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিলাম। ১৯২৩-এর অবস্থার একটু বিশেষত্ব ছিল। ইহার আগে চিত্তরঞ্জন দাশ গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। কাজেই ১৯২৩-এ তাঁহারই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকিবার কথা, কিন্তু এই কমিটির অধিকাংশ সদস্য তাঁহার ও স্বরাজ্য নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংখ্যা অতি অল্পই বেশী ছিল। দুই দলই প্রায় সমান সমান। ১৯২৩-এর গ্রীষ্মের প্রারম্ভে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই বৈঠকে ব্যাপার সঙ্গীন হইল, দাশ মহাশয় সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন এবং একটি ছোট মাঝামাঝি দল হইতে নূতন কার্যকরী সমিতি গঠিত হইল। কিন্তু কমিটিতে এই কেন্দ্রীয় দলের পশ্চাতে কোন সমর্থন ছিল না। দুইটি দলের সদিচ্ছার উপরই তাঁহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছিল। এই দল যে-কোন দলের সহিত যোগ দিয়া অপর দলকে অবশ্য হারাইতে পারিত। ডাঃ আন্সারী হইলেন নূতন সভাপতি এবং আমিও একজন সম্পাদক থাকিয়া গেলাম।

শীঘ্রই দুইপক্ষ হইতেই আমাদের উপর উৎপাতের সৃষ্টি হইল। পরিবর্তন-বিরোধীদের সুদৃঢ় দুর্গ গুজরাট কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কতকগুলি নির্দেশমত কার্য করিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। গ্রীষ্মকালের শেষ ভাগেই আবার নাগপুরে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইল। এখানে তখন জাতীয় পতাকা সত্যাগ্রহ চলিতেছিল। মন্দভাগ্য কেন্দ্রীয় দলের প্রতিনিধিস্বরূপ আমাদের কার্যকরী সমিতির সংক্ষিপ্ত ও খ্যাতিহীন জীবনের এইখানেই অবসান ঘটিল। ইহার পতন ঘটিল, কেননা, ইহা বিশেষভাবে কাহারও প্রতিনিধি ছিল না এবং যাঁহাদের হাতে কংগ্রেসের প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহাদেরই উপর কর্তৃত্ব করিতে প্রয়াসী হইল। গুজরাটের শৃঙ্খলা-বিরোধী কার্যের উপর ভর্ৎসনাত্মক প্রস্তাবের অসাফল্যের ফলেই কার্যকরী সমিতিকে পদত্যাগ করিতে হইল। আমার মনে আছে, ইস্তফাপত্র দাখিল করিয়া

আমি কত আনন্দিত ও ভারমুক্ত হইয়াছিলাম। দলাদলির কৌশলের অতি সামান্য অভিজ্ঞতাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল এবং কতিপয় খ্যাতনামা কংগ্রেসনেতার ষড়যন্ত্র-নৈপুণ্য দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম।

এই সভায় দাশ মহাশয় "ঠাণ্ডা রক্ত" বলিয়া আমার উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন। আমার ধারণা তাঁহার কথা সত্য। অবশ্য ইহার পরিমাপ করা মাপকাঠির বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। আমার বন্ধু ও সহকর্মীর সহিত তুলনায় আমার রক্ত অনেক বেশী ঠাণ্ডা। তথাপি অতিরিক্ত ভাবাবেগ ও মেজাজে বিচলিত হইবার ভয়ে আমি সর্বদাই সাবধান থাকি। বৎসরের পর বৎসর আমি রক্ত ঠাণ্ডা করিবার জন্য কঠিন উদ্যম করিয়াছি কিন্তু সাফল্য যেটুকু পাইয়াছি তাহা বাহ্যিক মাত্র।

১৬

নাভার কৌতুক

স্বরাজ্য দল ও পরিবর্তনবিরোধীদের মধ্যে টানাটানি চলিতে লাগিল; প্রথমোক্ত দলই জয়ী হইতে লাগিলেন। ১৯২৩-এর শরৎকালে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে স্বরাজীরা আর এক দিকে অগ্রসর হইলেন। এই কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমি এক আশ্চর্য বিপদসঙ্কুল ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িলাম।

পাঞ্জাবে শিখদের সহিত বিশেষভাবে আকালী শিখদের সহিত গভর্ণমেণ্টের পুনঃপুনঃ সংঘর্ষ চলিতেছিল। ভ্রষ্টচরিত্র মোহান্তদের অধিকৃত গুরুদ্বার ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য শিখদের আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করায় সংঘর্ষ বাধিল। গুরুদ্বার আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলনপ্রসূত দেশব্যাপী জাগরণেরই ফল এবং আকালীরা অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শেই কার্য করিতে লাগিলেন। এই কালে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে গুরু-কা-বাগের সংঘর্ষই বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সত্যাগ্রহী শিখজাঠা—ইহার মধ্যে অধিকাংশই ভূতপূর্ব সৈনিক—পুলিশের পাশবিক প্রহার সহ্য করিয়াও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছিল। এই সাহস ও অসীম ধৈর্য দেখিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ চমৎকৃত হইল। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গুরুদ্বার কমিটি বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছিল এবং কয়েক বৎসর সংঘর্ষের পর অবশেষে শিখেরা জয়ী হইলেন। এই আন্দোলনের প্রতি স্বাভাবিক রূপেই কংগ্রেসের সহানুভূতি ছিল এবং আকালী আন্দোলনের সহিত যোগ রক্ষা করিবার জন্য কংগ্রেস এক জন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি অমৃতসরে থাকিয়া এই কার্য করিতেন।

আমি যে ঘটনার কথা বলিতেছি, তাহার সহিত সাধারণ শিখ আন্দোলনের সম্পর্ক অতি অল্প হইলেও ইহা শিখদের চাঞ্চল্যের প্রতিক্রিয়া হইতেই উদ্ভূত, ইহা নিঃসন্দেহ। নাভা ও পাতিয়ালা—পাঞ্জাবের এই দুই সামন্ত রাজ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ অতি তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার ফলে ভারত গভর্ণমেণ্ট নাভার মহারাজাকে রাজচ্যুত করিয়া একজন ইংরাজ শাসক নিযুক্ত করেন। নাভারাজের গদিচ্যুতি লইয়া বিক্ষুব্ধ শিখেরা নাভার এবং নাভার বাহিরে

আন্দোলন করিতে লাগিলেন। নাভারাজ্যের জাইটো নামক স্থানে শিখদের ধর্ম-সংক্রান্ত উপাসনা ও গ্রন্থপাঠ ন্তন ইংরাজ শাসক বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহার প্রতিবাদস্বর্প এবং গ্র্ গ্রন্থসাহেব পাঠ অব্যাহত ভাবে চালাইবার জন্য শিখেরা জাইটোয় জাঠা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জাঠার প্রবেশ-পথ র্দ্ধ করিয়া প্লিশ তাহাদিগকে প্রহার করিত। অবশেষে গ্রেপ্তার করিয়া দ্রবর্তী দ্র্গম জঙ্গলে তাহাদের লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিত। আমি সংবাদপত্রে এইসব প্রহারের বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম; দিল্লী বিশেষ কংগ্রেসের পরেই আমি শ্নিলাম, শীঘ্রই আর একদল জাঠা রওনা হইবে। ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করা হইল, আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম। জাইটো দিল্লীর অতি নিকটে, ইহাতে আমার মাত্র একদিন সময় নষ্ট হইবে। দ্ইজন কংগ্রেস সহকর্মী এ. টি. গিদবাণী ও মাদ্রাজের কে শান্তানম আমার সঙ্গে চলিলেন। জাঠা অধিকাংশ পথ হাঁটিয়া চলিল। আমরা প্র্ব হইতে ঠিক করিলাম, নাভার সীমান্তে নিকটবর্তী এক রেলষ্টেশনে অমারা জাঠার সহিত মিলিত হইব। সময়মত নির্দিষ্টস্থানে আসিয়া আমরা একখানি গর্র গাড়িতে জাঠা হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম। জাইটোতে প্লিশ জাঠার গতিরোধ করিল এবং নাভা শাসকের দস্তখতি একখানা পরোয়ানা তৎক্ষণাৎ আমার উপর জারী হইল যে, আমি যেন নাভায় প্রবেশ না করি এবং করিলেও তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাই। অন্র্প পরোয়ানা গিদবাণী ও শান্তানমের উপরও জারী করা হইল, তবে নাভা কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নাম জানিতেন না বলিয়া পরোয়ানায় নাম ছিল না। আমরা প্লিশ কর্মচারীকে বলিলাম যে, আমরা জাঠার অন্তর্ভুক্ত নহি, আমরা দর্শক হিসাবে আসিয়াছি, নাভারাজ্যের নিয়মভঙ্গ করিবার কোন অভিপ্রায় আমাদের নাই। বিশেষতঃ নাভারাজ্যে যখন আমরা আসিয়া পড়িয়াছি তখন প্রবেশ না করবার আদেশের কোন অর্থ হয় না। মান্ষ আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে না। আমরা প্লিশ কর্মচারীকে বলিলাম, পরবর্তী ট্রেনের কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব আছে। এই সময়ট্কু আমাদিগকে জাইটোতেই থাকিতে হইবে। আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে বন্দী করা হইল। তারপর প্লিশ জাঠার উপর তাহাদের নিয়মিত কর্তব্য সাধন করিল।

সমস্ত দিন হাজতে রাখিয়া সন্ধ্যাবেলায় আমাদের ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হইল। অমাকে ও শান্তানমকে এক হাতকড়িতে বাঁধিয়া (আমার দক্ষিণ এবং তাহার বামহস্ত) হাতকড়ির সহিত বাঁধা শিকল হস্তে একজন কনেষ্টবল আগাইয়া চলিল; অন্র্প বেশে গিদবাণী আমাদের পিছন পিছন আসিতে লাগিলেন। জাইটোর পথ দিয়া এইভাবে চলিবার সময় আমার মনে পড়িতে লাগিল, অনিচ্ছ্ক কুকুরকে জোর করিয়া শিকলে বাঁধিয়া টানিয়া লওয়া হইতেছে। প্রথমে আমরা অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিলাম, পরক্ষণেই সমস্ত ব্যাপারটির কৌতুক বোধ করিয়া অনেকটা লঘ্ বোধ করিলাম। এ অভিজ্ঞতা উপভোগ্য। রাত্রিটা অত্যন্ত কষ্টে কাটিল। প্রথমতঃ ধীরগতি ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর জনবহ্ল কামরা, তারপর মধ্যরাত্রিতে একবার গাড়ীবদল এবং অবশেষে নাভার হাজত। পরদিন দ্বিপ্রহর, অর্থাৎ আমাদিগকে নাভা জেলে হাজির করার প্র্বে পর্যন্ত হাতকড়ি ও শিকল বরাবর ছিল। এই অবস্থায় অন্য একজনের সহযোগিতা ব্যতীত নড়াচড়া কঠিন। অন্য একজনের সহিত এক রাত্রি এবং পরদিনের অর্ধেক সময় একত্রে হাতকড়ি বদ্ধ হইয়া থাকিবার যে অভিজ্ঞতা, তাহার প্নরাভিনয় দেখিতে রুচি নাই।

নাভা জেলে আমাদিগকে অপরিষ্কার এবং অস্বাস্থ্যকর 'সেলে' আটক করা হইল। অত্যন্ত অপরিষ্কার ও স্যাঁৎসেঁতে ছোট ঘর, হাত দিয়া ছাদ স্পর্শ করা

যায়, এত নীচু। রাত্রে মেঝেতে আমাদের শুইতে হইত এবং অনেক সময় আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়া বুঝিতে পারিতাম এইমাত্র একটা ইন্দুর আমার মুখের উপর দিয়া দৌড়াইয়া গেল।

দুই-তিন দিন পর আমাদিগকে বিচারের জন্য আদালতে হাজির করা হইল এবং দিনের পর দিন বিচারের নামে এক কৌতুককর প্রহসনের অভিনব অভিনয় চলিতে লাগিল। ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জজ নামক ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ নিরক্ষর বলিয়াই মনে হইল। তিনি ইংরাজী জানেন না ইহা নিঃসন্দেহ, এমন কি, আদালতের ভাষা উর্দুও তিনি লিখিতে পারেন কি-না সন্দেহ। এক সপ্তাহের অধিককাল আমরা তাহাকে দেখিয়াছি, এই সময়ের মধ্যে তিনি একছত্রও উর্দু লেখেন নাই। কিছু লিখিবার আবশ্যক হইলে তিনি আদালতের কেরানীকে হুকুম করিতেন। আমরা কতকগুলি ছোটখাট দরখাস্ত করিয়াছিলাম। তিনি দরখাস্ত পড়িয়া তখনই কোন নির্দেশ দিতেন না; ঐগুলি রাখিয়া দিয়া পরদিন অপরের লেখা মন্তব্য সহ ফেরৎ দিতেন। আমরা নিয়মিতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করি নাই। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন না করাই আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, এমন কি যেখানে আত্মপক্ষ সমর্থন করা দোষের নহে, সেখানেও উহার চিন্তা পর্যন্ত আমার নিকট কুৎসিত কাজ বলিয়া মনে হইত। আমি আদালতে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছিলাম। উহাতে সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ এবং নাভার ব্যাপার, বিশেষভাবে ব্রিটিশ শাসকের আমলের ব্যাপার সম্পর্কে আমার মতামতও প্রকাশ করিয়াছিলাম।

আমাদের এই অতি অসাধারণ ও সহজ মামলাও দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। সহসা আর এক নূতন ব্যাপার ঘটিল। একদিন অপরাহ্নে আদালত বন্ধ হওয়ার পর আমাদিগকে সেইখানেই রাখা হইল। সন্ধ্যা ৭টার পর আমাদের আর একটা ঘরে লওয়া হইল। সেখানে টেবিলের সম্মুখে একজন বসিয়াছিলেন; আরও কয়েকজন লোকও ছিল। জাইটোতে যিনি আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, আমাদের সেই পুরাতন বন্ধু পুলিশ কর্মচারীটিও এখানে উপস্থিত ছিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া এক বিবৃতি দিতে লাগিল। আমরা কোথায় আছি এবং কি হইতেছে জিজ্ঞাসা করায় জবাব পাইলাম যে, ইহা আদালত এবং ষড়যন্ত্র করিবার অপরাধে আমাদের বিচার হইতেছে। এতদিন আদেশ ভঙ্গ করিয়া নাভায় প্রবেশের অপরাধে আমাদের বিচার চলিতেছিল। কিন্তু এই অভিযোগ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পরিষ্কার বোঝা গেল, পূর্বের অপরাধে বড় জোর ছয় মাস কারাদণ্ড হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে আমাদের সমুচিত শিক্ষা হইবে না বিবেচনা করিয়াই আরও গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিবার প্রয়োজন হইল। ষড়যন্ত্র প্রমাণ করিবার মত সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না, এই জন্য এক চতুর্থ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া আমাদের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল। এই লোকটির সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। জাইটো যাইবার পথে তাহার সহিত মাত্র একবার দেখা হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রের মামলা চালাইবার এই প্রকার উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া একজন ব্যবহারজীবী হিসাবে আমি অবাক হইলাম। মামলাটি একেবারেই মিথ্যা এবং বাহ্য ভদ্রতার খাতিরেও কতকগুলি সাধারণ আদবকায়দা দেখান উচিত ছিল। আমি বিচারককে বলিলাম যে, এ বিষয়ে আমরা পূর্ব হইতে কোন নোটিশ পাই নাই এবং আমরা যে আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করিতে পারি সে বিষয়ে বিবেচনা করা হয় নাই। এই যুক্তি তিনি গ্রাহ্য করিলেন—তবে একদম বোঝা গেল না। ইহাই নাভার নিয়ম। আমাদের যদি উকীলের দরকার হয় তাহা হইলে নাভাতেই

একজনকে মনোনীত করিতে হইবে। বাহির হইতে উকীল নিযুক্ত করিতে পারি কি না একথার উত্তরে আমাকে বলা হইল যে, নাভায় এরূপ অনুমতি দিবার নিয়ম নাই। নাভার বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই বুঝিতে পারিলাম। অবশেষে বিরক্ত হইয়া আমরা বিচারককে বলিলাম যে, তিনি যাহা খুশী করুন, আমরা এ বিচারে কোন অংশ গ্রহণ করিব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার এই সঙ্কল্প টিকিল না। আমাদের সম্পর্কে অসম্ভব মিথ্যা কথাগুলি শুনিয়া চুপ করিয়া থাকা কঠিন। আমরা মাঝে মাঝে সাক্ষীদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম। ঘটনার বিবরণ লিখিত ভাবেও আমরা আদালতে পেশ করিলাম। এই ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকটি প্রথম বিচারক অপেক্ষা অনেকাংশে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান।

দুইটি মামলাই একত্র চলিতে লাগিল। ফলে আমরা প্রত্যহ কিছুকালের জন্য জেলের নোংরা সেল হইতে মুক্তি পাইতাম। ইতিমধ্যে নাভার ইংরাজ শাসকের পক্ষ হইতে জেল সুপারিনটেন্‌ডেন্ট একদিন আসিয়া বলিলেন, যদি আমরা দুঃখ প্রকাশ করি এবং নাভা হইতে চলিয়া যাই তাহা হইলে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হইবে। আমরা উত্তর দিলাম, দুঃখ প্রকাশ করিবার মত আমরা কিছুই করি নাই, শাসকেরই আমাদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। আমরা কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি-পত্র লিখিতেও প্রস্তুত নই।

প্রায় ১৫ দিন পর দুইটি মামলা শেষ হইল। আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করি নাই, তবুও এক-তরফা মামলাতে এত সময় লাগিল, কেননা মামলা চলিবার কালে কোন প্রশ্ন উঠিলেই মামলা স্থগিত রাখা হইত এবং অন্তরালে অবস্থিত কোন কর্তৃপক্ষ—সম্ভবতঃ ইংরাজ শাসকটির সহিত পরামর্শের পর আবার মামলা সুরু হইত। এইরূপে অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে। সর্বশেষ দিন অভিযোক্তা পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইবার পর আমরা লিখিত বিবৃতি আদালতে দাখিল করিলাম। প্রথম আদালতের কার্য স্থগিত হইল, কিন্তু আমরা আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, অল্পক্ষণ পরেই বিচারক উর্দুতে লেখা এক প্রকাণ্ড রায়সহ আদালতে হাজির হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে এতবড় একটা রায় লেখা যে সম্ভবপর নহে তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল। আমরা বিবৃতি দাখিল করিবার পূর্বেই ইহা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। আমাদের নিকট রায় পাঠ করা হইল না। কেবল শুনাইয়া দেওয়া হইল যে, নাভার সীমানা ত্যাগের আদেশ অমান্য করায় সর্বোচ্চ শাস্তিরূপে আমাদিগকে ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ঐদিনই ষড়যন্ত্রের মামলায় আমাদের আঠার মাস কি দুই বৎসর করিয়া শাস্তি হইয়াছিল আমার ঠিক মনে নাই। ইহার সহিত ঐ ছয়মাস কারাদণ্ড যোগ হইবে। অর্থাৎ আমাদের সর্বমোট দুই বৎসর কি আড়াই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

এই বিচারের সময় আমরা যে সব আশ্চর্য ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিলাম, তাহাতে দেশীয় রাজ্যের শাসনপ্রণালী অথবা ভারতীয় দেশীয় রাজ্যে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা হইল। সমস্ত বিচারপ্রণালী এক প্রহসন মাত্র। এই কারণেই বোধ হয় সংবাদপত্রের লোক ও বাহিরের লোককে আদালতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। পুলিশ যাহা খুশী করে, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের তারা গণনার মধ্যেই আনে না এবং কার্যতঃ তাঁহাদের নির্দেশ অমান্য করে। বেচারী ম্যাজিস্ট্রেট নিরীহভাবে ইহা সহ্য করেন কিন্তু আমাদিগকেও তাহা সহ্য করিতে হইবে কেন বুঝিতে পারিলাম না। অনেক বার আমি দাঁড়াইয়া

পুলিশের ভদ্র ব্যবহার এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে মান্য করিবার দাবী উপস্থিত করিয়াছি। কখনও কখনও পুলিশ অত্যন্ত অভদ্রভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইত। ম্যাজিস্ট্রেট তাহার প্রতিকারে অক্ষম, এমন কি, আদালতের শৃঙ্খলা পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারিতেন না, তখন তাঁহার কাজ আমরা করিয়া দিতাম। মন্দভাগ্য ম্যাজিস্ট্রেটের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিত, তিনি পুলিশের ভয়ে সর্বদাই ভীত এবং আমাদিগকেও ভয় করিতেন, কেননা আমাদের গ্রেফতারের ফলে সংবাদপত্রে আন্দোলন চলিতেছিল। আমাদের মত সাধারণের পরিচিত রাজনীতিকদেরই যখন এই অবস্থা তখন স্বল্পপরিচিত ব্যক্তিদের ভাগ্যে কি ঘটে তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে হয়।

পিতার দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। সেই কারণে নাভায় আমার অপ্রত্যাশিত গ্রেফতারে তিনি বিশেষভাবে বিচলিত হইলেন। কেবল গ্রেফতারের সংবাদ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই তিনি জানিতে পারেন নাই। মানসিক উৎকণ্ঠায় তিনি আমার সংবাদ জানিবার জন্য বড়লাটের নিকট তার করিলেন। নাভায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পথে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত করা হইল। যাহা হউক, অবশেষে তিনি জেলে গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু আমি যখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছি না তখন তাঁহার সাহায্যের বিশেষ কোন আবশ্যক নাই, আমি তাঁহাকে আমার জন্য চিন্তা না করিতে এবং এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু আমাদের যুবক উকীল-বন্ধু কপিলদেব মালব্যকে নাভায় মামলা পর্যবেক্ষণের জন্য রাখিয়া গেলেন। নাভা আদালতের অতি সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতার ফলে কপিলদেবের আইন ও বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল সন্দেহ নাই। একবার পুলিশ তাঁহার হাত হইতে কাগজপত্র কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই অনুন্নত ও মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের যুগে রহিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বৈরাচারী প্রভুত্ব এখানে অবাধ কিন্তু তাহার মধ্যেও যোগ্যতা কিম্বা উদার দয়ার অভাব। সে সকল স্থানে এমন সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাহা কখনও প্রকাশিত হয় না। তাহাদের অযোগ্যতার দরুণই মন্দভাগ্য প্রজারা একটু আসান পায় এবং নানাভাবে অন্যায়ও কম হইয়া থাকে। কারণ শাসকমণ্ডলীর মধ্যেও সেই অযোগ্যতাই প্রতিফলিত। তাহার ফলে অত্যাচার ও অবিচার নিখুঁত হইয়া উঠিতে পারে না। অবশ্য ইহাতে অত্যাচার যে অল্প হয় তাহা নহে, উহা দূরপ্রসারী ও ব্যাপক হইয়া উঠিতে পারে না। কোন দেশীয় রাজ্য যখন প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে তখন এই ভারকেন্দ্র পরিবর্তিত হইয়া এক অভিনব অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই অর্ধ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ঠিক থাকে, স্বৈরাচারও থাকে অব্যাহত, পুরাতন নিয়মকানুনে মতই কার্য চলিতে থাকে, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সভা সমিতি, মতপ্রকাশ (ইহা একপ্রকার সর্বগ্রাসী) প্রভৃতির উপর বিধিনিষেধ সমানভাবেই চলে কিন্তু এমন একটি পরিবর্তন হয় যাহা মূলদেশকে নূতন আকার দেয়। শাসকগণ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে, শাসন ব্যাপারে কর্মকুশলতার পত্তন হয়, তাহার ফলে সামন্ততান্ত্রিক ও স্বৈর-শাসনের বন্ধন আরও চাপিয়া বসে। কালক্রমে ব্রিটিশ শাসনের ফলে অবশ্য কতকগুলি প্রাচীন প্রথা ও উপায়ের পরিবর্তন হইবে, কারণ ঐগুলি কুশলতার সহিত শাসনকার্য নির্বাহের এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের অন্তরায়স্বরূপ। কিন্তু গোড়াতে তাঁহারা অবস্থার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের উপর কর্তৃত্বকে দৃঢ় করিয়া তোলেন এবং জনসাধারণ তখন কেবল যে সামন্ততন্ত্র এবং স্বৈরাচার সহ্য করে তাহা নহে, শক্তিশালী শাসকগণ ঐ

ব্যবস্থাকে অতি নৈপুণ্যের সহিত দৃঢ় হস্তে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

নাভায় আমি ইহার কিছু দেখিয়াছি। এই রাজ্যের ব্রিটিশ শাসক একজন সিভিলিয়ান। ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে ইনি একজন স্বৈরাচারী শাসকের সম্পূর্ণ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত, তথাপি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে নাভার আইন ও পদ্ধতির কথা শুনাইয়া অতি সাধারণ অধিকার দেওয়া হইত না। আমরা প্রাচীন সামন্ততন্ত্র এবং আধুনিক আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের সমবেত মূর্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ইহাতে উভয় দিকের অসুবিধাগুলি পূর্ণমাত্রায় ছিল কিন্তু কোন দিকেরই সুবিধাগুলি ছিল না।

এই ভাবে বিচার শেষ হইয়া আমাদের কারাদণ্ড হইয়া গেল। বিচারক কি রায় দিলেন তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু দীর্ঘ কারাদণ্ডের বাস্তব সত্যের মুখে ঠাণ্ডা হইয়া গেলাম। অমারা রায়ের নকল চাহিলাম, আমাদিগকে সেজন্য দরখাস্ত করিতে বলা হইল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় জেল সুপারিনটেন্ডেণ্ট আমাদিগকে ডাকিয়া লইয়া ব্রিটিশ শাসকের একখানি আদেশপত্র দেখাইলেন। ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে আমাদের দণ্ড স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন সর্ত না থাকায় আমাদের পক্ষে আইনতঃ কারাদণ্ডের এইখানেই শেষ হইল। সুপারিনটেন্ডেণ্ট ব্রিটিশ শাসকপ্রদত্ত অন্য একখানি হুকুমনামা বাহির করিলেন, তাহাতে আমাদিগকে নাভা ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে এবং বিশেষ অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আমি আদেশ দুইখানির নকল চাহিলাম, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইল। তারপর আমাদিগকে রেলষ্টেশনে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। নাভায় আমাদের পরিচিত একটি প্রাণীও ছিল না। সহরের সদর দরজাও সে রাত্রির মত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সংবাদ লইয়া জানিলাম তখনই একখানি ট্রেন আম্বালা অভিমুখে যাইবে। আমরা উহাতে উঠিয়া বসিলাম। আম্বালা হইতে আমি দিল্লী হইয়া এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলাম।

এলাহাবাদ হইতে নাভার শাসকের নিকট, তাঁহার দুই খণ্ড আদেশপত্রের এবং দুইটি রায়ের নকল চাহিয়া পত্র লিখিলাম। পত্রের উত্তরে তিনি উহার নকল দিতে অস্বীকার করিলেন। আমি পুনরায় লিখিলাম, যদি আমি আপীল করি তাহা হইলে উহার প্রয়োজন আছে, তথাপি তিনি রাজী হইলেন না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও, যাহাতে আমি ও আমার সঙ্গীরা আড়াই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলাম, সেই রায়গুলি পড়িবার সুযোগ পাই নাই। কি জানি হয়ত এই কারাদণ্ড এখনও আমার জন্য ঝুলিতেছে এবং নাভা কর্তৃপক্ষ অথবা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই সম্ভবতঃ ইহা প্রয়োগ করিতে পারেন।

এই ভাবে আমরা তিন জন তো "স্থগিত"—অজুহাতে মুক্তি পাইলাম কিন্তু তথাকথিত ষড়যন্ত্রের চতুর্থ ব্যক্তি, যাহাকে আমাদের সহিত দ্বিতীয় অভিযোগে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই শিখটির ভাগ্যে কি হইল তাহা অনেক চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি নাই। খুব সম্ভব তাহাকে ছাড়া হয় নাই। তাহার কোন প্রভাবশালী বন্ধু ছিল না এবং তাহার অনুকূলে কোন আন্দোলনও হয় নাই; কাজেই অন্যান্য অনেকের মতই সে দেশীয় রাজ্যের কারাগারে বিস্মৃতির অন্ধকারেই ডুবিয়া আছে। কিন্তু আমরা তাহাকে ভুলি নাই। সামান্য যাহা কিছু সম্ভব তাহা আমরা করিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, গুরুদ্বার কমিটিও চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে অনুসন্ধানে জানিলাম যে, সে "কোমাগাটামারু" দলের একজন এবং দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া অল্পদিন পূর্বে মুক্তি পাইয়াছিল। এই শ্রেণীর লোককে

পুলিশ বাহিরে রাখিতে চাহে না, সেই জন্যই তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ রচনা করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল।

গিদবাণী, শান্তানম্ এবং আমি তিনজনেই নাভা জেল হইতে টাইফয়েড রোগের বীজাণু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং তিন জনেই ঐ রোগে আক্রান্ত হইলাম। আমার পীড়া সাংঘাতিক হইল এবং কিছুদিন অত্যন্ত সঙ্কটের মধ্যে কাটিল। তবে তিন জনের মধ্যে আমিই অল্পে অব্যাহতি পাইলাম। আমাকে তিন কি চার সপ্তাহ শয্যাশায়ী থাকিতে হইয়াছিল। অপর দুইজন দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিলেন।

নাভার ব্যাপারের জের এইখানেই শেষ হইল না। ছয় মাস কি তাহার পরে গিদবাণী অমৃতসরে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে শিখগুরুদ্বার কমিটির সহিত একযোগে কার্য করিতেছিলেন। কমিটি পাঁচ শত ব্যক্তি লইয়া গঠিত এক বিশেষ জাঠা জাইটোতে পাঠাইলেন। গিদবাণী দর্শকরূপে এই জাঠার সহিত নাভার সীমান্ত পর্যন্ত যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। নাভার সীমান্তে পুলিশ জাঠার উপর গুলি চালাইল, বহুলোক হতাহত হইল। গিদবাণী আহতদের সেবাকার্যে অগ্রসর হইলে পুলিশ তাহাকে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মামলা করা হইল না, তাঁহাকে কেবল জেলে আটকাইয়া রাখা হইল। প্রায় এক বৎসর কাল জেলে থাকিবার পর সম্পূর্ণরূপে ভগ্নস্বাস্থ্য গিদবাণীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

গিদবাণীর গ্রেফ্তার ও কারাদণ্ড শাসনক্ষমতার দানবীয় অপব্যবহার বলিয়া আমার মনে হইল। আমি শাসক (সেই ইংরাজ সিভিলিয়ান) মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া গিদবাণীর প্রতি এরূপ ব্যবহারের কারণ জানিতে চাহিলাম। তিনি উত্তর দিলেন যে, বিনানুমতিতে নাভারাজ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি আদেশ ভঙ্গ করায় কারারুদ্ধ হইয়াছেন, আমি পুনরায় পত্র লিখিয়া ইহার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিলাম। যে ব্যক্তি আহতদের সেবায় রত ছিল তাহাকে গ্রেফ্তার করা যে সনীতি-বিরোধী তাহাও উল্লেখ করিলাম এবং অনুরোধ করিলাম তাঁহার আদেশ হয় প্রত্যাহার করুন, না হয় আমার নিকট একখণ্ড পাঠাইয়া দিন। তিনি অস্বীকৃত হইলেন। গিদবাণীর প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছে আমার প্রতিও শাসক সেইরূপ ব্যবহার করুক, এ ইচ্ছা লইয়া আমিও নাভা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সহকর্মীর প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বাসের দিক দিয়া ইহা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু অনেক বন্ধু আমার সঙ্গে ভিন্ন মত অবলম্বন করিলেন ও আমাকে নিবৃত্ত করিলেন। আমি বন্ধুদের পরামর্শের অন্তরালে আশ্রয় লইলাম এবং নিজের দুর্বলতার উপর এক সূক্ষ্ম আবরণ নিক্ষেপ করিলাম। যাহাই হউক, আসলে নাভা জেলে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে আমার অনিচ্ছা ও দুর্বলতাই আমাকে যাইতে দিল না। একজন সহকর্মীকে বিপদের সময় পরিত্যাগ করিবার লজ্জা আমি সর্বদাই বোধ করিয়াছি। সাধারণতঃ সাহস অপেক্ষা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনারই আমরা অধিকতর পক্ষপাতী।

১৭

কোকোনদ ও মৌলানা মহম্মদ আলী

১৯২৩-এর ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ ভারতের কোকোনদ সহরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইল। মৌলানা মহম্মদ আলী ছিলেন সভাপতি। তাঁহার যেমন অভ্যাস, তেমনই এক সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তবে এই অভিভাষণ বেশ তথ্যপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক ভাবের প্রথম উন্মেষ কাল হইতে আলোচনা করিয়া আগা খাঁর নেতৃত্বে ১৯০৮-এ বড়লাটের নিকট স্মরণীয় মুসলিম ডেপুটেশান প্রেরণের কথা তুলিলেন। এই ডেপুটেশান যে গভর্ণমেণ্টের সৃষ্টি এবং ইহার সুযোগ লইয়াই তাঁহারা সরকারী ভাবে এই প্রথম সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন প্রথা এবং সাম্প্রদায়িক বিশেষ পক্ষপাতের কথা ঘোষণা করেন।

মহম্মদ আলী আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁহার সভাপতিত্বের আমলে আমাকে কংগ্রেসের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্য-প্রণালী সম্পর্কে আমার সংশয় থাকায় আমার আফিস সংক্রান্ত কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কিন্তু মহম্মদ আলীকে ঠেকান কঠিন। আমরা উভয়েই বুঝিতে পারিলাম যে, অন্য কেহ সম্পাদক হইলে নূতন সভাপতির সহিত আমার মত তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে না। মানুষ সম্বন্ধে তাঁহার ভালমন্দ ধারণা দুই দিকেই চরম। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে তিনি পছন্দ করিতেন। আমাদের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার বন্ধন ছিল। তিনি গভীরভাবে এবং আমার মতে অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে ধর্মপ্রবণ ছিলেন, কিন্তু আমি ছিলাম তাহার বিপরীত। তথাপি তাঁহার অকৃত্রিম আগ্রহ, তাঁহার অপর্যাপ্ত কর্মশক্তি এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্য তাঁহার প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি পরিহাসরসিক ছিলেন, কিন্তু সময় সময় তীব্র ব্যঙ্গ দ্বারা তিনি অপরকে আহত করিতেন। এই স্বভাবের জন্য তিনি অনেক বন্ধুকেই হারাইয়াছিলেন। কাহারও সম্বন্ধে যদি কোন চটুল মন্তব্য তাঁহার মনে জাগিত তাহা হইলে তিনি তাহা গোপন রাখিতে পারিতেন না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন।

আমাদের মধ্যে ছোটখাট মতভেদ সত্ত্বেও তাঁহার সভাপতিত্বের আমলে আমরা দুইজনে ভালভাবে কাজ চালাইতে লাগিলাম। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যালয়ে আমি এই নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলাম যে, কোন সদস্যের নাম লিখিবার কালে তাহার পূর্বে বা পরে কোন সম্ভ্রমসূচক উপাধি যোগ করা হইবে না। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর উপাধির অসদ্ভাব নাই—মহাত্মা, মৌলানা, পণ্ডিত, শেখ, সৈয়দ, মুন্সী, মৌলবী; ইহার উপর শ্রী, শ্রীযুক্ত মিঃ ও এস্কোয়ার তো আছেনই। এই সকল অজস্র উপাধি অনাবশ্যকরূপে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে আমি একটা সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু তাহা সম্ভবপর হইল না। মহম্মদ আলী এক জরুরী তার করিয়া "সভাপতি রূপে" আমাকে নির্দেশ দিলেন যে প্রাচীন ব্যবস্থাই বজায় রাখিতে হইবে, বিশেষভাবে গান্ধিজীর নিকটে পত্র লিখিতে হইলে 'মহাত্মা' শব্দ ব্যবহার করিতেই হইবে।

আমাদের মধ্যে আর একটি বিষয় লইয়া প্রায়ই তর্ক বাধিত—সে হইল, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর'। আমাদের কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অথবা প্রার্থনার ভাবে ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করিবার প্রতি মহম্মদ আলীর অত্যন্ত বেশী

ঝোঁক ছিল। আমি প্রতিবাদ করিলে তিনি আমার অধার্মিকতার জন্য ধমক দিতেন। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরবর্তীকালে তিনি আমাকে বলিলেন যে, আমার বাহ্য ব্যবহার ও অস্বীকৃতি সত্ত্বেও আসলে আমি যে একজন পরম ধার্মিক সে সম্বন্ধে তাঁহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার এই ধারণার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে তাহা আমি সময় সময় বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছি। সম্ভবতঃ ধর্ম ও ধর্মভাব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর এইরূপ ধারণা নির্ভর করে।

আমি তাঁহার সহিত ধর্ম লইয়া আলোচনা এড়াইয়া চলিতাম, কেননা, আমি জানিতাম যে, ইহার ফলে উভয়েই বিরক্ত হইব এবং হয়ত বা আমি তাঁহার মনে বেদনা দিব। কোন মতবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী ব্যক্তির সহিত এই বিষয় লইয়া আলোচনা করা সর্বদাই কঠিন; সম্ভবতঃ অধিকাংশ মুসলমানের সহিত তর্ক করা আরও কঠিন। কেননা, এ ক্ষেত্রে চিন্তার স্বাধীনতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় না। তাঁহাদের মতামতের দিক দিয়া তাঁহাদের পথ সরল ও বাঁধাধরা এবং বিশ্বাসী মুসলমান কখনও দক্ষিণে বা বামে হেলিতে পারেন না। সর্বত্র না হইলেও হিন্দুদের ভাব অনেকটা স্বতন্ত্র। আচরণে তাঁহারা অত্যন্ত গোঁড়া হইতে পারেন, আধুনিককালের অনুপযোগী উন্নতি-বিরোধী কুপ্রথা তাঁহারা মানিয়া লইতে পারেন এবং মানিয়া থাকেন, তথাপি ধর্ম সম্বন্ধে যে-কোন প্রকার বৈপ্লবিক মতবাদ আলোচনা করিতে তাঁহারা সর্বদাই প্রস্তুত। আমার ধারণা আধুনিক আর্যসমাজীদের সাধারণতঃ চিন্তার এত ঔদার্য নাই। মুসলমানদের ন্যায়ই তাঁহারা নিজেদের সরল বাঁধাধরা রাস্তায় চলিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে একটা পরম্পরাগত দার্শনিক ধারা আছে; যদিও আচরণের উপর উহার প্রভাব নাই, তথাপি উহার ফলে ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি বিভিন্ন মতবাদের দিক হইতে বিচার করিতে সংস্কারগত কোন বাধা নাই। আমার মনে হয় হিন্দুদের মধ্যে মত ও আচার ব্যবহারের বহু স্ববিরোধী সমাবেশ ঘটায় ইহা কিয়ৎপরিমাণে সম্ভব হইয়াছে। ধর্ম শব্দটি সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে ঠিক সেই অর্থে উহা দ্বারা হিন্দুয়ানী বুঝান যায় না। তথাপি কি আশ্চর্য দৃঢ়তা, কি আশ্চর্য জীবনী-শক্তি ইহার। প্রাচীন হিন্দু-দার্শনিক চার্বাকের মত যদি কেহ নিজেকে নাস্তিক বলিয়া প্রচার করে তথাপি সে হিন্দু নহে, এ কথা বলিতে কেহ ভরসা করিবে না। হিন্দু ধর্মের সন্তান যাহাই করুক সে হিন্দুই থাকিবে। আমি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছি, ধর্ম ও সামাজিক আচার নিয়ম সম্পর্কে আমি যাহাই করি আর যাহাই বলি না কেন, আমি ব্রাহ্মণই থাকিব বলিয়া মনে হয়। যদিও আমি নামের সহিত কোন সম্ভ্রম বা জাতিবাচক উপাধি যোগ করিতে অনিচ্ছুক তথাপি ভারতীয়গণের নিকট আমি 'পণ্ডিত' অমুক থাকিয়াই যাইব। আমার মনে পড়ে, সুইজারল্যাণ্ডে একবার এক তুর্কী পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে আমি পূর্বাহ্নে তাঁহার নিকট এক পরিচয়-পত্র পাঠাইয়াছিলাম এবং ঐ পত্রে আমার নাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়া উল্লেখ ছিল। তিনি আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য এবং একটু নিরাশ হইলেন, এবং কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, "পণ্ডিত" দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, একজন সৌম্যকান্তি প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের দর্শন পাইবেন।

এই সকল কারণে মহম্মদ আলীর সহিত আমি ধর্ম লইয়া আলোচনা করিতাম না; কিন্তু চুপ করিয়া থাকিবার লোক তিনি ছিলেন না। কয়েক বৎসর পরে (১৯২৫ কিংবা ১৯২৬-এর প্রথম ভাগে) তিনি আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। একদিন দিল্লীতে তাঁহার বাড়ীতে আমি গিয়াছি এমন সময় তাঁহার মুখে

ছুটিল এবং আমার সহিত ধর্মালোচনা করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। বলিলাম, আমাদের উভয়ের ধারণার মধ্যে এত পার্থক্য যে, আমরা পরস্পরকে কিছু বুঝাইতে পারিব না। কিন্তু তাঁহার কথার মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া কঠিন। তিনি বলিলেন, "আজ আমরা একটা হেস্তনেস্ত করিবই। আমার ধারণা, তুমি মনে কর যে, আমি একজন ধর্মান্ধ গোঁড়া। বেশ, আমি তোমার নিকট প্রমাণ করিতেছি, আমি তাহা নহি।" তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে, ধর্ম বিষয়ে তিনি গভীর ও ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি বইয়ের তাক দেখাইলেন; সেখানে বহুবিধ ধর্ম-পুস্তক, বিশেষভাবে ইস্‌লাম ও খৃষ্টধর্ম বিষয়ের অনেক পুস্তক ছিল, এবং এইচ জি ওয়েলসের "গড দি ইন্‌ভিজিভ্‌ল্‌ কিং" ও কয়েকখানি আধুনিক পুস্তকও ছিল। যুদ্ধের সময় যখন তিনি দীর্ঘকাল অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন তখন তিনি বহুবার কোরাণ এবং তাহার সর্ববিধ টীকা ও ভাষ্য পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, এই অধ্যয়নের ফলে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, কোরাণের শতকরা সাতানব্বই ভাগ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, এমন কি, কোরাণের নাম না করিয়াও ঐগুলির যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যাইতে পারে, অবশিষ্ট তিন ভাগ দৃশ্যতঃ তাঁহার নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। তবে যে কোরাণের সাতানব্বই ভাগ সত্য তাহার অবশিষ্ট তিন ভাগও নিশ্চয়ই সত্য। তাঁহার দুর্বল যুক্তিপ্রয়োগ ক্ষমতা নির্ভুল, আর কোরাণ ভুল, ইহা কি সম্ভব? অতএব তিনি সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, কোরাণের শতকরা একশত ভাগই অভ্রান্ত সত্য।

এই তর্কের যুক্তি খুব স্পষ্ট নহে। কিন্তু আমার তর্ক করিবার প্রবৃত্তি হইল না। তাঁহার পরের কথায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেলাম। মহম্মদ আলী বলিলেন, তাঁহার স্থির বিশ্বাস, যদি কেহ খোলা মন লইয়া কোরাণ পাঠ করে তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই ইহার সত্যকে গ্রহণ করিবে; বাপু (গান্ধিজী) যত্নসহকারে উহা পাঠ করিয়াছেন এবং তিনি নিশ্চয়ই ইস্‌লামের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ; কিন্তু আত্মাভিমানের জন্য তিনি ইহা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন না।

তাঁহার সভাপতিত্বের বৎসর শেষ হইলে মহম্মদ আলী ক্রমশঃ কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন অথবা তাঁহার ভাষায় কংগ্রেসই তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল। তিনি কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে যোগ দিতেন এবং কয়েক বৎসর নানাভাবে ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু মতভেদ বাড়িয়া চলিল, মনোমালিন্য প্রবল হইল। কিন্তু ইহার জন্য সম্ভবতঃ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দল দায়ী নহে; দেশের কতকগুলি ঘটনার ফলেই ইহা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শোচনীয় পরিণতিতে আমরা অনেকে ব্যথিত হইলাম, কেননা সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন লইয়া যত মতভেদই থাকুক না কেন, রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে পার্থক্য অতি অল্প ছিল। ভারতীয় স্বাধীনতার আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই সাধারণ রাজনৈতিক মনোভাবের জন্য সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্পর্কেও তাঁহার সহিত একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা সর্বদাই সম্ভব হইত। যে সকল প্রগতি-বিরোধী নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সমর্থক বলিয়া জাহির করিয়া থাকে তাহাদের সহিত রাজনীতির দিক দিয়া তাঁহার কোন সামঞ্জস্য ছিল না।

ভারতের পক্ষে দুর্ভাগ্য যে, ১৯২৮-এর গ্রীষ্মকালে তিনি ইউরোপে ছিলেন। তখন সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার একটা মস্ত চেষ্টা চলিতেছিল এবং সে চেষ্টা সাফল্যের কাছাকাছি আসিয়াছিল। যদি মহম্মদ আলী উপস্থিত থাকিতেন তবে ঘটনা অন্য আকার ধারণ করিত। কিন্তু তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন ভাঙ্গন সুরু হইয়াছে এবং অনিবার্যরূপে তিনি অপর দলে যোগ দিলেন।

দুই বৎসর পরে, ১৯৩০-এ যখন আমরা অধিকাংশই কারাগারে এবং আইন অমান্য আন্দোলন পুর্ণোদ্যমে চলিতেছে তখন মহম্মদ আলী কংগ্রেসের সিম্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিলেন। তাঁহার বিলাত গমনে আমি ব্যথিত হইলাম। আমার বিশ্বাস, তিনিও এই ব্যাপারে সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার লণ্ডনের কার্যপ্রণালীতে উহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত স্থান ভারতবর্ষে সংগ্রামের মধ্যে, লণ্ডনে নিষ্ফল বৈঠকের সভাগৃহে নহে; তিনি যদি স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন তাহা হইলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তিনি সংঘর্ষে যোগ দিতেন। কিন্তু তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কয়েক বৎসর ধরিয়া কালব্যাধি তাঁহাকে অল্পে অল্পে জীর্ণ করিতেছিল। যখন তাঁহার বিশ্রাম ও চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল অধিক তখন লণ্ডনে গিয়া কিছু বড়রকম প্রাপ্তির আশায় তাঁহার উৎকণ্ঠিত কর্মপ্রবণতা মৃত্যুকে নিকটতর করিল। নৈনী জেলে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আমি মর্মাহত হইলাম।

১৯২৯-এর ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে তাঁহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ। আমার সভাপতির অভিভাষণের কতকগুলি অংশ তাঁহার নিকট ভাল বোধ হয় নাই এবং তিনি উহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস অগ্রসর হইতেছে এবং একটা রাজনৈতিক সংঘর্ষ নিকটতর হইতেছে। তাঁহার মধ্যেও যথেষ্ট সংগ্রামপ্রবণতা ছিল এবং তাহা ছিল বলিয়াই অপরকে অগ্রসর হইতে দিয়া নিজে পশ্চাতে থাকা ভালবাসিতেন না। তিনি আমাকে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "জওহর আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তোমার বর্তমান সহকর্মীরাই তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, তাহারা সঙ্কটের মুহূর্তে তোমাকে বিপদের মুখে ফেলিয়া পলায়ন করিবে। তোমার কংগ্রেসী ভ্রাতারা তোমাকে ফাঁসীতে ঝুলাইয়া ছাড়িবে।" কি বিষাদময় ভবিষ্যদ্বাণী।

১৯২৩-এর ডিসেম্বরে কোকোনদ কংগ্রেসে আর একটি বিশেষ ঘটনায় আমি ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। এইখানে নিখিল ভারত স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘের অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সেবাদলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার পূর্বেও অবশ্য প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনা অথবা জেলে যাইবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অভাব ছিল না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতির অত্যন্ত অভাব ছিল। ডাঃ এন এস. হার্দিকারই প্রথম নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল সেবকদল গঠনের পরিকল্পনা করিলেন। ইহারা কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় জাতীয় কার্য করিবে। তিনি আমার সহযোগিতা প্রার্থনা করিলেন। আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম, কেননা, কল্পনাটি আমার ভাল লাগিল। কোকোনদেই কাজ আরম্ভ হইল। পরে আমরা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, কংগ্রেসের খ্যাতনামা নেতারা সেবাদলের প্রতি কিরূপ বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন। একজন বলিলেন যে, ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে; কংগ্রেসের ভিতর এই সামরিক দল ঢুকাইলে ইহারা একদিন কংগ্রেসের অসামরিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা অপহরণ করিতে পারে। অন্য কেহ কেহ বলিলেন, কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে তৎপরতার জন্য যতটুকু শৃঙ্খলার দরকার ততটুকু ভাল, ইহার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদলকে সামরিক কুচকাওয়াজ শিখান অবাঞ্ছনীয়। অনেকের মনের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে, কংগ্রেসের অহিংসার আদর্শের সহিত ড্রিল-করা সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ঠিক সামঞ্জস্য হইবে না। অবশ্য হার্দিকার এই কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং দীর্ঘকাল ধৈর্যসহকারে পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ করিলেন, আমাদের সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকেরা কত কর্মতৎপর,

এমনকি অহিংসও হইতে পারে।

কোকোনদ হইতে ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরে ১৯২৪-এর জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদে আমি এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। আমি স্মৃতি হইতে লিখিতেছি বলিয়া তারিখের কিছু গোলমাল হইতে পারে। সে বার এলাহাবাদে গঙ্গাতীরে কুম্ভ কিংবা অর্ধকুম্ভ স্নানের বৃহৎ মেলা বসিয়াছিল। দলে দলে যাত্রী গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অর্থাৎ ত্রিবেণী তীর্থে, স্নানের জন্য আসিতে লাগিল, গঙ্গাগর্ভ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল হইবে, কিন্তু শীতকালে নদী শুকাইয়া বিস্তীর্ণ বালুচর জাগিয়া উঠে, ইহার উপর যাত্রীদের তাঁবু ফেলিবার সুবিধা হয়। এই নদীগর্ভে গঙ্গার প্রবাহ প্রতি বৎসরই পরিবর্তিত হয়।

১৯২৪-এ গঙ্গার স্রোত ত্রিবেণী সঙ্গমে যাত্রীদের স্নান করার পক্ষে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ছিল। স্নানযাত্রীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিলে বিপদের আশঙ্কা অনেক কম হয়।

যোগে স্নান করিয়া পুণ্যার্জনের কোন স্পৃহা আমার ছিল না বলিয়া আমি এই বিষয় লইয়া কোন চিন্তা করি নাই। কিন্তু সংবাদপত্রে লক্ষ্য করিতেছিলাম, এই বিষয় লইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছিল। তাঁহারা (অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ) ত্রিবেণী সঙ্গমস্থলে স্নান করা নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। মালব্যজী ইহার প্রতিবাদ করিলেন, কেননা, ধর্মাচরণের দিক দিয়া সঙ্গমে স্নান করাই বিধি। দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি নিবারণের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গভর্ণমেণ্ট ঠিকই করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থা যেরূপ হয় এক্ষেত্রেও সেইরূপ হৃদয়হীন ও বিরক্তিকর হইয়াছিল।

কুম্ভের যোগের দিন অতি প্রত্যুষে মেলা দেখিবার জন্য আমি নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। স্নান করিবার আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। সেখানে গিয়া শুনিলাম মালব্যজী জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিনীত ভাষায় সরকারী আদেশ অমান্যের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়া এক পত্রে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট অনুমতি দেন নাই। মালব্যজী সত্যাগ্রহ করিবার সঙ্কল্প লইয়া দুই শত ব্যক্তিসহ সঙ্গম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া আমিও একটু কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম এবং আকস্মিক উত্তেজনায় সত্যাগ্রহী দলে যোগ দিয়া বসিলাম। সঙ্গমের পথে বিস্তীর্ণ স্থান শক্ত বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল। বেড়া পর্যন্ত আসিবার পর পুলিশ আমাদের গতিরোধ করিল এবং আমাদের সহিত যে মইখানি ছিল তাহা কাড়িয়া লইয়া গেল। আমরা অহিংস সত্যাগ্রহী: কাজেই বেড়ার ধারে বালুর উপর শান্তভাবে বসিয়া রহিলাম। প্রভাত অতিবাহিত হইয়া সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। আমরা বসিয়াই আছি। যতই সময় যাইতে লাগিল, সূর্য প্রখর হইয়া উঠিল, বালু তাতিয়া উঠিল এবং আমরা প্রত্যেকে ক্ষুধায় কাতর হইয়া উঠিলাম। পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যদলও ছিল। আমরা অসহিষ্ণু হইয়া একটা কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষও ধৈর্য হারাইয়া বলপ্রয়োগে আমাদিগকে তাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে বলিয়া মনে হইল। সৈন্যদল সহসা কি একটা আদেশ পাইয়া স্ব-স্ব অশ্বে আরোহণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইল; আমার তৎক্ষণাৎ মনে হইল (সত্য নাও হইতে পারে) যে আমাদের উপর ঘোড়া চালাইয়া দিয়া তাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ঘোড়ার পায়ের তলায় দলিত হইবার কিছুমাত্র আগ্রহও আমার ছিল না এবং আমি এভাবে বসিয়া একেবারেই বিরক্ত হইয়া

উঠিয়াছিলাম। অতএব আমার পার্শ্বে যাহারা বসিয়াছিল তাহাদিগকে বলিলাম, চল আমরা বেড়া ডিঙ্গাইবার চেষ্টা করি এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া বেড়ার উপরে উঠিয়া বসিলাম। তৎক্ষণাৎ আরও অনেকে আমার অনুসরণ করিল এবং কয়েকটি খুঁটি তুলিয়া ফেলিয়া যাইবার মত পথ প্রস্তুত করিল। একজন আমার হাতে একখানি জাতীয় পতাকা দিল। পতাকাখানি বেড়ার উপর স্থাপন করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। কেহ বেড়া ডিঙ্গাইতেছে, কেহ সদ্য প্রস্তুত সঙ্কীর্ণপথে প্রবেশ করিতেছে আর ঘোড়সোয়ারেরা জনতাকে হটাইয়া দিতেছে—এই সমস্ত মিলিয়া দৃশ্যটি আমার নিকট খুব উপভোগ্য মনে হইল। একথা আমি বলিব যে, ঘোড়সোয়ারেরা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহাদের কর্তব্য পালন করিয়াছিল। তাহারা মাথার উপর লাঠি ঘুরাইয়া জনতাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু কাহাকেও আঘাত করে নাই। ফরাসী বিদ্রোহীদের রাজপথে বেড়া দিয়া আত্মরক্ষার অস্পষ্ট স্মৃতি আমার মনের উপর ভাসিয়া উঠিল।

অবশেষে আমি বেড়ার অপর পারে নামিয়া পড়িলাম এবং ক্লান্তি ও গরমের ফলে গঙ্গায় গিয়া ডুব দিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মালব্যজী ও অন্যান্য অনেকে বেড়ার ধারে তেমনই বসিয়া আছেন, ঘোড়সোয়ার ও পদাতিক পুলিশেরা ততক্ষণে সত্যাগ্রহী দল ও বেড়ার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি অন্যদিক দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া পুনরায় মালব্যজীর পাশে বসিলাম। দেখিলাম মালব্যজী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছেন এবং তাঁর মনের ভাবকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সহসা কাহাকেও কিছু না বলিয়া মালব্যজী ঘোড়সোয়ার ও পুলিশের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। মালব্যজীর মত একজন বৃদ্ধ ও দুর্বলদেহ ব্যক্তির এই দুঃসাহস দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গেলাম। যাহা হউক, আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম, এবং গঙ্গায় ডুব দিলাম। পুলিশ ও ঘোড়সোয়ার কিছুক্ষণ আমাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিল এবং অল্পকাল পরে তাহারা চলিয়া গেল।

আমাদের মনে দ্বিধা ছিল, হয়ত বা গভর্ণমেণ্ট আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবেন, কিন্তু সেরূপ কিছু ঘটিল না। সম্ভবতঃ মালব্যজীর বিরুদ্ধে কিছু করা গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত ছিল না। অতএব এই সামান্য সংঘর্ষের এইখানেই শেষ হইল।

১৮

আমার পিতা ও গান্ধিজী

১৯২৪-এর প্রথমভাগে সহসা সংবাদ আসিল, কারাগারে গান্ধিজী গুরুতর পীড়িত, তাঁহাকে হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের জন্য স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষ উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিল, আমরা আতঙ্কে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সঙ্কট কাটিয়া গেল, দেশের চারিদিক হইতে জনস্রোত পুণায় তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিল, হাসপাতালে তিনি রক্ষী-বেষ্টিত বন্দীরূপে অবস্থান করিলেও নির্দিষ্ট সংখ্যক বন্ধুবান্ধবকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইত। পিতা ও আমি তাঁহার সহিত হাসপাতালে সাক্ষাৎ করিলাম।

তাঁহাকে হাসপাতাল হইতে আর কারাগারে লওয়া হয় নাই। তিনি ক্রমশঃ নিরাময় হইতেছেন দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট দণ্ড নাকচ করিয়া তাঁহাকে মুক্তি

দিলেন। ছয় বৎসর কারাদণ্ডের মধ্যে তিনি মাত্র প্রায় দুই বৎসর দণ্ডভোগ করিলেন। মুক্তির পর তিনি স্বাস্থ্য লাভার্থ বোম্বাইয়ের নিকটে সমুদ্র তীরবর্তী জুহুতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আমরাও সপরিবারে জুহুতে আসিয়া সমুদ্রতীরে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে আশ্রয় লইলাম। এখানে আমরা কয়েক সপ্তাহ ছিলাম। অনেকদিন পর আমি বিশ্রামের অবকাশ পাইলাম। মনের সাধে সমুদ্রে সাঁতার দিতাম, দৌড়াইতাম, অথবা সমুদ্র-তীরে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতাম। এখানে আমার উদ্দেশ্য অবশ্য অবকাশের আনন্দ উপভোগ নহে, আমরা গান্ধিজীর সহিত আলোচনার জন্যই আসিয়াছিলাম। পিতা তাঁহাকে স্বরাজ্য দলের অবস্থা বুঝাইয়া স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। তাঁহার আশা ছিল গান্ধিজী পুরাপুরি সাহায্য না করিলেও অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকিবেন। আমি যে সমস্ত সমস্যা লইয়া বিব্রত ছিলাম তাহার জন্যও গান্ধিজীর সহিত পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিল। গান্ধিজীর ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি জানিবার জন্যও আমার ঔৎসুক্য ছিল।

স্বরাজ্য দলের দিক দিয়া জুহু আলোচনায় কোনই ফল হইল না, গান্ধিজী অটল রহিলেন এবং এই আলোচনায় মোটেই প্রভাবান্বিত হইলেন না। বন্ধুভাবে আলোচনা ও পারস্পরিক সৌজন্য সত্ত্বেও স্পষ্টই বোঝা গেল, আপোষ অসম্ভব। অবশেষে তাঁহারা পরস্পরের সম্মতি লইয়া ভিন্ন মত অবলম্বন করিলেন এবং তদনুসারে সংবাদপত্রে বিবৃতি বাহির হইল।

গান্ধিজী আমার একটি সংশয়ও মীমাংসা করিয়া দিলেন না। ফলে আমিও কতকটা নিরাশ হইয়া জুহু হইতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি স্বভাবতঃই অধিকদূর ভবিষ্যৎ দেখিতে চান না এবং দীর্ঘকালব্যাপী কোন কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট করিতে চান না। তাঁহার মতে আমাদিগকে ধৈর্য সহকারে জনসেবা করিয়া যাইতে হইবে, কংগ্রেসের গঠনমূলক ও সমাজ সংস্কারমূলক কার্য চালাইতে হইবে এবং সংগ্রামশীল কার্যের জন্য শুভদিনের অপেক্ষা করিতে হইবে। তবে সমস্যা এই, যদি সেই শুভদিনও আসে তাহা চৌরীচাওরার মত ঘটনা ঘটিয়া পুনরায় তো আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারে? এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও তিনি কোন নিশ্চিত উক্তি করিলেন না। আমরা কি চাহিতেছি সে সম্বন্ধে অনেকেই আমাদের ধারণা স্পষ্ট করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেস তখনও এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত ঘোষণার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন না। আমরা কি স্বাধীনতা এবং কিছু সামাজিক পরিবর্তন চাহি, না, আমাদের নেতারা উহা অপেক্ষা অল্প প্রত্যাশী হইয়া আপোষ করিবার পক্ষপাতী? কয়েকমাস পূর্বে যুক্ত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে আমি স্বাধীনতার উপর জোর দিয়াছিলাম। আমার নাভা হইতে ফিরিবার কিছুকাল পরেই ১৯২৩-এর শরৎকালে এই সম্মেলন হইয়াছিল। নাভা জেল হইতে পুরস্কারস্বরূপ যে রোগ-বীজাণু আনিয়াছিলাম তাহার আক্রমণ হইতে তখনও আমি অব্যাহতি পাই নাই। রোগশয্যায় শুইয়াই আমাকে ঐ অভিভাষণ লিখিতে হইয়াছিল, আমি সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারি নাই।

যখন আমরা কয়েকজন স্বাধীনতাকেই কংগ্রেসের মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম তখন আমাদের মডারেট বন্ধুরা—যাঁহারা আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন অথবা আমরাই যাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছি—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি ও মহিমার প্রকাশ্য স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়া দিলেন। অথচ কার্যতঃ আমাদের স্বদেশবাসীরা এই

সাম্রাজ্যের পাদপীঠ মাত্র, ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে ভারতীয়দের প্রতি হয় দাসবৎ ব্যবহার করা হয়, না হয় তাহাদিগকে প্রবেশ করিতেই দেওয়া হয় না। মিঃ শাস্ত্রী দূত সাজিলেন এবং স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ১৯২৩-এর লণ্ডনে আহূত সাম্রাজ্য সম্মেলনে গর্বের সহিত ঘোষণা করিলেন, "আমি গর্বের সহিত বলিতে পারি যে, আমার স্বদেশই এই সাম্রাজ্যকে মহিমান্বিত করিয়াছে।"

মডারেট নেতা ও আমাদের মধ্যে যেন এক মহাসমুদ্রের ব্যবধান; আমরা যেন বিভিন্ন দেশের অধিবাসী, আমাদের ভাষা স্বতন্ত্র এবং আমাদের স্বপ্ন—যদি তাঁহাদের কোন স্বপ্ন থাকে—তবে তাহাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব আমাদের উদ্দেশ্যকে কি নিশ্চিত ও স্পষ্ট করিয়া লওয়া উচিত নহে?

কিন্তু এই শ্রেণীর চিন্তা অল্প-সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অনেকেই অতি-নির্দিষ্টতা পছন্দ করেন না। বিশেষতঃ জাতীয় আন্দোলন স্বভাবতঃই অস্পষ্টতা ও এক প্রকার রহস্যের আবরণে আবৃত থাকে। ১৯২৪ সালের প্রথম ভাগে ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে স্বরাজীরাই জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। "ভিতর হইতে বাধা প্রদান" এবং আইনসভা ধ্বংস করিবার দম্ভভরা উক্তির পর এই দল কি করিবে? সূচনা মন্দ হইল না। ব্যবস্থা পরিষদে সেই বৎসরের বাজেট না-মঞ্জুর হইল এবং একটি প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতা-সমস্যার সমাধানকল্পে গোলটেবিলের দাবী করা হইল। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙ্গলার আইনসভা সাহসের সহিত সরকারের সমস্ত দাবী না-মঞ্জুর করিলেন। কিন্তু কি ব্যবস্থা পরিষদ কি প্রাদেশিক আইনসভায় বড়লাট এবং গভর্ণরগণ তাহাদের বিশেষ-ক্ষমতাবলে বাজেট মঞ্জুর করিয়া দিলেন। অনেক বক্তৃতা হইল, আইনসভার মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য দেখা গেল, স্বরাজীরা সাময়িক জয়গর্ব অনুভব করিলেন, সংবাদপত্রে বড় বড় শিরোনামায় ইহা প্রচার করা হইল, ব্যস্ এই পর্যন্ত। ইহার বেশী তাঁহারা কি করিতে পারেন? বড়জোর তাঁহারা একই কৌশলের পুনরভিনয় করিতে পারেন কিন্তু উহার নূতনত্ব রহিল না, উৎসাহ শীতল হইয়া গেল, বড়লাট ও গভর্ণরগণ কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতাবলে আইন এবং বাজেট পাস করায় লোকের মন অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। অবশ্য কাউন্সিলের মধ্যে ইহার পরবর্তী সোপানে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য স্বরাজীদের ছিল না। তাহার স্থান আইনসভাগৃহের বাহিরে।

১৯২৪ সালের মধ্য ভাগে আহম্মদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির এক সভা হইল। এই সভায় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে গান্ধিজীর সহিত স্বরাজীদের বিরোধ উপস্থিত হইয়া কতকগুলি নাটকীয় ঘটনার সূত্রপাত করিল। গান্ধিজীই প্রথমে অগ্রসর হইলেন। কংগ্রেসী নিয়মতন্ত্রে তিনি কতকগুলি গুরুতর পরিবর্তনের প্রস্তাব করিলেন। যাহার ফলে ভোটাধিকার এবং কংগ্রেসের সদস্য সম্পর্কিত নিয়মের আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। পূর্বে নিয়ম ছিল যে, স্বরাজ লাভের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় সমন্বিত কংগ্রেসের মূলনীতি মানিয়া লইয়া যে চারি আনা চাঁদা দিবে সেই কংগ্রেসের সদস্য হইবে। গান্ধিজী চাহিলেন, চারি আনার পরিবর্তে প্রত্যেক সদস্যকে হাতে কাটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সূতা দিতে হইবে। ইহা ভোটাধিকারে এক গুরুতর পরিবর্তন এবং নিশ্চয়ই নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির ইহা করিবার অধিকার নাই। কিন্তু ইচ্ছামত কার্য করিবার বাধা উপস্থিত হইলে গান্ধিজী নিয়মতন্ত্রকে কদাচিৎ মর্যাদা দিয়া থাকেন। আমি নিয়মতন্ত্রের উপর এই আঘাতের ফলে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম এবং কার্যকরী সমিতির নিকট আমার সম্পাদকীয় পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিলাম। কিন্তু ঘটনাবলীর পরিবর্তনের ফলে আমি পদত্যাগ

লইয়া পীড়াপীড়ি করিলাম না। পিতা এবং দেশবন্ধু গান্ধিজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন এবং তাঁহাদের তীব্র অসম্মতি জ্ঞাপন করিবার জন্য ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে অনুচরবর্গসহ সভা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এমন কি অবশিষ্ট উপস্থিত সভ্যগণেরও কেহ কেহ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন। তৎসত্ত্বেও অধিকাংশের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হইল। কিন্তু পরিণামে উহা প্রত্যাহৃত হইল। কেননা স্বরাজীদের সভাত্যাগ এবং এই বিষয়ে আমার পিতা ও দেশবন্ধুর অনমনীয় দৃঢ়তা দেখিয়া গান্ধিজী অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তাঁহার মধ্যে যে ভাবাবেগ সঞ্চিত হইয়াছিল কোন সদস্যের একটি মন্তব্যের আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইহা স্পষ্টই বোঝা গেল, তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছেন। তিনি সভার সম্মুখে এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে কতিপয় সদস্য অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহা করুণ এবং অদৃষ্টপূর্ব।*

তীব্র প্রতিবাদ হইবে, ইহা জানিয়াও তিনি কেন কেবলমাত্র হাতে কাটা সূতায় চাঁদা দিবার নিয়ম প্রবর্তনের জন্য এত উৎসুক হইয়াছিলেন, আমি কোন দিনই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ তিনি চাহিয়াছিলেন, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার খাদি প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যে বিশ্বাসী তাহারাই কংগ্রেসে থাকিবে এবং বাদ বাকী সকলে হয় উহা মানিয়া লইবে নয় কংগ্রেস ত্যাগ করিবে। যদিও কংগ্রেসের অধিকাংশ দল তাঁহার পক্ষে ছিল, তথাপি তিনি আপন সঙ্কল্প শিথিল করিলেন এবং অন্যদলের সহিত আপোষ করিতে লাগিলেন। আমি দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, তিন চার মাসের মধ্যে তিনি এ বিষয়ে কয়েকবার তাঁহার মত পরিবর্তন করিলেন, বোধ হইল, তিনি যেন অকূল সমুদ্রে পড়িয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন। আমি তাঁহার

---

* এই ঘটনা জেলে বসিয়া স্মৃতি হইতে লিখিয়াছি, এখন দেখিতেছি যে, আমার স্মৃতি অসম্পূর্ণ এবং আলোচ্য বিষয়ের একটা গুরুতর দিক আমি উল্লেখ করি নাই, ফলে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। একজন বাঙ্গালী টেররিস্ট যুবক (গোপীনাথ সাহা) সম্পর্কিত প্রস্তাব ঐ সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং যদিও প্রস্তাবটি পাস হয় নাই তথাপি গান্ধিজী অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। আমার যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে ঐ প্রস্তাবে তাহার কার্যের নিন্দা করা হইয়াছিল কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি ছিল। প্রস্তাব অপেক্ষাও উহার সমর্থনসূচক বক্তৃতাগুলিতে গান্ধিজী বেশী দুঃখিত হইয়াছিলেন। অহিংসা সম্পর্কে কংগ্রেসের অনেকেই তেমন শ্রদ্ধাবান নহে। এই ধারণাই তাঁহাকে অধিকতর বিচলিত করিয়াছিল। কয়েকদিন পরে এই সম্পর্কে তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় লিখিয়াছিলেন, "চারিটি প্রস্তাবেই আমার পক্ষে অল্পসংখ্যক ভোট বেশী ছিল। ইহার অর্থ আমার পক্ষের দলই সংখ্যালঘিষ্ঠ। সভায় উভয় দলই সমান সমান ছিলেন। গোপীনাথ সাহার প্রস্তাব লইয়াই হাতাহাতি বাধিয়াছিল। বক্তৃতায় এবং তৎসংশ্লিষ্ট যে সকল দৃশ্য আমি দেখিলাম তাহাতে আমার চক্ষু খুলিয়া গেল......গোপীনাথ সাহার প্রস্তাবের পর সভার গাম্ভীর্য আর রহিল না। এই অবস্থার মধ্যে আমাকে সর্বশেষ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইল। আলোচনা যতই অগ্রসর হইতে লাগিল আমি ততই গম্ভীর হইয়া উঠিতে লাগিলাম। এই পীড়াদায়ক অবস্থার মধ্য হইতে আমার পলায়ন করিবার ইচ্ছা হইল। প্রস্তাব উপস্থিত করিতেও আমার ভয় করিতে লাগিল। কোন বক্তার মনে কোন ঈর্ষার ভাব ছিল না, ইহা আমি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছি কিনা জানি না। কংগ্রেসের দুর্নীতি অথবা অহিংসার প্রতি অবজ্ঞা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সম্পর্কে চেতনার অভাবই আমাকে অধিকতর পীড়িত করিয়াছে। সভার অর্ধেক কংগ্রেস প্রতিনিধি ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহা এক সংশয়াকুল আবিষ্কার।" এই ঘটনা এবং ইহার উপর গান্ধিজীর মন্তব্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে অহিংসার প্রতি গান্ধিজীর কি অসীম অনুরক্তি এবং কোন অনিচ্ছাকৃত কি গৌণভাবেও অহিংসা-বিরোধী কোন চেষ্টা তাঁহার মনে কি পরিমাণ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে তাহা বুঝা যায়। ইহার পরে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ প্রতিক্রিয়ারই ফল, তাঁহার সমস্ত উপায় ও কার্যপদ্ধতির মূলে ভিত্তি হইল এই অহিংসনীতি।

সহিত এইকালে ঘনিষ্ঠভাবে না মেশার ফলে, আমার বিস্ময় আরও বাড়িল। প্রশ্নটি আমার নিকট কোন দিনই খুব গুরুতর বলিয়া মনে হয় নাই। কায়িক শ্রমকে ভোটাধিকারের যোগ্যতার মাপকাঠি করা ভাল কিন্তু তাহাকে যেরূপ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহার কোন অর্থ হয় না।

আমার মতে, গান্ধিজী সম্পূর্ণ অপরিচিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়াই অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের ভূমি—সত্যাগ্রহের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের কর্মভূমিতে তিনি অনন্যসাধারণ, এখানে তাঁহার প্রত্যেক পদক্ষেপ অভ্রান্ত। জনসাধারণের মধ্যে নীরবে সমাজসংস্কারমূলক কার্য স্বয়ং অথবা সহকর্মীদের লইয়া পরিচালন করিতেও তাঁহার দক্ষতা অসীম। তিনি চরম সংগ্রাম অথবা পরিপূর্ণ শান্তি বুঝেন। কিন্তু দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থার মধ্যে তিনি সুখী বোধ করেন না। স্বরাজ্যদলের আইনসভার মধ্যে তিনি বাধাদান ও কোলাহল দেখিয়া কিছুমাত্র চঞ্চল হইলেন না। যে কাউন্সিলে যাইতে চাহে, সে সেখানে গিয়া কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করুক এবং ভাল আইন-কানুন প্রণয়নের চেষ্টা করুক, নতুবা কেবলমাত্র বাধা দিতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। যাহার উহা করিবার প্রবৃত্তি নাই তাহার পক্ষে বাহিরে থাকাই ভাল। স্বরাজীরা এই দুইয়ের কোনটাই গ্রহণ না করায় তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক অবশেষে তিনি স্বরাজীদের সহিত একটা আপোষ রফা করিয়া লইলেন। পুরাতন চারি আনা চাঁদা দেওয়া অথবা হাতেকাটা সূতায় চাঁদা দেওয়া দুই প্রকার প্রথাই প্রবর্তিত রহিল, তিনি স্বরাজ্যদলের আইনসভার কার্য প্রায় অনুমোদন করিলেন কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিলেন, লোকের বিশ্বাস হইল তিনি রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং শাসকসম্প্রদায়ের বিশ্বাস হইল তাঁহার জনপ্রিয়তা হ্রাস হইয়াছে এবং তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছে। দাশ এবং নেহরু গান্ধীকে নেপথ্যের অন্তরালে ঠেলিয়া দিয়া রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই শ্রেণীর মন্তব্য গত পনর বৎসর ধরিয়া নানাভাবে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যেক বারই দেখা গিয়াছে যে আমাদের শাসকগণ ভারতবাসীর মনোভাব সম্পর্কে গভীর ভাবেই অজ্ঞ। ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গান্ধিজীর আবির্ভাবের পর হইতে জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি কখনও হ্রাস হয় নাই এবং তাহা এখনও অব্যাহতই আছে। মনুষ্যপ্রকৃতি দুর্বল; অতএব তাঁহার কথামত সকলে কাজ করিতে পারে না। কিন্তু সাধারণের চিত্তে গান্ধিজীর প্রতি যথেষ্ট সদিচ্ছা বিদ্যমান। যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হয় তখন তাহারা বিরাট গণ-আন্দোলনের মাঝে জাগিয়া উঠে। অন্যথা তাহারা নতশিরে নীরবে থাকে। কোন নেতা যাদুদণ্ড ঘুরাইয়া শূন্য হইতে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারেন না, স্বাভাবিক ভাবে অভিব্যক্ত ঘটনার সুযোগ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন কিম্বা তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন কিন্তু স্বয়ং ঘটনার সৃষ্টি করিতে পারেন না।

কিন্তু একথা সত্য যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গান্ধিজীর জনপ্রিয়তার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অগ্রসর হইবার মুহূর্তে তাহারা তাঁহার অনুসরণ করে কিন্তু যখন অনিবার্যরূপে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তখন তাহারা হইয়া উঠে সমালোচক। তথাপি অধিকাংশই তাঁহার নিকট মাথা নীচু করিয়াছে। অন্য কোন কার্যকরী রাজনৈতিক উপায়ের অভাবও ইহার অন্যতম কারণ। মডারেট, রেস্পন্সিভিস্ট অথবা ঐ শ্রেণীর দলের কথা কেহ কল্পনার মধ্যেও আনে না। যাহারা সন্ত্রাসবাদী,

হিংসায় বিশ্বাসী, আধুনিক জগতের রাজনৈতিক মতবাদ হইতে তাহারা সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রণালী নিষ্ফল ও বর্তমান কালের অনুপযোগী। সমাজতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতিও দেশের সুপরিচিত নহে, এবং ইহা কংগ্রেসের উচ্চ শ্রেণীর সদস্যদের পক্ষে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ।

১৯২৪ সালের মধ্যভাগে সাময়িক রাজনৈতিক মনকষাকষির পর আমার পিতার সহিত গান্ধিজীর পুনরায় মিলন হইল ও উভয়ের সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। উভয়ের মধ্যে যতই কেন পার্থক্য থাকুক না, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সুবিবেচনার অভাব ছিল না। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি এই শ্রদ্ধার কারণ কি? মহাত্মা গান্ধীর কতকগুলি রচনা-সংগ্রহ "আধুনিক চিন্তাধারা" এই নামে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছিল। ঐ পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে গিয়া পিতা তাঁহার মনোভাব আমাদিগকে জানিবার সুযোগ দিয়াছিলেন।

তিনি লিখিতেছেন, "ঋষি ও মহাত্মাদের বিষয় আমি শুনিয়াছি কিন্তু কখনও তাঁহাদিগকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, আমি অকপটে স্বীকার করিব তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার মনে সংশয় আছে। আমি মানুষ এবং যাহা মনুষ্যোচিত তাহাতে বিশ্বাসী। এই পুস্তকে যাঁহার রচনা সংগ্রহ করা হইয়াছে তিনি একজন মানুষ এবং তাহাতে মনুষ্যোচিত গুণাবলী বিদ্যমান। মনুষ্যপ্রকৃতির দুইটি মহৎ গুণের তিনি দৃষ্টান্তস্থল—শ্রদ্ধা ও শক্তি......

"যাহার মধ্যে শক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, সে-ই প্রশ্ন করে, 'ইহার দ্বারা আমার কি ফল লাভ হইবে?' 'হয় জয় নয় মৃত্যু', এই উত্তরে তাহার মন সায় দেয় না...... কিন্তু দীনহীনও ইহাতে সোজা হইয়া দাঁড়ায়...বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমিতে অকম্পিত পদে দাঁড়াইয়া শক্তির অপরাহত শৌর্যে অটল থাকিয়া তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে মাতৃভূমির জন্য আত্মোৎসর্গ ও দুঃখের বাণী বিরামহীন ভাবে শুনাইতেছেন। তাঁহার বাণী লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ...."

উপসংহারে তিনি সুইনবার্ণের দুই পংক্তি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"আমাদের মধ্যে আমরা কি নরের মধ্যে নরোত্তম পাই নাই, যে মানুষ ঘটনাবলীর 'অধিরাজ'?"

তিনি উল্লিখিত বাক্যে স্পষ্টতঃই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মহাত্মা বা সাধুপুরুষ হিসাবে নহে, তিনি মানুষ হিসাবেই গান্ধীকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার চরিত্রে শক্তি ও অনমনীয় দৃঢ়তা ছিল বলিয়াই তিনি গান্ধিজীর মানসিক বলের প্রশংসা করিতেন। এই ক্ষুদ্র কৃশ-জীর্ণ-তনু মনুষ্যটির মধ্যে এমন এক লৌহকাঠিন্য আছে যাহা পর্বতের মত অটল এবং যত বড়ই হউক না কেন, কোন বাহুবলের সাধ্য নাই যে তাঁহাকে অবনত করে। তাঁহার দেহের মধ্যে আকর্ষণের কিছুই নাই, তথাপি তাঁহার কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত নগ্নদেহে, তাঁহার প্রত্যেক ভাবভঙ্গিমায় এমন একটা মহৎ গরিমা প্রকাশ পায় যাহার সম্মুখে অপরে মাথা নত না করিয়া পারে না। তিনি বিনয়ী ও নিরীহ এবং তিনি অত্যন্ত সচেতন কিন্তু তথাপি তিনি জানেন তাঁহার মধ্যে প্রভুত্বের ভাব আছে, শক্তি আছে এবং সময়মত অত্যন্ত অধীরতার সহিত তিনি আদেশ করেন এবং প্রত্যাশা করেন অপরে অবনত শিরে তাহা পালন করিবে। তাঁহার প্রশান্ত গভীর দৃষ্টি অপরকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া মর্মস্থলে প্রবেশ করে। তাঁহার স্পষ্ট গম্ভীর কণ্ঠস্বর অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়া হৃদয় মধ্যে আবেগের আলোড়ন উপস্থিত করে। তাঁহার শ্রোতা একজনই হউক আর সহস্রই হউক তাঁহার চরিত্রমাধুর্য ও আকর্ষণী শক্তি সকলকেই টানিয়া লয়, শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। এই ভাবপ্রবাহের সহিত মনের যোগ অতি অল্প থাকিলেও তাহা

একেবারে উপেক্ষার ছিল না। হৃদয়াবেগের সহিত তুলনায় মন ও যুক্তির স্থান নিশ্চয়ই পশ্চাতে ছিল। বাগ্মিতা বা মনোহর বাক্‌বিন্যাস কৌশল দ্বারা এই "মন্ত্রমুগ্ধ" অবস্থার সৃষ্টি হইত না, তাঁহার ভাষা সরল, সুনির্দিষ্ট এবং কদাচিৎ তিনি অনাবশ্যক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই মনুষ্যটির অকপট চরিত্র এবং প্রখর ব্যক্তিত্বই তাঁহার প্রতি সকলকে আকর্ষণ করে। তাঁহার অন্তরের গভীর পরিচয় বাহিরের ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠে। তাঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লোকমুখে প্রচলিত যে সকল গল্প রটিয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ তাহাও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পূর্ব হইতে অনেকটা অনুকূল করিয়া রাখে। হয়তো একজন অপরিচিত, এই সকল কাহিনী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তি অতি সহজে তত অভিভূত হইবে না। তথাপি গান্ধিজীর এক বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, তিনি অনায়াসে অপরের চিত্ত জয় করিতে পারেন, অন্ততঃপক্ষে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিরস্ত্র করিয়া ফেলিতে পারেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুরাগী হইলেও মনুষ্যহস্ত-রচিত কারুশিল্পের প্রতি গান্ধিজীর বিশেষ অনুরাগ নাই। তাজমহল তাঁহার দৃষ্টিতে বল-নিপীড়িত পরশ্রমের প্রতীকমাত্র, অথবা কিছু বেশী। সুগন্ধ উপভোগ করিবার ক্ষমতাও তাহার অত্যন্ত দুর্বল, তথাপি তিনি নিজের মত করিয়া জীবন যাত্রার একটা প্রণালী ঠিক করিয়া লইয়াছেন এবং সমগ্রভাবে তাহা সুন্দর। তাঁহার ভাবভঙ্গীর মধ্যে কমনীয়তা আছে, কৃত্রিমতা নাই। তাঁহার চরিত্রে কর্কশ ভাব কিম্বা কোন উগ্রতা নাই। এবং আমাদের দেশে মধ্যশ্রেণীসুলভ স্থুলরুচি ও ইতরতার লেশমাত্রও তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি অন্তরের মধ্যে গভীর শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন, জীবনের বন্ধুর যাত্রাপথে তিনি চারিদিকে সেই শান্তি বিলাইয়া দৃঢ় ও নির্ভীক পদক্ষেপে চলিয়াছেন।

কিন্তু আমার পিতার সহিত তাঁহার পার্থক্য কত বেশী! তাঁহার মধ্যেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শক্তি এবং রাজোচিত মহিমা বিদ্যমান। সুইনবার্ণের যে দুই ছত্র কবিতা তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা তাঁহার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যে কোন সভাসমিতিতে তিনি উপস্থিত হইলে অবলীলাক্রমে নেতার আসন গ্রহণ করিতেন। টেবিলের যে কোন দিকেই তিনি উপবেশন করুন না কেন তাহাই হইত প্রধান আসন। (একজন বিখ্যাত ইংরাজ বিচারক পরবর্তী কালে ইহা বলিতেন)। তিনি গান্ধিজীর মত নিরীহ অথবা কোমল প্রকৃতির ছিলেন না এবং কাহারও সহিত মতানৈক্য ঘটিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া কথা কহিতেন না। তাঁহার প্রকৃতি ছিল প্রভুত্বপ্রিয়! এ জন্য তিনি একদিকে যেমন অনেকের সশ্রদ্ধ আনুগত্য লাভ করিতেন অন্যদিকে তীব্র বিরোধিতারও অসদ্ভাব ছিল না। তাঁহার সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকা কঠিন। হয় তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে, না হয়, অপছন্দ করিতে হইবে। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধর, আত্মবিশ্বাসের দ্যোতক চিবুকের সহিত ইতালীর মিউজিয়মে রক্ষিত রোম সম্রাটগণের আবক্ষ মূর্তির আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। ইতালীর অনেক বন্ধু তাঁহার চিত্র দেখিয়া এই সৌসাদৃশ্যের কথা বলিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁহার শুভ্র কেশরাশি, তাঁহার গর্বিত ভাবভঙ্গীর মধ্যে যে অনির্দিষ্ট মহিমার বিকাশ হইত আধুনিক জগতে তাহা কত বিরল। পিতার প্রতি আমার পক্ষপাত আছে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ও দৌর্বল্যপূর্ণ এই জগতে আমি তাঁহার মত মহত্ত্বের অভাব সর্বদাই অনুভব করি। তাঁহার উদার আচরণ, ব্যবহার ও অপূর্ব শালীনতা আমি চারিদিকে কোথাও খুঁজিয়া পাই না।

আমার মনে আছে, ১৯২৪ সালে যখন স্বরাজদলের সহিত গান্ধিজীর বিরোধ চলিতেছিল তখন পিতার একখানি ফটো তাঁহাকে দেখাই। এই ফটোগ্রাফে পিতার

প্রতিকৃতি গুম্ফবর্জিত ছিল এবং ইতিপূর্বে গান্ধিজী কখনও পিতাকে সেই বিখ্যাত-গুম্ফহীন অবস্থায় দেখেন নাই। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টিতে প্রতিকৃতিখানা দেখিতে লাগিলেন। গুম্ফ অন্তর্হিত হওয়ায় মুখমণ্ডল ও চিবুকের মধ্যে একটা কাঠিন্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গান্ধিজী শুষ্ক হাস্যে বলিলেন, এখন বুঝিতেছি কাহার সহিত আমাকে বাদে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার চক্ষুদ্বয় এবং সদাহাস্য-প্রফুল্ল রেখায় মুখমণ্ডল হইতে কাঠিন্য অন্তর্হিত হইত। আবার সেই নির্মল চক্ষুদ্বয় কদাচিৎ দীপ্ত হইয়া উঠিত। হংসের নিকট যেমন জল প্রিয়, ব্যবস্থাপরিষদের কার্যও তেমনি পিতার নিকট হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাঁহার আইন ও নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার ফলে সত্যাগ্রহ অপেক্ষা এই খেলার কৌশল তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। তিনি দলের মধ্যে কঠিন শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন এবং অন্যান্য দল বা ব্যক্তিকে তাঁহার সমর্থনে প্রবৃত্ত করিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি নিজের দলের লোকদের লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। স্বরাজ্য দলের সূচনায় পরিবর্তনবিরোধী দলের সহিত বিরোধের ফলে কংগ্রেসের বলবৃদ্ধির জন্য অনেক অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে স্বরাজ্যদলে গ্রহণ করা হইয়াছিল। তারপর আসিল নির্বাচন, ইহার জন্য অর্থের আবশ্যক এবং তাহা ধনীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা ছাড়া উপায় নাই। এই সকল ধনীদের হাতে রাখিবার জন্য তাঁহাদের কয়েকজনকে স্বরাজ্যদলের প্রার্থীরূপে দাঁড় করান হইল। একজন আমেরিকান সোস্যালিষ্ট বলিয়াছেন (স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ কর্তৃক উল্লিখিত) যে, রাজনীতি গরীবের নিকট হইতে ভোট এবং ধনীর নিকট হইতে নির্বাচন যুদ্ধে রসদ আদায় করিবার এবং একের আক্রমণ হইতে অপরকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিবার এক মোলায়েম কৌশল মাত্র।

ঐ কারণে স্বরাজ্যদলের সূচনাতেই উহার মধ্যে দুর্বলতার বীজ প্রবেশ করিল। ব্যবস্থাপরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভায় কার্য করিতে গিয়া অপরের সহিত এবং নরমপন্থীদের সহিত প্রত্যহই আপোষ করিতে হইত এবং এই অবস্থার মধ্যে অভিযানের দৃঢ়সঙ্কল্প কিম্বা সুনির্দিষ্ট নীতি বেশী দিন টিকিতে পারে না। ক্রমশঃ শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে লাগিল, দলের উগ্রতা কমিয়া আসিল, দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি ও ভাগ্যান্বেষীরা উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিল। "ভিতর হইতে বাধাদান" করিবার উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়া স্বরাজ্যদল আইন সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ খেলা অপরেও খেলিতে পারে এবং গভর্ণমেণ্ট সুকৌশলে স্বরাজ্যদলের মধ্যে বাধা উপস্থিত ও ভেদ ঘটাইতে লাগিলেন। উচ্চপদ এবং অন্যান্য অনেক প্রলোভন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত করা হইল। তাঁহারা উহা হাত বাড়াইয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাদের যোগ্যতা, রাজনীতিকোচিত গুণাবলীর এবং মধুর ব্যবহারের প্রশংসা করা হইতে লাগিল। তাঁহাদের চারিদিকে পদ্যশালা এবং কর্মক্ষেত্রের ধূলি ও কোলাহলহীন অপূর্ব আরামের ব্যবস্থা করা হইল।

স্বরাজ্যদলের উচ্চ কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। কেহ কেহ খসিয়া পড়িয়া অন্যদলে যোগ দিতে লাগিল। পিতা চীৎকার করিলেন, ভয় দেখাইয়া "রোগদুষ্ট অঙ্গচ্ছেদনের" কথা বলিলেন। অঙ্গ যেখানে নিজেই খসিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত তখন এই ভীতি প্রদর্শন একান্তই বৃথা হইল। কোন কোন স্বরাজী মন্ত্রী হইলেন, কেহ বা প্রাদেশিক শাসন পরিষদের সদস্য হইলেন। একদল স্বরাজী স্বতন্ত্র হইয়া নিজেদের "রেস্পন্সিভিষ্ট" অর্থাৎ পারস্পরিক সহযোগিতাবাদী বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবস্থায় এই নামটি প্রথম লোকমান্য তিলক ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ইহার অর্থ

দাঁড়াইল এই যে, সুযোগ পাইলেই একটি চাকুরী লইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করা। অবশ্য এইভাবে কতকাংশের দলত্যাগ সত্ত্বেও স্বরাজ্যদলের কাজ চলিতে লাগিল। কিন্তু ঘটনার গতি দেখিয়া পিতা এবং দাশ মহাশয় উভয়েই কিঞ্চিৎ বিরক্ত এবং আইনসভায় এই নিষ্ফল শ্রমে ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার সহিত উত্তর ভারতে ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্য এবং তাহা হইতে দাঙ্গা হাঙ্গামার উৎপত্তি তাঁহাদিগকে আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিল।

১৯২১-২২-এ যে সকল কংগ্রেসপন্থী আমাদের সহিত কারাগারে ছিলেন এখন তাঁহারা কেহ বা মন্ত্রী কেহ বা গভর্ণমেণ্টের বড় চাকুরীয়া। ১৯২১ সালে যে গভর্ণমেণ্ট আমাদের কার্য বে-আইনী বলিয়া আমাদিগকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন সেই গভর্ণমেণ্টেও কতিপয় মডারেট (ইহারাও প্রাচীন কংগ্রেসপন্থী) ছিলেন। ভবিষ্যতে কয়েকটি প্রদেশে হয়তো বা আমাদের সহকর্মীরাই আমাদিগকে আইন-বিরোধী ঘোষণা করিয়া কারাগারে পাঠাইবেন। এই সকল নূতন মন্ত্রী এবং শাসন পরিষদের সদস্য মডারেট অপেক্ষাও সুপটু ও কার্যদক্ষ। ইঁহারা আমাদের ভাল করিয়াই চিনেন এবং আমাদের দুর্বলতা কি এবং কেমন করিয়া তাহার সুযোগ লইতে হয় তাহাও জানেন। তাঁহারা আমাদের কার্যপ্রণালীর সহিত সুপরিচিত, বৃহৎ জনতার মতিগতি এবং জনমত সম্পর্কেও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে। নাৎসীদের মতই মতপরিবর্তন করিবার পূর্বে ইঁহারা কিছুকাল বৈপ্লবিক কার্য-পদ্ধতিতে যোগ দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সেই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহারা অজ্ঞ ও অদূরদর্শী সাধারণ শাসকসম্প্রদায় কিম্বা মডারেট মন্ত্রিগণ অপেক্ষা অধিকতর কুশলতার সহিত কংগ্রেসের পুরাতন সহকর্মীদিগকে দমন করিতে পারেন।

১৯২৪-এর ডিসেম্বর মাসে গান্ধিজীর সভাপতিত্বে বেলগ্রাম-এ কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। তিনি বহুবর্ষ যাবৎ কার্যতঃ কংগ্রেসের স্থায়ী মহা-সভাপতি হইয়াই আছেন। অতএব তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ আমার মোটেই ভাল লাগিল না, উহার মধ্যে প্রেরণা পাইবার মত কিছুই ছিল না। অধিবেশনের শেষে আমি পুনরায় গান্ধিজীর নির্দেশে আগামী বৎসরের জন্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যকরী সম্পাদক নির্বাচিত হইলাম। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি ক্রমশঃ কংগ্রেসের স্থায়ী সম্পাদক হইয়া উঠিলাম।

১৯২৫-এর গ্রীষ্মকালে হাঁপানী রোগ বৃদ্ধি হওয়ায় পিতা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি পরিবারবর্গসহ হিমালয়ের ডালহৌসী পর্বতে চলিয়া গেলেন, আমি কয়েকদিন পর যাইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলাম। এই সময়ে আমরা ডালহৌসী হইতে হিমালয়ের গভীর গহনে চম্বার ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। পার্বত্য পথভ্রমণে শ্রান্ত হইয়া আমরা যখন সেখানে উপস্থিত হইলাম, (জুন মাস) তখনই তারে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু সংবাদ আসিল। পিতা শোকে মুহ্যমান হইয়া দীর্ঘকাল মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার নিকট ইহা এক নিষ্ঠুর আঘাত। আমি কদাচিৎ তাঁহাকে এত অধীর হইতে দেখিয়াছি। তাঁহার একমাত্র ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়তম সহকর্মী সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া সহসা চলিয়া গেলেন। বোঝা ক্রমেই ভারি হইয়া উঠিতেছিল, দলের দৌর্বল্য বাড়িতেছিল। তিনি এবং দেশবন্ধু উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফরিদপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধুর সর্বশেষ বক্তৃতায় এই ক্লান্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল।

আমরা পরদিন প্রভাতে চম্বা ত্যাগ করিয়া ডালহৌসী পশ্চাতে ফেলিয়া মোটর যোগে পার্বত্য পথ দিয়া দূরবর্তী রেলস্টেশনে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে এলাহাবাদ হইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

১৯

উদ্দাম সাম্প্রদায়িকতা

নাভা জেল হইতে ফিরিবার পর আমার পীড়া এবং টাইফয়েড রোগের সহিত যুদ্ধ আমার জীবনে এক নূতন অভিজ্ঞতা। জ্বর রোগে অথবা শারীরিক দুর্বলতার জন্য বিছানায় শুইয়া থাকিতে আমি অনভ্যস্ত। আমার স্বাস্থ্যের জন্য আমি গর্ববোধ করিয়া থাকি। আমাদের দেশে সাধারণতঃ শরীরটা ভাল নয় বলিবার বা ভাবিবার যে ফ্যাসান দেখা যায় আমি বরাবর তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকি। আমার যৌবন এবং সুগঠিত দেহের জন্য এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইলাম। দুর্বলদেহে বিছানায় শুইয়া আমি ক্রমশঃ স্বাস্থ্যলাভ করিতে লাগিলাম। এইকালে দৈনন্দিন কাজ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া দূরে হইতে সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার মন পূর্বাপেক্ষা শান্ত হইল এবং আমি সকল বিষয় অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে ও বুঝিতে লাগিলাম। সম্ভবতঃ কঠিন পীড়ায় সকলেরই অল্পবিস্তর এই শ্রেণীর অনুভূতি হইয়া থাকে; কিন্তু আমার ইহা এক আধ্যাত্মিক অনুভূতির মত মনে হইল। এই শব্দটি আমি কোন সঙ্কীর্ণ ধর্মসম্পর্কিত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। আমাদের রাজনীতির ভাবুকতার স্তরের ঊর্ধ্বে উঠিয়া আমি পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী, যাহা দ্বারা এতকাল রাষ্ট্রক্ষেত্রে চালিত হইয়াছি, তাহা যেন স্পষ্টতররূপে দেখিতে পাইলাম। এই স্পষ্টতার মধ্যে নূতন প্রশ্ন উঠিল কিন্তু আমি কোন সদুত্তর পাইলাম না। জীবন এবং রাজনীতিকে ধর্মের দিক হইতে দেখিবার ভাব আমার মন হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল। এই অভিজ্ঞতার বিষয় অধিক বলা আমার পক্ষে অসাধ্য। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নহে। তাহার পর এগার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, এখন আমার মনে ইহা অস্পষ্ট স্মৃতি মাত্রে পর্যবসিত; কিন্তু ইহা আমার উত্তমরূপে স্মরণ আছে যে, ইহার ফলে আমার চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। তাহার পর দুই বৎসর বা ততোধিক কাল আমি একরূপ অনাসক্তভাবে কার্য করিয়াছি।

অবশ্য আমার আয়ত্তের বাহিরে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছিল এবং যাহার সহিত আমি নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিতেছিলাম না তাহাও কিয়ৎপরিমাণে আমার মানসিক পরিবর্তনে সহায়তা করিয়াছিল। কতকগুলি রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তদপেক্ষা বহুগুণে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। বিশেষতঃ উত্তর ভারতের কয়েকটি নগরে অতি নৃশংস পাশবিক নিষ্ঠুরতার সহিত দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিল। ক্রোধ ও অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় কলহের এমন সব নূতন কারণ দেখা দিল, যাহা ইতিপূর্বে আমরা কখনও শুনি নাই। ইতিপূর্বে গোহত্যা লইয়া বিশেষতঃ বকরী-ঈদের দিন হাঙ্গামা ও মনকষাকষি হইত। যদি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পর্ব উৎসব একই দিনে হইত তাহা হইলেও কলহ হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহরম ও রামলীলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহরম শোকাবহ ব্যাপার। ইহার মিছিল গম্ভীর, অশ্রু ও বিষাদ-উদ্দীপক, পক্ষান্তরে রামলীলা আনন্দের উৎসব, অন্যায়ের উপর সত্যের জয় ঘোষণা। এই দুইটি পরস্পর বিরোধী—তবে সৌভাগ্যক্রমে দীর্ঘ তিন বৎসর পর এই দুই উৎসব এক সময় অনুষ্ঠিত হয়। রামলীলা সৌর মাস হিসাবে গণিত হয় বলিয়া প্রতি বৎসর একই সময় অনুষ্ঠিত হয়, মহরম চান্দ্র মাস হিসাবে গণিত

হয় বলিয়া প্রতিবৎসরই সময়ের পরিবর্তন হয়।

কিন্তু কলহের যে নূতন কারণ উপস্থিত হইল তাহা নিত্য-নৈমিত্তিক সচরাচর ঘটনা। ইহা মসজিদের সম্মুখে বাদ্য সমস্যা। মুসলমানেরা আপত্তি করিতে লাগিলেন যে বাদ্য এবং যে কোন গোলমালে মসজিদে প্রার্থনা করিবার ব্যাঘাত হয়। প্রত্যেক বৃহৎ সহরেই কতকগুলি করিয়া মসজিদ আছে। এখানে পাঁচবার করিয়া উপাসনা হয় এবং বিবাহ ও শবযাত্রাসহ নানাবিধ গোলমালের অভাব নাই, কাজেই কলহের সম্ভাবনা পদে পদে। বিশেষভাবে মসজিদে সান্ধ্য উপাসনার সময় শোভাযাত্রা ও গোলমালের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হইতে লাগিল। কিন্তু এই সময় হিন্দু মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। কাজেই আরতি-নামাজ সমস্যাই বড় হইয়া উঠিল।

যাহা পরস্পরের প্রতি সুবিবেচনা এবং মনোভাব লক্ষ্য করিয়া একটু অদল-বদল করিয়া লইলেই মীমাংসা হইতে পারিত, তাহাই তীব্র কলহে পরিণত হইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ হইল ইহা আশ্চর্য মনে হইতে পারে। কিন্তু ধর্মোন্মত্ততা কখনও যুক্তি, সুবিবেচনা এবং আপোষের ধার ধারে না। এবং যখন তৃতীয়পক্ষ এক পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে উস্কাইয়া দিবার জন্য উপস্থিত থাকে, তখন তো কথাই নাই।

উত্তর ভারতের কয়েকটি নগরে অনুষ্ঠিত এই দাঙ্গাহাঙ্গামাগুলির কারণ অনেকে বড় করিয়া দেখিতে পারেন। অধিকাংশ সহর এবং সমগ্র পল্লী-ভারত শান্তই ছিল এবং এই সকল ঘটনায় উত্তেজিত হয় নাই। তবে সংবাদপত্রে অতি সামান্য সাম্প্রদায়িক অশান্তির সংবাদও বিশেষ প্রাধান্য দিয়া প্রকাশ করা হইত। সহরবাসীদের মধ্যেই যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও তিক্ততা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহ। সাম্প্রদায়িক নেতারা পুরোভাগে আসিয়া ইহাকে অধিকতর বাড়াইয়া তুলিলেন এবং সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দাবীগুলির মধ্যে ইহার প্রতিচ্ছায়া ফুটিয়া উঠিল। যে সকল রাষ্ট্রীয় প্রগতিবিরোধী মুসলমান অসহযোগ আন্দোলনে পিছনে পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বিরোধের সুযোগে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। জাতীয় ঐক্য এবং ভারতের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ইহারা নিত্য নূতন অসম্ভব সাম্প্রদায়িক দাবী উপস্থিত করিতে লাগিলেন। হিন্দুদের পক্ষেও রাজনৈতিক প্রগতিবিরোধীরা আসিয়া প্রধান প্রধান নেতা সাজিলেন এবং হিন্দুস্বার্থরক্ষার নামে গভর্ণমেণ্টের হাতে খেলার পুতুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের কোন আশাই সফল হইল না এবং বস্তুতঃ হইতেও পারে না। তাঁহাদের অবলম্বিত উপায়ে তাঁহারা তাঁহাদের একটি দাবীও গভর্ণমেণ্টের নিকট আদায় করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল দেশের সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি করিতে কৃতকার্য হইলেন।

কংগ্রেস বিপাকে পড়িল। জাতীয় ভাবের প্রতিনিধি এবং জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন কংগ্রেস স্বভাবতঃ এই সাম্প্রদায়িকতার প্রাবল্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। জাতীয়তার আবরণে অনেক কংগ্রেসপন্থী আসলে ছিলেন সাম্প্রদায়িকতাবাদী। কিন্তু মোটের উপর কংগ্রেসনেতারা অটল রহিলেন, কোন সাম্প্রদায়িক দলের পক্ষাবলম্বন করিলেন না। এই সময় শিখ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের পক্ষ হইতে বিশেষ দাবী ঘোষিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে উভয় পক্ষের চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কংগ্রেসকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন। বহুপূর্বে, এমন কি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবারও কিছুদিন পূর্বে গান্ধিজী সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসার জন্য তাঁহার নিজের সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার

মতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উদারতা ও সদিচ্ছার উপরেই সমাধান নির্ভর করে। এজন্য মুসলমানদের সর্ববিধ দাবী স্বীকার করিয়া লইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের চিত্তজয় করিতে চাহিয়াছিলেন, দর কষাকষি করিবার মনোভাব তাহাতে ছিল না। দূরদর্শিতা এবং বস্তুর প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সত্য ধারণা লইয়া তিনি বাস্তব দৃষ্টিতে ইহার মীমাংসা চাহিয়াছেন। কিন্তু এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা কোন বস্তুর প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বাজার দরের বিষয়েই বেশী জানিতেন এবং কেনাবেচার পদ্ধতি পরিত্যাগে অনিচ্ছুক ছিলেন। বস্তুর প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কি মূল্য দিতে হইতেছে সেই সম্পর্কেই তাঁহারা বেশী সচেতন।

অপরকে দোষ দেওয়া ও সমালোচনা করা সহজ। কাহারও উদ্দেশ্যের ব্যর্থতার একটা কৈফিয়ৎ আবিষ্কার করিবার লোভ সংবরণ করা কঠিন। ব্যর্থতার জন্য অপরের বাধাই দায়ী—না নিজেদের চিন্তা ও কার্যে ভুলই দায়ী? আমরা গভর্ণমেণ্টকে দোষ দিয়াছি, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দোষ দিয়াছি, অবশেষে কংগ্রেসকেও নিন্দা করিয়াছি। অবশ্য বাধা পাইয়াছি, গভর্ণমেণ্ট এবং তাহার সমর্থকেরা ইচ্ছা করিয়াই অবিরত বাধা দিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অতীতে এবং বর্তমানে আমাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। বিভক্ত করিয়া শাসন করা সকল সাম্রাজ্যেরই নীতি এবং এই নীতির সাফল্যেই বিজিতের উপর তাহাদের শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন। ইহার বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ করিতে পারি না, অন্ততঃ ইহাতে আশ্চর্য হওয়া উচিত নহে। ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া এতৎসম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন না করা চিন্তার ত্রুটি মাত্র।

কি উপায়ে ইহাকে আমরা প্রতিরোধ করিতে পারি? দর কষাকষি করিয়া বাজার-চলন কৌশলে নিশ্চয়ই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কেননা আমরা যত বেশী দিতে চাহি না কেন, তৃতীয় পক্ষ সর্বদাই তাহার বেশী দিতে চাহিবে এবং তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি মত কার্যও করিতে পারেন। যদি জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ সম্বন্ধে সাধারণ দৃষ্টি-ভঙ্গিমা না থাকে, তাহা হইলে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এক যোগে কার্য করা সম্ভব নয়। যদি আমরা বর্তমান প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে মানিয়া লইয়া এখানে ওখানে এক-আধটু সংস্কার চাহি এবং উচ্চ চাকুরীগুলিতে অধিকসংখ্যক ভারতবাসী নিয়োগ করিতে চাহি, তাহা হইলে আমরা ঐক্যবদ্ধ কোন কার্য করিবার প্রেরণাই পাইব না। কেননা উহার উদ্দেশ্য হইবে, যাহা চাহিয়া চিন্তিয়া পাওয়া গেল, তাহা ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লওয়া। এক্ষেত্রে প্রবল প্রভুত্বের গরিমায় প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় পক্ষই উহা নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং তাহাদের মনোমত অনুগ্রহভাজনদিগের মধ্যেই পুরস্কার বিতরণ করিবে। অতএব স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা, এমন কি, বর্তমান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক সামাজিক ব্যবস্থার পরিকল্পনার উপরই আমরা সম্মিলিত কার্যপদ্ধতির দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতে পারি। এই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত দাবী হইল পূর্ণ স্বাধীনতা। ইহার দ্বারাই জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে যে, বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটা ভারতীয় সংস্করণ (যাহার মূলে থাকিবে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব) অর্থাৎ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমরা চাহিতেছি না, ইহা হইতে স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্যই আমাদের অভিযান। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে অবশ্যই কেবল রাজনৈতিক মুক্তি বুঝায়, ইহাতে সামাজিক পরিবর্তন বা জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি বুঝায় না। তবে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে লণ্ডন সহরের সহিত আমরা যে আর্থিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ আছি তাহার অপসারণ বুঝায়, এবং এ বন্ধন অপসারিত হইলে বর্তমান সমাজ-

ব্যবস্থা পরিবর্তন করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। তখন আমার চিন্তা প্রণালী এইরূপ ছিল। অবশ্য এখনও আমি মনে করি না যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিছক রাষ্ট্রীয় মুক্তিই আনিবে। ইহার সহিত সামাজিক স্বাধীনতাও আসিবে। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ নেতাই বর্তমানের সঙ্কীর্ণ বিধিবদ্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই তাঁহাদের চিন্তা সীমাবদ্ধ রাখিলেন। এবং এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইল যে, বর্তমান ব্যবস্থা যাঁহাদের করায়ত্ত, তাঁহারা সেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে গিয়া পড়িলেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের অন্যরূপ করিবার উপায়ও ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক আন্দোলনে যোগ দিলেন। কিন্তু ইঁহাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কারমূলক, বৈপ্লবিক নহে। সংস্কারমূলক পদ্ধতির দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি সমাধানের দিন বহুকাল অতীত হইয়াছে। বর্তমান অবস্থায় বৈপ্লবিক দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া আমূল পরিবর্তনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু এমন নেতা কোথায় যিনি এ ভিত্তিতে দাঁড়াইতে পারেন?

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতাই সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে সহায়তা করিয়াছে। স্বরাজের জন্য সংঘর্ষের সহিত দৈনন্দিন জীবনের কোন স্পষ্ট সম্বন্ধ জনসাধারণ দেখিতে পায় নাই। তাহারা সহজাত বুদ্ধি লইয়া সংগ্রামে যোগ দিয়াছে কিন্তু তাহাদের হাতের অস্ত্র ছিল দুর্বল এবং উহা অপর প্রয়োজনে নিয়োগ করা বিশেষ কঠিন নহে। প্রতিক্রিয়ার সময় জনসাধারণের এই অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত সহজসাধ্য ছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধর্মের নামে ইহা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিয়াছে। যে সকল দাবী বা কার্যপদ্ধতির সহিত জনসাধারণের, এমনকি, নিম্নমধ্যশ্রেণীর স্বার্থের কোন যোগ নাই, হিন্দু মুসলমান উভয়শ্রেণীর বুর্জোয়াদল ধর্মের পবিত্র নাম লইয়া ঐ সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়াছিল, ইহা এক পরমাশ্চর্য ঘটনা। যে কোন সাম্প্রদায়িক দল হইতে যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক দাবী করা হইয়াছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহা কেবল চাকুরীর দাবীমাত্র এবং এই চাকুরীগুলি মুষ্টিমেয় উচ্চ মধ্যশ্রেণী ছাড়া আর কাহারও ভাগ্যে জুটিতে পারে না। অবশ্য আইনসভাগুলিতে বিশেষ ও অতিরিক্ত আসনের দাবীও ছিল। এই দাবীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক ভাবে চাকুরী বণ্টনের ক্ষমতা লাভের প্রতিই আগ্রহ ছিল বেশী। উচ্চ মধ্যশ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তির লাভের জন্য জাতীয় ঐক্য ও উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ এই সকল সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক দাবীকে অত্যন্ত চতুরতার সহিত বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের জনসাধারণের দাবীরূপে প্রকাশ করা হইল। উহার নিষ্ফলতা ঢাকিবার জন্য ধর্মানুরাগকে আবরণ স্বরূপ ব্যবহার করা হইল।

এইরূপে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াপন্থীরা সাম্প্রদায়িক নেতার ছদ্মবেশে রাষ্ট্রক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের কার্যপ্রণালীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব অপেক্ষা রাজনৈতিক উন্নতিতে বাধা দিবার আগ্রহই ছিল অধিকতর প্রবল। রাজনৈতিক ব্যাপারে আমরা বাধা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্তু এই নিরাশ্রয় অবস্থার মধ্যে তাঁহারা যে কি পর্যন্ত যাইতে পারেন সে দৃশ্য অত্যন্ত ক্লেশজনক। মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা অতি আশ্চর্য আশ্চর্য কথা বলিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল ভারতের জাতীয়তা বা স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদের কোন মাথা-

ব্যথা নাই। হিন্দ়ু সাম্প্রদায়িক নেতারা সর্বদা জাতীয়তার ব়ুলি ম়ুখে আওড়াইলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁহাদের অক্ষমতাই পরিস্ফ়ুট হইতে লাগিল। তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের দরজায় ধরণা দিতে লাগিলেন। দ়ুর্ভাগ্যক্রমে তাহাও কোন কাজে আসিল না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অথবা অন়ুর়ুপ কোন "উচ্ছেদম়ুলক" আন্দোলনের নিন্দা করিতে উভয় দলই একমত, এবং কায়েমী স্বার্থের কোন ক্ষতি হয় এমন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে এই দ়ুইদলের ঐক্য অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। ম়ুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষতিজনক অনেক কিছ়ুই করিয়াছেন ও বলিয়াছেন; কিন্তু দল ও ব্যক্তি হিসাবে তাঁহারা গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সম্ম়ুখে মর্যাদার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দ়ু সাম্প্রদায়িক নেতাদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।

কংগ্রেসের মধ্যে বহ়ু ম়ুসলমান আছেন। ইঁহাদের সংখ্যা কম নহে। ইহার মধ্যে অনেকে যোগ্য ব্যক্তি এবং কয়েকজন খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় ম়ুসলমান নেতাও রহিয়াছেন। কংগ্রেসী ম়ুসলমানদের মধ্যে অনেকে "জাতীয়তাবাদী ম়ুসলমান দল" র়ুপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী ম়ুসলমানদের বিরোধিতা করিয়াছেন। আরম্ভে তাঁহারা কিছ়ু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত ম়ুসলমানদের অধিকাংশই তাঁহাদের পক্ষে এর়ুপ অন়ুমিত হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহারা সকলেই উচ্চ মধ্যশ্রেণীর এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহারও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছিল না। তাঁহারা কেহ বা ব়ৃত্তিজীবী কেহ বা ব্যবসায়ী—জনসাধারণের সহিত সংযোগহীন. তাঁহারা সাধারণের মধ্যে কখনও প্রচারকার্যও করিতেন না। তাঁহারা বৈঠকী সভাসমিতিতে নিজেদের মধ্যে চুক্তি ইত্যাদি করিতেন। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্প্রদায়িক নেতারা অধিকতর নিপ়ুণ ছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহারা জাতীয়তাবাদী নেতাদিগকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন এবং ক্রমে একের পর আর তাঁহাদের প্রত্যেকটি নীতিই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। জাতীয়তাবাদী ম়ুসলমানেরা বার বার পিছ়ু না হটিয়া "কম অনিষ্টকর" এই নীতি লইয়া দ়ৃঢ়পদে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু প্রতিবারই তাঁহাদিগকে আর একট়ু পশ্চাতে হটিয়া অন্য একটি "কম অনিষ্টকর" বাছিয়া লইতে হইয়াছে। তারপর এমন সময় আসিল যখন তাঁহাদের নিজের বলিতে আর কিছ়ু রহিল না এবং য়ুক্ত-নির্বাচন ব্যতীত ধরিয়া থাকিবার মত আর কোন ম়ুলনীতি রহিল না। কিন্তু আবার সেই "কম অনিষ্টকর" নীতি গ্রহণ করিবার দ়ুর্ভাগ্য তাঁহাদের সম্ম়ুখে দেখা দিল এবং তাঁহারা সর্বশেষ আশ্রয়টিও পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। তাঁহারা দল গঠন করিবার সময় তাঁহাদের পতাকায় গর্বভরে যে সকল নীতি ও কার্যক্রম লিখিয়া দিয়াছিলেন, সমস্তই ম়ুছিয়া গেল, তাঁহারা কেবল নামে মাত্র জীবিত রহিলেন।

জাতীয় ম়ুস্লিম দল হিসাবে তাঁহাদের পতন ও বিলোপ ঘটিলেও অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই কংগ্রেসের প্রধান নেতৃপদে রহিয়াছেন। ইহা এক স়ুদীর্ঘ শোচনীয় ইতিহাস। ইহার সর্বশেষ অধ্যায় মাত্র এই বৎসর (১৯৩৪) লিখিত হইয়াছে। ১৯২০ হইতেই পর পর কয়েক বৎসর তাঁহারা শক্তিশালী দল ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী ম়ুসলমানের বির়ুদ্ধে তাঁহাদের মনোভাব বির়ুপ ছিল। এমন কি কয়েকটি ঘটনায় যখন গান্ধিজী অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কোন কোন দাবী মানিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহকর্মী জাতীয়তা-বাদী ম়ুসলমানেরাই তীব্র বিরোধিতা করিয়া উহাতে বাধা দিয়াছেন।

বিংশ দশকের মধ্যভাগে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানকল্পে আলাপ আলোচনার

জন্য কতকগুলি "ঐক্য সম্মেলন" আহূত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৯২৪ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলী কর্তৃক আহূত সম্মেলনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দিল্লীতে গান্ধিজী যখন একুশ দিন উপবাসব্রত পালন করিতেছিলেন সেই সময় ইহার অধিবেশন হয়। এই সকল সম্মেলনে অনেকে সদিচ্ছা ও ঐকান্তিক আগ্রহ লইয়া যোগ দিয়াছিলেন এবং আপোষ-রফার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি সাধু ও উত্তম প্রস্তাব পাস ব্যতীত মূল সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। এই শ্রেণীর সম্মেলনে এক মত ব্যতীত অধিকাংশ ভোটে কোন মীমাংসা হওয়া কঠিন এবং প্রত্যেক সম্মেলনেই বিভিন্ন দলের এমন কতকগুলি ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেন যাঁহাদের ধারণা তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করাই সমস্যার সমাধান। কতিপয় বিখ্যাত সাম্প্রদায়িকতাবাদীর আদৌ সমাধানের ইচ্ছা ছিল কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নিশ্চয়ই রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই রাষ্ট্রক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনকামী, তাঁহাদের সহিত উঁহাদের কোন সাধারণ মিলনভূমি ছিল না।

ব্যক্তিবিশেষের পিছাইয়া পড়া অপেক্ষাও প্রকৃত বিক্ষোভের কারণ আরও গভীর ছিল। এই সময় শিখেরা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক দাবী উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিলেন। এবং তাহার ফলে পাঞ্জাবে এক জটিল ত্রিধাবিভক্ত সমস্যার উদ্ভব হইল। সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রভূমি হইল পাঞ্জাব। পরস্পরের বিরুদ্ধে ভীতি আক্রোশ এবং ভ্রান্ত ধারণা এইখানেই সর্বাধিক প্রবল হইল। অন্যান্য প্রদেশে কৃষক সমস্যা—বাঙ্গলায় হিন্দু জমিদার এবং মুসলমান প্রজার সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতার ছদ্মবেশে দেখা দিল। পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে মহাজন ও ধনী শ্রেণীরা সাধারণতঃ হিন্দু, এবং খাতকের দল অধিকাংশই মুসলমান চাষী। সুদ-লোভী মহাজনের উপর দায়িকের সমস্ত আক্রোশ সাম্প্রদায়িকতার শক্তিই বৃদ্ধি করিতে লাগিল। সচরাচর মুসলমানেরা দরিদ্রতর সম্প্রদায় এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা সর্বহারাদের চিত্তে ধনীদের প্রতি যে বিরোধ থাকে, সেই মনোবৃত্তিকে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কার্যে লাগাইল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তাহাদের প্রস্তাবে সর্বহারাদের উন্নতিসাধনের জন্য কোন কার্যতালিকা ছিল না। অথচ ইহার বলেই সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা কিয়ৎপরিমাণে জনসাধারণের প্রতিনিধি হইয়া কিছু শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা—অর্থনৈতিক দিক হইতে দেখিতে গেলে—ধনী ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাঁহারা হিন্দু জনসাধারণের সাময়িক সহানুভূতি পাইলেও কদাচিৎ তাহাদের সমর্থন লাভ করিয়াছেন। অতএব সমস্যা কিয়ৎপরিমাণে অর্থনৈতিক স্তরভেদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা হিসাব করা হয় নাই। ক্রমে ইহা অর্থনৈতিক শ্রেণীগত বিরোধের রূপ গ্রহণ করিতে পারে, যদি সে সময় আসে, তাহা হইলে অন্যকার সকল দলের উচ্চ শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক নেতারা নিজেদের মতভেদ মিটাইয়া লইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে একই শ্রেণী-স্বার্থের শত্রুদের সম্মুখীন হইবে। একদিক বর্তমান অবস্থার মধ্যেও একটা রাজনৈতিক সমাধান খুব বেশী কঠিন নহে। কিন্তু যদি—এবং ইহা একটি সুবৃহৎ যদি—তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত না থাকিত।

১৯২৪-এর দিল্লীর সম্মেলন শেষ হইতে না হইতেই এলাহাবাদে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিল। হতাহতের দিক দিয়া এই দাঙ্গা অন্যান্যগুলির তুলনায় এমন কিছু বড় নহে, তথাপি নিজের ঘরে এই দৃশ্য দেখা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি দিল্লী হইতে অতি দ্রুত এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়া দেখি হাঙ্গামা শেষ হইয়াছে; কিন্তু উভয় পক্ষের বিদ্বেষ এবং আদালতের মামলায় দীর্ঘকাল ধরিয়া

উহার জের চলিল। কি উপলক্ষে দাঙ্গা বাধিল আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। সেই বৎসর অথবা তাহার পরে এলাহাবাদে রামলীলা উৎসব ও শোভাযাত্রা লইয়া গণ্ডগোল বাধিয়াছিল। রামলীলা উৎসবে সাধারণতঃ বহ্ বৃহৎ শোভাযাত্রা বাহির হইয়া থাকে কিন্তু মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বাজান সম্পর্কিত বিধিনিষেধের প্রতিবাদস্বরূপ ইহা পরিত্যক্ত হইল। প্রায় আট বৎসর কাল এলাহাবাদে রামলীলা উৎসব হয় না। বৎসরের মধ্যে এই সর্বপ্রধান উৎসবে এলাহাবাদ জিলার লক্ষ লক্ষ নরনারীর আনন্দ সম্মেলন হইত—আজ তাহা এক বেদনাময় স্মৃতিতে পর্যবসিত। আমার শৈশবের রামলীলা উৎসবের স্মৃতি মনে আছে। কত উৎসাহ উদ্দীপনাই না হইত! অন্যান্য জিলা ও বিভিন্ন সহর হইতে দলে দলে লোক ইহা দেখিতে আসিত। ইহা হিন্দুদের হইলেও অপরের যোগ দিবার কোন বাধা ছিল না এবং মুসলমানেরাও দলে দলে আসিয়া জনতা বৃদ্ধি করিত; সর্বত্র আনন্দ ও উৎসবের কলহাস্যে মুখরিত হইত, কেনাবেচার ধুম পড়িত। বহু বৎসর পরে, বড় হইয়া রামলীলার শোভাযাত্রা দেখিয়াছি কিন্তু পূর্বের উৎসাহ বোধ করি নাই এবং শোভাযাত্রার সং ও সাজান চৌকি প্রভৃতি দেখিয়া বিরক্তিই বোধ করিয়াছি। আমার কারু-শিল্পরুচি এবং আনন্দ উপভোগের স্তর অনেক উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। তবুও বৃহৎ জনতার আনন্দ উৎসাহ আমি উপভোগ করিয়াছি। তাহাদের নিকট ইহা উৎসবের আনন্দময় অবকাশ। আজ আট নয় বৎসরকাল, বয়স্কদের তো কথাই নাই, এলাহাবাদের বালক বালিকারা পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের বিরস একঘেয়েমির মধ্যে একটি দিবসে আনন্দময় উত্তেজনা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ইহার কারণ অতি সামান্য মতভেদ এবং কলহ। ধর্ম এবং ধর্মবুদ্ধিকে ইহার জন্য নিশ্চয়ই জবাবদিহি করিতে হইবে। ইহারা আনন্দকে কি ভাবে বিনষ্ট করিতেছে!

২০

মিউনিসিপালিটির কাজ

প্রায় দুই বৎসর এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির কাজ আমি চালাইয়াছি। কিন্তু কাজে মন বসিত না। তিন বৎসরের জন্য আমি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলাম। দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হইবার পর হইতেই আমি নিষ্কৃতির পথ খুঁজিতে লাগিলাম। প্রথমে কাজটা আমার ভাল লাগিয়াছিল এবং ইহাতে অনেক সময় ব্যয় করিতাম। সহকর্মীদের সদিচ্ছায় কিছু সাফল্যও আমি লাভ করিয়াছিলাম। এমনকি প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টও আমার প্রতি রাজনৈতিক বিরক্তি সত্ত্বেও মিউনিসিপালিটিসংক্রান্ত কতকগুলি কাজে আমার প্রশংসা করিয়াছিলেন। তথাপি আমি বুঝিতে পারিলাম, খাঁটি ভাল কাজ করিবার পথে অনেক বাধা বিঘ্ন রহিয়াছে।

কোন ব্যক্তিবিশেষ যে ইচ্ছা করিয়া বাধা দিতেন এরূপ নহে এবং আমি সকলের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সহযোগিতাই পাইয়াছি। কিন্তু একদিকে ছিল গভর্ণমেন্টের শাসনযন্ত্র, অন্যদিকে মিউনিসিপালিটির সম্বলাভাব এবং জনসাধারণের ঔদাস্য। গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্মিত মিউনিসিপাল শাসনযন্ত্রের বাঁধনকষণ এত শক্ত যে, তাহার মধ্যে নূতন কিছু করা কিম্বা কোনদিকে আমূল পরিবর্তন করা অসম্ভব। মিউনিসিপালিটির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গভর্ণমেন্টের উপর নির্ভরশীল। প্রচলিত মিউনিসিপাল আইনের উদার ধারার কোন বাস্তব পরিবর্তন অথবা

জনহিতকর কার্য করার উপায় ছিল না। যে সকল পরিকল্পনা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত, তাহাও গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরীর অপেক্ষা রাখে এবং একমাত্র অতিরিক্ত আশাবাদী এই শ্রেণীর মঞ্জুরীর আশা করিয়া বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিতে পারেন। আমি দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, যখনই জাতিগঠন কিম্বা সমাজসেবামূলক কোন কাজের প্রস্তাব হয়, গভর্ণমেণ্টের শাসনযন্ত্র কত আয়াস সহকারে অক্ষম অকর্মণ্যতা লইয়া মন্থরগতিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু যখন কোন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে দমন অথবা আঘাত করিতে হয়, তখন অকর্মণ্যতা বা মন্থরতার লেশমাত্রও থাকে না। এই বৈসাদৃশ্য কত সহজে চোখে পড়ে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের ভার একজন মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত। কিন্তু সাধারণতঃ এই সম্মান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি মিউনিসিপালিটি-সংক্রান্ত এবং জনহিতকর কার্য সম্পর্কে গভীরভাবেই অজ্ঞ। প্রকৃত প্রস্তাবে বিভাগীয় সিভিলিয়ান স্থায়ী কর্মচারীরাই কার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রীকে তাঁহারা গণনার মধ্যেই আনেন না। ভারতের উচ্চ কর্মচারী মহলে, গভর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল পুলিসী ব্যবস্থার কাজ চালান, এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে, এবং এই শ্রেণীর কর্মচারীরাও ঐ প্রচলিত বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত। এই ধারণার উপর প্রভুত্বসুলভ অনুগ্রহপ্রবণতা থাকা সত্ত্বেও বড় আকারে কোন সমাজ-সেবাকার্য ইঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

গভর্ণমেণ্টের নিকট অধিকাংশ মিউনিসিপালিটি ঋণী—পুলিসের দৃষ্টির সহিত মহাজনের দৃষ্টি মিলাইয়া তাঁহারা মিউনিসিপালিটির উপর লক্ষ্য রাখেন। ঋণের কিস্তী নিয়মমত শোধ হইয়াছে কি? মিউনিসিপালিটির আর্থিক অবস্থা কি সচ্ছল, হাতে উদ্বৃত্ত কিছু আছে কি?- এই সকল প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু মিউনিসিপালিটি কেবলমাত্র টাকা ধার করিবার এবং নির্দিষ্ট নিয়মে পরিশোধ করিবার প্রতিষ্ঠান নহে। ইহাকে শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি কার্যই মুখ্যভাবে করিতে হয়। শাসকগণ প্রায়ই ইহা ভুলিয়া যান। ভারতীয় মিউনিসিপালিটিগুলির সমাজ-হিতকর কার্য অতি অল্প। তাহাও আবার আর্থিক অসঙ্গতির অজুহাতে সঙ্কুচিত করা হয় এবং সাধারণতঃ ইহার ফলে শিক্ষাবিভাগই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারী চাকুরীয়ারা ব্যক্তিগতভাবে মিউনিসিপাল স্কুলগুলির কোনই খবর রাখেন না। কেননা তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিরা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যয়বহুল আধুনিক প্রাইভেট স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

অধিকাংশ ভারতীয় সহরই দুই ভাগে বিভক্ত। একাংশ ঘন বসতিপূর্ণ নগরী—অন্য অংশে বাগান ও সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ সমন্বিত বাংলো বা "কটেজ"। ইংরেজরা এই অংশকে "সিভিল লাইনস্" বলিয়া থাকেন। এই সিভিল লাইনে ইংরাজ কর্মচারীরা, ব্যবসায়ীরা, উচ্চ-মধ্যশ্রেণীর ভারতীয় বৃত্তিজীবী ও সরকারী কর্মচারীরা বাস করেন। যদিও মিউনিসিপালিটির আয় সিভিল লাইন অপেক্ষা মূল সহরে অনেক বেশী, তথাপি বেশীর ভাগ টাকা সিভিল লাইনেই খরচ করিতে হয়। সিভিল লাইনের বিস্তার ও পরিধি অনেক বেশী বলিয়া সেখানে রাস্তার সংখ্যাও বেশী এবং এগুলি মেরামত করিতে, পরিষ্কার করিতে, জল ও আলো দিতে হয়। তাহার উপর বিস্তীর্ণ পয়ঃপ্রণালী, জলসরবরাহ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা আছে। মূল সহরের অংশ অত্যন্ত অবহেলিত। বিশেষতঃ দরিদ্র বস্তী-গুলিতে কোন নজরই দেওয়া হয় না। এদিকে ভাল রাস্তার সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশই সরু গলি। আলোর ব্যবস্থা পর্যন্ত নাই এবং পয়ঃপ্রণালী কিম্বা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাও নিতান্ত অনুপযুক্ত। সাধারণ লোকেরা ইহা নীরবে সহ্য করে, এবং কদাচিৎ অভিযোগ করিয়া থাকে। অভিযোগ করিলেও কোন প্রতিকার

হয় না। "সিভিল লাইন"-বাসীরাই ক্ষ্দ্র ব্হৎ দাবী লইয়া মিউনিসিপালিটিকে বিব্রত রাখেন।

ভারকেন্দ্রের সাম্যরক্ষার জন্য এবং কিছ্ উন্নতি সাধনের জন্য আমি জমির ম্ল্যের নিরিখে ট্যাক্স ধার্যের প্রস্তাব করিলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একজন সরকারী কর্মচারী তীব্র আপত্তি তুলিলেন। আমার মনে হয়, ইনি জিলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি বলিলেন যে, এই ব্যবস্থা ভূমিসংক্রান্ত আইন-কান্নের বিরোধী। অবশ্য এই শ্রেণীর ট্যাক্সের ফলে সিভিল লাইনের বাংলোর মালিকদিগের ট্যাক্স বাড়িয়া যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু চুঙ্গি মাশ্ল বা অন্র্প ট্যাক্স গভর্ণমেণ্ট সর্বদাই সমর্থন করিয়া থাকেন, তাহার ফলে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ম্ল্য ব্দ্ধি হয় এবং ইহার বোঝা গরীবের ঘাড়েই বেশী করিয়া পড়ে। এই সমাজনীতিবির্দ্ধ এবং অনিষ্টকর মাশ্লই ভারতীয় মিউনিসিপালিটিগ্লির প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এক্ষণে ব্হত্তর সহরগ্লিতে ইহা ধীরে ধীরে বিল্প্ত হইতেছে।

মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানর্পে আমি দ্ই বিপাকের মধ্যে পড়িলাম। একদিকে নৈর্ব্যক্তিক প্রভুত্বচালিত গভর্ণমেণ্ট যন্ত্র—প্রাতন গর্র গাড়ীর মত কাঁচা কর্দমাক্ত রাস্তার নির্দিষ্ট রেখায় মন্থর গতিতে চলিয়াছে। দ্রুত চলিতেও ইহার আপত্তি, মোড় ঘ্রিতে ততোধিক আপত্তি। অন্যদিকে আমার সহকর্মী সদস্যদল —তাঁহারাও পরিচিত দাগের বাহিরে যাইতে সমান অনিচ্ছ্ক। কাহারও কাহারও বড় বড় পরিকল্পনা ছিল এবং তাঁহারা কাজেও বেশ উৎসাহ দেখাইতেন। কিন্তু সমগ্রভাবে তাঁহাদের কোন দ্রদ্ষ্টি ছিল না। কোন পরিবর্তন বা উন্নতির আগ্রহও ছিল না। প্রাতন ধারাই ভাল, ন্তন পরীক্ষার ফল কি হইবে কে জানে। এমন কি উৎসাহী আদর্শবাদীরা সমস্ত বাঁধা-ধরা দৈনন্দিন কাজের জালে জড়াইয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব কিম্বা ন্তন লোক নিয্ক্ত করিবার সময় সদস্যদের মধ্যে অত্যন্ত কর্মতৎপরতা দেখা যাইত। কিন্তু তাঁহাদের এই উৎসাহের ফলে যে কুশলতা বাড়িত তাহা নহে।

বৎসরের পর বৎসর সরকারী-সিদ্ধান্ত এবং সরকারী কর্মচারীব্ন্দ ও সংবাদপত্র মিউনিসিপালিটি ও লোকালবোর্ডের কার্যের সমালোচনা করিয়া থাকেন। ইহাতে এই সারমর্ম উদ্ধার করা হয় যে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী নহে। এইগ্লির ত্র্টি অবশ্য অনেক আছে কিন্তু যে ব্যবস্থার মধ্যে উহাদিগকে কার্য করিতে হয়, তাহা সংশোধনের দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয় না। এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকও নহে স্বেচ্ছাচারম্লকও নহে। ইহা মাঝামাঝি এমন একটি বস্তু যাহার মধ্যে উভয়ের অস্বিধাগ্লি প্র্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের কতকগ্লি ক্ষমতা নিশ্চয়ই থাকা আবশ্যক; কিন্তু যদি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট গণতান্ত্রিক এবং জনসাধারণের অভাব সম্পর্কে সচেতন হন, তাহা হইলেই গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সহিত সামঞ্জস্য সম্ভবপর। কিন্তু যেখানে ইহার অভাব, সেখানে হয় দ্ইয়ের মধ্যে বিরোধ বাধিবে, নয় কেন্দ্রীয় প্রভুত্বের সম্প্র্ণ বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় প্রভুত্ব দায়িত্ব গ্রহণ করেন না অথচ ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই অসন্তোষজনক অবস্থায় জনসাধারণের আয়ত্তে কোন বাস্তব ক্ষমতা আসিতে পারে না। এমন কি মিউনিসিপাল বোর্ডের সদস্যরা পর্যন্ত নির্বাচকমণ্ডলী অপেক্ষা কর্তৃপক্ষের ম্খ চাহিয়াই কার্য করেন। জনসাধারণও প্রায়শঃই বোর্ডের প্রতি উদাসীন। প্রকৃত সমাজকল্যাণকর প্রশ্ন বোর্ডের দৈনন্দিন কার্যের এলাকার বাহিরে থাকিয়া কদাচিৎ

উহা বোর্ডে উঠিয়া থাকে এবং যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ ট্যাক্স আদায় করা, তাহার প্রতি জনসাধারণ প্রসন্ন হইতে পারে না।

স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ভোটাধিকারও সীমাবন্ধ; ভোটারের যোগ্যতার নিরিখ আরও নিম্ন এবং বিস্তৃত হওয়া উচিত। বোম্বাইয়ের মত বৃহৎ সহরের কর্পোরেশনের ভোটাধিকার অতিশয় সংকীর্ণ বলিয়া আমার ধারণা। কিছুদিন পূর্বে ভোটাধিকার বিস্তৃত করিবার একটি প্রস্তাব কর্পোরেশনেই বর্জিত হয়। অধিকাংশ সদস্যই বর্তমান ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট এবং ভোটাধিকার প্রসারিত করিয়া নিজেদের অবস্থা অনিশ্চিত করিতে চাহেন না।

কারণ যাহাই হউক, আমাদের দেশের মিউনিসিপালিটিগুলি সাফল্য ও যোগ্যতার নিদর্শন না হইলেও অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও উন্নতিশীল দেশের মিউনিসিপালিটির সহিত ইহার তুলনা চলিতে পারে। এইগুলি সাধারণতঃ ঘুসখোর নহে, তবে অকর্মণ্য। এবং এইগুলির প্রধান দুর্বলতা আশ্রিতবাৎসল্য এবং কোন বিষয় সত্যদৃষ্টিতে দেখিবার অক্ষমতা। ইহা স্বাভাবিক। কেননা গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে, চাই সুগঠিত জনমত এবং দায়িত্ববোধ। তাহার পরিবর্তে আমাদের চারিদিকে এক সর্বব্যাপী প্রভুত্বের আবেষ্টনী এবং গণতন্ত্রের অনুকূল আবহাওয়ার অভাব। এদেশে জনসাধারণকে কোন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই এবং প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া জনমত গঠন করিবার কোন চেষ্টা নাই। ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক অথবা অন্যান্য ক্ষুদ্র বিষয়ে সাধারণতঃ আকৃষ্ট থাকে।

মিউনিসিপালিটি হইতে রাজনীতি দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সততই আগ্রহশীল। জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন প্রস্তাব দেখিলেই তাঁহারা ভ্রূকুটি করেন, জাতীয়তার অনুকূল কোন পাঠ্যপুস্তক মিউনিসিপাল স্কুলে পড়িতে দেওয়া হয় না, এমনকি জাতীয় নেতাদের চিত্রও সেখানে রাখিতে দেওয়া হয় না। মিউনিসিপালিটির ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইবে এই ভয় দেখাইয়া জাতীয় পতাকা অপসারিত করা হয়। কিছুকাল হইল সমস্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট একযোগে কংগ্রেসপন্থীদিগকে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ও বোর্ডগুলির চাকুরী হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য বন্ধ করিবার ভীতি প্রদর্শনই যথেষ্ট। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে কলিকাতা কর্পোরেশনের জন্য এই আইন করা হইয়াছে, যাহারা গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে কিম্বা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়াছে, তাহাদিগকে চাকুরী দেওয়া হইবে না। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, ইহার মধ্যে অযোগ্যতা কিম্বা অক্ষমতার কোন প্রশ্ন নাই। এই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে যে, মিউনিসিপালিটি ও জেলা বোর্ডগুলিতে কতটুকু গণতন্ত্র ও কতটুকু স্বাধীনতা রহিয়াছে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে মিউনিসিপালিটি বা ঐ চাকুরী হইতে (অবশ্য তাহারা প্রত্যক্ষ সরকারী চাকুরী প্রার্থী হয় না) বঞ্চিত করার চেষ্টা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, গত পনর বৎসরে প্রায় তিন লক্ষ লোক কারাগারে গিয়াছে। রাজনীতি ছাড়িয়া দিলেও এই তিন লক্ষ লোকের মধ্যে বহু শক্তিমান আদর্শবাদী, সমাজের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি আছেন। ইঁহাদের শক্তি, কর্মতৎপরতা ও সেবার আদর্শের প্রতি অনুরাগ আছে। অতএব জনহিতকর অথবা অনুরূপ বিভাগে এই উৎকৃষ্ট শ্রেণী হইতেই কর্মচারী সংগ্রহ করা কর্তব্য। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই সকল লোককে বাহিরে রাখিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, এমনকি আইন পাশ করিয়া ইহাদিগকে

এবং ইহাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট পোষাকুকুরের বংশবৃদ্ধিরই অনুরাগী এবং তাহাতেই উৎসাহ দিয়া থাকেন। তারপর স্বায়ত্তশাসন বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁহারা অযোগ্যতার অপবাদ দিয়া থাকেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির সহিত সম্পর্ক থাকিবে না একথা যদিও মুখে বলা হয়, তথাপি গভর্ণমেণ্টের পছন্দমত রাজনীতিতে উৎসাহ দিবার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বোর্ডের স্কুলের শিক্ষকগণকে চাকুরীর ভয় দেখাইয়া গ্রামে গ্রামে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রচারকার্যের জন্য কার্যতঃ বাধ্য করা হইয়াছিল।

গত পনর বৎসর কংগ্রেসকর্মীরাই বহু বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন, গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে লইয়াছেন এবং সর্বোপরি তাঁহারা কিছু সাফল্যের সহিতই এক শক্তিমান, আত্মরক্ষায় সুদক্ষ গভর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। এই কঠিন ভূমিতে শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারা পাইয়াছেন আত্মপ্রত্যয়, কর্মকুশলতা এবং আত্মরক্ষার শক্তি। অতিমাত্রায় প্রভুত্বপরায়ণ শাসনতন্ত্রের ফলে ভারতবাসী যে পৌরুষ ও অন্যান্য গুণ হারাইয়া ফেলিতেছিল, ইহা তাঁহারা পুনরায় ফিরাইয়া পাইয়াছেন। অবশ্য অন্যান্য গণ-আন্দোলনের মতই কংগ্রেসের আন্দোলনের মধ্যেও নির্বোধ অকর্মণ্য দুশ্চরিত্র প্রভৃতি অনেক অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিল। তথাপি আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, গড়ে একজন কংগ্রেসকর্মী সমগুণবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর কুশলকর্মা এবং শক্তিমান।

এই ব্যাপারের আর একটা দিক আছে, যাহা গভর্ণমেণ্ট এবং তাহার পরামর্শ-দাতারা বুঝিতে পারেন না। কংগ্রেসকর্মীদিগকে সমস্ত চাকুরী অথবা জীবিকার্জনের অন্যান্য উপায় হইতে বঞ্চিত করার চেষ্টাকে প্রকৃত বিপ্লবীরা অভ্যর্থনাই করিয়া থাকে। সাধারণ কংগ্রেসকর্মীরা বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন নহেন বলিয়া অখ্যাতি আছে। তাঁহারা কিছুকালের জন্য অর্ধবৈপ্লবিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকিয়া অবশেষে পুনরায় সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রবৃত্ত হন। নিজের ব্যবসায় বৃত্তি অথবা স্থানীয় রাজনীতির জটিল জালে জড়াইয়া পড়েন। বৃহত্তর সমস্যা তাঁহাদের মন হইতে ক্রমে মুছিয়া যায় এবং বৈপ্লবিক আবেগ শান্ত হইয়া আসে। মাংসপেশীতে মেদ দেখা দেয়, নিরাপদ জীবনের প্রতি মমত্ব বৃদ্ধি পায়। মধ্যশ্রেণীর কর্মীদের এই অনিবার্য প্রবণতার ফলে অগ্রগামী এবং বৈপ্লবিক মনোবৃত্তিবিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মীরা তাঁহাদের সহকর্মীদিগকে আইনসভা অথবা মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির নিয়মতান্ত্রিক আবর্ত হইতে কিংবা সারাক্ষণের জন্য চাকুরীগ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিতে বেগ পাইয়া থাকেন। যাহা হউক এইবার গভর্ণমেণ্ট আমাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন এবং কংগ্রেসকর্মীদিগের পক্ষে চাকুরী পাওয়া কঠিন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে বৈপ্লবিক উৎসাহ আরও কিছুকাল থাকিবে —এমনকি বাড়িতেও পারে।

এক বৎসর কিম্বা আরও অধিককাল মিউনিসিপালিটির কাজ করিয়া দেখিলাম আমার কর্ম-শক্তিকে সার্থকতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না। বড়জোর আমি কাজের মধ্যে কিছু গতিবেগ ও কিছু কুশলতা সঞ্চার করিতে পারি কিন্তু কোন গুরুতর পরিবর্তন সাধন করিতে পারি না। আমি চেয়ারম্যানের পদে ইস্তফা দিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু বোর্ডের সদস্যগণ আমার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে আমি এত দয়া ও সৌজন্য পাইয়াছি যে, আমার পক্ষে অনুরোধ এড়ান কঠিন হইল। যাহা হউক, দ্বিতীয়বর্ষের শেষে আমি পদত্যাগ করিলাম।

১৯২৫ সাল। শরৎকালে আমার পত্নীর কঠিন পীড়া হইল এবং কয়েকমাস

ধরিয়া তিনি লক্ষ্ণৌর হাসপাতালে শয্যাশায়ী রহিলেন। সেবার কানপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। কতকটা উন্মনাভাবে আমাকে এলাহাবাদ, কানপুর ও লক্ষ্ণৌর মধ্যে ছুটাছুটি করিতে হইল (আমি তখনও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক)।

চিকিৎসকগণ আমার স্ত্রীকে সুইজারল্যান্ডে লইয়া গিয়া চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন। আমি কোন ছুতায় ভারতবর্ষের বাহিরে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম, কাজেই প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগিল। আমার মন সমস্যায় আচ্ছন্ন, কোন পথ স্পষ্টরূপে দেখিতেছিলাম না। ভাবিলাম, হয়তো ভারতবর্ষ হইতে দূরে সরিয়া গেলে উন্নততর পটভূমিকার উপর সমস্ত ভাল করিয়া দেখিতে পারিব, এবং আমার মনের অন্ধকার কোণগুলিও আলোকিত হইয়া উঠিবে।

১৯২৬-এর মার্চ মাসের প্রথমভাগে আমি স্ত্রী ও কন্যাসহ বোম্বাই হইতে ভিনিস্ যাত্রা করিলাম। ঐ জাহাজে আমার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি রণজিৎ পণ্ডিতও ছিলেন। আমাদের বিলাত যাত্রার কথা উঠিবার বহুপূর্বেই তাঁহারা ইউরোপ ভ্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

২১

ইউরোপে

তের বৎসর পর পুনরায় ইউরোপে চলিয়াছি। যুদ্ধে বিদ্রোহে এই কয় বৎসরে কি অভূতপূর্ব পরিবর্তন হইয়াছে। মহাযুদ্ধের মধ্যেই পরিচিত প্রাচীন জগতের মৃত্যু হইয়াছে। নবীন জগৎ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি ইউরোপে ছয় সাত মাস, বড়জোর এই বৎসরের শেষ পর্যন্ত থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু কার্যতঃ আমাদের এক বৎসর নয় মাস থাকিতে হইল।

এই সময়টা দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও শান্তিতে কাটিয়াছে। আমরা অধিকাংশ সময় সুইজারল্যান্ডে জেনেভায় এবং মন্টানার পার্বত্য স্বাস্থ্যাবাসে কাটাইয়াছি। ১৯২৬-এর গ্রীষ্মকালে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী কৃষ্ণা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া আমাদের দলে যোগ দিল, এবং অবশিষ্ট সময় আমাদের সঙ্গেই ইউরোপে ছিল। বেশীর ভাগ সময় আমার স্ত্রীকে ছাড়িয়া যাইতে না পারায় আমি কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য কয়েকটি স্থান দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। পরে আমার স্ত্রী কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলে আমরা ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতে কিছু ভ্রমণ করিয়াছি। তুষার-শৈলমালা-বেষ্টিত আমাদের এই পার্বত্য আবাসে আমি ভারতবর্ষ ও ইউরোপ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করিতাম। স্বদেশের ঘটনাবলী বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে, আমি দূর হইতে দ্রষ্টার মত সংবাদ পাঠ এবং ঘটনাগুলি লক্ষ্য করিতেছি, কখন বা নূতন ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইহার রাজনীতি, অর্থনীতি, ইহার স্বাধীন সামাজিক জীবন বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। যখন জেনেভায় ছিলাম তখন স্বভাবতই রাষ্ট্রসংঘ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

কিন্তু শীতের প্রারম্ভের সহিত এদেশের শীতকালের খেলাধূলায় মাতিয়া উঠিলাম। আগামী কয়েকমাস ইহাই আমার প্রধান কাজ হইয়া উঠিল। ইতিপূর্বে আমি বরফের উপর "স্কেটিং" করিয়াছি, কিন্তু "স্কীইং" এক নূতন অভিজ্ঞতা।

ইহার অভিনবত্বে আমি মুগ্ধ হইলাম। ইহা শিখিতে অত্যন্ত কষ্ট হইল। অনেকবার আছাড় খাইলাম; তবুও সাহসের সহিত পুনঃ পুনঃ উদ্যম করিয়া অবশেষে কৃতকার্য হইলাম। ইহাতে আমি অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিতাম।

এখানে জীবন মোটের উপর অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন। দিনে দিনে আমার স্ত্রী ক্রমশঃ শক্তি ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে লাগিলেন। এখানে কদাচিৎ কোন ভারতবাসীর সহিত দেখা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পার্বত্য নিবাসের অধিবাসীবৃন্দ ছাড়া অল্পলোকের সহিতই দেখা হইত। কিন্তু পৌনে দুই বৎসরের মধ্যে ইউরোপে আমাদের সহিত কয়েকজন সুপরিচিত নির্বাসিত এবং প্রাচীন বিপ্লবপন্থী ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে।

তখন জেনেভার একটি বাড়ীর উপরতলায় শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা তাঁহার পীড়িতা পত্নীকে লইয়া বাস করিতেন। এই বৃদ্ধা দম্পতির কোন সঙ্গী ছিল না। সারাক্ষণের জন্য ভৃত্যাদিও ছিল না। তাঁহাদের ঘরগুলি স্যাঁতসেঁতে ধূলিমলিন ও দুর্গন্ধপূর্ণ। শ্যামজীর অর্থ ছিল প্রচুর, কিন্তু তিনি ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন। এমনকি তিনি কয়েকটি পয়সা বাঁচাইবার জন্য ট্রামে না উঠিয়া হাঁটিয়া যাইতেন। প্রত্যেক নবাগতকেই তিনি সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখিতেন। এবং উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মনে করিতেন, এই ব্যক্তি হয় টাকার লোভেই আসিয়াছে, নয় ব্রিটিশের গুপ্তচর। তাঁহার পকেট তাঁহার সম্পাদিত প্রাচীন কাগজ "ইণ্ডিয়ান স্যোশিওলজিষ্ট"-এ বোঝাই থাকিত। তিনি ঐগুলি টানিয়া বাহির করিয়া তাঁহার বার চৌদ্দ বৎসর পূর্বের লেখা কোন প্রবন্ধ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পাঠ করিতেন। তিনি পুরাতন গল্প করিতে ভালবাসিতেন। হ্যামণ্টার্ডে ইণ্ডিয়া হাউসের গল্প করিতেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার পিছনে যে সকল গোয়েন্দা লাগাইয়াছিলেন, কেমন করিয়া তিনি তাহাদের চিনিয়া ফেলিতেন এবং তাহাদের বেকুব বানাইতেন সেই সব গল্প করিতেন। তাঁহার ঘরের দেয়ালে বহু তাক এবং সেগুলি ধূলিমলিন ও অযত্নরক্ষিত পুরাতন পুঁথিপুস্তকে বোঝাই। মেঝের উপরও বই ও খবরের কাগজের ছড়াছড়ি। সেগুলি হয়তো মাসের পর মাস কেহ নাড়াচাড়া করে নাই। মোটের উপর চারিদিকে বিষণ্ণ নির্জনতা—যেন ধ্বংসের স্তূপ, জীবন এখানে যেন অবাঞ্ছনীয় অতিথি—অন্ধকারে নিস্তব্ধ বারান্দার উপর দিয়া হাঁটিবার সময় মনে হয় যেন প্রত্যেক অন্ধকোণে মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া রহিয়াছে। এই বাড়ী হইতে বাহির হইলে মুক্ত বায়ুতে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচা যায়।

শ্যামজী তাঁহার টাকাকড়ির একটা বিলি ব্যবস্থায় ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কোন জনহিতকর কার্যে, বিশেষভাবে ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষার জন্য একটা স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপনের তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি আমাকে একজন অছি নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবার কোন আগ্রহ দেখাইলাম না। তাঁহার আর্থিক ব্যাপারের সহিত জড়িত হইবার কিছুমাত্র ইচ্ছাও আমার ছিল না; তাহা ছাড়াও আমি যদি এ বিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাই, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করিবেন, তাঁহার টাকার উপর আমার লোভ আছে। কেহ জানিত না তাঁহার কত টাকা আছে। জার্মানীর "মার্কের" দাম পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে এইরূপ একটা গুজব শুনিয়াছিলাম।

সময় সময় অনেক খ্যাতনামা ভারতীয় জেনেভায় আসিতেন। রাষ্ট্রসংঘে যে সব সরকারী চাকুরিয়া শ্রেণীর ভারতীয় আসিতেন, শ্যামজী তাঁহাদের ছায়াও মাড়াইতেন না। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রমিক সভায় অনেক বেসরকারী এমনকি বিখ্যাত কংগ্রেসপন্থী ভারতীয় আসিতেন, শ্যামজী তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে

চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এই সকল ভদ্রলোক তাঁহাকে দেখিলে অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া যাইতেন এবং অস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহিত মেলামেশা এড়াইয়া চলিতেন। পারতপক্ষে গোপনে ছাড়া দেখা করিতে চাহিতেন না। তাঁহার সহিত মেলামেশা অনেকেই খুব নিরাপদ মনে করিতেন না।

কাজেই সন্তানসন্ততি আত্মীয় বন্ধুহীন এমন কি প্রায় মনুষ্যসংসর্গ বর্জিত-ভাবে শ্যামজী ও তাঁহার পত্নী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেন। তিনি যেন অতীতের স্মৃতিচিহ্ন, তাঁহার দিন ফুরাইবার পরও যেন বাঁচিয়া আছেন। বর্তমানের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই এবং জগৎ যেন তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছে। এখনও তাঁহার চক্ষুতে সেই পূর্বেকার অগ্নির জ্বালা এবং আমার ও তাঁহার মধ্যে [illegible]ের অভাব সত্ত্বেও আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া পারিলাম না।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাঠ করিয়াছি এবং তাঁহার অল্পদিন পরেই তাঁহার আজীবনের প্রধান সঙ্গিনী সেই মহিয়সী গুজরাটী মহিলারও মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছি। সংবাদে প্রকাশ যে, তিনি বিদেশে ভারতীয় মহিলাদের শিক্ষার জন্য প্রচুর টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি—যাঁহার নাম আমি বহুকাল যাবৎ জানি, সেই রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সহিত সুইজারল্যাণ্ডে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিল। তাঁহাকে তখন দেখিলাম (সম্ভবতঃ এখনও) একজন সদানন্দময় আশাবাদী, বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হইয়া তিনি এক ভাবরাজ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি প্রথমতঃ অবাক হইলাম। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ তিব্বতের মালভূমি অথবা সাইবেরিয়ার উপযুক্ত; কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই মন্ট্রোর মত স্থানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাঁহার পোষাক অর্ধসামরিক, পায়ে রুশীয় বুট জুতা এবং তাঁহার সর্বাঙ্গে কাগজপত্র ও ফটো বোঝাই বড় বড় পকেট। তাহার মধ্যে জার্মাণ চ্যান্সেলার বেথম্যান হলওয়েগের লেখা একখানা চিঠি, কাইজারের নিজের নাম দস্তখত করা একখানা ছবি, তিব্বতের দালাইলামার নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানি সুন্দর রেশমী কাপড়ে লেখা জড়ান পত্র এবং অসংখ্য দলিল দস্তাবেজ, ছবি রহিয়াছে। এই সকল পকেটের বিচিত্র কাগজপত্র দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। তিনি বলিলেন, একবার চীনদেশে মূল্যবান কাগজপত্রসহ তাঁহার একটি হাতবাক্স হারাইয়া গিয়াছিল, সেই হইতে তিনি কাগজগুলি সর্বদা কাছে রাখাই সঙ্গত মনে করেন। এতগুলি পকেটের কারণ তাহাই।

মহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁহার জাপান, চীন, তিব্বত ও আফগানিস্থানের ভ্রমণ ও অপূর্ব অভিজ্ঞতার অনেক ভাল ভাল গল্প বলিতে পারেন। তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবন-কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় মনোহর। বর্তমানে তিনি "হ্যাপিনেস সোসাইটি" বা সুখসন্ধানক সমিতি লইয়া মাতিয়া আছেন। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা তিনি স্বয়ং এবং ইহার বাণী হইল "সুখী হও"। তাঁহার এই সমিতি লাটভিয়ার (অথবা লিথুয়ানিয়ার) সর্বাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে।

তাঁহার প্রচারকার্যের ধারা এইরূপ, মাসে মাসে তিনি তাঁহার বাণী পোস্টকার্ডে ছাপাইয়া জেনেভার বিভিন্ন সভাসমিতি উপলক্ষে সমবেত সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করেন। তাঁহার মুদ্রিত বাণীর নীচে তিনি নানা ছাঁদে এক বিশেষ ভঙ্গীতে নিজের নাম দস্তখত করেন। "মহেন্দ্রপ্রতাপের" আদ্যক্ষর মাত্র ব্যবহার করেন এবং তাহার সহিত তাঁহার তিন বিভিন্ন দেশের নাম যোগ করিয়া নিজেকে তাহার প্রতিনিধিরূপে বর্ণনা করেন। তিনি যে আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী, তাহাও বর্ণনা

করিবার জন্য সর্বশেষে লেখেন "মানবজাতির ভৃত্য"। মহেন্দ্রপ্রতাপের সব কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করা কঠিন। তিনি যেন কোন মধ্যযুগীয় উপন্যাসের নায়ক। যেন বিংশ শতাব্দীতে কোথা হইতে ছিট্‌কাইয়া এক ডনকুইক্সোট আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে সরল এবং তাঁহার আবেগ অকৃত্রিম।

প্যারিতে আমরা উগ্রস্বভাবা এবং ভয়ঙ্করী মাদাম কামার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি সোজাসুজি আসিয়া মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়াই পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। উত্তর দিলেও কোন ফল হয় না (সম্ভবতঃ তিনি বদ্ধ কালা); কেননা কোন প্রমাণেই তাঁহার নিজের বদ্ধমূল ধারণা তিনি ত্যাগ করেন না।

ইতালীতে কিয়ৎকালের জন্য আমার মৌলবী ওবেইদুল্লার সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি চালাক-চতুর এবং প্রাচীন ধরণের রাজনৈতিক কলাকৌশলে সুপটু; কিন্তু আধুনিক ভাবধারার সহিত তাঁহার কোন পরিচয় নাই। তিনি আমাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের (ইউনাইটেড রিপাব্লিকস্ অব্ ইণ্ডিয়া) একটা পরিকল্পনা দেখাইয়া বলিলেন, ইহা দ্বারাই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। তিনি আমাকে ইস্তাম্বুলে (কনষ্টান্টিনোপল) তাঁহার অতীত কার্যকলাপের কথা বলিলেন। আমার নিকট সেগুলি খুব গুরুতর বলিয়া মনে হয় নাই এবং সেগুলি আমি অল্পকাল পরেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কয়েক মাস পরেই লালাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাঁহার নিকটও তিনি এসব গল্প করেন। লালাজী তাঁহার কথায় অত্যন্ত মুগ্ধ হন। সেই সকল গল্পই নানা অযৌক্তিক ও আশ্চর্যরূপে পল্লবিত হইয়া সেই বৎসরের ভারতীয় আইন সভার নির্বাচনে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে মৌলবী ওবেইদুল্লা হেজাজে যান। তাহার পর আর কয়েক বৎসর আমি তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই।

সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের আর একজন মৌলবী—বরকতুল্লার সহিত আমার বার্লিনে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই হাসিখুশী বৃদ্ধ মহা উৎসাহী এবং অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির। তিনি সাদাসিদে, খুব বেশী বুদ্ধিমান নহেন কিন্তু সমসাময়িক জগতের নবীন ভাবধারা বুঝিবার জন্য সর্বদাই চেষ্টিত। আমরা সুইজারল্যান্ডে থাকিতেই ১৯২৭ সালে সানফ্রান্সিসকোতে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম।

বার্লিনে আরও অনেক ভারতীয় ছিলেন। যুদ্ধের সময় ইহাদের একটি দল ছিল; কিন্তু সে দল বহুদিন পূর্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা প্রত্যেকে অপরকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিতেন এবং এই কারণে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। সর্বত্রই রাজনৈতিক নির্বাসিতের ভাগ্যে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বার্লিনে এই সকল ভারতীয় মধ্যশ্রেণীর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বসবাস করিতেছেন। মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে ইঁহাদের কখনও কাজ জোটে, কখনও জোটে না। যাহাই হউক, তাঁহাদের আর বৈপ্লবিক আগ্রহ নাই। এমন কি, তাঁহারা রাজনীতি এড়াইয়া চলেন।

যুদ্ধের সময় এই ভারতীয় পুরাতন দলের কাহিনী অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। ১৯১৪ সালের সেই চিরস্মরণীয় গ্রীষ্মকালে ইঁহারা জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা জার্মান ছাত্রদের সহিত একই জীবন যাপন করিতেন, তাঁহাদের সঙ্গীত গাহিতেন, তাঁহাদের খেলাধুলার যোগ দিতেন, তাঁহাদের সহিত বীয়র মদ্য পান করিতেন এবং জার্মান সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতেন। যুদ্ধের সহিত তাঁহাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না;

কিন্তু সমগ্র জার্মানব্যাপী জাতীয় ভাবের তীব্র উচ্ছ্বাসের স্রোতে তাঁহারা ভাসিয়া গেলেন। তাঁহারা আসলে জার্মানীর পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহাদের মনের ভাব ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী এবং ভারতীয় জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা ব্রিটেনের শত্রুদের প্রতি অনুকূল হইয়াছিলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন কতিপয় ভারতীয় সুইজারল্যাণ্ড হইতে জার্মানীতে আসিয়াছিলেন। ইঁহারা একটি সমিতি গঠন করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে হরদয়ালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কয়েক মাস পরে হরদয়াল আসিলেন এবং ইতিমধ্যে সমিতি বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ভারতীয়দের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবকে নিজেদের সুবিধাজনক কাজে লাগাইবার জন্য জার্মান গভর্ণমেণ্টই এই সমিতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। ভারতীয়েরা এই আন্তর্জাতিক অবস্থার সুযোগে কেবলমাত্র জার্মানীর সুবিধার জন্য কাজ না করিয়া নিজেদের জাতীয় সুবিধাও অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যদিও এই ব্যাপারে তাঁহাদের নিজস্ব বিশেষ স্বাধীনতা ছিল না, তবুও জার্মান কর্তৃপক্ষের গরজ দেখিয়া একটা বিধিব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জার্মানীর নিকট ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি এবং পাকা কথা চাহিলেন। জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগের সহিত তাঁহাদের একটা সন্ধি হইয়া গেল। স্থির হইল, জয়লাভের পর জার্মানী ভারতের স্বাধীনতা মানিয়া লইবে এবং (আরও কতকগুলি ছোটখাট সর্তে) ভারতীয়েরা ইহার বিনিময়ে যুদ্ধের সময় জার্মানীকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই ভারতীয় সমিতির সহিত জার্মান কর্তৃপক্ষ সম্মানজনক ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং সমিতির সদস্যরা বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা পাইতে লাগিলেন।

অনভিজ্ঞ যুবকদল-গঠিত এই সমিতির অপ্রত্যাশিত সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় অনেকেরই মাথা গরম হইয়া উঠিল। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, তাঁহারা যেন ঐতিহাসিক ঘটনার নায়করূপে এক যুগান্তকারী মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। ইঁহাদের অনেকে অসমসাহসিক কার্য করিয়াছেন, অনেকের জীবন বিপন্ন হইয়াছে, অল্পের জন্য মৃত্যুর কবল হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে ইঁহাদের গুরুত্ব কমিয়া গেল এবং পরে কেহ ইঁহাদের প্রায় গ্রাহ্যই করিত না। আমেরিকা হইতে আগত হরদয়াল অনেক পূর্বেই পরিত্যক্ত হইলেন। সমিতির সহিত তাঁহার বনিবনাও হইল না। সমিতি এবং জার্মান গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। বহুকাল পরে আমি ১৯২৬-২৭ সালে ইউরোপে গিয়া দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছি যে, তখনও ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয়েরা হরদয়ালের প্রতি কি পরিমাণ বিরক্তি ও ঘৃণা পোষণ করেন। তিনি তখন সুইডেনে ছিলেন। আমার সহিত তাঁহার দেখা হয় নাই।

যুদ্ধ শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বার্লিনের ভারতীয় কমিটিরও পরমায়ু ফুরাইল। আশাভঙ্গজনিত মনোবেদনায় তাঁহাদের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল। বৃহৎ পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহারা হারিয়া গেলেন। যুদ্ধের সময় তাঁহাদের গুরুত্ব এবং দুঃসাহসী কার্যকলাপের অবসানে দৈনন্দিন বৈচিত্র্যহীন জীবন ছাড়া আর কিছুই রহিল না। কিন্তু নিরাপদভাবে তাহা নির্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠিল। তাঁহাদের পক্ষে ভারতে ফিরিয়া আসাও কঠিন, অন্যদিকে যুদ্ধের পর পরাজিত জার্মানীতে বাস করাও সহজ নহে। জীবনসংগ্রাম অত্যন্ত কঠিন। কয়েকজনকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে ফিরিতে দিলেন, বাকী আর সকলকেই জার্মানীতে বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল। তাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাঁহারা দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রেরই নাগরিক নহেন। তাঁহাদের বৈধ ছাড়পত্র নাই। জার্মানীর বাহিরে ভ্রমণ করা

তাঁহাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। জার্মানীতে বাস করাও নানা কারণে বিঘ্নবহুল এবং তাহাও স্থানীয় পুলিশের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া। জীবনের এই দুঃখ কষ্ট, প্রতিদিনের দুশ্চিন্তা এবং আহার বাসস্থানের জন্যও অবিরত উৎকণ্ঠা, ইহাই তাঁহাদের ভাগ্য হইল।

১৯৩৩-এর পর তাঁহারা যদি নাৎসী নীতি অবলম্বন না করিয়া থাকেন তাহা হইলে নাৎসীরাজ্যে তাঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। "নরডিক" শ্রেণীর আর্য নহে, বিশেষতঃ এসিয়াবাসী বিদেশীরা বর্তমান জার্মানীতে অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি। ভাল ব্যবহার করিলে লোকে তাঁহাদিগকে সহ্য করে মাত্র। হিটলার ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন সমর্থন করিয়া স্পষ্টভাবে অভিমত ঘোষণা করিয়াছেন, কেন না, তিনি ব্রিটেনের সদিচ্ছা লাভ করিতে চাহেন। যে সকল ভারতবাসীর উপর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই তিনি উৎসাহ দিবেন না।

পূর্বোক্ত ভারতীয় সমিতির বিশিষ্ট সদস্য চম্পকরমণ পিল্লের সহিত আমাদের বার্লিনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন এবং যুবক ভারতীয় ছাত্রেরা তাঁহাকে এক অশ্রদ্ধাপূর্ণ উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কিছুই বুঝিতেন না। সামাজিক বা অর্থনৈতিক দিক হইতে কোন প্রশ্ন আলোচনা করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন। জার্মান জাতীয়তাবাদী "লৌহশিরস্ত্রাণ" দলের সহিত তিনি বেশ ভাব করিয়া লইয়াছিলেন। জার্মানীতে যে কয়জন ভারতীয়কে নাৎসীরা পছন্দ করিতেন, তিনি তাঁহাদের একজন ছিলেন। কয়েকমাস পূর্বে জেলে থাকিতেই বার্লিনে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আমি পাঠ করি।

ভারতে এক বিখ্যাত বংশের সন্তান বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের মানুষ। তাঁহাকে সকলে আদর করিয়া "চট্টো" বলিয়া ডাকিত। তাঁহার যোগ্যতা, কর্মকুশলতা এবং চরিত্রমাধুর্য অনুপম। তিনি সর্বদাই অভাবগ্রস্ত, তাঁহার বসন জীর্ণ, এমনকি এক সন্ধ্যা খাওয়া জোটাও মাঝে মাঝে কঠিন হইত। কিন্তু তথাপি তিনি লঘুচিত্ত এবং পরিহাসরসিক ছিলেন। আমার কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভার্থ গিয়াছিলেন। আমি যখন হ্যারোতে পড়ি তখন তিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন। তিনি আর ভারতবর্ষে ফিরেন নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার চিত্ত দেশের জন্য ব্যাকুল হইত এবং ফিরিয়া আসিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন। তাঁহার পারিবারিক জীবনের সমস্ত বন্ধনই ছিন্ন হইয়াছে এবং ভারতে ফিরিয়া আসিলে তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ ও অসুখী বোধ করিতেন ইহাও নিশ্চিত। কিন্তু দীর্ঘকাল বর্ষের পর বর্ষ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়াও স্বদেশের প্রতি টান সমানই রহিয়া গিয়াছে, কোন নির্বাসিতই মানসিক বিষাদ হইতে পরিত্রাণ পায় না। মাৎসিনি ইহাকে বলিতেন আত্মার ক্ষয়রোগ।

বিদেশে আমি যে সকল ভারতীয় রাজনৈতিক নির্বাসিতের সহিত পরিচিত হইয়াছি, তাঁহাদের বেশীর ভাগের মধ্যেই আমি বিশেষ কোন বিশেষত্ব দেখি নাই। তাঁহাদের স্বার্থত্যাগের প্রতি আমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং তাঁহাদের বর্তমান দুঃখ, বিঘ্ন, বাধার প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি রহিয়াছে। তাঁহারা সারা জগতে ছড়াইয়া আছেন, আমার সহিত অল্প কয়েকজনেরই দেখা হইয়াছে। খ্যাতিমান দুই-চারিজন ছাড়া বাকবাকী অন্যান্য অনেকে যে ভারতবর্ষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই ভারতবর্ষই তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে। যে কয়েকজনের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে মাত্র দুইজনের দুর্দম দীপ্তিই আমার মনে রেখাপাত করিয়াছে। এক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অপর মানবেন্দ্রনাথ রায়। রায়ের সহিত মস্কোতে আমার মাত্র আধ ঘণ্টা আলাপ হয়। তিনি তখন কম্যুনিস্ট দলের

একজন নেতা ছিলেন। পরে তাঁহার কম্যুনিজম গোঁড়া কমিনটার্ণ মার্কার কম্যুনিজম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যায়। আমার বিশ্বাস, চট্টো পুরাপুরি কম্যুনিস্ট ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার কম্যুনিজমের দিকে ঝোঁক ছিল। রায় বর্তমানে তিন বৎসর হইল ভারতীয় কারাগারে আছেন।

ইউরোপে আরও অনেক ভারতীয় ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহারা বৈপ্লবিক ভাষায় কথা বলেন, অসমসাহসিক ও অবাস্তব প্রস্তাব করেন এবং আশ্চর্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। দেখিলে মনে হয়, তাঁহাদের উপর ব্রিটিশ গোয়েন্দা-বিভাগের ছাপ পড়িয়াছে।

আমরা অনেক ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানের সহিতও দেখা করিয়াছি। জেনেভা হইতে ভেলেনিউভের ওল্গা ভিলায় আমরা কয়েকবার (প্রথমবার গান্ধীজীর পরিচয়-পত্র সহ) তীর্থযাত্রীর মত রোমাঁ রোল্যাঁর দর্শন লাভ করিয়াছি। যুবক জার্মান কবি ও নাট্যকার আর্নষ্ট টোলারের স্মৃতি (নাৎসী আমলে তিনি আর জার্মান নহেন) এবং নিউ ইয়র্ক সিভিল লিবার্টি ইউনিয়নের রোজার বল্ডুইনের স্মৃতি ভুলিবার নহে। জেনেভাতে সুলেখক আমেরিকাপ্রবাসী ধনগোপাল মুখার্জীর সহিতও আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ইউরোপে যাইবার পূর্বে ভারতে আমার সহিত অক্সফোর্ড গ্রুপ আন্দোলনের ফ্রাঙ্ক বাকম্যানের সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের আন্দোলন সম্পর্কে কতকগুলি রচনা আমাকে দিয়াছিলেন, আমি সেগুলি পড়িয়া আশ্চর্য হইয়াছিলাম। অকস্মাৎ দীক্ষা গ্রহণ, নিজের অতীত সম্পর্কে অকপট স্বীকারোক্তি এবং একপ্রকার ধর্মসংশ্লিষ্ট পুনরুত্থানবাদী আবহাওয়ার সহিত আধুনিক যুগের স্বাধীন বুদ্ধির সামঞ্জস্য কি করিয়া হয় আমার ধারণায় আসিল না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কি ভাবে এই আশ্চর্য ভাবাবেগে অধীর হইয়া পড়েন, আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমার কৌতূহল বাড়িল। জেনেভায় ফ্রাঙ্ক বাকম্যানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে রুমানিয়ার কোন স্থানে তাঁহাদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আহ্বান করিলেন। দুঃখের কথা এই নূতন ভাববাতিকতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আমার ঘটিল না। আমার কৌতূহল অতৃপ্ত রহিয়া গেল এবং অক্সফোর্ড গ্রুপ আন্দোলনের পরিপুষ্টির কথা আমি যতই পাঠ করি ততই আশ্চর্য হই।

২২

ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক

আমাদের সুইজারল্যাণ্ডে আগমনের কিছুদিন পরেই ইংলণ্ডে সাধারণ ধর্মঘট আরম্ভ হইল। আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। আমার স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল ধর্মঘটীদিগের প্রতি। অল্পদিন পরে ধর্মঘট ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এই সংবাদে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইলাম। কয়েক মাস পরে আমি ইংলণ্ডে গিয়া কিছুদিন ছিলাম। খনির শ্রমিকদের ধর্মঘট তখনও চলিতেছিল। রাত্রে লণ্ডন সহর অর্ধ-আলোকিত হইত। ডার্বিশায়ারের নিকটবর্তী খনি অঞ্চলে আমি অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলাম। আমি দেখিলাম অনাহারক্লিষ্ট নারীদের শুষ্ক মুখে বেদনার চিহ্ন, তাহাদের সর্বাঙ্গে শ্রীহীনতার ছাপ। অবশেষে মর্মান্তিক দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইল, স্থানীয় বিচার আদালতে, সেখানে ধর্মঘটী ও তাহাদের পত্নীদের বিচার

চলিতেছিল। কয়লার খনির ডাইরেক্টার এবং ম্যানেজারেরাই এখানে ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁহারাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধে জরুরী আইন অনুসারে বিচার করিয়া ধর্মঘটীদের দণ্ড দিতেছিলেন। একটি বিচার দেখিয়া আমি ক্রুদ্ধ হইলাম। তিনটি কি চারটি স্ত্রীলোককে তাহাদের কোলে সন্তানসহ কাঠগড়ায় হাজির করা হইল। তাহাদের অপরাধ—তাহারা ধর্মঘটবিরোধী শ্রমিকদের ব্যঙ্গ করিয়াছে। এই অল্পবয়স্কা জননীগণ (তাহাদের সন্তানগুলিও) জীর্ণমলিনবসনা এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শীর্ণ। দীর্ঘকালব্যাপী ধর্মঘটের বেদনা ও অভাব অনটনের প্রতিচ্ছবি তাহাদের অবয়বে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে সকল ধর্মঘটবিরোধী শ্রমিক তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে, তাহাদের প্রতি ইহাদের বিরক্তি ও তিক্ততা স্বাভাবিক।

শ্রেণী হিসাবে বিচার-বৈলক্ষণ্যের সংবাদ প্রায়ই পাঠ করা যায় এবং ভারতে ইহা সচরাচর ঘটনা। কিন্তু ইংলণ্ডে যে তাহার কলঙ্কমলিন দৃষ্টান্ত দেখিব এ প্রত্যাশা আমার ছিল না। আমি মর্মাহত হইলাম। আমি আশ্চর্য হইয়া আরও দেখিলাম সর্বত্রই ধর্মঘটীরা যেন ভয়ে আড়ষ্ট। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, পুলিশ ও কর্তৃপক্ষের কঠোর নীতি তাহাদিগকে ভীত করিয়া রাখিয়াছে এবং সকল প্রকার অন্যায় ব্যবহারই তাহারা নীরবে সহ্য করিতেছে। দীর্ঘকাল ধর্মঘটের পর তাহারা শ্রান্ত ক্লান্ত, তাহাদের সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকেরা বহু পূর্বেই তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে। তথাপি দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিকদের সহিত ইহাদের আকাশ পাতাল ব্যবধান। এততেও ব্রিটিশ খনি-শ্রমিকদের সঙ্ঘশক্তি তখনও প্রবল, জাতীয়, এমন কি আন্তর্জাতিক সহানুভূতি তাহাদের পক্ষে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাহায্যে প্রচারকার্য এবং অন্যান্য নানাবিধ সহায়তা তাহারা লাভ করিতেছে। ভারতীয় শ্রমিকেরা এ সকল সুবিধা পায় না। তথাপি চোখে মুখে ভীতির ছাপের দিক দিয়া উভয়ের আশ্চর্য সাদৃশ্য।

এই বৎসর ভারতবর্ষে ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন সভার তৃতীয় বার্ষিক নির্বাচনের ব্যাপার চলিতেছিল। এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল না। কিন্তু তীব্র বাদপ্রতিবাদের খবর সুইজারল্যাণ্ডেও আমার নিকট পৌঁছিত। আমি শুনিলাম, ভূতপূর্ব স্বরাজ্য দল এবং অধুনা কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধতা করিবার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং লালা লাজপৎ রায় এক নূতন দল গঠন করিয়াছেন। ইঁহারা হইলেন জাতীয় দল। আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই, এখনও জানি না নীতিগত কি পার্থক্যের ফলে এই নূতন দল পুরাতন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। অবশ্য ইদানীং আইন সভার দলগুলির মধ্যে নীতিগত কোন পার্থক্য নাই, ইহা একই কথার হেরফের মাত্র! সর্বাগ্রে স্বরাজ্য দলই কাউন্সিলের মধ্যে সংগ্রামশীল শক্তি লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ইঁহারাই অন্যান্য দল অপেক্ষা চরমপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু এই পার্থক্য নীতিগত নহে, কেহ একটু বেশী চরম, কেহ একটু কম।

নূতন জাতীয়দল অনেকাংশে নরমপন্থী এবং স্বরাজ্য দল অপেক্ষা নিঃসন্দেহে দক্ষিণমার্গী। হিন্দু মহাসভার সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করিয়া ইঁহারা কার্য করিতেছিলেন এবং ইহা সম্পূর্ণভাবে একটি হিন্দু দল। পণ্ডিত মালব্যের এই দলের নেতৃত্বের কারণ সহজেই বুঝা যায়, কেন না, ইহা তাঁহার নিজের মতবাদেরই অভিব্যক্তি। যদিও তিনি পুরাতন সাহচর্য রক্ষা করিয়া কংগ্রেসের মধ্যেই ছিলেন তথাপি তাঁহার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী মডারেটদল হইতে বিশেষ পৃথক ছিল না। তিনি অসহযোগ অথবা কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্যপ্রণালীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না এবং কংগ্রেসের নূতন কার্যপ্রণালী গঠনে যোগ দেন নাই। যদিও তিনি

কংগ্রেসে শ্রদ্ধা ও সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিতেন তথাপি নূতন কংগ্রেসের মধ্যে তিনি ছিলেন না। তিনি কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্য হন নাই। তিনি কংগ্রেসের নির্দেশ, বিশেষভাবে আইন সভা সম্পর্কিত নীতি কখনও মানিয়া লন নাই। তিনি হিন্দু মহাসভারও একজন জনপ্রিয় নেতা এবং সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে কংগ্রেসের নীতির সহিত তাঁহার পার্থক্য ছিল। কংগ্রেসের সূচনা হইতে তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া এই প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁহার আবেগময় অনুরাগ ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শবাদও তাঁহাকে আকর্ষণ করিত এবং তিনি জানিতেন যে, কংগ্রেস ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানই এ সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য কার্য করিতেছেন না। এই সকল কারণে তাঁহার হৃদয় সর্বদাই কংগ্রেসপন্থীদের দিকে থাকিত হইত, বিশেষতঃ সংগ্রামের মুহূর্তে তিনি কংগ্রেসের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতেন কিন্তু তাঁহার মস্তিষ্ক থাকিত অন্য দলের সহিত। ইহার অপরিহার্য ফলস্বরূপে তাঁহাকে ক্রমাগত নিজের মনের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় এবং কখনও বা তিনি এই কালে দুই বিপরীত দিকে চলিবার চেষ্টা করেন। তাহার ফলে জনসাধারণের বুদ্ধি ঘুলাইয়া যায়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ একটি আশ্চর্য ধোঁয়াটে পদার্থ এবং মালব্যজী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সহিত সম্পর্কহীন নিছক জাতীয়তাবাদী মাত্র। তিনি কি সামাজিক কি অর্থনৈতিক সকল দিক দিয়াই প্রাচীন সনাতনী শিক্ষা, সংস্কৃতির সমর্থক, এবং ভারতীয় দেশীয় নৃপতি, বড় জমিদার এবং তালুকদারগণ তাঁহাকে একজন সহৃদয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। তিনি কেবলমাত্র একটি পরিবর্তন চাহেন এবং সমস্ত অন্তর দিয়া সেই পরিবর্তন কামনা করেন--ভারতে বৈদেশিক কর্তৃত্বের অবসান হউক। তাঁহার যৌবনের শিক্ষা ও অধ্যয়ন এখনও তাঁহার মনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। তিনি তিন চার সহস্র বৎসরের পুরাতন হিন্দু সংস্কৃতি ও বর্ণাশ্রমধর্মের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া, টি এইচ গ্রীন, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, গ্লাডস্টোন ও মর্লির চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত উনবিংশ শতাব্দীর চশমা দিয়া মহাযুদ্ধের পরবর্তী তীব্র গতিশীল এবং বৈপ্লবিক আবেগময় বিংশশতাব্দীকে নিরীক্ষণ করেন। বহুবিধ স্ববিরোধিতার ইহা আশ্চর্য সম্মেলন; কিন্তু এই সকল বিরোধিতার নিরসন করিবার স্বকীয় শক্তির উপর তাঁহার বিস্ময়কর বিশ্বাস আছে। তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে বহু জনহিতকর কার্য করিয়াছেন, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান তাঁহার সাফল্যের নিদর্শন! তাঁহার অকপট চরিত্র, সতত কর্মপ্রবণতা, অপূর্ব বাগ্মিতা, অমায়িক ব্যবহার, শ্রদ্ধা-উদ্রেককারী ব্যক্তিত্বের ফলে ভারতীয় জনসাধারণের, বিশেষভাবে হিন্দুদিগের নিকট তিনি প্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার সহিত যাঁহাদের মতভেদ আছে, যাঁহারা তাঁহার রাজনীতির অনুগামী নহেন, তাঁহারাও তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভালবাসিয়া থাকেন। তাঁহার বয়ঃক্রম এবং সুদীর্ঘকালের জনসেবার ফলে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতম ব্যক্তি। কিন্তু তবুও যেন মনে হয়, তিনি আজিকার দিনের লোক নহেন, বর্তমান জগতের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছে। তাঁহার কথা সকলেই শ্রদ্ধাবনত শিরে শ্রবণ করে কিন্তু তাঁহার ভাষা ও ভাব আজিকার দিনে অনেকের নিকটেই দুর্বোধ্য।

অতএব মালব্যজী যে স্বরাজ্য দলে যোগদান করিলেন না ইহা স্বাভাবিক। প্রথমতঃ এই দলের অগ্রগামী রাজনীতির বাধা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পক্ষে কংগ্রেসের নিয়মশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা কঠিন। রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িকতার দিক দিয়া তিনি একটু নরম পন্থা এবং নিয়মতন্ত্র পরিধি

চাহিয়াছিলেন। স্বধাপরিতা ও নেতাহিসাবে তিনি ন্তনদলের মধ্যে তাহাই পাইয়াছিলেন।

কিন্তু যদিও লালা লাজপৎ রায় দক্ষিণপন্থী এবং সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার এই ন্তন দলে যোগদানের কারণ অন্মান করা কঠিন। গ্রীষ্মকালে আমার সহিত জেনেভায় লালাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সহিত কথাবার্তা হইতে ব্ঝিতে পারি নাই যে, তিনি কংগ্রেস দলের বির্দ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। ইহা কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল তাহা এখনও আমার নিকট দ্বর্বোধ্য। নির্বাচন য্দ্ধের সময় তিনি এমন কতকগ্লি অভিযোগ আনিয়াছিলেন যাহা হইতে তাঁহার মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কতকটা অন্মান করা যায়। কংগ্রেসের নেতারা ভারতের বাহিরের লোকের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন তিনি এই অপবাদ দিয়াছিলেন। তিনি আরও অভিযোগ আনিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কাব্লে একটি কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। কিন্তু প্নঃ প্নঃ অন্রোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁহার অভিযোগগ্লি বিবরণ দিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন নাই।

আমার মনে আছে, স্ইজারল্যাণ্ডে বসিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রে লালাজীর অভিযোগগ্লি পাঠ করিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে আমি আমাদের প্রতিষ্ঠানের সকল খবরই জানি। কাব্ল কমিটিকে শাখার্পে গ্রহণ করিবার প্রস্তাবের দায়িত্ব আমারই এবং দেশবন্ধ্ দাশও এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। অভিযোগের বিষয়গ্লি প্ঙ্খান্প্ঙ্খর্পে আমি তখনও জানিতাম না, এখনও জানি না। তবে সাধারণভাবে ঐগ্লি বিচার করিয়া আমি বলিতে পারি যে, কংগ্রেসের দিক দিয়া দেখিলে ঐগ্লি ভিত্তিহীন। আমি জানি না, কে লালাজীর মনে ঐর্প ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। হয়তো কতকগ্লি গ্জব তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন অথবা যে মৌলবী ওবেইদ্লার কথায় আমি কোন গ্র্ত্ব আরোপ করি নাই তিনি হয়তো তাঁহার দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্বাচন এক অদ্ভূত দৃশ্য। ইহাতে সাধারণ ভদ্রতার আদর্শ ওলট-পালট হইয়া যায় এবং বিসদৃশ র্চিবিকার উপস্থিত হয়। ইহা আমি যতই দেখিতেছি ততই আশ্চর্য হইতেছি এবং সম্প্র্ণর্পে গণতন্ত্রবিরোধী এক বিতৃষ্ণা আমার মধ্যে বর্ধিত হইতেছে।

কিন্তু ব্যক্তিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও ক্রমবর্ধিত সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের আবহাওয়ায় জাতীয়দল অথবা অন্র্প কোন দলের স্ষ্টি অনিবার্য। একদিকে ম্সলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দ্-ভীতি, অন্যদিকে ম্সলমানদের ভয়প্রদর্শনে (হিন্দ্দের মতে) হিন্দ্দের বিক্ষোভ। অনেক হিন্দ্ ভাবিতে লাগিলেন যে, ম্সলমানেরা জোর করিয়া আদায় করিবার মনোভাব দেখাইতেছেন এবং অন্য পক্ষে যোগ দিব এই ভয় দেখাইয়া বিশেষ স্বিধার ফিকির খ্ঁজিতেছেন। ইহার ফলে ম্সলমান সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী হিন্দ্ সাম্প্রদায়িকতা এবং হিন্দ্ জাতীয়তার প্রতিনিধিস্বর্প হিন্দ্ মহাসভা প্রবল হইয়া উঠিল। মহাসভার আক্রমণম্লক কার্যপদ্ধতির প্রতিক্রিয়ায় ম্সলমান সাম্প্রদায়িকতা পরিপ্ষ্ট হইতে লাগিল এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় দেশের সাম্প্রদায়িক উত্তাপ বর্ধিত হইতে লাগিল। সমস্যা দাঁড়াইল, দেশব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং এক বৃহৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় লইয়া। কিন্তু দেশের সকল অংশের অবস্থা সমান নহে। পাঞ্জাব ও সিন্ধ্দেশে হিন্দ্ ও শিখেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ ও ম্সলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। এখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গ্লি ভারতের অন্যান্য অংশের ম্সলমানদের মতই বৃহৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ

সম্প্রদায় কর্তৃক নির্যাতিত হইবার ভয় করিতে লাগিল। অথবা সত্য কথা বলিলে বলিতে হয়, প্রত্যেক দলের মধ্যশ্রেণীর চাকুরীপ্রার্থীর দল একে অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে এই ভয় করিতে লাগিল এবং কায়েমী স্বার্থের মালিকগণও আমূল পরিবর্তনজনিত ক্ষতির আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

সাম্প্রদায়িকতার অভ্যুত্থানে স্বরাজ্য দল ক্ষতিগ্রস্ত হইল। অনেক মুসলমান সদস্য খসিয়া পড়িয়া সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন। কতক হিন্দু সদস্যও জাতীয় দলে চলিয়া গেলেন। মালব্যজী ও লালা লাজপৎ রায়ের মিলিত শক্তি হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলীর উপর প্রভাব বিস্তার করিল এবং সাম্প্রদায়িকতার জন্মভূমি পাঞ্জাবে লালাজীর অসামান্য প্রভাব ছিল। স্বরাজ্য দল অথবা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নির্বাচন সংগ্রামের দায়িত্বের অধিকাংশই পড়িল আমার পিতার স্কন্ধে। তাঁহার দায়িত্বের অংশ যিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন সেই দাশ মহাশয় তখন পরলোকে। পিতা সংগ্রামপ্রিয় ছিলেন এবং কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। এবং বাধা যতই প্রবল হইল তিনি ততই অধিকতর উৎসাহে নির্বাচনযুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন। তিনি কঠিন আঘাত পাইলেন, প্রতিঘাত করিতেও ইতস্ততঃ করিলেন না। উভয় দলের সংঘর্ষের মধ্যে শালীনতার চিহ্নও রহিল না এবং এই নির্বাচন এক তিক্ত স্মৃতি রাখিয়া গেল।

জাতীয় দল অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিলেন। কিন্তু এই সাফল্যের ফলে ব্যবস্থা পরিষদের মধ্যে রাজনৈতিক উগ্র মত প্রশমিত হইল। দক্ষিণমার্গীরাই বেশী শক্তি লাভ করিলেন। স্বরাজ্য দলও ছিল কংগ্রেসের দক্ষিণমার্গীদল। এবং দলের শক্তিবৃদ্ধি করিতে গিয়া ইঁহারা এমন সব অবাঞ্ছনীয় লোককে দলে প্রবেশ করিতে দিলেন, যাঁহারা দলের যোগ্যতা ও কুশলতার অপহ্নব ঘটাইল। জাতীয় দলেরও অবস্থা প্রায় একই প্রকার, তবে তাঁহারা আরও এক স্তর নীচে নামিয়া গেলেন এবং রাজনীতির সহিত সম্পর্কহীন, খেতাবধারী, জমিদার ও ব্যবসায়ীরা এই দলে ভীড় জমাইলেন।

১৯২৬-এর শেষভাগে এক কলঙ্কমলিন কুকীর্তির সংবাদে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘৃণায় ও লজ্জায় শিহরিয়া উঠিল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বুদ্ধির শোচনীয় অধোগতি এই ঘটনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। রোগশয্যাশায়ী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এক ধর্মান্ধ কর্তৃক নিহত হইলেন। যে ব্যক্তি গুর্খাসৈন্যের উদ্যত রাইফেল ও সঙ্গীনের সম্মুখে অনাবৃত বক্ষ প্রসারিত করিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার এই শোচনীয় পরিণতি! আট বৎসর পূর্বে আর্য সমাজের এই নেতা দিল্লীর জুম্মা মসজিদের বক্তৃতা মঞ্চ হইতে হিন্দু-মুসলমান মিলিত বিশাল জনতাকে ঐক্য ও ভারতের স্বাধীনতার বাণী শুনাইয়াছিলেন এবং উৎসাহ উদ্দীপনায় জনতা হিন্দু-মুসলমানের জয়ধ্বনি করিয়াছিল। তাহারা রাজপথে সেই মিলনের জয়ধ্বনি নিজেদের দেহের রক্তে লিখিয়া দিয়াছিল। আজ তিনি তাঁহার একজন স্বদেশবাসী কর্তৃক নিহত হইলেন! সে মনে করিল এই হত্যা দ্বারা সে ধর্মানুমোদিত কার্যই করিল এবং সে ইহার দ্বারা 'বেহেস্ত' লাভ করিবে।

যে সাহস মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দৈহিক যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যুবরণ করিতে পারে, আমি সর্বদাই সেই সাহসের অনুরাগী। আমার বিশ্বাস, অনেকেই ইহার প্রশংসা করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মধ্যে এক পরমাশ্চর্য নির্ভীকতা ছিল। সন্ন্যাসীর বেশে আবৃত তাঁহার দীর্ঘ সমুন্নত দেহ বার্ধক্যেও যাহা অজু, তাঁহার দীপ্ত চক্ষু, যাহাতে সময় সময় অপরের দৌর্বল্য দেখিলে ক্রোধ ও বিরক্তির ছায়া ভাসিয়া

উঠে—এই চিত্র আমার মানসপটে কত সমুজ্জ্বল এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া কতবার তাহা আমার মনে পড়ে!

২৩

ব্রুসেল্স্-এ নির্যাতিত সম্মেলন

১৯২৬-এর শেষ ভাগে বার্লিন থাকাকালীন আমি শুনিতে পাইলাম যে, শীঘ্রই ব্রুসেল্সে নির্যাতিত জাতিগুলির এক কংগ্রেসের বৈঠক বসিবে। প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগিল। ব্রুসেল্স্ কংগ্রেসে ভারতীয় রাষ্ট্র মহাসভার পক্ষ হইতে সরকারী ভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করা উচিত এই মর্মে আমি ভারতে পত্র লিখিলাম। আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হইল এবং আমি ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলাম।

১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে ব্রুসেল্স্-এ কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার প্রবর্তক কে আমি জানি না। এই কালে সর্বদেশের রাজনৈতিক, নির্যাচিত চরমপন্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল বার্লিন। এ বিষয়ে বার্লিন প্রায় প্যারির সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছিল। কম্যুনিস্টরাও এখানে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। নির্যাতিত জাতিসমূহ নিজেদের মধ্যে এবং বামপন্থী শ্রমিকদের সহিত মিলিত হইয়া এক সাধারণ উদ্দেশ্যে কার্য করিবার কথা তখন আলোচনা করিতেছিল। স্বাধীনতার সর্ববিধ সংঘর্ষ সাম্রাজ্যবাদরূপী এক সাধারণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। অতএব সকলের মিলিতভাবে কার্যপদ্ধতি স্থির এবং সম্ভব হইলে একত্রে কার্য করাই উচিত, এই শ্রেণীর কথা অনেকেই ভাবিতেছিলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি শক্তি যাহাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য আছে, তাহারা এই শ্রেণীর উদ্যমের স্বভাবতঃই বিরোধিতা করিবেন। কিন্তু যুদ্ধের পর জার্মানীর কোন উপনিবেশ না থাকায়, জার্মান গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য শক্তির উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির এই শ্রেণীর আন্দোলনের প্রতি এক সদয় নিরপেক্ষতা দেখাইতেন। এই কারণেই বার্লিন সর্বদেশের অসন্তুষ্ট ও অগ্রগামী দলের কেন্দ্রভূমি হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে চীনের কু-মিন-টাং-এর বামপন্থীরাই খুব বেশী অগ্রগামী এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন; তখন চীনে কু-মিন-টাং-এর দুর্বার অভিযানের সম্মুখে প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এমন কি, সাম্রাজ্যবাদী-শক্তিগুলি তাহাদের আক্রমণশীল অভ্যাস ও স্পর্ধাবাক্য সংযত করিয়া এই অভিনব দৃশ্য দেখিতেছিল। মনে হইতে লাগিল যেন চীনের ঐক্য ও স্বাধীনতার সমস্যার সমাধান আর অধিক দূরে নহে। কু-মিন্-টাং-এর সাফল্যের বার্তা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ইহারা জানিতেন, সম্মুখেও বাধা আছে প্রচুর। এই কারণে শক্তিবৃদ্ধির জন্য ইহারা আন্তর্জাতিক প্রচারকার্যে রত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই দলের বামপন্থীরাই বিদেশের কম্যুনিস্ট কিম্বা কম্যুনিস্টভাবাপন্নদের সহিত সহযোগিতা করিয়া এই আন্দোলনের প্রতি ঝোঁক দিয়াছিলেন। স্বদেশে দলের মধ্যে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি এবং বাহিরে চীনের জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি এই উভয়বিধ লক্ষ্য তাঁহাদের ছিল। দলের মধ্যে তখনও ভেদ দেখা দেয় নাই। দুই কিম্বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী কিম্বা পরস্পর বিরোধী দল তখনও সৃষ্ট হয় নাই, বাহ্যতঃ তাঁহারা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন।

কু-মিন-টাং-এর ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা নির্যাতিত জাতিসমূহের কংগ্রেসের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিলেন। সম্ভবতঃ ইঁহারাই আরও কতিপয় ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া এই কংগ্রেসের ব্যবস্থা করেন। সূচনা হইতেই এই প্রস্তাবের পশ্চাতে কয়েকজন কম্যুনিস্ট অথবা অনুরূপ মতাবলম্বী ব্যক্তি ছিলেন। তবে কম্যুনিস্টরা কখনও মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা পীড়িত লাটিন আমেরিকা হইতেই সাহায্য এবং কার্যকরী সমর্থন আসিল। তখন মেক্সিকোর সভাপতি ছিলেন চরমপন্থী। তাঁহারাও যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী লাটিন আমেরিকান দলের পুরোভাগে আসিবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। অতএব মেক্সিকো ব্রুসেল্‌স্ কংগ্রেস সম্বন্ধে আগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সরকারীভাবে যোগ দিতে না পারিলেও তাহাদের পক্ষ হইতে একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।

জাভা, ইন্দোচীন, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মিশর, উত্তর আফ্রিকার আরবগণ এবং আফ্রিকার নিগ্রোগণের জাতীয় সম্মেলনের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিগণ ব্রুসেল্‌স্-এ উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া, বহু চরমপন্থী শ্রমিকসঙ্ঘের প্রতিনিধি এবং ইউরোপীয় শ্রমিক সংঘর্ষে দীর্ঘকাল নেতৃত্ব করিয়াছেন এমন কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তিও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অনেক কম্যুনিস্টও প্রতিনিধিরূপে আলোচনায় বিশেষভাবে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কম্যুনিস্টরূপে নহে, শ্রমিকসঙ্ঘ বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপেই আসিয়াছিলেন।

জর্জ ল্যান্সবেরী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিভাষণ বেশ আবেগময় হইয়াছিল। এই বক্তৃতা হইতে প্রমাণ হইল যে, কংগ্রেস ততটা চরমপন্থী নহে এবং কম্যুনিজম প্রচারের কৌশলমাত্রও নহে। কিন্তু মোটের উপর সম্মেলন কম্যুনিস্টদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্নই ছিল। যদিও কতকগুলি ব্যাপারে মতের ঐক্য সম্ভবপর হয় নাই তথাপি সম্মিলিতভাবে কার্য করিবার ভূমির অভাব ছিল না।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইতে মিঃ ল্যান্সবেরী স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহার এই হঠকারিতার জন্য পরে তিনি অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ব্রিটিশ শ্রমিকদলের সহকর্মীরাও তাঁহার এই কার্যের অনুমোদন করে নাই। শ্রমিকদল তখন "হিজ ম্যাজেস্টিস্ অপোজিসন্" হইতে "হিজ্ ম্যাজেস্টিস্ গভর্ণমেণ্ট" রূপে ফুটিবার উপক্রম করিতেছেন। এবং ভাবিবার মন্ত্রীদের পক্ষে বৈপ্লবিক রাজনীতি লইয়া আলোচনা নিরাপদ নহে। সময় নাই এই অজুহাত দেখাইয়া তিনি সভাপতির পদত্যাগ করিলেন। এমন কি সঙ্ঘের সদস্যপদও ত্যাগ করিলেন। দুই তিন মাস পূর্বে যাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির এই আকস্মিক মত পরিবর্তনে আমি ব্যথিত হইলাম।

যাহা হউক অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে আইনস্টাইন, মাদাম সান ইয়াৎ সেন এবং আমার মনে হয় রোমাঁ রোলাঁও ছিলেন। কিন্তু পরে প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদী কলহে সঙ্ঘের আরব প্রীতিমূলক কার্যকলাপের সহিত একমত হইতে না পারিয়া কয়েক মাস পরে আইনস্টাইন পদত্যাগ করেন।

ব্রুসেল্‌স্ কংগ্রেস এবং পর পর বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের কার্যকরী অধিবেশন হইতে আমি পরাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির সমস্যা সম্পর্কে অনেক জ্ঞানলাভ করিলাম। পাশ্চাত্য শ্রমিকসঙ্ঘের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও মতবাদ ইহার

মধ্য দিয়া আমি অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে পারিলাম। ইতিপূর্বেও আমি কিছু কিছু জানিতাম এবং পুঁথি-পুস্তকেও কিছু পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার জ্ঞানের পশ্চাতে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল না। এখন এই যোগাযোগের ফলে কোন সমস্যার সম্মুখীন হইলেই আমি বুঝিতে পারি, কোন্ অন্তর্নিহিত সংঘাতের ইহা প্রতিচ্ছবি। শ্রমিকজগতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অপেক্ষা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল। যুদ্ধের পর হইতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যকলাপ দেখিয়া আমি বিতৃষ্ণ ও বিরক্ত হইয়াছিলাম। ইহার সর্বপ্রধান সমর্থক ব্রিটিশ শ্রমিকদের আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে ভারতে আমরা অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিয়াছিলাম। এই কারণে সদিচ্ছা লইয়া আমি অনিবার্যরূপে কম্যুনিজম্-এর দিকে ঝুঁকিলাম। ইহার আর যে দোষই থাক অন্ততঃ ইহার ভণ্ডামি নাই এবং ইহা সাম্রাজ্যবাদী নহে। ইহা মতবাদের অনুবর্তন নহে, কেন না, কম্যুনিজম্-এর সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না। আমি অত্যন্ত সীমাবদ্ধরূপে ইহার মোটামুটি অবয়বের সহিত পরিচিত ছিলাম। ইহা এবং রুশিয়ার অভূতপূর্ব পরিবর্তনের প্রতি আমি আকৃষ্ট হইলাম। কিন্তু কম্যুনিস্টদের মতবাদের গোঁড়ামী, আক্রমণশীল ও কিয়ংপরিমাণে স্থূলরুচির কার্যপ্রণালী এবং কাহারও সহিত মতে না মিলিলেই তাহাকে জাহান্নামে ঠেলিয়া দিবার অভ্যাস দেখিয়া আমি মাঝে মাঝে বিরক্ত হইতাম। আমার মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াকে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার বুর্জোয়া পদ্ধতিতে শিক্ষা ও লালনপালনের ফল বলিয়া অভিহিত করিবেন।

আমাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘের সভাগুলিতে ছোটখাট তর্কবিতর্কে আমি সাধারণতঃ এংলো-আমেরিকান সদস্যদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বসিতাম। ইহা আশ্চর্য মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর কতকটা সাদৃশ্য ছিল। অথবা অতিশয়োক্তিতে ভরা এবং আলঙ্কারিক আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় রচিত প্রস্তাবগুলি যখন প্রায় ঘোষণাপত্রের ন্যায় হইয়া উঠিত তখন আমরা সম্মিলিত ভাবে উহার প্রতিবাদ করিতাম। আমরা সংক্ষিপ্ত ও সরল প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলাম, কিন্তু ইউরোপের প্রচলিত নীতি ঠিক ইহার বিপরীত। কখনও বা কম্যুনিস্টদের সহিত অন্যান্যের মতভেদ উপস্থিত হইত কিন্তু আমরা সহজেই আপোষ করিয়া ফেলিতাম। পরে আমরা দেশে ফিরিয়া আসায় আর এই সব সভায় যোগ দিতে পারি নাই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক বিভাগগুলি ব্রুসেল্স্ কংগ্রেস দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র বিভাগের খ্যাতনামা লেখক আনগুর তাঁহার একখানি পুস্তকে এ বিষয়ে রোমাঞ্চকর এবং হাস্যোদ্দীপক বর্ণনা দিয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্যেও বহু আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ছিল, বিভিন্ন গোয়েন্দাবিভাগ হইতেও অনেকে প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন। একটি কৌতুককর দৃষ্টান্তের কথা আমার মনে আছে। আমার একজন আমেরিকান বন্ধু প্যারী থাকাকালীন ফরাসী গুপ্তচর বিভাগের একজন ফরাসী ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। কতকগুলি বিষয়ে খবর লইবার জন্য বন্ধু-ভাবেই তিনি দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কাজের কথা শেষ হইলে তিনি আমেরিকান ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারেন কি না? পূর্বে তাঁহার সহিত যে দেখা হইয়াছিল তাহা কি স্মরণ আছে? আমেরিকান ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া স্বীকার করিলেন যে, কোন কথাই আমার স্মরণ হইতেছে না। তখন গুপ্তচরটি বলিলেন যে, তিনি হাতে ও মুখে কাল রং মাখিয়া নিগ্রো প্রতিনিধিরূপে ব্রুসেল্স্ কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন এবং

সেইখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

কোলনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘের এক সভায় আমি যোগ দিয়াছিলাম। সভার পর অদূরবর্তী ডুসেলডর্ফে, স্যাক্কো-ভ্যানজিটি সভায় যোগদানের জন্য আমাদের আহ্বান করা হইল। এই সভা হইতে আমরা ফিরিতেছি এমন সময় পুলিশ আমাদের ছাড়পত্র দেখিতে চাহিল। অনেকেরই সঙ্গে ছাড়পত্র ছিল, কিন্তু আমি কয়েক ঘণ্টার জন্য ডুসেলডর্ফে যাইতেছি মনে করিয়া ছাড়পত্রটি কোলনের হোটেলে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। আমাকে পুলিশ-ষ্টেসনে লইয়া যাওয়া হইল। সৌভাগ্যক্রমে এক ইংরাজদম্পতিও আমার সঙ্গে ছিলেন। সম্ভবতঃ ইঁহারাও কোলনে পাসপোর্ট ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। টেলিফোনে খোঁজখবর করার পর এক ঘণ্টা পরে পুলিশের বড় কর্তা সৌজন্যসহকারে আমাদিগকে মুক্তি দিলেন।

পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী-সঙ্ঘ নিজের বৈশিষ্ট্য বজা রাখিয়াও অনেকটা কম্যুনিজম্-এর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। আমার সহিত কেবলমাত্র চিঠিপত্রে ইহার সহিত সম্পর্ক ছিল। ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের সহিত গভর্ণমেণ্টের দিল্লী-চুক্তিতে আমি স্বাক্ষর করায় সঙ্ঘ আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আমার টিকি, মালা, পৈতা কাড়িয়া লইয়া জাতিচ্যুত করিলেন। সাদা কথায়, একটি প্রস্তাব করিয়া আমাকে সঙ্ঘ হইতে বহিস্কৃত করা হইল। একথা স্বীকার করিতে আমার দ্বিধা নাই যে, সঙ্ঘের পক্ষে বিরক্তির কারণ ঘটিয়াছিল। তথাপি ইহারা আমাকে কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ দিতে পারিতেন। ১৯২৭-এর গ্রীষ্মকালে পিতা ইউরোপে আসিলেন, আমি ভিনিসে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাহার পর কয়েকমাস আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম। নভেম্বর মাসে সোভিয়েটের দশমবার্ষিক স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে আমরা সকলে—পিতা, আমার স্ত্রী ও ছোট ভগ্নী মস্কো যাত্রা করিলাম। শেষমুহূর্তে ইহা ঠিক হইল এবং মস্কোতে আমরা মাত্র তিন চার দিন ছিলাম। তবুও আমরা সুখী হইলাম, কেন না এই চোখের দেখাটুকুরও দাম আছে। নূতন রুশিয়া সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার পক্ষে ইহা কিছুই নহে। তবুও রুশিয়া সম্পর্কে কিছু পাঠ করিবার সময় ইহা হইতে সাহায্য পাই। পিতার নিকট সোভিয়েট এবং যৌথ ধারণাগুলি সম্পূর্ণরূপে নূতন। তিনি তাঁহার ব্যবহারশাস্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিকতার কাঠামো হইতে সহজে বাহির হইয়া কিছু দেখিতে পারেন না। তথাপি মস্কোতে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমরা মস্কো থাকিতেই সাইমন কমিশনের কথা প্রথম ঘোষণা করা হইল। মস্কোরই একখানা খবরের কাগজে ঐ সংবাদ আমরা প্রথম পাঠ করি। কয়েকদিন পরে লন্ডনে স্যার জন সাইমনের সহযোগীরূপে পিতা একটি আপীলের মামলায় প্রিভি কাউন্সিলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা একটি পুরাতন জমিদারীঘটিত মামলা। বহুবর্ষপূর্বে ইহার সূচনায় আমি এই মামলার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার আর কোন স্বার্থ ছিল না কিন্তু স্যার জন সাইমনের অনুরোধে পিতার সহিত একবার তাঁহার চেম্বারে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলাম। ১৯২৭ সাল শেষ হইয়া আসিল। আমরা ইউরোপে অনর্থক অনেক সময় নষ্ট করিলাম। পিতা ইউরোপে না আসিলে তো আমরা পূর্বেই ফিরিয়া যাইতাম। ফিরিবার পথে দক্ষিণপূর্ব ইউরোপ, তুরস্ক এবং মিশরে কিছুকাল কাটাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আর সময় করিয়া উঠিতে পারিলাম না। বড়দিনের সময় মাদ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি ফিরিবার সংকল্প করিলাম। ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে আমি স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যাসহ মার্সাই হইতে কলম্বো-

গামী জাহাজে উঠিলাম। পিতা আরও তিন মাসের জন্য ইউরোপে রহিয়া গেলেন।

২৪

ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং রাজনীতিতে যোগদান

মানসিক ও শারীরিক পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া আমি ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করিলেও তাঁহার স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার সম্বন্ধে আমার বিশেষ উৎকণ্ঠা রহিল না। ইতিপূর্বে দ্বিধা-সংশয়ে আমার মনের মধ্যে যে অবস্থা ছিল তাহা দূর হইয়া গেল, আমি নূতন শক্তি ও উদ্দীপনা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার দৃষ্টি অনেক প্রসারিত হইয়াছে এবং জাতীয়তাবাদ আমার নিকট অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ নীতি বলিয়া মনে হইল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, পরশাসন হইতে মুক্তি নিশ্চয়ই বড় কথা, কিন্তু উহার জন্য প্রকৃত পথে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। সামাজিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত কি দেশ কি ব্যক্তিবিশেষ কোনটাই সম্যক পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। আমি অনুভব করিলাম যে, জগতের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে আমার পরিষ্কার ধারণা জন্মিয়াছে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের সমস্যাগুলি আমি অধিকতর আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিয়াছি। আমার অধ্যয়ন কেবল সমসাময়িক ঘটনা ও রাজনীতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমূলক অন্যান্য বিষয়ও অধ্যয়ন করিয়াছি। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিমূলক পরিবর্তন চলিয়াছে তাহা মুগ্ধনেত্রে দেখিবার বস্তু। সোভিয়েট রাশিয়ার কোন কোন অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার থাকিলেও উহা আমাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিল। মনে হইল, ইহা জগতের সম্মুখে এক নূতন আশার বাণী প্রচার করিতেছে। বিংশ দশকের মধ্যভাগে ইউরোপ আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে—বৃহৎ অর্থসঙ্কট তখনও উপস্থিত হয় নাই। আমি এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম যে, আত্মস্থ হইবার চেষ্টা বাহ্য ব্যাপার মাত্র, ভিতরে ভিতরে ইউরোপে ও সমগ্র জগতে ভূমিকম্প ও ভয়াবহ পরিবর্তনের সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

জগতের এই সকল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে আমাদের স্বদেশবাসীকে সুশিক্ষিত করিয়া ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত রাখাই আমাদের আশু কর্তব্য বলিয়া মনে হইল। এই প্রস্তুত করা বহুলাংশে সুস্পষ্ট মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ প্রচারের উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ইহা নিঃসন্দেহ। অস্পষ্ট ও জটিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত। তাহার পর সামাজিক লক্ষ্যও নির্দিষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু এখনই কংগ্রেসের নিকট এই পথে চলিবার দাবী উপস্থিত করা আমার নিকট অত্যধিক প্রত্যাশা বলিয়া মনে হইল। কংগ্রেসী রাজনীতি জাতীয়তাবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ইহা অন্যভাবে চিন্তা করিতে অনভ্যস্ত, তথাপি নূতন সূচনা করিতে হইবে। কংগ্রেসের বাহিরে শ্রমিক মহলে ও যুবকদের মধ্যে এই আদর্শ প্রচার করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে আমি কংগ্রেসের অফিস সংক্রান্ত কার্য হইতে মুক্তি চাহিলাম।

কয়েক মাস পল্লী অঞ্চলে থাকিয়া জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিব এইরূপ একটা ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু তাহা হইল না, ঘটনাচক্রে আমি কংগ্রেসী রাজনীতির আবর্তে ভাসিয়া গেলাম।

মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়াই আমি এক ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব সহ এক গোছা প্রস্তাব আমি ওয়ার্কিং কমিটির দরবারে পেশ করিলাম। যুদ্ধের আশঙ্কা, সাম্রাজ্য-বিরোধী সঙ্ঘের সহিত যোগ স্থাপন প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তাবই কার্যকরী সমিতির সরকারী প্রস্তাব রূপে গৃহীত হইল। আমাকেই ঐগুলি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইল ঐগুলি বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হইল দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইলাম। এমন কি . মিসেস আনি বেশান্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। চারিদিক হইতে এত সমর্থন পাওয়া আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিলাম। মনে হইল, হয় প্রস্তাবগুলিকে বুঝিতে কেহ চেষ্টা করিলেন না, না হয় ভুল বুঝিলেন। কংগ্রেসের পর যখন স্বাধীনতা প্রস্তাব লইয়া বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, তখন ইহা বুঝিলাম।

সাধারণতঃ কংগ্রেসে যে শ্রেণীর প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় আমার প্রস্তাবগুলি অনেকাংশে তাহা হইতে পৃথক ছিল। এগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নূতন। অনেক কংগ্রেসপন্থীই এগুলি পছন্দ করিলেন, অনেকের নিকট ইহা ভাল লাগিল না। কিন্তু কেহই বিশেষ প্রতিবাদ করিলেন না। সম্ভবতঃ তাঁহারা মনে করিলেন, এই প্রস্তাবগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামাত্র এবং ইহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। অতএব ঐগুলি তাড়াতাড়ি পাশ করিয়া দিয়া অন্য গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই ঐগুলি এড়ানর প্রকৃষ্ট পন্থা। স্বাধীনতা প্রস্তাব লইয়া মাদ্রাজে বিশেষ কিছু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু দুই-এক বৎসর পরেই উহা কংগ্রেসে মুখ্য হইয়া উঠিল এবং পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ লইয়া এক উদ্বেল ভাবাবেগ জাগ্রত হইল।

গান্ধিজী মাদ্রাজ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন আলোচনায় যোগ দেন নাই। কার্যকরী সমিতির সদস্য হইলেও তিনি উহার অধিবেশনে যোগ দেন নাই। স্বরাজ্য দলের উদ্ভবের পর হইতে তিনি কংগ্রেসের প্রতি এইরূপে অনাসক্তিই প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সর্বদাই তাঁহার পরামর্শ লওয়া হইত এবং তাঁহার অগোচরে কোন প্রধান কাজ হইত না। আমি যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম, সেগুলি তিনি অনুমোদন করিলেন কি না বুঝিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল, প্রস্তাবগুলির মতামত না হউক, বলিবার ভঙ্গী তাঁহার ভাল লাগে নাই। অবশ্য পরেও তিনি ঐগুলির কোন সমালোচনা করেন নাই। পিতা তখন ইউরোপে ছিলেন, অতএব তাঁহার মতামত জানা গেল না।

সাইমন কমিশনের নিন্দা ও বর্জন করিবার একটি প্রস্তাব কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই উপস্থাপিত হইল এবং উহা আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাধীনতা প্রস্তাবটিকে যে কেহই বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই, তাহা বুঝা গেল। এই প্রস্তাবের পরিশিষ্ট হিসাবে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য এক সর্বদল সম্মিলনীর প্রস্তাব হইল। ঐ প্রস্তাবে স্বাধীনতা যাঁহাদের ধারণার মধ্যে নাই, সেই মডারেটদের সহযোগিতা কামনা করা হইল। অথচ তাঁহারা বড়জোর একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন।

আমি আবার কংগ্রেসের সম্পাদক হইলাম। এই বৎসরের সভাপতি ডাক্তার আনসারীর অনুরোধে ইহা ঘটিল। ডাঃ আনসারী আমার দীর্ঘকালের প্রিয় বন্ধু

তাঁহাকে এড়ান কঠিন। এবং আমার নির্দেশে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাকে কার্যকরী করিতে হইলেও আমার সহযোগিতা আবশ্যক। কিন্তু সর্বদল সম্মিলনীর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় আমার প্রস্তাবগুলির গুরুত্ব অনেকাংশে কমিয়া গেল। সর্বদল সম্মিলনীর মধ্যস্থতায় এবং অন্যান্য কারণে মডারেটদের দিকে ঝুঁকিয়া কংগ্রেস নরমপন্থী হইয়া উঠিতে পারে, এই আশঙ্কা হইতেই আমি বিশেষভাবে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলাম। কংগ্রেস তখন দোটানায় পড়িয়া দোল খাইতেছিল। মডারেটীয় নীতির দিকে কংগ্রেস ঝুঁকিয়া না পড়ে এবং স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্য যাহাতে কংগ্রেস ধরিয়া থাকে, আমি সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

জাতীয় রাষ্ট্র-মহাসভার অধিবেশনের সহিত আনুসঙ্গিক আরও অনেক সভাসমিতি হইয়া থাকে। মাদ্রাজে এই বৎসর প্রথম (এবং শেষ) রিপাবলিক্যান কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। আমাকে সভাপতির পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হইল। আমি নিজেকে একজন রিপাবলিক্যান বলিয়াই মনে করি, প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগিল। কিন্তু এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের আমি চিনি না, তাহার উপর হঠাৎ ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া ওঠা এই শ্রেণীর ব্যাপারের সহিত জড়াইয়া পড়িতে আমার ইচ্ছা ছিল না। ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে আমি সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইলাম; কিন্তু এজন্য আমাকে পরে অনুতাপ করিতে হইয়াছে। অন্যান্য অনেক সমিতির মত রিপাবলিক্যান কনফারেন্সের সূতিকাগারেই মৃত্যু হইল। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি পাইবার জন্য আমি কয়েকমাস নিষ্ফল চেষ্টা করিলাম। আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা উৎসাহের সহিত নূতন কাজ সুরু করে কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহা ছাড়িয়া অন্য কিছু নূতনের সন্ধানে বাহির হয়। আমরা কোন কাজে ধৈর্যের সহিত লাগিয়া থাকিতে পারি না বলিয়া যে অপবাদ আছে, তাহা অনেকাংশে সত্য।

মাদ্রাজ কংগ্রেস অবসান হইবার পূর্বেই দিল্লী হইতে হাকিম আজমল খাঁর মৃত্যুসংবাদ আসিল। তিনি কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি এবং অন্যতম প্রবীণ রাজনৈতিক ছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলীতে তিনি অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন রক্ষণশীলতার মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে কোন আধুনিকতা ছিল না। দিল্লীর মোগল আমলের শিক্ষাসভ্যতায় তিনি ভরপুর ছিলেন। তাঁহার অতিরিক্ত শিষ্টাচার, মন্থর কথা বলিবার ভঙ্গী এবং নিরাভরণ রসিকতায় সকলেই আনন্দিত হইতেন। তাঁহার আচরণ ছিল প্রাচীনকালের অভিজাতদের মত। তাঁহার অবয়বেও মোগল সম্রাটদের প্রতিকৃতির ছাপ ছিল। এই শ্রেণীর মানুষ সচরাচর রাজনীতির বন্ধুর পথে পদার্পণ করেন না। আধুনিক "এজিটেটর"দের জ্বালায় অস্থির হইয়া ইংরাজগণ যে সকল পুরাতন ধরণের মানুষের জন্য বিলাপ করেন তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ। প্রথম জীবনে হাকিম সাহেব রাজনীতির দিকে ঘেঁষেন নাই। তিনি এক বৃহৎ চিকিৎসক পরিবারের কর্তা ছিলেন এবং তাঁহার বহুবিস্তৃত চিকিৎসা ব্যবসায়েই ডুবিয়া থাকিতেন। যুদ্ধের শেষের দিকে তাঁহার পুরাতন বন্ধু ও সহকারী ডাক্তার আনসারীর প্রভাবে তিনি কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হন। পরে পাঞ্জাবে সামরিক আইন ও খিলাফত সমস্যায় বিচলিত হইয়া তিনি গান্ধী নির্দিষ্ট অসহযোগ পদ্ধতি অনুমোদন করিয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসের মধ্যে প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে যোগসূত্ররূপে ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনেক প্রাচীনপন্থী জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক হইয়াছিলেন। এইভাবে উভয়দিকের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি জাতীয়-

দলের অগ্রগামিগণের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। তিনি উভয় সম্প্রদায়েরই সমান শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। গান্ধিজীও তাঁহাকে একজন বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু-মুসলমান ব্যাপারে হাকিম সাহেবের পরামর্শই তিনি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিতেন। আমার পিতা ও হাকিমজীর মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য থাকায় তাঁহাদের মধ্যে এক স্বাভাবিক প্রীতির বন্ধন ছিল।

প্রায় এক বৎসর পূর্বে হিন্দু মহাসভার কোন কোন নেতা আমাকে এই অপবাদ দিয়াছিলেন যে, পারসীক সংস্কৃতির ভিত্তিতে আমার শিক্ষার দোষে হিন্দু মনোভাব সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা গভীর। আমার মধ্যে কি সংস্কৃতি আছে, অথবা আদৌ আছে কি না, বলা আমার পক্ষে কিছু শক্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে পারসীক ভাষা আমি একেবারেই জানি না। তবে আমার পিতা ভারতীয় ও পারসীক সংস্কৃতির মিশ্র আবহাওয়ায় বর্ধিত হইয়াছিলেন, ইহা সত্য। প্রাচীন দিল্লী দরবার হইতে সমগ্র উত্তর ভারতই ইহা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে। এমন কি, এই অধঃপতনের যুগেও দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ এই সংস্কৃতির দুই প্রধান কেন্দ্র। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের আশ্চর্য দক্ষতা ছিল। তাঁহারা যখন ভারতের সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করেন তখন ভারতীয়-পারসীক সংস্কৃতিরই প্রাধান্য ছিল। তাঁহারা উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পারসী ও উর্দুভাষায় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিমান হইয়াছিলেন। তারপর যখন ব্রিটিশ যুগ আসিল তখন তাঁহারা পূর্বের মতই অতি দ্রুত ইংরাজি ভাষা ও ইউরোপীয়ান সভ্যতা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। এখনও ভারতে পারসীক ভাষায় অনেক সুপণ্ডিত রহিয়াছেন—সার তেজবাহাদুর সপ্রু এবং রাজা নরেন্দ্রনাথ এই দুই জনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই কারণে পিতা ও হাকিম সাহেবের মধ্যে অনেক ঐক্য ছিল, এমন কি, অতীতকালে উভয় পরিবারের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহার প্রমাণও তাঁহারা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইয়াছিল এবং তাঁহারা পরস্পরকে 'ভাই সাহেব' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহাদের পারস্পরিক স্নেহবন্ধনের মধ্যে রাজনীতির স্থান অতি অল্পই ছিল। পারিবারিক জীবনে হাকিমজী অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ কিছুতেই প্রাচীন অভ্যাস বর্জন করিতে পারিতেন না। তাঁহার পরিবারের মত পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি আমি আর কোথাও দেখি নাই। অথচ হাকিমজী নিজে বিশ্বাস করিতেন, স্ত্রী-স্বাধীনতা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি অসম্ভব। স্বাধীনতা আন্দোলনে তুর্কী-নারীরা যোগ দেওয়ায় তিনি আমার নিকট তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তুর্কীর নারীদের জন্যই কামাল পাশা সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

হাকিম আজমল খাঁর মৃত্যুতে কংগ্রেস প্রচণ্ড আঘাত পাইল এবং কংগ্রেসের একজন শক্তিশালী সমর্থকের অভাব ঘটিল। ইহার পর দিল্লীতে গেলেই আমরা একটা অভাব বোধ করিয়া থাকি, কেন না, দিল্লীর সহিত হাকিমজী এবং তাঁহার বাল্লীমারান মহল্লার বাড়ীর স্মৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

১৯২৮ সালে রাজনীতির দিক দিয়া বেশ প্রচুর কাজ চলিল। সর্বত্রই নূতন উৎসাহ ও নূতন উদ্দীপনা এবং জনসাধারণের মধ্যে অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হইল। সম্ভবতঃ আমার অনুপস্থিতির সময় ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন আসিয়াছে। আমি ফিরিয়া আসিয়া ইহা লক্ষ করিলাম। ১৯২৮-এর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষ

ছিল নিজীব ও অবসন্ন, সম্ভবতঃ তখনও সে ১৯১৯-২২-এর পরের অবসাদ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ১৯২৮-এর ভারতবর্ষ সতেজ সক্রিয় এবং অবরুদ্ধ শক্তির চেতনায় জাগ্রত। কারখানার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যশ্রেণীর যুবক এবং সাধারণভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়—সকলের মধ্যেই এই নবচেতনার লক্ষণ সুপরিস্ফুট।

ট্রেড্ ইউনিয়ন (শ্রমিক) আন্দোলন বিশেষ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল এবং সাত কি আট বৎসর পূর্বে স্থাপিত নিখিল ভারত ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস ইতিমধ্যে এক শক্তিশালী প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ইহার শাখাপ্রশাখা তো বাড়িয়াছেই, উপরন্তু ইহার মতবাদ ক্রমশঃ সংগ্রামশীল ও চরম হইয়া উঠিতেছে। প্রায়ই ধর্মঘট লাগিয়া আছে এবং শ্রেণীস্বার্থবোধ জাগ্রত হইতেছে। বস্ত্রশিল্প এবং রেলওয়ে শ্রমিকরাই সর্বাপেক্ষা অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল। এবং ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল বোম্বাই গিরনী কামগার ইউনিয়ন ও জি আই পি রেলওয়ে ইউনিয়ন। শ্রমিক সঙ্ঘের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্যরূপে তাহার মধ্যে পাশ্চাত্য হইতে আভ্যন্তরীণ কলহ ও ধ্বংসের বীজও আসিল। ভারতে ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন প্রতিষ্ঠালাভ না করিতে করিতেই ইহার মধ্যে দল ভাঙ্গাভাঙ্গি বিচ্ছেদ প্রতিযোগিতা এবং শত্রুতার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে একদল ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভক্ত, একদল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুরাগী, একদল সংস্কারমূলক নরমপন্থী, অপরদল খোলাখুলি বৈপ্লবিক ও আমূল পরিবর্তনকামী। এই দুই দলের মাঝামাঝি অনেক রকম মতের লোক এবং সুবিধাবাদীরাও ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সকল গণপ্রতিষ্ঠানেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

কৃষক সম্প্রদায়েও চাঞ্চল্য দেখা দিল। যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চলে ঘন ঘন কৃষকদের প্রতিবাদ সভা হইতে লাগিল। নূতন অযোধ্যা প্রজাস্বত্ব আইনে রায়তদের জীবনস্বত্ব ও অন্যান্য যে সকল অধিকার দিবার কথা ছিল, তাহার ফলে কার্যতঃ কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি হইল না। গুজরাটে ভূমিকর বৃদ্ধি লইয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত কৃষকদের সংঘর্ষ ব্যাপকভাবে দেখা দিল। গুজরাটে গভর্ণমেণ্টের সহিত কৃষকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। এই সংঘর্ষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে বারদোলী সত্যাগ্রহরূপে দেখা দিল। এই আন্দোলনের পরিচালন-নৈপুণ্য ভারতবর্ষ প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। বারদোলী কৃষকেরা অনেকাংশে সাফল্যলাভ করিল। এই আন্দোলনে ভারতীয় কৃষকদের মনে যে নূতন আশার সঞ্চার হইল, সর্বাপেক্ষা বড় সাফল্য তাহাই। কৃষকদের দৃষ্টিতে বারদোলী আশা, সঙ্ঘশক্তি এবং সাফল্যের প্রতীক হইয়া উঠিল।

১৯২৮-এর ভারতবর্ষে যুব আন্দোলন একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। দেশের সর্বত্র যুবক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং প্রায়ই নানা স্থানে সম্মেলন হইত। এই সকল যুবক সমিতির মধ্যে নানা মতভেদ ছিল। ধর্ম হইতে বৈপ্লবিক মতবাদ ও পদ্ধতি পর্যন্ত এক এক দলে আলোচিত হইত। ইহাদের উদ্ভব ও কার্যপদ্ধতির পার্থক্য সত্ত্বেও যুবক সম্মেলনগুলিতে সর্বত্রই বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি আলোচিত হইত এবং বর্তমান ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের আগ্রহ বিশেষভাবে দেখা যাইত।

কেবল রাজনীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই বৎসরে সাইমন কমিশন বয়কট এবং সর্বদল সম্মিলনীই প্রধান ঘটনা। কংগ্রেসের বয়কট আন্দোলনে মডারেটগণ যোগ দেওয়ায় ইহা আশ্চর্য সাফল্যলাভ করিল। কমিশন যেখানেই

উপস্থিত হইতেন সেইখানেই বিরূপ অভ্যর্থনার জন্য সমবেত জনতা "গো ব্যাক্ সাইমন" (সাইমন ফিরিয়া যাও) বলিয়া চীৎকার করিত। ইহার ফলে ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে স্যর জন সাইমনের নাম সুপরিচিত হইয়া উঠিল এবং ইংরাজী ভাষার দুইটি শব্দ তাহারা শিখিল। ক্রমাগত ঐ চীৎকার শুনিয়া কমিশনের সদস্যরা নিশ্চয়ই বিরক্তি বোধ করিতেন। তাঁহারা যখন নয়া দিল্লীর ওয়েস্টার্ণ হোটেলে ছিলেন, তখন নৈশ অন্ধকারে ঐ শব্দ ভাসিয়া আসিত, এইরূপ একটা গল্প শুনিয়াছিলাম। রাত্রেও তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ বিদ্রুপাত্মক ধ্বনির ফলে তাঁহারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিতেন। কিন্তু আসলে সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানীর পরিত্যক্ত প্রান্তরবাসী শৃগালের চীৎকারকেই তাঁহারা জনতার ধিক্কার বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন।

সর্বদল সম্মিলনীতে শাসনতন্ত্রের খসড়া করা বিশেষ কঠিন ছিল না। গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টীয় পদ্ধতির শাসনতন্ত্র যে কেহ সহজেই রচনা করিতে পারে। কিন্তু প্রধান বিঘ্ন অর্থাৎ একমাত্র বিঘ্ন দেখা দিল, সম্প্রদায় বা সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যা লইয়া। সম্মেলনে চরম সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও ছিলেন; সকলকে সম্মত করান সুকঠিন হইয়া উঠিল। ইহা যেন সেই পুরাতন ও নিষ্ফল ঐক্য সম্মেলনের পুনরভিনয়। পিতা বসন্তকালে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া উৎসাহের সহিত সম্মেলনে যোগ দিলেন। অবশেষে অন্যপথ না পাইয়া পিতার সভাপতিত্বে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হইল। শাসনতন্ত্র রচনা এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ভার এই কমিটির উপর অর্পিত হইল। এই কমিটি, নেহরু কমিটি এবং ইহার প্রকাশিত সিদ্ধান্ত নেহরু রিপোর্ট রূপে সুপরিচিত হইয়াছিল। স্যর তেজবাহাদুর সপ্রুও এই কমিটির সদস্য ছিলেন এবং রিপোর্টের অংশবিশেষ তাঁহারই রচনা।

আমি এই কমিটির সদস্য ছিলাম না, তবে কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে আমাকে অনেক কিছুই করিতে হইত। কিন্তু যেখানে আসল সমস্যা—ক্ষমতা ও অধিকার—সেখানে কাগজে কলমে শাসনতন্ত্র রচনা নিষ্ফল পণ্ডশ্রম মাত্র, ইহা ভাবিয়া আমি অত্যন্ত বিব্রত হইতাম। তাহার উপর কমিটি, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, এমন কি, কার্যতঃ তাহা হইতেও অনেক কম লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, আমার উহা ভাল বোধ হয় নাই। তবে যদি সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা হয়, এই আশায় আমি কমিটির গুরুত্ব অনুভব করিয়াছিলাম। চুক্তি বা পারস্পরিক সম্মতি দ্বারা এই সমস্যার মীমাংসা আমি কখনও প্রত্যাশা করি নাই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ না করিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর নহে। তবে যদি অধিকাংশ ব্যক্তি সাময়িক ভাবেও কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে বর্তমান অসন্তোষ অনেকাংশে দূরীভূত হইবে এবং অন্যান্য সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর পাওয়া যাইবে, এই কারণে কমিটির কাজে বাধা না দিয়া আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলাম।

সাফল্য যেন মুঠোর মধ্যে আসিয়াছে বলিয়া মনে হইল। দুই তিনটি ব্যাপারের মীমাংসা হইলেই সব চুকিয়া যায়। ইহার মধ্যে পাঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান-শিখ এই ত্রিধা বিভক্ত সমস্যাই হইল প্রধান। কমিটি এক অভিনব উপায়ে এই সমস্যার বিচার করিলেন; তাঁহারা সমগ্রভাবে পাঞ্জাবকে গ্রহণ না করিয়া পূর্ব (হিন্দুপ্রধান), পশ্চিম (মুসলমানপ্রধান) ও উত্তর-পূর্ব (শিখপ্রধান)—এই ভাবে ভাগ করিয়া সংখ্যানুপাতে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। পরস্পরের প্রতি ভয় ও অবিশ্বাস রহিয়াই গেল; আর যতটুকু আশা হইলে

সমস্যা সমাধান হয়, কোন পক্ষই ততটুকু অগ্রসর হইলেন না।

কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিবার জন্য লক্ষ্ণৌ-এ সর্বদল সম্মেলন আহুত হইল। আমাদের মধ্যে অনেকে আবার এক দোটানায় পড়িলাম। আমরা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহি না, কিন্তু অন্য দিকে স্বাধীনতা আদর্শে জলাঞ্জলি দেওয়াও আমাদের পক্ষে কঠিন। আমরা সম্মেলনের নিকট প্রার্থনা করিলাম এ সম্পর্কে প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিবার স্বাধীনতা স্বীকার করা হউক। অর্থাৎ কংগ্রেস তাহার স্বাধীনতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখুক, অন্যান্য মডারেটদল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই আদর্শরূপে গ্রহণ করুন। কিন্তু পিতা রিপোর্ট হইতে একচুলও নড়িতে চাহিলেন না, অবস্থাধীনে তাঁহার পক্ষে উহা সম্ভবও ছিল না। তখন আমরা 'ইণ্ডিপেনডেণ্ট লীগ'-এর পক্ষ হইতে (সম্মেলনে আমাদের সংখ্যা কম ছিল না) এই মর্মে বিবৃতি দিলাম যে, স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষা হীন যে সকল সিদ্ধান্ত হইবে, আমরা তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিব না, তবে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, আমরা সম্মেলনের কার্যে কোন বাধা দিব না, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় বিঘ্ন উৎপাদনের ইচ্ছা আমাদের আদৌ নাই।

এইরূপ প্রধান সমস্যায় এই শ্রেণীর মনোভাব অবশ্য বিশেষ কার্যকরী নয়। ইহা অনেকটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা। আমাদের মনোভাবের কার্যকারিতা দেখাইবার জন্য আমরা সেইদিনই "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ অফ ইণ্ডিয়া" প্রতিষ্ঠা করিলাম।

প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে মূল অধিকার সম্পর্কিত ব্যবস্থায় অযোধ্যার তালুকদারদের অনুরোধে সর্বদল সম্মেলন, তাঁহাদের তালুকের উপর কায়েমী-স্বত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া একটি ধারা জুড়িয়া দিলেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইলাম। অবশ্যই সমস্ত শাসনতন্ত্রই ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তার ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি এই সকল বৃহৎ অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী-গুলির উপর ব্যক্তিগত অধিকার অব্যাহত ভাবে শাসনতন্ত্রে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল, ইহা আমার নিকট অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। স্পষ্ট বুঝা গেল যে, কংগ্রেসের নেতারা (অকংগ্রেসীরা তো বটেই) তাঁহাদের দলের অগ্রগামী অংশ অপেক্ষা বড় বড় ভূম্যধিকারীদের সাহচর্যই কামনা করেন। আমাদের অধিকাংশ নেতার সহিত আমাদের ব্যবধান যে কত বেশী তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। এবং এই অবস্থায় আমার পক্ষে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করা অযৌক্তিক মনে হইল। "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগের" অন্যতম সভাপতিরূপে বলিয়া আমি পদত্যাগ করিতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু কার্যকরী সমিতি ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা আমাকে এবং সুভাষ বসুকে (ইনিও এই কারণে পদত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন) বলিলেন যে, আমরা লীগের কাজ চালাইলেও তাহার সহিত কংগ্রেস-কার্যের কোন সংঘর্ষের সম্ভাবনা নাই। অবশ্য কংগ্রেস ইতিপূর্বে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির অনুরোধে আমি আবার স্বীকৃত হইলাম। আমাকে বুঝাইয়া পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করান কত সোজা তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য হই। অনেকবার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। আসলে কোন পক্ষই বিচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। এবং আমরা নানা ছলনায় বিচ্ছেদকে এড়াইয়া গিয়াছি।

গান্ধিজী সর্বদল সম্মেলন অথবা কমিটি মিটিং-এ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, লক্ষ্ণৌ সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না।

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাতে

কৃষ্ণপতাকা ও বিপুল জনতার "গো-ব্যাক" ধ্বনি সমভাবেই চলিয়াছে। স্থানে স্থানে পুলিশের সহিত জনতার ছোটখাট সংঘর্ষ বাধিতেছিল। লাহোরে এই ঘটনা চরমে উঠিল এবং সহসা সে সংবাদে সমগ্র দেশ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সাইমন কমিশন-বিরোধী—সহস্র সহস্র নরনারীর জনতার পুরোভাগে রাস্তার ধারে লালা লাজপৎ রায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। জনৈক যুবক ইংরাজ পুলিশ কর্মচারী সকলের সম্মুখে তাঁহাকে প্রহার করে এবং তাঁহার বক্ষে বেটন্ দিয়া আঘাত করে। লালাজী তো নহেনই, জনতাও কোন হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন করে নাই। এমন কি, তিনি এবং তাঁহার বহু সঙ্গী শান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলেও পুলিশ কর্তৃক ভীষণভাবে প্রহৃত হইলেন। যদিও আমাদের মিছিলগুলি সংঘতোভাবে শান্তিপূর্ণ, তথাপি রাজপথে মিছিল পরিচালনকালে পুলিশের সহিত সংঘর্ষের আশঙ্কা সর্বদাই থাকে। লালাজী ইহা জানিতেন এবং সেজন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তথাপি অনাবশ্যক পাশবিক উপায়ে এই লাঞ্ছনার বিবরণ শুনিয়া ভারতবর্ষের বিশাল জনসঙ্ঘ বিক্ষুব্ধ হইল। তখন, আমরা পুলিশের লাঠি চালনায় অভ্যস্ত হইয়া উঠি নাই। এবং আমাদের আত্মাভিমানের তীক্ষ্ণতা তখনও পুনঃ পুনঃ পাশবিক অত্যাচারে ভোঁতা হইয়া যায় নাই। আমাদের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এবং পাঞ্জাবের প্রধানতম ও জনপ্রিয় নেতার প্রতি এই শ্রেণীর দানবীয় ব্যবহারে সমগ্র দেশে, বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে, এক নিস্তব্ধ ক্রোধ ছড়াইয়া পড়িল। আমরা কত অসহায়, কত নীচ যে আমাদের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতাকেও রক্ষা করিতে পারি না!

লালাজী দীর্ঘকাল হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন, তাহার উপর বুকের এই আঘাতে তাঁহার দৈহিক অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। সম্ভবতঃ একজন সুস্থকায় যুবকের পক্ষে এই আঘাত তেমন মারাত্মক হইত না। কিন্তু লালাজী যুবকও নহেন, সুস্থকায়ও নহেন। কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁহার মৃত্যুর সহিত এই আঘাতের সম্পর্ক কতখানি তাহা বলা কঠিন। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলিয়াছিলেন, ইহার ফলে তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছিল। কিন্তু আমার মতে দৈহিক আঘাতের সহিত মানসিকযন্ত্রণায় লালাজী অধিকতর মর্মবেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত অপমান অপেক্ষা এই প্রহারকে জাতীয় অবমাননারূপে গ্রহণ করিয়া তিনি অত্যন্ত তিক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

এই জাতীয় অবমাননা ভারতবর্ষের বুকে দুর্বহ বোঝার মত চাপিয়া বসিল। তাহার পরেই লালাজীর মৃত্যুসংবাদ অপরিহার্যরূপে ঐ প্রহারের বেদনার সহিত যুক্ত হইয়া দুঃখকে ক্রোধ ও ঘৃণায় পরিণত করিল। ইহা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেই আমরা পরবর্তী ঘটনাগুলির মর্মগ্রহণে সক্ষম হইব। ভগৎ সিং-এর আবির্ভাব এবং উত্তর ভারতে তাঁহার সহসা বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা আমরা দেখিয়াছি। অন্তর্নিহিত মূল কারণগুলি এবং ঘটনা-পরম্পরা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া কোন কার্য অথবা ব্যক্তির নিন্দা করা অতি সহজ। ভগৎ সিংকে পূর্বে কেহ জানিত না, তাঁহার জনপ্রিয়তার কারণ হিংসাত্মক কার্য অথবা "টেররিজম্"-এর জন্য নহে। টেররিস্টরা গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কোন না কোন আকারে ভারতবর্ষে আছে। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে প্রথম সূচনার কথা ছাড়িয়া দিলে আর কেহ ভগৎ সিং-এর শতাংশের এক অংশও জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য, ইহাকে অস্বীকার না করিয়া স্বীকারই করিতে হয়, এবং আরও একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, মাঝে মাঝে টেররিজম্ মাথা চাড়া দিয়া উঠিলেও ইহাতে জাতীয় বুকে সত্যকারের আর কোন বাস্তব আকর্ষণ ছিল না। পাঞ্জাব তখন

অশ্রান্ত অহিংসা প্রচারের ফলে ভারতবর্ষের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, এবং রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে টেরোরিজম্-এর প্রতি জনসাধারণ অধিকতর উদাসীন, এমন কি বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন। সাধারণতঃ যে সকল শ্রেণী হইতে টেরোরিস্ট সংগ্রহ করা হয় সেই নিম্ন-মধ্যশ্রেণী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় হিংসামূলক উপায়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রবল প্রচারকার্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। এই দলের অধীন কর্মীরা, যাঁহারা বৈপ্লবিক কার্যপদ্ধতির বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহারাও এখন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতেছেন যে, টেরোরিজম্ দ্বারা বিপ্লব আসিতে পারে না; "টেরোরিজিম্" এক জরাজীর্ণ নিষ্ফল উপায় মাত্র এবং উহা প্রকৃত বৈপ্লবিক কার্যপদ্ধতির পথে বিঘ্নস্বরূপ। ভারতে ও অন্যান্য স্থানে "টেরোরিজম্" আজকাল মরণোন্মুখ। ইহা অবশ্যই গভর্ণমেণ্টের দমননীতির ফল নহে। দমননীতি বড়জোর উহাকে চাপিয়া রাখিয়া কিম্বা নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিতে পারে কিন্তু উৎখাত করিতে পারে না। জাগতিক ঘটনাপ্রবাহের মূল কারণ হইতেই "টেরোরিজম্" মরিতেছে। "টেরোরিজম্" সাধারণতঃ কোন দেশের বৈপ্লবিক আগ্রহের শৈশবকাল সূচনা করে। এই স্তর উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান বাহ্যলক্ষণ হিসাবে "টেরোরিজম্"ও অন্তর্হিত হয়। স্থানীয় কারণ অথবা ব্যক্তিগত আক্রোশ হইতে মাঝে মাঝে ইহা ঘটিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে এই স্তর অতিক্রম করিয়াছে এবং আকস্মিক ঘটনার অভিব্যক্তিও যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, ভারতের সমস্ত অধিবাসী হিংসামূলক উপায়ের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। ব্যক্তিগত হিংসামূলক কার্য বা টেরোরিজমের উপর আস্থা অনেকেরই নাই, কিন্তু অধিকাংশ লোক ভাবেন যে, এমন এক সময় আসিবে যখন স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংঘবদ্ধ সঙ্ঘর্ষের প্রয়োজন হইবে, যেমন অন্যান্য দেশে হইয়াছে। অবশ্য অদ্যকার দিনে ইহা কথার কথা মাত্র, কালই তাহার একমাত্র পরীক্ষক, তবে টেরোরিস্টদের পদ্ধতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। অতএব ভগৎ সিং তাঁহার হিংসামূলক কার্যের জন্য জনপ্রিয় হন নাই, সেই মুহূর্তে তিনি লালা লাজপৎ রায়ের এবং জাতীয় সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, জনসাধারণ ইহাই মনে করিতে লাগিল। লোকের নিকট তিনি একটি প্রতীকরূপে প্রতিভাত হইলেন। তাঁহার কাজ লোকে ভুলিয়া গেল। এবং কয়েক মাসের মধ্যে পাঞ্জাবের প্রতি পল্লী-নগর এবং কিয়দংশে উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চলেও তাঁহার নাম ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার নামে অসংখ্য সঙ্গীত রচিত হইল এবং তিনি আশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ করিলেন।

সাইমন কমিশন উপলক্ষ্যে প্রহারের কিছু পরে লালা লাজপৎ রায় দিল্লীতে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির একটি অধিবেশনে যোগ দেন। তাঁহার দেহে তখনও আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং তিনি তখনও ভুগিতেছিলেন। লক্ষ্ণৌ সর্বদল সম্মেলনের পর এই অধিবেশনে কোন না কোন আকারে স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আমার ঠিক ভাল করিয়া মনে নাই, তবে স্মরণ হয় ঐ বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম যে, এমন একটা সময় আসিয়াছে যখন কংগ্রেসকে দুইটার একটা বাছিয়া লইতে হইবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনমূলক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী অথবা সংস্কারকামীর উদ্দেশ্য ও উপায়—এই দুই পথ। এই বক্তৃতার কোন গুরুত্ব ছিল না, হয় তো আমি ইহা ভুলিয়াই যাইতাম। কিন্তু লালাজী ইহার কোন অংশ সমালোচনা করায় উহা মনে আছে। তিনি আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিলেন যে, আমরা যেন ব্রিটিশ শ্রমিকদলের নিকট কিছু প্রত্যাশা না করি। অন্ততঃ আমার নিকট এই সাবধান-বাণীর কোন প্রয়োজন ছিল না, কেন না, আমি কোন

দিনই ব্রিটিশ শ্রমিকদলের সরকারী নেতাদের অনুরাগী নহি। তাঁহারা যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করিতেন, কিম্বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কার্য অথবা সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেন তাহা হইলেই আমি আশ্চর্য হইতাম।

লাহোরে ফিরিয়া গিয়া লালাজী আমার বক্তৃতার বিভিন্ন বিষয় লইয়া তাঁহার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি পীপল'-এ ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার অসমাপ্ত সর্বশেষ প্রবন্ধ এবং আমি বিষাদময় আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিয়াছিলাম।

২৫

ষষ্টি সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা

লালা লাজপৎ রায়ের লাঞ্ছনা ও তাঁহার মৃত্যুর পর, সাইমন কমিশন যেখানেই যাইতে লাগিলেন, বিরূপ অভ্যর্থনা অধিকতর প্রবল হইল। লক্ষ্ণৌ-এ কমিশন আসিবার পূর্ব হইতেই স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি "অভ্যর্থনার" জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই বড় বড় মিছিল, সভা প্রভৃতি হইতে লাগিল, প্রচারকার্য ও বিরূপ অভ্যর্থনার মহলা চলিতে লাগিল। আমি লক্ষ্ণৌ-এ গিয়া এই সকল ব্যাপারে যোগ দিলাম। আমাদের প্রাথমিক উদ্যোগ-পর্ব সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ হইলেও কর্তৃপক্ষ যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাহা বুঝা গেল। তাঁহারা বাধা দিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি অঞ্চলে মিছিল নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। এই সম্পর্কে আমার জীবনে এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হইল, আমার দেহে প্রথম পুলিশের লাঠি ও বেটনের আঘাত অনুভব করিলাম।

যানবাহন যাতায়াতের অজুহাত দেখাইয়া শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আমরা স্থির করিলাম, এ সম্বন্ধে অভিযোগের কারণ না ঘটাইয়া অপেক্ষাকৃত জন-বিরল রাস্তা দিয়া এক এক দলে ষোল জন করিয়া সভাস্থলে যাইব। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, ইহাও আদেশ ভঙ্গের মধ্যে পড়ে; কেন না, পতাকাসহ ষোল জনকে একটি মিছিল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমি প্রথম ষোল জনকে লইয়া অগ্রসর হইলাম, আমার বহু পশ্চাতে গোবিন্দবল্লভ পন্থ দ্বিতীয় দল লইয়া আসিতে লাগিলেন। জনহীন রাস্তা দিয়া আমি দল লইয়া দুইশত গজ অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় পশ্চাতে অশ্বপদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমরা পিছনে চাহিয়া দেখি প্রায় পঁচিশ জন অশ্বারোহী পুলিশ আমাদের দিকে অতি দ্রুত ঘোড়া চালাইয়া আসিতেছে। অশ্বারোহী পুলিশ আমাদের উপর পড়িয়া সেই ষোলজনের ক্ষুদ্র মিছিল ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। তারপর তাহারা বড় বড় বেটন ও লাঠি দিয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি-চালিত হইয়া স্বেচ্ছাসেবকগণের কেহ রাস্তার ফুটপাতে উঠিল কেহ বা ছোট ছোট দোকানে আশ্রয় লইল। পুলিশ তাহাদের পিছনে পিছনে গিয়া প্রহার করিতে লাগিল। যখন দেখিলাম, ঘোড়াগুলি আমাদের উপর আসিয়া পড়িতেছে, তখন আমার মনেও আত্মরক্ষার ইচ্ছা জাগ্রত হইল। ইহা অত্যন্ত [illegible] দৃশ্য। কিন্তু আমার মনে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব বাধিল, আমার পশ্চাতের স্বেচ্ছাসেবকদের

উপর চোট পড়িল, প্রথম আক্রমণে আমি অটল রহিলাম। সহসা আমি দেখিলাম রাস্তার মধ্যে আমি একা দাঁড়াইয়া আছি; আমার চারিদিকে প্লিশেরা স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রহার করিতেছে। একর্প অজ্ঞাতসারে আমি একট্ গা-ঢাকা দিবার জন্য রাস্তার পাশের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। পরম্হ্তেই থামিয়া মনে মনে বিচার করিয়া ব্ঝিলাম, আমার পক্ষে ইহা অত্যন্ত অশোভনীয়। ইহা কয়েক নিমেষের ব্যাপার মাত্র, কিন্তু সেই মানসিক দ্বন্দ্বের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, সম্ভবতঃ কাপ্র্ষের মত ব্যবহারের বির্দ্ধে আমার জাগ্রত আত্মাভিমানই র্খিয়া দাঁড়াইল। তথাপি কাপ্র্ষতা ও সাহসের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য, আমি যে কোন দিকে ঝ্ঁকিতে পারিতাম। এই চকিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষ্ মেলিয়া দেখি, একজন অশ্বারোহী প্লিশ একটি ন্তন দীর্ঘ বেটন ঘ্রাইতে ঘ্রাইতে আমার দিকে আসিতেছে। আমি তাহাকে সম্ম্খে অগ্রসর হইতে বলিয়া মাথা ঘ্রাইয়া লইলাম—আবার মাথা ও ম্খ রক্ষা করিবার এক অনিবার্য আবেগে। সে আমার প্ষ্ঠদেশে দ্ইবার কঠিন আঘাত করিল। আমার মাথা ঘ্রিয়া গেল, সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল কিন্তু তব্ও যে আমি সোজা দাঁড়াইয়া আছি ইহাতেই বিস্মিত আনন্দে আপ্ল্ত হইলাম। অল্পক্ষণ পরেই প্লিশ সরিয়া গিয়া আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা প্নরায় একত্রিত হইল, অনেকেরই দেহ রক্তাক্ত, কাহারও বা মাথা ফাটিয়াছে; এমন সময় পন্থ ও তাঁহার দল আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। তাঁহারাও প্রহ্ত হইয়াছিলেন। আমরা সকলে প্লিশের সম্ম্খে বসিয়া পড়িলাম, সন্ধ্যার প্র্বে পর্যন্ত আমরা এক ঘণ্টা কি কিছ্ বেশী সময় বসিয়া রহিলাম। একদিকে বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা আসিয়া দাঁড়াইলেন, অন্যদিকে সংবাদ পাইয়া ক্রমে ব্হৎ জনতা জড় হইল। অবশেষে সরকারী কর্মচারীরা আমাদিগকে যাইতে দিতে সম্মত হইলেন। যে অশ্বারোহী প্লিশদল আমাদের উপর চড়াও হইয়া প্রহার করিয়াছিল, তাহারা আগে আগে আমাদের রক্ষীদলের মত চলিতে লাগিল, পশ্চাতে আমরা অগ্রসর হইলাম। এই তুচ্ছ ঘটনা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিবার কারণ—ইহা আমার মনের মধ্যে কিছ্ রেখাপাত করিয়াছিল। যষ্টি সঞ্চালনের সম্ম্খীন হওয়ার এবং প্রহার সহ্য করিবার শারীরিক শক্তির অন্ভূতিতে আমার চিত্তে যে সন্তোষ জন্মিল তাহাতেই আমি দৈহিক বেদনা ভুলিয়া গেলাম। এবং আমি আশ্চর্য হইলাম যে, ঘটনার সময় এমন কি প্রহ্ত হইবার কালেও, আমার মন বেশ স্বচ্ছ ছিল এবং আমি সচেতনভাবে আমার মনোভাব বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই প্রাথমিক মহড়ার পরদিন প্রভাতে অধিকতর পরীক্ষার সম্ম্খীন হইতে অধিকতর দ্ঢ়তা লাভ করিলাম। আগামী প্রভাতে সাইমন কমিশন আসিতেছে এবং আমাদের ব্হৎ মিছিল এবং বির্প অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

পিতা তখন এলাহাবাদে ছিলেন। আমার আশঙ্কা হইল যে, প্রভাতে সংবাদপত্রে আমার প্রহারের বিবরণ পাঠ করিয়া তিনি এবং পরিবারবর্গ বিচলিত হইবেন। সেজন্য সন্ধ্যার পর টেলিফোনযোগে তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমরা সকলে ভালই আছি, কোন চিন্তার কারণ নাই। কিন্তু তথাপি তিনি দ্শ্চিন্তাক্রান্ত হইলেন, শান্ত হইয়া থাকা অসম্ভব ব্ঝিয়া তিনি মধ্য রাত্রিতে লক্ষ্ণৌ যাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। তখন শেষ ট্রেন ছাড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি মোটরযোগেই রওনা হইলেন। রাস্তায় কিছ্ বাধা বিঘ্ন পাইয়া তিনি ১৪৬ মাইল অতিক্রম করিয়া শ্রান্তক্লান্তভাবে ভোর পাঁচটায় লক্ষ্ণৌ পেঁৗছাইলেন।

তখন আমরা মিছিল করিয়া ষ্টেশনে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছি। আমরা যাহা পারিতাম না, পূর্বদিনের সন্ধ্যার ঘটনায় তাহাই হইয়াছিল, অর্থাৎ উত্তেজিত জনতা সূর্যোদয়ের পূর্বেই দলে দলে ষ্টেশনের দিকে চলিতে লাগিল। নগরের নানা মহল্লা হইতে অগণিত ছোট ছোট মিছিল বাহির হইল এবং কংগ্রেস আফিস হইতে চার জন করিয়া এক এক সারিতে কয়েক সহস্র লোকের প্রধান মিছিল অগ্রসর হইল। আমরা এই প্রধান মিছিলে ছিলাম। ষ্টেশনের নিকটবর্তী হইবামাত্র পুলিশ আমাদিগকে আটক করিল। তখন ষ্টেশনের সম্মুখে প্রায় অর্ধ বর্গ মাইল পরিমিত খোলা জায়গা ছিল, (এখন এখানে নূতন ষ্টেশন নির্মিত হইয়াছে) আমরা সেইখানে গিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইলাম। সেই ময়দানে আমাদের মিছিল খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল, আমরা অগ্রসর হইবার কোন চেষ্টা করিলাম না। অনেক পদাতিক ও অশ্বারোহী পুলিশ ও সৈন্যদলও চারিদিকে মোতায়েন ছিল। বহু উৎসুক দর্শকও আসিয়া ময়দান ভরিয়া ফেলিল। সহসা আমরা দেখিলাম যে, দূরে কাহারা যেন জনতা ঠেলিয়া আসিতেছে। দেখিলাম পর পর দুই-তিন শ্রেণীতে বিভক্ত অশ্বারোহী পুলিশ বা সৈন্যদল আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে এবং সম্মুখের জনতা দলিত মথিত হইয়া ময়দানে লুটোপুটি খাইতেছে। অশ্বারোহী সৈন্যদলের এই আক্রমণের দৃশ্য দেখিতে সুন্দর, কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে বিস্মিত নিরীহ দর্শকদিগকে অশ্বপদতলে দলিত করার মত সকরুণ দৃশ্য খুব কমই আছে। যাহারা পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে তাহাদের মধ্যে কেহ বা উত্থানশক্তি রহিত, কেহ বা যন্ত্রণায় গড়াইতেছে। সমস্ত ময়দান যেন যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ ধারণ করিল। কিন্তু এই দৃশ্য দেখিয়া চিন্তা করিবার অবসর আর মিলিল না। অশ্বারোহীরা দ্রুতবেগে আসিয়া পড়িল। তাহাদের প্রথম শ্রেণীর সহিত আমাদের ঘন-সন্নিবিষ্ট শোভা-যাত্রার সংঘর্ষ হইল, আমরা আমাদের ভূমি ত্যাগ করিলাম না, সোজা দাঁড়াইয়া রহিলাম। শেষ মুহূর্তে সহসা সংযতরশ্মি অশ্বগুলি পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের সম্মুখের পা'গুলি আমাদের মাথার উপর শূন্যে কাঁপিতে লাগিল। তার পর লাঠি ও বেটন দিয়া অশ্বারোহী ও পদাতিক পুলিশ আমাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। এই প্রচণ্ড প্রহারে পূর্বে দিনের সন্ধ্যার মত আমার স্পষ্ট ধারণা আর কিছু রহিল না, আমার কেবল এইটুকুই মনে রহিল, আমাকে এইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, কিছুতেই পিছনে হটিব না। প্রহারের ফলে আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। এক অবরুদ্ধ ক্রোধে প্রতিঘাত করিবার বাসনা জাগিল, ঘোড়া হইতে আমার সম্মুখস্থ পুলিশ অফিসারকে টানিয়া নামাইয়া আমি অবলীলাক্রমে তাহারই অশ্বে আরোহণ করিতে পারি। কিন্তু দীর্ঘকালের শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতার ফলে আমি সংযম রক্ষা করিলাম এবং আঘাত হইতে আমার মুখমণ্ডল রক্ষা করা ছাড়া আমি হস্ত সঞ্চালন করি নাই এবং আমি আরও জানিতাম যে, আমাদের পক্ষ হইতে কিঞ্চিৎমাত্র আক্রমণের ভাব দেখাইলে গুলীবর্ষণ আরম্ভ হইত এবং সেই পৈশাচিক বিয়োগান্ত ঘটনায় আমাদের বহুলোক গুলীর আঘাতে প্রাণ হারাইত।

মনে হইতে লাগিল যেন দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু কার্যত কয়েক মিনিট পরেই আমাদের প্রথম শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে পিছু হটিতে লাগিল। ইহার ফলে আমি অন্যান্য সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খোলা জায়গায় পড়িলাম। ফলে আরও লাঠির আঘাত পড়িতে লাগিল এবং সহসা বিরক্তির সহিত অনুভব করিলাম, আমাকে কাহারা যেন মাটি হইতে শূন্যে তুলিয়া পিছন দিকে লইয়া গেল। আমার কয়েকজন যুবক বন্ধু আমার উপর আক্রমণের

প্রকোপ অত্যধিক দেখিয়া আমাকে এইভাবে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিল।

আমাদের মিছিলকারীরা প্রায় একশত ফ্ট হটিয়া গিয়া প্নরায় শ্রেণীবন্ধ হইয়া দাঁড়াইল। প্লিশও সরিয়া গিয়া প্রায় পঞ্চাশ ফ্ট তফাতে শ্রেণীবন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা এই ভাবে ম্খোম্খি দাঁড়াইয়া রহিলাম কিন্তু এই গোলমালের ম্ল কারণ যাঁহারা সেই সাইমন কমিশন ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দ্রে গোপনে অবতরণ করিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা কৃষ্ণপতাকাধারীদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। কিছ্ক্ষণ পর আমরা মিছিল সহ কংগ্রেস আফিসে ফিরিয়া গেলাম। সেখান হইতে যে যাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। আমি পিতার নিকট গেলাম। তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

উত্তেজনার অবসানে আমি সর্বাঙ্গে বেদনা ও অত্যন্ত ক্লান্তি অন্ভব করিলাম। আমার প্রতি অঙ্গ বিষাইয়া উঠিল। আমার শরীরের নানা স্থানে থেত্লান আঘাত এবং প্রহারের চিহ্ন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার কোন মর্মস্থানে আঘাত লাগে নাই। কিন্তু আমার অনেক দ্র্ভাগা সঙ্গী গ্র্তর আঘাত পাইয়াছিলেন। আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছয় ফ্টের অধিক উঁচু গোবিন্দ বল্লভ পন্থই প্রহারকারীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এবং তিনি এত গ্র্তরর্পে প্রহৃত হইয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল তিনি মের্দণ্ড সোজা কিম্বা সাধারণ কাজকর্ম করিতে পারেন নাই। আমার সহ্য করিবার শক্তি এবং নিজের শরীর সম্পর্কে অহঙ্কারের জোরে এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। কিন্তু প্রহার অপেক্ষাও ঐ সকল প্লিশের, বিশেষভাবে আক্রমণকারী উচ্চতর কর্মচারীদের অনেকগ্লি ম্খ আমার স্মরণে আছে। আসল বেপরোয়া প্রহার চালাইয়াছিল ইউরোপীয়ান সার্জেণ্টরা, ভারতীয় কনেস্টবলেরা অনেকটা ম্দ্ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। সেই ম্খগ্লিতে ঘৃণার ও রক্তলোল্পতার উন্মত্ততা ফ্টিয়া উঠিয়াছিল। লেশমাত্র সহান্ভূতি বা মন্ষ্যত্বের চিহ্নও ছিল না। সম্ভবতঃ তখন আমাদের ম্খগ্লি দেখিলেও ঘৃণার উদ্রেক হইত। কার্যতঃ যদিও আমরা নিষ্ক্রিয় ছিলাম, তাই বলিয়া আমাদের প্রতিপক্ষের প্রতি আমাদের হৃদয়ে নিশ্চয়ই প্রেমের আবেগ উছলিয়া উঠে নাই কিম্বা আমাদিগকে স্ন্দরও দেখাইতেছিল না। অথচ আমাদের পরস্পরের বির্দ্ধে কোন অভিযোগ নাই, কোন বিদ্বেষ নাই, কোন ব্যক্তিগত কলহের কারণও নাই। সাময়িকভাবে আমরা যেন এক আশ্চর্য শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলাম, আমাদের হৃদয় ও মনকে যেন ইহা সবলে চাপিয়া ধরিল। এবং আমাদের হৃদয়ে বহ্ বিমিশ্র ভাবের উদ্রেক করিয়া ইহা যেন আমাদিগকে তাহার হাতের অন্ধ যন্ত্র করিয়া তুলিল। অন্ধেরই মত আমরা সংঘর্ষে মাতিলাম, কিন্তু কেন এই সংঘর্ষ, আমরা কোথায় চলিয়াছি কিছ্ই ব্ঝিতে পারিলাম না। ঘটনার উত্তেজনায় আমরা যেন মন্ত্রম্গ্ধ হইলাম, কিন্তু ইহা অবসানের অব্যবহিত পরেই প্রশ্ন জাগিল—ইহার পরিণাম কি? ইহার পরিণতি কোথায়?

২৬

ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস

এই বৎসর দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের মধ্যে সাইমন কমিশন বয়কট্ ও সর্বদল সম্মেলন প্রধানভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু আমার নিজের কার্যপ্রণালী বেশীর ভাগ অন্যান্য দিকে নিয়োজিত হইয়াছিল। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবার দিকে ঝোঁক ছিলাম। সর্বদল সম্মেলন আমাদের খুব নীচু করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া মাদ্রাজের স্বাধীনতা প্রস্তাবটির প্রতি কংগ্রেসপন্থীদের লক্ষ্য যাহাতে স্থির থাকে, সেই উদ্দেশ্যও আমার ছিল। এই সকল কারণে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমি অনেক বিশিষ্ট সভায় বক্তৃতা দ্বারা প্রচারকার্য করিতে লাগিলাম। ১৯২৮ সালে আমি পাঞ্জাব, মালাবার, দিল্লী ও যুক্ত প্রদেশের চারিটি প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছি। এই বৎসর বাঙ্গলার যুবক সম্মেলনে এবং বোম্বাই-এর ছাত্রসম্মেলনে আমাকে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছে। মাঝে মাঝে যুক্ত প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে এবং কদাচিৎ কারখানার শ্রমিকদের নিকটও আমাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। সর্বত্রই আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু একই ছিল, কেবল স্থানীয় অবস্থা এবং শ্রোতাদের লক্ষ্য করিয়া বলিবার ভঙ্গী পরিবর্তন করিয়া লইতাম। সর্বত্রই আমি রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত সামাজিক স্বাধীনতার কথাও বলিতাম এবং এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন, ইহা বলিতাম। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে হইলেও যাহাদের অধিকাংশ জাতীয় আন্দোলনের মেরুদণ্ড, সেই সকল কংগ্রেসকর্মী ও শিক্ষিত জনগণের মধ্যে উহা প্রচারে আমি অধিকতর আগ্রহ দেখাইতাম। আমাদের জাতীয়তাবাদীরা বক্তৃতাকালে অতীত মহিমা কীর্তন করিতেন, বিদেশী শাসনে আমাদের আধ্যাত্মিক ও আর্থিক ক্ষতির কথা বলিতেন, জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার কথা বলিতেন, আমাদের উপর পরশাসনের অপমানের কথা বুঝাইতেন, জাতীয় মর্যাদা উদ্ধারের জন্য আমাদের স্বাধীনতা আবশ্যক এবং ইহার জন্য দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে, এই শ্রেণীর কথা বলিতেন। এই সকল পরিচিত কথায় প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় উদ্বেলিত হইত। এবং একজন জাতীয়তাবাদী হিসাবে এই সকল কথায় আমার চিত্তেও আবেগ উপস্থিত হইত। (কিন্তু আমি কখনও প্রাচীন ভারত অথবা অন্য কোন প্রাচীনের অন্ধ অনুরাগী ছিলাম না) কিন্তু ইহার মধ্যে যদিও কিছু সত্য ছিল কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে উহা নিরর্থকতায় জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। এবং সকলের মুখে একই রূপ কথার প্রতিধ্বনির ফলে আমাদের সংঘর্ষের মর্মকথা ও অন্যান্য সমস্যা আলোচনা করিবার সুযোগ হইত না। ইহাতে কেবল ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিত, চিন্তা জাগ্রত হইত না।

ভারতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম প্রচারক আমি নহি, বস্তুতঃ আমি অনেকের পশ্চাতে ছিলাম এবং অতিকষ্টে এক এক পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলাম। তখন অন্যান্য সকলে দুরন্ত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। শ্রমিকদের ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন এবং যুবক সমিতিগুলির অধিকাংশই

মতবাদের দিক দিয়া নিশ্চিতই সমাজতান্ত্রিক। আমি যখন ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করি তখন চারিদিকে এক প্রকার অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রবাদের কথা হাওয়ায় ভাসিতেছে, এবং তাহার পূর্বে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে সমাজতান্ত্রিক ছিলেন। অধিকাংশ যদিও কল্পনারাজ্যে বিহার করিতেন তথাপি তাঁহারা ক্রমশঃ মার্কস্ মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছিলেন। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি নিজেদের পুরাপুরি মার্কস্-পন্থী মনে করিতেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের উন্নতি এবং বিশেষভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে ইউরোপ আমেরিকার মতই ভারতেও এই ভাব শিকড় গাড়িতেছিল।

সমাজতন্ত্রী কর্মীরূপে আমার কিছু খ্যাতি রটিয়াছিল, তাহার কারণ আমি একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী এবং কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। আরও অনেক খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্মীও আমার মতই চিন্তা করিতেছিলেন। যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে ইহা বিশেষভাবে দেখা গিয়াছিল; এমন কি, আমরা ১৯২৬ সালেই একটি মোলায়েম সমাজতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলাম। জমিদার ও তালুকদার অধ্যুষিত প্রদেশে ভূমির প্রশ্নই প্রধান। আমরা ঘোষণা করিলাম, ভূমি-সংক্রান্ত বর্তমান ব্যবস্থা রহিত করিতে হইবে এবং কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন মধ্যস্বত্বভোগী থাকিবে না। অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এ সকল কথা আমাদের বলিতে হইত, কেন না, তখনও লোকে এই শ্রেণীর কথা শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই।

১৯২৯ সালে যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আরও কিছু অগ্রসর হইয়া এক সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রচিত প্রস্তাব নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিতে উপস্থিত করিল। গ্রীষ্মকালে উহার বোম্বাই অধিবেশনে যুক্ত প্রদেশের প্রস্তাবটির ভূমিকাটুকু গৃহীত হওয়ায় সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি স্বীকৃত হইল, তবে যুক্তপ্রদেশ-নির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা সম্পর্কিত প্রস্তাব পরবর্তী কালের জন্য স্থগিত রাখা হইল। অনেকে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি ও যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এই প্রস্তাবের কথা ভুলিয়া গিয়া মনে করেন, সমাজতন্ত্রবাদ দুই-এক বৎসর হইল কংগ্রেসে আলোচিত হইতেছে। অবশ্য নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ সদস্যগণ কি করিলেন, তাহা বুঝিতেই পারেন নাই।

'ইন্ডিপেন্ডেন্ট লীগ'-এর যুক্তপ্রাদেশিক শাখা (এই প্রদেশের প্রধান কংগ্রেস কর্মীদের লইয়াই গঠিত) সর্বতোভাবে সমাজতান্ত্রিক ছিল; এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী গঠিত কংগ্রেস কমিটি অপেক্ষা মতবাদের দিক দিয়া ইহা অনেক বেশী অগ্রগামী ছিল। ইন্ডিপেন্ডেন্ট লীগের অন্যতম লক্ষ্য ছিল সামাজিক স্বাধীনতা। আমরা এই লীগকে সমস্ত ভারতে এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রবাদের অনুকূলে প্রচারকার্য করার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লীগের কার্যক্ষেত্র যুক্ত প্রদেশের বাহিরে বিশেষ বিস্তৃতিলাভ করিল না। দেশে সমর্থনের অভাব ইহার কারণ নহে। আমাদের অধিকাংশ সদস্যই কংগ্রেসেরও বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন এবং কংগ্রেস মতবাদের দিক দিয়া স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করায় তাঁহারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াই সর্বদা কাজ করিতেন। আর একটি কারণ এই যে, লীগের প্রাথমিক স্থাপয়িতাদের মধ্যে অনেকে পরে প্রতিষ্ঠানের পরিপুষ্টি ও বিকাশের দিকে ততটা মনোযোগ দিতেন না। তাঁহারা ইহাকে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির উপর চাপ দিবার এবং কার্যকরী সমিতির নির্বাচনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য হিসাবে দেখিতে

লাগিলেন। এই সকল কারণে লীগ শিথিল হইয়া পড়িল এবং ক্রমে কংগ্রেস প্রবল ও সংগ্রামশীল হইয়া উঠায় অধিকাংশ অগ্রগামী কর্মীই ঐ দিকে ঝুঁকিলেন, ফলে লীগ দুর্বল হইয়া পড়িল। ১৯৩০-এ নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে লীগ কংগ্রেসের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া বিলুপ্ত হইল।

১৯২৮-এর শেষার্ধে এবং ১৯২৯-এ আমি গ্রেফতার হইব, এই গুজব পুনঃ পুনঃ উঠিয়াছিল। সংবাদপত্রেও এই আশঙ্কা ব্যক্ত হইত এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতেও এ বিষয়ে সাবধানবাণী-সমন্বিত অনেক পত্র পাইতাম। আমার গ্রেফতার যে আসন্ন, অনেকে নিশ্চিতরূপে সন্ধান পাইয়াই তাহা আমাকে জানাইতেন। এই সকল লেখার প্রভাবে আমার মনেও এক অনিশ্চিত ভাবের উদয় হইল এবং আমিও প্রস্তুত হইয়াই থাকিতাম। জেলে যাওয়াটা জীবনের একটা স্থায়ী ব্যাপার নহে; ইহা ভাবিয়া ভবিষ্যতের জন্য আমি বিশেষ চিন্তা করিতাম না। এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তন এবং জেলে যাওয়া অনেক ভাল। মোটের উপর আমি নিজেকে পূর্ব হইতে প্রস্তুত রাখিবার যথেষ্ট সময় পাইয়াছিলাম, (আমার পরিবারবর্গও ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন) এবং আহ্বান আসিলে আমি উহা সহজেই গ্রহণ করিতে পারিব। কাজেই এই শ্রেণীর গুজবে আমার লাভই হইল, ইহার ফলে প্রত্যেকটি দিন এক প্রকার উত্তেজনার মধ্যে কাটিত; একটি দিনের স্বাধীনতাও কত মূল্যবান, যেন একটি দিন লাভ হইল। কিন্তু কার্যতঃ ১৯২৮ এবং ১৯২৯ অতিক্রম করিয়া ১৯৩০-এর এপ্রিল মাসে আমি গ্রেফতার হইয়াছিলাম। ইহার পর হইতে কারার বাহিরে আমার জীবনের কোন বাস্তব সত্তা ছিল না; অল্পদিনের জন্য বাহিরে আসিয়াও নিজের গৃহে অপরিচিত অতিথির মত কাটাইয়াছি, লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ করিয়াছি। কাল কি হইবে জানিতাম না; সর্বদাই কারাগারের আহ্বানের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিতাম।

১৯২৮-এর শেষভাগে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন আসন্ন হইল। নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন আমার পিতা। তিনি সর্বদল সম্মেলন এবং তাহার রিপোর্ট লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত এবং উহা কংগ্রেসে পাশ করাইয়া লইবার জন্য উদ্গ্রীব। তিনি জানিতেন যে, উহাতে আমার সম্মতি নাই, কারণ স্বাধীনতা সম্পর্কে কোন আপোষ রফা আমার পক্ষে অসম্ভব; ইহাতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমরা এই বিষয়ে বড় একটা তর্ক করিতাম না, কিন্তু উভয়ের মানসিক সংঘর্ষ উভয়েই অনুভব করিতাম, দুই পৃথক পথে প্রস্থানের আবেগ অনুভব করিতাম। মতভেদ ইহার পূর্বেও বহুবার ঘটিয়াছে এবং গুরুতর মতভেদ হেতু আমরা দুই পৃথক রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়াছি, কিন্তু ইহার পূর্বে কিম্বা পরবর্তীকালে এত অধিক মন কষাকষি কখনও হয় নাই। ইহাতে আমরা উভয়েই অত্যন্ত অসুখী হইয়াছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, পিতা জানাইয়া দিলেন, কংগ্রেসে যদি তাঁহার মতানুযায়ী কার্য না হয়,—অর্থাৎ সর্বদল-সম্মেলনের রিপোর্টের উপর রচিত প্রস্তাব যদি অধিকাংশের ভোটে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে তিনি কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিবেন না। তাঁহার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও নিয়মতান্ত্রিক পথ। তাঁহার প্রতিপক্ষ এতখানির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। কংগ্রেস ও অন্যত্র ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমালোচনা করিব, কিন্তু কঠিন অথচ দায়িত্ব গ্রহণের বেলা পিছাইয়া যাইব। মনের মধ্যে আশা থাকে যে সমালোচনার ফলে প্রতিপক্ষ আমাদের সুবিধাজনকভাবে পথ পরিবর্তন করিয়া লইবে, আমাদের হাতে হাল ছাড়িয়া দিবে না। ভারত গভর্নমেন্টের ব্যবস্থার মত, যেখানে আমাদের হাতে কোন

দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই, শাসন পরিষদ যেখানে অনপসরণীয় ও স্বৈরাচারী এবং যেখানে কেবলমাত্র সমালোচনার পথ খোলা, (অবশ্য কার্যের কথা স্বতন্ত্র) সেখানে সমালোচনা নেতিবাচক হইতে বাধ্য। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যদি নেতিবাচক সমালোচনাকেও কার্যকরী করিতে হয়, তাহা হইলেও মনের দিক দিয়া নিজেকে এমন করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হইবে যে, সুযোগ উপস্থিত হইলেই গভর্ণমেণ্টের সকল বিভাগের—শাসন ও সামরিক, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক—দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা থাকিবে না। কিন্তু আংশিক নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা, (যেমন আমাদের মডারেটগণ সমর-বিভাগ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন) নিজেদের অক্ষমতা স্বীকারেরই নামান্তর এবং তাহাতে সমালোচনার কোন জোর থাকে না।

সমালোচনা ও নিন্দা অথচ তাহার স্বাভাবিক পরিণামের দায়িত্ব গ্রহণের বেলায় পিছাইয়া পড়া গান্ধিজীর সমালোচকদের মধ্যেও দেখা গিয়াছে। কংগ্রেসের মধ্যে একদল লোক আছেন যাঁহারা তাঁহার কার্যপ্রণালী পছন্দ করেন না এবং উহা তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও গান্ধিজীকে কংগ্রেস হইতে তাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। এই মনোভাব খুব দুর্বোধ্য নহে; কিন্তু ইহা কোন পক্ষের প্রতিই সুবিচার নহে।

কলিকাতা কংগ্রেসেও এই প্রকারের বিঘ্ন উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে কথাবার্তা হইয়া একটা আপোষ-প্রস্তাব খাড়া করা হইল বটে, কিন্তু তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল। সমস্ত ব্যাপারটাই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল—কোন দিকেই কিছু বুঝা গেল না। অবশেষে কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব এইভাবে রচনা করা হইল যে, কংগ্রেস সর্বদল সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিবেন যে, এক বৎসরের মধ্যে ঐ শাসনতন্ত্র গৃহীত না হইলে কংগ্রেস পুনরায় স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করিবে। ইহা এক বৎসরের সময় দিয়া এক সৌজন্যপূর্ণ চরমপত্রের মত। সর্বদল সম্মেলনের রিপোর্টে পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনও চাওয়া হয় নাই, অতএব এই প্রস্তাবে কংগ্রেসকে যে স্বাধীনতার আদর্শ হইতে অনেকখানি নামিয়া আসিতে হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি এই প্রস্তাব দূরদর্শিতার পরিচায়ক, কেন না, ইহার ফলে সকলেরই অবাঞ্ছনীয় ভেদ নিবারিত হইল এবং ঐক্যবন্ধ কংগ্রেস ১৯৩০-এর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যে এক বৎসরের মধ্যে সর্বদল সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল। সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল এবং দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বুঝা গেল, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব ব্যতীত ইহা কৃতকার্য হইবে না।

আমি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলাম; আমার প্রতিবাদ অবশ্য দ্বিধা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তথাপি আমি পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইলাম। যাহাই ঘটুক না কেন, সম্পাদকের পদে আমি পাকেচক্রে আঠার মত লাগিয়া থাকি। কংগ্রেসী মহলে আমি যেন বিখ্যাত 'ভিকার অফ ব্রে'র ভূমিকা অভিনয় করিতেছি। যে কোন সভাপতিই কংগ্রেসের সিংহাসনে উপনিবেশন করুন না কেন, আমাকে ঠিক সম্পাদকের পদে বসিয়া প্রতিষ্ঠান চালাইবার কার্যভার গ্রহণ করিতেই হইবে।

কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্বে, ঝরিয়ায় (কয়লা খনি অঞ্চলে) নিঃ ভাঃ ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। প্রথম দুই দিন আমি ইহার অধিবেশনে যোগদান করিয়া কলিকাতা চলিয়া যাই, ইহাই আমার প্রথম ট্রেড

ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদান। যদিও আমি কৃষকদের মধ্যে দীর্ঘকাল এবং কিছুকাল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলাম, তথাপি আমি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বাহিরেই ছিলাম। আমি দেখিলাম, বৈপ্লবিকদের সহিত সংস্কারকদের পুরাতন বিবাদ একই রূপ রহিয়াছে। কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হওয়া, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘ, প্যান প্যাসিফিক ইউনিয়ন এবং জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ—এইগুলিই মতভেদের মুখ্য বিষয় ছিল। ইহা ছাড়াও কংগ্রেসের উভয় দলের মূলনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। পুরাতন ট্রেড ইউনিয়নপন্থীরা রাজনীতি ক্ষেত্রে মডারেট, এবং তাঁহারা শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের যোগাযোগ স্থাপনে সন্দিগ্ধচিত্ত। তাঁহারা অতি সাবধানে শ্রমিকসুলভ উপায়ে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধনে বিশ্বাসী। এই দলের নেতা এন এম যোশী, ইনি অনেকবার জেনেভায় শ্রমিক সম্মেলনে গিয়াছেন। অন্য দল অধিকতর সংগ্রামশীল, রাজনৈতিক কার্যে বিশ্বাসী এবং প্রকাশ্যভাবে বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের উপর কম্যুনিষ্ট অথবা কম্যুনিষ্টভাবাপন্ন ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব না থাকিলেও ইঁহারা বহুল পরিমাণে উঁহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত। বোম্বাই-এর কাপড়ের কলের শ্রমিকদল ইঁহাদের হাতে ছিল এবং ইঁহাদের নেতৃত্বে চালিত বোম্বাই-এ কাপড়ের কলে ধর্মঘট আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছিল। গিরনী কামগার ইউনিয়ন নামক এক নূতন শক্তিশালী শ্রমিকসঙ্ঘ বোম্বাই-এর শ্রমিক মহলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। জি আই পি রেলওয়ে ইউনিয়নের উপরও এই অগ্রগামী দলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

সূচনা হইতেই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি এবং আফিস এন এম যোশী ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত এবং যোশীই এই আন্দোলনের স্রষ্টা। অগ্রগামী দল শ্রমিক মহলে শক্তিশালী হইলেও, উপর হইতে নিয়ন্ত্রিত কার্যপ্রণালীর উপর তাহাদের কোন প্রভাব ছিল না। এই অসন্তোষজনক অবস্থা, শ্রমিকদের মনোভাব ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার প্রতিকূল। ইহার ফলে অসন্তোষ ও কলহ লাগিয়াই থাকিত; এবং অগ্রগামীদল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ক্ষমতা হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেন। অন্য দিকে ইহা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিতে গেলে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবার আশঙ্কাও ছিল। ভারতে শ্রমিক আন্দোলন তখনও যৌবনে পদার্পণ করে নাই; ইহার অনেক দৌর্বল্য ছিল এবং অ-শ্রমিক নেতারাই ইহা পরিচালন করিতেন। এই অবস্থায় বাহিরের লোকেরা শ্রমিক আন্দোলনের সুযোগে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিবে ইহা স্বাভাবিক এবং ভারতে শ্রমিক কংগ্রেস ও ইউনিয়নে তাহাই দেখা যাইত। এন এম যোশী অবশ্য দীর্ঘকাল শ্রমিক আন্দোলনে লিপ্ত থাকিয়া স্বীয় যোগ্যতা ও কুশলতা প্রমাণ করিয়াছেন, এমন কি যাঁহারা তাঁহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে অনগ্রসর ও মডারেট বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে তাঁহার সেবার মহত্ত্ব স্বীকার করেন। অন্যান্য কয়েকজন মডারেট ও অগ্রগামী ব্যক্তির সম্বন্ধেও ইহা বলা যাইতে পারে।

ঝরিয়াতে আমার সহানুভূতি অগ্রগামীদিগের সহিতই ছিল, কিন্তু আমি নবাগত এবং ইহাদের গৃহদ্বন্দ্বের মধ্যে প্রবেশের আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না বলিয়া আমি নিরপেক্ষ রহিলাম। আমার ঝরিয়া ত্যাগের পর টি. ইউ সি'র নূতন নির্বাচন হইয়াছিল। আমি কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম, আমাকে আগামী বর্ষের জন্য সভাপতি নির্বাচিত করা হইয়াছে। মডারেট দল হইতেই আমার নাম প্রস্তাব

করা হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, অগ্রগামী দলের প্রস্তাবিত অন্যতম প্রার্থী যিনি একজন খাঁটি শ্রমিক (রেলকর্মী) তাঁহাকে পরাজিত করিতে হইলে আমার নাম কাজে লাগিবে। যদি আমি সেদিন ঝরিয়ায় উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রমিক প্রার্থীর অনুকূলে স্বীয় নাম প্রত্যাহার করিতাম। একজন অ-শ্রমিক ও নবাগতকে সহসা একেবারে সভাপতির পদে বরণ করা আমার নিকট অত্যন্ত অশোভনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের শৈশব ও দৌর্বল্যের ইহাও একটি প্রমাণ।

১৯২৮-এ বহু শ্রমিক-চাঞ্চল্য ও ধর্মঘট হইয়াছিল, ১৯২৯-এও তাহার জের চলিয়াছে। হতদরিদ্র অথচ সংগ্রামশীল বোম্বাই-এর কাপড়ের কলের শ্রমিকেরাই ধর্মঘটে অগ্রণী হইয়াছিল। বাঙলার পাটকলগুলিতে ব্যাপক ধর্মঘট হইয়াছিল। জামসেদপুরের লোহার কারখানায়, সম্ভবতঃ রেলেও ধর্মঘট চলিতেছিল। জামসেদপুরের টিন-প্লেট ওয়ার্কসে কয়েকমাস ধরিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী ধর্মঘট সাহসের সহিত পরিচালিত হইতেছিল। জনসাধারণের সহানুভূতি সত্ত্বেও শক্তিশালী মালিক কোম্পানী (বর্মা অয়েল কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট) শ্রমিক-দিগকে দলিত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল।

দুই বৎসর ধরিয়া শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তি চলিল এবং তাহার ফলে তাহাদের অবস্থা আরও খারাপ হইল। মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে কল-কারখানার প্রভূত প্রসার ও উন্নতি হইয়াছিল এবং প্রচুর লাভ হইয়াছিল। পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া পাটের কল ও কাপড়ের কলে শতকরা ১০০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্যন্ত লাভ হইয়াছে। এই অসম্ভব হারে লাভের অঙ্কের সবটাই মালিক অথবা অংশীদারদের পকেটে গিয়াছে, অথচ শ্রমিকদের অবস্থা পূর্ববৎই ছিল। বেতনের হার যেমন কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছিল, তেমনই আবার দ্রব্যমূল্যও বাড়িয়াছিল। যখন এই ভাবে হু হু করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জিত হইতেছিল, তখন দরিদ্র শ্রমিকেরা জরাজীর্ণ কুটীরে বাস করিতেছিল, নারীদের লজ্জানিবারণের উপযোগী বস্ত্রও ছিল না। বোম্বাই শ্রমিকদের অপেক্ষাও কলিকাতায় প্রাসাদমালা হইতে অনতিদূরবর্তী পাটকলের শ্রমিকদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় ছিল। অর্ধ-নগ্না শ্রীহীনা নারীরা উদরান্নের তাড়নায় উদয়াস্ত শ্রম করিত, এবং তাহাদের শ্রমে ডাণ্ডি ও গ্লাসগো এবং কিয়দংশে ভারতীয় পকেটে ঐশ্বর্যের স্রোতধারা অবিরাম প্রবাহিত থাকিত।

সুদিনে কলকারখানা উত্তমরূপে চলিলেও শ্রমিকদের অবস্থা পূর্ববৎই ছিল এবং তাহারা বিশেষ লাভবান হয় নাই। কিন্তু সুদিনের অবসানে, যখন মোটা হারে লাভ করা কঠিন হইয়া উঠিল, তখন সমস্ত ভার গিয়া পড়িল শ্রমিকদের উপর। পুরাতন লাভের কথা সকলে ভুলিয়া গেল, কেন না, তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে। প্রচুর লাভ না হইলে কলকারখানা চলিবে কিরূপে? অতএব কারখানায় শ্রমিক মহলে অসন্তোষ ও অশান্তি দেখা দিল, বোম্বাই-এর ব্যাপক ধর্মঘট দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট ও মালিকগণ শঙ্কিত হইলেন। সংঘ ও মতবাদের দিক দিয়া শ্রমিক আন্দোলন, শ্রেণী-স্বার্থসচেতন সংগ্রামশীল ও অগ্রসর হইয়া উঠিল। রাজনৈতিক আন্দোলনও দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছিল; যদিও উভয় আন্দোলনই চলিতেছিল, তথাপি একের সহিত অপরের সম্পর্ক ছিল না। গভর্ণমেণ্ট ইহার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

১৯২৯-এর মার্চ মাসে গভর্ণমেণ্ট অগ্রগামী দলের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনকে সহসা আঘাত করিলেন। বোম্বাই

গিরণী কামগার ইউনিয়নের নেতারা এবং বাঙলা, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের শ্রমিক নেতারা গ্রেফতার হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কম্যুনিষ্ট, কেহ বা কম্যুনিষ্ট-ভাবাপন্ন এবং অন্যান্য অনেক সাধারণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ছিলেন। ইহাই বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মমালার সূচনা। এই মামলা সাড়ে চারি বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল।

মীরাটের আসামীদিগকে আদালতে সমর্থন করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইল। আমার পিতা ঐ সমিতির সভাপতি এবং ডাঃ আনসারী, আমি ও অন্যান্য অনেকে সভ্য হইলাম। আমাদের কাজ অত্যন্ত কঠিন হইল। টাকা সংগ্রহ করা সহজ হইল না, কেন না, বুঝা গেল—ধনী ব্যক্তিরা কম্যুনিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট এবং শ্রমিক আন্দোলনকারীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন। আইনজীবীরা উপাখ্যান-কথিত পুরোপুরি এক পাউণ্ড নরমাংস না পাইলে কাজ করিবেন না বলিয়া কবুল জবাব দিলেন। আমাদের কমিটিতে আমার পিতা এবং অন্যান্য বিখ্যাত আইনজ্ঞ ছিলেন। পরামর্শ এবং অন্যান্য নির্দেশের জন্য তাঁহারা সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। ইহাতে আমাদের এক পয়সাও ব্যয় হইত না। কিন্তু মাসের পর মাস মীরাটে বসিয়া কাজ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অন্যান্য যে সকল আইনজীবীর নিকট আমরা উপস্থিত হইলাম, তাঁহারা এই মামলাকে যতটা সম্ভব অর্থ উপার্জনের যন্ত্র স্বরূপ দেখিতে লাগিলেন।

মীরাট মামলা ছাড়াও আমি এম. এন রায়ের মামলা ও অন্যান্য কয়েকটি মামলার তদ্বির সমিতির সদস্য ছিলাম। সর্বত্রই আমি আমার সমব্যবসায়ীদের লোভ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ১৯১৯-এ পাঞ্জাব সামরিক আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি প্রথম আমন্ত্রিত হই। একজন বিখ্যাত নেতৃস্থানীয় আইনজীবী তাঁহার পুরো ফী, অর্থাৎ প্রভূত অর্থ দাবী করিয়াছিলেন। সামরিক আইনের হতভাগ্য আসামীদের মধ্যে একজন তাঁহার সমব্যবসায়ীও ছিলেন এবং অন্যান্য অনেককে ধার করিয়া, সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে মজুরী দিতে হইয়াছিল। আমার সর্বশেষ অভিজ্ঞতা অধিকতর বেদনাবহ। আমরা দরিদ্রতম শ্রমিকদের নিকট পয়সায় আধলায় যে অর্থ সংগ্রহ করিতাম তাহা মোটা অঙ্কের চেক লিখিয়া আইন-জীবীদের দিতে হইত। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। অথচ এ সমস্ত আয়োজন নিষ্ফল। কি রাজনৈতিক কি শ্রমিক-ঘটিত মামলায় আমরা যতই আত্মপক্ষ সমর্থন করি না কেন ফল প্রায় সমানই হয়। মীরাট মামলার মত ব্যাপারে নানা কারণে আত্মপক্ষ সমর্থন অনিবার্যরূপে আবশ্যক হইয়াছিল।

মীরাট মামলা তদ্বির সমিতি আসামীদিগকে লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিলেন এবং এক এক জনের পক্ষ সমর্থন-প্রণালী এক এক প্রকার এবং তাঁহাদের মধ্যেও কোনও ঐক্য ছিল না। কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা কমিটি তুলিয়া দিলাম এবং ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাজনৈতিক ঘটনাবলী ঘনাইয়া উঠিল এবং ১৯৩০-এ আমাদের সকলেই কারাগারে উপনীত হইলাম।

ঝটিকার পূর্বাভাস

১৯২৯-এ লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন। দশ বৎসর পরে পাঞ্জাবে পুনরায় কংগ্রেস ফিরিয়া আসিল। জনসাধারণের চিত্তে পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হইল। জালিয়ানওয়ালাবাগ, সামরিক আইন ও তাহার লাঞ্ছনা, অমৃতসর কংগ্রেস এবং তাহার পর অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা। এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটিয়াছে—ভারতে বহু পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু তবুও সৌসাদৃশ্যের অভাব নাই। রাজনৈতিক অসন্তোষ বাড়িতেছিল, সংঘর্ষ আসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। সমগ্র দেশের উপর সঙ্কটের কৃষ্ণচ্ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছিল।

আইন সভার চক্রে ঘূর্ণায়মান মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যতীত দেশের লোক ব্যবস্থা পরিষদ অথবা প্রাদেশিক আইন সভাগুলির প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া উঠিতেছিল। গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্বকামী ও স্বৈরাচারী প্রকৃতির উপর এক আইন সভার জরাজীর্ণ শতচ্ছিন্ন আবরণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহারা কোনও মতে কাজ চালাইয়া যাইতেছিলেন এবং ইহাকেই কতকগুলি লোক ভারতের পার্লামেণ্ট বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিত এবং সদস্যরূপে ভাতা গ্রহণ করিত। ১৯২৮-এ সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকৃতিমূলক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় ব্যবস্থা পরিষদ তাহার সর্বশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।

পরে ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতির সহিত গভর্ণমেণ্টের বিরোধ বাধিল। পরিষদের স্বরাজী সভাপতি বিঠলভাই প্যাটেল তাঁহার স্বাধীনতাপ্রিয়তার জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কণ্টক হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার পক্ষচ্ছেদ করিবার আয়োজন হইল। এই ঘটনার প্রতি জনসাধারণ একবার চোখ মেলিয়া চাহিল মাত্র। কিন্তু মোটের উপর বাহিরের ঘটনাবলী জনমতকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। আমার পিতার কাউন্সিল-মোহ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, বর্তমান অবস্থায় আইন সভাগুলির কোনই সার্থকতা নাই। যে-কোন সুযোগে তিনি উহা হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টায় ছিলেন। তাঁহার নিয়মতান্ত্রিকতায় অভ্যস্ত মন এবং আইনজীবীসুলভ কার্যপ্রণালীর উপর অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি নিষ্ফল ও মূল্যহীন। তিনি তাঁহার আইনজ্ঞ মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, ভারতবর্ষে বস্তুতঃ নিয়মতন্ত্র বলিয়া কিছু নাই এবং যেখানে ব্যক্তি বা প্রভুর দল যাদুকরের টুপির মধ্য হইতে খরগোস বাহির করিবার মত অপ্রত্যাশিতভাবে অর্ডিনান্স বাহির করিতে পারেন, সেখানে আইন প্রণয়নেরও কোন বৈধ নীতির অভাব। প্রকৃতি ও সংস্কারের দিক দিয়া তিনি বৈপ্লবিক ছিলেন না; যদি ভারতবর্ষে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মত কোন শাসনপদ্ধতি থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহে তাহার প্রধান সমর্থক হইতেন। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় এক নকল পার্লামেণ্টের কৌতুকাভিনয় লইয়া ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি তিনি ক্রমশঃ অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

কলিকাতা কংগ্রেসে আপোষ প্রস্তাবে যদিও গান্ধিজী হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি রাজনীতি হইতে দূরেই ছিলেন। অবশ্য তিনি ঘটনাবলীর পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস নেতারাও প্রায়শঃই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি প্রধানতঃ খাদি প্রচারেই ব্রতী ছিলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে

প্রত্যেক প্রদেশে, প্রত্যেক জিলায়, প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য সহরে এমন কি, সুদূর পল্লী অঞ্চলেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেন, সুবৃহৎ জনতা সমবেত হইত। এই জন্য পূর্ব হইতে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা হইত, যাহাতে তাঁহার কার্যপ্রণালী সুনিয়ন্ত্রিতভাবে নির্বাহ হয়। এইরূপে বহুবার ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ,—পূর্বাঞ্চলের গিরিমালা হইতে পশ্চিম সমুদ্রের তীর পর্যন্ত এই বিশাল দেশের প্রত্যেক অংশের পরিচয় তিনি লাভ করিয়াছিলেন। অন্য কোন মানুষ তাঁহার মত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছে কি না আমি জানি না।

অতীতকালে অনেক কৌতূহলী বিখ্যাত ভ্রমণকারী তীর্থযাত্রীর আবেগ লইয়া দেশ পর্যটন করিয়াছেন; কিন্তু তখন যানবাহন ছিল মন্থর এবং আজকার দিনে রেল বা মোটরে এক বৎসরে যাহা দেখা সম্ভব তখন সারাজীবনেও তাহা দেখা সম্ভব হইত না। গান্ধিজী রেলে ও মোটরে ভ্রমণ করিতেন, তবে পদব্রজেও তিনি বহু ভ্রমণ করিয়াছেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা অনন্যসাধারণ এবং এইভাবে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সহিত তিনি ব্যক্তিগতভাবে মিলিয়াছেন। তিনিও তাঁহাদের চিনিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাকে চিনিয়াছে। ১৯২৯-এ খাদি প্রচার উপলক্ষ্যে তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্য যুক্ত প্রদেশে ছিলেন। তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল। আমি কয়েকবার তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলাম এবং অল্প কয়েক দিন করিয়া তাঁহার সহিত ছিলাম। পূর্বে অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বৃহৎ জনতা দেখিয়া আমি বিস্মিত না হইয়া পারি নাই, বিশেষভাবে আমাদের পূর্বাঞ্চলে গোরক্ষপুর প্রভৃতি জেলায় জনস্রোত দেখিয়া দলে দলে পঙ্গপালের মত মনে হইত। পল্লী অঞ্চলে মোটরে যাইবার সময় আমরা কয়েক মাইল পরে পরেই দশ হইতে বিশ সহস্র জনতার সম্মুখীন হইতাম এবং ঐ দিবসের প্রধান সভায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হইত। বড় বড় কয়েকটি বৃহৎ সহর ব্যতীত কোথাও বৈদ্যুতিক "লাউড স্পীকারের" ব্যবস্থা ছিল না এবং এই সুবৃহৎ জনতার পক্ষে আমাদের কথা শোনা অসম্ভব ছিল। সম্ভবতঃ তাহারা বক্তৃতা শুনিতে আসিত না, মহাত্মাজীর দর্শন লাভেই সন্তুষ্ট হইত। অতিরিক্ত শ্রম না হয় এজন্য গান্ধিজী সাধারণতঃ অতি সংক্ষেপে বক্তৃতা করিতেন; অন্যথা দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইভাবে কাজ করা কঠিন।

তাঁহার যুক্ত প্রদেশ ভ্রমণের সব সময় আমি তাঁহার সহিত ছিলাম না। আমাকে তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। কাজেই তাঁহার দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমি সঙ্গত বিবেচনা করি নাই। জনতায় আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাই বলিয়া ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি, অপরের পায়ের তলায় পড়িয়া আহত হওয়া প্রভৃতি—যাহা গান্ধিজীর সঙ্গীদের অনিবার্য নিয়তি—তাহার প্রতি আমি কোন আকর্ষণ অনুভব করিতাম না। আমার হাতে অন্য কাজ ছিল এবং রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিণতির ফলে তুলনায় খাদির কাজ আমার নিকট অতি সামান্য বোধ হইয়াছিল এবং সারাক্ষণ খাদির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিবার ইচ্ছাও আমার ছিল না। গান্ধিজীর এই শ্রেণীর অ-রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকায় মাঝে মাঝে আমার রাগ হইত। তাঁহার মনের মধ্যে কি আছে, আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। এই সময়ে তিনি খাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং প্রায়ই বলিতেন যে, "দরিদ্র নারায়ণ" সেবার জন্য অর্থের আবশ্যক। ইহার অর্থ—কুটীর শিল্পের মধ্য দিয়া অর্থসৃষ্টি তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ শব্দটির মধ্যে দারিদ্র্যকে মহিমান্বিত করিবার একটি ভাব আছে, যেন ঈশ্বর বিশেষভাবে দরিদ্রের প্রভু এবং দরিদ্ররাই

তাঁহার বিশেষ প্রিয়। আমার মনে হয়, সর্বত্রই ধর্মভাবের এই সাধারণ মনোভাব আছে। কিন্তু আমার পক্ষে ইহা অসহ্য। আমার মতে, দারিদ্র্য অত্যন্ত ঘৃণার্হ। উহার সহিত যুদ্ধ করিয়া উহাকে উন্মূলিত করাই কর্তব্য, উহাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। কেন না, এই মনোভাব হইতে লোকে দারিদ্র্যকে আক্রমণ না করিয়া যে ব্যবস্থা হইতে দারিদ্র্যের উৎপত্তি হয়, লোকে তাহা সমর্থন করে এবং যাহারা দারিদ্র্যের প্রতি যুদ্ধবিমুখ, তাহারা দারিদ্র্যের একটা সঙ্গত, শোভন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। তাহারা অভাবপূর্ণ জগৎ চিন্তা করিতেই অভ্যস্ত, ইহজগতেই জীবনের সর্বপ্রকার প্রয়োজন প্রচুররূপে পাওয়া যায়, তাহা ধারণা করিতে পারে না, ইহাদের মতে জগতে চিরকাল ধনী এবং দরিদ্র থাকিবে।

এই বিষয় লইয়া মাঝে মাঝে গান্ধিজীর সহিত আমার আলোচনা হইয়াছে। তিনি জোরের সহিত বলেন যে, ধনীরা তাহাদের ধন দরিদ্রদের পক্ষ হইতে অছি স্বরূপ রক্ষা করিতেছে, ইহাই মনে করিবে। ইহা অতি প্রাচীন মত। ইউরোপীয় মধ্যযুগে এবং ভারতবর্ষে ইহা সচরাচর শোনা যায়। আমি অকপটে স্বীকার করি, আমি ইহা বুঝিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম যে কেমন করিয়া একজন ব্যক্তি ধারণা করিতে পারে, এই উপায়ে সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যবস্থা পরিষদ প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, অতি অল্প লোকই ইহার নীরস কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করিত। সহসা একদিন কঠিন জাগরণ আসিল, ভগৎ সিং এবং বি. কে. দত্ত দর্শকের আসন হইতে সভার মেঝেয় দুইটি বোমা নিক্ষেপ করিল। কেহ গুরুতর আহত হন নাই, সম্ভবতঃ বোমা নিক্ষেপের সে উদ্দেশ্যও ছিল না। অপরাধীরা পরে স্বীকার করিয়াছিল যে, কাহাকেও আহত করার ইচ্ছা তাহাদের ছিল না, একটা গোলমাল ও উত্তেজনা সৃষ্টিই তাহাদের লক্ষ্য ছিল।

তাহারা ব্যবস্থা পরিষদ এবং বাহিরেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। টেরোরিষ্টদের অন্যান্য কাজ এরূপ নিরাপদ ছিল না। লালা লজপৎ রায়কে আঘাতকারী বলিয়া বর্ণিত একজন যুবক ইংরাজ পুলিশ কর্মচারীকে লাহোরে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। বাঙ্গালা ও অন্যান্য স্থানেও টেরোরিষ্ট কার্যপ্রণালীর পুনরারম্ভের সূচনা দেখা গিয়াছিল। কতকগুলি ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের হইল এবং বিনা বিচারে বন্দী ও অন্তরীণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় আদালতের মধ্যে পুলিশ কতকগুলি অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করিল, যাহার ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে এই মামলার উপর পতিত হইল। আদালতে এবং কারাগারে এই শ্রেণীর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদস্বরূপ অধিকাংশ বন্দী অনশন-ব্রত গ্রহণ করিল। ইহার সূচনার কারণ আমি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু পরিণামে ইহা কয়েদীদের প্রতি ব্যবহার, বিশেষতঃ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের সমস্যায় পর্যবসিত হইয়াছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনশন চলিতে লাগিল এবং দেশে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। অভিযুক্তদের শারীরিক দুর্বলতার জন্য তাহাদিগকে আদালতে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না এবং পুনঃ পুনঃ মামলা স্থগিত রাখিতে হইল। ফলে, গভর্নমেণ্ট এক আইন করিয়া দিলেন যে, আদালতে অভিযুক্ত এবং তাহাদের উকীলদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের বিচার চলিতে পারিবে। অন্য দিকে কারাগারের ব্যবহার সম্পর্কেও তাঁহারা বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

অনশন ধর্মঘটের এক মাস পর আমি একবার লাহোরে গিয়াছিলাম। জেলে গিয়া কয়েকজন বন্দীর সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেওয়া হইল;

এই সুযোগ আমি গ্রহণ করিলাম। এই প্রথম আমি ভগৎ সিং, যতীন দাস এবং আরও কয়েকজনকে দেখিলাম। ইহারা অত্যন্ত দুর্বল এবং শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের সহিত বেশীক্ষণ কথাবার্তা বলা সম্ভব নহে। ভগৎ সিংয়ের মুখমণ্ডল কমনীয়, বুদ্ধিদীপ্ত এবং বিশেষভাবে প্রশান্ত মনে হইল। তাহার মুখে কোন ক্রোধের চিহ্ন ছিল না। তাহার ব্যবহার ও কথাবার্তা অত্যন্ত ভদ্র। অবশ্য আমার মনে হয় এক মাস উপবাসের পর সকলকেই এইরূপ শান্ত দেখায়। যতীন দাস অধিকতর নম্র, কুমারী কন্যার মত কোমল ও শান্ত। যখন আমি তাহাকে দেখি, তখন তাহার অত্যন্ত যন্ত্রণা ছিল। ইহার কিছুদিন পরেই একষট্টি দিন উপবাসের ফলে তাহার মৃত্যু হয়।

ভগৎ সিংয়ের কথায় মনে হইল, ১৯০৭ সালে লালা লাজপৎ রায়ের সহিত নির্বাসিত তাহার খুল্লতাত সর্দার অজিৎ সিংহকে সে একবার দেখিতে চাহে, অন্ততঃপক্ষে তাহার সংবাদ চাহে। তিনি দীর্ঘকাল বিদেশে নির্বাসিত। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতেছেন এমনি একটা গুজব ছিল বটে, কিন্তু আমি তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই; তিনি মৃত কি জীবিত, আমি জানি না।

যতীন দাসের মৃত্যুতে দেশব্যাপী চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইল। ইহার ফলে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের প্রশ্ন মুখ্য হইয়া উঠিল এবং গভর্ণমেণ্ট ইহার অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিল। এই কমিটির সিদ্ধান্তের ফলে বন্দীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের বিশেষ কোন শ্রেণী করা হইল না। এই সকল নূতন নিয়মের ফলে আশা করা গিয়াছিল যে, অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে, কিন্তু কার্যতঃ অল্প পার্থক্যই হইয়াছে—যেমন ছিল তেমনি অসন্তোষজনকই রহিয়াছে। ক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা গত হইয়া শরৎকালের উদয় হইল। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে ব্যস্ত হইলেন। এই নির্বাচনের প্রণালী অত্যন্ত দীর্ঘ এবং ইহাতে আগষ্ট হইতে অক্টোবর পর্যন্ত সময় লাগিল। ১৯২৯ সালে সকলে একবাক্যে গান্ধিজীকেই সমর্থন করিতে লাগিল। গান্ধিজীকে দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতিরূপে পাইবার এই আগ্রহ নিশ্চয়ই তাঁহাকে কংগ্রেসে অধিকতর সম্মানিত পদ দিবার জন্য নহে; কেন না কয়েক বৎসর ধরিয়াই তিনি কংগ্রেসের মহা সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন। যাহা হউক, সকলের ধারণা হইল যে, সঙ্ঘর্ষ আসন্ন এবং কার্যতঃ তাঁহাকেই ইহার নেতৃত্ব করিতে হইবে। কাজেই এবার অন্ততঃ নামেও তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হউন। ইহা ছাড়া, তিনি ব্যতীত সভাপতি পদের যোগ্য ব্যক্তি অন্য কেহ ছিলেন না।

অতএব, প্রাদেশিক কমিটিগুলি গান্ধিজীকেই সভাপতি পদে মনোনীত করিলেন। কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না। তাঁহার আপত্তি তীব্র হইলেও যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝাইলে তিনি পুনর্বিবেচনা করিবেন, এইরূপ আশা হইল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য লক্ষ্ণৌয়ে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইল এবং আমাদের ধারণা ছিল যে, তিনি রাজী হইবেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না এবং শেষ মুহূর্তে আমার নাম উপস্থিত করিলেন। তাঁহার চূড়ান্ত আপত্তিতে সকলেই অবাক হইলেন এবং এই সঙ্কটে পতিত হইয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তও হইলেন। অন্য লোকের অভাবে অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহারা আমাকেই নির্বাচিত করিলেন।

এই নির্বাচনে আমি যত বিব্রত ও অপমানিত বোধ করিলাম, পূর্বে কখনও তাহা করি নাই। আমি যে এই সম্মান সম্পর্কে সচেতন নহি এমন নহে; ইহা এক মহৎ সম্মান। সাধারণভাবে নির্বাচিত হইলে আমি আনন্দিত হইতাম।

কিন্তু সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া, এমন কি সম্মুখের কোন দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া পশ্চাৎ দ্বার দিয়া হতভম্ব দর্শকবৃন্দের সম্মুখে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা যথাসম্ভব ভব্যতা রক্ষা করিয়া তিক্ত ঔষধের মত আমাকে গলাধঃকরণ করিলেন। আমার আত্মাভিমান আহত হইল এবং এই সম্মান ফিরাইয়া দিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি এইরূপ নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা না করিয়া আত্মসম্বরণ করিলাম এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দূরে সরিয়া গেলাম।

সম্ভবতঃ, এই সিদ্ধান্তে আমার পিতাই সর্বাপেক্ষা সুখী হইয়াছিলেন। আমার রাজনীতি তাঁহার সম্পূর্ণ ভাল না লাগিলেও আমাকে তিনি অতিরিক্ত ভালবাসিতেন এবং আমার কল্যাণে সুখী হইতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমার সমালোচনা করিতেন এবং কর্কশ কথাও বলিতেন; কিন্তু অপরে তাঁহার সম্মুখে আমার নিন্দা করিলে তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না।

আমার নির্বাচন একদিকে যেমন বৃহৎ সম্মান, অন্যদিকে তেমনি গভীর দায়িত্ব। পিতার অব্যবহিত পরেই পুত্রের সভাপতি পদ লাভ এক অভিনব ঘটনা। অনেকে বলেন যে, আমিই কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ সভাপতি—তখন আমার বয়স চল্লিশ বৎসর। কিন্তু ইহা সত্য নহে। আমার মনে হয়, গোখ্লের বয়সও এইরূপ ছিল এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (যদিও আমা অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়) যখন সভাপতি হইয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স সম্ভবতঃ চল্লিশের নীচে ছিল। গোখ্লের বয়স যখন ত্রিংশ-দশকের মধ্যে তখনই তিনি একজন প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং আবুল কালাম আজাদ তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনুরূপ শ্রদ্ধা-ভাজন ব্যক্তির মত অবয়ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। রাজনীতির পণ্ডিত বলিয়া আমার কোন খ্যাতি ছিল না এবং আমি একজন মহা পণ্ডিত ব্যক্তি এ অপবাদ কেহই আমাকে দেয় নাই। যদিও আমার চুল পাকিয়াছে এবং আমার অবয়বের পরিবর্তন হইয়াছে, তথাপি বয়স্ক ব্যক্তি বলিয়া অপবাদের হাত হইতে এ যাবৎ নিষ্কৃতি পাইয়া আসিতেছি।

লাহোর কংগ্রেস নিকটবর্তী হইল। ইতিমধ্যে ঘটনারাজি যেন তাহার আভ্যন্তরীণ শক্তিতে সম্মুখে দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। যে যতই সাহসিকতা দেখাক না কেন, ইহার উপর কাহারও হাত ছিল না। যেন এক বৃহৎ যন্ত্র অন্ধগতিতে চলিয়াছে এবং আমরা তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকা মাত্র।

নিয়তির এই দুর্বার গতি রোধ করিবার জন্যই সম্ভবতঃ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এক পদ অগ্রসর হইলেন এবং বড়লাট লর্ড আরুইন গোল টেবিল বৈঠকের বার্তা ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণা-বাণী অতি কৌশলপূর্ণ ভাষার আবরণে প্রকাশিত হইল। ইহার অর্থ অনেক কিছু হইতে পারে অথবা কিছুই নহে এবং আমাদের নিকট ইহা অনিশ্চিত বলিয়াই প্রতিভাত হইল। এমন কি, যদি এই ঘোষণার মধ্যে সার পদার্থ কিছু থাকে, তাহা আমাদের প্রত্যাশা হইতে অনেক কম। বড়লাটের ঘোষণার অব্যবহিত পরেই অশোভনীয় ব্যস্ততার সহিত দিল্লীতে এক "নেতৃ-সম্মেলনের" আয়োজন হইল। বিভিন্ন দলের ব্যক্তিরাই ইহাতে আহূত হইলেন। গান্ধিজী গেলেন, আমার পিতাও গেলেন; বিঠলভাই প্যাটেল (তখনও ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সার তেজ বাহাদুর এবং অন্যান্য মডারেট নেতারাও উপস্থিত হইলেন। একটি সম্মিলিত প্রস্তাব অথবা ইস্তাহার রচনা হইল এবং কতকগুলি সর্তে বড়লাটের ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হইল। তবে ইহা উল্লেখ থাকিল যে, ঐগুলি জরুরী এবং উহা পূর্ণ করিতে হইবে। যদি

গভর্ণমেণ্ট ঐগুলি গ্রহণ করেন, তবে সহযোগিতা করা হইবে। এই সর্তগুলি* অতি বাস্তব এবং দৃঢ় ছিল এবং ইহার ফলে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারিত।

মডারেট এবং অন্যান্য অগ্রগামী দলের প্রতিনিধিবর্গকে এই প্রস্তাবে সম্মত করান নিশ্চয়ই একটা সাফল্য। কিন্তু কংগ্রেসের দিক দিয়া ইহা অনেকাংশে অবতরণ; কিন্তু সম্মিলিত ঐক্যমতের দিক দিয়া ইহা ঊর্ধ্বে অবরোহণ। কিন্তু ইহার মধ্যেও ধ্বংসের বীজ ছিল। এই সর্তগুলিকে লইয়া অন্ততঃ দুই পৃথক দৃষ্টিতে বিচার চলিল। কংগ্রেসপন্থীদের দৃষ্টিতে ইহা অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য —যাহার কমে সহযোগিতা চলিতে পারে না। কেন না, ইহাই তাহাদের সর্বনিম্ন প্রয়োজন। পরবর্তী কার্যকরী সমিতির সভায় ইহা পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করা হইল এবং আরও স্থির হইল যে, মাত্র আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত এই সর্তগুলি বলবান থাকিবে। মডারেটগণের মতে ঐ সর্তগুলি হইল সর্বোচ্চ কাম্য কিন্তু সহযোগিতা অস্বীকার করিয়া ঐগুলির দাবী করা উচিত নহে। ঐ সর্তগুলিকে তাঁহারা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিলেন, কিন্তু ঠিক সর্ত হিসাবে দেখিলেন না।

পরে দেখা গেল, যদিও উহার একটি সর্তও পূরণ হয় নাই এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র ব্যক্তির সহিত আমরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলাম, তবুও আমাদের মডারেট ও রেসপনসিভিষ্ট বন্ধুরা—যাঁহারা আমাদের সহিত একত্রে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন—তাঁহারা আমাদের কারাধ্যক্ষদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। ইহা যে ঘটিবে, আমাদের অধিকাংশের মনেই এ আশঙ্কা ছিল; তথাপি কেহই এতটা প্রত্যাশা করি নাই। সম্মিলিত কার্যপদ্ধতির আশাতেই কংগ্রেসপন্থীরা নিজেদের এতখানি নত করিয়াছিলেন এবং তেমনি মডারেটরাও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত নির্বিচার ও নির্বিবেক সহযোগিতা করিবার রিপু দমন করিবেন, ইহাই কথা ছিল। কংগ্রেসের সৈন্যসামন্তবৃন্দকে সঙ্ঘবদ্ধ রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই আপোষ প্রস্তাবের সম্পর্কে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলাম। একটা বৃহৎ সংঘর্ষের সম্মুখে আমরা কিছুতেই কংগ্রেসে ভেদ সৃষ্টি হইতে দিতে পারি না এবং আমাদের প্রদত্ত সর্তগুলি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল। ইহাতে আমাদের অবস্থা শক্তিশালী হইল এবং আমরা সহজেই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের আমাদের সহিত টানিয়া লইয়া চলিলাম। আর কয়েক সপ্তাহ মাত্র বাকী, ডিসেম্বর এবং লাহোর কংগ্রেস অদূরবর্তী।

তথাপি সম্মিলিত ইস্তাহার আমাদের অনেকের নিকট তিক্ত বটিকার মত মনে হইতে লাগিল। স্বাধীনতার দাবী পরিত্যাগ করা—এমন কি কল্পনায় কিম্বা অল্প সময়ের জন্যও—অত্যন্ত ভুল এবং মারাত্মক। তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, [illegible] উহা একটা কৌশল মাত্র, স্বাধীনতা [illegible] আমাদের নিকট অপরিহার্য, উহা [illegible] না এমন [illegible] নহে। অতএব আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম এবং ইস্তাহারে দস্তখত করিতে অস্বীকার

* সর্তগুলি এই—(১) পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তির উপর প্রস্তাবিত বৈঠকে আলোচনা হইবে, (২) বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যা অধিক সংখ্যক হইবে, (৩) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে, (৪) এখন হইতেই [illegible] সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্টের ধারায় কার্যপ্রণালী পরিচালনা করিতে থাকিবেন।

করিলাম। (সুভাষ বসু দৃঢ়তার সহিত স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলেন) কিন্তু আমার পক্ষে ইহা নূতন কথা নহে; বলিয়া কহিয়া আমাকে রাজী করিয়া নাম দস্তখৎ লওয়া হইল। তাহার পরেও অত্যন্ত অশান্তি লইয়া আমি চলিয়া আসিলাম এবং স্থির করিলাম, পরদিন কংগ্রেসের সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিব। এই মর্মে গান্ধিজীর নিকট একখানি পত্র দিলাম। যদিও আমি যথেষ্ট বিচলিত হইয়াছিলাম, তথাপি আমি যে এই কাজ দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত করিয়াছিলাম, এমন মনে হয় না। গান্ধিজীর নিকট হইতে একখানি মধুর পত্র পাইয়া এবং তিন দিন চিন্তা করিয়া আমি শান্ত হইলাম।

লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে আপোষের জন্য আর একবার সর্বশেষ চেষ্টা করা হইল। বড়লাট লর্ড আরুইনের সহিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইল। কাহার মধ্যস্থতায় এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইয়াছিল আমি জানি না, কিন্তু আমার মতে বিঠলভাই প্যাটেলই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সাক্ষাৎকারের সময় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গান্ধিজী এবং আমার পিতা উপস্থিত ছিলেন এবং মনে হয়, মিঃ জিন্না, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং সভাপতি প্যাটেলও উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকারে কোনও ফল হইল না, কোন সাধারণ ভূমি নির্দিষ্ট হইল না এবং গভর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেস—এই দুই প্রধান পক্ষ পরস্পর হইতে বহুদূরে প্রতিভাত হইলেন। অতএব, কংগ্রেসের পক্ষে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। কলিকাতার প্রস্তাবানুযায়ী বর্ষ শেষ হইয়া আসিল; কংগ্রেসের চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণা করিয়া উহা লাভের জন্য সংঘর্ষ চালাইবার আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

লাহোর কংগ্রেসের এই কয় সপ্তাহ পূর্বে ক্ষেত্রান্তরে আমাকে আর একটি গুরুতর কাজ করিতে হইল। নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে এই বৎসরের নির্দিষ্ট সভাপতিরূপে আমাকেই সভাপতিত্ব করিতে হইল। কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে একই ব্যক্তির পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসে ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যুগপৎ সভাপতিত্ব করা এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। আমার আশা ছিল যে, যোগসূত্ররূপে আমি এই উভয় প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ করিব—জাতীয় কংগ্রেস অধিকতর সমাজতান্ত্রিক এবং অধিকতর গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে এবং জাতীয় সংঘর্ষের জন্য শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিবে।

কিন্তু সম্ভবতঃ এ আশা নিষ্ফল, কেন না, জাতীয়তাবাদ নিজেকে বিসর্জন দিয়াই সমাজতান্ত্রিক বা সর্বহারাদের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী বুর্জোয়া হইলেও ইহাই দেশের বৈপ্লবিক শক্তির প্রতিনিধি। অতএব শ্রমিকশক্তি নিজেদের মতবাদ ও স্বাতন্ত্র্য সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াও ইহার সহিত সহযোগিতা ও ইহাকে সাহায্য করিতে পারে। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্যপদ্ধতির গতিপথে কংগ্রেস অধিকতর চরম মতবাদ গ্রহণ করিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইবে। গত কয়েক বৎসরে কংগ্রেস কৃষক ও পল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। যদি এই গতি অব্যাহত থাকে তাহা হইলে একদিন কংগ্রেস বিরাট কৃষক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে, কিম্বা অন্ততঃপক্ষে কৃষকেরাও কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। আমাদের যুক্তপ্রদেশের বহু জিলা কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ সদস্যই কৃষক; অবশ্য নেতৃত্ব মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের হাতেই রহিয়াছে।

জাতীয় কংগ্রেস ও শ্রমিক কংগ্রেসের সম্পর্ক পল্লী ও নগরের বাঞ্ছিত বিরোধের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কিন্তু ইহার সম্ভাবনা সুদূর-

পরাহত। বর্তমানে নগরী হইতে মধ্যশ্রেণীর লোকেরাই জাতীয় কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং যে পর্যন্ত জাতীয় স্বাধীনতার সমাধান না হইতেছে ততদিন রাষ্ট্রক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য থাকিবে এবং দেশের চিত্তে জাতীয় ভাবই প্রবল শক্তিরূপে কার্য করিবে। তথাপি আমি কংগ্রেসের সহিত সংঘবদ্ধ শ্রমিকশক্তির ঘনিষ্ঠতার পক্ষপাতী ছিলাম। এমন কি আমরা শ্রমিক কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখা হইতে আমাদের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে প্রতিনিধি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। অনেক কংগ্রেসপন্থী শ্রমিক আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রমিক দলের অগ্রগামী অংশ কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিতেই ভালবাসিতেন। তাঁহারা কংগ্রেস নেতাদের অবিশ্বাস করিতেন এবং শ্রমিকদের দিক হইতে তাঁহাদের মতবাদকে বুর্জোয়া ও প্রগতিবিরোধী বলিতেন। কংগ্রেস যে জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান, তাহার নামেই সে প্রমাণ রহিয়াছে।

ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত রয়াল কমিশন, অর্থাৎ —হুইটলী কমিশন লইয়া ১৯২৯ সালে শ্রমিকমহলে অত্যন্ত বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। বামপন্থীরা কমিশন বয়কট করিতে চাহিলেন। দক্ষিণপন্থীরা সহযোগিতার পক্ষপাতী হইলেন। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যাপারও ছিল, কেন না দক্ষিণপন্থী নেতাদের কমিশনের সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। অন্যান্য ব্যাপারের মত এ ক্ষেত্রেও আমার সহানুভূতি ছিল বামপন্থীদের দিকে, বিশেষতঃ জাতীয় কংগ্রেসও বর্জননীতিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন আমরা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে যাইতেছি, তখন সরকারী কমিশনের সহযোগিতা করা হাস্যকর বলিয়া মনে হইল।

নাগপুর শ্রমিক কংগ্রেসে হুইটলী কমিশন বয়কট করার প্রশ্নই মুখ্য হইয়া উঠিল এবং এই বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে বামপন্থীরাই জয়লাভ করিলেন। এই কংগ্রেসে আমি উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করি নাই। শ্রমিক আন্দোলনে আমি নবাগত এবং এখনও আমি ইহার আটঘাট বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া সঙ্কোচ অনুভব করিলাম। সাধারণতঃ আমি অগ্রগামীদলের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেও কোন দলের সহিত যোগ দিয়া কাজ করিতে বিরত থাকিলাম এবং সভাপতির আসন হইতে নির্দেশ দিবার পরিবর্তে আমি নিরপেক্ষ বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। আমি নিষ্ক্রিয় দর্শকরূপে দেখিলাম, শ্রমিক কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হইল এবং এক নূতন মডারেট প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল। ব্যক্তিগতভাবে আমি দক্ষিণপন্থীদের নূতন প্রতিষ্ঠান অযৌক্তিক বলিয়াই মনে করিলাম। কিন্তু বামপন্থী কয়েকজন নেতার জিদ এবং অপরকে বহিষ্কৃত করিবার কৌশলের ফলেই ইহা সম্ভব হইল। এই উভয় পক্ষের কলহের মধ্যে মধ্যপন্থীরা নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। সম্ভবতঃ যোগ্য নেতা থাকিলে উভয় পক্ষকেই সংযত করিয়া ঐ বিচ্ছেদ নিবারণ করিতে পারিতেন এবং যদি বিচ্ছেদও হইত তাহা হইলেও তাহা পরবর্তী শোচনীয় ঘটনাবলীতে পর্যবসিত হইত না।

ইহার ফলে শ্রমিক আন্দোলন যে প্রচণ্ড আঘাত পাইল, অদ্যাপি তাহা সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। গভর্ণমেণ্ট তখন অগ্রগামী দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন এবং মীরাট মামলা তাহার প্রথম ফল। সরকারী দমননীতি চলিল এবং মালিকেরাও সেই সুযোগে নিজেদের ঘর সামলাইতে লাগিল। ১৯২৯-৩০-এর শীতকালে [illegible] অর্থসঙ্কট দেখা দিল, ইহাতে আহত হইয়া এবং চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ট্রেড ইউনিয়নগুলি দুর্বল হইয়া পড়িল।

শ্রমিকেরা অসহায় দর্শকের মত নিজেদের অবস্থার ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। আগামী দুই-এক বৎসরের মধ্যে শ্রমিক কংগ্রেস আরও বিচ্ছিন্ন হইল, একদল কম্যুনিস্ট বাহিরে চলিয়া গেল। এইরূপে তিনটি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান দেখা দিল; মডারেট দল, মূল শ্রমিক কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট দল। কার্যতঃ তিন দলই শক্তিহীন ও দুর্বল হইয়া পড়িল; এবং ইহাদের আত্মকলহের ফলে শ্রমিক সাধারণও বিরক্ত হইয়া উঠিল। ১৯৩০ হইতে আমি ইহার বাহিরে ছিলাম। কেন না ইহার পর অধিকাংশ সময় আমাকে কারাগারেই কাটাইতে হইয়াছে। আমার সংক্ষিপ্ত ও সাময়িক কারামুক্তির সময় শুনিতে পাইতাম যে বিরোধ-মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই।* মডারেট ইউনিয়নগুলির সহিত রেলওয়ে শ্রমিকেরা যোগ দেওয়ায় উহা শক্তিশালী হইয়াছিল। অন্যান্য দল অপেক্ষা এই দলের আরও সুযোগ ছিল যে, গভর্ণমেণ্ট এই দলকে গ্রাহ্য করিতেন এবং জেনেভার শ্রমিক সম্মেলন এই দলের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতেন। জেনেভা যাইবার লোভে অনেক শ্রমিক নেতা স্ব স্ব ইউনিয়ন সহ এই দলে যোগ দিয়াছিলেন।

২৮

স্বাধীনতা এবং তাহার পর

লাহোর কংগ্রেসের স্মৃতি আমার চিত্তপটে উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক। এখানে আমিই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলাম এবং সাময়িকভাবে রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থল আমিই অধিকার করিয়াছিলাম। ঐ কর্মব্যস্ত দিন কয়েকটির অপূর্ব ভাবোন্মাদনা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। লাহোরের অধিবাসীরা আমার অভ্যর্থনার জন্য যে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন তাহার সমারোহ, আন্তরিকতা ও আনন্দোচ্ছ্বাস আমি জীবনে ভুলিব না। আমি জানি আমার ব্যক্তিত্বের জন্য নহে, একটি আদর্শের প্রতীককে লক্ষ্য করিয়াই এই উৎসাহের উন্মাদনা; তথাপি ক্ষণকালের জন্য অগণিত নরনারীর দৃষ্টিতে ও হৃদয়ে সেই প্রতীকরূপে গৃহীত হওয়া ব্যক্তির পক্ষেও কম কথা নহে। আমার মন আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিল। কিন্তু যে বৃহৎ সমস্যা সম্মুখে, তাহার নিকট আমার ব্যক্তিগত মনোভাব অতি তুচ্ছ। গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যভরা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় যেন বজ্র ও বিদ্যুৎ স্তম্ভিত হইয়া আছে। এবার আমাদের সিদ্ধান্ত কেবল সমালোচনা নহে, প্রতিবাদ নহে, মত প্রকাশ নহে, এখন হইতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের যে আহ্বান ধ্বনিত হইবে, তাহার ফলে সমস্ত দেশ আলোড়িত এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে বিশাল বিপর্যয় উপস্থিত হইবে।

দূর ভবিষ্যতে আমাদের ও দেশের ভাগ্যে কি আছে, কেহই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যৎ স্পষ্ট—সেখানে সংঘর্ষ এবং নিজেদের প্রিয়জনের দুঃখভোগ। এই চিন্তায় আমাদের উৎসাহের উচ্ছ্বাস প্রশান্ত হইল এবং আমাদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন হইয়া উঠিলাম। আমাদের প্রত্যেকটি ভোট হইবে আরাম, আয়েস, পারিবারিক সুখশান্তি ও বন্ধু সম্মেলনের বিদায় অভিনন্দন

---

* পরবর্তী চেষ্টায় শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা অধিকতর কার্যকরী হইয়াছিল এবং বর্তমানে সকল দলই সহযোগিতার সহিত কার্য করিতেছে।

এবং নিঃসঙ্গ দিবারাত্রি, দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার আমন্ত্রণ-লিপি।

পূর্ণ স্বাধীনতার মূল প্রস্তাব এবং স্বাধীনতা সংঘর্ষের কার্যপ্রণালী প্রায় সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইল, কয়েক সহস্রের মধ্যে একশতেরও কম ব্যক্তি বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। মূল প্রস্তাবের একটি অংশ লইয়া একটি সংশোধিত প্রস্তাবে প্রকৃত ভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল। সংশোধক প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটসংখ্যা গণনা ও ঘোষণার পর উহা পরিত্যক্ত হইল। পরিশেষে ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে পুরাতন বর্ষ শেষে, নব বর্ষারম্ভের মুহূর্তে, মূল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ইহা যেন কাকতালীয়বৎ; কেন না কলিকাতা কংগ্রেস-নির্দিষ্ট এক বৎসর সময় ঠিক সেই মুহূর্তেই শেষ হইল এবং নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সংঘর্ষের আয়োজন আরম্ভ হইল। কর্মচক্র ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু কখন, কি ভাবে, কোথায় আরম্ভ, তাহা আমরা অন্ধকারে তখন বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সংঘর্ষের কার্যক্রম নির্দেশ করিবার ভার নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর অর্পিত হইল কিন্তু আমরা সকলেই বুঝিলাম, গান্ধিজীর উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

লাহোর কংগ্রেসে পার্শ্ববর্তী সীমান্ত প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিল। এই প্রদেশ হইতে অল্পবিস্তর প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগ দিতেন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ কংগ্রেসে আসিয়া আলোচনায় যোগ দিতেছিলেন। লাহোরেই প্রথম সীমান্ত প্রদেশের বহু যুবক নিখিল ভারতীয় রাজনীতির সংস্পর্শে আসিলেন। তাঁহাদের নবীন ও সতেজ মনে ইহা রেখাপাত করিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সমস্ত ভারতবর্ষের সহিত ঐক্যবোধ এবং উৎসাহ লইয়া তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন। ইহারা সরল ও কর্মকুশল; অন্যান্য প্রদেশের লোক অপেক্ষা ইঁহারা কথাবার্তায় বাগবিতণ্ডা কম করেন। তাঁহারা ফিরিয়া গিয়া নূতন ভাব প্রচার এবং জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সাফল্যলাভ করিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নবাগত সৈনিকরূপে সীমান্তের নরনারীরা ১৯৩০-এর সংঘর্ষে অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই আমার পিতা কংগ্রেসের নির্দেশানুসারে ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলির সদস্যপদে কংগ্রেসী সদস্যদিগকে ইস্তফা দিতে আহ্বান করিলেন। প্রায় সকলেই এই নির্দেশানুসারে কার্য করিলেন, অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই নির্বাচন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পদত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন।

ভবিষ্যৎ তখনও অনিশ্চিত। কংগ্রেসে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সত্ত্বেও, দেশ কি ভাবে সাড়া দিবে সে সম্বন্ধে কাহারও কোন ধারণা ছিল না। আমরা তো তরী ডুবাইয়া দিয়া সম্মুখে চলিয়াছি, কিন্তু কোন অপরিচিত অজানা রাজ্যে, কে জানে! সংগ্রামের সূচনার জন্য এবং দেশবাসীর মনোভাব বুঝিবার জন্য ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস নির্দিষ্ট হইল। স্থির হইল, ঐ দিবস দেশের সর্বত্র পূর্ণ স্বরাজ্য সঙ্কল্প গৃহীত হইবে।

আমাদের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে সন্দেহ সত্ত্বেও আশা ও উৎসাহ লইয়া আমরা ঘটনার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে আমি এলাহাবাদেই ছিলাম, পিতা বাহিরে ছিলেন। এই সময় প্রতি বৎসর মাঘ মেলা হয় এ বৎসর কুম্ভমেলা ছিল। লক্ষ লক্ষ নরনারী জনস্রোতের মত এলাহাবাদে—তীর্থযাত্রীদের জন্য পবিত্র প্রয়াগতীর্থে—আসিতে লাগিল। ইহাদের অধিকাংশই

কৃষক, তাহা ছাড়া শ্রমিক, দোকানদার, শিল্পী, ধনী, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন বৃত্তিজীবী —এককথায়, হিন্দু-ভারতের সর্বশ্রেণীর সমাবেশ। অবিরত জনস্রোত নদীতীরে যাইতেছে আসিতেছে; দেখিতে দেখিতে আমি উন্মনা হইয়া ভাবিতাম—নিরুপদ্রব প্রতিরোধ অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আহ্বানে ইহারা কিরূপ সাড়া দিবে! ইহাদের মধ্যে কয়জন লাহোর সিদ্ধান্ত জানে বা জানিবার আগ্রহ রাখে? সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অগণিত নরনারী ভারতের নানা প্রান্ত হইতে পবিত্র গঙ্গানীরে যে বিশ্বাস লইয়া অবগাহন করিতে আসিতেছে, তাহার কি আশ্চর্য শক্তি! এই অসামান্য শক্তির কিয়দংশ কি তাহারা নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নিয়োজিত করিতে পারে না? অথবা ইহাদের মন ধর্মের অনুশাসন ও পরম্পরাগত আচারের জালে এমন ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে সেখানে অন্য চিন্তার ঠাঁই নাই!

অবশ্য আমি জানি, এ সকল চিন্তা তাহাদের চিত্তে উদয় হইতেছে এবং বহু-যুগের প্রশান্ত বারিধি উদ্বেলিত হইতেছে। এই সকল অস্পষ্ট ধারণা ও আশা আকাঙ্ক্ষার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতেই জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই ফলে গত দ্বাদশ বৎসরের আলোড়নে ভারতবর্ষ দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে। নিশ্চয়ই ঐ সকল চিন্তা তাহাদের মনে আছে এবং তাহার পশ্চাতে সৃজনী শক্তিও কার্য করিতেছে। তবুও সন্দেহ জাগে, প্রশ্ন উঠে; সহসা উত্তর খুঁজিয়া পাই না। এই সকল নূতন ভাব কতটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে? ইহাদের শক্তি কত, সংঘবদ্ধভাবে কার্য করিবার সামর্থ্য এবং সহ্যশক্তি কতখানি?

আমাদের বাড়ীতেও যাত্রীর ভীড় হইতে লাগিল। আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে ভরদ্বাজ আশ্রম—অতি প্রাচীনকালের বিদ্যায়তন। তীর্থযাত্রীরা এই আশ্রম দেখিবার অবসরে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের বাড়ীতেও আসিত। আমার মনে হয়, তাহারা বিখ্যাত যে সকল ব্যক্তির নাম শুনিয়াছে, তাহাদের এবং কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া বিশেষভাবে আমার পিতাকে দেখিতে আসিত। ইহাদের মধ্যে অনেকে রাজনীতির খোঁজ খবর রাখিত। ইহারা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কথা, ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালীর কথা জিজ্ঞাসা করিত। অনেকেই অর্থনৈতিক পীড়ন অনুভব করিতেছিল, তাহারা কি করিতে হইবে জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিত। আমাদের রাজনৈতিক ধ্বনিগুলি তাহাদের সুপরিচিত এবং আমাদের বাড়ী অহোরাত্র সেই সকল চীৎকারে প্রতিধ্বনিত হইত। সকাল হইতে আমি পাঁচিশ, পঞ্চাশ অথবা একশ' জনকে কিছু কিছু বলিতাম, এক দলের পর অপর দল; প্রত্যেক দলের সম্মুখে কিছু বলা অসম্ভব হইয়া উঠিত। অবশেষে নীরবে প্রত্যেক নবাগত দলকে অভিবাদন ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিতাম না। কিন্তু ইহারও সীমা আছে, অবশেষে আমি লুকাইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। জয়ধ্বনি ক্রমশঃ গ্রামে গ্রামে উঠিয়া উচ্চতর হইত, দর্শনার্থীরা বারান্দা ভরিয়া ফেলিত; প্রত্যেক দরজা জানালায় দশ-বার জোড়া তৃষিত চক্ষু উন্মুখ হইয়া থাকিত। এই অবস্থায় কথা বলা, খাওয়াদাওয়া করা, এমন কি, কোন কাজ করাই কঠিন। ইহা কেবল সঙ্কট নহে, এক বিরক্তিকর ঝকমারী। কিন্তু তথাপি তাহারা উজ্জ্বল স্নেহার্দ্র দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকে। পুরুষানুক্রমে বহুকাল দারিদ্র্য দুঃখে পিষ্ট হইয়াও, ইহাদের হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা ও প্রেম উথলিয়া উঠিতেছে; ইহারা একটু সহানুভূতি ও আদর ছাড়া কোন প্রতিদান চাহে না। এই অপরিমিত ভক্তি ভালবাসার সম্মুখে হৃদয় আপনা হইতেই সম্ভ্রমভরে নত হইয়া পড়ে।

এই সময় আমাদের এক প্রিয় বান্ধবী আমাদের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ

করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত বসিয়া একটু আলাপ করিবারও সময় পাইতাম না। প্রতি চার পাঁচ মিনিট অন্তর আমাকে বাহিরে গিয়া জনতাকে দুই-চার কথা বলিতে হইত—আর জয়ধ্বনি তো সব সময় লাগিয়াই আছে। আমার বান্ধবী আমার এই অবস্থা দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, জনসাধারণের উপর আমার অসামান্য প্রভাব। আসলে পিতার জন্য ইহারা আসিতেছিল এবং পিতার অনুপস্থিতির ফলেই আমাকে এই সংগীতের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। তিনি সহসা আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, এই বীরপূজা তোমার কেমন লাগিতেছে? তোমার মনে কি অহঙ্কার হইতেছে? আমি উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া তিনি সম্ভবতঃ ভাবিলেন, একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন বলিয়া আমি বিরত বোধ করিতেছি। তিনি ক্ষমা চাহিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে মোটেই বিব্রত করেন নাই। এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন আমার মন দূর-দূরান্তরে চলিয়া গেল এবং নিজের মনোভাব আমি বিশ্লেষণ করিতে লাগিলাম। সত্যই আমার মনে বিমিশ্র ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল।

ইহা সত্য যে, ঘটনাচক্রে আমি সাধারণের মধ্যে অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। শিক্ষিত ব্যক্তিরা আমার অনুরাগী; যুবক যুবতীদের নিকট আমি একজন বীর, তাহাদের দৃষ্টিতে আমার চারিদিকে 'রোমান্সের' পরিমণ্ডল। আমার নামে সংগীত রচিত হইয়াছিল এবং হাস্যকর বীরত্ব-কাহিনী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, আমার প্রতিপক্ষরা পর্যন্ত আমার প্রশংসা করিতেন এবং সহৃদয় মুরুব্বীর মত আমার যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করিতেন।

হয় মহা সাধু, নয় হৃদয়হীন দানব, ইহাতে অক্ষত ও অবিচলিত থাকিতে পারে; আমি দুইয়ের কোনটাই নহি। ইহা আমার মস্তিষ্কে উন্মাদনা সঞ্চার করিত এবং শক্তি ও আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিত। আমি কাজে কর্মে (নিজেকে পরের দৃষ্টিতে দেখা সব সময়ই কঠিন) একটু 'ডিক্টেটর'-ধরণের প্রভুত্বপ্রয়াসী হইয়া পড়িতেছি (আমার কল্পনা) বলিয়া মনে হইত। অথচ আমার অহঙ্কার দৃশ্যতঃ বাড়িয়াছিল, এমন মনে হয় না। আমার নিজের শক্তি সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা আছে। তাহা লইয়া আমি অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করি না কিন্তু তাহা এমন কিছু অসাধারণ নহে এবং আমার দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধেও আমি সর্বদা সচেতন। আত্মানুসন্ধানের অভ্যাসের ফলেই সম্ভবতঃ আমার মাথা ঠিক থাকে এবং নিজের সম্বন্ধে অনেক ঘটনা আমি অনাসক্তের মত গ্রহণ করিতে পারি। জনসাধারণের কার্যে অভিজ্ঞতা হইতে আমি দেখিয়াছি জনপ্রিয়তা অবাঞ্ছনীয় লোকের হাতের পুতুল মাত্র; ইহা নিশ্চয়ই কোন গুণ বা বুদ্ধির নিদর্শন নহে। আমার অর্জিত গুণের জন্য, না, আমার দুর্বলতাগুলির জন্য আমি জনপ্রিয়! কেন আমার এই জনপ্রিয়তা?

আমার বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যের কোন বিশেষত্ব নাই এবং বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে জনপ্রিয় হওয়া যায়, এমন নহে। তথাকথিত ত্যাগের জন্যও যে আমি জনপ্রিয় তাহাও নহে। আমাদের সমসাময়িক কালেই ভারতবর্ষের শত সহস্র নরনারী কত বেশী দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়াছে, এমন কি আত্মত্যাগের শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়াছে। আমার বীরত্বখ্যাতি সম্পূর্ণরূপেই ভুয়া, আমি নিজের মধ্যে বীরত্বের কোন চিহ্নই দেখি না। সাধারণতঃ বীরোচিত ভাবভঙ্গী এবং জীবনে বীরত্বের নাটকীয় আস্ফালন আমার নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ লঘুতা বলিয়াই মনে হয়। আর 'রোমান্স'? সম্ভবতঃ আমি সর্বাধিক রোমান্স-হীন ব্যক্তি। অবশ্য আমার দৈহিক ও মানসিক সাহস আছে সত্য, কিন্তু তাহার ভিত্তি, সম্ভবতঃ

ব্যক্তিগত, দলগত এবং জাতীয়তার অহঙ্কার এবং ভয় দেখাইয়া বা জোর করিয়া কাজ করিতে বাধ্য হওয়ার প্রতি আমার অনিচ্ছা।

কিন্তু ইহাও আমার প্রশ্নের সদ্ত্তর নহে। তখন আমি অন্য দিকে অন্‌সন্ধানে প্রব্ত্ত হইলাম। আমি দেখিলাম, আমার ও আমার পিতার সম্বন্ধে এই কাহিনীটি প্রচলিত আছে যে, আমরা প্রতি সপ্তাহে ভারত হইতে প্যারীর ধোপাবাড়ীতে কাপড় কাচিতে পাঠাইতাম। আমরা বারম্বার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি, কিন্তু কাহিনী মরে নাই। ইহা অপেক্ষা অসম্ভব ও অদ্ভুত কিছ্ কল্পনা করা যাইতে পারে কি-না জানি না। তবে যদি কেহ এত ম্র্খ থাকে যে, এই শ্রেণীর বৈঠকী গাল-গল্প করিয়া অনাবশ্যক বাহাদ্রী লয়, তাহা হইলে আমার মতে তাহাকে ম্র্খোত্তম উপাধি দিয়া প্রস্কৃত করা উচিত।

এইর্প আর একটি গল্প প্নঃ প্নঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও এখনও চলিতেছে। স্কুলে, ইংলণ্ডের য্বরাজ নাকি আমার সহপাঠী ছিলেন। ১৯২১ সালে আমি যখন জেলে ছিলাম, তখন য্বরাজ ভারতে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন, এমন একটা কথাও রটনা আছে। কিন্তু কার্যতঃ আমি তাঁহার সহপাঠী তো ছিলামই না, এমন কি তাঁহার সহিত আমার কখনও দেখা করার বা কথা বলার স্যোগই হয় নাই।

একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে যে, আমার যতট্কু কুখ্যাতি বা জনপ্রিয়তা আছে, তাহার ভিত্তি এই শ্রেণীর কাহিনী। হয়ত তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়; কিন্তু উপরে এই শ্রেণীর আহাম্মকীর রং আছে; নতুবা এর্প গল্প সৃষ্টি হইত না। যাহাই হউক, অভিজাত সমাজে মেলামেশা, অলস বিলাসের প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনযাপন এবং পরে ঐগ্লি সর্বতোভাবে ত্যাগ;—এই ত্যাগের দ্বারা সহজেই ভারতীয় চিত্ত জয় করা যায়! কিন্তু খ্যাতির এই শ্রেণীর ভিত্তির উপর আমার অন্রাগ নাই।

নেতিবাচক গ্ণ অপেক্ষা ইতিবাচক ক্রিয়াশীল গ্ণেরই আমি পক্ষপাতী। ত্যাগের জন্যই ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ, আমার ভাল লাগে না। অন্যদিক হইতে আমি ত্যাগ ও সংযমের উপকারিতা স্বীকার করি। মানসিক ও আত্মোন্নতি সাধনের জন্য উহা আবশ্যক। ব্যায়ামবীর তাহার দেহ সবল ও স্স্থ রাখিবার জন্য যেমন সাদাসিধে ও নিয়মিত জীবন যাপন করিয়া থাকে, ইহা কতকটা সেই শ্রেণীর। যাহারা দ্ঃসাধ্য সাধনে প্রব্ত্ত হয় তাহাদের কঠিন আঘাত সহ্য করিয়াও উদ্যমের সহিত কাজ করার শক্তি আবশ্যক। কিন্তু সন্ন্যাসীর মত জীবনকে অস্বীকার, আনন্দ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ান্ভূতি সম্পর্কে আতঙ্ক ও কঠোরতার প্রতি আমার আকর্ষণ নাই, উহা আমার ভালও লাগে না। যাহা আমার কামনার বস্তু, তাহা কখনও ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করি নাই; কিন্তু কাম্য বস্তুরও পরিবর্তন আছে।

কিন্তু ইহাতেও আমার বান্ধবীর প্রশ্নের উত্তর অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল; জনতার এই বীরপূজা দেখিয়া আমি গর্ব বোধ করি কি-না? আমার ইহা ভাল লাগে না, দ্রে পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হয়; তব্ ইহাতে আমি অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। এই সম্মান না পাইলে অভাবও বোধ হয়। কোন দিকেই প্র্ণ তৃপ্তি পাই না; তবে মোটের উপর জনতা আমার মনের গভীর ফাঁক প্র্ণ করিয়াছে। আমি জনতাকে ম্গ্ধ করিয়া ইচ্ছামত অগ্রণী হেজনে চালিত করিতে পারি; এই ধারণা হইতে তাহাদের মন ও হৃদয়ের উপর আমার প্রভুত্ববোধ জাগ্রত হইয়াছে এবং ইহাতে আমার শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা কতকাংশে চরিতার্থ হয়। অন্যদিকে তাহারাও আমার উপর স্ক্ষ্মভাবে অত্যাচার করে। আমার প্রতি তাহাদের বিশ্বাস, নির্ভরতা

ও ভালবাসায় আমার মর্মস্থল আলোড়িত হইয়া উঠে এবং উদ্বেলিত ভাবাবেগ তাহাদের প্রতি উচ্ছ্বসিতভাবে ছুটিয়া যায়। আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী; কিন্তু সময় সময় আমার ব্যক্তিত্বের বাঁধ গলিয়া ধ্বসিয়া পড়ে; মনে হয়, আত্মরক্ষা অপেক্ষা ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া অভিশপ্ত জীবন যাপন করাও শ্রেয়। কিন্তু ব্যবধান একেবারে বিলুপ্ত হয় না, দূর হইতে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি লইয়া আমি যে দৃশ্য দেখি, তাহার মর্ম সম্যক্ বুঝিতে পারি না।

আত্মাভিমান অনেকটা মেদ রোগের মত; অজ্ঞাতসারে ইহা স্তরে স্তরে বৃদ্ধি পায় এবং প্রাত্যহিক বৃদ্ধি কেহ বুঝিতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে এই উন্মত্ত জগতের কঠিন আঘাতে ইহা নত হয়; কখনও বা একেবারেই ধরাশায়ী হয় এবং অধুনা ভারতবর্ষে আমাদের জন্য এইরূপ কঠিন আঘাতের অভাব নাই। আমাদের পক্ষে জীবনের এই শিক্ষাগার অতি কঠিন স্থান, আর দুঃখ অতি নির্মম শিক্ষক।

আমার আরও সৌভাগ্য যে আমার পরিজনবর্গ বন্ধু ও সহকর্মীরা আমাকে যথাস্থানে রাখিয়াই ব্যবহার করিতেন এবং আমার মাথা গরম করিয়া দিতেন না। জনসভা, অভ্যর্থনা সভা, মিউনিসিপ্যালিটি, লোকালবোর্ড ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান হইতে অভিনন্দনপত্র দান প্রভৃতি ব্যাপারে আমার মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয় এবং রসবোধ শুকাইয়া ওঠে। আলঙ্কারিক ভাষায় অসম্ভব অতিশয়োক্তি শুনিয়া এবং চারিদিকে ভদ্রমহোদয়গণের গম্ভীর ও অমায়িক মূর্তি দেখিয়া আমার পক্ষে হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইয়া উঠিত; জিভ বাহির করিয়া ভ্যাংচাইলে অথবা সভাস্থলে ডিগ্‌বাজী খাইলে এই সকল সভ্য ভব্য ভদ্রমহোদয়গণের কি অবস্থা হয়, তাহা দেখিয়া আমোদ উপভোগের ইচ্ছা হইত। সৌভাগ্যক্রমে আমার খ্যাতি এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আমার দায়িত্ব স্মরণ করিয়া এই সকল উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা আমি দমন করিয়া বাহিরে শিষ্ট ব্যবহার করিতাম। কিন্তু সব সময় পারিতাম না। জনবহুল সভায় বিশেষতঃ শোভাযাত্রায় সময় সময় সহ্য করিতে না পারিয়া আমি উগ্র হইয়া উঠি। আমাদের সম্মানের জন্য নির্দিষ্ট শোভাযাত্রা হইতে আমি অলক্ষ্যে সরিয়া জনতার ভীড়ে মিশিয়া পড়ি, আমার স্ত্রী কিম্বা অপর কেহ আমার স্থলে গাড়ীতে কিম্বা মোটরে বসিয়া শোভাযাত্রার সহিত গমন করেন।

সদা সর্বদাই নিজের মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া সাধারণের সম্মুখে অমায়িক হওয়ার দুঃখ অনেক, ফলে সভাসমিতিতে মুখভাব প্রায়ই বিরক্তিপূর্ণ ও গম্ভীর দেখায়। সম্ভবতঃ এই কারণে কোন হিন্দু মাসিক পত্রিকায় আমার সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল যে, আমি দেখিতে অনেকটা হিন্দু বিধবার মত। প্রাচীন ধরণের হিন্দু বিধবাদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এই মন্তব্যে আমি আহত হইয়াছিলাম। লেখক সম্ভবতঃ আমাকে প্রশংসা করিবার জন্যই তাঁহার মনমত কতকগুলি গুণ আমাতে আরোপ করিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমি যেন ত্যাগ ও আত্মবিলোপের প্রতীক এবং হাস্যলেশহীন কর্তব্যপরায়ণতার আদর্শ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার এবং আমার মনে হয় হিন্দু বিধবাদেরও অনেক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত গুণ, কর্মপ্রবণতা ও হাস্যপরিহাসের শক্তি আছে। গান্ধিজী একবার একজনকে বলিয়াছিলেন, যদি তাঁহার হাস্যপরিহাসের শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে তিনি আত্মহত্যা বা ঐরূপ কিছু করিতেন। আমার অতদূর যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও একথা বলিতে পারি যে, যদি লোকে হাস্যপরিহাস ও মৃদু আমোদ না করিত, তাহা হইলে আমার নিকট জীবন নীরস ও অসহ্য হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

আমার জনপ্রিয়তা এবং আলঙ্কারিক ভাষায় শব্দাড়ম্বরপূর্ণ অভিনন্দনপত্র (অভিনন্দনে অত্যুক্তি ও অতিশয়োক্তি করা ভারতের প্রথা) পাইয়া আমার

পরিবারবর্গ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরা মাঝে মাঝে পরিহাস করিয়া তুমুল হাস্যরোল তুলিতেন। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত বড় বড় বুলি ও বিশেষণ এবং উপাধিগুলি, অভিনন্দনপত্র হইতে বাছিয়া লইয়া আমার স্ত্রী, ভগ্নীরা এবং অন্যান্য সকলে ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্যের সুরে পরিহাস করিতেন। প্রায়ই আমাকে 'ভারত-ভূষণ' 'ত্যাগমূর্তি' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হইত, সভার ক্লান্তির শেষে ঐগুলি লইয়া বাড়ীতে হাস্য পরিহাসে আমার হৃদয়ের ভার লঘু হইয়া যাইত, এমন কি, আমার ছোট মেয়েটি পর্যন্ত এই ব্যাপারে যোগ দিত। কেবল আমার মাতা ঐগুলি শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করিবার জন্য জিদ করিতেন এবং তাঁহার আদরের পুত্রকে লইয়া এইরূপ রঙ্গ পরিহাস তিনি সহ্য করিতেন না। পিতা আমোদ বোধ করিতেন। আমার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ও সুগভীর স্নেহ প্রকাশ করিবার এক প্রশান্ত ভঙ্গী ছিল।

কিন্তু জনতার জয়ধ্বনি, বিরস ও ক্লান্তিকর অভিনন্দন-সভা প্রভৃতি, তর্ক যুক্তি, রাজনীতির ধূলি ধূম আমাকে বাহির হইতে স্পর্শ করিত মাত্র—ইহা কদাচিৎ তীব্র তীক্ষ্ম হইত। প্রকৃত দ্বন্দ্ব চলিত আমার মনে—আদর্শের সংঘাত, কামনা ও আনুগত্যের সংঘাত, সচেতন অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরামহীন সংগ্রাম এবং তাহার মধ্যে অন্তরের অতৃপ্ত ক্ষুধা। আমার মনের মধ্যে যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্র এবং বিভিন্ন শক্তি পরস্পরকে পরাহত করিয়া প্রভুত্ব স্থাপন-প্রয়াসী। ইহা হইতে পরিত্রাণের জন্য মন উন্মুখ হইত; সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হইতাম এবং এই চেষ্টার ফলেই নিজেকে কর্মের মধ্যে ডুবাইয়া দিতাম। কর্মক্ষেত্রে কিছু শান্তি পাই। বাহিরের সংগ্রামে, ভিতরের সংঘর্ষ কতকটা প্রশমিত হয়।

নিস্তব্ধ কারাগৃহে বসিয়া কেন এ সকল কথা লিখিতেছি? কি বাহিরে, কি কারাগারে, ঈপ্সিতের আকাঙ্ক্ষা সমানই রহিয়াছে; শান্তি ও মানসিক আরাম লাভের আশায় আমি আমার অতীত মনোভাব ও অভিজ্ঞতা লিখিতে বসিয়াছি!

২৯

আইন অমান্যের সূচনা

১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস আসিল। বিদ্যুৎচমকের মত আমরা দেশের আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখিতে পাইলাম। সর্বত্র বৃহৎ জনতা নিস্তব্ধ গাম্ভীর্যপূর্ণ, স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য* উচ্চারণ করিতেছে, সে এক মহান দৃশ্য! সেখানে কোন বক্তৃতা নাই, অনুরোধ উপরোধ নাই। এই অনুষ্ঠান হইতে গান্ধিজী প্রেরণা লাভ করিলেন এবং দেশের নাড়ীর গতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিলেন, কার্য করার সময় উপস্থিত। রঙ্গমঞ্চে ঘটনার দ্রুত সমাবেশে মহানাট্য জমিয়া উঠিল।

আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনায় দেশের আকাশ রোমাঞ্চিত। মনে পড়িল ১৯২১-২২-এর আন্দোলন এবং চাওরী-চাওরার পর তাহার আকস্মিক পরিসমাপ্তি! দেশ এখন অধিকতর সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং এই শ্রেণীর সংঘর্ষ

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সম্পর্কে ধারণাও পূর্বাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট। সংঘর্ষের কৌশল সম্পর্কে সকলের একটা মোটামুটি ধারণা থাকিলেও গান্ধিজী প্রত্যেককে অহিংসার মর্মকথা অধিকতর পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দশ বৎসর পূর্বের কথা অনেকেরই মনে পড়িল। এত সাবধানতা সত্ত্বেও যে স্বাভাবিকভাবে অথবা কোন ষড়যন্ত্রের ফলে কোথাও হিংসামূলক কার্যের অনুষ্ঠান হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি? যদি এইরূপ ঘটনা ঘটে, তবে আমাদের আইন অমান্য আন্দোলনের কি হইবে? পূর্বের মত আবার কি আকস্মিকভাবে আন্দোলন স্থগিত থাকিবে? এরূপ সম্ভাবনা কত নৈরাশ্যজনক।

গান্ধিজী সম্ভবতঃ তাঁহার স্বকীয় ভাবে এই প্রশ্ন চিন্তা করিতেছিলেন এবং তাঁহার সাময়িক কথাবার্তা হইতে তিনি যে এই সমস্যা লইয়া বিব্রত তাহাও বুঝিতাম; তাঁহার মনোভাব আমার ভাষায় লিখিতেছি।

তাঁহার মতে, কোন অন্যায়ের প্রতিকার অথবা কল্যাণ-সাধনের জন্য অহিংসাই একমাত্র সত্যপথ এবং সম্যকভাবে প্রযুক্ত হইলে ইহা অব্যর্থ। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, ইহার পরিচালন ও সাফল্যের জন্য বিশেষ অনুকূল ক্ষেত্র আবশ্যক। কিন্তু যদি বাহিরের অবস্থা ইহার অনুকূল না হয় তাহা হইলে কি ইহা প্রয়োগ করা উচিত নহে? ইহার উত্তরে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, সমস্ত ক্ষেত্রই অহিংস উপায় প্রয়োগের যোগ্য নহে এবং ইহা সর্বজনীন বা অব্যর্থ উপায়ও নহে। কিন্তু গান্ধিজী এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই গ্রহণ করেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহা সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য এবং ইহা অব্যর্থ। অতএব প্রতিকূল অবস্থা, এমন কি, হিংসাপূর্ণ সংঘর্ষের মধ্যেও এই উপায়ে কার্য করা যাইতে পারে। অবস্থাবিশেষে ইহার প্রয়োগ-কৌশলের অদল-বদল হইতে পারে; কিন্তু ইহা প্রত্যাহার করিলে তাহা ব্যর্থতা স্বীকারেরই নামান্তর মাত্র।

সম্ভবতঃ এইভাবে তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না। তিনি আমাদিগকে এইটুকু বুঝিবার অবসর দিলেন যে, তাঁহার মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে এবং স্থানবিশেষে আকস্মিক হিংসার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার প্রয়োজন নাই। এই আশ্বাসে আমরা অনেকে সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রশ্ন—কেমন করিয়া? আমরা কি ভাবে আরম্ভ করিব? কি উপায়ে ইহা কার্যকরী অবস্থার উপযোগী এবং জনপ্রিয় হইবে? সে ইঙ্গিত দিলেন—মহাত্মা!

সহসা লবণ শব্দটি অপূর্ব রহস্য ও শক্তিতে মণ্ডিত হইল। লবণকরকে আক্রমণ করিতে হইবে, লবণ আইন ভঙ্গ করিতে হইবে। আমরা হতভম্ব হইলাম। জাতীয় সংঘর্ষের সহিত অতি সাধারণ লবণের সম্পর্ক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। গান্ধিজী 'এগার দফা দাবী' ঘোষণা করায় আরও বিস্ময় বাড়িয়া গেল। যদিও প্রস্তাবগুলি ভাল সন্দেহ নাই, তথাপি যখন আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলিতেছি, তখন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারমূলক কতকগুলি প্রস্তাবের সার্থকতা কি? পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, গান্ধীজীও কি তাহাই বুঝেন, অথবা আমাদের বলিবার ভাষা স্বতন্ত্র? ঘটনার রথচক্র চলিতে লাগিল, তর্ক করার অবসর রহিল না। ভারতে রাজনৈতিক ঘটনাস্রোত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আবর্তিত হইতে লাগিল; কিন্তু তখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই, জগদ্ব্যাপী এক ভয়াবহ অর্থসঙ্কট ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা ঘনাইয়া আসিতেছে। নগরবাসীরা ইহাতে প্রাচুর্যের দিন ফিরিয়া আসিতেছে মনে করিয়া আনন্দিত হইল, কিন্তু পল্লীবাসী কৃষক ও রায়তেরা শস্যমূল্য হ্রাসের সম্ভাবনায় প্রমাদ গণিল।

তারপর গান্ধিজীর সহিত বড়লাটের পত্রবিনিময় হইল এবং সবরমতী আশ্রম হইতে ডাণ্ডী অভিযান আরম্ভ হইল। দিনের পর দিন এই তীর্থযাত্রীদের অগ্রগতি জনসাধারণ উৎসুক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং দেশব্যাপী উৎসাহানল প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। আসন্ন আন্দোলন পরিচালনার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য আহম্মদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসিল। আন্দোলনের নেতা অনুপস্থিত, তিনি তীর্থযাত্রীদের লইয়া সমুদ্রতীরে চলিয়াছেন এবং ফিরিয়া আসিতে অস্বীকৃত হইলেন। সকলে গ্রেফতার হইবার সম্ভাবনায় সভায় স্থির হইল, কমিটির সমস্ত ক্ষমতা সভাপতির থাকিবে, তিনি কার্যকরী সমিতির শূন্যপদে অপরকে মনোনীত করিবেন এবং তিনি স্বয়ং গ্রেফতার হইলে পরবর্তী সভাপতি মনোনীত করিয়া যাইবেন, তাঁহারও অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে। প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেসকমিটিগুলিকেও অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইল।

এইভাবে তথাকথিত 'ডিক্টেটরদের' রাজত্ব চলিল এবং ইঁহারা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আন্দোলন পরিচালন করিতে লাগিলেন। ভারত-সচিব, বড়লাট ও গভর্ণরগণ দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া শঙ্কিত তারস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, কংগ্রেসের কি ভয়ঙ্কর ও শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে, ইহা ডিক্টেটরিত্বে বিশ্বাস করে! অথচ তাঁহারা নিজেরাও ডিক্টেটরীর অনুরক্ত ভক্ত। এমন কি, ভারতের মডারেট সংবাদপত্রগুলিও আমাদিগকে গণতন্ত্রের তত্ত্বকথা শুনাইতে লাগিলেন। আমরা নীরবে (কেন না কারাগারে) বিস্ময়ের সহিত ঐ সকল উপদেশ শুনিতে লাগিলাম। নির্লজ্জ ভণ্ডামীর চূড়ান্ত নিদর্শন! সমস্ত প্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতা দমন করিয়া অর্ডিন্যান্সীয় আইন দ্বারা ডিক্টেটরী নীতিতে বলপূর্বক ভারতবর্ষকে শাসন করা হইতেছে অথচ আমাদের শাসকবর্গই মোলায়েম সুরে গণতন্ত্রের দোহাই দিতেছেন! এমন কি, সাধারণ অবস্থাতেই ভারতে গণতন্ত্রের ছায়া কোথায়? ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রভুত্ব সম্পর্কে যাহারা প্রশ্ন করে, তাহাদের দমন করা স্বাভাবিক, কিন্তু এই সকল ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক উপায় বলিয়া তাঁহারা যে দাবী করেন, তাহা ভবিষ্যদ্বংশধরদের চিন্তা ও প্রশংসার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্তব্য।

এমন অবস্থা শীঘ্রই আসিবে, যখন কংগ্রেসের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে কার্য করা সম্ভবপর হইবে না। ইহাকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হইবে; কোন পরামর্শ বা কার্যের জন্য কমিটির গোপনে ব্যতীত মিলিত হওয়া অসম্ভব হইবে। আমরা গোপনতার পক্ষপাতী ছিলাম না। আমরা জনসাধারণের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য প্রকাশ্য সংঘর্ষই স্থির করিয়াছিলাম। গোপন উপায়ে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের, প্রাদেশিক ও জিলা কংগ্রেসের প্রধান প্রধান নরনারীরা অনতিবিলম্বেই গ্রেফতার হইবেন ইহা নিশ্চিত। তখন সংঘর্ষ পরিচালন করিবে কাহারা? আমাদের সম্মুখে একটি পথ খোলা ছিল। যুদ্ধরত সৈন্যদলের কেহ অক্ষম বা আহত হইলে যেমন নূতন লোক তাহাদের স্থান পূরণ করে, আমাদেরও সেই রকম ব্যবস্থা করিতে হইবে; যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়া আমরা কমিটির সভা করিতে পারি না। ঐরূপ করিয়াও দেখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য ও ফল এই দাঁড়ায় যে, সকলে মিলিয়া গ্রেফতার হইতে হয়। সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগে নিরাপদ স্থানে বসিয়া সামরিক কর্তারা অথবা ততোধিক নিরাপদ স্থানে অসামরিক মন্ত্রিমণ্ডল বসিয়া পরামর্শ ও পরিচালনা করিতেছেন, আমাদের এ সুবিধাও ছিল না। আমাদের যুদ্ধের নীতি অনুসারে সেনাপতি ও সচিবমণ্ডলীই থাকেন পুরোভাগে এবং যুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁহারাই সর্বাগ্রে গ্রেফতার হন। এক্ষেত্রে আমরা ডিক্টেটরদের কতখানি ক্ষমতা দিয়াছিলাম?

তাঁহারা সংগ্রাম পরিচালনায় জাতীয় দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রতীকরূপে পরিণত হইবার সম্মান লাভ করিতেন। কিন্তু কার্যতঃ তাঁহাদের ডিক্টেটরী ক্ষমতা নিজেদের কারাগারে প্রেরণ করিবার ক্ষমতাতেই পর্যবসিত ছিল। যেখানে বাহিঃশক্তির প্রভাবে কমিটির সভা অসম্ভব হইত, সেইখানেই কমিটির প্রতিনিধিরূপে 'ডিক্টেটর' কার্য করিতেন; কিন্তু যখন যেখানে কমিটির অধিবেশন সম্ভবপর হইত, সেখানে ডিক্টেটরের কোন কর্তৃত্ব থাকিত না। তাঁহাদের মূলনীতি বা সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না; আন্দোলন পরিচালনের ছোটখাট ব্যাপারগুলিই 'ডিক্টেটরেরা' নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেন। কংগ্রেসের 'ডিক্টেটরশিপ' কার্যতঃ কারাগারে যাইবার সোপান মাত্র ছিল এবং দিনের পর দিন এইভাবে একজনের স্থান অপরে গ্রহণ করিত।

অতএব এইভাবে ব্যবস্থা করিয়া আমরা আহম্মদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকর্মীদের নিকট বিদায় লইলাম। কে জানে, কবে কোথায় কাহার সহিত কিভাবে দেখা হইবে, হয়ত বা আমরা আর একত্র মিলিবই না। আমরা তাড়াতাড়ি নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিয়া নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্দেশানুযায়ী স্থানীয় ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম এবং সরোজিনী নাইডুর ভাষায় জেলে যাইবার জন্য দাঁতন হাতে করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ফিরিবার পথে আমি ও পিতা গান্ধিজীর সহিত দেখা করিলাম। জাম্বুসারে তিনি ও তাঁহার দলবলের সহিত আমরা কয়েক ঘণ্টা ছিলাম। তিনি লবণসমুদ্র লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পরবর্তী গন্তব্যস্থলে যাত্রা করিলেন। এবারের মত তাঁহার সহিত এই শেষ দেখা! যষ্টিহস্তে সকলের পুরোভাগে তিনি দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন—তাঁহার মুখমণ্ডল নির্ভীক প্রশান্ত। কি মহিমময় দৃশ্য!

জাম্বুসারে গান্ধিজীর সহিত পরামর্শ করিয়া আমার পিতা স্থির করিলেন তাঁহার এলাহাবাদের ভবন দেশের নামে উৎসর্গ করিবেন এবং উহার নূতন নাম রাখিবেন স্বরাজ ভবন। এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি এই সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন এবং কংগ্রেস কর্মীদিগের হাতে উহা অর্পণ করিলেন। এই বৃহৎ ভবনের একাংশে হাসপাতাল স্থাপিত হইল। তখন তিনি আইনতঃ এই কার্য করিয়া যাইতে পারেন নাই, দেড়বৎসর পরে আমি তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী উপযুক্ত দলিল সম্পাদন করিয়া অছিদের হাতে উহা অর্পণ করিয়াছি।

এপ্রিল আসিল, গান্ধিজী ক্রমশঃ সমুদ্রের নিকটবর্তী হইতেছেন, আমরা লবণ আইন ভাঙ্গিয়া আইন অমান্যের জন্য আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছি। এই কয়মাস আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা কুচকাওয়াজ করিতেছিল এবং কমলা ও কৃষ্ণা (আমার স্ত্রী ও ভগ্নী) এজন্য পুরুষের পোষাক পরিয়া ইহাদের দলে যোগ দিয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে কোনও অস্ত্র, এমন কি কোন লাঠিও ছিল না। যাহাতে তাহারা অধিকতর কার্যকুশল হয় এবং বৃহৎ জনতা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, শিক্ষাদানের তাহাই উদ্দেশ্য ছিল। ৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবস, সত্যাগ্রহ হইতে জালিয়ানওয়ালাবাগ—১৯১৯-এর সেই স্মৃতি স্মরণ করিয়া বাৎসরিক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। গান্ধিজী ঐ দিবস ডাণ্ডির বেলাভূমিতে লবণ আইন ভঙ্গ করিলেন। তিন-চারিদিন পরে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্ব স্ব এলাকায় ঐরূপে করিবার নির্দেশ দিয়া আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে বলা হইল।

মনে হইল যেন বাঁধ ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ বন্যার জল আসিয়াছে। দেশের সর্বত্র, প্রতি পল্লী-নগরীতে লবণ তৈয়ারীর কথা আলোচিত হইতে লাগিল এবং লবণ

তৈয়ারীর নানার্পে অদ্ভুত উপায় আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। আমরা এ বিষয়ে অল্পই জানিতাম, প্র্থিপত্র খ্র্জিয়া কিছ্র আবিষ্কার করা গেল। লবণ তৈয়ারীর নিয়ম ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইল। আমরা হাঁড়ি কড়াই সংগ্রহ করিয়া অনেক কষ্টে লবণের মত একরকম পদার্থ তৈয়ারী করিলাম। তাহাতেই কত আনন্দ! এবং উহাই উচ্চ ম্ল্যে ফেরী করিয়া বিক্রয় হইতে লাগিল। লবণ ভাল হউক মন্দ হউক, কিছ্র যায় আসে না, নিন্দনীয় লবণ আইন ভঙ্গ করাই প্রধান কথা। আমাদের লবণ খারাপ হইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। লবণ তৈয়ারী দাবানলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, জনসাধারণের উৎসাহের অন্ত রহিল না। গান্ধিজী যখন প্রথম এই প্রস্তাব করেন, তখন তাঁহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম বলিয়া লজ্জা ও কুণ্ঠা অন্ভব করিলাম। এই মন্ষ্যটির জনসাধারণকে উদ্ব্দ্ধ করিয়া শ্ঙ্খলিতভাবে কার্যে নিয়োগ করিবার কি আশ্চর্য শক্তি, আমরা বিস্মিত হইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ১৪ই এপ্রিল আমি গ্রেফতার হইলাম; মধ্যপ্রদেশে রামপ্রে একটি সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য ঐ দিবস আমি যাত্রা করিয়াছিলাম। ঐ দিনই কারাগারের মধ্যে আমার বিচার হইল, লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য আমি ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম। গ্রেফতারের কথা প্র্ব হইতেই অন্মান করিয়া আমি (নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রদত্ত ক্ষমতান্সারে) গান্ধিজীকে আমার অন্পস্থিতিকালে কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় পিতাকে দ্বিতীয় স্থানে মনোনীত করিয়াছিলাম। আমার প্রত্যাশাই সত্য হইল, গান্ধিজী অস্বীকার করায় পিতাই কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হইলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তথাপি প্রথম কয়মাস তিনি অসীম উৎসাহে কার্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার দ্ঢ় নির্দেশ এবং শ্ঙ্খলা রক্ষার সাবধানতার ফলে আন্দোলন বহ্ল পরিমাণে উপকৃত হইল। আন্দোলনের লাভ হইল বটে; কিন্তু তাঁহার অবশিষ্ট শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্য একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

প্রতিদিন কি উৎসাহ, কি উত্তেজনা, কত রোমাঞ্চকর সংবাদ—মিছিল ও যষ্টি প্রহার, গ্লীবর্ষণ, বিখ্যাত নেতাদের গ্রেফতারে হরতাল, তাহার উপর পেশোয়ার দিবস, গাড়োয়ালী দিবস প্রভৃতি অন্ষ্ঠান। সাময়িকভাবে বিদেশীবস্ত্র ও সর্ববিধ ব্রিটিশ পণ্য বর্জন সম্প্র্ণর্পে সাফল্যলাভ করিল। যখন আমি সংবাদ পাইলাম যে, আমার ব্দ্ধা জননী ও আমার ভগিনীগণ প্রতপ্ত গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সম্ম্খে দাঁড়াইয়া পিকেটিং করিতেছেন, তখন আমি বিচলিত হইলাম। কমলাও ইহা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আরও অধিক কিছ্র করিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ সহর ও জিলার আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, তাঁহার শক্তি ও দ্ঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার সহিত আমার দীর্ঘকালের পরিচয়েও ইহা ব্ঝিতে পারি নাই। তিনি নিজের রোগের কথা ভুলিলেন, আকাশের রৌদ্র মাথায় করিয়া উদভ্রান্ত ছ্টাছ্টি করিতেন এবং কর্মনিয়ন্ত্রণ করিবার আশ্চর্য শক্তি দেখাইয়াছিলেন। জেলে এই সকল কথা আমার কানে আসিত। পরে পিতা যখন কারাগারে আমার সহিত মিলিত হইলেন তখন তাঁহার নিকট সব কথা শ্নিলাম। তিনি কমলার কাজকর্ম, বিশেষভাবে সঙ্ঘনিয়ন্ত্রণকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কিন্তু তিনি আমার মাতা ও অন্যান্য মেয়েদের রৌদ্রে ছ্টাছ্টি করা পছন্দ করিতেন না। তবে সাময়িক ধমক দেওয়া ছাড়া তিনি বড় একটা বাধা দেন নাই।

সকলের চেয়ে বড় সংবাদ ২৩শে এপ্রিলের পেশোয়ারের এবং পরে সমস্ত

সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাবলী। ভারতের অন্য যে কোনও স্থানে মেশিনগানের গুলীবর্ষণের সম্মুখে সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণ সাহসিকতার দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশে এইরূপ উত্তেজনার সঞ্চার হইত। সীমান্ত প্রদেশে এই ঘটনার আরও একটা বিশেষ দিক আছে। পাঠানদের সাহসী বলিয়া খ্যাতি আছে বটে; কিন্তু তাহারা শান্ত ও নিরীহ বলিয়া খ্যাতি নাই। এই পাঠানেরাই ভারতবর্ষের সম্মুখে এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল। এবং এই সীমান্ত প্রদেশেই সেই ইতিহাস-স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে গাড়োয়ালী সৈনিকেরা নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। সৈনিকেরা সাধারণতঃ নিরস্ত্র জনতার উপর গুলীবর্ষণ করিতে ঘৃণা বোধ করে এবং নিঃসন্দেহে জনতার প্রতি সহানুভূতিবশতঃই তাহারা উহা অস্বীকার করিয়াছিল। সৈনিকের পক্ষে তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশ পালনে অস্বীকৃতি কেবলমাত্র সহানুভূতির জন্যই সাধারণতঃ সম্ভব নহে, ভাবী পরিণাম কি সে তাহা উত্তমরূপেই জানে। সম্ভবতঃ বৃটিশশক্তি অবসানপ্রায়, এই ভ্রান্ত ধারণা হইতেই গাড়োয়ালীরা (অন্যান্য স্থলেও আরও কয়েকটি সৈন্যদল এইরূপ অবাধ্যতা করিয়াছিল, কিন্তু সে খবর রটে নাই) ঐরূপ করিয়াছিল। অনুরূপ ধারণা মনে বদ্ধমূল হইলেই সৈনিকেরা নিজেদের সহানুভূতি ও অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য করিতে সাহসী হয়।

সম্ভবতঃ, কয়েকদিন অথবা সপ্তাহ ধরিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিহ্বল উত্তেজনা এবং আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে কতকগুলি ব্যক্তি মনে করিতেছিল যে, ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন সমাগত এবং ভারতীয় সৈন্যদলের একাংশের উপর ইহার প্রভাব বিসর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই যখন বুঝা গেল, অদূরভবিষ্যতে এরূপ কোন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তখন সৈন্যদলে আর অবাধ্যতা দেখা যায় নাই। সৈন্যদল যাহাতে এরূপ অবস্থার মধ্যে গিয়া না পড়ে, তজ্জন্য সাবধানতাও অবলম্বন করা হইয়াছিল।

এইকালে যে সকল আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে নারীদের দলে দলে জাতীয় সংঘর্ষে যোগদান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁহারা দলে দলে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; বাহিরের কাজে অনভ্যস্ত হইলেও তাঁহারা মহোৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদেশী বস্ত্র ও আবগারী দোকানে পিকেটিং করা তাঁহারা একচেটিয়া করিয়া লইলেন। প্রত্যেক সহরে দলে দলে নারী মিছিল করিতে লাগিলেন এবং সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতেন। অনেক মহিলা প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেসের 'ডিক্টেটর' হইয়াছিলেন।

লবণ আইন ভঙ্গের সহিত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইল। বড়লাট কতকগুলি নিষেধাত্মক অর্ডিন্যাস জারী করিয়া ইহার সুবিধা করিয়া দিলেন। অর্ডিন্যান্স ও নিষেধের সংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল, ঐগুলি অমান্য করিবার সুযোগও ততই বাড়িল। যে সমস্ত কাজ বন্ধ করিবার জন্য অর্ডিন্যান্স, সেইগুলি করাই নিরুপদ্রব প্রতিরোধের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। কংগ্রেস ও জনসাধারণই আগু বাড়াইয়া কাজ করিতে লাগিল এবং গভর্ণমেণ্ট যখন দেখিলেন, অর্ডিন্যান্স কার্যকরী হইতেছে না, তখন নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বহু সদস্য বন্দী হইলেন; কিন্তু নূতন সদস্যরা কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক নূতন অর্ডিন্যান্স জারীর সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী সমিতিও কি ভাবে উহার সম্মুখীন হইতে হইবে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেন। একমাত্র সংবাদপত্র ব্যতীত, এই সকল নির্দেশ অতি আশ্চর্য ঐক্যের সহিত সমগ্র দেশে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইত।

যখন সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য জামীনের টাকা দাবী করিয়া অর্ডিন্যান্স জারী হইল, তখন কার্যকরী সমিতি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিকে জামীনের টাকা না দিয়া প্রচার বন্ধ করিতে নির্দেশ দিলেন। সংবাদপত্র পরিচালকদের পক্ষে এই নির্দেশ পালন করা অতি কঠিন হইয়া উঠিল, কেন না তখন দেশবাসী সংবাদ জানিবার জন্য অধিকতর ব্যাকুল। কতকগুলি মডারেট কাগজ ছাড়া অধিকাংশ কাগজ বন্ধ হইল; ফলে নানা প্রকার গুজব দেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু এভাবে বেশী দিন চলিল না, মডারেট কাগজগুলি এই সুযোগে দাঁও মারিয়া লইতেছে দেখিয়া তাঁহারা বিরক্ত হইলেন। ফলে পুনরায় জাতীয়তাবাদী কাগজগুলি আত্মপ্রকাশ করিল।

৫ই মে গান্ধিজী গ্রেফতার হইলেন। পশ্চিম উপকূলে অধিকতর উৎসাহের সহিত লবণগোলা আক্রমণ ও লবণ সংগ্রহের কাজ চলিতে লাগিল। লবণ আইন অমান্যকারীদের উপর এইকালে পুলিশ-বর্বরতার কতকগুলি বেদনাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোম্বাই আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি হইয়া উঠিল এবং বড় বড় হরতাল, মিছিল এবং লাঠিচালনা চলিতে লাগিল। লাঠির আঘাতে আহতদের চিকিৎসার জন্য কয়েকটি হাসপাতাল স্থাপিত হইল। বোম্বাই বৃহৎ সহর বলিয়া এখানের ঘটনাগুলি বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। ছোটখাট সহর এবং পল্লী অঞ্চলের ঘটনাগুলি মোটেই প্রচারিত হয় না।

জুন মাসের শেষভাগে পিতা আমার মাতা ও কমলাকে লইয়া বোম্বাই-এ গিয়াছিলেন। তাঁহারা বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন; তাঁহাদের অবস্থিতিকালে কয়েকবার প্রচণ্ড লাঠিচালনা হইয়াছিল। অবশ্য বোম্বাই-এ ইহা সচরাচর ঘটনা হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার পনর দিন পর, পুলিশ পথরোধ করায় বিশাল জনতাসহ কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ এবং মালব্যজী সমস্ত রাত্রি পুলিশের সম্মুখে পথে বসিয়াছিলেন।

বোম্বাই হইতে ফিরিবার পর ৩০শে জুন পিতা বন্দী হইলেন। তাঁহার সহিত সৈয়দ মামুদকেও গ্রেফতার করা হইল। তাঁহারা বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি ও সম্পাদকরূপে গ্রেফতার হইলেন। তাঁহাদের ছয় মাস কারাদণ্ড হইল। জনতার উপর গুলি চালাইবার আদেশ পাইলে পুলিশ বা সৈনিকের কর্তব্য কি, সে সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রচার করাই সম্ভবতঃ পিতার গ্রেফতারের কারণ। এই বিবৃতি ভারতে ব্রিটিশ আইন মোতাবেক সম্পূর্ণ বৈধভাবেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি উহা বিপজ্জনক ও আপত্তিকর বিবেচিত হইয়াছিল।

বোম্বাই-এ পিতাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি কর্মরত থাকিতেন; প্রত্যেক জরুরী সিদ্ধান্তে তাঁহাকেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইত। তাঁহার শরীর পূর্ব হইতেই অসুস্থ ছিল, অধিকতর অবসাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া তিনি চিকিৎসকগণের পরামর্শে পূর্ণ বিশ্রামলাভের জন্য মুসৌরী যাত্রার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাত্রার পূর্ব দিন তিনি মুসৌরীর পরিবর্তে, নৈনী সেন্ট্রাল জেলে আমাদের ব্যারাকে উপনীত হইলেন।

নৈনী জেলে

সাত বৎসর পর আমি পুনরায় কারাগারে ফিরিয়া আসিলাম; কারাজীবনের পূর্বস্মৃতি অনেকাংশে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ প্রদেশে নৈনী সেণ্ট্রাল জেল অন্যতম বৃহৎ কারাগার। এখানে আমি নিঃসঙ্গ কারাবাসের এক অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। জেলের বৃহৎ প্রাচীরের মধ্যে ২৩০০ শত কয়েদী হইতে আমাকে পৃথক করিয়া এক ক্ষুদ্র স্থানে রাখা হইল। পনর ফিট উঁচু বৃত্তাকারে ঘেরা স্থান—পরিধি প্রায় একশত ফিট হইবে। ইহার মধ্যস্থলে এক বিবর্ণ, কুৎসিত, চারিটি সেল-ওয়ালা দালান। আমাকে পাশাপাশি দুইটি সেল দেওয়া হইল—একটি বাসের, অপরটি স্নানাগাররূপে ব্যবহার করিবার জন্য। অপর দুইটি সেল কিছুকাল খালি ছিল।

বাহিরের কর্মব্যবস্থা ও উত্তেজনার পর এখানে আসিয়া আমি নিঃসঙ্গ ও অবসন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। আমি পরিশ্রান্ত ছিলাম, প্রথম দুই-তিন দিন খুব নিদ্রা গেলাম। তখন গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে, আমি বাহিরে শয়ন করিবার অনুমতি পাইলাম—সেলের বাহিরের প্রাচীর ও দালানের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ স্থানে শয়নের ব্যবস্থা হইল। আমার খাটখানি শক্ত করিয়া শিকল দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল, কি জানি আমি যদি উহা লইয়া পলাইয়া যাই অথবা যাহাতে আমি দেওয়াল টপকাইবার মই হিসাবে উহা ব্যবহার করিতে না পারি সেইজন্যই এই সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছিল! সারারাত্রি নানাবিধ চীৎকার চলিত। যাহারা প্রধান প্রাচীর পাহারা দিত, সেই সকল কয়েদী-পাহারাদারেরা পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া সাঙ্কেতিক চীৎকার করিত, তাহাদের তীব্র প্লুতস্বর দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া দূরাগত বায়ুর মর্মধ্বনির মত বোধ হইত। ব্যারাকে কয়েদী-মেট্‌রা, তাহাদের জিম্মায় নির্দিষ্ট কয়েদীদের চীৎকার করিয়া অবিরত গণনা করিত এবং মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিত, সব ঠিক আছে। জেল কর্মচারীরাও রাত্রে কয়েকবার করিয়া ঘুরিতেন, আমার ব্যারাকেও আসিতেন এবং ওয়ার্ডারদের সহিত উচ্চৈঃস্বরে সংবাদ আদান-প্রদান করিতেন। অন্যান্য স্থান হইতে আমার সেল দূরে ছিল বলিয়া এই সকল স্বর অস্পষ্টভাবে শুনিতাম এবং প্রথম প্রথম উহার অর্থ বুঝিতাম না। কখনও কখনও মনে হইত, যেন আমি কোন অরণ্যের পার্শ্বে রহিয়াছি এবং কৃষকেরা চীৎকার করিয়া শস্যক্ষেত্র হইতে বন্যপশু তাড়াইতেছে অথবা আমি যেন অরণ্যের মধ্যে রহিয়াছি এবং বন্য জন্তুরা সকলে মিলিয়া তাহাদের নৈশ ঐকতান জুড়িয়া দিয়াছে।

চতুষ্কোণ অপেক্ষা বৃত্তাকার আবেষ্টনীর মধ্যেই বন্দীজীবন অধিকতর দুর্বহ—ইহা আমার কল্পনা, না সত্য ঘটনা—আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি। প্রলম্বিত কোণের ও অবকাশের অভাব নিরানন্দ আরও বাড়াইয়া তোলে। দিবাভাগে প্রাচীর আকাশকে অন্তরাল করিয়া রাখে,—অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র অংশ দৃষ্টিগোচর হয়! তৃষিত দৃষ্টি মেলিয়া আমি দেখি,—'অতি ক্ষুদ্র নীল বস্ত্রাবাস, বন্দীরা যাহাকে আকাশ বলে,—তাহার মধ্যে রূপালী পাল তুলিয়া মেঘখণ্ডগুলি ভাসিয়া যাইতেছে।' রাত্রে এই প্রাচীর আমাকে আরও ঘিরিয়া ফেলে, মনে হয় যেন আমি এক কূপের তলদেশে বসিয়া আছি। এখান হইতে তারকাখচিত আকাশের যে অংশ আমি দেখি তাহা আমার নিকট আর বাস্তব থাকে না। গ্রহতারকার কৃত্রিম মানচিত্রের

অংশ বলিয়া মনে হয়।

আমার ব্যারাক ও আবেষ্টনীকে জেলের লোকেরা বলিত কুত্তাঘর। ইহা পুরাতন নাম, আমার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। ভয়ঙ্কর চরিত্রের আসামীদের স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার জন্যই ইহা বিশেষভাবে নির্মিত হইয়াছিল। পরে ইহা রাজনৈতিক বন্দী, অন্তরীণদিগকে জেলখানায় স্বতন্ত্রভাবে রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীরের সম্মুখে কিছু দূরে গম্বুজের মত একটা ইমারৎ দেখিয়া আমি প্রথমে বিরক্ত হইয়াছিলাম। জিনিষটা দেখিতে একটা বৃহৎ খাঁচার মত এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি মানুষ অবিরত চক্রাকারে ঘুরিতেছে। পরে বুঝিতে পারিলাম যে, উহা জল তুলিবার পাম্প, এক এক সঙ্গে ষোল জন করিয়া লোক লাগাইয়া জল তোলা হয়। মানুষের যেমন সবই অভ্যাস হইয়া যায়, আমিও তেমনই ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম। তথাপি সর্বদাই আমার মনে হইত, মানুষের শ্রমশক্তিকে এ ভাবে কাজে লাগান নির্বুদ্ধিতা ও বর্বরতা মাত্র। উহার দিকে তাকাইলেই আমার চিড়িয়াখানার কথা মনে পড়িত।

কিছুদিন আমাকে আবেষ্টনীর বাহিরে ব্যায়ামের জন্য বা অন্য কোনও কারণে যাইতে দেওয়া হইত না। পরে অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে আমাকে আধ ঘণ্টার জন্য বাহিরে মূল প্রাচীরের নিকট হাঁটিতে বা দৌড়াইতে দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থার কারণ যে অন্য অন্য কয়েদীরা যেন আমাকে দেখিতে না পায় বা আমার সংস্পর্শে না আসে। বাহিরের খোলা হাওয়ায় ব্যায়াম করিবার এই সামান্য সময়টুকু আমি যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিতাম। আমি দৌড়াইতাম এবং ক্রমশঃ পাল্লাবৃদ্ধি করিয়া দুই মাইলের উপর দৌড়াইতাম।

আমি প্রভাতে চারিটা, এমন কি সাড়ে তিনটার সময় শয্যা ত্যাগ করিতাম। তখনও বেশ অন্ধকার থাকিত। আমাকে যে আলো দেওয়া হইত তাহা পাঠ করিবার মত পর্যাপ্ত নয় বলিয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িতাম। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। তারা দেখিতে আমার ভাল লাগিত, পরিচিত কোনও তারকা-মণ্ডলের অবস্থিতি দেখিয়া আমি মোটামুটি সময় ঠিক করিতাম। আমার শয্যা হইতে আমি প্রাচীরের উপরে সর্বদাই ধ্রুবতারা দেখিতে পারিতাম—ইহা দেখিলেই আমার মন জুড়াইত। গতিশীল তারকামণ্ডলীর মধ্যে ধ্রুবনক্ষত্রটি মনে যেন আনন্দের চিরস্থির অম্লান প্রতীক।

এক মাস আমার কেহ সঙ্গী ছিল না। তবে আমাকে একাকী থাকিতে হইত না। ওয়ার্ডার ছিল, কয়েদী ওভারশিয়ার ছিল এবং আমার রান্না এবং অন্যান্য কাজের জন্য একজন কয়েদীও ছিল। দীর্ঘ কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী-মেট্‌রা মাঝে মাঝে কাজকর্ম উপলক্ষ্যে যাতায়াত করিত। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত 'লাইফার' জেলে বহু ছিল। সাধারণতঃ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলিতে বিশ বৎসর বা তাহার কম সময় বুঝায়। কিন্তু এই জেলে এমন অনেককে দেখিলাম, যাহারা বিশ বৎসরের অধিক কালও রহিয়াছে। নৈনীতে আমি একটি স্মরণীয় ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। প্রত্যেক কয়েদীর কাঁধের কাছে কাপড়ের সহিত আটকানো একখানি ছোট কাঠের চাক্‌তি থাকে, তাহার মধ্যে তাহাদের নম্বর, কারাদণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এবং মুক্তির তারিখ লেখা থাকে। একজন কয়েদীর কাঠের চাক্‌তিতে আমি দেখিলাম, মুক্তির তারিখ ১৯৯৬ সাল! ১৯৩০ সালেই কয়েক বৎসর তাহার জেলখাটা শেষ হইয়াছে, লোকটি মধ্যবয়সী। সম্ভবতঃ তাহার বিরুদ্ধে কতকগুলি কারাদণ্ডের বিধান হইয়াছে এবং সেইগুলি পর পর যোগ দিয়া ৭৫ বৎসর হইয়াছে।
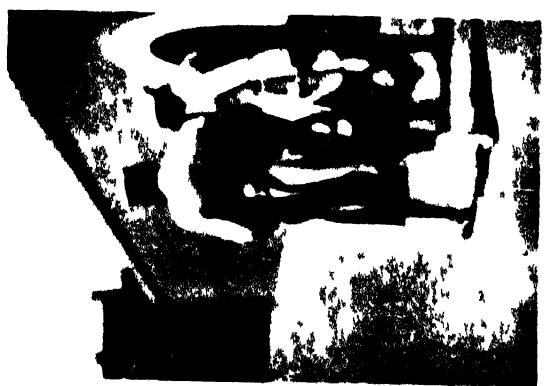
এই 'লাইফারেরা' বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া শিশু, নারী, এমন কি, পশু-প্রাণীরও মুখ দেখিতে পায় না। বহির্জগতের সহিত তাহাদের যোগ ছিন্ন হইয়া যায় এবং মানুষের সঙ্গ পায় না। তাহারা বসিয়া বসিয়া ভাবে; ভয়, প্রতিহিংসা ও ঘৃণাসঞ্জাত ক্রুদ্ধ চিন্তারাশি তাহাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে—জগতে যে ভাল আছে, দয়া আছে, আনন্দ আছে, ইহা তাহারা ভুলিয়া যায়। কেবলমাত্র মন্দের মধ্যে তাহারা বাস করে। ক্রমে তাহাদের ঘৃণার উগ্রতা কমিয়া আসে, এবং জীবন ক্রমে প্রাণহীন যন্ত্রবৎ নিয়মানুবর্তিতায় পরিণত হয়। পরচালিত গতিতে তাহাদের দিন অতিবাহিত হয়। একজনের সহিত অপরের কোনও পার্থক্য থাকে না এবং একমাত্র ভয় ছাড়া তাহাদের আর কোনও অনুভূতি থাকে না। নির্দিষ্ট সময়ে কয়েদীদের দেহ মাপা হয়, ওজন করা হয়, কিন্তু মন ও আত্মাকে তো ওজন করা যায় না! তাহা অবরুদ্ধ আবেগের মধ্যে নির্যাতনের নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে ক্রমে জীর্ণ হইয়া যায়। লোকে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়া থাকে, তাহাদের যুক্তিগুলি শুনিতে আমার ভালও লাগে। কিন্তু কারাগারে যখন দেখি, দীর্ঘকাল মানুষ একই বেদনা বহন করিতেছে, তখন আমার মনে হয় যে, মানুষকে এরূপ অল্পে অল্পে হত্যা করা অপেক্ষা মৃত্যুদণ্ড অনেক ভাল। একদিন একজন 'লাইফার' আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 'আমাদের কি হইবে? স্বরাজ হইলে কি আমরা এই নরকের বাহিরে যাইতে পারিব?'

এই 'লাইফার' কাহারা? ইহারা অধিকাংশই ডাকাতি মামলার আসামী; পঞ্চাশ হইতে একশ জন একসঙ্গে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অপরাধী হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই অপরাধী কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এই শ্রেণীর মামলায় লোককে জড়াইয়া ফেলা অতি সহজ। একজন রাজসাক্ষীর (এপ্রুভার) সাক্ষ্য এবং একটু সনাক্তকরণই যথেষ্ট। আজকাল ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বৎসর বৎসর জেলের লোকসংখ্যাও বাড়িতেছে। লোকে খাইতে না পাইলে কি করিবে? জজ্ এবং ম্যাজিস্ট্রেটেরা অপরাধ বৃদ্ধির কথা রটনা করিতে মুখর হইয়া উঠেন; কিন্তু দৃশ্যমান অর্থনৈতিক কারণগুলি সম্বন্ধে অন্ধ।

তারপর কৃষকেরা আছে। হয় তো জমির অধিকার লইয়া দাঙ্গা করিয়াছে, বেপরোয়া লাঠি চালাইয়াছে, হয় তো কেহ মরিয়াছে এবং তাহার ফলে অনেকের যাবজ্জীবন অথবা দীর্ঘ কারাদণ্ড। এমনও ঘটিয়াছে যে, এক পরিবারের সমস্ত পুরুষকেই স্ত্রীলোকদিগকে ভাগ্যের হাতে সঁপিয়া দিয়া কারাগারে চলিয়া আসিতে হইয়াছে। ইহাদের একজনও অপরাধপ্রবণ শ্রেণীর মত নহে। এই সকল সুন্দর যুবক সাধারণ গ্রামবাসী অপেক্ষা কি শারীরিক কি মানসিক সকল দিক দিয়াই উন্নত। ইহাদিগকে কিছু শিক্ষা, বিষয়ান্তরে নিয়োগ করিবার চেষ্টা অথবা কোন বৃত্তি শিক্ষা দিলে ইহারা দেশের সম্পদরূপে গণ্য হইতে পারে।

অবশ্য ভারতীয় কারাগারে অপরাধে অভ্যস্ত, পরপীড়ক, সমাজের শত্রু, ভয়ঙ্কর চরিত্রের কয়েদী আছে। কিন্তু জেলখানায় আমি দেখিয়া আশ্চর্য হই, এমন বহু সংখ্যক বালক, যুবক ও প্রৌঢ় আছে যাহাদিগকে আমি নির্বিচারে বিশ্বাস করিতে পারি। আমি জানি না, আসল অপরাধী এবং এই শ্রেণীর বন্দীর মধ্যে শতকরা হার কত। এবং সম্ভবতঃ কারাবিভাগের কাহারও মনে এরূপ পার্থক্যের কথা উদয়ও হয় নাই। নিউ ইয়র্কের সিং সিং কারাগারের ওয়ার্ডেন্ লুইস্. ই. লজ্ এ বিষয়ে অনেক উল্লেখযোগ্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তাঁহার জেলখানার জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ জনই অপরাধপ্রবণ নহে।

শতকরা পাঁচিশ জন ঘটনাচক্রে ও অবস্থাধীনে অপরাধ করিয়াছে। অবশিষ্ট পাঁচিশজনের অন্ততঃ অর্ধেক সংখ্যক নিশ্চিতর্পে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। সকলেই জানেন যে, পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা আধ্বনিক সভ্যতার কেন্দ্র বৃহৎ নগর-গর্লিতে অপরাধপ্রবণতার প্রাবল্য অধিক। আমেরিকা সঙ্ঘবন্ধ দস্যুবৃত্তির জন্য বিখ্যাত। এবং এই শ্রেণীর ভয়ঙ্কর-চরিত্র অপরাধীদের আবাসস্থলর্পে সিং সিং জেলও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তথাপি এই জেলের ওয়ার্ডেনের মতে মাত্র শতকরা সাড়ে বারজন কয়েদী প্রকৃত প্রস্তাবে মন্দ। আমার মতে ভারতীয় জেলে এই হার আরও কম, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আরও ভাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অধিকতর কর্মপ্রাপ্তির ব্যবস্থা এবং শিক্ষা বিস্তার করিলে আমাদের জেলখানাগর্লি শ্ন্য হইয়া যাইতে পারে। অবশ্য ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আম্ল পরিবর্তন আবশ্যক, কিন্তু ইহার পরিবর্তে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্লিশের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং জেলখানাগর্লির বিস্তার সাধন করিতেছেন। ভারতবর্ষে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। নিখিল-ভারত-কয়েদী-সাহায্য-সমিতির সম্পাদক অধ্না যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৩৩ সালে একমাত্র বোম্বাই প্রদেশেই একলক্ষ আটাশ হাজার ব্যক্তি কারাগারে গিয়াছিল। ঐ বৎসর বাঙ্গলা দেশে কারাদণ্ডে দণ্ডিতের সংখ্যা একলক্ষ চব্বিশ হাজার।* অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যা আমি পাই নাই। তবে দুই প্রদেশের কয়েদীর সংখ্যা যদি প্রায় তিন লক্ষ হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতে সম্ভবতঃ দণ্ডিতের সংখ্যা দশ লক্ষ হইবে। এই সংখ্যার মধ্যে অবশ্য স্থায়ী বাসিন্দার হিসাব ধরা হয় নাই। কয়েদীদের একটা বড় অংশ অল্পকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। জেলের স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা তুলনায় কম হইলেও সংখ্যায় বড় কম নহে। ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রদেশের কারাবিভাগ জগতের মধ্যে সর্ববৃহৎ বলিয়া কথিত হয়। হয় তো বা উহাদের মধ্যে য্ক্ত প্রদেশও এই সন্দেহজনক সম্মানের অন্যতম অধিকারী। এবং এই প্রদেশের কারা-শাসনবিভাগ প্র্বের মতই এখনও বহ্ল পরিমাণে পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল। কয়েদীকে কখনও মান্ষ বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। কিম্বা তাহার যে ব্যক্তিত্ব আছে ইহাও গণনার মধ্যে আনা হয় না; কাজেই তাহার মানসিক উন্নতি বিধানের কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু য্ক্ত প্রদেশের কারাবিভাগ কয়েদীদিগকে বন্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থায় সকলের সেরা। এই কড়াকড়ির মধ্যে অল্পলোকই পলাইতে চেষ্টা করে এবং প্রতি দশ হাজারে একজন সক্ষম হয় কি না সন্দেহ।

পনর বা তদ্ধর্ব বয়স্ক বহ্তর বালক কয়েদী, জেলের অন্যতম বিষাদময় দৃশ্য। অধিকাংশই ব্দ্ধিমান বালক এবং স্যোগ পাইলে ইহারা অনায়াসে ভাল হইতে পারে। অধ্না ইহাদিগকে প্রাথমিক লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু জেলের অন্যান্য ব্যবস্থার মত ইহাও অত্যন্ত অসম্প্র্ণ এবং নিষ্ফল। ইহারা খেলাধ্লার স্যোগ কমই পায়, কোন প্রকার সংবাদপত্রও পড়িতে পায় না, বইও পড়িতে দেওয়া হয় না। বার ঘণ্টা বা তাহারও অধিক কাল সমস্ত বন্দীকে তালা দিয়া আটক রাখা হয়—দীর্ঘ অপরাহ্নে এবং এই সময়ে তাহাদের কিছ্ই করিবার থাকে না।

তিন মাস অন্তর একবার আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করিতে বা পত্রাদি দেওয়া হয়—এইর্প দীর্ঘকাল বিলম্ব অত্যন্ত নিষ্ঠ্র ব্যবস্থা। এমন কি, অনেক

* স্টেট্স্‌ম্যান—১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪।

কয়েদী ইহারও সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। তাহারা যদি নিরক্ষর হয় (অধিকাংশই নিরক্ষর) তাহা হইলে পত্র লিখাইবার জন্য কোন জেল কর্মচারীর উপর নির্ভর করিতে হয়, ইহারা সাধারণতঃ কাজ না বাড়াইবার জন্য কৌশলে ইহা এড়াইয়া থাকে। পত্র লেখা হইলেও ঠিকানা ভাল করিয়া লেখা হয় না বলিয়া অনেক পত্র পৌঁছায় না। দেখা-শুনো করা আরও কঠিন। কোন জেল কর্মচারীকে কিছু দিয়া সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে এ সুযোগ অনেকের অদৃষ্টেই জোটে না। কয়েদীরা প্রায়ই এক জেল হইতে অন্য জেলে বদলী হয়, তাহাদের আত্মীয়বর্গ কোন খোঁজ পায় না। আমি এমন অনেক কয়েদীকে জানি, বহু বর্ষ পরিবারবর্গের সহিত যাহাদের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছে এবং তাহাদের কি হইয়াছে তাহাও জানে না। তিন মাস বা তাহার পর যখন দেখাশুনা হয়,—তাহাও এক আশ্চর্য ব্যাপার। একদল কয়েদী এবং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎকারীদের তারের বেড়ার দুই পাশে দাঁড় করান হয় এবং সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া কথা বলিতে থাকে। এক সঙ্গে এতগুলি লোকের যুগপৎ দেখা করার ব্যবস্থায়—হৃদয়ের আদান-প্রদানের সুবিধা থাকে না।

অতি অল্পসংখ্যক কয়েদী (ইউরোপীয়ান ছাড়া হাজার করা একজনের বেশী নহে) ভাল খাদ্য, ঘন ঘন সাক্ষাৎকার বা পত্র লেখার বিশেষ সুবিধা পায়। রাজনৈতিক নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় যখন হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দীতে জেলখানা ভরিয়া যায়, তখন ঐ সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক বন্দীদের কি স্ত্রী কি পুরুষ, শতকরা পঁচানব্বই জনকেই সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা হইয়া থাকে এবং কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় না।

বৈপ্লবিক কার্যের অপরাধে যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘ কারাদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদিগকে দীর্ঘকাল নির্জন কারাগৃহে রাখা হয়। আমার বিশ্বাস, যুক্তপ্রদেশে এই শ্রেণীর বন্দীকে সাধারণতঃই নির্জন 'সেলে' আবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু নিয়মানুযায়ী, কারাবিধি ভঙ্গ করিবার বিশেষ শাস্তিস্বরূপ নির্জন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল বন্দী, যাহাদের অধিকাংশই তরুণবয়স্ক,—তাহাদিগকেও এভাবে বন্দী থাকিতে হয়; অথচ জেলখানায় তাহাদের আচরণ আদর্শস্থানীয় হইতে পারিত। এইরূপে আদালতে প্রদত্ত শাস্তির সহিত জেল কর্তৃপক্ষ একান্ত অযৌক্তিকভাবে আর এক ভয়াবহ শাস্তি যোগ করিয়া দেন। ইহা আশ্চর্য, কোন কারাবিধির সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই। নির্জন কারাবাস, অল্পদিনের জন্যও অত্যন্ত বেদনাজনক ব্যাপার; ইহাকে বৎসরের পর বৎসর চালাইলে তাহা এক দারুণ নিষ্ঠুরতা হইয়া পড়ে, ইহাতে ধীরে ধীরে মানসিক অবনতি হইতে থাকে, ক্রমে পাগল হইবার উপক্রম হয়, মুখে এক নৈরাশ্যের শূন্যতার ভাব ফুটিয়া উঠে; দৃষ্টি ভীত পশুর মত হয়। ইহা ধাপে ধাপে মানুষের তেজ ও বীর্যকে হত্যা করা, জীবন্ত জীবদেহে ছুরিকাচালনার ন্যায় ইহা আত্মার উপর অবিরত মন্থর আঘাত। ইহা কাটাইয়া উঠিলেও, মানুষ অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে, সমাজজীবনের সহিত সে আর সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে না। এই ব্যক্তি কোন কাজ বা অপরাধের জন্য দায়ী কি না? এ চিরন্তন প্রশ্ন তো আছেই। ভারতের পুলিশী ব্যবস্থা সকলকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে; রাজনৈতিক ব্যাপারে উহা আরও অধিক।

ইউরোপীয়ান অথবা ইউরেশিয়ান কয়েদীদের অপরাধ যাহাই হউক এবং সামাজিক মর্যাদা যাহাই হউক, নির্বিচারে সকলেই উচ্চশ্রেণীর কয়েদী হয় এবং ভাল খাদ্য, কম কাজ, অধিকতর ঘন ঘন দেখাশুনো ও চিঠিপত্র পাইয়া থাকে। সপ্তাহে একবার করিয়া পত্নীদের সহিত দেখাশুনোর ফলে তাহারা বাহিরের ঘটনাবলীর

সহিত যোগ রাখিতে পারে। পাদ্রীরা তাহাদের বিদেশী সচিত্র পত্রিকা বা ব্যঙ্গ কৌতুকের কাগজ আনিয়া দেন এবং প্রয়োজন মত পরিবারবর্গের নিকট সংবাদাদি দিয়া থাকেন।

ইউরোপীয়ান কয়েদীদের বিশেষ সুবিধার জন্য কেহ তাহাদের ঈর্ষা করে না, কেননা তাহারা সংখ্যায় অতি অল্প। কিন্তু স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে অন্যান্য বন্দীদের প্রতি ব্যবহারে মানবোচিত মানদণ্ডের অভাব দেখিয়া চিত্ত পীড়িত হয়। কোন কয়েদীকেই ব্যক্তিবিশেষ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না এবং তাহাদের সহিত সেভাবে ব্যবহারও করা হয় না। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের দুর্বহ দমননীতির অমানুষিক দিক কত কদর্য, তাহা কারাগারে আসিলে দেখা যায়। এই চিন্তাহীন ভ্রূক্ষেপহীন যন্ত্র অবিরাম গতিতে যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই পিষ্ট করিতেছে—এই যন্ত্রটিকে অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্য লইয়াই কারাবিধিগুলি রচিত। আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন নরনারীরা এই হৃদয়হীন যন্ত্রের রাজত্বের মধ্যে সতত পীড়া ও মনোবেদনা অনুভব করে। আমি দেখিয়াছি, এই নিরানন্দ নিষ্ঠুর ব্যবস্থায় দীর্ঘকাল দণ্ডিত কয়েদী সময় সময় ভাঙিগয়া পড়ে এবং অসহায় ক্ষুদ্র শিশুর মত ক্রন্দন করে। যাহাতে তাহাদের মুখে একটু হাসি, আনন্দ দীপ্তি বা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে পারে, এমন সামান্য সহানুভূতির বাণী, একটু উৎসাহ এই কারাগারে কত দুর্লভ!

তবুও কয়েদীদের নিজেদের মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্য ও বন্ধুত্বের অনেক মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একবার একজন "পেশাদার" অন্ধ কয়েদী তের বৎসর পর মুক্তিলাভ করে। দীর্ঘকাল পরে সে বাহিরে যাইতেছে, সেই বন্ধুহীন বহির্জগতে তাহার কোন আশ্রয় নাই। তাহার সহ-কয়েদীরা তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইল; কিন্তু তাহাদের সাধ্যই কতটুকু! একজন তাহাকে জেল কার্যালয়ে জমা দেওয়া সার্টটি দান করিল, আর একজন দুই চারিখানা কাপড় দিল। তৃতীয় ব্যক্তি সেইদিন প্রভাতেই একজোড়া নূতন 'স্যাণ্ডাল' পাইয়াছিল এবং গর্বের সহিত আমাকে দেখাইয়াছিল। জেলে ইহা এক দুর্লভ সম্পদ। যখন সে দেখিল, তাহার বহুবর্ষের এক অন্ধ সঙ্গী নগ্নপদে বাহিরে যাইতেছে; সে স্বেচ্ছায় তাহার নূতন 'স্যাণ্ডাল' জোড়া তাহাকে দিয়া দিল। আমার তখন মনে হইল, বহির্জগত অপেক্ষা এই কারাগারে দয়া-দাক্ষিণ্য অনেক বেশী।

১৯৩০ সাল বহু নাটকীয় এবং প্রাণপ্রদ, জীবনপ্রদ ঘটনাপ্রবাহে পরিপূর্ণ। সমগ্র জাতিকে উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে গান্ধীজীর আশ্চর্য শক্তি কি বিস্ময়াবহ! ইহার মধ্যে যেন যাদু আছে; মনে পড়িল, গোখলে একবার তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ধূলি হইতেও বীর সৃষ্টি করিতে পারেন। জাতীয় মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়স্বরূপ শান্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতির কার্যকারিতায় যেন সকলের আস্থা জন্মিল, দেশের চিত্তে আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হইল, শত্রু মিত্র সকলেই একথা স্বীকার করিলেন। যাহারা আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল, তাহারা আশ্চর্য উন্মাদনায় বিভোর হইল—এই উন্মাদনা কারাগারেও দেখা গেল। সাধারণ কয়েদীরাও বলিতে লাগিল, "স্বরাজ আসিতেছে।" উহার জন্য তাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধার আশা লইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ওয়ার্ডাররা বাজারের গল্প শুনিয়া আসিয়া স্বরাজ অনুরবর্তী বলিয়া মনে করিত—জেলের ছোটখাট কর্মচারীরাও একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল।

আমরা কারাগারে কোন দৈনিক পত্রিকা পাইতাম না, একখানি হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রিকা আসিত,—তাহাতে যতটুকু সংবাদ পাইতাম, তাহাই আমাদের কল্পনাকে

দীপ্ত করিয়া তুলিত। প্রত্যহ যষ্টি সঞ্চালন, কখন বা গুলীবর্ষণ, শোলাপুরে সামরিক আইন এবং জাতীয় পতাকা বহনের জন্য দশ বৎসর কারাদণ্ড। আমাদের জনসাধারণ, বিশেষতঃ নারীরা সমগ্র দেশে যে ভাবে কার্য করিতেছে, তাহাতে আমরা গর্ব বোধ করিতাম। আমার মাতা, স্ত্রী ও ভগ্নী এবং সম্পর্কিতা ভগ্নী ও বান্ধবীদের কার্যকলাপে আমি অধিকতর সন্তোষ লাভ করিতাম। যদিও আমি কারাগারে তাঁহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া আছি তথাপি আমরা যেন অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইতেছি; এক মহৎ উদ্দেশ্যের কর্মসূত্র যেন আমাদিগকে নূতন স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিল। পরিবার বৃহত্তম গোষ্ঠীর মধ্যে যেন মিলিয়া গেল। অথচ পুরাতন স্নেহ মমতার টান সমানই রহিয়া গেল। নিজের শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া কমলা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য যে ভাবে কার্য করিতেছিল, সে সংবাদে আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

আমি কারাগারে অনেকটা নিশ্চিন্তে কালযাপন করিতেছি অথচ বাহিরে অনেকে কত বিঘ্ন বিপদের সম্মুখীন হইয়া বহু কষ্ট সহ্য করিতেছে, এই চিন্তা আমার নিকট দুর্বহ হইয়া উঠিল। বাহিরে যাইবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল, অথচ উপায় নাই। অবশেষে আমি কারার মধ্যেই কঠোর জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। আমি প্রত্যহ তিন ঘণ্টাকাল আমার নিজের চরকায় সূতা কাটিতাম এবং জেলকর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া আরও ২।৩ ঘণ্টা কাল "নেওয়ার" (চওড়া ফিতা) বুনিতাম। এই কাজগুলি আমার ভাল লাগিত। ইহাতে অতিরিক্ত পরিশ্রমও হইত না, বিশেষ মনোযোগও দিতে হইত না অথচ মনের উত্তেজনা অনেকটা প্রশান্ত হইত। আমি পড়াশুনা খুব বেশী করিতাম। সময়ান্তরে ঝাড়ু দেওয়া, নিজের কাপড়চোপড় কাচা প্রভৃতিও করিতাম। আমি ইচ্ছা করিয়াই শারীরিক পরিশ্রম করিতাম, কেন না আমার কারাদণ্ড বিনাশ্রম ছিল।

বাহিরের ঘটনাবলীর চিন্তা এবং জেলের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ, ইহা লইয়াই নৈনী জেলে আমার দিন কাটিতে লাগিল। ভারতীয় কারাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে আমার মনে হইল, ইহা যেন ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মত। শাসনযন্ত্রে যোগ্যতা ও কুশলতার অভাব নাই, দেশের উপর গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ইহা অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে, অথচ দেশের মানুষগুলির সম্বন্ধে প্রায় কোন চেতনাই নাই। বাহির হইতে দেখিলে জেলখানার কাজকর্ম বেশ যোগ্যতার সহিত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এবং কতকাংশে ইহা সত্যও বটে; কিন্তু যে সকল হতভাগ্য এখানে আসে, তাহাদের উন্নতির জন্য সাহায্য করা যে জেলের প্রধান উদ্দেশ্য, সেকথা কেহ ভাবে বলিয়া মনে হয় না। জব্দ কর, পিষিয়া ফেল—এই ভাব সর্বত্র বিরাজিত। তাহারা যখন বাহিরে যাইবে, তখন কাহারও যেন তেজ বীর্য অবশিষ্ট না থাকে। কি ভাবে কারাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়, কয়েদীদিগকে সংযত করা ও শাস্তি দেওয়া হয়? প্রধানতঃ কয়েদীদিগের দ্বারাই তাহাদিগকে শাসনে রাখা হয়। কতকগুলি কয়েদীকে কয়েদী-মেট প্রভৃতি করিয়া দেওয়া হয় এবং কতক ভয়ে এবং কতক পুরস্কার পাইবার আশায়, মেয়াদ কম হইবার আশায় তাহারা কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করে। বেতনভোগী বাহিরের ওয়ার্ডারের সংখ্যা অত্যন্ত কম। জেলের ভিতরে সাধারণতঃ কয়েদী-মেটরাই পাহারা দিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, জেলখানায় গোয়েন্দাগিরি প্রবলভাবে চলিয়া থাকে। কয়েদীদিগকে পরস্পরের উপর নজর রাখিতে উৎসাহ দেওয়া হয়, যাহাতে কয়েদীরা দলবদ্ধ হইয়া কাজ না করিতে পারে সেজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। এইভাবে তাহাদের মধ্যে ভেদ রক্ষা করিলে তাহাদের সংযত রাখা যাইতে পারে; অতএব,

ইহার অর্থ সহজেই ব্ঝা যায়।

বাহিরে আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্টেও এই ব্যবস্থাই ব্যাপক ও ব্হত্তররূপে দেখিতে পাই, তবে সেখানে তাহা কিঞ্চিৎ আবৃত। এখানে কয়েদী-মেট ও কয়েদী-ওয়ার্ডারদের নাম স্বতন্ত্র। ইহাদের বড় বড় উপাধি আছে, ইহাদের তক্‌মা চাপরাসও বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। এবং তাহার পশ্চাতে কারাগারের মতই অস্ত্রধারী রক্ষীদল প্রস্তুত হইয়াই আছে।

আধ্নিক রাষ্ট্রে জেলখানাগ্লির প্রয়োজনীয়তা কত অপরিহার্য! অন্ততঃপক্ষে কয়েদী চিন্তা করিতে থাকে যে, গভর্ণমেণ্টের বহ্তর বিভাগ ও অন্যান্য দায়িত্ব, প্লিশ কি সৈন্যদল, কারাগারের কার্যপ্রণালীর তুলনায় নিতান্ত বাহ্য ব্যাপার মাত্র। যে দলের হাতে গভর্ণমেণ্টের পরিচালন-ক্ষমতা থাকে, সেই দলের ইচ্ছা অপরের উপর প্রয়োগ করিবার পীড়নমূলক যন্ত্রই হইল রাষ্ট্র—এই মার্কসীয় মতবাদের যাথার্থ্য কারাগারে বসিয়াই ব্ঝিতে পারা যায়।

আমার ব্যারাকে আমি এক মাস একাকীই ছিলাম। তারপর নর্মদাপ্রসাদ সিংহকে সঙ্গীরূপে পাইয়া অনেকটা শান্তি পাইলাম। আড়াই মাস পরে ১৯৩০ সালের জ্ন মাসের শেষদিন আমাদের ক্ষ্দ্র আবেষ্টনীর মধ্যে সহসা হ্ড়াহ্ড়ি পড়িয়া গেল। অপ্রত্যাশিত ভাবে অতি প্রত্যূষে আমার পিতা ও ডাঃ সৈয়দ মাম্দ সেখানে আসিলেন। তাঁহারা উভয়েই আনন্দভবনে অতি প্রত্যূষে শয্যায় থাকিতেই গ্রেফতার হইয়াছিলেন।

৩১

এরোডায় আপোষের কথাবার্তা

আমার পিতার গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গেই অথবা অব্যবহিত পরেই কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত করা হইল। ইহার ফলে বাহিরে এক ন্তন অবস্থার উদ্ভব হইল—অধিবেশন হইলেই সমস্ত সদস্য একসঙ্গে ধরা পড়িতেন। পূর্বপ্রাপ্ত ক্ষমতান্সারে অস্থায়ী সভাপতিরা স্থলাভিষিক্ত সদস্য মনোনীত করিতেন। এইভাবে অনেক নারী অস্থায়ী সদস্য হইয়াছিলেন। কমলাও তাঁহাদের অন্যতম।

জেলে আসিবার সময় পিতার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং যে অবস্থায় তাঁহাকে রাখা হইল, তাহাতে তিনি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অন্ভব করিতে লাগিলেন। ইহা অবশ্য গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাকৃত নহে। কেন না তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তাঁহারা সাধ্যমত চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু নৈনী জেলে বেশী কিছ্ করিবার উপায় ছিল না। আমার ব্যারাকে চারিটি ক্ষ্দ্র সেলে চারজনের পক্ষে স্থানের অত্যন্ত অকুলান হইল। জেল-স্পার আসিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, পিতাকে জেলের অন্য অংশে লইয়া গেলে তিনি অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় থাকিতে পারিবেন। কিন্তু আমরা একত্রে থাকিতেই ভাল বোধ করিলাম। তাহা হইলে আমরা তাঁহার সেবা-শ্শ্রূষা করিতে পারিব।

তখন বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের ছাদ দিয়া মাঝে মাঝেই নানাস্থানে টপ টপ করিয়া জল পড়ে। সেলের অভ্যন্তরভাগ শ্ষ্ক রাখা কঠিন। রাত্রে পিতার বিছানা লইয়া সময়ময় সরাইতে হইত। বৃষ্টি বাঁচাইবার জন্য সেল-সংলগ্ন

ক্ষুদ্র বারান্দায় (১০×৫ ফুট) তাঁহার খাট পাতা হইত। কখনও কখনও তাঁহার জ্বর হইত। অবশেষে জেল কর্তৃপক্ষ একটি অতিরিক্ত বারান্দা তৈরী করিতে মনস্থ করিলেন। আমাদের সেল-সংলগ্ন এই প্রশস্ত সুন্দর বারান্দাটি তৈয়ারী হওয়ায় আমাদের অনেক সুবিধা হইল। কিন্তু ইহাতে পিতার পক্ষে বিশেষ লাভ হয় নাই, কেন না বারান্দা তৈয়ারী হওয়ার অল্পদিন পর তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল।

স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও মিঃ এম আর জয়াকর কংগ্রেসের সহিত গভর্ণমেণ্টের শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, জুলাই মাসের শেষভাগে ইহা লইয়া তুমুল আলোচনা চলিতে লাগিল। আমার পিতাকে দয়া করিয়া যে দৈনিক সংবাদপত্র দেওয়া হইত, তাহাতেই আমরা ইহা পড়িতাম। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বড়লাট লর্ড আরুইন ও সপ্রু-জয়াকরের প্রকাশিত পত্রাবলী হইতে জানিতে পারিলাম যে, তথাকথিত "শান্তিদূতেরা" গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমরা বুঝিতে পারিলাম না যে কেন তাঁহারা এই কার্যে ব্রতী হইলেন অথবা তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি। পরে আমরা তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, গ্রেফতারের কয়েকদিন পূর্বে বোম্বাইয়ে পিতা যে বিবৃতি* দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা উৎসাহিত হইয়া এই কার্য করিয়াছিলেন। লণ্ডন "ডেলী হেরাল্ড"-এর প্রতিনিধি মিঃ শ্লোকম (তখন ভারতে ছিলেন) আমার পিতার সহিত আলাপ-আলোচনার পর ঐ বিবৃতির মুসাবিদা করেন এবং পিতা উহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। ঐ বিবৃতিতে ইহা উল্লেখ ছিল যে, গভর্ণমেণ্ট যদি কতকগুলি সর্তে সম্মত হন, তাহা হইলে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে পারেন এইরূপ সম্ভাবনা আছে। ইহা কতকাংশে অস্পষ্ট ও পরীক্ষামূলক প্রস্তাব মাত্র এবং উহাতে একথাও স্পষ্ট ছিল যে, এমন কি গান্ধিজী এবং আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া পিতা ঐ অস্পষ্ট সর্তগুলি সম্পর্কে কোন কথাই বলিতে পারিবেন না। সে বৎসর আমি কংগ্রেসের সভাপতি, অতএব, আমাকে গণনা করিতেই হয়। গ্রেফতারের পর নৈনী জেলে পিতা আমাকে এ কথা বলিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তাড়াতাড়িতে ঐরূপ অস্পষ্ট বিবৃতি দেওয়াতে তিনি দুঃখিত, কেননা উহাতে ভুল ধারণা উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কার্যতঃ হইয়াছিলও তাহাই। তবে যে সকল লোক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করে, তাহারা অতি-নির্দিষ্ট ও সরল বিবৃতির মধ্যেও খুঁত বাহির করিয়া থাকে।

স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং মিঃ জয়াকর ২৭শে জুলাই সহসা নৈনী জেলে

---

* ১৯৩০-এর ২৫শে জুন তারিখে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু অনুমোদিত বিবৃতি—গোলটেবিল বৈঠক স্বাধীনভাবে যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ঐ প্রস্তাবগুলি কিভাবে গ্রহণ করিবেন, সে সম্বন্ধে কোন পূর্ব ধারণা না করিয়াও, যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্ট কোন বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে এরূপ আশ্বাস দেন যে তাঁহারা ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র সমর্থন করিবেন,—অবশ্য ভারতের সহিত ব্রিটেনের দীর্ঘকালের সম্বন্ধ এবং ভারতের বর্তমান অবস্থার জন্য প্রয়োজনমত পারস্পরিক আপোষ যাহা পরে গোলটেবিল কর্তৃক স্থির হইবে—তাহা হইলে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ব্যক্তিগতভাবে সে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। অবশ্য দায়িত্বশীল কোন তৃতীয়পক্ষের মারফৎ যদি সেরূপ প্রতিশ্রুতি মিঃ গান্ধী বা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট আসে, তাহা বিবেচনা করিতে তিনি গ্রহণ করিবেন। যদি সেরূপ প্রতিশ্রুতি আসে এবং গৃহীত হয়, তাহা হইলে আপোষের সম্ভাবনা হইতে পারে—যাহাতে একদিকে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবে, অন্যদিকে গভর্ণমেণ্ট বর্তমান দমননীতি প্রত্যাহার করিবেন এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে ছাড়িয়া দিবেন। পরে পারস্পরিক সর্তসমূহের সহিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে পারেন।"

গান্ধিজীর পত্রসহ আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করিলেন। সেদিন এবং তার পরদিন তাঁহাদের সহিত আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হইল। পিতার জ্বরভাব ছিল, তিনি অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিলেন। আমরা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তর্ক করিলাম, আলোচনা করিলাম, কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য পরস্পরের ভাষা ও চিন্তা অল্পই বুঝিতে পারিলাম। তবে ইহা বুঝিলাম, বর্তমান অবস্থা যেরূপ তাহাতে কংগ্রেসের ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে শান্তিস্থাপনের সম্ভাবনা অতি অল্প। আমরা কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ বিশেষভাবে গান্ধিজীর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন প্রস্তাব করিতে অস্বীকার করিলাম এবং এই মর্মে গান্ধিজীর নিকট পত্র লিখিলাম।

এগার দিন পর ডাঃ সপ্রু পুনরায় বড়লাটের উত্তর লইয়া আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আমাদের এরোড়া যাওয়ার প্রস্তাবে (পুণার যে জেলে গান্ধিজী ছিলেন) বড়লাট আপত্তি করেন নাই। তবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি যে সকল সদস্য তখনও বাহিরে থাকিয়া আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাবে সপারিষদ বড়লাট সম্মত হন নাই। এই অবস্থায় আমরা এরোড়া যাইতে সম্মত কিনা, ডাঃ সপ্রু জানিতে চাহিলেন। আমরা বলিলাম, গান্ধিজীর সহিত যে কোন সময়ে দেখা করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদের অন্যান্য সহকর্মীদের সহিত আলোচনা ব্যতীত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা নাই। সেইদিন (অথবা তাহার পূর্বদিন) সংবাদপত্রে আমরা দেখিলাম, বোম্বাই-এ অতি প্রচণ্ড লাঠিচালনা হইয়া গিয়াছে এবং মালব্যজী, বল্লভভাই প্যাটেল, তাসাদ্দুক সেরওয়ানী ও অন্যান্য স্থায়ী অস্থায়ী কার্যকরী সমিতির সদস্যরা গ্রেফতার হইয়াছেন। আমরা ডাঃ সপ্রুকে বলিলাম, এই সকল ঘটনা মোটেই অনুকূল নহে, তিনি আমাদের মনোভাব বড়লাটকে বুঝাইয়া বলেন, সে অনুরোধও আমরা করিলাম। ডাঃ সপ্রু বলিলেন, যথাসম্ভব শীঘ্র আমাদের গান্ধিজীর সহিত দেখা করায় কোন অনিষ্ট হইবে না। আমরা পূর্বে হইতেই তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, যদি আমাদের এরোড়া যাইতেই হয়, তাহা হইলে নৈনী জেলে আমাদের সঙ্গী এবং কংগ্রেসের সম্পাদক ডাঃ সৈয়দ মামুদও আমাদের সঙ্গে যাইবেন।

দুই দিন পর ১০ই আগস্ট আমি, মামুদ ও পিতা—এই তিনজন স্পেশ্যাল ট্রেনে নৈনী হইতে পুণা যাত্রা করিলাম। আমাদের গাড়ী অবশ্যই বড় বড় ষ্টেশনে থামে নাই—ছোটখাট ষ্টেশনে মধ্যে মধ্যে গাড়ী থামিত। তবুও সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, গাড়ী থামুক আর নাই থামুক, প্রত্যেক ষ্টেশনে জনতার ভীড় হইত। ১১ই তারিখ আমরা গভীর রাত্রে পুণার নিকটবর্তী কিরকীতে পৌঁছিয়াছিলাম।

আমরা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, আমাদিগকে গান্ধিজীর ব্যারাকে রাখা হইবে, অন্ততঃ সত্বরই তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে। এরোড়া জেলের অধ্যক্ষ সেই ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমাদের সহিত যে পুলিশ কর্মচারী আসিয়াছিলেন, তাহার মারফৎ সংবাদ পাইয়া এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়। কারাধ্যক্ষ লেঃ কর্ণেল মার্টিন আমাদের নিকট গুপ্ত কথা ভাঙ্গিলেন না; কিন্তু পিতার সুকৌশল প্রশ্নে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, সপ্রু-জয়াকরের উপস্থিতি ব্যতীত আমাদিগকে গান্ধিজীর সহিত দেখা (অন্ততঃ প্রথম বার) করিতে দেওয়ার অভিপ্রায় নাই। পূর্বে দেখা হইলে আমাদের মনোভাব দৃঢ় হইতে পারে এবং আমরা ঐকান্তিক দৃঢ়তার সহিত বাধা দিতে পারি, এরূপ আশঙ্কা করা হইয়াছিল। সে রাত্রি এবং পরদিন দিবারাত্রি আমাদের পৃথক ব্যারাকে রাখা হইল,

পিতা মহা বিরক্ত হইলেন। যাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আমরা নৈনী হইতে আসিলাম, সেই গান্ধিজীর সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইতেছে না, অথচ আশার আশায় রাখা হইতেছে, ইহা অত্যন্ত ক্লেশকর। ১৩ই তারিখ মধ্যাহ্নের পূর্বে আমাদিগকে জানান হইল, স্যার তেজবাহাদুর ও মিঃ জয়াকর আসিয়াছেন এবং গান্ধিজীও তাঁহাদের সহিত জেলের অফিস ঘরে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমাদিগকেও সেইখানে যাইবার জন্য আহ্বান করা হইল। পিতা প্রথমে যাইতে অস্বীকার করিলেন। তার পর অনেক কৈফিয়ৎ ও ক্ষমাপ্রার্থনার পর তিনি এই সর্তে যাইতে সম্মত হইলেন যে, তিনি প্রথম নির্জনে গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বল্লভভাই প্যাটেল ও জয়রামদাস দৌলতরামকে এরোডাতেই আনা হইয়াছিল, সরোজিনী নাইডুও এরোডা জেলের নারীদের জন্য নির্দিষ্ট অংশে ছিলেন; আমাদের সম্মিলিত অনুরোধে তাঁহাদিগকেও আমাদের সম্মিলনে যোগ দিতে দেওয়া হইল। সেই দিন সন্ধ্যায় আমাকে, পিতাকে ও মামুদকে গান্ধিজীর ব্যারাকে লইয়া যাওয়া হইল, অবশিষ্ট কয়দিন আমরা তাঁহার সহিতই ছিলাম। বল্লভভাই ও জয়রাম দাসকেও ঐ কয়দিন পরামর্শের জন্য আমাদের নিকট রাখা হইয়াছিল।

১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই আগষ্ট, এই তিন দিন সপ্রু-জয়াকরের সহিত আলোচনা করিবার পর আমরা আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া পত্র বিনিময় করিলাম, ঐ পত্রে আমবা যে সকল নিম্নতম সর্তে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার এবং গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে পারি, তাহা লিখিয়া দিলাম। এই সকল পত্র পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।*

এই সকল বৈঠক ও আলোচনায় পিতা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। ১৬ই তারিখে সহসা তাঁহার প্রবল জ্বর হইল। ইহাতে আমাদের ফিরিতে বিলম্ব হইল। ১৯শে তারিখ রাত্রে আমরা পুনরায় স্পেশ্যাল ট্রেনে নৈনী যাত্রা করিলাম। পিতার যাহাতে পথে কোন ক্লেশ না হয়, সেজন্য বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এরোডা জেলেও তাঁহার বিশেষ যত্ন লওয়া হইত। আমরা যে রাত্রে এরোডা জেলে উপস্থিত হই, সেদিনের একটি কৌতুককর ঘটনার কথা মনে আছে। কারাধ্যক্ষ কর্ণেল মার্টিন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি শ্রেণীর খাদ্য তিনি পছন্দ করেন? পিতা তাঁহাকে বলিলেন, তিনি সাধারণতঃ লঘু পথ্যই গ্রহণ করেন। তারপর তিনি প্রভাতে শয্যায় চা হইতে নৈশভোজন পর্যন্ত খাদ্যের খুটিনাটি তালিকা দিতে লাগিলেন। (নৈনী জেলে বাড়ী হইতে পিতার খাদ্য আসিত)। পিতা সরলভাবে তাঁহার লঘু পথ্যের তালিকা দিলেন, তাহা গুরুতর বোধ হইল। লণ্ডনের রিট্জ বা সাভয় হোটেলে ইহা অবশ্যই অতি সাধারণ ও লঘু খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, পিতারও অবশ্য তাহাই ধারণা। কিন্তু এরোডা জেলে ইহা আশ্চর্য দুর্লভ এবং অতিরিক্ত বিবেচিত হইল। পিতার বহুতর বস্তু-বহুল ফর্দ শুনিতে শুনিতে কর্ণেল মার্টিনের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া আমি ও মামুদ অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতে লাগিলাম। কেন না, বহুকাল ধরিয়া তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও খ্যাতনামা নেতার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার জন্য ছাগলের দুধ, খেজুর ও কচিৎ কমলালেবু ব্যতীত আর কিছুর দরকার হয় নাই। কিন্তু পৃথক ধরণের নেতার সহিত তাঁহার এই প্রথম পরিচয়।

পুণা হইতে নৈনীতে ফিরিবার পথেও বড় বড় ষ্টেশনে গাড়ী না থামাইয়া ছোট ছোট ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে লাগিল। এবার জনতা আরও বেশী মনে হইল;

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনে, বিশেষভাবে হারদা, ইটারসি এবং সোহাগপুরে ষ্টেশন প্লাটফর্ম এমন কি রেললাইনের উপর জনতা ভীড় করিয়াছিল। অল্পের জন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

পিতার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল। তাঁহার নিজের চিকিৎসকগণ এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসকগণ তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। স্পষ্টই বুঝা গেল, জেলখানায় তাঁহার উপযুক্ত চিকিৎসা অসম্ভব। তাঁহার অসুখের জন্য কারামুক্তি হওয়া উচিত, সংবাদপত্রে জনৈক বন্ধুর এইরূপ মন্তব্য দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; তাঁহার মনে হইল, জনসাধারণ ভাবিবে যে, প্রস্তাবটি তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। এমন কি, তিনি লর্ড আরুইনকে তারযোগে জানাইলেন যে, কারামুক্তির অনুগ্রহ তিনি চাহেন না। কিন্তু দিনে দিনে তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল, তাঁহার ওজন কমিয়া গেল; শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইতে লাগিল। দশ সপ্তাহ কারাগারে থাকিয়া তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ করিলেন।

পিতা চলিয়া গেলে আমাদের ব্যারাক প্রাণহীন ও শূন্যময় মনে হইতে লাগিল। আমি, নর্মদাপ্রসাদ ও মামুদ তিনজনই আনন্দের সহিত সারাক্ষণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতাম। তাঁহার ছোটখাট কাজগুলি করিয়া কত আনন্দ হইত! আমি নেওয়ার বুনা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, চরকা অল্পই কাটিতাম, পড়াশুনাও বেশী করিতাম না। তাঁহার প্রস্থানের পর আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া পুনরায় পুরাতন নিয়মে কাজ করিতে লাগিলাম। পিতার মুক্তির পর দৈনিক সংবাদপত্রও বন্ধ হইয়া গেল। চার কি পাঁচ দিন পর আমার ভগ্নীপতি রণজিৎ পণ্ডিত গ্রেফ্‌তার হইয়া আমাদের ব্যারাকে আসিলেন।

ছয় মাস কারাদণ্ড শেষ হওয়ায় ১১ই অক্টোবর আমি জেল হইতে মুক্তি পাইলাম। বাহিরে তখন সংঘর্ষ তীব্রভাবে চলিতেছে, আমার এই স্বাধীনতা ক্ষণস্থায়ী। 'শান্তিদূত' সপ্রু-জয়াকরের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। আমার কারামুক্তির দিনই আরও দুই কি ততোধিক অর্ডিন্যান্স জারী হইল। কারার বাহিরে আসিয়া আমি আনন্দিত হইলাম এবং যে কয়দিন বাহিরে থাকি যথাসম্ভব কাজ করিবার সংকল্প করিলাম।

কমলা তখন এলাহাবাদে কংগ্রেসের কাজ লইয়া ব্যস্ত ছিল। পিতা মুসৌরীতে চিকিৎসাধীন ছিলেন, আমার মাতা ও ভগ্নী তাঁহার সহিত ছিলেন। আমি দেড় দিন এলাহাবাদে কংগ্রেসের কাজকর্মের ব্যবস্থা করিয়া কমলাকে লইয়া মুসৌরী যাত্রা করিলাম। পল্লী অঞ্চলে খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে কিনা আমরা তখন এই বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। খাজনা আদায়ের নির্দিষ্ট সময় তখন নিকটবর্তী; কিন্তু যাহাই হউক, কৃষিপণ্যের মূল্য অসম্ভব হারে কমিয়া যাওয়ায় খাজনা আদায় করা কঠিন হইবে। এই সময় ভারতবর্ষেও জগতের বাজারের মন্দা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

আইন অমান্য আন্দোলনের অংশরূপেই হউক বা পৃথক আন্দোলনরূপেই হউক, ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলনের ইহাই উপযুক্ত অবসর। এই বৎসরের আয় হইতে কি জমিদার কি প্রজা কাহারও পক্ষে পুরা খাজনা আদায় দেওয়া অসম্ভব। জমিদারদের সাধারণতঃ কিছু সংস্থান আছে, তাহাদের পক্ষে ঋণ পাওয়াও সহজ। কিন্তু প্রজারা অধিকাংশই হতদরিদ্র, কোন সঞ্চয় সঞ্চিত তাহাদের নাই। যে কোন গণতান্ত্রিক দেশে, যেখানে কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধ ও প্রভাবশালী, সেখানে বর্তমান অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা অসম্ভব হইত। কিন্তু

ভারতবর্ষে কৃষকদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রায় কিছুই নাই। কোন কোন অঞ্চলে কংগ্রেসের সহায়তায় কৃষিবল একটু সঙ্ঘবদ্ধ; অবশ্য অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া যদি কৃষকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে, এ আশঙ্কা সর্বদাই আছে। তবে ইহারা বংশানুক্রমিক অপ্রতিবাদে সমস্ত দুঃখ নীরবে সহ্য করিতেই অভ্যস্ত।

গুজরাট এবং অন্যান্য অঞ্চলে খাজনাবন্ধ আন্দোলন চলিতেছিল, তবে তাহা আইন অমান্য আন্দোলনের অংশরূপে রাজনৈতিক আন্দোলনরূপেই পরিচালিত হইতেছিল। সেখানে রায়তারী প্রথা প্রচলিত এবং তাহারা গভর্ণমেন্টকে খাজনা দিয়া থাকে। তাহারা খাজনা না দিলে গভর্ণমেন্ট প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু যুক্তপ্রদেশে জমিদারী ও তালুকদারী প্রথা প্রচলিত; গভর্ণমেন্ট ও কৃষকের মধ্যে বহু মধ্যস্বত্বভোগী বিদ্যমান। এখানে প্রজারা খাজনা না দিলে মুখ্যভাবে জমিদারেরা বিপন্ন হন। অতএব, এক্ষেত্রে শ্রেণীর প্রশ্ন স্বতঃই আসে। কিন্তু কংগ্রেস নিছক জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান; ইহার মধ্যে অনেক মাঝারি এবং কয়েক-জন বড় জমিদারও আছেন। শ্রেণীস্বার্থের প্রশ্ন উঠে কিম্বা জমিদারেরা বিরক্ত হন এমন কিছু করিতে কংগ্রেসের নেতারা সর্বদাই ভীত; এই কারণে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম ছয় মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা পল্লী অঞ্চলে খাজনা বন্ধ আন্দোলন ঘোষণা করিলেন না। আমার মতে তখন উহার উপযুক্ত অবসর ছিল সন্দেহ নাই। যে কোন ভাবেই হউক, শ্রেণীস্বার্থের কথা তুলিতে আমার নিজের কোন ভয় ছিল না; তবে আমি ইহা মানিতে বাধ্য যে, তখন কংগ্রেসের নিয়ম যেরূপ তাহাতে উহা শ্রেণীসংঘর্ষ অনুমোদন করিতে পারে না। অবশ্য কংগ্রেস জমিদার ও প্রজা উভয়কেই খাজনা দিতে নিষেধ করিতে পারে। জমিদারেরা সম্ভবতঃ গভর্ণমেন্ট দাবী করিলেই খাজনা চুকাইয়া দিবেন; কিন্তু সে দোষ তাঁহাদেরই হইবে।

অক্টোবরে যখন আমি জেল হইতে বাহিরে আসিলাম তখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেখিয়া আমি নিঃসন্দেহ বুঝিলাম, খাজনাবন্ধ আন্দোলনের ইহাই উপযুক্ত অবসর। কৃষকদের অর্থকষ্ট প্রায় চরমে উঠিয়াছে। আমাদের রাজনৈতিক নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন যদিও সর্বত্র পুরাদমে চলিতেছিল, তথাপি উহা একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল। তখনও লোকে অল্পাধিক দলে দলে জেলে যাইতেছিল বটে, কিন্তু সে উৎসাহ-উদ্দীপনা আর ছিল না। নগরবাসী ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা পুনঃ পুনঃ হরতাল ও মিছিলে অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার জন্য নূতন কিছু চাই, নূতন মানুষ চাই। একমাত্র কৃষক সম্প্রদায় ছাড়া আর কোথায় তাহা পাওয়া যাইবে? এইখানেই সমষ্টিবল সঞ্চিত রহিয়াছে। এইখানেই জনসাধারণের স্বার্থের ভিত্তিতে বিরাট গণ-আন্দোলন জাগ্রত করা যাইতে পারে এবং আমার মতে উহার দ্বারাই অতি গুরুতর সামাজিক প্রশ্নগুলিও সমাধানের অনুকূল অবস্থায় সৃষ্টি হইবে।

আমি এলাহাবাদে যে দেড় দিন ছিলাম, এই বিষয় লইয়া সহকর্মীদের সহিত আলোচনা করিলাম। সময় সংক্ষিপ্ত হইলেও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী-সভা আহূত হইল। অনেক তর্কবিতর্কের পর আমরা স্থির করিলাম, খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে। তবে আমরা প্রদেশের কোন অংশে উহা ঘোষণা করিলাম না, প্রত্যেক জিলার উপর ভার দেওয়া হইল। কার্যকরী সমিতি শ্রেণী-সংঘর্ষ বাঁচাইবার জন্য জমিদার ও প্রজা উভয়কেই সমানভাবে আহ্বান করিলেন। অবশ্য আমরা জানিতাম যে, প্রজারাই ইহাতে বেশী সাড়া দিবে।

এই সিদ্ধান্তের পর আমাদের এলাহাবাদ জিলাই প্রথম আন্দোলন আরম্ভ

করিতে প্রস্তুত হইল। নূতন আন্দোলনে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য আমরা প্রতিনিধি স্থানীয় কৃষকদের লইয়া একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করিলাম। কারামুক্তির প্রথম দিনই আমি যতখানি কাজ করিলাম, তাহাতে সুখী হইলাম। ইহার সহিত এলাহাবাদে এক বৃহৎ জনসভা আহ্বান করিয়া আমি বক্তৃতা করিলাম। এই বক্তৃতার জন্য আমার পুনরায় কারাদণ্ড হইল।

সে যাহা হউক, ১৩ই অক্টোবর আমি কমলাকে লইয়া মুসৌরী গেলাম এবং পিতার সহিত তিন দিন অবস্থান করিলাম। তাঁহাকে অনেকটা ভাল বোধ হইল, এ যাত্রা তিনি সারিয়া উঠিবেন, ইহা ভাবিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। পরিবারবর্গের সহিত তিনটি দিন যে আনন্দে কাটিল, তাহা আমার স্মরণ আছে। আমার কন্যা ইন্দিরা ও তিনটি ছোট ভাগিনেয়ী সেখানে ছিল। আমি শিশুদের লইয়া খেলা করিতাম। কখনও আমরা মিছিল করিয়া বীরদর্পে বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতাম; সর্বকনিষ্ঠা (৩।৪ বৎসর বয়স্ক) জাতীয় পতাকা হস্তে আগে চলিত, পাছে পাছে আমরা চলিতাম এবং "ঝাণ্ডা ঊঁচা রহে হামারা" গানটি গাহিতাম। এই তিন দিনই পিতার সহিত আমার সর্বশেষ একত্র অবস্থান। তারপর যখন চরম রোগ তাঁহাকে আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল, তখন একবার দেখিয়াছিলাম মাত্র।

আমার পুনরায় গ্রেফ্‌তার অনুমান করিয়া এবং সম্ভবতঃ আমাকে আরও কিছুকাল নিকটে দেখিবার জন্য পিতা সহসা এলাহাবাদে প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প করিলেন। এলাহাবাদে ১৯শে তারিখ কৃষক সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য আমি ও কমলা ১৭ই তারিখ মুসৌরী হইতে যাত্রা করিলাম। পিতা অন্যান্য সকলকে লইয়া তাহার পরদিন এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন।

ফিরিবার পথে আমি ও কমলা উভয়েই কিছু উত্তেজনা অনুভব করিয়াছিলাম। আমরা দেরাদুন ছাড়িতেছি, এমন সময় আমার উপর ১৪৪ ধারা জারী করা হইল। লক্ষ্ণৌ-এ আমরা কয়েক ঘণ্টা ছিলাম, এখানে আসিয়া শুনিলাম আর একটি ১৪৪ ধারার নোটিশ অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু বৃহৎ ও ঘনসন্নিবিষ্ট জনতা ভেদ করিয়া পুলিশ কর্মচারীটি আমার নিকট পৌঁছিতে পারিলেন না। স্থানীয় মিউনিসিপালিটি আমাকে একখানি মানপত্র প্রদান করিলেন। তারপর আমরা মোটর গাড়ীতে এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম; পথে স্থানে স্থানে গাড়ী থামাইয়া কৃষকসভায় বক্তৃতা করিতে হইল। আমরা ১৮ই তারিখ রাত্রে এলাহাবাদে পৌঁছিলাম।

১৯শে তারিখ সকালবেলা আমার উপর আর একখানি ১৪৪ ধারার নোটিশ জারি হইল। বুঝিলাম, গভর্ণমেণ্ট আমার পিছু লইয়াছেন এবং আমার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমি পুনরায় গ্রেফ্‌তার হওয়ার পূর্বে কিষাণ কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমরা কেবল প্রতিনিধিদের সভা আহ্বান করিয়াছিলাম। বাহিরের লোকদিগকে এখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। এলাহাবাদ জিলার প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় ষোল শত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমাদের জিলায় খাজনাবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিবার প্রস্তাব উৎসাহের সহিত সম্মেলনে গৃহীত হইল। আমাদের বিশিষ্ট কর্মীরা কিছু ইতস্ততঃ করিলেন। অনেকের মনেই ইহার সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হইল। বড় জমিদারেরা গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রজাদিগকে ভীত করিয়া তুলিবেন। তাহারা সেই আঘাত সহ্য করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর সেই ষোল শত কৃষক প্রতিনিধির মনে কোনও সংশয় বা সন্দেহ ছিল না। অন্ততঃ তাহারা তাহা প্রকাশ করে নাই। আমি কনফারেন্সে এক বক্তৃতা করিলাম।

তাহার ফলে আমি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিলাম কিনা, বুঝিতে পারিলাম না। কেন না উক্ত নোটিশে আমাকে সাধারণে বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল।

সেখান হইতে আমি ষ্টেশনে পিতা ও অন্যান্য পরিবারমণ্ডলীকে আনিতে গেলাম। ট্রেন দেরীতে আসিল এবং তাঁহাদের আগমনের অব্যবহিত পরেই আমি কৃষক ও নাগরিকদের এক মিলিত জনসভায় যোগ দিতে চলিয়া গেলাম। সভার শেষে অত্যন্ত ক্লান্তদেহে রাত্রি ৮টার সময় আমি ও কমলা বাড়ীতে ফিরিতেছিলাম। পিতা ফিরিবার পর আমরা কথা বলার কোনও সুযোগই পাই নাই। আমি জানি, তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং আমিও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম। কিন্তু ফিরিবার পথে আমাদের বাড়ীর নিকট আমাদের গাড়ীখানা থামাইয়া ফেলা হইল এবং আমাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া তখনই যমুনা নদীর উপর দিয়া নৈনীতে আমার পুরাতন বাসস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। কমলা একাকী আনন্দভবনে প্রতীক্ষমান পরিবারবর্গকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল এবং আমি যখন নৈনী জেলের বৃহৎ সিংহদ্বার দিয়া পুনরায় প্রবেশ করিলাম, তখন ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে ৯টা বাজিয়া উঠিল।

৩২

যুক্ত প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন

আট দিন অনুপস্থিতির পর আমি পুনরায় নৈনীতে ফিরিয়া সেই পুরাতন ব্যারাকে সৈয়দ মামুদ, নর্মদাপ্রসাদ এবং রণজিৎ পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইলাম। কয়েকদিন পরে জেলের মধ্যেই আমার বিচার হইল। মুক্তির পরদিন আমি এলাহাবাদে যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম তাহার ভিত্তিতে কয়েকটি অভিযোগ উপস্থিত করা হইল। বলা বাহুল্য, আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করিলাম না। কেবলমাত্র আদালতের সম্মুখে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিলাম। আমাকে সিডিসানীর ১২৪ (ক) ধারায় ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০, টাকা জরিমানা করা হইল, ১৮৮২ সালের লবণ আইন অনুসারে ছয় মাস কারাদণ্ড ও এক শত টাকা জরিমানা করা হইল এবং ১৯৩০-এ ৬নং অর্ডিনান্স (কি বিষয় তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি) অনুসারে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড এবং এক শত টাকা জরিমানা হইল। শেষোক্ত কারাদণ্ড দুইটি একসঙ্গে চলিবে। মোটমাট আমার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল এবং জরিমানার টাকা না দিলে আরও পাঁচ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এইবার লইয়া আমার পাঁচ বার কারাদণ্ড হইল।

আমার গ্রেফ্‌তার ও কারাদণ্ডের ফলে আইন অমান্য আন্দোলনে সাময়িকভাবে কিছু শক্তিসঞ্চার হইল ও কিছু উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল। পিতার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। যখন কমলা গিয়া তাঁহার নিকট আমার গ্রেফ্‌তারের সংবাদ ব্যক্ত করিল তখন তিনি আহত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের টেবিলে করাঘাত করিয়া বলিলেন যে, তিনি এভাবে রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিবেন না। তিনি ভাল হইবেন এবং মানুষের মত কাজ করিবেন, এমন দুর্বলভাবে রোগের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন না। এ সংকল্প সাহসিক, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইচ্ছাশক্তি যত প্রবলই হউক না কেন, যে রোগ তাঁর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে জীর্ণ করিতেছে, তাহাকে পরাহত করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে।

কিন্তু কয়েকদিন আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল। লোকে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। তিনি যখন এরোডা জেলে ছিলেন তখন হইতে কয়েকমাস ধরিয়া তাঁহার থ্তুর সহিত রক্ত পড়িতেছিল। তাঁহার এই সঙ্কল্পের পর সহসা রক্ত বন্ধ হইয়া গেল। কয়েকদিন আর রক্ত পড়িল না। তিনি ইহাতে খ্সী হইলেন এবং জেলে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া গর্বের সহিত এই ঘটনা বলিলেন। কিন্তু দ্র্ভাগ্যক্রমে ইহা ক্ষণস্থায়ী হইল, কয়েকদিন পরেই বেশীমাত্রায় রক্ত পড়িতে লাগিল এবং তাঁহার রোগ প্নরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু ঐ অল্পকালেই তিনি তাঁহার প্রাতন শক্তি লইয়া নিখিল ভারতীয় আইন অমান্য আন্দোলনে এক ন্তন বেগ সঞ্চার করিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের কর্মীরা আসিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তিনি সর্বত্র প্রয়োজন মত উপদেশাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করিলেন (নভেম্বর মাসে, উহা আমার জন্মদিন)। যে বক্তৃতার জন্য আমার কারাদণ্ড হইয়াছে, ঐ বক্তৃতাটি ভারতের সর্বত্র জনসভায় ঐদিন পঠিত হইবে স্থির হইল। নির্দিষ্ট দিনে বহ্স্থানে লাঠি চলিল, জোর করিয়া মিছিল ও সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং কেবলমাত্র ঐদিনে দেশের সর্বত্র প্রায় পাঁচ হাজার লোক গ্রেফ্তার হইল। জন্মদিনের কি চমৎকার অন্ষ্ঠান!

পীড়িত পিতার পক্ষে এই ভাবে দায়িত্ব লইয়া শক্তিক্ষয় করা অত্যন্ত অন্যায়। আমি তাঁহাকে সম্প্র্ণ বিশ্রাম লইবার প্রার্থনা জানাইলাম। কিন্তু আমি জানিতাম, ভারতে থাকিয়া তাঁহার পক্ষে এর্প বিশ্রাম অসম্ভব; আন্দোলনের গতির সহিত তাঁহার মনও সর্বদা আলোড়িত থাকিবে এবং লোকেও উপদেশের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে। আমি সেই জন্য তাঁহাকে রেঙ্গ্ন, সিঙ্গাপ্র এবং জাভা প্রভৃতি অঞ্চলে ছোটখাট সম্দ্র যাত্রার পরামর্শ দিলাম। তিনিও প্রস্তাবটি পছন্দ করিলেন। ঠিক হইল, সম্দ্রযাত্রায় একজন ডাক্তার বন্ধ্ তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন। এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কলিকাতায় গেলেন এবং সেখানে তাঁহার অবস্থা আরও খারাপ হইল, তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কলিকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে তিনি কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করিলেন, পরিবারস্থ সকলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। কেবল কমলা কংগ্রেসের কাজের জন্য এলাহাবাদে রহিয়া গেলেন।

খাজনাবন্ধ আন্দোলনের সহিত আমার সংশ্রবের জন্যই আমাকে প্নরায় তাড়াতাড়ি গ্রেফ্তার করা হইল। কিন্তু কার্যতঃ কিষাণ সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই কৃষক প্রতিনিধিরা এলাহাবাদে থাকিতে থাকিতেই আমাকে গ্রেফ্তার করার ফলে আন্দোলন যের্প সাফল্য লাভ করিল, আর কিছ্তেই তেমন হইতে পারিত না। ইহার ফলে তাহাদের উৎসাহ ব্দ্ধি হইল এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্তের কথা তাহারা জিলার প্রত্যেক গ্রামে প্রচার করিতে লাগিল। দ্ই দিনের মধ্যেই জিলার সকলে জানিল, খাজনাবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, এবং সর্বত্রই আনন্দের সহিত ইহা সমর্থিত হইল।

এইকালে আমরা কি করিতেছি, জনসাধারণের নিকট আমরা কি চাহি, এই সম্পর্কিত সংবাদ আদান-প্রদানের বিশেষ বাধা আমরা অন্ভব করিতে লাগিলাম। গভর্নমেণ্ট কর্তৃক দণ্ডিত এবং কাগজ বন্ধ হইবার ভয়ে কোন সংবাদপত্রই আমাদের সংবাদ প্রকাশ করিত না। ছাপাখানাগ্লি আমাদের বিজ্ঞাপন নোটিশাদি ছাপিত না। চিঠি ও টেলিগ্রাম সেন্সর করা হইত এবং প্রায়ই বন্ধ করা হইত। লোক মারফৎ সংবাদ আদানপ্রদানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পন্থা ছিল; কিন্তু তাহাতেও

আমাদের সংবাদবাহীরা প্রায়ই গ্রেফ্‌তার হইত। এই উপায় অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ইহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ বহু ব্যবস্থার প্রয়োজন। তবুও এই ব্যবস্থা অনেকাংশে সফল হইল। প্রাদেশিক কেন্দ্র ও জিলা কেন্দ্রের সহিত প্রধান কেন্দ্রের সর্বদা যোগরক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল। সহরে সংবাদ প্রচার করা বিশেষ কঠিন নয়। সাইক্লোস্টাইল যন্ত্রে মুদ্রিত বহু সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা বে-আইনীভাবে প্রচারিত হইত এবং লোকে তাহা আগ্রহসহকারে পাঠ করিত। নগরে ঢোলসহরৎ দ্বারা আমাদের ঘোষণাপত্রগুলি প্রচারিত হইত এবং প্রায়ই ঢুলিকে গ্রেপ্তার করা হইত। ইহা কেহ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিত না; কেন না, লোকে গ্রেপ্তার হইতেই চাহে, পলাইতে চাহে না। কিন্তু নাগরিক উপায়গুলি পল্লী অঞ্চলে প্রয়োগ করা চলে না। দূত প্রেরণ করিয়া অথবা বে-আইনী নোটিশ বিলি করিয়া প্রধান প্রধান পল্লীকেন্দ্রের সহিত কতকটা যোগ রাখা সম্ভব হইলেও ব্যবস্থা খুব সন্তোষজনক ছিল না। দূর গ্রামে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িতে দেরী হইত।

কিন্তু এলাহাবাদে কিষাণ কনফারেন্সের পর এই অসুবিধা অনেকটা দূর হইল। জিলার প্রায় প্রত্যেক প্রধান গ্রাম হইতেই কৃষক প্রতিনিধি আসিয়াছিল, তাহারা কৃষকদের সম্পর্কিত নূতন প্রস্তাব এবং তাহার জন্য আমার গ্রেফ্‌তারের সংবাদ লইয়া জিলার সর্বত্র ছড়াইয়া দিল। অর্থাৎ খাজনাবন্ধ আন্দোলনের ষোল শত উৎসাহী প্রচারকারী এক দিনেই সমস্ত প্রান্তে সংবাদ প্রচার করিল। আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্য দেখা গেল। সর্বত্রই বুঝা গেল যে, বল প্রয়োগ না করিলে কেহই স্বেচ্ছায় খাজনা দিবে না। অবশ্য কি জমিদার কি শাসকবর্গ বল প্রয়োগ করিয়া ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলে তাহারা সহ্য করিতে পারিবে কি না, তাহা কাহারও পক্ষে বলা কঠিন।

আমরা জমিদার ও প্রজা উভয়কেই খাজনা বন্ধ করিতে বলিয়াছিলাম। মতবাদের দিক দিয়া ইহা শ্রেণী-আন্দোলন নহে, কিন্তু কার্যতঃ জমিদারেরা স্ব স্ব রাজস্ব দিলেন, এমন কি, জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন জমিদারেরাও তাহাই করিলেন। চাপও তাহাদের উপর বেশী এবং ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। যাহা হউক, প্রজারা অটল রহিল এবং খাজনা দিল না। আমাদের সংঘর্ষ কার্য-ক্ষেত্রে খাজনা বন্ধের আন্দোলনে পর্যবসিত হইল। এলাহাবাদ জিলা হইতে ইহা যুক্ত প্রদেশের আরও কয়েকটি জিলায় ছড়াইয়া পড়িল। অন্যান্য জিলায় ইহা বিধিবদ্ধভাবে গৃহীত ও ঘোষিত না হইলেও প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শস্যমূল্য কমিয়া যাওয়ায় অক্ষমতাবশতঃই তাহারা খাজনা দিতে পারিল না। কিন্তু কয়েক মাস ধরিয়া কি জমিদার কি গভর্ণমেণ্ট কেহই অবাধ্য প্রজাদিগকে ভয় দেখাইবার কোনই চেষ্টা করিলেন না। তাঁহারা অত্যন্ত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছিলেন। একদিকে নিরূপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি লইয়া রাজনৈতিক সংঘর্ষ, অন্যদিকে অর্থনৈতিক মন্দার জন্য পল্লী অঞ্চলে কৃষকদের ক্লেশ। এই দুইয়ের মিলিত মূর্তি দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট কৃষক বিদ্রোহের আশঙ্কায় ভীত হইলেন। লণ্ডনে তখন গোলটেবিল বৈঠক চলিতেছিল, ভারতে অধিকতর অশান্তির সৃষ্টি করা অথবা গভর্ণমেণ্টের 'প্রতাপ' দেখাইবার বিশেষ আগ্রহ তাহাদের ছিল না।

যুক্ত প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলনের এক প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেল যে, ইহা আন্দোলনের কেন্দ্রকে সহর হইতে পল্লীতে লইয়া গেল এবং অধিকতর ব্যাপক ও দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। যদিও আমাদের নগরবাসীরা বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং আমাদের মধ্যশ্রেণীর কর্মীরা নির্জীব হইয়া

পড়িতেছিলেন, তথাপি যুক্ত প্রদেশের আন্দোলন শক্তিশালী, এমন কি, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিল। অন্যান্য প্রদেশের আন্দোলনে সহর হইতে পল্লীতে, রাজনীতি হইতে অর্থনীতিতে পরিবর্তিত গতি এতটা দেখা যায় নাই। তাহার ফলে নগর হইতেই আন্দোলন পরিচালিত হইতে লাগিল এবং মধ্যশ্রেণীর কর্মীদের ক্লান্তির জন্য আন্দোলন অনেকাংশে শিথিল হইয়া পড়িল। এমন কি, যে বোম্বাই সহর আন্দোলনের প্রথম হইতে প্রধান কেন্দ্ররূপে কার্য করিতেছিল, তাহার উৎসাহ দীপ্তিও কমিয়া আসিল। কর্তৃপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা, গ্রেফ্‌তার প্রভৃতি নানাস্থানে চলিতেছিল বটে, কিন্তু ইহা কৃত্রিম মনে হইতে লাগিল। সে জীবন্ত ভাব আর রহিল না। ইহা স্বাভাবিক, কেন না, জনসাধারণকে কোন নির্দিষ্ট বৈপ্লবিক উচ্চ-গ্রামে দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখা কঠিন। সাধারণতঃ ইহা কয়েকদিনের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি কয়েকমাস ধরিয়া সমান উৎসাহে কার্য করিয়া আশ্চর্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছে। এমন কি, অপেক্ষাকৃত নিম্নগ্রামে ইহা অনির্দিষ্ট কালের জন্য চালান যাইতে পারে।

গভর্ণমেন্টের দমননীতি প্রবল হইল। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি, যুবক সমিতি প্রভৃতি যাহা এতদিন আশ্চর্যভাবে চলিতেছিল, তাহা বে-আইনী ঘোষণা করিয়া দমন করা হইল। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি জেলখানার ব্যবহার আরও খারাপ হইল। কারামুক্তির অল্পদিন পরেই লোকে পুনরায় কারাদণ্ড লইয়া জেলে ফিরিয়া আসে, এই ব্যাপার দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট বিষম বিরক্ত হইলেন। শাস্তি সত্ত্বেও লোকের তেজ কমে না; ইহাতে শাসকগণের আত্মাভিমান আহত হইতে লাগিল। ১৯৩০-এর নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে জেল-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধের ছলনায় যুক্ত প্রদেশের জেলসমূহে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে বেত্রদণ্ড দেওয়া হইল। নৈনী জেলে এই সকল সংবাদ পাইয়া আমরা অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। আমি নিজে বেত্রদণ্ডকে অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া মনে করি, আমার মতে অতি দুর্বৃত্ত অপরাধীকেও এই দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু ক্রমে ইহাতে এবং ভারতে ইহাপেক্ষাও শোচনীয় অনেক ব্যাপারে আমরা অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম। তথাপি যুবক ও অল্পবয়স্ক বালকদিগকে সামান্য শৃঙ্খলাভঙ্গের অজুহাতে বেত্রদণ্ড দেওয়া বর্বরতা মাত্র। আমাদের ব্যারাকের আমরা চারজন এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিলাম। কিন্তু দুই সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিয়াও কোন উত্তর পাইলাম না। বেত্রদণ্ডের প্রতিবাদ এবং যাহারা এই বর্বর দণ্ড লাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য একটা কিছু করা উচিত বলিয়া মনে হইল। আমরা তিনদিন—বাহাত্তর ঘণ্টা পূর্ণ উপবাস করা স্থির করিলাম। দিনের সংখ্যার দিক দিয়া এই উপবাস কিছুই নহে, কিন্তু আমরা কেহ উপবাসে অভ্যস্ত ছিলাম না, কাজেই আমরা কতদূর পর্যন্ত সহ্য করিতে পারিব বুঝিতে পারিলাম না। আমি ইতিপূর্বে কখনও চব্বিশ ঘণ্টার বেশী উপবাস করি নাই।

উপবাসের দিন কয়টা ভালয় ভালয় কাটিল, যতটা ভয় পাইয়াছিলাম, ব্যাপারটা তত গুরুতর নহে। আমি নির্বোধের মত ঐ তিন দিনও দৌড় ঝাঁপ প্রভৃতি ব্যায়াম করিয়াছিলাম। আমি পূর্বে একটু অসুস্থ ছিলাম, কাজেই ইহার ফল ভাল হইল না। তিন দিনে আমাদের প্রত্যেকের ওজন সাত-আট পাউণ্ড করিয়া কমিয়া গেল। ইহার পূর্বে কয়েক মাসে নৈনী জেলে আমাদের প্রত্যেকের ওজন পনর হইতে ছাব্বিশ পাউণ্ড পর্যন্ত কমিয়াছিল।

আমাদের উপবাস ছাড়াও বাহিরে বেত্রদণ্ডের বিরুদ্ধে কিছু আন্দোলন

হইয়াছিল এবং আমার বিশ্বাস, যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে বেত্রদণ্ড না দেওয়ার জন্য কারাবিভাগের উপর আদেশ জারী করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আদেশ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। এক বৎসরের কিছু পরেই যুক্ত প্রদেশ ও অন্যান্য প্রদেশের জেলখানায় বেত্রদণ্ডের অপ্রতুলতা ছিল না।

এই শ্রেণীর সাময়িক চাঞ্চল্যের কথা ছাড়িয়া দিলে জেলে আমরা অনেকটা শান্তিতেই বাস করিয়াছি। আবহাওয়া চমৎকার ছিল। এলাহাবাদে শীতকাল অতি মনোরম। আমাদের ব্যারাকে রণজিৎ পণ্ডিতের আগমনে আমাদের ভালই হইল। তিনি বাগান-রচনায় অভিজ্ঞ; অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের ব্যারাকের নীরস প্রাঙ্গণ বিবিধ ফুলে ও রঙ্গে ভরিয়া উঠিল। এমন কি, তিনি সেই অপরিসর স্থানের মধ্যে একটি গল্‌ফ্‌ খেলিবার স্থান তৈয়ারী করিলেন।

নৈনী জেলে আর একটি দৃশ্য আমাদের চিত্ত হরণ করিত; তাহা হইল এরোপ্লেন। পূর্ব ও পশ্চিমগামী আকাশপথের এলাহাবাদ অন্যতম ঘাঁটি। অস্ট্রেলিয়া, যাভা, ফরাসী ইন্দো-চীন প্রভৃতি দেশগামী বড় বড় বিমানপোত নৈনীতে একেবারে আমাদের ঠিক মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইত। সর্বাপেক্ষা বাটাভিয়া যাতায়াতকারী ডাচ্‌ বিমানপোতগুলি দেখিতে মনোহর ছিল। যেদিন আমাদের ভাগ্য ভাল, সেদিন শীতের অন্ধকার প্রত্যূষে আমরা তারকাখচিত আকাশে বিমানপোতের সাক্ষাৎ পাইতাম। উজ্জ্বল আলোকিত পোতের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে রক্তবর্ণ আলো জ্বলিত। প্রত্যাসন্ন প্রভাতের কৃষ্ণবর্ণ আকাশের পটভূমিকায় ভাসমান বিমানপোত কত সুন্দর দৃশ্য!

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও অন্য জেল হইতে বদলী হইয়া নৈনীতে আসিলেন। তাঁহাকে আমাদের ব্যারাক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইল, কিন্তু প্রত্যহই তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। বাহিরে তাঁহাকে যত না দেখিয়াছি, এখানে তাঁহাকে বিশেষভাবে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সঙ্গ অত্যন্ত আনন্দের; তাঁহার জীবনের দীপ্তি ও সর্ববিষয়ে যৌবনোচিত উৎসাহ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এমন কি, তিনি রণজিতের সাহায্যে জার্মান ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার স্মৃতিশক্তি দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। তাঁহার নৈনী থাকা কালেই বেত্রদণ্ডের সংবাদ আসিয়াছিল, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া প্রাদেশিক অস্থায়ী গভর্ণরের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। কিছু পরেই তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। জেলের আবহাওয়ার ঠান্ডা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার পীড়া কঠিন হইয়া উঠায় তাঁহাকে সহরের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল; এবং কারাদণ্ড শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি হাসপাতালেই আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

নববর্ষের প্রথমদিন ১৯৩১-এর ১লা জানুয়ারী সংবাদ পাইলাম, কমলা গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন। তিনি তাঁহার কারারুদ্ধ সহকর্মীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য অনেকদিন হইতেই অপেক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া এই সংবাদে আমি হৃষ্ট হইলাম। আমার স্ত্রী, ভগ্নী ও অন্যান্য নারীরা যদি পুরুষ হইতেন, তাহা হইলে বহু পূর্বেই তাঁহারা গ্রেফ্‌তার হইতেন। তৎকালে গভর্ণমেণ্ট স্ত্রীলোকদিগকে গ্রেফ্‌তার করা যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতেন বলিয়াই ইঁহারা এতদিন ধরা পড়েন নাই। এখন তাঁহার আশা পূর্ণ হইল! আমি ভাবিলাম, তিনি নিশ্চয়ই আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক অবস্থা স্মরণ করিয়া আশঙ্কা হইল, জেলখানায় তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট হইবে।

তাঁহার গ্রেফ্‌তারের পর একজন সাংবাদিক আসিয়া তাঁহার নিকট একটি

'বাণী' চাহিলেন। তিনি মুহূর্তের উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া যে কথা বলিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে অনুরঞ্জিত। 'আজ আমি আনন্দে বিহ্বল এবং আমার স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি বলিয়া গর্বিতা। আমি আশা করি, সকলে জাতীয় পতাকা উচ্চে তুলিয়া রাখিবে।' তিনি যদি একটু চিন্তা করিবার সময় পাইতেন, তাহা হইলে এমন কথা বলিতেন না, কেন না, তিনি পুরুষের অত্যাচার হইতে নারীকে রক্ষা করার একজন নেত্রী ছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে পতিব্রতা হিন্দুনারী তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল; এমন কি, পুরুষের অত্যাচারের কথাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আমার অসুস্থ পিতা কমলার গ্রেফ্‌তার ও কারাদণ্ডের সংবাদে অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া এলাহাবাদে ফিরিবার সংকল্প করিলেন। তিনি তখনই আমার ভগ্নী কৃষ্ণাকে এলাহাবাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং কয়েক দিন পরে পরিবারবর্গ সহ স্বয়ং এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। ১২ই জানুয়ারী তিনি আমাকে নৈনীতে দেখিতে আসিলেন। দুই মাস পরে আমি তাঁহাকে দেখিলাম। আমার ব্যথিত চিত্তের বেদনা অতি কষ্টে সংবরণ করিলাম। তাঁহার চেহারা দেখিয়া আমার মনে যে বিষাদের উদয় হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন, কলিকাতায় তিনি অনেকটা ভাল হইয়াছেন। তাঁহার মুখ ফুলিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার ধারণা, ইহা সাময়িক কারণে ঘটিয়াছে।

তাঁহার সেই মুখখানি বারম্বার মনে পড়িতে লাগিল; উহা তাঁহার স্বাভাবিক মুখ হইতে কত স্বতন্ত্র। জীবনে এই প্রথম আমার মনে তাঁহার জন্য আশঙ্কা জাগিল—বিপদ সম্মুখে ঘনাইয়া আসিতেছে। আমি চিরদিন তাঁহাকে স্বাস্থ্য-শক্তির প্রতীক বলিয়া মনে করিতাম, তাঁহার মৃত্যু আমি চিন্তাই করিতে পারিতাম না। মৃত্যুর কথা লইয়া তিনি হাস্য-পরিহাস করিতেন এবং আমাদিগকে বলিতেন, আমি আরও দীর্ঘকাল বাঁচিব। শেষদিকে তিনি যৌবনের কোন বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পাইলেই বিয়োগব্যথায় নিজকে নিঃসঙ্গ বোধ করিতেন এবং উহা প্রত্যাসন্ন অমঙ্গলের ইঙ্গিত বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু অল্পকালেই এই বিষাদ কাটিয়া যাইত, তাঁহার জীবনের প্রাচুর্য উছলিয়া উঠিত। তাঁহার তেজস্বী ব্যক্তিত্ব ও সকলের প্রতি অজস্র স্নেহধারায় আমরা এমন ডুবিয়াছিলাম যে, তাঁহাকে বাদ দিয়া জগৎ ভাবিতেই পারিতাম না।

তাঁহার মুখ স্মরণ করিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইলাম, আমার মনে নানা অমঙ্গলের আভাস ভাসিয়া উঠিল। তথাপি অদূর ভবিষ্যতেই তাঁহার কোন বিপদ ঘটিতে পারে ইহা ভাবিতে পারিলাম না। কোন অজ্ঞাত কারণে ঐকালে আমার শরীরও ভাল ছিল না।

এইকালে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের শেষ দৃশ্যের অভিনয় চলিতেছিল। আমরা একটু কৌতুকের সহিত,—আমার আশঙ্কা হয়, ঘৃণামিশ্রিত কৌতুকের সহিত—সেই সকল নাটকীয় উচ্ছ্বাস ও ভঙ্গী দেখিতেছিলাম। ঐ সকল বক্তৃতা, বড় বড় কথা, সুগম্ভীর আলোচনা যেমন কৃত্রিম, তেমনই নিষ্ফল। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি বাস্তব ঘটনা ছিল। যখন আমাদের দেশে অগ্নি-পরীক্ষা চলিতেছে, অগণিত নরনারী প্রশংসার সহিত কার্য করিতেছেন, সেই সময় আমাদেরই কতিপয় স্বদেশবাসী এই সংগ্রামের কথা ভুলিয়া গিয়া বিপক্ষে যোগ দিলেন। জাতীয়তার ছলনাময় আবরণে স্ববিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থগুলি কিভাবে কার্য করিতেছে, কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট লোকেরা কিভাবে ভবিষ্যতের জন্য উহা রক্ষা করিবার আশায় জাতীয়তাবাদের নাম উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা আমরা স্পষ্টভাবে

প্রত্যক্ষ করিলাম। ইঁহাদের অনেকে আমাদের সংঘর্ষের বিরোধিতা করিয়াছিলেন; অনেকে নিরপেক্ষভাবে দূরে দাঁড়াইয়া সময় সময় আমাদের শুনাইতেন, 'যাহারা দূরে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করে, তাহারাও এক প্রকারে সাহায্য করিতেছে।' কিন্তু লণ্ডন যখন হাতছানি দিল, তখন তাঁহারা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, নিজেদের স্বার্থ নিরাপদ করিতে এবং আরও কিছু ভাগ পাইবার আশায় গুটি গুটি গিয়া জমায়েৎ হইলেন। কংগ্রেস ক্রমেই বামপন্থী হইয়া উঠিতেছে এবং জনসাধারণের উপর তাহার প্রভাবও বাড়িতেছে, এই আশঙ্কা অনুভব করিয়া লণ্ডনে সকলে একসঙ্গে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন। যদি ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন আমূল পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা যাইবে, অন্ততঃপক্ষে তাহারা প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে এবং তাহারা সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থা ওলট-পালট করিবার জন্য এমন সব দাবি উপস্থিত করিবে, যাহার ফলে কায়েমী স্বার্থগুলি বিপন্ন হইয়া পড়িবে। এই আতঙ্কজনক সম্ভাবনা অনুমান করিয়া ভারতীয় কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিরা পিছাইয়া গেলেন এবং যে কোন দূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। বর্তমান সামাজিক কাঠামো রক্ষা ও কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃত্ব থাকা আবশ্যক, এই ধারণা হইতে তাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলিতে লাগিলেন। একবার একজন বিখ্যাত মডারেট নেতার সহিত আমার কথা হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম যে, গ্রেট ব্রিটেনের সহিত আপোষের একটা প্রধান সর্ত এই হওয়া উচিত যে, ব্রিটিশ সৈন্য অতি সত্বর সরাইয়া লইতে হইবে এবং ভারতীয় সৈন্যদলকে ভারতীয় গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে স্থাপন করিতে হইবে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এমন প্রস্তাবে রাজী হন, তাহা হইলে তিনি সর্বান্তঃকরণে তাহার বিরোধিতা করিবেন। যে কোন প্রকার জাতীয় স্বাধীনতার উহাই মূল কথা। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উহা অসম্ভব বলিয়া নহে, অবাঞ্ছনীয় বলিয়া তিনি চাহেন না। অবশ্য ইহা ভাবা যাইতে পারে যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি আমাদিগকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ সৈন্যের অবস্থিতি চাহেন। এইরূপ বহিরাক্রমণের আশঙ্কা থাকুক আর নাই থাকুক, যে ভারতীয়ের মধ্যে একটু তেজও অবশিষ্ট আছে তাহার নিকট বিদেশীর আশ্রয় ভিক্ষার চিন্তা কি মর্মান্তিক রূপে অপমানজনক। কিন্তু আমার মতে ব্রিটিশ বাহুবল ভারতে রাখিবার আগ্রহের অন্তরালে অভিপ্রায় অন্যরূপে। ভারতীয়দের হস্ত হইতেই ভারতীয় কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য, খাঁটি গণতন্ত্র হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং জনসাধারণের বিদ্রোহ দমনের জন্যই ভারতে ব্রিটিশের অবস্থিতি আবশ্যক।

এই কারণেই গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিরা—কেবল প্রগতি-বিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাই নহেন,—যাঁহারা নিজেদের প্রগতিবাদী ও জাতীয়তাবাদী বলেন, তাঁহারাও নিজেদের সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের স্বার্থের ঐক্য আবিষ্কার করিলেন। ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা ব্যাপক ও বহু প্রকারের। ভারতে যাহারা স্বাধীনতার সংঘর্ষে কারাগারে যাইতেছে তাহারাও জাতীয়তাবাদী,—আবার যাঁহারা আমাদের কারারক্ষকদের সহিত করমর্দন করিয়া এক সাধারণ পদ্ধতির কথা আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারাও জাতীয়তাবাদী। ইহা ছাড়াও আমাদের দেশে আর একশ্রেণীর সাহসী জাতীয়তাবাদী আছেন যাঁহারা জ্বলন্ত বক্তৃতা করেন, সকল দিক দিয়া স্বদেশী

আন্দোলনে উৎসাহ দেন, বলেন উহাই স্বরাজের মর্মকথা এবং তাঁহাদের স্বদেশবাসীকে ত্যাগ স্বীকার করিয়াও স্বদেশীর পোষকতা করিতে বলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই আন্দোলনে তাঁহাদের কোনই ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না। ইহাতে তাঁহাদের ব্যবসায় ফাঁপিয়া উঠে এবং লাভের অঙ্ক বাড়িয়া যায়। যখন বহুলোক জেলে যায়, লাঠির আঘাত সহ্য করে তখন তাঁহারা নিরাপদে কোষাগারে বসিয়া পয়সা গণিয়া তোলেন। পরে যখন উগ্র জাতীয়তাবাদ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে, তখন তাঁহাদের বক্তৃতার সুর নরম হয়, তাঁহারা 'চরমপন্থীদের' নিন্দা করেন এবং অন্যপক্ষের সহিত চুক্তি ও আপোষ করেন।

কার্যতঃ গোল টেবিল বৈঠকে কি হইল না হইল, তাহা আমরা গ্রাহ্যও করি নাই। উহা বহুদূরের অস্পষ্ট ও কৃত্রিম ব্যাপার মাত্র—আসল সংঘর্ষ আমাদের পল্লী ও নগরে। আমাদের সংঘর্ষ সহজে জয়ী হইবে, এরূপ কোন অসম্ভব প্রত্যাশাও আমাদের মনে ছিল না। সম্মুখের বিপদ সম্বন্ধেও আমাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল, কিন্তু ১৯৩০-এর ঘটনাবলীতে জাতীয় সাহস ও শৌর্যের উপর আমাদের বিশ্বাস জন্মিল এবং সেই বিশ্বাস লইয়াই আমরা ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইলাম।

ডিসেম্বর কি জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে একটি ঘটনায় আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এডিনবরায় (মনে হয় এখানে তাঁহাকে 'ফ্রিডম অফ্ দি সিটি' উপহার দেওয়া হইয়াছিল) একটি বক্তৃতায়, ভারতে যাহারা আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করিতেছে, তাহাদের প্রতি ঘৃণাসূচক উক্তি করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা এবং যে উদ্দেশ্যে সেই বক্তৃতা করা হইয়াছিল তাহাতে আমরা মর্মাহত হইলাম। কেন না, রাজনৈতিক মতভেদ সত্ত্বেও আমরা মিঃ শাস্ত্রীকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।

গোল টেবিল বৈঠকের উপসংহারে মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ভ্রাতৃপ্রীতির উচ্ছ্বাসে ভরা এক বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতার মধ্যে পরোক্ষভাবে কংগ্রেসকে অন্যায় কার্য হইতে বিরত হইয়া সুখী ও তৃপ্ত বৈঠকী দলের সহিত মিলিত হইবার একটা ইঙ্গিত ছিল। ঠিক এই সময় ১৯৩১-এর জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে এলাহাবাদে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির এক বৈঠক হয়; ইহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত ঐ বক্তৃতার অনুরোধও আলোচিত হইয়াছিল। আমি তখন নৈনী জেলে ছিলাম এবং আমার কারামুক্তির পর ঐ অধিবেশনের বিবরণী পাঠ করিয়াছিলাম। পিতা তখন সদ্য কলিকাতা হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও জিদ করিলেন, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সদস্যদিগকে ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে। কে একজন প্রস্তাব করিলেন, মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা উচিত। এই প্রস্তাবে পিতা উত্তেজিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, যে পর্যন্ত না জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ততদিন তিনি কিছুতেই আপোষ করিবেন না, যদি আর কেহ না থাকে, তাহা হইলে তিনি একাই আন্দোলন পরিচালন করিবেন। এই উত্তেজনা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত মন্দ, তাঁহার জ্বরের উত্তাপ বাড়িয়া গেল; চিকিৎসকগণ তাঁহাকে একাকী রাখিয়া সদস্যগণকে অনেক কষ্টে অন্যত্র লইয়া গেলেন।

বিশেষভাবে পিতার নির্দেশে কার্যকরী সমিতি আপোষের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এই প্রস্তাব প্রকাশের পূর্বেই স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর নিকট হইতে পিতার নিকট একখানি তার আসিল।

উহাতে তাঁহার মধ্যস্থতায় কংগ্রেসকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাঁহাদের সহিত আলোচনার পূর্বে যেন কোন সিদ্ধান্ত করা না হয়। তখন সদস্যেরা অধিকাংশই স্ব স্ব স্থানে রওনা হইয়া গিয়াছেন। উত্তরে তাঁহাদিগকে জানান হইল যে, কার্যকরী সমিতি ইতিপূর্বেই একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তবে সপ্রু ও শাস্ত্রী উপস্থিত হইলে এবং তাঁহাদের সহিত আলোচনার পূর্বে উহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে না।

জেলের মধ্যে আমরা এই ব্যাপারের কিছুই জানিতাম না। তবে একটা কিছু হইতেছে জানিয়া বরং একটু চিন্তিত হইয়াছিলাম। আমরা তখন আগতপ্রায় ২৬শে জানুয়ারী—স্বাধীনতা দিবসের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানের কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। পরে আমরা জানিতে পারিলাম যে, দেশের সর্বত্র সভাসমিতি হইয়াছে এবং পূর্বের স্বাধীনতা-সঙ্কল্প সহ একটি 'স্মারক প্রস্তাব'* গৃহীত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান এক স্মরণীয় ঘটনা, কেন না, সংবাদপত্র ও ছাপাখানার সহায়তা পাওয়া যায় নাই, ডাক ও তার বিভাগের মারফতেও কাজ করা সম্ভব হয় নাই। তথাপি একই প্রস্তাব বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় একই সময় দেশের সমস্ত পল্লী-নগরে প্রকাশ্য জনসভায় গৃহীত হইয়াছিল। অবশ্য অধিকাংশ সভাই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া হইয়াছিল এবং পুলিশও বলপূর্বক ঐগুলি ভাঙিয়া দিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।

২৬শে জানুয়ারী নৈনী জেলে বসিয়া আমরা বিগত বৎসর এবং আগামী বৎসরের কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় দ্বিপ্রহরের পূর্বেই অকস্মাৎ আমাকে সংবাদ দেওয়া হইল যে, আমার পিতার অবস্থা সঙ্গীন এবং আমাকে এখনই বাড়ী যাইতে হইবে। অনুসন্ধানে জানিলাম যে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। রণজিৎও আমার সঙ্গী হইল।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা সমগ্র ভারতে বিভিন্ন জেলখানা হইতে অনেককে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইঁহারা সকলেই কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির মূল সদস্য অথবা স্থলাভিষিক্ত সদস্য। গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে অবস্থা বিবেচনা করিবার জন্য সুযোগ দিলেন। অতএব যে ভাবেই হউক আমি সেদিন অপরাহ্নে মুক্তি লাভ করিতামই। পিতার অবস্থার জন্য কয়েক ঘণ্টা পূর্বে মুক্তি পাইলাম মাত্র। কমলাও মাত্র ছাব্বিশ দিন কারাগারে থাকার পর লক্ষ্মৌ জেল হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। তিনিও কার্যকরী সমিতির স্থলাভিষিক্ত সদস্যা ছিলেন।

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩৩

পিতৃ-বিয়োগ

দুই সপ্তাহ পর পিতাকে দেখিলাম। ১২ই জানুয়ারী নৈনী জেলে তিনি যখন আমাকে দেখিতে গিয়াছিলেন তখন তাঁর মুখ দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে তাঁহার অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে, মুখ আরও ফুলিয়াছে। কথা বলিতে তাঁহার কষ্ট হয় এবং মনও মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি কোনমতে দেহ মনের কাজ চালাইয়া লইতেছিল।

তিনি আমাকে ও রণজিৎকে দেখিয়া সুখী হইলেন। দুই-এক দিন পর রণজিৎকে (সে কার্যকরী সমিতির সদস্যতালিকাভুক্ত নহে বলিয়া) নৈনী জেলে ফিরাইয়া লওয়া হইল।

ইহাতে পিতা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইলেন। তিনি বারে বারে অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে, ভারতের নানা দেশ হইতে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে অথচ তাঁহার নিজের জামাতাকে কেন দূরে রাখা হইবে। ডাক্তারেরা ইহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং বুঝিলেন যে ইহাতে পিতার স্বাস্থ্য অধিকতর মন্দ হইবে। তিন-চারদিন পর যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট রণজিৎকে মুক্তি দিলেন। আমার ধারণা ডাক্তারদের অনুরোধেই ইহা সম্ভব হইল।

২৬শে জানুয়ারী—যেদিন আমি মুক্তি পাইলাম সেই দিনই গান্ধিজীও এরোডা জেল হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। তাঁহাকে এলাহাবাদে পাইবার জন্য আমি ব্যাকুল হইলাম এবং পিতার নিকট এই সংবাদ দেওয়ায় তিনিও গান্ধিজীর দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। মুক্তির পর দিবস বোম্বাই সহরে এক বিশাল জনসভায় গান্ধিজী অভ্যর্থিত হইলেন! অত বড় সভা বোম্বাইতে কখনও ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই। ঐদিনই বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়া তিনি গভীর রাত্রে এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন। পিতা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় জাগিয়া রহিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার কয়েকটি কথা শুনিয়া পিতা শান্তি বোধ করিলেন। আমার মাতাও গান্ধিজীর আগমনে আশা-ভরসা পাইলেন।

কার্যকরী সমিতির সকল প্রকার সদস্যগণের মুক্তির পর সভার অধিবেশনের নির্দেশের জন্য তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছিলেন। অনেকে পিতার জন্য ব্যস্ত হইয়া অবিলম্বে এলাহাবাদে আসিতে চাহিতেছিলেন। এই সকল কারণে এলাহাবাদেই সভার অধিবেশন স্থির হইল। দুই দিনের মধ্যেই প্রায় চল্লিশ জন আসিয়া পৌঁছিলেন, আমাদের বাড়ীর পার্শ্ববর্তী স্বরাজভবনে সভা আরম্ভ হইল। আমি মাঝে মাঝে এই সভায় যোগ দিয়াছি বটে কিন্তু মানসিক দুশ্চিন্তা ও উদ্‌ভ্রান্তভাবের জন্য আলোচনায় যোগ দিতে পারি নাই। কি কি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল তাহাও এখন আমার ভাল করিয়া মনে নাই। বোধ হয় তাঁহারা আইন অমান্য আন্দোলন চালাইয়া যাইবার অনুকূলেই মত দিয়াছিলেন।

যে সকল পুরাতন বন্ধু এবং সহকর্মী আসিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই সদ্য কারামুক্ত এবং পুনরায় হয়ত শীঘ্রই কারাগারে ফিরিয়া যাইবেন। তাঁহারা পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন, অর্থাৎ শেষবার দেখা অথবা চিরবিদায় লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। তাঁহারা সকালে ও সন্ধ্যায় দুই-তিন জন করিয়া এক এক দলে আসিতেন এবং পিতা একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া তাঁহাদের

অভ্যর্থনা করিবার জন্য জিদ করিতেন। তাহাই হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ ভাবলেশহীন, কেন না, মুখ ফুলিয়া উঠায় তাহাতে কোন ভাবের চিহ্ন ফুটিত না। একজনের পর একজন পুরাতন বন্ধু ও সহকর্মী আসিতে লাগিলেন, চিনিবা মাত্র তাঁহার চক্ষু দীপ্ত হইল। তিনি যুক্তকরে মস্তক ঈষৎ নত করিয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন। যদিও বেশী কথা বলার সাধ্য তাঁহার ছিল না, তবুও কাহারও সহিত দুই-চারিটি কথা বলিলেন। তাহাতেও তাঁহার অভ্যস্ত-রসিকতার অভাব ছিল না। তিনি মরণাহত বৃদ্ধ সিংহের মত বসিয়া আছেন, তাঁহার দৈহিক শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি সেই সিংহ-গ্রীব পুরুষ আপন গরিমায় অটল। আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম, বিস্মিত হইয়া ভাবিতাম এখন তাঁহার মস্তিষ্কে কি চিন্তা খেলিতেছে; তিনি কি আমাদের আন্দোলনের বিষয় আর ভাবেন না? তিনি যেন নিজের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, ঘটনাসূত্রগুলি তিনি সাজাইয়া গুছাইয়া ধরিতে যান কিন্তু তাঁহার শিথিল মুষ্টি হইতে তাহা খসিয়া পড়ে। জীবনের শেষ পর্যন্ত হতাশ না হইয়া তিনি দেহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, কখনও বা আমাদের সহিত পরিষ্কারভাবে কথা বলিয়াছেন। এমন কি, যখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া কথা বলিবার শক্তি বিলুপ্ত হইল তখনও তিনি কাগজে লিখিয়া আমাদিগকে মনোভাব জানাইতেন।

আমাদের ঘরের পাশেই কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে তিনি কোনও কৌতূহল প্রদর্শন করিলেন না। পনর দিন পূর্বে ইহা ঘটিলে তিনি কতই না উত্তেজিত হইতেন। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে, এই সকল ঘটনা হইতে তিনি অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। একদিন তিনি গান্ধিজীকে বলিলেন, 'মহাত্মাজী, আমি শীঘ্রই চলিয়া যাইতেছি, আমি স্বরাজ চক্ষে দেখিব না, কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনি স্বরাজ লাভ করিবেন এবং শীঘ্রই উহা পাইবেন।'

অন্যান্য নগর ও প্রদেশ হইতে সমাগত ব্যক্তিরা চলিয়া গেলেন। গান্ধিজী ও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং নিকট আত্মীয়েরা রহিলেন, আর রহিলেন তিন জন বিখ্যাত চিকিৎসক। ইঁহারা পিতার পুরাতন বন্ধু। ইঁহাদের সম্বন্ধে পিতা বলিতেন যে তাঁহাদের হস্তেই তিনি স্বীয় দেহ সমর্পণ করিয়াছেন—ডাঃ আন্সারী, বিধানচন্দ্র রায় এবং জীবরাজ মেহ্‌তা। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রভাতে তাঁহার অবস্থা একটু ভাল বোধ হইল। এই সুযোগে আমরা তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিলাম। কেন না, এলাহাবাদে এক্স-রে চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা ছিল না। সেই দিনই মোটর গাড়ী করিয়া আমরা তাঁহাকে লইয়া যাত্রা করিলাম। গান্ধিজী ও এক বৃহৎ দল আমাদের পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। আমরা খুব ধীরে চলিতেছিলাম তথাপি তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পরদিন তাঁহার ক্লান্তি না থাকিলেও কতকগুলি মন্দ উপসর্গ দেখা দিল। তার পরদিন ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রভাতে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছি, সমস্ত রাত্রি তিনি যন্ত্রণা ও অশান্তিতে কাটাইয়াছেন, সহসা আমি লক্ষ্য করিলাম তাঁহার মুখ প্রশান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, জীবনযুদ্ধের শেষ রশ্মি যেন মিলাইয়া গেল। আমি ভাবিলাম তিনি নিদ্রিত হইলেন। আমি একটু আশ্বস্তই হইলাম কিন্তু আমার মাতার পর্যবেক্ষণ-শক্তি তীক্ষ্ণ। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আমি মৃদুভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, পিতা ঘুমাইতেছেন, তাঁহাকে বিরক্ত করিও না। কিন্তু সেই ঘুমই তাঁহার শেষ ঘুম, যাহা আর কখনও ভাঙ্গে নাই।

আমরা সেইদিনই তাঁহার দেহ লইয়া মোটর গাড়ীতে এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে আমি ও পিতার প্রিয় ভৃত্য রহিলাম, রণজিৎ গাড়ী চালাইতে লাগিল।

আমাদের গাড়ীর পিছনের গাড়ীতে মাকে লইয়া গান্ধিজী আসিতে লাগিলেন, তৎপশ্চাতে অন্যান্য গাড়ী। সমস্ত দিন আমি আবিষ্টবৎ রহিলাম, কি যে ঘটিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—পরবর্তী কাজকর্ম এবং বৃহৎ জনতার মধ্যে কিছু ভাবা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। দুঃসংবাদ শুনিয়া সমবেত বিরাট জনতা ভেদ করিয়া দ্রুত লক্ষ্ণৌ হইতে এলাহাবাদ যাত্রা—জাতীয় পতাকায় আবৃত দেহের পার্শ্বে আমি বসিয়া, গাড়ীর উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন; এলাহাবাদে আগমন, তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দূর দূরান্তর হইতে সমাগত বৃহৎ জনসমষ্টি!

বাড়ীতে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডের পর শবযাত্রা গঙ্গাতীর অভিমুখে চলিল, পশ্চাতে চলিল বিশাল জনতা। শীতের সন্ধ্যায় নদীতীরে অন্ধকার নামিয়া আসিল, চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। যে দেহ আমাদের সর্বস্ব ছিল, যাহা ভারতের কোটি কোটি নরনারীর প্রিয় ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। গান্ধিজী আবেগময়ী ভাষায় জনতাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিলেন, তারপর আমরা সকলে নীরবে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সেই শ্রীহীন শূন্যতার ঊর্ধ্বে আকাশে তারকারাজি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমার মাতা ও আমার নিকট সহস্র সহস্র সমবেদনাজ্ঞাপক তার ও পত্র আসিতে লাগিল। লর্ড এবং লেডী আরুইন মাতার নিকট সৌজন্যপূর্ণ সহবেদনাজ্ঞাপক পত্র লিখিলেন। দেশের চারিদিক হইতে অজস্র সহানুভূতি ও কল্যাণকামনায় আমাদের দুঃখ অনেকাংশে প্রশমিত হইল। কিন্তু সর্বোপরি গান্ধিজীর উপস্থিতির ফলেই আমার মাতা এই শোকাবেগ সহ্য করিতে পারিলেন এবং আমরা জীবনের এই সঙ্কটের মুহূর্তে বললাভ করিলাম।

তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন এ কথা আমি ভাবিতেই পারি না। তিন মাস পর সিংহলের নিউয়ারা ইলিয়া নামক স্থানে আমি স্ত্রী ও কন্যাসহ কিছুদিন ছিলাম। স্থানটি আমার ভাল লাগিল, সহসা মনে পড়িল এখানকার জলহাওয়া পিতার পক্ষেও ভাল হইবে। তাঁহাকে এখানে আনিলে কেমন হয়? আমি তাঁহাকে এলাহাবাদে তার করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম।

সিংহল হইতে এলাহাবাদে ফিরিয়া আমি একদিন একখানি আশ্চর্য পত্র পাইলাম। খামের উপর পিতার হস্তাক্ষরে নাম ঠিকানা লেখা এবং পত্রখানির সর্বাঙ্গে বিভিন্ন পোস্টাফিসের ছাপ। আমি আশ্চর্য হইয়া পত্রখানি খুলিয়া দেখি, ১৯২৬-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পিতাই আমাকে ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৯৩১-এর গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ বৎসর পরে সেই পত্র আমার হাতে আসিল! ১৯২৬-এ আমার ও কমলার ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে পিতা ঐ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, উহাতে বোম্বাই-এর ইটালীয়ান লয়েড স্টিমারের ঠিকানা ছিল। উহা সময়মত আমাদের হাতে না আসায় বহুস্থান ঘুরিয়াছে; বহু পোস্টাফিসের খোপের মধ্যে অনেকদিন বিশ্রাম করিয়াছে, তারপর হয়ত কোন উৎসাহী কর্মচারী উহা আমার নিকট ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। আশ্চর্য এই, উহা আশিস-লিপি।

৩৪

দিল্লী-চুক্তি

আমার পিতার যে দিন মৃত্যু হয়, সেই দিন ঠিক সেই সময়ে গোল টেবিল বৈঠকের একদল ভারতীয় প্রতিনিধি বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করিলেন। স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু ও মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং আরও কয়েকজন (আমার ভাল মনে নাই) সোজা এলাহাবাদ চলিয়া আসিলেন। গান্ধিজী ও কার্যকরী সমিতির কয়েকজন সদস্য তখন এলাহাবাদে ছিলেন। আমাদের বাড়ীতে কয়েকটি ঘরোয়া বৈঠকে গোল টেবিল বৈঠকে কতদূর কি হইয়াছে, তাহা আলোচনা হইল। আরম্ভে একটি ঘটনা ঘটিল। মিঃ শাস্ত্রী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এডিনবরায় যাহা বলিয়াছিলেন, সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে তিনি সর্বদাই পারি-পার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হন এবং তাঁহার 'উচ্ছ্বসিত বাগাড়ম্বরের' বাঁধ থাকে না।

প্রতিনিধিরা গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে এমন নূতন কিছু বলিতে পারিলেন না, যাহা আমরা পূর্ব হইতে জানিতাম না। তাঁহারা আমাদিগকে যবনিকার অন্তরালে নানা ষড়যন্ত্রের কথা বলিলেন, অমুক লর্ড অথবা অমুক স্যর ব্যক্তিগত-ভাবে কি কি বলিয়াছেন, তাহাও আমরা শুনিলাম। আমাদের মডারেট বন্ধুরা সর্বদাই মূলনীতি কিম্বা ভারতের বাস্তব অবস্থা অপেক্ষা বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা ও গল্পগুজবকে বেশী গুরুত্ব দিয়া থাকেন। মডারেট নেতাদের সহিত ঘরোয়া আলোচনায় কোন কিছু মীমাংসা হইল না এবং গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি যে মূল্যহীন, আমাদের সেই পূর্ব ধারণাই অধিকতর বদ্ধমূল হইল। একজন প্রস্তাব করিলেন, কে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, যে, গান্ধিজী বড়লাটের নিকট পত্র লিখিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করুন এবং খোলাখুলি ভাবে সব বিষয় আলোচনা করুন। তিনি সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু বুঝা গেল, ফল সম্বন্ধে বেশী আশান্বিত হইলেন না। নিজের ভূমি ত্যাগ করিয়াও প্রতিপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ ও যে কোন বিষয় আলোচনা করা তাঁহার চিরাচরিত নীতি। নিজের দাবীর সত্যতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ বলিয়া অপর পক্ষকে তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি সতত্ই প্রস্তুত। সম্ভবতঃ তাঁহার লক্ষ্য কেবল মানুষের বুদ্ধি নহে, তিনি হৃদয়ের পরিবর্তনে বিশ্বাসী; ক্রোধ ও অবিশ্বাসের বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি অপরের শুভেচ্ছা ও সৎপ্রবৃত্তির নিকট আবেদন উপস্থিত করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, এই পরিবর্তন সাধনের দ্বারাই নিজের মত অপরকে বুঝান সহজ। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলেও বিরুদ্ধতার উগ্রতা কমিয়া যায় এবং সংঘর্ষের মধ্যে তীব্রতা থাকে না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এই উপায়ে তাঁহার অনেক বিরুদ্ধবাদীকে নিরস্ত্র করিয়া কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বের প্রভাবে জয়লাভ করিয়াছেন। অনেক সমালোচক ও নিন্দুক তাঁহার বিশাল ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে থাকিয়া তাঁহার গুণানুরাগী হইয়াছেন এবং তাহার পরও সমালোচনা করিলে সে সমালোচনায় আর বিষ থাকিত না।

নিজের এই শক্তি সম্পর্কে সচেতন গান্ধিজী সর্বদাই ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পাইলে আনন্দিত হন। কিন্তু ছোটখাট ব্যাপার লইয়া ব্যক্তি-বিশেষের সহিত বুঝাপড়া করা এক কথা, আর নৈর্ব্যক্তিক, বিরাট সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ান আর এক কথা। ইহা অদ্ভুত কৌশলী

গান্ধিজী লর্ড আরুইনের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে বেশী আশান্বিত হন নাই। আইন অমান্য আন্দোলন তখনও চলিতেছিল; তবে গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষ প্রস্তাব আলোচনা হইতেছিল বলিয়া তাহার গতিবেগ মন্দীভূত হইয়াছিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল, গান্ধিজী দিল্লী চলিয়া গেলেন; আমাদিগকে বলিয়া গেলেন যে, যদি বড়লাটের সহিত আলোচনায় কোন সাময়িক আপোষের অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি কার্যকরী সমিতির সদস্যদিগকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। কয়েকদিন পরেই আমরা দিল্লী হইতে আহ্বান পাইলাম। সুদীর্ঘ ও ক্লান্তিজনক আলোচনায় আমরা দিল্লীতে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করিলাম। গান্ধিজী প্রায়ই লর্ড আরুইনের সহিত দেখা করিতে লাগিলেন, মাঝে মাঝে তিন-চার দিন আলোচনা বন্ধ থাকিত। সম্ভবতঃ ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ সময় লণ্ডনে ভারত সচিবের দপ্তরের সহিত কথাবার্তা চালাইতেন। কখনও বা অতি সামান্য বিষয় কি একটি শব্দ লইয়া মতভেদের ফলে কথাবার্তা অগ্রসর হইত না। আইন অমান্য আন্দোলন 'স্থগিত' রাখা ঐরূপ একটি শব্দ। গান্ধিজী এই কথাটা প্রথম হইতে স্পষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন যে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি চূড়ান্তভাবে বন্ধ বা প্রত্যাহার করা যাইতে পারে না, কেন না, জনসাধারণের হস্তে ইহাই একমাত্র অস্ত্র। তবে অবশ্যই ইহা স্থগিত রাখা যাইতে পারে। লর্ড আরুইন এই শব্দটিতে আপত্তি করিলেন, গান্ধিজী রাজী হইলেন না। অবশেষে 'আপাততঃ প্রত্যাহার' শব্দটি গৃহীত হইল। বিদেশী বস্ত্রের দোকান এবং আবগারী দোকানে পিকেটিং সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হইল। অধিকাংশ সময়ই চুক্তির সর্তগুলি আলোচনায় ব্যয় হইল। কিন্তু মূল বিষয়ে বিশেষ কোন কথা হইল না। সম্ভবতঃ মনে করা হইয়াছিল যে, চুক্তি হইয়া গেলে এবং সংঘর্ষ বন্ধ হইলে অধিকতর অনুকূল আবহাওয়ায় ঐ সব বিষয় আলোচনা করা যাইবে। আমরা ইহাকে যুদ্ধ-বিরতির সন্ধি রূপেই দেখিলাম। যাহার ফলে আসল ব্যাপারগুলি পরে আলোচিত হইতে পারিবে।

এই কালে দিল্লীতে নানা শ্রেণীর ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। অনেক বিদেশী সাংবাদিকও উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের অধিকাংশ আমেরিকান। ইঁহারা আমাদের নীরবতা দেখিয়া বিরক্ত হইতেন এবং বলিতেন যে, গান্ধী-আরুইন কথাবার্তা সম্পর্কে তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা নয়াদিল্লীর দপ্তরখানা হইতে বেশী সংবাদ পাইয়া থাকেন। কথাটা সত্য। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্যস্তসমস্ত হইয়া গান্ধিজীর নিকট শ্রদ্ধানিবেদন করিতে আসিতেন, কেন না, মহাত্মাজীর যে তখন দিন ফিরিয়াছে। যাঁহারা গান্ধিজী ও কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেন, এমন কি, মাঝে মাঝে বিরুদ্ধতা করিতেন, আজ তাঁহারাই আসিয়া পূর্বের ভুল সংশোধন করিতেছেন। এ এক কৌতুককর দৃশ্য! কংগ্রেস যেন ভাল কাজই করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও কি করিবে কে জানে? যাহাই হউক, এখন কংগ্রেস ও তাহার নেতাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করাই নিরাপদ। এক বৎসর পরে ইঁহারা পুনরায় বদলাইলেন। কংগ্রেসের প্রতি এবং ইহার সকল কাজের প্রতি তাঁহাদের তীব্র ঘৃণা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে কংগ্রেসের ত্রিসীমাতেও নাই তাহাও প্রচার করিতে ভুলিলেন না।

এমন কি, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও ঘটনা দেখিয়া উত্তেজিত হইলেন। হয়ত ইহার পর তাঁহাদের আর গুরুত্ব থাকিবে না ভাবিয়া শঙ্কিত হইলেন। তাঁহাদের অনেকে মহাত্মার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। তিনি যদি স্বয়ং এ বিষয়ে উদ্যোগী হন

তাহা হইলে আপোষ মীমাংসার কোন বিষয়ই হইবে না।

ছোট-বড় সর্বশ্রেণীর মানুষ অবিশ্রান্ত স্রোতের মত ডাঃ আন্সারীর বাড়ীতে আসিতে লাগিল। এইখানে গান্ধিজী ও আমরা অধিকাংশই ছিলাম। আমরা অবসরকালে এই সকল ব্যক্তিকে কৌতুকের সহিত লক্ষ্য করিতাম এবং অনেক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিতাম। কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা সহর ও পল্লীর গরীব লোক এবং জেলের বাসিন্দাদের সংস্পর্শে আসিয়াছি। গান্ধিজীর দর্শনার্থী ধনী ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে আমরা মানব-চরিত্রের আর একটি দিক দেখিলাম। যেখানে শক্তি ও সাফল্য সেই স্থানেই এই সকল ব্যক্তি নত হইয়া সহাস্য মুখে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অতি বিশ্বস্ত স্তম্ভ। ইহা শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম যে, ভারতে যে কোনও গভর্ণমেণ্টেরই তাঁহারা অনুরূপ বিশ্বস্ত স্তম্ভ হইতে পারেন।

এই সময়ে আমি নয়া দিল্লীতে প্রাতর্ভ্রমণের সময় গান্ধিজীর সঙ্গী হইতাম। এই সময় ছাড়া তাঁহার সহিত কথা বলিবার অবসর ঘটিত না। বাকী সমস্ত দিন টুকরা টুকরা করিয়া ব্যক্তি ও বিষয়ের জন্য পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকিত। এমন কি, কোন বিদেশী দর্শনার্থী অথবা ব্যক্তিগত উপদেশপ্রার্থী বন্ধুর জন্য প্রাতর্ভ্রমণেও সুবিধা হইয়া উঠিত না। আমরা অতীত, বর্তমান এবং বিশেষভাবে ভবিষ্যতের অনেক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতাম। আমার মনে আছে, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহার ধারণা শুনিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম। স্বাধীনতা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অধুনাতন কংগ্রেসও স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হইবে আমি এইরূপ কল্পনা করিতাম। কিন্তু তাঁহার মতে কংগ্রেস চলিবে—কিন্তু একটি সর্তে। কংগ্রেস স্বেচ্ছায় এই ত্যাগ বরণ করিয়া লইবে যে, ইহার কোনও সদস্য রাষ্ট্রের অধীনে বেতন লইয়া চাকরী স্বীকার করিবে না। যদি কেহ ঐরূপ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন আমি এখন তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না, তবে ইহার অন্তরালে আসলে এই ভাব ছিল যে, কংগ্রেস যদি নিঃস্বার্থ বুদ্ধি লইয়া মুক্ত থাকে, তাহা হইলে শাসন বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের উপর নৈতিক চাপ দিতে পারিবে, যাহার ফলে ঐগুলি ন্যায়পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।

কিন্তু এই আশ্চর্য ভাবের আমি কোনও মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রশ্নটি আরও জটিল হইয়া উঠে। আমার মনে হয় যে, যদি এরূপ কোনও সম্মেলন স্থাপন করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাহাকে কোন না কোনও কায়েমী স্বার্থবাদী নিজের সুবিধার জন্য প্রয়োগ করিবে। ইহার কার্যকারিতা বাদ দিলেও ইহা হইতে গান্ধিজীর চিন্তাধারার মূল ভিত্তি কতক পরিমাণে বুঝিবার সুবিধা হয়। কতকগুলি পূর্বনির্দিষ্ট আদর্শ লইয়া রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালিয়া সাজিবার জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যেই দল গঠন করিবার যে আধুনিক ধারণা, গান্ধিজীর ধারণা তাহার বিপরীত। অথবা যাহারা এখনও অধিকসংখ্যক পাবার জন্য সর্বাধিক পাওনা দিবার (মিঃ আর, এইচ, টনি কথিত) মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া দল গঠন করেন, ইহা তাহারও বিপরীত।

গণতন্ত্র সম্পর্কে গান্ধিজীর ধারণা দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব, সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা জনসংখ্যার সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। ইহার ভিত্তি হইল ত্যাগ ও সেবা, ইহার শক্তি নৈতিক। সম্প্রতি এক

বিবৃতিতে* তিনি গণতন্ত্রীর সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি নিজেকে 'আজন্ম গণতন্ত্রী' বলিয়া দাবী করেন। 'যদি কেহ মনুষ্য জাতির দরিদ্রতমদের সহিত সম্পূর্ণ একাত্মবোধ করিতে পারে, তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবনে প্রলুব্ধ না হয়, এবং নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে তাহাদের স্তরে থাকিবার জন্য সচেতন-ভাবে চেষ্টা করে, তাহা হইলেই সে গণতন্ত্রী হইতে পারে; আমি ইহাই বলিতে চাই।' গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন,—

'কংগ্রেস যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানরূপে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার কারণ বাৎসরিক অধিবেশনে সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ নহে। পরন্তু তাহার ক্রমবর্ধিত সেবার দ্বারাই উহা লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যদি এখনও ব্যর্থ না হইয়া থাকে তবুও ইহা এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন। প্রকৃত গণতন্ত্র-বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া জগতের সম্মুখে তাহার সাফল্য প্রমাণ করিবার ভার ভারতবর্ষের উপরই অর্পিত।'

'গণতন্ত্র হইতে দুর্নীতি যে অপরিহার্যরূপে উদ্ভূত হইবে এমন কোন কথা নাই, অবশ্য বর্তমানে ঐগুলি আছে নিঃসন্দেহ। সংখ্যার গুরুত্ব গণতন্ত্রের প্রকৃত মাপকাঠি নহে। অল্পসংখ্যক লোকও যদি জনসাধারণের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্দেশ্যকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করিতে পারে তবে তাহার সহিত গণতন্ত্রের কোন অসঙ্গতি নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গণতন্ত্র কখনও বলপূর্বক প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে না। গণতন্ত্রের আদর্শ কখনও বাহির হইতে বলপূর্বক চাপাইয়া দেওয়া যায় না, ইহা ভিতর হইতেই মূর্ত হয়।' ইহা নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নহে, তিনি নিজেও তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কম্যুনিস্টদের গণতন্ত্রের ধারণার সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে, কেন না, তাহাতেও কিঞ্চিৎ দার্শনিকতার রেশ বিদ্যমান। জনসাধারণ জানুক আর নাই জানুক মুষ্টিমেয় কম্যুনিস্ট তাহাদের প্রকৃত অভাব ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারে। জনসাধারণ তাঁহাদের নিকট একটি দার্শনিক অনুভূতি মাত্র এবং এই কারণেই তাঁহারা প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন। যাহা হউক, এই সাদৃশ্য এত অল্প যে, ইহা আমাদিগকে অধিক দূরে লইয়া যায় না। দৃষ্টিভঙ্গী ও বিষয় বিচার করিবার প্রণালীর মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান। কার্যপদ্ধতি ও বাহুবল সম্পর্কে পার্থক্যও স্মরণীয়।

গান্ধিজী গণতন্ত্রী হউন আর নাই হউন, তিনি ভারতের কৃষক-সাধারণের প্রতিনিধি, এই কোটি কোটি নর-নারীর চেতন ও অচেতন আকাঙ্ক্ষার তিনিই ঘনীভূত মূর্তি। তাঁহাকে প্রতিনিধি বলিলে ঠিক বলা হয় না,—তিনি বিশাল জনসঙ্ঘের দৃষ্টিতে আদর্শের দেহধারী প্রতীক। অবশ্য তিনি সাধারণ কৃষকের মত নহেন। তিনি তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ সুরুচিসম্পন্ন ও দূরদর্শী। মানবসুলভ কোমলতা সত্ত্বেও তিনি কঠোর তপস্বী; ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ও বিষয়ভোগ স্পৃহাকে তিনি সংযত করিয়া উহা উন্নততর অধ্যাত্ম সাধনায় নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব চুম্বকের মত সকলকে আকর্ষণ করে, মানুষ স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে, আনুগত্য স্বীকার করে। এই সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ কৃষকের দৃষ্টি লইয়াই তিনি ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করেন, জীবনের কতকগুলি ব্যাপারে কৃষকদের মতই তাঁহার অন্ধ অনুরক্তি আছে। ভারতের অধিকাংশই কৃষক এবং তিনি তাঁহার ভারতবর্ষকে উত্তমরূপে জানেন, উহার নাড়ীর প্রত্যেক স্পন্দন

---

* ১৯৩৪-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর।

তাঁহার অনুভূতিতে প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে, প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাঁহার অনুমান ভ্রমহীন এবং সময় অনুকূল বুঝিবামাত্র কাজ করিবার তাঁহার দক্ষতা অনুপম।

কেবল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিতে নহে, অনেক ভারতবাসী এবং তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের দৃষ্টিতেও তিনি দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। অন্য কোন দেশে জন্মিলে হয়ত কেহ তাঁহাকে আমলেই আনিত না; কিন্তু ভারতবর্ষ, অবতারকল্প ধার্মিক পুরুষ, যিনি পাপমুক্তি অহিংসার কথা বলেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বরণ করিতে পারে। ভারতের পুরাণসমূহ ঋষি মুনি তপস্বীদের কাহিনীতে পূর্ণ, যাঁহারা তপঃপ্রভাবে বাহ্য জগতের ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, রাজ্য ও রাজা ভাঙিয়াছেন, গড়িয়াছেন। গান্ধিজীর আশ্চর্য উৎসাহ ও অন্তর্নিহিত শক্তি দেখিয়া আমার বিস্ময়মুগ্ধ চিত্তে ঐ সকল পৌরাণিক কাহিনীর কথা উদয় হইত; মনে হইত যেন এক অফুরন্ত অধ্যাত্মশক্তির ভাণ্ডার হইতে উহা উৎসারিত হইতেছে। জগতের সাধারণ ছাঁচে তিনি গঠিত নহেন; তিনি স্বতন্ত্র তিনি অনুপম, মাঝে মাঝে তাঁহার দৃষ্টিতে অজানার আভাস ফুটিয়া উঠে।

ভারতের নব-নাগরিক সভ্যতা ও কল-কারখানায় আধুনিক জীবনের উপরও কৃষক-ভারতের সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। যিনি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হইয়াও ভারতবর্ষেরই সন্তান তাঁহাকে এই নবীন ভারতও আদর্শ ও নেতারূপে গ্রহণ করিয়াছে, তিনি বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন স্মৃতি জাগ্রত করিয়াছেন, ভারতবাসীর দৃষ্টির সম্মুখে ভারতের আত্মাকে উন্মুক্ত করিয়াছেন। বর্তমানের দুঃখভারজর্জরিত ভারত যখন অতীত ও ভবিষ্যতের অস্পষ্ট স্বপ্ন লইয়া নৈরাশ্যক্ষুব্ধ বিলাপের মাঝে সান্ত্বনা খুঁজিতেছিল, তখন তিনি আসিয়া আশার বাণী শুনাইলেন, দেশের মনে শক্তি সঞ্চার করিলেন,—তাঁহার দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ রঙ্গীন হইয়া উঠিল। একদিকে অতীত অন্যদিকে ভবিষ্যৎ; বর্তমান ভারত দুইকেই একত্র করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইল।

ভারতের এই কৃষক-জীবনধারা হইতে আমরা অনেকেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি; প্রাচীন ধারায় চিন্তা, প্রথা নিয়ম ধর্ম আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আমাদিগকে বলি আধুনিক; আমরা 'উন্নতিতে' বিশ্বাসী, বৈজ্ঞানিক কল-কারখানার বিস্তার, জীবনযাত্রার উন্নততর ব্যবস্থা, সমবায় ও যৌথভাবে কার্যনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী। আমরা অনেকে কৃষক-জীবনের রক্ষণশীলতাকে প্রগতিবিরোধী বলিয়া জানি এবং অনেকেই সোস্যালিজম, কম্যুনিজম-এর অনুরাগী। আমরা কেমন করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধিজীর সহিত মিলিত হইয়াছি এবং নানা ঘটনায় তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরের মত কার্য করিয়াছি এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন এবং যে গান্ধিজীকে জানে না, সে কোন উত্তরেই সন্তুষ্ট হইবে না। ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না, ইহার আশ্চর্য শক্তি মানুষকে মুগ্ধ করে। এই শক্তি তাঁহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই আছে। যাঁহারা তাঁহার নিকট আসিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার এক এক দিক গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি মানুষকে আকর্ষণ করেন,—কিন্তু তাহা অন্ধ অনুরক্তি নহে, যুক্তি বিচার দ্বারাই অনেকে তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা গান্ধিজীর জীবন সম্পর্কে দার্শনিক ব্যাখ্যা বা তাঁহার অনেক আচরণ ও আদর্শ গ্রহণ করেন নাই। অনেক সময় তাঁহারা তাঁহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার নির্দেশিত কর্মপ্রণালীর যৌক্তিকতা সহজেই বুঝা যায়। দীর্ঘকাল কর্মহীন, উদ্দেশ্যহীন রাজনীতির পর তিনি যখন তাঁহার নৈতিক বিচার দীপ্ত সাহসিক ও সফল কর্মপন্থাটি উপস্থিত করিলেন, তখন তাঁহার আহ্বান সহজেই অনিবার্য হইয়া উঠিল এবং

সকলে কি বুদ্ধি কি ভাবাবেগের দিক দিয়া তাহা বরণ করিল। প্রত্যেক পদক্ষেপে তিনি তাঁহার কার্যপদ্ধতির অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন করিলেন এবং আমরা তাঁহার অধ্যাত্ম দর্শন গ্রহণ না করিয়াও অনুগামী হইলাম। ভাব হইতে কার্যকে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভবতঃ সম্যক দর্শন নহে এবং উহার ফলে পরিণামে মানসিক সংঘাত ও ক্লেশ উপস্থিত হয়। গান্ধিজী কর্মী পুরুষ এবং অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে সর্বদা সচেতন, এই কারণে আমরা আশা করিয়াছিলাম, আমরা যাহা সত্য বলিয়া জানি, সেই দিকেই তিনি অগ্রসর হইবেন। যে ভাবেই হউক, তিনি যত দিন সত্যপথে চলিতেছেন তত দিন ভবিষ্যতে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, পূর্ব হইতে এরূপ ধারণা করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র।

এই সকল হইতে বুঝা যাইবে, আমাদের মনে কোন স্পষ্ট বা নিশ্চিত ধারণা ছিল না। আমরা অধিকতর যুক্তিবাদী হইলেও গান্ধিজী ভারতবর্ষকে আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী জানেন এবং যিনি জনসাধারণের এমন অসামান্য শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অনুরাগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্যোতনায় অনুরঞ্জিত। যদি আমরা তাঁহাকে বুঝাইতে পারি, তাহা হইলে জনসাধারণও আমাদের দলে আসিবে। মনে হইয়াছিল, তাঁহাকে বুঝান সম্ভবপর। কেন না, তাঁহার কৃষকোচিত দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও তিনি আজন্ম বিদ্রোহী। এই বিপ্লবী এক বৃহৎ পরিবর্তন চাহেন, কোন ভয়েই তিনি স্তব্ধ হইবেন না।

আমাদের অলস ও অধঃপতিত জনমণ্ডলীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তিনি কি ভাবে কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছেন! বল প্রয়োগ করিয়া নহে, ঐহিকের কোন লোভ দেখাইয়া নহে। প্রশান্ত দৃষ্টি, মধুর বচন এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ভারতে সত্যাগ্রহের প্রথম সূচনা কালে ১৯১৯-এ বোম্বাই-এর ওমর শোভানী তাঁহাকে বলিতেন, 'ক্রীতদাসগণের প্রিয়তম প্রভু', ইহা আমার মনে আছে। তারপর অনেক কিছুই ঘটিয়াছে। আজ ওমর বাঁচিয়া নাই, সৌভাগ্য-ক্রমে ১৯২১-এর সূচনা হইতে আমরা আনন্দ ও গর্বের সহিত তাঁহাকে দেখিয়াছি। ১৯৩০ আমাদের জীবনের এক অপূর্ব বৎসর। গান্ধিজী তাঁহার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে সমস্ত দেশে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর আমরা জয়লাভ করিয়াছি, একথা ভাবিবার মত মূর্খ কেহ ছিল না। আমাদের গর্ব ও গৌরবের সহিত গভর্ণমেণ্টের সম্পর্ক অতি অল্পই ছিল। এই আন্দোলনে আমাদের নারীরা, যুবকেরা, সন্তানসন্ততিরা যে ভাবে কাজ করিয়াছে তাহা লইয়াই আমাদের গর্ব ও গৌরব। ইহা আত্মার সমৃদ্ধি। যে কোন সময়ে, যে কোন জাতির পক্ষে ইহা দুর্লভ সম্পদ, পরাধীন ও পদদলিত আমরা—আমাদের নিকট ইহার মূল্য আরও বেশী।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি চিরদিনই গান্ধিজীর অসামান্য দয়া ও সুবিবেচনা লাভ করিয়াছি; পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি আমার প্রতি অধিকতর স্নেহশীল হইয়াছেন। তিনি আমার কথা সর্বদাই ধৈর্যের সহিত শুনেন এবং আমার ইচ্ছা-পূরণের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে আমি ভাবিতাম যে, আমি ও আমার সহকর্মীরা তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়া ক্রমে সমাজতান্ত্রিক পথে আনিতে পারিব এবং তিনি নিজেও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইলে তিনি ধীরে ধীরে ঐ দিকে অগ্রসর হইবেন। আমার মনে হইয়াছিল যে, তিনি নিঃসন্দেহে সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতিগুলি গ্রহণ করিবেন, কেননা, আমার দৃষ্টিতে বর্তমান ব্যবস্থার অবিচার, হিংসা, অপচয় ও দুঃখের হাত হইতে মুক্তির অন্য পথ নাই।

উপায় লইয়া তাঁহার মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু আদর্শে তিনি একমত হইতেন। তখন ঐরূপ ভাবিলেও এখন আমি স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছি যে, গান্ধিজীর আদর্শের সহিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান।

এইবার ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীর কথায় ফিরিয়া আসা যাউক। গান্ধী-আরুইন আলোচনা চলিতেছে এমন সময় সহসা তাহা বন্ধ হইয়া গেল। কয়েক দিন ধরিয়া বড়লাট গান্ধিজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন না, মনে হইল কথাবার্তা ভাঙিয়া গেল। কার্যকরী সমিতির সদস্যেরা দিল্লী ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব প্রদেশে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রস্থানের পূর্বে আমরা ভবিষ্যৎ কার্য-পদ্ধতি ও আইন অমান্য আন্দোলন (যাহা তখনও জারী ছিল) সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য মিলিত হইলাম। আমরা বুঝিলাম, আপোষ আলোচনা ভাঙিয়া গেল, ইহা ঘোষণার পরেই আমরা আর একত্র মিলিত হইয়া পরামর্শ করিবার সুযোগ পাইব না। আমরা গ্রেফ্তার হওয়ার প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম এবং আরও শুনিলাম, গভর্ণমেণ্ট প্রচণ্ডভাবে কংগ্রেসকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, সে চণ্ডনীতি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভীষণ হইবে। অতএব আমরা সর্বশেষবার মিলিত হইলাম এবং ভবিষ্যতে আন্দোলন পরিচালনার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। এবারের প্রস্তাবে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। পূর্বে নিয়ম ছিল যে, সভাপতি গ্রেফ্তারের পূর্বে অস্থায়ী সভাপতি এবং কার্যকরী সমিতির সদস্যের শূন্য পদ মনোনয়ন দ্বারা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন। স্থলাভিষিক্ত কার্যকরী সমিতি প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কার্যই করিতে পারে নাই। কোন ব্যাপারে নূতন কিছু নির্ধারণ করিবার অধিকারও ইহার ছিল না। সদস্যরা কেবল জেলে যাইতে পারিতেন। যাহা হউক, এইরূপ একজনের পর একজন মনোনয়নের প্রথার বিপদও ছিল। ইহার ফলে কংগ্রেসের মর্যাদাহানিকর ব্যাপারও ঘটিতে পারিত। এই আশঙ্কা করিয়া দিল্লীতে কার্যকরী সমিতি সিদ্ধান্ত করিলেন যে ভবিষ্যতে আর অস্থায়ী সভাপতি ও স্থলাভিষিক্ত সদস্য মনোনয়ন করা হইবে না। যে সকল মূল সদস্য কারাগারের বাহিরে থাকিবেন তাঁহারা সমিতির পূর্ণ ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হইয়া কার্য করিবেন। যখন সকলে মিলিয়া কারাগারে যাইবেন, তখন সমিতির কোন কাজ থাকিবে না। তবে আমরা একটু আড়ম্বর করিয়া বলিলাম যে, সে অবস্থায় কার্যকরী সমিতির ক্ষমতা দেশের প্রত্যেক নরনারীর উপর ন্যস্ত হইবে। আমরা সর্বসাধারণকে উৎসাহের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করিলাম।

এই প্রস্তাবে সংঘর্ষ পরিচালনের সাহসিকতাপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হইল এবং আপোষের সর্বপ্রকার পথ ইহাতে বন্ধ করা হইল। আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সহিত দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ রক্ষা করা এবং নিয়মিতভাবে নির্দেশাদি প্রদান করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের পুরুষ ও মহিলা কর্মীরা সকলেই সুপরিচিত এবং তাঁহারা প্রকাশ্যে কাজ করিতেন বলিয়া ইহা অনিবার্য ছিল। তাঁহাদের গ্রেফ্তারের সম্ভাবনা সর্বদাই থাকিত। ১৯৩০-এ গুপ্ত সংবাদবাহীদল গঠন করিয়া নির্দেশ প্রচার, পরিদর্শন ও রিপোর্টাদি আনয়নের ব্যবস্থাদি হইয়াছিল। ইহাতে কাজ ভালই চলিয়াছিল এবং আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, এইরূপে গুপ্তভাবে সংবাদ সংগ্রহের কাজ আদর্শের সহিত কিয়ৎপরিমাণে সামঞ্জস্যহীন এবং গান্ধিজীও ইহার বিরোধী ছিলেন। কেন্দ্র হইতে নির্দেশের অভাবে কাজ চালাইবার দায়িত্ব আমরা স্থানীয় লোকের উপর অর্পণ করিলাম। অন্যথা তাহারা উপর হইতে নির্দেশ পাইবার জন্য অপেক্ষা করিবে অথচ কিছুই

করিবে না। অবশ্য সম্ভবত নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে।

এইভাবে একটি প্রস্তাব ও অন্যান্য প্রস্তাব পাশ করিয়া আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। (পরবর্তী ঘটনায় এই সকল প্রস্তাব প্রকাশ করা হয় নাই।) এমন সময় লর্ড আর‍ুইনের নিকট হইতে প‍ুনরায় আহ্বান আসিল এবং আপোষ প্রস্তাব আলোচনা স‍ুর‍ু হইল।

৪ঠা মার্চ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বড়লাটের বাড়ী হইতে গান্ধিজীর প্রত্যাগমনের আশায় আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি রাত্রি দ‍ুইটার সময় ফিরিয়া আসিলেন। এবং আমাদিগকে জাগাইয়া সংবাদ দেওয়া হইল যে, আপোষ প্রস্তাবগ‍ুলি নির্ধারিত হইয়াছে। আমরা খসড়াখানি দেখিলাম। প‍ূর্বে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি অধিকাংশ ধারাগ‍ুলি জানিতাম কিন্তু দ‍ুই নম্বর ধারার* রক্ষাকবচ ইত্যাদি দেখিয়া আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইলাম। ইহার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি সে রাত্রের মত আর কিছ‍ু বলিলাম না, সকলেই স্ব স্ব শয্যায় ফিরিয়া গেলাম।

অবশ্য বলিবার বিশেষ কিছ‍ু ছিল না। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আমাদের নেতা স্বয়ং কথা দিয়া আসিয়াছেন। এখন আমরা তাঁহার সহিত ভিন্নমত অবলম্বন কি করিয়া করিতে পারি? তাঁহাকে পরিত্যাগ করা? তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়া? আমাদের অনৈক্য ঘোষণা করা? ইহাতে ব্যক্তিগতভাবে কাহারও সন্তোষ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে চ‍ূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কিছ‍ু আসিয়া যাইবে না। অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও তখনকার মত আইন অমান্য আন্দোলন শেষ হইল। এবং কার্যকরী সমিতির পক্ষেও ইহা পরিচালনা করা সম্ভবপর নহে। কেন না, গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়া দিবেন, মিঃ গান্ধী আপোষ করিতে সম্মত হইয়াছেন। আমি এবং আমাদের অন্যান্য সহকর্মীরা আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত সাময়িক আপোষে ইচ্ছ‍ুক ছিলাম। আমাদের সহকর্মীদিগকে প‍ুনরায় কারাগারে প্রেরণ এবং যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি জেলে রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে সেইখানে রাখার নিমিত্তের ভাগী হওয়া কাহারও পক্ষে সহজ নহে। যদিও আমরা অনেকে নিজেদের কারাজীবনের উপয‍ুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম এবং উহার পীড়াদায়ক দৈনন্দিন কার্যপদ্ধতি লইয়া হাস্য পরিহাস করিতাম, তথাপি আমাদের জীবনের দিবারাত্রগ‍ুলি কাটাইবার জন্য কারাগার নিশ্চয়ই মনোরম স্থান নহে। তাহা ছাড়া যে তিন সপ্তাহের অধিককাল ধরিয়া গান্ধিজী ও লর্ড আর‍ুইনের মধ্যে আপোষের কথাবার্তা চলিতেছিল সেই সময় আসন্ন আপোষের প্রত্যাশায় সমগ্র দেশ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কথাবার্তা ভাঙ্গিয়া গেলে দেশে নৈরাশ্যের সঞ্চার হইত সন্দেহ নাই। এই কারণে আমরা (কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ) অস্থায়ী সন্ধির প্রস্তাবে (ইহা যে অস্থায়ী তাহা স‍ুস্পষ্ট) সম্মতি দিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও বলিলাম, এই সন্ধির দ্বারা আমরা কোনও ম‍ূল নীতি প্রত্যাহার করিলাম না।

---

* দিল্লী-চুক্তির দুই নম্বর সর্ত (১৯৩১, ৫ই মার্চ) : শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত প্রশ্নে, হিজ ম্যাজেস্টির গভর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে, ভবিষ্যৎ আলোচনার সীমা এই ভাবে নির্দিষ্ট হইল যে, গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের যে কাঠামো আলোচিত হইয়াছে, তাহাই পুনরায় বিচার করা হইবে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্র একটি অপরিহার্য অংশ হইবে এবং ভারতের দায়িত্ব, সংরক্ষিত বিষয় ও রক্ষাকবচগুলি ভারতের স্বার্থের দিক হইতে নির্দেশ করা হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যথা—দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার, সংখ্যালঘিষ্ঠদের অবস্থা, ভারতের ঋণ এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি পূরণ।

পরে বিভিন্ন বিষয় লইয়া যে তুমুল তর্কের তুফান উঠিয়াছিল ব্যক্তিগতভাবে আমি এগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেই নাই। আমার দুইটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। প্রথম কথা, আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যকে কিছুতেই খাট করা হইবে না, দ্বিতীয়তঃ, এই সন্ধির প্রভাব আমাদের যুক্ত প্রদেশের কৃষক আন্দোলনের উপর কি ভাবে পতিত হইবে। আমাদের করবন্ধ অথবা খাজনা-বন্ধের আন্দোলন এ পর্যন্ত বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং কোন কোন অঞ্চলে একেবারেই কিছু আদায় হয় নাই। কৃষকদের মেরুদণ্ড সোজা ছিল এবং সমগ্র জগতের কৃষিকার্যের অবস্থা এবং কৃষিপণ্যের মূল্যের মন্দার দরুণ তাহাদের পক্ষে খাজনা দেওয়া কঠিন ছিল। আমাদের করবন্ধ আন্দোলন একাধারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। যদি গভর্ণমেণ্টের সহিত একটা সন্ধি হয় তাহা হইলে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবে এবং করবন্ধ আন্দোলনের কোনও রাজনৈতিক ভিত্তি থাকিবে না। কিন্তু মূল্য হ্রাস হওয়ায় অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে দাবীর অনুরূপ অর্থ দিবার অক্ষমতার ফলে যে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার কি হইবে? গান্ধিজী লর্ড আরুইনের নিকট এই বিষয়টা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, করবন্ধ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইলেও আমরা কৃষকদিগকে তাহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত খাজনা দিবার উপদেশ দিতে পারিব না। এই ব্যাপারটি প্রাদেশিক বলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই। আমাদিগকে এই আশ্বাস দেওয়া হইল যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট আনন্দের সহিত এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কৃষকদের দুর্দশা মোচনকল্পে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। ইহা অনির্দিষ্ট আশ্বাস মাত্র। কিন্তু সে অবস্থায় ইহা অপেক্ষা নির্দিষ্ট কোন প্রতিশ্রুতি পাওয়া কঠিন ছিল। কাজেই তখনকার মত এই ব্যাপারের এই খানেই শেষ হইল।

আমাদের স্বাধীনতা লাভের ও আমাদের উদ্দেশ্যের মুখ্য প্রশ্নটি রহিয়া গেল। এবং আমি সন্ধির দুই নং ধারাটিতে দেখিলাম যে, এই উদ্দেশ্যকেও খর্ব করা হইয়াছে। ইহারই জন্য কি এক বৎসর কাল এত লোক এত দুঃখ বরণ করিল? আমাদের গর্বিত উক্তি এবং দুঃসাহসিক কার্যের কি এই পরিণাম? কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাব ২৬শে জানুয়ারীর সঙ্কল্প এবং তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখের ফল কি ইহাই? মার্চ মাসের সেই রাত্রিতে আমি শয্যায় শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, কোনও মহার্ঘ সম্পদ চিরদিনের মত হারাইয়া গেলে যেরূপ মনোভাব হয়, আমার হৃদয়ও সেইরূপ শূন্যতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।*

---

* [illegible]

৩৫

করাচী কংগ্রেস

গান্ধিজী পরোক্ষভাবে আমার মানসিক চাঞ্চল্যের কথা জানিতে পারিলেন। পরদিন প্রভাতে প্রাতর্ভ্রমণে যাইবার সময় আমাকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন। আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল আলোচনা হইল। তিনি আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, কোন গুরুতর বিষয় অথবা মূলনীতি প্রত্যাহার করা হয় নাই। তিনি সন্ধির দুই নম্বর ধারাটিকে 'ভারতের স্বার্থ' এই কথাটির উপর জোর দিয়া এমনভাবে ব্যাখ্যা করিলেন যে, উহার সহিত আমাদের স্বাধীনতার দাবীর ঐক্যই রহিয়াছে। এই ব্যাখ্যা আমার নিকট কষ্টকল্প না বলিয়া মনে হইল, তাঁহার যুক্তিতর্ক আমি মানিয়া লইতে পারিলাম না, তবে তাঁহার কথায় আমার মন অনেকটা শান্ত হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, চুক্তিনামার গুণাগুণ ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার আকস্মিক কার্যগুলি দেখিয়া আমরা ভয় পাই। তাঁহার মধ্যে এমন এক অজ্ঞাত বস্তু আছে, যাহা চৌদ্দ বৎসরের ঘনিষ্ঠতাতেও আমি বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া সর্বদাই শঙ্কিত থাকি। তিনি নিজের মধ্যে এই অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি নিজেও ইহার জন্য দায়ী নহেন এবং ইহা যে তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইবে, তাহাও পূর্ব হইতে বলিতে পারেন না।

দুই-এক দিন আমি সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিলাম, কি করিব বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঐ সন্ধির বিরুদ্ধতা করা অথবা উহা বন্ধ করার প্রশ্ন তখন আর উঠিতে পারে না। আমি বড় জোর কল্পনার দিক হইতে উহার সহিত সংস্রব না রাখিতে পারি, কিন্তু বাস্তব ঘটনারূপে উহা আমাকে মানিয়া লইতে হইবেই। ইহাতে আমার ব্যক্তিগত অহমিকা চরিতার্থ হইতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর সমস্যায় তাহাতে কি সাহায্য হইবে? অতএব ইহাকে সৌজন্যের সহিত মানিয়া লইয়া গান্ধিজীর মতই অনুকূল ব্যাখ্যা করাই ভাল নহে কি? সন্ধির পরেই সংবাদপত্রের জন্য তিনি যে বিবৃতি দিলেন, তাহাতে ঐ ব্যাখ্যার উপর জোর দিয়া বলিলেন যে, আমরা স্বাধীনতার দাবী একটুও বর্জন করি নাই। যাহাতে তখন এবং ভবিষ্যতে কোন ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব না হয়, এজন্য তিনি লর্ড আরউইনের নিকট গিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলিয়া আসিলেন। গান্ধিজী তাঁহাকে বলিলেন, যদি কংগ্রেস গোল টেবিল বৈঠকে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করে, তাহা হইলে এই ভিত্তির উপরই দাবী উপস্থিত করা যাইবে। লর্ড আরউইন অবশ্য এই দাবী স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না, তবে ইহা দাবী করিবার অধিকার কংগ্রেসের আছে, তিনি ইহা স্বীকার করিলেন।

মানসিক দ্বন্দ্ব ও বেদনা সত্ত্বেও আমি ঐ সন্ধি অঙ্গীকার করিয়া উহার অনুকূলে কার্য করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কোন মধ্যপথ আমি খুঁজিয়া পাইলাম না।

লর্ড আরউইনের সহিত আলোচনা কালে, সন্ধির পূর্বে ও পরে গান্ধিজী বহুবার আইন অমান্য আন্দোলন ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। আইন অমান্যের বন্দীদের মুক্তির কথা সন্ধিপত্রের মধ্যেই ছিল। তাহা ছাড়া, কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা বিনা বিচারে অপরাধ না জানিতে দিয়া আটক বন্দীও সহস্র সহস্র ছিল। অন্তরীণে আবদ্ধদের মধ্যে অনেকেই বহু বর্ষ আটক ছিলেন। ইহা লইয়া সমস্ত ভারতে, বিশেষভাবে

বাঙলা দেশে অত্যন্ত অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল। বিনা বিচারে আটক নীতির ফলে বাঙলা দেশই বেশী বিব্রত হইয়াছে। পেঙ্গুইন দ্বীপের বড় কর্তার মতই (অথবা ড্রেফাস্ মামলায়?) ভারত গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিতেন যে, প্রমাণের অভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রমাণ যে নাই, ইহা খণ্ডন করা যায় না। গভর্ণমেণ্টের অভিযোগ এই যে, অন্তরীণে আবদ্ধ ব্যক্তিরা অত্যন্ত উগ্র বিপ্লবী অথবা বৈপ্লবিক অপরাধপ্রবণ। সন্ধির অংশ স্বরূপ, গান্ধিজী এই মুক্তির দাবী করেন নাই। বাঙলার আবহাওয়া স্বাভাবিক এবং রাজনৈতিক অসন্তোষ নিবারণের জন্য তিনি উহা অত্যাবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইহাতে রাজী হইলেন না।

গান্ধিজীর ব্যাকুল অনুরোধ উপরোধেও গভর্ণমেণ্ট ভগৎ সিংহের মৃত্যুদণ্ড মকুব করিতে রাজী হইলেন না। ইহার সহিত সন্ধির অবশ্যই কোন সম্বন্ধ ছিল না কিন্তু এই বিষয়ে দেশব্যাপী যে মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার জন্যই গান্ধিজী স্বতন্ত্রভাবে এই অনুরোধ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিরাশ হইলেন।

এইকালে একটি ঘটনায় ভারতীয় টেররিস্ট দলের মনোভাব জানিবার আমার সুবিধা হইয়াছিল। আমার কারামুক্তির পরে, পিতার মৃত্যুর পূর্বে কিম্বা কয়েকদিন পর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার সহিত দেখা করিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, শুনিলাম, তাঁহার নাম চন্দ্রশেখর আজাদ। আমি তাঁহাকে পূর্বে কখনও দেখি নাই। শুনিয়াছিলাম, দশ বৎসর পূর্বে, ১৯২১ সালে স্কুল ত্যাগ করিয়া তিনি অসহযোগ আন্দোলনে কারাগমন করিয়াছিলেন। সেখানে জেলশৃংখলা ভঙ্গ করিবার অপরাধে এই পনর বৎসরের বালককে বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়। ইহার পর তিনি টেররিস্ট দলে যোগদান করেন এবং উত্তর ভারতে ঐ দলের একজন প্রতিপত্তিশালী সদস্য হইয়া উঠেন। এই সকল কথা আমি পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, তবে এই শ্রেণীর গুজবে আমার বড় কৌতূহল ছিল না। অতএব, তাঁহাকে দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইলাম। আমাদের কারামুক্তির ফলে কংগ্রেসের সহিত গভর্ণমেণ্টের আপোষের প্রত্যাশা সকলের মনেই জাগিয়াছিল, এই কারণেই তিনি আমার সহিত দেখা করেন। তিনি জানিতে চাহিলেন, যদি আপোষ হয়, তাহা হইলে তাঁহার দলের লোকদের সেখানে কোন ঠাঁই হইবে কি-না? তাহারা কি এমনইভাবে নির্বাসিত জীবন যাপন করিবে, প্রতাড়িত হইয়া একস্থান হইতে অন্যত্র ভ্রমণ করিবে, তাহাদের মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষিত থাকিবে এবং সম্মুখে থাকিবে ফাঁসির সম্ভাবনা? অথবা তাহাদিগকে শান্তিতে জীবনযাপনের সুযোগ দেওয়া হইবে? তিনি আমাকে বলিলেন, তিনি এবং তাঁহার অনেক সহকর্মী বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কেবলমাত্র টেররিস্ট কার্যপদ্ধতি নিষ্ফল, ইহার দ্বারা কোন কল্যাণ হইবে না। অবশ্য, তিনি কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে ইহা বিশ্বাস করিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে ভীষণ সংঘর্ষ ঘটিতে পারে, তবে তাহা টেররিজম নহে। টেররিজম দ্বারা ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিবে না, একথাও তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন। কিন্তু তাঁহাকে শান্তিতে বসবাস করিতে না দিয়া যদি এইভাবে তাড়াইয়া লওয়া চলিতে থাকে, তবে কি হইবে? তাঁহার মতে ইদানীং যে সকল টেররিস্ট ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নিছক আত্মরক্ষার জন্য।

টেররিজমের উপর বিশ্বাস দ্রুত অন্তর্হিত হইতেছে, আমাদের নিকট এই

কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম, পরেও আমি ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। দলের নীতি হিসাবে, টেররিজম-এর কার্যতঃ কোন অস্তিত্ব নাই। ব্যক্তিগত বা আকস্মিক ঘটনার সম্ভবতঃ বিশেষ কারণ আছে। ইহা প্রতিশোধমূলক কার্য অথবা ব্যক্তিগত মানসিক বিকৃতির ফল; কোন সাধারণ বিশ্বাসজনিত কার্য নহে। অবশ্য তাই বলিয়া পুরাতন টেররিস্ট ও তাঁহাদের সঙ্গিগণ অহিংসামন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছেন অথবা ব্রিটিশ শাসনের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু টেররিজম সম্বন্ধে তাঁহাদের পূর্ব ধারণা আর নাই। আমার বোধ হয়, ইঁহাদের অনেকেই নিশ্চিতরূপে ফাসিস্ত মনোবৃত্তিসম্পন্ন।

আমার রাজনৈতিক কার্যের মতবাদ বুঝাইয়া দিয়া আমি চন্দ্রশেখরকে স্বমতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাঁহার মূল প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, তিনি এখন কি করিবেন? এমন কিছুই ঘটিবার সম্ভাবনা নাই যাহাতে তিনি ও তাঁহার মত ব্যক্তিরা শান্তি পাইতে পারেন। আমি কেবল তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে, তিনি যেন তাঁহার দলের ব্যক্তিদিগকে ভবিষ্যতে হিংসামূলক কার্য হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করেন, কেন না, তাহাতে তাঁহাদের দলের ক্ষতি, দেশের স্বার্থেরও ক্ষতি।

দুই-তিন সপ্তাহ পরে, যখন গান্ধী-আরুইন কথাবার্তা চলিতেছিল, তখন দিল্লীতে শুনিলাম যে, চন্দ্রশেখর আজাদ এলাহাবাদে পুলিশের গুলীতে নিহত হইয়াছেন। দিবাভাগে কোন উদ্যানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পুলিশবাহিনী চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলে। তিনি একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। উভয়পক্ষ হইতে গুলীবর্ষণ চলিয়াছিল। নিহত হইবার পূর্বে তাঁহার গুলীতেও দুই-একজন পুলিশ আহত হইয়াছিল।

সন্ধিপত্র গৃহীত হইবার পরই আমি দিল্লী ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলাম। আমরা অবিলম্বে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলাম; সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান অপূর্ব শৃঙ্খলার সহিত আমাদের নির্দেশ পালন করিল। আমাদের দলের অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং অনেকে উগ্রপন্থী ছিলেন, তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করার মত কোন শক্তি আমাদের হাতে ছিল না। যদিও অনেকে সমালোচনা করিলেন, তথাপি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক ব্যক্তিই এই সন্ধি মানিয়া লইলেন। একজনও অবজ্ঞা করিয়াছেন, এমন সংবাদ আমি পাই নাই। আমাদের প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে তখন খাজনাবন্ধের আন্দোলন চলিতেছিল বলিয়া নূতন ঘটনার যে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইল, আমি তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আমাদের প্রথম কাজ হইল, আইন অমান্য আন্দোলনের প্রত্যেক বন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা। দিনের পর দিন হাজার হাজার বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইল। যাহাদের অপরাধ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আছে এরূপ কয়েকজন মাত্র জেলে রহিয়া গেল। অবশ্য সহস্র সহস্র অন্তরীণে আবদ্ধ এবং হিংসামূলক কার্যের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিরা মুক্তি পাইল না।

কারামুক্ত বন্দীরা যখন স্ব স্ব নগরে উপস্থিত হইলেন তখন জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বর্ধনা করিল। এই উপলক্ষ্যে পুষ্প পল্লব পতাকা দ্বারা গৃহসজ্জা, শোভাযাত্রা সভা বক্তৃতা ও মানপত্র প্রদান ইত্যাদি চলিত। ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু পুলিশের লাঠিচালনা, বলপ্রয়োগে সভা ও শোভাযাত্রা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ব্যাপারের মধ্যে এই পরিবর্তন অতি আকস্মিক, পুলিশ অস্বাভাবিক অভ্যাস করিতে লাগিল। এবং সম্ভবতঃ কারাপ্রত্যাগত ব্যক্তিদের মনেও

একটু জয়ের অহঙ্কার হইয়াছিল। অবশ্য ইহাতে জয়গর্বের বিশেষ কোন কারণ ছিল না। তবে জেল হইতে বাহির হইলে স্বভাবতঃই স্ফূর্তির কারণ ঘটে, অবশ্য জেলে একেবারে প্রবেশ করিতে না হইলে এবং দলে দলে জেল হইতে বাহির হইলে আনন্দের তো কথাই নাই।

এই ঘটনা উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, কয়েকমাস পরে 'এই জয়োৎসবে' গভর্ণর তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে ইহাও একটা অভিযোগরূপে উপস্থিত করা হইয়াছিল। সর্বদা প্রভুত্বের পরিমণ্ডলে বাস করিতে অভ্যস্ত, গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে সামরিক ধারণা পোষণকারী, জনসাধারণের সহিত সংযোগ অথবা সম্পর্কহীন শাসকবর্গের দৃষ্টিতে তাঁহাদের ধারণানুরূপ মর্যাদার কোনও অপহ্নব অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এবিষয়ে আমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, সিমলার তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে সমতল ক্ষেত্র পর্যন্ত সর্বত্র সরকারী কর্মচারীরা জনসাধারণের এই ঔদ্ধত্য দেখিয়া ক্রোধে কম্পান্বিত হইতেছিলেন। যে সকল সংবাদপত্রে তাঁহাদের মত প্রতিধ্বনিত হয়, তাঁহারা সেকথা ভুলিতে পারেন নাই এবং সাড়ে তিন বৎসর পরে এখনও তাঁহারা সেই দুঃসাহসিক দুর্দিনের কথা চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠেন। তাঁহাদের মতে কংগ্রেসপন্থীরা যেন বৃহৎ জয়লাভ করিয়াছে এমনই ভাব দেখাইয়া অহঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট এবং তাঁহাদের সংবাদপত্রস্থ বন্ধুগণের এই উষ্মা দেখিয়া আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া গেল। তাঁহাদের মানসিক অবস্থা এবং তাঁহারা কতখানি আত্মদমন করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম। আমাদের সৈনসামন্তদের কয়েকটি বক্তৃতা ও গোটাকয়েক শোভাযাত্রাই তাঁহাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইয়া ফেলিয়াছিল, ইহা এক আশ্চর্য দৃশ্য।

কার্যতঃ, সাধারণ কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে তো নহেই, নেতাদের মধ্যেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে 'হারাইয়া দিয়াছি' এমন কোন মনোভাব ছিল না। কিন্তু আমাদের নিজেদের লোকের সাহস ও আত্মোৎসর্গ দেখিয়া আমরা গর্বিত হইয়াছিলাম। ১৯৩০ সালে দেশ যাহা করিয়াছে, তাহাতে আমরা গর্ব বোধ করিয়াছি, আমাদের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদা বাড়িয়াছে, এমন কি, আমাদের কনিষ্ঠতম স্বেচ্ছাসেবক পর্যন্ত এই গর্বে সোজা হইয়া মাথা উঁচু করিয়া চলিত। আমরা আরও বুঝিয়াছিলাম যে, এই বৃহৎ সংঘর্ষ সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর অত্যধিক চাপ দিয়াছে এবং আমাদিগকে লক্ষ্যের নিকটবর্তী করিয়াছে। কিন্তু ইহার সহিত গভর্ণমেণ্টকে পরাজিত করিবার কথার কোন সম্ভব ছিল না বরং দিল্লী সন্ধি করিয়া গভর্ণমেণ্ট যে সুবিবেচনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সম্যক্‌রূপে সচেতন ছিলাম। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বলিতেন যে, আমাদের লক্ষ্য এখনও বহুদূরে এবং সম্মুখে অধিকতর কঠোর সংঘর্ষ অপেক্ষা করিতেছে, তাঁহাদিগকে গভর্ণমেণ্টের বন্ধুরা সংগ্রামলোলুপ এবং দিল্লী-চুক্তিবিরোধী বলিয়া অভিহিত করিতেন।

যুক্তপ্রদেশে আমাদিগকে কৃষক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। বস্তুতঃ সন্ধির পর, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য আমরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্তপ্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সংস্রবে আসিলাম। দীর্ঘকাল পরে—দুই বৎসর সরকারী মহলে আমাদের কোন আনাগোনা ছিল না—কৃষক সমস্যা লইয়া আমি কয়েকজন উচ্চকর্মচারীর সহিত দেখা করিলাম। আমাদের মধ্যে দীর্ঘ পত্র-বিনিময়ও চলিতে লাগিল। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি গভর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্তা চালাইবার মুখপাত্র হিসাবে গোবিন্দবল্লভ পন্থকে নিযুক্ত করিলেন।

পল্লী-অঞ্চলের দুঃখ, কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস এবং চাহিদা অনুরূপ খাজনা দিবার সাধারণ কৃষকদের অক্ষমতা তাঁহারা স্বীকার করিলেন, প্রশ্ন হইল কি পরিমাণ খাজনা মাপ দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহার মীমাংসা সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উপরেই নির্ভর করে। সাধারণতঃ গভর্ণমেণ্ট জমিদারের সহিতই বুঝাপড়া করিয়া থাকেন, প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের সহিত কিছু করেন না। অতএব খাজনা কমাইবার অথবা মাপ দিবার ভার প্রধানতঃ জমিদারের। যতদিন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দেয় রাজস্বের অংশবিশেষ মাপ না করিতেছেন ততদিন তাঁহারা ঐরূপ করিতে রাজী হইলেন না। যাহাই ঘটুক, তাঁহারা স্বভাবতঃই রায়তদের খাজনা মাপ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কাজেই সমস্যার মীমাংসার ভার গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতে লাগিল।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি কৃষকদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, খাজনা-বন্ধ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইয়াছে, এখন তাহারা সাধ্যমত খাজনা দিতে পারে। কিন্তু তাহারা কৃষকদের প্রতিনিধিরূপে মোটারকম খাজনা মকুবের দাবী করিলেন। দীর্ঘকাল গভর্ণমেণ্ট কিছুই করিলেন না, সম্ভবতঃ ছুটি অথবা বিশেষ কর্তব্যের জন্য গভর্ণর স্যার ম্যালকম হেলীর অনুপস্থিতির জন্য তাঁহারা বাধা অনুভব করিতেছিলেন। দ্রুত ও বহুদূরপ্রসারী ব্যবস্থার তখন আবশ্যক ছিল। কিন্তু অস্থায়ী গভর্ণর ও তাঁহার সহযোগীরা ইতস্ততঃ করিয়া কিছুই করিলেন না এবং গ্রীষ্মকালে স্যার ম্যালকম হেলীর প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অনিশ্চিত অবস্থা ও বিলম্বের ফলে অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইল এবং প্রজাদের দুর্দশা বাড়িয়া গেল।

দিল্লী-সন্ধির অব্যবহিত পরেই আমার স্বাস্থ্য একটু ভাঙ্গিয়া পড়িল। জেলেই আমার শরীর খারাপ হইয়াছিল, তারপর পিতার মৃত্যু এবং দিল্লীতে দীর্ঘকাল আলোচনার ক্লান্তি আমার দেহ সহ্য করিতে পারিল না। তবু কোন প্রকারে একটু ভাল হইয়া করাচী কংগ্রেসের কাজ চালাইয়া লইলাম।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের করাচী বন্দর অত্যন্ত দুর্গম স্থান; বিস্তৃত মরুভূমি দ্বারা ইহা অবশিষ্ট ভারত হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন। তথাপি বহু দূরবর্তী স্থান হইতে অনেক লোক এখানে সমবেত হইয়াছিলেন এবং দেশের তৎকালীন মনোভাব করাচীতে সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবর্ধিত শক্তি দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট। কংগ্রেস সুশৃঙ্খলার সহিত অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, যথানিয়মে নির্দেশমত কার্য করিয়াছে, ইহাতে জনসাধারণের শক্তি ও সামর্থ্যের উপর সকলেরই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। সর্বত্রই কংগ্রেসের জন্য গর্ব ও সংযত উৎসাহ লক্ষিত হইল। সম্মুখে বৃহৎ সমস্যা ও বিঘ্নগুলির জন্য গভীর দায়িত্ববোধেরও অভাব ছিল না। আমাদের বক্তব্য ও প্রস্তাব লঘুভাবে ব্যক্ত করা বা গ্রহণ করা সম্ভব নহে, কেন না, উহার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সমস্ত জাতীয় কর্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবে। দিল্লী-সন্ধি যদিও অধিকাংশ ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি জনমত উহার অনুকূল ছিল না, এজন্য আমাদের কিছু অসুবিধায় পড়িতে হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা ছিল। ইহার ফলে দেশের মধ্যে সমস্যাগুলি একটু ঘোলাইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর কংগ্রেসের প্রাক্কালে ভগৎ সিংহের ফাঁসি লইয়া এক নূতন অসন্তোষ দেখা গেল। এই অসন্তোষের প্রাবল্য উত্তর ভারতেই লক্ষ্য করা গেল এবং করাচীতে (নিকটবর্তী বলিয়া) পাঞ্জাব হইতে বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অন্যান্য কংগ্রেস অপেক্ষাও করাচীতে গান্ধিজী ব্যক্তিগত ভাবে অধিকতর

জয়লাভ করিলেন। সভাপতি ছিলেন শক্তিমান ও জনপ্রিয় গুজরাটের যশস্বী জননায়ক, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল; কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চে মহাত্মাই প্রধান নায়ক। আবদুল গফুর খাঁর নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশ হইতে শক্তিশালী 'লালকুর্তাদল' কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। লালকুর্তাদল কংগ্রেসে সকলের প্রশংসা ও জয়ধ্বনি লাভ করিলেন। ১৯৩০-এর এপ্রিল হইতে তাঁহারা ক্রোধের বহু কারণ সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সাহসের সহিত কর্তব্যপালন করিয়া সারা ভারতের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। রেড্-শার্ট বা লালকুর্তা নাম দেখিয়া অনেকে ভ্রান্তভাবে মনে করেন যে ইহারা কম্যুনিস্ট অথবা বামপন্থী শ্রমিকদল। তাহাদের আসল নাম হইল খুদাই খিদ্মদ্গার এবং ইহা কংগ্রেসের সহিত যুক্তভাবে কাজ করিত। (পরে ১৯৩১ হইতে ইহা কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।) তাহাদের প্রাচীনকালের পোষাক রক্তবর্ণ ছিল বলিয়া তাহাদের 'লালকুর্তা' বলা হইত। তাহাদিগের কার্য-তালিকায় জাতীয় ও সমাজ-সংস্কারের প্রস্তাব ছিল, কিন্তু কোন অর্থনৈতিক কার্যপদ্ধতি ছিল না।

করাচীতে মুখ্য প্রস্তাব ছিল দিল্লী-সন্ধি ও গোলটেবিল বৈঠক লইয়া। কার্যকরী সমিতির রচিত ও নির্ধারিত প্রস্তাবে আমি সায় দিলাম। কিন্তু গান্ধিজী যখন আমাকেই উহা প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত করিতে বলিলেন, তখন আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। প্রস্তাবটি আমার মতমতো নহে বলিয়া আমি প্রথমে অস্বীকার করিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, ইহা দুর্বলতা ও অব্যবস্থিত-চিত্ততার পরিচায়ক; হয় আমাকে ইহা সমর্থন করিতে হইবে, নয় বিরুদ্ধতা করিতে হইবে, দোটানায় পড়িয়া লোককে কল্পনা ও অনুমান করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত নহে। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসে প্রস্তাব উপস্থিত করিবার কয়েক মিনিট পূর্বে আমি রাজী হইলাম। সেই বৃহৎ জনমণ্ডলীর সম্মুখে আমি সরলভাবে আমার মনোভাব ব্যক্ত করিলাম, যে কারণে এই প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতে অনুরোধ করিতেছি, তাহাও বলিলাম। মুহূর্তের উত্তেজনাপ্রসূত আমার সেই বক্তৃতায়, কোন আলঙ্কারিক শব্দচাতুর্য ছিল না, ভাবিয়া চিন্তিয়াও কিছু বলি নাই। আমার হৃদয় হইতে স্বতঃউৎসারিত এই বক্তৃতার ফল আমার পূর্ব হইতে প্রস্তুত করা বক্তৃতা অপেক্ষা ভাল হইয়াছিল।

আরও কয়েকটি প্রস্তাবে আমি বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ভগৎ সিংহ এবং মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত প্রস্তাব, এই দুইটি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত প্রস্তাবে আমি অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলাম, কেন না, ইহার বিষয়গুলিতে আমার সম্মতি ছিল, দ্বিতীয়তঃ ইহাতে কংগ্রেস এক অভিনব নীতি ও উদ্দেশ্য স্বীকার করিল। এতদিন কংগ্রেস খাঁটি জাতীয়তাবাদের আদর্শেই চলিয়াছে, কুটীরশিল্প ও স্বদেশীর উৎসাহ প্রদান ছাড়া অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে পরিহার করিয়াই চলিয়াছে। করাচী প্রস্তাবে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক পথে প্রথম পদার্পণ করিয়া একটু অগ্রসর হইল—প্রধান প্রধান ব্যবসায় ও লোকহিতকর ব্যবসায়গুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, জমির উন্নতি বৃদ্ধি করিয়া গরীবদের ট্যাক্সের বোঝা লাঘব ইত্যাদি। অবশ্য ইহা মোটেই সোস্যালিজম নহে, যে কোন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রও এই সকল ব্যবস্থা সহজেই গ্রহণ করিতে পারে।

এই মোলায়েম ও নিরীহ প্রস্তাবটিতেও ভারত গভর্ণমেন্টের দুশ্চিন্তা বাড়িয়া গেল। সম্ভবতঃ তাঁহারা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ দূরদৃষ্টির বলে দেখিতে পাইলেন যে, বলশেভিকদের স্বর্ণ গোপনপথে করাচীতে আসিয়া কংগ্রেস

নেতাদের বিগড়াইয়া দিতেছে। এক প্রকার রাজনৈতিক অন্তঃপুরবাসী, বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন গোপনতার আবহাওয়ায় অভ্যস্ত শাসকগণের কৌতূহলী মন সর্বদাই রহস্যময় কল্পিত কাহিনী নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকে। তারপর এই কাহিনীগুলি এক রহস্যময় উপায়ে অল্পে অল্পে অনুগৃহীত সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহাতে এমন ইঙ্গিতও করা হইল যে, যবনিকা উত্তোলিত হইলে আরও অনেক কিছু ঘটনা প্রকাশিত হইতে পারে। এইভাবে মূল নীতি সম্পর্কিত করাচী প্রস্তাবকে অভ্যস্ত উপায়ে ঐ সকল কাহিনীর সহিত জড়িত করিতে দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, উহা সরকার পক্ষেরই মত। গল্প রটিয়াছিল যে, একজন রহস্যময় ব্যক্তি (কম্যুনিষ্ট দলের) ঐ প্রস্তাব বা উহার অধিকাংশ ভাগ রচনা করিয়া করাচীতে আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর আমি মিঃ গান্ধীকে সাফ বলিয়া দিলাম যে, হয় ইহা গ্রহণ করুন, নহিলে আমি দিল্লী-চুক্তির বিরোধিতা করিব এবং মিঃ গান্ধী আমাকে হাতে রাখিবার জন্য উহা গ্রহণ করিলেন ও কংগ্রেসের শেষ দিন পরিশ্রান্ত বিষয়নির্বাচন-সমিতিকে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন।

সেই 'রহস্যময় ব্যক্তির' নাম যদিও খোলাখুলি উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু বহু প্রকার ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া কাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে তাহা আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। আমি স্বয়ং রহস্যপূর্ণভাবে বা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা বলিতে অভ্যস্ত নহি। অতএব আমি সোজাসুজি বলিতেছি যে, এম. এন. রায়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ নিরীহ করাচী প্রস্তাব সম্পর্কে এম. এন. রায় অথবা অন্য কোন 'কম্যুনিষ্ট মনোভাবাপন্ন' ব্যক্তির ধারণা কি তাহা জানিলে দিল্লী সিমলার বড়কর্তাদের কিছু চোখ খুলিত। তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য হইতেন যে, ঐ শ্রেণীর লোক প্রস্তাবটির প্রতি ঘৃণাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে উহা বুর্জোয়া সংস্কারপন্থী মনোবৃত্তির বিশেষ নিদর্শন।

মিঃ গান্ধী সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, আমি গত সতর বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আমার পক্ষে তাঁহার উপর জোর জবরদস্তি করা এবং তাঁহার সহিত দর কষাকষি করার কথা কল্পনাতীত। আমরা পরস্পরের মত মানিয়া লইতে পারি অথবা কোন বিশেষ ব্যাপারে ভিন্ন মতও অবলম্বন করিতে পারি কিন্তু আমাদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে কেনাবেচার মনোভাব আসিতে পারে না।

এই শ্রেণীর প্রস্তাব কংগ্রেসে উপস্থিত করিবার কল্পনা অনেক দিন হইতেই ছিল। যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি কয়েক বৎসর ধরিয়া এই বিষয়ে আন্দোলন করিতেছিলেন এবং একটি সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাব নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিকে গ্রহণ করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯২৯ সালে উহার মূল নীতি নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিকে কতকটা গ্রহণ করাইতে পারা গিয়াছিল। তাহার পর আইন অমান্য আন্দোলন আসিল। ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দিল্লীতে গান্ধিজীর সহিত আমার প্রাতর্ভ্রমণকালীন আলাপ আলোচনায় আমি ঐ বিষয় তাঁহাকে জানাই এবং তিনিও অর্থনৈতিক ব্যাপার সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব গ্রহণের অনুকূলে মত দেন। তিনি আমাকে ঐ প্রস্তাব করাচীতে উপস্থিত করিতে এবং উহা রচনা করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে বলিলেন। আমি করাচীতে তাঁহাকে প্রস্তাবটি দেখাইলে তিনি উহার অনেক অদলবদল করিলেন। তিনি বলিলেন যে, কার্যকরী সমিতিতে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার পূর্বে আমাদের উভয়ের একমত হওয়া উচিত। আমাকে কয়েকটি খসড়া প্রস্তাব রচনা করিতে হইল এবং আমরা আমাদের

কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া কয়েকদিন দেরী হইয়া গেল। অবশেষে গান্ধিজী ও আমি একমত হইয়া প্রস্তাবটি কার্যকরী সমিতির সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহা এক অভিনব প্রস্তাব এবং অনেক সদস্য যে বিস্মিত হইয়াছিলেন তাহা সত্য। যাহা হউক, ইহা সহজেই সমিতিতে ও কংগ্রেসে গৃহীত হইল এবং ইহার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর ভার দেওয়া হইল।

যখন আমি এই প্রস্তাবটি রচনা করিতেছিলাম তখন নানাশ্রেণীর লোক আমার তাঁবুতে আসিতেন। অনেকের সহিত আমি এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছি। কিন্তু এম. এন. রায়ের সহিত ইহার কোন সংশ্রবই ছিল না। আমি ভাল করিয়াই জানি যে, তিনি এই প্রস্তাব দেখিলে হাসিতেন এবং ইহা অনুমোদন করিতেন না।

আমি করাচী যাত্রা করিবার কয়েকদিন পূর্বে এম. এন. রায়ের সহিত এলাহাবাদে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যায় তিনি অকস্মাৎ আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে ভারতে আসিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্রই চিনিলাম। কেন না ১৯২৭ সালে মস্কোতে তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। করাচীতেও তিনি আমার সহিত দেখা করেন, কিন্তু পাঁচ মিনিটের অধিক কাল তাঁহার সহিত আলাপ হয় নাই। অতীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া রায় আমার কার্যপ্রণালীর নিন্দা করিয়া অনেক কিছুই লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিন্দায় আমি অনেক সময় আঘাতও পাইয়াছি। তাঁহার ও আমার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য সত্ত্বেও আমি তাঁহার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকি এবং পরে যখন তিনি গ্রেফতার হইয়া বিপদাপন্ন হইলেন তখন আমি তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য (অত্যন্ত অল্প) করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহার তীক্ষ্ম বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার সর্বজন-পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ একাকীত্বও আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দীর্ঘ হস্ত তাঁহার দিকে প্রসারিত, জাতীয়তাবাদী ভারত তাঁহার প্রতি উদাসীন এবং যাঁহারা নিজেদের কম্যুনিস্ট বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদের নিকট তিনি আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নিন্দিত। আমি জানিতাম, তিনি দীর্ঘকাল রুশিয়ায় ছিলেন এবং কোমিণ্টার্ণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে তিনি তাহাদের ছাড়িয়াছেন, অথবা সম্ভবতঃ তাহারাই তাঁহাকে ছাড়িয়াছে। কেন ইহা ঘটিল, আমি জানি না। তাঁহার বর্তমান মত কি, গোঁড়া কম্যুনিস্টদের সহিত তাঁহার মতভেদ কোথায়, সে বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা ছাড়া আমার ভাল জানা নাই। কিন্তু সর্বজন-পরিত্যক্ত এই মানুষটির জন্য আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম এবং আমার সাধারণ অভ্যাসের বিরুদ্ধেও আমি তাঁহার মামলা-পরিচালন কমিটিতে যোগ দিয়াছিলাম। সেই ১৯৩১ সালের গ্রীষ্মকালের পর হইতে তিন বৎসর তিনি জেলে আছেন, অসুস্থ দেহ লইয়া তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে নির্জনে দিন কাটাইতে হইতেছে।

করাচীতে কংগ্রেসের সর্বশেষ কাজ নূতন কার্যকরী সমিতি নির্বাচন। নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক ইহা নির্বাচিত হয়। কিন্তু নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি, সেই বৎসরের নির্বাচিত সভাপতির মত-ই (গান্ধিজী ও অন্যান্য সহকর্মীদের সহিত পরামর্শক্রমে) অনুমোদন করেন, ইহা প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু করাচীতে কার্যকরী সমিতির নির্বাচন লইয়া এমন অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটিল, যাহা পূর্বে কেহ ধারণা করিতে পারেন নাই। কয়েকজন মুসলমান সদস্য এই নির্বাচনে, বিশেষভাবে একজনের (মুসলমান) নির্বাচনে আপত্তি প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের দল হইতে

কাহাকেও মনোনীত করা হয় নাই বলিয়া সম্ভবতঃ তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মাত্র পনর জন সদস্য লইয়া যে নিখিল ভারতীয় কমিটি গঠিত, সেখানে সকল শ্রেণীর স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া অসম্ভব। বর্তমান আপত্তি ব্যক্তিগত ও পঞ্জাবের ঘরোয়া ব্যাপার মাত্র, যাহার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিতাম না। ইহার ফলে পঞ্জাবের প্রতিবাদকারীরা কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া 'অহ্‌র দল' অথবা 'মজলিস্-ই-অহ্‌রের' সহিত যোগদান করিলেন। পঞ্জাবের কয়েকজন কর্মী ও জনপ্রিয় মুসলমান কংগ্রেসপন্থী উহাতে যোগ দিলেন এবং অনেক পাঞ্জাবী মুসলমান উহার সদস্য হইলেন। ইহা বিশেষভাবে নিম্ন মধ্যশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান এবং নানাদিক দিয়া ইহার মুসলমান জনসাধারণের সহিত যোগ ছিল। এইরূপে ইহা শক্তিশালী হইয়া উঠিল। মূলহীন অস্তিত্বহীন বৈঠকখানায় সীমাবদ্ধ উচ্চ-শ্রেণীর মুসলমানদের জরাজীর্ণ সাম্প্রদায়িক সভাগুলি অপেক্ষা এই নবীন দল অধিকতর প্রতিষ্ঠালাভ করিল। অহ্‌র দলও অনিবার্যরূপেই সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, কিন্তু মুসলমান জনসাধারণের সহিত ইহার যোগ থাকায় এক প্রকার অস্পষ্ট অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও ইহাতে ছিল। এই দল দেশীয় রাজ্যে, বিশেষভাবে কাশ্মীর মুসলমান আন্দোলনে বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল; তবে ইহা বিস্ময় ও দুঃখের কথা যে, অর্থনৈতিক দুর্গতির সহিত সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিও একত্রে মিশ্রিত করা হইয়াছিল। অহ্‌র দলের কতিপয় নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করায় পঞ্জাবে কংগ্রেস ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু করাচীতে আমরা ইহা অনুমান করিতে পারি নাই, কয়েক মাস পরে ইহা বুঝিতে পারিয়া-ছিলাম। করাচীতে, কার্যকরী সমিতির নির্বাচন লইয়া অসন্তোষই তাঁহাদের কংগ্রেস ত্যাগের কারণ নহে। উহাতে কেবল বুঝা গিয়াছিল যে, হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে; প্রকৃত কারণ আরও গভীর।

আমরা করাচীতে থাকিতেই কাণপুর হইতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সংবাদ আসিল। তার পরেই সংবাদ পাওয়া গেল যে, গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী যাহাদিগকে সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, সেই উন্মত্ত জনতা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। এই শ্রেণীর দাঙ্গায় পাশবিক বর্বরতা প্রায়শঃই দেখা যায়, কিন্তু গণেশজীর মৃত্যুতে আমরা উহার ভীষণতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম। তিনি এই কংগ্রেস শিবিরে সহস্র সহস্র ব্যক্তির পরিচিত ছিলেন এবং যুক্ত প্রদেশে তিনি আমাদের সকলেরই প্রিয় সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন। সাহসী ও উৎসাহী, দূরদর্শী ও সুবিজ্ঞ, নৈরাশ্যহীন, সদাকর্মরত, যশে নির্লোভ বিদ্যার্থী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। যৌবনের উৎসাহে তিনি আদর্শের সেবা করিতে গিয়া জীবন উৎসর্গ করিলেন, নির্বোধ হস্ত তাঁহাকে আঘাত করিয়া কাণপুরে ও যুক্ত প্রদেশকে তাহাদের উজ্জ্বল মণিখণ্ড হইতে বঞ্চিত করিল। করাচীতে সংবাদ আসিবার পর যুক্ত প্রদেশের শিবিরে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। যেন গৌরবরবি অস্তমিত হইল। যিনি অকম্পিত-ভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছেন এবং সগৌরবে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, শোকের মধ্যেও তাঁহার জন্য গর্বের কারণ ছিল।

দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম

আমার চিকিৎসকগণ বিশ্রাম ও বায়ুপরিবর্তনের উপদেশ দিলেন। আমি এক মাসের জন্য সিংহলে যাওয়া মনস্থ করিলাম; ভারতবর্ষ বিশাল দেশ কিন্তু ইহার কোন স্থানেই আমার মানসিক শান্তির অবকাশ নাই। কেন না, যেখানেই আমি যাইব, রাজনৈতিক সহযোগীদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং একই সমস্যা সর্বদা আমার পশ্চাতে লাগিয়া থাকিবে। সিংহল দ্বীপই ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী স্থান, সেইজন্য কমলা ও ইন্দিরাকে লইয়া আমি সিংহল যাত্রা করিলাম। ১৯২৭ সালে ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর এই আমার প্রথম বিশ্রাম এবং জীবনে এই প্রথম স্ত্রী ও কন্যার সহিত সমস্ত কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শান্তিতে বিশ্রাম করিবার সময় পাইলাম। জীবনে আর পুনরায় ইহা ঘটে নাই, ঘটিবে কি-না তাহাও জানি না।

নিউয়ারা ইলিয়ায় দুই সপ্তাহ ব্যতীত সিংহলেও আমরা বিশেষ বিশ্রাম করিতে পারি নাই। এখানেও সকল শ্রেণীর লোকের আতিথেয়তা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে আমরা অভিভূত হইলাম। এই সকল শুভেচ্ছা আনন্দদায়ক হইলেও সময় সময় বড় অসুবিধায় পড়িতে হয়। নিউয়ারা ইলিয়ায় মজুরেরা, চা-বাগানের শ্রমিকেরা এবং অন্যান্য অনেকে কয়েক মাইল দূর হইতে প্রত্যহ দল বাঁধিয়া আসিত এবং বন্য ফুল, শাকসব্জী এবং গৃহে প্রস্তুত মাখন ইত্যাদি মনোহর উপহার দিয়া যাইত। আমরা পরস্পরের সহিত কথা কহিতে পারিতাম না, কেবল মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতাম। আমাদের ক্ষুদ্র গৃহ এই সকল মূল্যবান উপহারে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহারা দরিদ্র, তবুও এইগুলি সংগ্রহ করিত। আমরা ঐগুলি স্থানীয় হাসপাতালে ও অনাথালয়ে পাঠাইয়া দিতাম।

আমরা অনেক ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, বৌদ্ধ বিহার এবং মনোহর অরণ্যরাজি দর্শন করিলাম, অনুরাধাপুরে বুদ্ধদেবের এক প্রাচীন উপবিষ্ট মূর্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। এক বৎসর পরে যখন আমি দেরাদুন জেলে তখন সিংহল হইতে আমার এক বন্ধু এই মূর্তির একখানি চিত্র প্রেরণ করেন। আমি আমার সেলের মধ্যে ছোট টেবিলের উপর উহা স্থাপন করিয়াছিলাম। বুদ্ধমূর্তির দৃঢ় ও প্রশান্ত অবয়ব আমার মনকে স্নিগ্ধ করিত এবং নৈরাশ্যের মুহূর্তে ইহা আমাকে চিত্ত স্থির করিবার বল প্রদান করিত।

বুদ্ধের প্রতি আমি চিরদিনই গভীরভাবে অনুরাগী। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করা কঠিন, তবে ইহা ধর্মানুরাগ নহে। বৌদ্ধধর্মের চারিদিকে কালে কালে যে সকল অনুশাসন সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কেও আমার কোনও কৌতূহল নাই। ইহা মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার আকর্ষণ। এমনইভাবে খ্রীস্টের ব্যক্তিত্বের প্রতিও আমার আকর্ষণ আছে।

আমি রাজপথে এবং বিহারে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখিয়াছি, সকলেই তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে। তাঁহাদের প্রায় সকলের মুখেই ধীর শান্তির আভাস, জগতের দুঃখ দুশ্চিন্তার প্রতি এক অনাসক্তির ভাব। ইঁহাদের মুখমণ্ডলে বুদ্ধির দীপ্তি নাই, মানসিক তীব্র সংগ্রামের কোনও চিহ্ন নাই, ইঁহাদের জীবন যেন স্বচ্ছন্দগতি তটিনীর মত মৃদুভাবে মহাসমুদ্রে বহিয়া চলিয়াছে। আমি তাঁহাদিগকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখিতাম, ঐরূপ প্রশান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা হইত, কিন্তু আমি নিশ্চিত-

র্পেই জানি যে, আমার ভাগ্য ভিন্নর্প, ঝটিকা ও উত্তাল তরঙ্গমালার উপাদানে আমি গঠিত। আমার জন্য এতটুকু শান্তি নাই, বাহিরের মতই আমার অন্তরে ঝটিকা গর্জিয়া উঠে, তরঙ্গমালা দ্লিতে থাকে। যদি দৈবক্রমে আমি নিরাপদ অন্তরাল খ্ঁজিয়া পাই, যেখানে উন্মত্ত বায়্ প্রবেশ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে কি আমি আত্মতৃপ্ত ও স্খী হইব?

কিছ্কালের জন্য নিরালা গৃহকোণ অতি প্রীতিপ্রদ, নিশ্চিন্তে শ্ইয়া স্বপ্ন-বিলাসিতা, প্রকৃতির মোহময় যাদ্মন্ত্রে ভুলিয়া থাকা ভাল লাগে। আমার মনোভাবের সহিত সিংহল যেন মিশিয়া গিয়াছিল। এই দ্বীপের সৌন্দর্যে আমি ম্গ্ধ হইলাম। আমাদের ছ্টির মাস ফ্রাইয়া গেল, অত্যন্ত দ্ঃখের সহিত আমরা বিদায় লইলাম। সেই মনোরম ভূমির এবং অধিবাসিগণের কত স্মৃতি এই কারাগারের দীর্ঘ শ্ন্যময় দিনগ্লিতে ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া মনে পড়ে। জাফ্নার একটি ক্ষ্দ্র ঘটনার স্মৃতি মনে আছে। একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রেরা আমাদের গাড়ী থামাইয়া কয়েকটি সদয় বচনে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। উদ্গ্রীব ও উজ্জ্বল ম্খে বালকেরা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্য হইতে একজন অগ্রসর হইয়া আমার হস্ত ধারণ করিল, সে প্রশ্ন করিল না, তর্ক তুলিল না, আমার ম্খের দিকে চাহিয়া কেবল বলিল,—'আমি টলিব না।' সেই কমনীয় কিশোর ম্খ, উজ্জ্বল চক্ষ্, দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভঙ্গী আমার মনে ম্দ্রিত রহিয়াছে। সে কে, আমি জানি না, তাহার পরিচয়ও পরে খ্ঁজিয়া পাই নাই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে তাহার কথা রক্ষা করিবে এবং যখন জীবনের কঠিন সমস্যাগ্লির সম্ম্খীন হইবে তখন সে টলিবে না।

সিংহল হইতে আমরা কন্যাকুমারী হইয়া দক্ষিণ ভারতে আসিলাম। তারপর ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মালাবার, মহীশ্র, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি দেখিলাম। এগ্লি অধিকাংশই দেশীয় রাজ্য, কতকগ্লি উন্নতিশীল, কতকগ্লি এখনও বহ্লাংশে পশ্চাৎপদ। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন শিক্ষার দিক দিয়া ব্রিটিশ ভারত হইতেও অগ্রসর। মহীশ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া অগ্রগামী। হায়দ্রাবাদ সামন্ততন্ত্রের নিখ্ঁত দৃষ্টান্ত। আমরা সর্বত্রই কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের নিকট হইতে সৌজন্যপ্র্ণ ব্যবহার ও অভ্যর্থনা পাইয়াছি। কিন্তু আমরা ব্ঝিতে পারিয়াছিলাম যে, কর্তৃপক্ষের বাহ্যসৌজন্যের অন্তরালে একট্ চিন্তাও ছিল, ব্ঝি-বা আমাদের সংস্পর্শে আসিয়া লোকে বিপজ্জনকভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। মনে হইল, মহীশ্র ও ত্রিবাঙ্কুরে তখন জনসাধারণকে কিছ্ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক কার্য করিবার স্যোগ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু হায়দ্রাবাদে ইহা কিছ্মাত্র নাই। এবং আমাদের চারিদিকে সৌজন্যপ্র্ণ ব্যবহারের মধ্যেও অন্ভব করিলাম যে, হায়দ্রাবাদ র্দ্ধকণ্ঠ, শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতেও ভীত। পরে অবশ্য মহীশ্র ও ত্রিবাঙ্কুর গভর্নমেণ্টও তাহাদের প্র্বদত্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক কার্যের অধিকার প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

মহীশ্র রাজ্যের বাঙ্গালোরে বৃহৎ জনতার সম্ম্খে আমি এক স্-উচ্চ লৌহদণ্ডের উপর জাতীয় পতাকা উত্তীন করিয়াছিলাম। আমার প্রস্থানের কিছ্দিন পরেই সেই লৌহদণ্ডটি ট্ক্রা ট্ক্রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল এবং মহীশ্র গভর্নমেণ্ট জাতীয় পতাকা উত্তীন করা অপরাধ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। আমি যে পতাকা উত্তীন করিয়াছিলাম তাহার প্রতি দ্র্ব্যবহার ও অপমানে আমি অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছিলাম।

ত্রিবাঙ্কুরে এখনও কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত এবং কেহ

কংগ্রেসের সদস্য হইতে পারে না। যদিও আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবার পর ব্রিটিশ ভারতে ইহা বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এইরূপে মহীশূরে ও ত্রিবাঙ্কুরে সাধারণ শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কার্যও দমন করা হইয়াছে এবং পূর্বপ্রদত্ত কিছু সুবিধা পুনরায় কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। ইহারা পিছু হটিয়া চলিয়াছে। হায়দ্রাবাদের পক্ষে অবশ্য পিছু হটিবার কি সুবিধা কাড়িয়া লইবার কোনও কথাই উঠে না। কেন না, ইহা কোন দিনই একপদও অগ্রসর হয় নাই কিম্বা কোনও সুবিধা জনসাধারণকে দেয় নাই। হায়দ্রাবাদে রাজনৈতিক সভা বলিয়া কেহ কিছু জানে না, এমন কি, সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক সম্মেলনগুলিও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং ঐ গুলির জন্যও পূর্ব হইতে বিশেষ অনুমতি লইতে হয়। সংবাদপত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহার একখানিও এখানে নাই এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতেও বহু সংবাদপত্র দূষিতভাব আমদানী হইবার ভয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। এই নিয়ম এত কঠোর যে, মডারেটগণ-পরিচালিত কাগজেরও প্রবেশাধিকার নাই। কোচিনে আমরা 'শ্বেতকায় ইহুদীদের' অঞ্চল এবং তাহাদের এক প্রাচীন উপাসনালয়ে প্রার্থনাদি দেখিলাম। এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় অতি প্রাচীন এবং অনন্যসাধারণ। ইহাদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। আমরা শুনিলাম, কোচিনের যে অংশে ইঁহারা বাস করেন তাহার সহিত প্রাচীন জেরুজালেমের সাদৃশ্য আছে। ইহা যে প্রাচীন তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।

মালাবারের কয়েকটি সহরে আমরা প্রাচীন সিরিয়ান খৃষ্টানদিগের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করিলাম। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই ইউরোপ খৃষ্টান হইবার বহু পূর্বেই ভারতে খৃষ্টধর্ম আসিয়াছিল এবং দক্ষিণ ভারতে উহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতি অল্প লোকেরই এ বিষয়ে ধারণা আছে। যদিও এই সকল খৃষ্টানের ধর্মগুরু এণ্টিয়ক বা সিরিয়ার অন্য কোনও স্থানে থাকেন, তথাপি ইহাদের খৃষ্টান ধর্ম কার্যতঃ লৌকিক ব্যাপার এবং বাহিরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই।

দক্ষিণ ভারতে নেষ্টোরিয়ানদের একটি উপনিবেশ দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হইলাম। তাহাদের বিশপের নিকট শুনিলাম যে, ইহারা সংখ্যায় দশ সহস্র হইবে। আমার ধারণা ছিল, নেষ্টোরিয়ানরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত অনেক দিন মিশিয়া গিয়াছে, ভারতে যে তাহাদের অস্তিত্ব আছে, আমার এ ধারণাও ছিল না। আমি শুনিলাম, এক সময় ভারতে তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল, এমন কি, উত্তর ভারতের কাশী পর্যন্ত তাহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

আমরা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এবং তাঁহার কন্যাদ্বয় পদ্মজা ও লীলামণির সহিত দেখা করিবার জন্যই হায়দ্রাবাদ গিয়াছিলাম। তাঁহাদের গৃহে অবস্থান-কালীন পর্দানসীন মহিলাদের একটি ছোট বৈঠক আহূত হয়। আমার স্ত্রীর সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দেওয়াই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য। কমলা এই বৈঠকে কিছু বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি নারীজাতির স্বাধীনতা ও মনুষ্য রচিত আইন ও প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (তাঁহার প্রিয় আলোচ্য বিষয়) সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে কখনও পুরুষের অতিরিক্ত বাধ্য হওয়া ভাল নয়। দুই কি তিন সপ্তাহ পর এই বক্তৃতার এক কৌতুককর পরিণতির সংবাদ পাইয়াছিলাম। একজন বিভ্রান্ত স্বামী হায়দ্রাবাদ হইতে কমলার নিকট পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি ঐ সভায় আসার পর হইতে আমার স্ত্রীর ব্যবহার অতি দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আমার কথা শুনেন না, পূর্বের মত আমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন না বরং উল্টা তর্ক সুরু করেন এবং সময় সময় অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠেন।"

যে বোম্বাই হইতে সমুদ্রপথে সিংহল গিয়াছিলাম, সেই বোম্বাই-এ এই সাত সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিলাম এবং তৎক্ষণাৎ কংগ্রেসের রাজনীতিতে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্রুত পরিবর্তন, যুক্ত প্রদেশের কৃষক-অসন্তোষ, আব্দুল গফুর খানের নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশে লালকুর্তা দলের অভূতপূর্ব বিস্তার, বাংলার রুদ্ধ অসন্তোষ অশান্তি প্রবল মানসিক উত্তেজনা, নিত্য বর্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা, স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহ, কংগ্রেসকর্মী ও গভর্ণমেন্ট কর্মচারীদের মধ্যে নানা বিষয় লইয়া মতভেদ এবং পরস্পরের প্রতি দিল্লী-চুক্তি ভঙ্গ করিবার অভিযোগ। আলোচনার বিষয়ের অভাব ছিল না। তার পর সেই পৌনঃপুনিক প্রশ্ন, কংগ্রেস দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে কি-না? মহাত্মার কি যাওয়া উচিত?

৩৭

সন্ধিকালের সংঘর্ষ

গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য গান্ধিজী লণ্ডনে যাইবেন কি-না? পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত হইল না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কি ঘটিবে, তাহা কার্যকরী সমিতি, এমন কি, গান্ধিজীও জানিতেন না। ঘটনারাজির সংঘাতে অবস্থার নিত্য নূতন পরিবর্তন এবং আরও অনেক বিষয়ের উপর এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে। অতি জটিল সমস্যা-গুলিও এই প্রশ্নোত্তরের সহিত জড়িত ছিল।

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এবং তাহাদের বন্ধুগণ আমাদিগকে বারম্বার বলিতে লাগিলেন যে, গোল টেবিল বৈঠকে শাসনতন্ত্রের কাঠামো তৈয়ারী করা হইয়াছে, প্রধান প্রধান সীমারেখাগুলিও টানা হইয়াছে, এখন উহার মধ্যে যেখানে যাহা আঁকিতে হইবে তাহাই বাকী। কিন্তু কংগ্রেসের মনে এরূপ ধারণা ছিল না, তাঁহাদের বিশ্বাস প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পুনরায় নূতন করিয়া আঁকিতে হইবে। দিল্লী-সন্ধি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি ও কিছু কিছু রক্ষাকবচ স্বীকার করা হইয়াছে, ইহা সত্য, আমরা অনেকেই মনে করিতাম যে, ভারতের শাসনতন্ত্রগত সমস্যার যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শই সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসা; কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে, প্রথম গোল টেবিল বৈঠক-নির্দিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করিব। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক পরিবর্তনের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সঙ্গতি রহিয়াছে। কিন্তু রক্ষাকবচগুলির সহিত উহার সঙ্গতি রক্ষা করা অতি কঠিন। কেন না, সাধারণভাবেই উহা রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করিবে, যদিও 'ভারতের স্বার্থের জন্য' কথাটি জুড়িয়া দেওয়ায় কিছু সুবিধা হইয়াছে, তথাপি সম্ভবতঃ উহা বিশেষ কার্যকরী হইবে না। যাহা হউক, করাচী কংগ্রেস স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছিল যে, নূতন শাসনতন্ত্রে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, রাজস্ব ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দিতে হইবে। ভারতের বৈদেশিক ঋণ (অধিকাংশই ব্রিটিশ) সমস্যা পরীক্ষা ও আলোচনার পর উহার দায়িত্ব গ্রহণ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবে ঈপ্সিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রস্তাব ছিল। এ সকলই গোল টেবিল বৈঠকের

অনেক সিদ্ধান্ত ও ভারতের প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ও কংগ্রেসের মতের দুস্তর ব্যবধান ছিল; এই অবস্থায় উহার সংযোগ-সাধন সম্ভবপর নহে বলিয়াই অনুমিত হইল। গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের সহিত গভর্ণমেন্টের ঐক্যমত হইতে পারে, এমন প্রত্যাশা কংগ্রেসপন্থীদের মনে প্রায় ছিল না। গান্ধিজীর মত আশাবাদীও অধিক প্রত্যাশার কিছু দেখিলেন না। কিন্তু তিনি নিরাশ হইলেন না, শেষ পর্যন্ত দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমরাও মনে করিলাম সফল হই আর না হই দিল্লী-সন্ধি অনুসারে আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এমন দুইটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় দেখা দিল, যাহার ফলে আমাদের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। আমাদের মতামত সমগ্রভাবে বৈঠকে উপস্থিত করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে আমরা যাইতে পারি, পূর্বেই বৈঠকে উহা আলোচনা হইয়াছে এইরূপ অজুহাত বা অন্যান্য কারণ দর্শাইয়া আমাদিগকে কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বাধা দেওয়া না হয়। ভারতের অবস্থাও এরূপ দাঁড়াইতে পারে যে, আমাদের বৈঠকে যাওয়া ঘটিয়া উঠিবে না। এমন হইতে পারে যে, গভর্ণমেন্টের সহিত আমাদের সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিবে এবং আমরা তীব্র দমননীতির সম্মুখীন হইব। যদি ঘরে আগুন লাগিয়া উঠে, তবে তাহা ভুলিয়া আমাদের প্রতিনিধি লণ্ডনে বসিয়া শাসনতন্ত্র লইয়া তত্ত্বালোচনায় ব্রতী থাকিবেন, ইহা অসম্ভব।

ভারতে অবস্থা অতি দ্রুত মন্দ হইতে লাগিল। দেশের সর্বত্র বিশেষভাবে বাঙ্গলা, যুক্ত-প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। বাঙ্গলায় দিল্লী-সন্ধির ফলে বিশেষ কোন পরিবর্তনই হয় নাই; মন কষাকষি ক্রমেই গুরুতর হইতে লাগিল। আইন অমান্য আন্দোলনের অনেক বন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সহস্র সহস্র রাজনৈতিক বন্দীকে সামান্য কারণে আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দী নহে বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল না। অন্তরীণে আবদ্ধ ব্যক্তিরা বাহিরে নির্দিষ্ট স্থানে অথবা বন্দীশালায় আটক রহিল। 'সিদিসানীয়' বক্তৃতা বা অন্যান্য রাজনৈতিক কার্যের জন্য গ্রেফ্‌তার চলিতে লাগিল এবং দেখা গেল, গভর্ণমেন্টের আক্রমণ সমানভাবেই চলিতেছে। টেরোরিজম্-এর জন্য বাঙ্গলার সমস্যা কংগ্রেসের নিকট অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিল। আইন অমান্য আন্দোলন ও সাধারণ রাজনৈতিক কার্যের তুলনায়, গুরুত্ব ও বিস্তৃতির দিক দিয়া টেরোরিস্ট কার্যপ্রণালী অতি তুচ্ছ। কিন্তু ইহা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হওয়ায় লোকের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এবং ইহার ফলে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানে কংগ্রেসের কার্য-পরিচালনা করা বিঘ্নসঙ্কুল ছিল, কেন না, টেরোরিজম-এর আবহাওয়া, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক শান্তিপূর্ণ কার্যপ্রণালীর প্রতিকূল। ইহার ফলে গভর্ণমেন্ট দমননীতিকে তীব্র করিয়া তুলিলেন এবং তাহার আঘাত নিরপেক্ষভাবে টেরোরিস্ট, অ-টেরোরিস্ট সকলের উপরই পড়িতে লাগিল।

কংগ্রেসপন্থী, শ্রমিক ও কৃষক কর্মী এবং যাহাদের কার্য গভর্ণমেন্ট পছন্দ করেন না, তাহাদের বিরুদ্ধে বিশেষ আইন ও অর্ডিন্যান্সগুলি (টেরোরিস্টদের উদ্দেশ্যে রচিত) প্রয়োগ না করিয়া আত্মসম্বরণ করা পুলিশ ও স্থানীয় কর্মচারীদের পক্ষে কঠিন হইল। যে সকল বন্দী দীর্ঘকাল যাবৎ বিনা অভিযোগে, বিচার বা দণ্ড ব্যতিরেকেও আটক আছেন, তাঁহাদের অপরাধ সম্ভবতঃ টেরোরিজম সংক্রান্ত নহে, অন্য প্রকার কার্যকরী রাজনৈতিক প্রচেষ্টার জন্যই তাঁহারা বন্দী। তাঁহাদিগকে কোন কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার সুবিধা দেওয়া হয় নাই,

অথবা তাঁহাদের অপরাধ কি তাহাও জানিতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হয় নাই, সম্ভবতঃ পুলিশ এমন সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে নাই, যাহার ফলে তাঁহাদের দণ্ড হইতে পারে। অথচ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কিত, ব্রিটিশ ভারতের আইনগুলি এত নিখুঁত ও সর্বব্যাপী যে তাহার কবল হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন। এমন ঘটনাও ঘটে যে, কারাগার হইতে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তাহাকে ধরিয়া অন্তরীণে আবদ্ধ করে।

বাঙ্গলার এই জটিল সমস্যা লইয়া কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি নিজেদের অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। ইহা লইয়া তাঁহারা বিব্রত হইলেন, তাহার উপর বাঙ্গলা হইতে আরও অনেক বিষয় নানারূপে তাঁহাদের সম্মুখে আসিতে লাগিল। তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে, প্রকৃত সমস্যার তাঁহারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না। অতএব তাঁহারা দুর্বলভাবে ঘটনার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহাদের যে অবস্থা, তাহাতে তাঁহারা আর কি করিতে পারিতেন বলা কঠিন। কার্যকরী সমিতির এই মনোভাবে বাঙ্গলার চিত্তে অসন্তোষের সঞ্চার হইল এবং তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য প্রদেশ বাঙ্গলার প্রতি উদাসীন। বিপদের সময় যেন বাঙ্গলাকে সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত, সমগ্র ভারতের সহানুভূতি বাঙ্গলার প্রতি ছিল; কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করিবার পথ ছিল না। তা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও নিজেদের বিঘ্ন বিপদ ছিল।

যুক্তপ্রদেশে কৃষক-সমস্যা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমস্যা লইয়া প্রথমতঃ গা ভাসান দিলেন, রাজস্ব ও খাজনা মাপের সিদ্ধান্তে বিলম্ব করিতে লাগিলেন, তারপর জোর করিয়া আদায় সুরু হইল। পাইকারী-ভাবে উচ্ছেদ ও ক্রোক চলিল। আমরা যখন সিংহলে ছিলাম, তখন জোর করিয়া খাজনা আদায় লইয়া দুই-তিন জায়গায় হাঙ্গামা হইল। ইহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার হইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে একস্থলে তাহার ফলে জমিদার অথবা তাহার গোমস্তার মৃত্যু হইল। গান্ধিজী নৈনীতালে গিয়া (আমি তখন সিংহলে) যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর স্যার ম্যালকম হেলীর সহিত কৃষক-সমস্যার আলোচনা করিলেন, কিন্তু বিশেষ ফল হইল না। গভর্ণমেণ্ট খাজনা মকুব করিলেন বটে, কিন্তু তাহা প্রত্যাশা অপেক্ষা অনেক কম এবং ক্রমাগত ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাড়িতে লাগিল। জমিদার ও গভর্ণমেণ্ট একত্র হইয়া কৃষকদের উপর চাপ দিতে লাগিলেন, সহস্র সহস্র কৃষককে জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইল, তাহাদের সামান্য সম্পত্তি ক্রোক করা হইল, যে অবস্থা হইল, তাহা অন্য দেশে হইলে এক বৃহৎ কৃষকবিদ্রোহে পর্যবসিত হইত। আমার বিশ্বাস, প্রধানতঃ কংগ্রেসের চেষ্টার ফলেই কৃষকেরা বলপ্রয়োগে বিরত ছিল। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ও জবরদস্তির অন্ত ছিল না।

কৃষকদের অসন্তোষ ও দুঃখ দুর্দশার একটা ভাল দিকও আছে। শস্যের মূল্য বহুল পরিমাণে হ্রাস হওয়ায় মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিরা এবং কৃষকেরা (যাহাদের জমি হইতে উচ্ছেদ করা হয় নাই) দীর্ঘকাল পর পেট ভরিয়া দুটি খাইতে পাইত।

বাঙ্গলার মতই সীমান্ত প্রদেশও দিল্লী-সন্ধির ফলে শান্তি পাইল না। উভয় পক্ষের মনোমালিন্য সর্বদাই প্রবল, কেন না, এখানে গভর্ণমেণ্ট সমর বিভাগীয় ব্যাপার; বহুতর বিশেষ আইন ও অর্ডিন্যান্সের ছড়াছড়ি এবং সামান্য অপরাধেও

গুরুদণ্ড হয়। এই অবস্থার বিরুদ্ধে আব্দুল গফুর খাঁ আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ফলে তিনি গভর্ণমেণ্টের চক্ষুশূল হইয়া উঠিলেন। সেই ছয় ফিট তিন ইঞ্চি উচ্চ দীর্ঘ সমুন্নত পাঠান-পৌরুষের মূর্তি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সর্বত্র লালকুর্তা বাহিনীর কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। তিনি ও তাঁহার কর্মীরা দেশের সর্বত্র "খুদাই খিদমতগার"-এর শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহাদের আন্দোলন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, অস্পষ্ট অভিযোগ ছাড়া একটিও বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইতে পারেন নাই। ইহারা শান্তিকামী হউক আর নাই হউক, যুদ্ধ ও হিংসার পারম্পর্য পাঠানদের আছে। তাহার উপর অতি নিকটেই দুর্ধর্ষ পাঠান উপজাতিরা রহিয়াছে, কাজেই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া এই সুশৃঙ্খলিত আন্দোলন দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট বিচলিত হইলেন। ইহাদের শান্তি ও অহিংসার আদর্শ গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিয়াছিলেন, আমার এরূপ মনে হয় না। যদি বিশ্বাসও করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহারা প্রতিক্রিয়ার মুখে বিরক্ত ও ভীত হইতেন। এই আন্দোলনের বর্তমান ও ভাবী শক্তির সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহাদের মাথা ঠিক রাখা কঠিন হইল।

এই বিরাট আন্দোলনের অবিসম্বাদী নেতা আব্দুর গফুর খাঁ—"ফকর্-ই-আফগান," "ফকর-ই-পাঠান," (পাঠান গৌরব) "গান্ধী--ই-সারহাদ" অর্থাৎ সীমান্ত-গান্ধী নামে—সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত। বিঘ্ন বিপদ ও গভর্ণমেণ্টের বিরোধিতায় অটল থাকিয়া তিনি ধীরতা ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য করিয়া সীমান্ত প্রদেশে অপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। রাজনীতিক বলিতে সচরাচর যাহা বুঝায় তিনি তাহা ছিলেন না, রাজনীতির ছলা-কলা তাঁহার অজ্ঞাত। দীর্ঘকায় সরল মানুষ, দেহ ও মন দুই-ই সরল, তিনি হুজুগ্ ও বাচালতা দুই-ই ঘৃণা করেন; তিনি ভারতের স্বাধীনতার সহিত সীমান্তপ্রদেশের স্বাধীনতা চাহেন; কিন্তু শাসনতন্ত্রঘটিত আইনের জটিল প্রশ্নের প্রতি উদাসীন। তবে কিছু লাভ করিতে হইলে কার্য আবশ্যক, তাই তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী হইয়া শান্তিপূর্ণ উপায় গ্রহণ করিয়াছেন। কার্যের জন্য সঙ্ঘ আবশ্যক, যুক্তিতর্ক নিয়মকানুন রচনা লইয়া মাথা না ঘামাইয়া তিনি সোজাসুজি সঙ্ঘ গঠন আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সাফল্য লাভ করিলেন।

গান্ধিজীর প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি স্বাভাবিক লজ্জা ও বিনয়বশতঃ কোন ব্যাপারেই সম্মুখে আসিতেন না এবং গান্ধিজী হইতে দূরে থাকিতেন। পরে নানা বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়া তাঁহাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। আমাদের অনেকের অপেক্ষাও অধিকতর নিষ্ঠার সহিত এই পাঠান যে অহিংসার আদর্শ গ্রহণ করিলেন, ইহা অতীব বিস্ময়কর। এই আত্মবিশ্বাস বলেই তিনি পাঠানদিগকে উত্তেজনার কারণের সম্মুখেও শান্তিপূর্ণ থাকিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তবে সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা হিংসা বা বলপ্রয়োগের ভাব একেবারেই ত্যাগ করিয়াছে একথা বলা হাস্যকর; অন্যান্য প্রদেশের সাধারণ লোকদের সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা বলা হাস্যকর। জনতা ভাবাবেগেই চালিত হয়, উত্তেজনার মুহূর্তে তাহারা কি করিয়া বসিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তথাপি ১৯৩০-এ এবং পরে সীমান্তের অধিবাসীরা অতি আশ্চর্য সংযম ও শৃঙ্খলা দেখাইয়াছিল।

সরকারী কর্মচারী এবং আমাদের দেশের নিরীহ ভদ্রলোকেরা সীমান্ত-গান্ধীকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের কথা কেহই বিশ্বাস

করিলেন না, একটা গভীর ষড়যন্ত্র কল্পনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি এবং সীমান্তের সহকর্মীরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেসকর্মীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন; ফলে সকলের মধ্যে প্রীতি ও সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় হইয়াছে। কংগ্রেস মহলে আব্দুল গফুর খাঁ সুপরিচিত ও জনপ্রিয়। একজন ব্যক্তিবিশেষ সহকর্মীরূপে নহে, ভারতের দৃষ্টিতে তিনি আমাদের সহিত একই সংগ্রামে লিপ্ত এক সাহসী ও দুর্ধর্ষ জাতির শৌর্য ও ত্যাগের প্রতীকমূর্তিরূপে প্রতিভাত।

আব্দুল গফুর খাঁর কথা শুনিবার বহুপূর্বে আমি তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ খাঁ সাহেবকে চিনিতাম। আমি যখন কেমব্রিজে, তিনি তখন লণ্ডন সেণ্ট-টমাস হাসপাতালের ছাত্র। পরে যখন আমি ইনার টেম্পলে ব্যারিস্টারীর খানা খাইতে সুরু করিলাম, তখন তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়। লণ্ডনে প্রায় প্রত্যহই আমরা মিলিত হইতাম। আমি ভারতে ফিরিবার পরও তিনি অনেক বৎসর ইংলণ্ডে ছিলেন, যুদ্ধের সময় চিকিৎসকরূপে কাজ করিয়াছিলেন। পরে নৈনী জেলে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়।

সীমান্তের 'লাল কুর্তাদল' কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিলেও তাহাদের প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্র ছিল। কংগ্রেস ও তাহাদের মধ্যে আব্দুল গফুর খাঁ ছিলেন যোগসূত্র। সীমান্তের জননায়কদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্যকরী সমিতি ১৯৩১-এর গ্রীষ্মকালে 'লাল কুর্তাদল'কে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। তাহার পর হইতে 'লালকুর্তা' আন্দোলন কংগ্রেসের অংশরূপে পরিগণিত হইল।

করাচী কংগ্রেসের পর গান্ধিজী সীমান্ত প্রদেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইহাতে উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন না। পরে কয়েকমাস ধরিয়া সরকারী কর্মচারীরা লাল কুর্তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ক্রমাগত যখন অভিযোগ করিতে লাগিলেন, তখনও গান্ধিজী বারম্বার সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশের অনুমতি চাহিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। আমাকেও সেখানে যাইতে দেওয়া হইল না। দিল্লী-সন্ধি অনুযায়ী, গভর্ণমেণ্টের স্পষ্ট অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে সীমান্ত যাওয়া আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না।

এ সকল ছাড়াও সাম্প্রদায়িক সমস্যা কার্যকরী সমিতির সম্মুখে এক প্রধান সমস্যা। যদিও ইহা নানা অদ্ভুত বেশে ও রূপে বারবার আবির্ভূত হয়, তথাপি ইহার মধ্যে নূতন কিছুই নাই। গোলটেবিল বৈঠকে ইহার মর্যাদা কিছু বাড়িয়াছিল; ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা ইহাকেই মুখ্য করিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। বৈঠকের সদস্যগণ সকলেই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত। এই মনোনয়ন এমন ভাবে করা হইয়াছিল যে, সকলেই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের কথা, বিশিষ্ট স্বার্থের কথা এবং সাধারণ বৃহত্তর স্বার্থের পরিবর্তে পরস্পরের মতভেদের কথাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, গভর্ণমেণ্ট কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে প্রতিনিধি মনোনীত করিতে নিতান্ত উগ্রভাবে সোজা-সুজি অস্বীকার করিয়াছিলেন। গান্ধিজী অনুভব করিলেন, যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নির্দেশে বৈঠক প্রথম হইতেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার জালে জড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি লইয়া সম্যক আলোচনা সম্ভবপর হইবে না। এই অবস্থায় তাঁহার বৈঠকে যোগদান করায় বিশেষ কোন ফল হইবে না। তিনি কার্যকরী সমিতির সম্মুখে প্রস্তাব করিলেন যে, বিভিন্ন দলের মধ্যে পূর্ব হইতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ও বোঝাপড়া হইলে তিনি

লণ্ডনে যাইতে পারেন। তিনি ঠিক সিদ্ধান্তই করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্যকরী সমিতি বলিলেন, তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই বলিয়া লণ্ডনে যাইবেন না এরূপ হইতে পারে না, এখন তাঁহার অস্বীকার করা উচিত নহে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া সমাধানের একটা খসড়া তৈরির একটা চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু বিশেষ সাফল্য লাভ করা গেল না।

১৯৩১-এর গ্রীষ্মকালে ঐ সকল প্রধান সমস্যা ছাড়াও অনেক ছোটখাট ব্যাপার লইয়া আমাদের বিব্রত হইতে হইল। দেশের নানা স্থান হইতে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলি আমাদিগকে ক্রমাগত সংবাদ দিতে লাগিলেন যে, স্থানীয় কর্মচারীরা দিল্লী-চুক্তি ভঙ্গ করিতেছেন। ইহার মধ্যে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বাছিয়া লইয়া আমরা গভর্ণমেণ্টকে জানাইতে লাগিলাম। গভর্ণমেণ্ট আবার কংগ্রেসপন্থীদের বিরুদ্ধে সন্ধি-বিরোধী কার্যের পাল্টা অভিযোগ করিতে লাগিলেন। ঐরূপ পরস্পরের দোষ প্রদর্শন চলিতে লাগিল, পরে উহা সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। বলাবাহুল্য, ইহাতে কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্টের সম্পর্কের কোন উন্নতি হইল না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া এই কলহের বাহ্যতঃ কোন গুরুত্ব নাই। কিন্তু ইহার মূলে রহিয়াছে এক গভীর সংঘর্ষ, যাহার উপর ব্যক্তির কোন হাত নাই। যাহার উৎপত্তি আমাদের জাতীয় আলোড়ন হইতে, পল্লীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয় হইতে, মূল ভিত্তিতে পরিবর্তন না করিয়া তাহার নিরসন অসম্ভব। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয়, মধ্যশ্রেণীর আত্মবিকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজিবার আগ্রহ হইতে, তাহার পশ্চাতে ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেরণা। ইহা পরে নিম্নমধ্যশ্রেণীতে প্রসারিত হইয়া শক্তিশালী হইল। তারপর যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য চরমসীমায় পৌঁছিয়াছে, সেই জনসাধারণের মধ্যে ইহা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। পল্লীর প্রাচীন আত্মতৃপ্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে। কৃষিকার্যের পরিপূরক কুটীর-শিল্প, যাহার ফলে জমির উপর এত চাপ পড়িত না, তাহা কতক পরিমাণে শাসননীতির জন্য, বেশীর ভাগ আধুনিক যুগের কলকারখানার প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। জমির উপর চাপ বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই তুলনায় ভারতে কল-কারখানা গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া অবস্থার বিশেষ তারতম্য হয় নাই। আত্মরক্ষার উপযুক্ত উপকরণহীন, দুর্বহ-ভার পীড়িত পল্লীগুলি জগতের পণ্যশালার আঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সমান সর্তে ইহা প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। পল্লীর উৎপাদন-প্রণালী আদিম যুগের এবং ভূমিসংক্রান্ত প্রচলিত ব্যবস্থার ফলে জমি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত হইয়াছে যে, কোন উন্নততর ব্যবস্থায় প্রবর্তন অসম্ভব। কাজেই কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা—জমিদার রায়তের অবস্থা (কয়েক বৎসরের তেজী বাজার ছাড়িয়া দিলে) দিন দিন শোচনীয় হইতেছে। জমিদার তাহার বোঝা রায়তদের ঘাড়ে চাপাইতেছেন এবং কৃষকদের ক্রমবর্ধিত দারিদ্র্য—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদার, জোতদার ও রায়ত—সকলকেই জাতীয় আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করিতেছে। পল্লী-অঞ্চলের বহুসংখ্যক ভূমিহীন কৃষি-মজুরও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। এই সকল পল্লীবাসীরা 'জাতীয়তা' ও 'স্বরাজ' বলিতে ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন বুঝে;—অর্থাৎ তাহাদের খাজনা ও উদ্ধার করিবে এবং ভূমিহীনেরা জমি ফিরিয়া পাইবে। অবশ্য, কি কৃষক সম্প্রদায় কি জাতীয় আন্দোলনের মধ্যশ্রেণীর নেতাগণ, কাহারও মনে এই আকাঙ্ক্ষার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই।

১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই জগদ্ব্যাপী কৃষি ও বাণিজ্য সঙ্কট দেখা দিল। এই মন্দার প্রথম চোট পড়িল পল্লীবাসীদের উপর, তাহারা কংগ্রেস ও আইন অমান্যের দিকে ঝুঁকিল। তাহাদের নিকট ইহা লণ্ডন বা অন্যত্র বসিয়া সূক্ষ্ম শাসনতন্ত্র রচনার সমস্যা নহে, তাহারা ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন (বিশেষতঃ জমিদারী অঞ্চলে) প্রত্যাশা করিতে লাগিল। জমিদারী প্রথার দিন গিয়াছে, ইহার আর নিজের পায়ে দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বর্তমান অবস্থায় ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিতে সাহস পান না। যখন কৃষি তদন্তের জন্য রয়াল কমিশন নিযুক্ত হয়, তখন জমির স্বত্ব স্বামিত্ব এবং ভোগদখলের ব্যবস্থা ইত্যাদি আলোচনা ও অনুসন্ধান করিবার ভার দেওয়া হয় নাই।

অতএব ভারতবর্ষে সংঘর্ষের সমস্ত কারণই বিদ্যমান এবং ইহাকে কোন মন্ত্রবলে অথবা আপোষ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ভূমিসংক্রান্ত মুখ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন (অন্যান্য জরুরী জাতীয় সমস্যা ছাড়াও) ব্যতীত এই সংঘর্ষ দূর হইবে না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মারফৎ ইহার সমাধানের কোন সম্ভাবনাই নাই। সাময়িক ব্যবস্থায় কিয়ৎকালের জন্য দুর্দশার লাঘব হইতে পারে, তীব্র দমননীতির বলে ভীতি উৎপাদন করিয়া ইহার বহিঃপ্রকাশ বন্ধ করা যাইতে পারে,—কিন্তু তাহাতে সমস্যা সমাধানের কোন সুবিধা হয় না।

আমার ধারণা, অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের মতই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও মনে করেন, ভারতের অধিকাংশ অশান্তি উপদ্রবের জন্য "এজিটেটর" বা আন্দোলনকারীরাই দায়ী। ইহার মত ভ্রান্ত ধারণা আর নাই। গত পনর বৎসর ধরিয়া ভারত এমন একজন নেতা পাইয়াছে, যিনি কোটি কোটি লোকের ভালবাসা ও শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন এবং যিনি অনায়াসে নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা ভারতবর্ষকে চালিত করিতে পারেন। তিনি ভারতের বর্তমান ইতিহাস রচনা করিতেছেন, কিন্তু এই ইতিহাসে তাঁহার অপেক্ষা যাহারা তাঁহার ইঙ্গিত প্রায় অন্ধভাবে গ্রহণ করিয়াছে, সেই জনসাধারণের গুরুত্ব অধিক। জনসাধারণই প্রধান অভিনেতা, ঐতিহাসিক প্রয়োজনের প্রেরণাই তাহাদিগের মধ্যে অগ্রগতি সঞ্চার করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের নেতার বিষাণধ্বনি শুনিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার পট-ভূমিকায় ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ না হইলে কোন নেতা কোন "এজিটেটর" তাহাদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না। নেতা হিসাবে গান্ধিজীর এক প্রধান গুণ এই যে, তিনি জনসাধারণের নাড়ীর গতি উত্তমরূপে বুঝেন এবং জানেন যে, কখন কার্য আরম্ভ করিবার সুসময়।

১৯৩০-এ ভারতের জাতীয় নেতাদের অজ্ঞাতসারে আন্দোলন দেশের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই আবির্ভূত হইয়াছিল এবং সেই সকল শক্তির বাস্তব অনুভূতির ফলেই ইহা ইতিহাসের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। কংগ্রেসই জাতীয় আন্দোলনের প্রতিনিধিরূপে কার্য করিয়াছে এবং ইহার শক্তি-সামর্থ্যের স্বরূপ কংগ্রেসের বহুবর্ধিত মর্যাদার মধ্যেই প্রতিফলিত হইয়াছে। জাতীয় আন্দোলনে বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ স্পষ্ট দেখা যায় না, হিসাব করা যায় না, নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে প্রকাশ করা যায় না, তথাপি ইহা সর্বত্রই প্রকটিত। কৃষক সম্প্রদায় কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া ইহার শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল, নিম্নমধ্যশ্রেণী ছিল কংগ্রেসের মেরুদণ্ড এবং ইহার সৈন্যসামন্ত। এমন কি উচ্চশ্রেণীর বুর্জোয়ারা নূতন অবস্থায় পড়িয়া কংগ্রেসের সহিত বন্ধুতা রক্ষা করাই নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন। ভারতের

অধিকাংশ কাপড়ের কলওয়ালারাই কংগ্রেসের নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, কংগ্রেস অসন্তুষ্ট হয় এমন কার্য করিতেন না।

যখন পণ্ডিতেরা লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে বসিয়া আইনের সূক্ষ্ম তর্কে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেস অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, কংগ্রেসের শক্তি সম্পর্কে এই ধারণা দিল্লী-সন্ধির পরেও বাড়িয়াছে, তাহার কারণ শূন্যগর্ভ আস্ফালনপূর্ণ বক্তৃতা নহে; ১৯৩০ এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাতেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। একমাত্র কংগ্রেসের নেতারাই সম্মুখের আগতপ্রায় বিঘ্ন ও বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং কোনটিই তাঁহারা ছোট করিয়া দেখেন নাই।

দেশের মধ্যে পাশাপাশি দুটি কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতে চলিয়াছে, এই অস্পষ্ট ধারণায় গভর্ণমেণ্ট বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলেন। এই ধারণার স্থান বাস্তব ভিত্তি ছিল না, কেননা বাহুবল সম্পূর্ণরূপে কর্তৃপক্ষের আয়ত্তে, তবে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার অস্তিত্ব ছিল নিঃসন্দেহ। প্রভুত্বপ্রবণ ও জনমতের নিকট দায়িত্ব-হীন গভর্ণমেণ্টের নিকট ইহা অসহ্য এবং তাঁহাদের স্নায়বিক উত্তেজনা ইহাতে বাড়িয়া গেল ও পরে তাঁহারা যে কতকগুলি গ্রাম্য বক্তৃতা বা শোভাযাত্রার দোষ দিয়াছিলেন তাহা কথার কথা মাত্র। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। কংগ্রেসও আত্মহত্যা করিতে পারে না, গভর্ণমেণ্টও দ্বৈত কর্তৃত্বের আবহাওয়া বরদাস্ত করিতে না পারিয়া কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকের জন্য সংঘর্ষ মুলতুবী রাখা হইল। যে কোন কারণেই হউক, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট গান্ধিজীকে লণ্ডনে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, ইহার বিঘ্ন হয় এমন কিছু কাজ তাঁহারা যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

ক্রমে বিরোধের ভাব বাড়িতে লাগিল, গভর্ণমেণ্ট যে ক্রমশঃ কঠিন হইতেছেন ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম, দিল্লী-সন্ধির অব্যবহিত পরেই লর্ড আরুইন ভারত ত্যাগ করিলেন এবং লর্ড উইলিংডন বড়লাট হইয়া আসিলেন। গুজব প্রচারিত হইল, নূতন বড়লাট অত্যন্ত কড়া ও শক্তলোক এবং তাঁহার পূর্বগামীর মত আপোষ-প্রবণতা তাঁহার নাই। নীতির দিক হইতে না দেখিয়া ব্যক্তির দিক হইতে রাজনীতি চিন্তা করিবার মডারেটদের অভ্যাস, আমাদের অনেক রাজনীতিক উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রশস্ত সাম্রাজ্যনীতি বড়লাটের ব্যক্তিগত মতের উপর নির্ভর করে না। বড়লাটের পরিবর্তনে কোন পার্থক্য হয় নাই, হইতও না; ঘটনার গতিপথেই গভর্ণমেণ্টের নীতি পরিবর্তিত হইয়াছে। সিভিলিয়ান-তন্ত্র কখনও এই সকল সন্ধি-চুক্তি, কংগ্রেসের সহিত আদানপ্রদান অনুমোদন করেন নাই। কেন না তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা, প্রভুত্বমূলক গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কিত ধারণা ইহার বিরোধী। তাঁহাদের ধারণা হইল যে, সমকক্ষভাবে ব্যবহার করিয়া তাঁহারা কংগ্রেস ও গান্ধিজীর প্রভাব ও মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছেন, এখন দুই এক ধাপ নামাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই ধারণা অত্যন্ত নির্বোধ, কিন্তু তাহা না হইলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ধারণার মৌলিকতার খ্যাতি থাকে কি করিয়া? যে কোন কারণেই হউক, গভর্ণমেণ্ট খাড়া হইয়া কোমর বাঁধিলেন, এবং আমাদিগকে প্রাচীন আপ্তপুরুষের ভাষায় যেন বলিতে লাগিলেন—দেখ আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলি আমার পিতার কটিদেশ অপেক্ষাও স্থূল; তিনি তোমাদের চাবুক দিয়া শাসন করিতেন, আমি তোমাদের বৃশ্চিক দিয়া শিক্ষা দিব।

কিন্তু শাসন করিবার সময় তখনও আসে নাই। সম্ভব হইলে গোলটেবিল

বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে। বড়লাট ও অন্যান্য প্রধান কর্ম-চারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গান্ধিজী দুইবার সিমলা গেলেন। তাঁহারা অনেক বিষয় আলোচনা করিলেন। বাঙ্গলার কথা ছাড়া, সীমান্তের লালকুর্তা-আন্দোলন ও যুক্ত-প্রদেশের কৃষক-সমস্যারও আলোচনা হইল—এই সকল ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন।

গান্ধিজীর আহ্বানে আমি সিমলায় গিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের কয়েকজন প্রধান কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার কথাবার্তা যুক্ত-প্রদেশ লইয়াই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের পশ্চাতে যে আসল বিরোধ, তাহা খোলাখুলি ভাবে আলোচিত হইল। কথাপ্রসঙ্গে শুনিলাম যে, ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে গভর্ণমেণ্ট অন্ততঃ তিন মাসের মধ্যেই আইন অমান্য আন্দোলন ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দমননীতির যন্ত্র এমন-ভাবে সন্নিবেশ করিয়াছিলেন যে, কেবল ইঙ্গিত করিলেই হইত। কিন্তু বলপ্রয়োগের পরিবর্তে, আপোষে কথাবার্তা দ্বারা কার্যসিদ্ধিই তাঁহারা ভাল মনে করিয়া পরস্পরের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করিলেন, যাহার ফলে দিল্লী-সন্ধি সম্ভবপর হইয়াছিল। চুক্তি না হইলে অন্যদিকে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে তিলার্ধ বিলম্ব হইত না। এই কথার মধ্যে এমন ইঙ্গিতও হয়ত ছিল যে, যদি আমরা বুঝিয়া না চলি, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতেই দমননীতির কল চলিবে। এই সকল কথা অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ সরলতার সহিতই বলা হইল এবং আমরা উভয়েই বুঝিলাম, আমাদিগকে বাদ দিলেও এবং আমরা যাহা বলি আর করি না কেন, সংঘর্ষ অনিবার্য।

আর একজন উচ্চ কর্মচারী কংগ্রেসের প্রশংসা করিলেন। আমরা রাজনীতি ছাড়া অন্যান্য সমস্যাগুলি আলোচনা করিতেছি, এমন সময় তিনি বলিলেন, রাজনীতি ছাড়িয়া দিলেও কংগ্রেস ভারতের এক বৃহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ভারতবাসীরা সংগঠনমূলক কার্যে অপটু, সচরাচর এই অপবাদ তাহাদিগকে দেওয়া হয়; কিন্তু ১৯৩০ সালে কংগ্রেস বিপুল বাধাবিঘ্নের মধ্যেও সঙ্ঘবদ্ধ কার্যে অপূর্ব কুশলতা দেখাইয়াছে।

গান্ধিজীর প্রথমবার সিমলায় গিয়া আলোচনার ফলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করার কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইল না। আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি দ্বিতীয় বার সিমলায় গেলেন। যে কোন দিকেই হউক, একটা কিছু স্থির করা আবশ্যক, কিন্তু ভারত ত্যাগ করিতে তখনও তাঁহার মন সরিতেছিল না। তিনি দেখিলেন, বাঙ্গলা, সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশে বিবাদ ঘনাইয়া আসিতেছে। ভারতে শান্তির প্রতিশ্রুতি না পাইলে তিনি যাইতে চাহিলেন না। কয়েকখানি চিঠির আদান-প্রদানের পর, অবশেষে গভর্ণমেণ্টের সহিত বুঝাপড়া হইল এবং ঐ মর্মে এক বিবৃতি প্রচারিত হইল। এই রফা একেবারে শেষ মুহূর্তে হইল। কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি গান্ধিজী গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট জাহাজ ধরিলেন। তখন শেষ ট্রেনও ছাড়িয়া গিয়াছিল, সিমলা হইতে বোম্বাই পর্যন্ত স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইল এবং যোগাযোগ স্থাপনের জন্য পথে অন্যান্য ট্রেন থামাইয়া রাখা হইল।

আমি তাঁহার সহিত সিমলা হইতে বোম্বাই গেলাম। আগষ্ট মাসের শেষে একদিন প্রভাতে আমি তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলাম; অর্ণবপোত তাঁহাকে লইয়া আরব সমুদ্রের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করিল। দুই বৎসরের মত আমাদের এই শেষ দেখা।

৩৮

গোলটেবিল বৈঠক

যিনি মিঃ গান্ধীকে ভারতে ও লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখিয়াছেন, এমন একজন ইংরাজ সাংবাদিক সম্প্রতি একখানি পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

"মুলতান জাহাজেই নেতৃবৃন্দ জানিতেন যে, কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে মিঃ গান্ধীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রহিয়াছে। তাঁহারা আরও জানিতেন যে, সময় উপস্থিত হইলেই কংগ্রেস তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু কংগ্রেস মিঃ গান্ধীকে বাহির করিয়া দিলে সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত অর্ধেক সদস্যও বাহির হইয়া যাইবে। এই অর্ধাংশকেই স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং মিঃ জয়াকর লিবারেল দলে ভিড়াইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভাষায় মিঃ গান্ধী "বিভ্রান্তবুদ্ধি," ইহা তাঁহারা গোপন করিতেন না। একজন "বিভ্রান্তবুদ্ধি" নেতাকে হাত করা ভাল, কেন না তাঁহার সহিত কোটি কোটি "বিভ্রান্তবুদ্ধি" অনুচরও পাওয়া যাইবে।"*

---

* গ্লোরনি বোলটনের "দি ট্রাজেডি অব গান্ধী" হইতে। উদ্ধৃত অংশ আমি ঐ পুস্তকের সমালোচনা হইতে লইয়াছি . কেন না তখনও উহা আমার পড়িবার সুবিধা হয় নাই। আমার বিশ্বাস ইহাতে গ্রন্থকার বা উদ্ধৃত অংশে উল্লিখিত ব্যক্তিদের প্রতি আমি কোন অবিচার করি নাই।...এই লেখা শেষ হইবার পর আমি পুস্তকখানা পড়িয়াছি। মিঃ বোলটনের অনেক বর্ণনা ও প্রতিপাদ্য বিষয় আমার মতে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কার্যকরী সমিতি দিল্লী-সন্ধির আলোচনা-কালে এবং পরে কি করিয়াছিল না করিয়াছিল, তাহা লইয়া বিশেষভাবে এবং অন্যান্য ব্যাপারের বর্ণনাতেও অনেক ভুল আছে। আর একটি কৌতুককর কল্পনা এই যে, মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল, ১৯৩১-এ কংগ্রেসের সভাপতি পদ ও নেতৃত্বের জন্য মিঃ গান্ধীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ গত ১৫ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসে (এবং সমগ্র দেশেও) মিঃ গান্ধীই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, কংগ্রেসের কোন সভাপতিই সে স্থান পাইতেন না। তিনি সভাপতি সৃষ্টি করিতেন, তাঁহার নির্দেশেই নির্বাচন হইত। বহুবার তিনি সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং তাঁহার কোন সহকর্মী অথবা অনুগামীর নাম প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার জন্যই আমি কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলাম, তিনি স্বয়ং নির্বাচিত হইয়াও, তাঁহার পরিবর্তে আমাকেই নির্বাচিত করেন। সাধারণ অবস্থায় মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের নির্বাচন হয় নাই। তখন আমরা সদ্য কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়াছি, অধিকাংশ কংগ্রেস কমিটি তখন বে-আইনী, কাজেই সাধারণভাবে কাজ চলিতে পারে না। সেই জন্য কার্যকরী সমিতি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের ভার লইয়াছিলেন। মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল স্বয়ং এবং অন্যান্য সমস্ত সদস্য এক-যোগে মিঃ গান্ধীকে সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি যদিও কার্যতঃ কংগ্রেসের মাথা, তথাপি নামেও তিনি অন্ততঃ এই সঙ্কটের সময় সভাপতি হউন, ইহা সকলের ইচ্ছা ছিল। তিনি রাজী হইলেন না এবং মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলকে গ্রহণ করিবার জন্য জিদ দেখাইলেন। আমার মনে আছে, এই সময় একজন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মুসোলিনীর মত একজনকে সাময়িকভাবে রাজা বা বড়কর্তা করিয়া রাখিতে চাহেন।

পাদটীকায় মিঃ বোলটনের নানা শ্রেণীর ভুল ধারণার আলোচনা সম্ভবপর নয়। তাঁহার ধারণা যে, পিতা কোন ইংরাজ ক্লাবের সদস্য না হইতে পারিয়াই রাজনৈতিক মত পরিবর্তন করেন; তিনি চরমপন্থী ত হইলেনই, এমন কি, ইংরাজ সমাজের সঙ্গেও মেশিতেন না। বহুবার কথিত হইলেও, এই কাহিনী আগাগোড়া মিথ্যা। আসল ঘটনা অতি তুচ্ছ, তবে কেবল ভ্রম নিরসনের জন্য আমি উহা উল্লেখ করিতেছি। তিনি আইন ব্যবসার আরম্ভ জীবনের সময় এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর জন এজ-এর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। স্যর জন তাঁহাকে এলাহাবাদ (ইউরোপীয়ান) ক্লাবের সদস্য হইতে বলিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার নাম প্রস্তাব করিতে চাহিলেন। আমার পিতা তাঁহাকে এই সদয় উপদেশের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, ইহাতে গোলমাল হইতে পারে। অনেক ইংরাজ তিনি ভারতীয় বলিয়া আপত্তি

আমি জানি না, উদ্ধৃত বাক্যাংশের মধ্যে স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু, মিঃ জয়াকর অথবা ১৯৩১-এ গোলটেবিল বৈঠকে যাত্রী অন্যান্য প্রতিনিধিদের মতামত কতখানি আছে। ভারতীয় রাজনৈতিক ঘটনার সহিত সংশ্রবহীন যে কোন ব্যক্তি, তিনি সাংবাদিকই হউন আর নেতাই হউন, এই শ্রেণীর বর্ণনা দিতে পারেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু বিবরণটি পড়িয়া আশ্চর্য হইয়াছিলাম। আমি পূর্বে কখনও এরূপ অদ্ভুত কথা ঘুণাক্ষরেও শুনি নাই, যদিও তাহা বুঝা কঠিন নহে, কেন না পরে অধিকাংশ সময়ই আমি কারাগারে ছিলাম।

কাহারা ষড়যন্ত্রকারী এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল? কেহ কেহ বলিতেন আমি ও সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল কার্যকরী সমিতিতে সর্বাপেক্ষা উগ্রপন্থী ছিলাম। অতএব, আমার ধারণা, আমাদিগকেই ষড়যন্ত্রের নেতারূপে গণনা করা হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতে বল্লভভাই অপেক্ষা গান্ধিজীর অধিক বিশ্বস্ত সহযোগী আর কেহ নাই। শক্তিশালী ও অদম্য কর্মী হইয়াও বল্লভভাই গান্ধিজীর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও কর্মনীতির একান্ত ভক্ত। আমি সে ভাবে গান্ধিজীর আদর্শ গ্রহণ না করিলেও দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করিয়াছি; তাঁহার বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্রের চিন্তা পর্যন্ত করিতে পারি, এই ধারণা কত মিথ্যা! সমগ্র কার্যকরী সমিতি সম্পর্কেই এই কথা বলা চলে। এই সমিতি কার্যতঃ তাঁহার নিজের সৃষ্টি, তিনি সহকর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া সদস্য মনোনীত করিয়াছেন, নির্বাচন তাহার পরে আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। এই সমিতির মেরুদণ্ড যাঁহারা, তাঁহারা বহু বৎসর ধরিয়াই কার্যতঃ স্থায়ী সদস্য-রূপেই রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ ছিল, দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যক্তিগত মেজাজের পার্থক্যও ছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া একই কর্মক্ষেত্রে একই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া একই বিঘ্নবিপদ বরণ করিয়া তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পরের বন্ধু, সখা সহকর্মী এবং একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তাঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তির সমবায় নহেন, পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। অতএব, এখানে একের বিরুদ্ধে অপরের ষড়যন্ত্রের কথা ধারণারও অতীত। গান্ধিজীই সমিতির পরিচালক এবং সকলেই তাঁহার পরামর্শের অপেক্ষা রাখেন। বহুবর্ষ ধরিয়া ইহাই চলিতেছে; বরং ১৯৩০-এর আন্দোলনের সাফল্যে, ১৯৩১ সালে উহা আরও বেশী হইয়াছিল।

"উগ্রপন্থীদের" তাঁহাকে কার্যকরী সমিতি হইতে "বহিষ্কৃত" করিবার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? তিনি সর্বদাই আপোষ করার জন্য অনুকূল, অতএব ভারস্বরূপ, হয়ত এইরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু তাঁহাকে বাদ দিলে আমাদের

করিবেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দিবেন। যে কোন সামরিক কর্মচারী হয়ত পরোক্ষে তাঁহার নিন্দা করিবেন; এই অবস্থায় তিনি নির্বাচনপ্রার্থী হইতে চাহেন না। সার জন তখন বলিলেন যে, তাঁহার নাম প্রস্তাব হইলে তিনি তাহা এলাহাবাদ বিভাগের ডিভিশনাল জেনারেলকে দিয়া সমর্থন করাইবেন। যাহা হউক অবশেষে ব্যাপারটা চাপা পড়িল, আমার পিতার নাম প্রস্তাব করা হইল না, তিনি ইচ্ছা করিয়া অপমানের ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত হইলেন না। এই ঘটনায় ইংরাজদের প্রতি তাঁহার মন তিক্ত হওয়া ত দূরের কথা, সার জন এবং পরে বহুবর্ষ ধরিয়া অন্যান্য অনেক ইংরাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই ঘটনা বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে ঘটে এবং তাহার পঁচিশ বৎসর পর তিনি রাষ্ট্রক্ষেত্রে অগ্রগামী ও সহযোগী হন। তাঁহার এই পরিবর্তনও আকস্মিক নহে। পাঞ্জাবের সামরিক আইন ও মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহার পরেও তিনি ইচ্ছা করিয়া ইংরাজ সমাজের সংস্রব বর্জন করিতেন না। কিন্তু যেখানে ইংরাজগণ অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী, সেখানে অসহযোগ ও আইন অমান্যের জন্য স্বাভাবিক মিলন সম্ভবপর হয় নাই।

সংগ্রামের মূল্য কি, কোথায় থাকিত আইন অমান্য আর কোথায় থাকিত সত্যাগ্রহ? এই আন্দোলনের তিনি জীবন্ত অংশ, অথবা তিনিই বিগ্রহরূপী আন্দোলন। আমাদের সংগ্রামের প্রত্যেক ব্যাপারই তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াছে। অবশ্য জাতীয় আন্দোলন তাঁহার সৃষ্টি নহে, কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর তাহা নির্ভর করে না, তাহার মূল গভীর। কিন্তু বৃহৎ আন্দোলনের কোন এক বিশেষ প্রকাশ, যেমন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ তাঁহারই সৃষ্টি। তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র হওয়ার অর্থ বর্তমান আন্দোলন বর্জন করিয়া আবার নূতন ভিত্তির উপর তাহা গড়িয়া তোলা। এরূপ কাজ সব সময়েই কঠিন, ১৯৩১-এ কেহ একথা চিন্তাও করিতে পারিত না।

কোন কোন লোকের মতে আমরা ১৯৩১-এ তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে তাড়াইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলাম, একথা ভাবিতেও কৌতুক বোধ হয়। যাঁহাকে সামান্য ইঙ্গিত করিলেই সরিয়া দাঁড়াইবেন, তাহার জন্য ষড়যন্ত্রের আবশ্যক কি! তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন এমন প্রস্তাব মাত্রেই কার্যকরী সমিতি, এমন কি, সমগ্র দেশ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তিনি আমাদের আন্দোলনের সহিত এমন ভাবে জড়িত যে, তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিবেন এ চিন্তা পর্যন্ত অসহনীয়। আমরা তাঁহাকে লণ্ডনে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম, কেন না তাঁহার অনুপস্থিতিতে সমস্ত ভার আমাদের উপর পড়িত এবং আমরা তাহার পরিণাম ভাল বোধ করি নাই। তাঁহার স্কন্ধেই সমস্ত ভার নিক্ষেপে আমরা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। কার্যকরী সমিতি এবং তাহার বাহিরে আমাদের অনেকের সহিত গান্ধিজীর সম্পর্ক এরূপ যে, কোন ব্যাপারে তাঁহার নিকট সাময়িক সুবিধা আদায় করা অপেক্ষা ব্যর্থ হওয়াই আমরা ভাল বিবেচনা করিতাম।

গান্ধিজী "বিভ্রান্তবুদ্ধি" কি না সে বিচারের ভার আমরা মডারেট বন্ধুদেরই দিলাম। একথা সত্য যে, তাঁহার রাজনীতি অনেক সময়েই দার্শনিক এবং বুঝা কঠিন। কিন্তু তিনি যে কাজের মানুষ, তাঁহার সাহস যে অনন্যসাধারণ, একমাত্র তিনিই যে জাতির পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুতি দিতে সক্ষম, ইহা বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। এবং "বিভ্রান্তবুদ্ধির" যদি ইহাই কর্মপরিণত ফল হয়, তাহা হইলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে যাহার আরম্ভ ও শেষ, কেবল আলোচনাতেই পর্যবসিত সেই "বাস্তব রাজনীতির" সহিত তুলনায় নিশ্চয়ই উহা মন্দ নহে। তাঁহার কোটি কোটি অনুগামীও যে "বিভ্রান্তবুদ্ধি" একথাও সত্য, কেন না তাহারা রাজনীতিও বুঝে না শাসনতন্ত্রও বুঝে না; তাহারা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন অশন, বসন, আচ্ছাদন জমি-জিরাতের দিক দিয়াই চিন্তা করিতে পারে।

খ্যাতনামা বিদেশী সাংবাদিক, যাঁহারা মানবপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে নিপুণ, তাঁহারা ভারতে আসিলেই ভুলাইয়া যান, ইহা আমার নিকট সর্বদাই আশ্চর্য বোধ হয়। প্রাচ্য একেবারেই স্বতন্ত্র এবং সাধারণ মাপকাঠিতে তাহার বিচার হইতে পারে না; শৈশবের এই বদ্ধমূল ধারণাই কি ইহার কারণ? অথবা ইংরেজের ক্ষেত্রে ইহা কি সাম্রাজ্যের বজ্রবন্ধন, যাহা তাঁহাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত এবং মস্তক বিকৃত করিয়া ফেলে! যত অসম্ভব কথাই হউক না কেন বিন্দুমাত্র আশ্চর্য না হইয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া বসেন, কেন না রহস্যময় প্রাচ্যে সকলই সম্ভব। সময় সময় তাঁহাদের রচিত পুস্তকে সত্য বিবরণ লিখিবার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, কথোপকথনের নির্ভুল বিবরণও থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে অতি বিস্ময়কর ভ্রান্তি উহার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়।

১৯৩১-এ গান্ধিজীর ইউরোপ যাত্রার পরেই লণ্ডনের কোন সংবাদপত্রে

প্যারীর বিখ্যাত সংবাদদাতার রচিত একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয়। এই প্রবন্ধটি ভারতের বিষয় লইয়া রচিত, প্রসঙ্গতঃ লেখক একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন যুবরাজ ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন, কোন এক স্থানে (সম্ভবতঃ দিল্লী) মহাত্মা গান্ধী অপরের অজ্ঞাতসারে একান্ত নাটকীয় ভাবে যুবরাজের সম্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং যুবরাজের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার নিকট এই নিরানন্দ দেশের জন্য শান্তি ভিক্ষা চাহিলেন। আমরা কেহ, এমন কি গান্ধিজীও কখনও এই চমৎকার গল্পটি শোনেন নাই। আমি উক্ত সাংবাদিক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া সব জানাইলাম। পত্রোত্তরে তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু লিখিয়াছিলেন যে, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে উহা অবগত হইয়াছেন। আমার নিকট আশ্চর্য এই যে, এমন একটা আজগুবী গল্প তিনি অনুসন্ধান না করিয়াই বিশ্বাস করিলেন, অথচ যিনি গান্ধী, কংগ্রেস, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু জানেন, তিনি কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে একথা সত্য যে অনেক ইংরাজ দীর্ঘকাল ভারতে থাকিয়াও কংগ্রেস, গান্ধী অথবা এদেশ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। কেণ্টারবেরীর আর্চ-বিশপ সহসা মুসোলিনীর মাথার উপর চড়িয়া বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, সেই কল্পিত গল্পের সহিত ঐ অবিশ্বাস্য ও হাস্যকর গল্পটির তুলনা চলিতে পারে।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে অন্যপ্রকার একটি গল্প প্রচারিত হইয়াছে। গান্ধিজীর হাতে কোটি কোটি টাকা আছে, এগুলি তিনি গোপনে বন্ধুদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন; কংগ্রেস এই টাকার লোভে তাঁহার অনুগত থাকে। কংগ্রেসের সর্বদাই ভয়, গান্ধিজী সদস্যপদ ত্যাগ করিলে এই টাকা হাতছাড়া হইবে। এই গল্পটিও হাস্যকর, কেন না তিনি কখনও নিজের হাতে বা বন্ধুদের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখেন না, যাহা তিনি সংগ্রহ করেন, তাহা সাধারণ প্রতিষ্ঠানে দিয়া দেন। তাঁহার স্বাভাবিক 'বানিয়া' বুদ্ধিবশতঃ তিনি সাবধানতা সহকারে হিসাব রাখেন এবং তাঁহার সংগৃহীত সমস্ত টাকার হিসাব, হিসাব-পরীক্ষকগণ কর্তৃক পরীক্ষান্তে সাধারণে প্রচার করা হয়।

১৯২১ সালে কংগ্রেসের জন্য যে এক কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল সেই স্মরণীয় কাহিনী হইতে এই শ্রেণীর গল্প প্রচারিত হইয়াছে। টাকার অঙ্কটা শুনিতে বড়, কিন্তু সমস্ত ভারতের নানাকাজে ছড়াইয়া দিলে কিছুই নয়—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল, কুটীর-শিল্পের উন্নতি, খদ্দর প্রচার, অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং অন্যান্য গঠনমূলক কাজে ইহা ব্যয় হইয়াছে। অধিকাংশ টাকাই বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এখনও বিশেষ কাজের রক্ষিত ধনভাণ্ডাররূপে রহিয়াছে, বাদবাকী টাকা স্থানীয় কমিটিগুলি কংগ্রেসের গঠনমূলক ও রাজনৈতিক কার্যে ব্যয় করিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনে এবং পরবর্তী কয়েক বৎসরের কংগ্রেসের কাজে ইহা ব্যয় হইয়াছে। আমাদের এই দরিদ্র দেশে গান্ধিজীর শিক্ষাগুণে আমরা অতি অল্প খরচে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইয়া থাকি। আমাদের অধিকাংশ কাজই সকলে স্বেচ্ছায় করিয়া থাকেন; যেখানে অর্থ দেওয়া হয়, তাহা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিবার বেশী নহে। আমাদের ভাল ভাল কর্মীরা, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবক এবং যাহাদের পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়, তাহারাও ইংলণ্ডে বেকারেরা যে ভাতা পায়, তদপেক্ষাও কম ভাতা লইয়া থাকেন। গত পনর বৎসর কংগ্রেসের আন্দোলন কত অল্প ব্যয়ে

চালান হইয়াছে, কোন দেশের রাজনৈতিক বা শ্রমিক আন্দোলন তত কম খরচে চলে কিনা সন্দেহ। কংগ্রেসের সমস্ত টাকার যথাযথ হিসাব রাখা হয় এবং প্রতি বৎসর পরীক্ষিত হিসাব প্রকাশ করা হয়। ইহার মধ্যে কিছু গোপন করা হয় না। তবে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যখন কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছিল, তখন ইহা সম্ভবপর হয় নাই।

গান্ধিজী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য লণ্ডনে চলিয়া গেলেন। আমরা দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির করিলাম যে, আর কোন প্রতিনিধি পাঠান হইবে না। এই সঙ্কটের সময় যাঁহারা সুকৌশলে কাজ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের ভারতে রাখারও আবশ্যক ছিল। লণ্ডনে গোল-টেবিল বৈঠক বসিলেও আসল কেন্দ্র ভারতে এবং এখানকার ঘটনা লণ্ডনেও অনিবার্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথ ভাবে রক্ষা করিয়া যাহাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য আমরা সাবধানতা অবলম্বন করিলাম। অবশ্য একজন মাত্র প্রতিনিধি প্রেরণের ইহাই প্রধান কারণ নহে। যদি আমরা প্রয়োজন বুঝিতাম, তাহা হইলে আমরা আরও প্রতিনিধি পাঠাইতাম। বিশেষ বিবেচনা করিয়াই আমরা তাহা করি নাই।

শাসনতন্ত্রের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি আলোচনার জন্য আমরা বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণ করি নাই। শাখাপ্রশাখা লইয়া চিন্তা করার আমাদের অভিপ্রায় ছিল না, কেন না মূল বিষয়গুলি লইয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত কোন বুঝাপড়া হইয়া গেলে ঐগুলি আলোচনা করার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে। আসল প্রশ্ন, কতখানি ক্ষমতা গণতান্ত্রিক ভারতকে দেওয়া হইবে; উহার মীমাংসা হইয়া গেলে যে কোন আইনজীবী বিস্তারিত ব্যাপারের খসড়া রচনা করিতে পারেন। মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে কংগ্রেসের ধারণা অতিশয় স্পষ্ট ছিল, তর্ক ও আলোচনার ইহাতে বিশেষ অবকাশ ছিল না। কংগ্রেসের পক্ষের কথা বলিবার জন্য আমাদের একজন প্রতিনিধি—আমাদের নেতাকে প্রেরণ করাই একমাত্র মর্যাদার পথ। তিনি আমাদের দাবীর অপরিহার্য যৌক্তিকতা দেখাইবেন এবং সম্ভব হইলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে তাহা স্বীকার করাইতে চেষ্টা করিবেন। আমরা জানিতাম, ইহা সুকঠিন কাজ, কিন্তু অবস্থানুসারে উহা ছাড়া অন্য পথ ছিল না। আমাদের আদর্শ ও নীতি যাহা আমরা সঙ্কল্প করিয়া গ্রহণ করিয়াছি এবং যেগুলি আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, কোন অবস্থাতেই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যদি কোন আশ্চর্য উপায়ে ঐ সকল মূলনীতির ভিত্তিতে আপোষ সম্ভব হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট বিষয় স্থির করিতে কোনই বেগ পাইতে হইবে না। আমরা নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়াছিলাম যে, যদি আপোষ সম্ভব হয়, তাহা হইলে গান্ধিজী আমাদের কয়েকজনকে অথবা কার্যকরী সমিতির সমস্ত সদস্যকে লণ্ডনে আহ্বান করিবেন, আমরা গিয়া বিস্তৃত আলোচনায় যোগ দিব। আমরা এই আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলাম; প্রয়োজন হইলে বিমান পথে গিয়াও আমরা দশ দিনের মধ্যে তাঁহার সহিত যোগ দিতে পারি।

আর যদি মূলে বিষয়েই আপোষ না হয়, তাহা হইলে বিস্তারিত আলোচনার প্রশ্নই উঠে না এবং বৈঠকে অধিকসংখ্যক কংগ্রেসের প্রতিনিধি প্রেরণের কথাও উঠে না। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন। তবে তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যান নাই। তিনি ভারতের নারী-জাতির প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন এবং কার্যকরী সমিতি তাঁহাকে যোগ দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

যাহা হউক এই ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছামত কাজ করিবার অভিপ্রায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ছিল না। মূল বিষয়গুলির আলোচনা স্থগিত রাখিয়া তাঁহারা বৈঠকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অবান্তর বিষয়ের আলোচনার কৌশল অবলম্বন করিলেন। এমন কি, যখন কোন মূল প্রশ্ন উঠে, তখন গভর্ণমেণ্ট কোন নিশ্চিত মত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন; কেবল প্রতিশ্রুতি দেন যে, এ বিষয়ে পাকাপাকি ঠিক হইলে তাহার পর গভর্ণমেণ্ট মত ব্যক্ত করিবেন। অবশ্য তাঁহাদের হাতে প্রধান অস্ত্র ছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যা—এই অস্ত্র তাঁহারা ভালভাবেই প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাই সম্মেলনে সর্বাপেক্ষা মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

বৈঠকের অধিকাংশ ভারতীয় সদস্যই অনেকে স্বেচ্ছায়, কেহ বা অনিচ্ছায় এই সরকারী কৌশলজালের মধ্যে পড়িলেন। বৈঠকে সকলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অধিকাংশই "আপ্‌কে ওয়াস্তে"—প্রকৃত প্রতিনিধি অল্প। দুই চার জন যোগ্য ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন, অধিকাংশ সম্পর্কে এ কথা বলা চলে না। মোটের উপর, ইহারা ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিবিরোধী অংশের প্রতিনিধি। ইহারা এত পশ্চাদ্‌পদ ও প্রতিক্রিয়াশীল যে, ইহাদের মধ্যে অতি সাবধানী ও ধীর-প্রকৃতি ভারতীয় মডারেটদিগকেও উন্নতিশীল বলিয়া মনে হইত। যাহারা উন্নতি ও আশ্রয়ের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির সহিত সমস্বার্থসূত্রে সম্বন্ধ, ভারতীয় সেই সকল বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের উহারা প্রতিনিধি। ইহা ছাড়া, সাম্প্রদায়িক দিক হইতে 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' 'সংখ্যালঘিষ্ঠ' ইত্যাদি দলের প্রতিনিধিও ছিল। এই সকল উচ্চ শ্রেণীর ঐক্যবিরোধী ব্যক্তিরা কিছুতেই নিজেদের মধ্যে কোন আপোষ রফা না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইহারা পুরাপুরি প্রতিক্রিয়াশীল; রাজনৈতিক অধিকার বর্জন করিয়াও সাম্প্রদায়িক সুবিধালাভই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য। অবশ্য ইহারা মুখে ঘোষণা করিতে লাগিল যে, তাহাদের সাম্প্রদায়িক দাবী সন্তোষজনক ভাবে পূর্ণ না হইলে তাহারা আর এক দফা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে সম্মত হইবে না। এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! পরাধীন জাতির যে কত অধঃপতন হইতে পারে, তাহারা কি ভাবে নিজেদের সাম্রাজ্যনীতির দ্যূতক্রীড়ার পণ্যরূপে অবাধে ব্যবহার করিতে পারে, ইহা তাহার এক অতি শোচনীয় দৃষ্টান্ত। অবশ্য এই সকল হাইনেসগণ, লর্ডগণ, নাইটগণ বা অন্যান্য খেতাবধারীরা নিশ্চয়ই ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি নহেন। গোলটেবিল বৈঠকের এই সকল প্রতিনিধি সকলেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোনীত এবং তাঁহাদের স্বার্থের দিক হইতে গভর্ণমেণ্ট ভাল লোকই বাছিয়া লইয়াছেন। তথাপি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের এইভাবে ব্যবহার ও কাজে লাগাইতে পারেন, ইহা আমাদের দুর্বলতারই পরিচায়ক। কত সহজে তাহাদিগকে ভুলাইয়া পরস্পরের কাজ পণ্ড করিবার কাজে লাগাইয়া দেওয়া যায়! আমাদের উচ্চশ্রেণী এখন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মতবাদে আচ্ছন্ন এবং তাঁহাদের ইঙ্গিতেই চালিত হইয়া থাকে। তাঁহারা কি ইহা দেখিতে এবং বুঝিতে পারেন না? অথবা তাঁহারা স্পষ্টভাবে সব বুঝিয়াই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ভয়েই উহা জ্ঞাতসারে গ্রহণ করেন?

কায়েমী স্বার্থবাদীদের এই বৈঠকে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী, সামন্ততন্ত্রী মূলধনী বণিক, ধার্মিক, সাম্প্রদায়িকতাবাদী সকল শ্রেণীর সমাবেশ, সেখানে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব আগা খাঁর ন্যায় যোগ্যপাত্রেই অর্পিত হইয়াছিল; কেন না তাঁহাতে একাধারে কমবেশী ও সকল বিভিন্ন স্বার্থের সমাবেশ আছে। আজীবন তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ কাল ইংলণ্ডেই বাস করেন, কাজেই আমাদের

শাসকগণের স্বার্থ ও মত তিনি ভালভাবেই ব্যক্ত করিতে পারেন। গোলটেবিল বৈঠকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের একজন যোগ্য প্রতিনিধি হইতে পারিতেন, কিন্তু অদৃষ্টের এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে, তিনিই যেন ভারতের যথার্থ প্রতিনিধি।

বৈঠকে আমাদের বিরুদ্ধ পাল্লাই অতিমাত্রায় ভারী, উহাতে আমাদের প্রত্যাশার কিছুই রহিল না, দৈনন্দিন আলোচনার সংবাদে আমরা ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। আমরা দেখিলাম, জাতীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি লইয়া অসম্বন্ধ ও অক্ষম আলোচনার ভাণ, চুক্তি, ষড়যন্ত্র ও প্রলোভনজাল বিস্তার, ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের অতিমাত্রায় প্রগতিবিরোধীদের সহিত আমাদের কতিপয় স্বদেশবাসীর মিলন, সামান্য ব্যাপার লইয়া বিরামহীন আলোচনা, প্রকৃত কাজের কথা ইচ্ছা করিয়া স্থগিত রাখা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ কায়েমী স্বার্থের ইঙ্গিতে ক্রমাগত যন্ত্রের মত পরিচালিত হওয়া, পরস্পরের দোষদর্শন এবং মাঝে মাঝে খানা-পিনা ও পরস্পরের গুণকীর্তন। ইহা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা—বড় চাকুরী, ছোট চাকুরী, চাকুরী ও আইন সভার আসন হিন্দু, মুসলমান, শিখ, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয়ান কে কত পাইবে তাহার ভাগাভাগি; কিন্তু সমস্তই উচ্চশ্রেণীর ভাগে পড়িবে, জনসাধারণের ইহাতে কিছুই নাই। সুবিধাবাদীদের পোয়া বার, বিভিন্ন দল যেন ক্ষুধিত নেকড়ের মত নূতন শাসনতন্ত্রের মাংসখণ্ড পাইবার জন্য বিচরণ করিতেছে। স্বাধীনতার অর্থ ইহাদের নিকট ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির ক্ষেত্র প্রসারিত করা, ইহার নাম "ভারতীয় করণ" অর্থাৎ সমর বিভাগ ও সিভিল সার্ভিস ইত্যাদিতে অধিকসংখ্যায় ভারতীয়দের চাকুরীর ব্যবস্থা। স্বাধীনতার কথা, গণতান্ত্রিক ভারতের হস্তে ক্ষমতা অর্পণের কথা, ভারতীয় জন-সাধারণের অতি মর্মান্তিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানের কথা কেহই চিন্তা করিলেন না। ইহার জন্যই কি ভারত এমন সাহসের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে? আদর্শবাদ ও আত্মোৎসর্গের নির্মল আলোক হইতে কি আমরা এই তমসাবৃত রাজ্যে প্রবেশ করিব?

সেই সুসজ্জিত জনপূর্ণ কক্ষে গান্ধিজী বসিয়া -নিঃসঙ্গ, একক। তাঁহার পোষাক অথবা পোষাকের একান্ত অভাব অন্যান্য সকলের সহিত তাঁহার পার্থক্য ঘোষণা করিতেছিল; কিন্তু ঐ সকল উৎকৃষ্ট বেশভূষা পরিহিত ব্যক্তিগণের সহিত চিন্তার ও দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁহার পার্থক্য ছিল আরও বেশী। বৈঠকে তিনি এক অসম্ভব কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়িলেন, আমরা দূর হইতে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম তিনি সহ্য করিতেছেন কি করিয়া। কিন্তু তিনি ধৈর্যের সহিত কর্তব্য পালন করিতে লাগিলেন এবং আপোষের সূত্র আবিষ্কারের জন্য বারম্বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ একটি ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতা আসলে রাজনৈতিক প্রগতিবিরোধিতা মাত্র। মুসলমান প্রতিনিধি-দের পক্ষ হইতে যে সকল সাম্প্রদায়িক দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিই তিনি ভাল মনে করেন নাই। তাঁহার ও তাঁহার সহকর্মী মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের ধারণা যে, ঐগুলি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী। তথাপি তিনি প্রশ্ন না করিয়া তর্ক না করিয়া ঐগুলি সমস্তভাবে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, সর্ত দিলেন যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য মুসলমান প্রতিনিধি-গণকে তাঁহার ও কংগ্রেসের সহিত যোগ দিতে হইবে।

তিনি নিজের দায়িত্বেই এই সর্ত দিলেন, কেন না তখনকার কংগ্রেসকে কোন প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কংগ্রেসকে তিনি রাজী করাইতে পারিবেন। কংগ্রেসে

তাঁহার অসামান্য প্রভাব যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের মনে গান্ধিজী যে কংগ্রেসের অন‌ুমোদন লাভ করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু গান্ধিজীর এই সর্ত গ‌ৃহীত হইল না, আগা খাঁ ভারতের স্বাধীনতার দাবী করিবেন, ইহা কল্পনা করাও কঠিন। ইহা হইতে ব‌ুঝা গেল যে, বৈঠকে সাম্প্রদায়িকতাকে খ‌ুব বড় করিয়া তোলা হইলেও, সাম্প্রদায়িকতা প্রধান সমস্যা নহে। সাম্প্রদায়িকতার আবরণে রাজনৈতিক প্রগতিবিরোধীরাই সমস্ত প্রকার উন্নতির বাধা। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সাবধানতা সহকারে এই সকল প্রগতিবিরোধীদের বৈঠকের জন্য বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং বৈঠকের কার্যপ্রণালী স‌ুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যাকেই প্রধান প্রশ্নে পরিণত করিয়াছিলেন। এই প্রশ্নের মীমাংসায় যাঁহারা কিছ‌ুতেই রাজী হইবেন না, তাঁদের সহিত আপোষ অসম্ভব।

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের এই চেষ্টা সফল হইল। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কেবল বাহ‌ুবলই নহে, পরম্পরাগত সাম্রাজ্যবাদের কৌশল ও ক‌ূটনীতি দ্বারাও আরও বহ‌ুকাল তাঁহারা সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন। ভারতের জনসাধারণ ব্যর্থকাম হইল। অবশ্য গোলটেবিল বৈঠকে তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিনিধিরা ছিলেন না এবং ইহা উভয় পক্ষের বলাবলের পরীক্ষাও নহে। তাহারা ব্যর্থকাম হইল, কেন না তাহাদের দাবীর পশ্চাতে কোন মতবাদের দ‌ৃঢ়ভূমি ছিল না এবং ইহাদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করা অতি সহজ। উন্নতির পরিপন্থী কায়েমী স্বার্থগ‌ুলিকে সরাইয়া ফেলিবার মত শক্তি তাহাদের ছিল না বলিয়া তাহারা ব্যর্থকাম হইল। অতিরিক্ত ধর্মপ্রবণতার জন্য সাম্প্রদায়িক ভেদ ব‌ৃদ্ধি প্রবল করিয়া তোলা সহজ বলিয়া তাহারা ব্যর্থকাম হইল। অর্থাৎ তাহারা যথোচিত অগ্রসর ও শক্তিমান নহে বলিয়াই ব্যর্থ হইল।

এই গোলটেবিল বৈঠকে সাফল্য বা ব্যর্থতার কোন প্রশ্ন ছিল না। ইহাতে আশা করিবার অল্পই ছিল, তথাপি অন্যদিক দিয়া এই বৈঠক একট‌ু স্বতন্ত্র ধরণের। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি সকলের দ‌ৃষ্টি ছিল বলিয়া প্রথমে বৈঠকের প্রতি ভারতের বা অন্যান্য দেশের দ‌ৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। ১৯৩০-এ গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মনোনীত হইয়া যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ পতাকার ও ধিক্কারধ‌্বনির বির‌ূপ বিদায়াভিনন্দন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালের ঘটনা স্বতন্ত্র, কেন না কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং কোটি কোটি লোকের নেতা গান্ধিজী বৈঠকে যোগদান করিলেন। ইহাতে বৈঠকের মর্যাদা ব‌ৃদ্ধি পাইল এবং ভারতবর্ষ আগ্রহ সহকারে ইহার কার্যকলাপ দেখিতে লাগিল। যে কোন কারণেই হউক না কেন, প্রত্যেক ব্যর্থতায় ভারতের অখ্যাতি প্রতিধ‌্বনিত হইতে লাগিল। আমরা ব‌ুঝিতে পারিলাম, কেন গান্ধিজীকে বৈঠকে লইয়া যাইবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এতটা ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

সমস্ত চক্রান্ত, স‌ুবিধাবাদ ও নিষ্ফল কূটিল গতি লইয়া এই বৈঠক ভারতের পক্ষে কোন ব্যর্থতার নিদর্শন নহে। যাহাতে ব্যর্থ হয় সেই ভাবেই ইহা গঠিত হইয়াছিল এবং তাহার জন্য ভারতবাসীকে কোনমতেই দায়ী করা যায় না। কিন্তু ভারতের প্রধান সমস্যাগ‌ুলি হইতে জগতের দ‌ৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে ইহা কৃতকার্য হইল এবং ভারতেও ইহা আশাভঙ্গ, নৈরাশ্য এবং অপমান বোধ স‌ৃষ্টি করিল। ইহার স‌ুযোগ লইয়া প্রগতিবিরোধী শক্তিগ‌ুলি প‌ুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

দেশবাসীর সাফল্য ও ব্যর্থতা ভারতবর্ষের ঘটনার উপরই নির্ভর করে। স‌ুদ‌ূর লণ্ডনের কৌশলপ‌ূর্ণ চাতুর্যে, শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন মিলাইয়া যাইবে না। মধ্যশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের প্রকৃত ও আশ‌ু অভাবগ‌ুলি জাতীয়তাবাদের

মধ্যেই প্রকাশিত এবং উহা দ্বারাই তাহারা সমস্যা সমাধান করিতে চাহে। এই আন্দোলন হয় সাফল্য লাভ করিবে অথবা ইহার প্রয়োজন শেষ হইলে ইহার স্থলে অন্য কোন আন্দোলন জনসাধারণকে উন্নতি ও স্বাধীনতার দিকে চালিত করিবে, অথবা সাময়িক ভাবে বলপূর্বক ইহাকে দমন করা যাইতে পারে। ভারতে সেই সংঘর্ষ কিছুকাল পরেই উপস্থিত হইল, তাহার ফলে সাময়িক অবসাদ দেখা দিল। এই সংঘর্ষের উপর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের কোন প্রভাব না থাকিলেও ইহা সংঘর্ষের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল।

৩৯

যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা

কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক এবং কার্যকরী সমিতির সাধারণ সদস্যরূপে নিখিল ভারতীয় রাজনীতির সহিত আমার সর্বদাই যোগ ছিল। সময় সময় আমাকে নানাস্থানে যাইতে হইত, তবে যথাসম্ভব আমি ইহা এড়াইয়া চলিতাম। কাজের চাপ ও দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী সমিতির অধিবেশনও দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল, এমন কি ক্রমাগত দুই সপ্তাহ পর্যন্ত অধিবেশন হইত। ইহার কাজ এখন আর সমালোচনাপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করা নহে; এক বৃহৎ ও বহুমুখী প্রতিষ্ঠানের বিবিধ গঠনমূলক কার্য নিয়ন্ত্রণ করা, দিনের পর দিন কঠিন ও জটিল সমস্যাগুলি সমাধান করা, যাহার একটু এদিক ওদিক হইলেই সংঘর্ষ দেশব্যাপী হইয়া উঠিতে পারে।

যুক্ত-প্রদেশের কৃষক সমস্যাই কংগ্রেসের ও আমার প্রধান কাজ হইয়া উঠিল। যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি ১৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত, দুই তিন মাস পর ইহার অধিবেশন হইত। ইহার কার্যকরী সমিতিতে ১৫ জন সদস্য ছিলেন; ইঁহারা ঘন ঘন সভা করিতেন, কৃষক আন্দোলনের ভার ইঁহাদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল।

১৯৩১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এই কার্যকরী সমিতি এক বিশেষ কৃষক কমিটি নিযুক্ত করিলেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কতিপয় জমিদারও আসিয়া কার্যকরী সমিতির সহিত যোগ দিলেন এবং তাঁহাদের অনুমোদন লইয়াই কৃষক সমিতির কাজ চলিতে লাগিল। আমাদের প্রাদেশিক কংগ্রেসের সে বৎসরের সভাপতি (অতএব কার্যকরী সমিতি ও কৃষক কমিটিরও সভাপতি) তাসাদ্দুক আহম্মদ খাঁ শেরোয়ানী একজন বিখ্যাত জমিদার বংশের সন্তান। সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রকাশ এবং কয়েকজন প্রধান সদস্য জমিদার অথবা জমিদারবংশীয়; অবশিষ্ট সকলেই মধ্যশ্রেণীর বৃত্তিজীবী। আমাদের প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতিতে একজনও মজুর অথবা গরীব কৃষকের প্রতিনিধি ছিল না। জিলা কমিটিতে অবশ্য কৃষক সদস্য ছিল; কিন্তু নানাস্তরের নির্বাচনের মধ্য দিয়া যখন প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতি গঠন হইত, তখন তাহার সমস্ত সদস্যই মধ্যশ্রেণীর বৃত্তিজীবী এবং জমিদার শ্রেণীর হইতেন। অতএব ইহাকে কোনমতেই চরমপন্থী বলা চলে না, কৃষকসমস্যা লইয়া তো নহেই।

প্রাদেশিক ব্যাপারে আমি কার্যকরী সমিতি ও কৃষক কমিটির একজন সদস্যমাত্র, তাহার বেশী কিছু নহি। আলোচনা ও অন্যান্য কাজে আমি বিশেষভাবে যোগ দিতাম বটে, কিন্তু কখনও নেতার আসন গ্রহণ করি নাই। অবশ্য আমাদের

প্রদেশে কেহই নেতার আসন গ্রহণ করিতেন না, আমরা সহযোগিতা ও একত্র কাজ করিতে বহুদিন হইল অভ্যস্ত। আমরা ব্যক্তি অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই বড় করিয়া দেখিতাম। বাৎসরিক সভাপতি সাময়িক ভাবে আমাদের প্রধান বা প্রতিনিধি হইতেন, তবুও তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষমতা ছিল না।

আমি এলাহাবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটিরও সদস্য ছিলাম। এই কমিটি সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনে কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়াছে। ১৯৩০ সালে এই কমিটিই যুক্ত-প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলনে প্রথম অগ্রণী হইয়াছিল। অবশ্য এলাহাবাদ জিলা অপেক্ষা অযোধ্যার তালুকদারী অঞ্চলের অবস্থা কৃষিপণ্যের মন্দার দরুণ অধিকতর শোচনীয় হইয়াছিল,—তথাপি এলাহাবাদ হইতে আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার কারণ, এই জিলা অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে অগ্রসর। এলাহাবাদ সহর রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি, এখান হইতে প্রধান প্রধান কর্মীরা প্রায়ই পল্লী অঞ্চলে যাইতেন।

১৯৩১-এর মার্চমাসে দিল্লী-সন্ধির পরেই আমরা পল্লী অঞ্চলে কর্মীদিগকে পাঠাইয়া এবং মুদ্রিত ইস্তাহার বিলি করিয়া কৃষকদের জানাইয়া দিলাম যে, আইন অমান্য ও করবন্ধ আন্দোলন বন্ধ হইয়াছে। রাজনৈতিক কারণে খাজনা দেওয়ার আর কোন বাধা নাই; আমরা তাহাদিগকে খাজনা দিবার উপদেশ দিলাম। তবে ইহাও জানাইলাম যে, দ্রব্যমূল্য অতিরিক্ত হারে হ্রাস পাওয়ার ফলে, তাহাদের খাজনাও মাপ পাওয়া উচিত, আমরা তাহাদের সহিত একযোগে ঐ দাবী করিব বলিয়া প্রস্তাব করিলাম। এমন কি, সাধারণ অবস্থাতেও খাজনা এক দুর্বহ বোঝা, দ্রব্যমূল্য কমিয়া যাওয়ায় পূর্ণ খাজনা বা তাহার কাছাকাছি কিছু দেওয়া অসম্ভব। আমরা কৃষকদেব প্রতিনিধিদের লইয়া সম্মেলন আহ্বান করিলাম এবং আপোষ রফার আলোচনার ভিত্তি হিসাবে প্রস্তাব করিলাম—সাধারণভাবে অর্ধেক, বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষাও কম খাজনা লওয়া হউক।

আমরা কৃষক সমস্যাকে আইন অমান্য আন্দোলন হইতে পৃথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। অন্ততঃ ১৯৩১ সালে আমরা রাজনীতি-বর্জিত নিছক অর্থনৈতিক সমস্যারূপেই উহা বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। ইহা অবশ্য কঠিন, কেন না উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ বিদ্যমান এবং অতীতে ইহা একত্রই ছিল। কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে আমাদের লক্ষ্য অবশ্যই রাজনৈতিক ছিল। আপাততঃ আমরা এক প্রকার কৃষক সমিতির মধ্য দিয়া কাজ করিতে লাগিলাম (অ-কৃষক এবং এমন কি জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে) কিন্তু রাজনীতি আমরা একেবারে বিসর্জন দিতে পারি নাই, সে ইচ্ছাও ছিল না; কিন্তু গভর্ণমেন্ট আমাদের প্রত্যেক কার্যের মধ্যেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেখিতে লাগিলেন। আমরা সম্মুখে ভবিষ্যতের আইন অমান্য আন্দোলনের ছায়া দেখিতেছিলাম এবং উহা যখন আসিয়া পড়িবে, তখন রাজনীতি ও অর্থনীতি পুনরায় একত্রে অগ্রসর হইবে ইহা নিঃসন্দেহ।

এই শ্রেণীর বাধা সত্ত্বেও আমরা দিল্লী-সন্ধির পর হইতে বরাবর কৃষক সমস্যাকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ হইতে পৃথক রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। দিল্লীচুক্তিতে এই সমস্যার যে সমাধান হয় নাই, তাহা গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করাইবার জনাই আমরা উহা করিয়াছি। দিল্লীতে আলোচনা কালে, আমার বিশ্বাস, গান্ধিজী লর্ড আরুইনকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যদি তিনি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে নাও যান, তাহা হইলেও বৈঠকের অধিবেশন কালে আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করিবেন না। পক্ষান্তরে, তিনি কংগ্রেসকেও গোলটেবিল বৈঠকের বিঘ্ন না ঘটাইয়া ফলাফলের জন্য অপেক্ষা

করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনই গান্ধিজী ইহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি স্থানীয় কোন অর্থনৈতিক সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে আমাদের বাধ্য করা হয়, তাহার সহিত এই প্রতিশ্রুতির সম্বন্ধ নাই। যুক্ত-প্রদেশের কৃষক সমস্যা তখন আমাদের সম্মুখে ছিল এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কিছু কাজও হইয়াছিল, তবে কার্যতঃ সমস্ত ভারতেই কৃষকগণের একই প্রকার দুর্দশা হইয়াছিল। সিমলায় আলোচনা কালে গান্ধিজী এই প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন করেন,—উভয় পক্ষের প্রকাশিত পত্রেও ইহার উল্লেখ ছিল।* ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে তিনি স্পষ্টভাবে

---

* ১৯৩১-এর ২৭শে আগস্টের সিমলা চুক্তিনামার এই পত্র দুইখানিও অবিচ্ছেদ্য অংশ :—

সিমলা, ২৭শে আগস্ট, ১৯৩১

প্রিয় মিঃ ইমার্সন,

ধন্যবাদ সহকারে নূতন খসড়াসহ আপনার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। আপনি যে সমস্ত সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছেন, স্যর কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর অনুগ্রহপূর্বক তাহা আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন। আমি এবং আমার সহকর্মিগণ বিশেষ মনোযোগ সহকারে সংশোধিত খসড়াখানি বিবেচনা করিয়াছি। নিম্নলিখিত মন্তব্যের সহিত উক্ত খসড়া আমরা গ্রহণ করিতে সম্মত আছি। যথা—

চতুর্থ দফায় গভর্ণমেণ্ট যে সর্ত দিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, আমাদের মনে হয় যে, যদি কোন ক্ষেত্রে চুক্তির সর্ত ভঙ্গ সম্পর্কিত কোন অভিযোগের প্রতিকার না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তদন্ত আবশ্যক, কেন না দিল্লীর চুক্তি যতদিন বলবৎ থাকিবে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ততদিন স্থগিত থাকিবে। যদি একান্তই ভারত সরকার তথা প্রাদেশিক সরকারগণ তদন্ত মঞ্জুর করিতে সম্মত না থাকেন, তবে আমার বা আমার সহকর্মীদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহার ফল এই হইবে যে, এ পর্যন্ত অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, সে সমস্ত বিষয় তদন্তের জন্য কংগ্রেস পীড়াপীড়ি করিবে না বটে, কিন্তু যদি কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ এমন গুরুতর বলিয়া মনে হয় যে, তদন্তের অভাবে প্রতিকারের অভাববশতঃ কংগ্রেসকে প্রতিকারার্থ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত থাকা সত্ত্বেও সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। বাহুল্য হইলেও আমি নিশ্চিতরূপে গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া রাখিতেছি যে, কংগ্রেস সর্বদাই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা করিবে এবং আলোচনা অনুরোধ প্রভৃতি দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। ভবিষ্যতে কোন মতান্তর উপস্থিত না হইতে পারে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ না আনা যাইতে পারে, এই জন্যই এই কথাটা বলিয়া রাখা। যদি আমাদের এই আলোচনা সফল হয়, তাহা হইলে প্রস্তাবিত ইস্তাহার, এই চিঠি এবং আপনার উত্তর একসঙ্গে প্রকাশিত হইবে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

ভবদীয়

এম কে গান্ধী

দি গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া

স্বরাষ্ট্র বিভাগ, সিমলা, ২৭শে আগস্ট, ১৯৩১

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

কয়েকটি মন্তব্যসহ খসড়া ইস্তাহারখানি গ্রহণ করিয়া আপনি অদ্য তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কংগ্রেস এ পর্যন্ত যে সমস্ত অভিযোগ করিয়াছে, তাহার তদন্তের জন্য পীড়াপীড়ি করিবার অভিপ্রায় কংগ্রেসের নাই, তাহা সপারিষদ বড়লাট অবগত হইলেন। আপনি একথাও জানাইয়াছেন যে, যাহাতে কোন সংঘর্ষ না হয়, তজ্জন্য কংগ্রেস সতত চেষ্টিত থাকিবে এবং আলোচনা ও অনুরোধ প্রভৃতি দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। কংগ্রেসকে ভবিষ্যতে যদি কোন ব্যবস্থা করিতেই হয়, তাহা হইলে আপনি কংগ্রেসের কথা পূর্ব হইতেই পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে জানাইতেছি যে কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আশঙ্কা হইবে না বলিয়াই সপারিষদ বড়লাটের ধারণা। গভর্ণমেণ্টের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে, বড়লাট আপনাকে ১৯শে আগস্ট তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্র দেখুন।

সরকারী ইস্তাহার, আপনার অদ্য তারিখের চিঠি এবং এই উত্তর গভর্ণমেণ্ট একসঙ্গে প্রকাশ করিবেন।

ভবদীয়

এইচ. ডব্লিউ. ইমার্সন

বলিয়াছিলেন যে, গোলটেবিল বৈঠক অথবা রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও, জনসাধারণের, বিশেষভাবে কৃষকদের অর্থনৈতিক আন্দোলন, তাহাদের পক্ষ সমর্থন করা কংগ্রেসের পক্ষে প্রয়োজন হইতে পারে। এই শ্রেণীর সংঘর্ষে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি উহা পরিহার করিতেই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অপরিহার্য হইয়া উঠিলে দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর কি। আমরা জনসাধারণকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। তাঁহার কথা এই যে দিল্লী-সন্ধি সাধারণভাবে রাজনৈতিক নির্পদ্রব প্রতিরোধেই প্রযোজ্য, এই শ্রেণীর আন্দোলনের বাধা নহে।

আমি ইহা উল্লেখ করিতেছি, কেন না যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি ও তাহার নেতাদের বির্দ্ধে পুনঃ পুনঃ এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা দিল্লী-সন্ধি ভঙ্গ করিয়া করবন্ধ আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহাদের বির্দ্ধে এই অভিযোগ, তাঁহারা ইহার উত্তর দিতে পারিতেন। কিন্তু যখন তাঁহারা কারার্দ্ধ এবং সংবাদপত্র ও ছাপাখানার উপর কঠোর অনুশাসন, তখনই সুবিধা মত ঐ সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। যুক্ত-প্রদেশের কমিটি ১৯৩১ সালে করবন্ধ আন্দোলন করেন নাই, কিন্তু সে কথা আলাদা, আমি এইটুকু বলিতে চাই যে, আইন অমান্য হইতে স্বতন্ত্র, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া কোন আন্দোলন নিশ্চয়ই দিল্লী-সন্ধি ভঙ্গ করা নহে। ইহার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতার বিচার স্বতন্ত্র বিষয়, অর্থনৈতিক অসন্তোষের প্রতিবিধানের জন্য কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার যতখানি অধিকার আছে, কৃষকদেরও ঠিক ততখানি অধিকার রহিয়াছে। দিল্লী-সন্ধি হইতে সিমলা আলোচনা পর্যন্ত আমাদের মনোভাব এইর্পই ছিল এবং গভর্ণমেণ্ট কেবল ইহা যে বুঝিয়াছিলেন তাহা নহে, ইহাকে যথোচিত মর্যাদা দিয়াছিলেন।

যে দুরবস্থা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, ১৯২৯ এবং তাহার পরবর্তী কৃষিপণ্যের মন্দা তাহাকে চরম করিয়া তুলিল। কয়েক বৎসর পূর্বে জগতে সর্বত্র কৃষিপণ্যের দর চড়া ছিল, জগতের বাজারের সহিত একসূত্রে গ্রথিত ভারতের কৃষিজীবীরাও উহার অংশ পাইয়াছে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও জমিদারের খাজনাও বাড়িয়াছে,—কাজেই প্রকৃত চাষী এই চড়ার বাজারে বিশেষ লাভবান হইতে পারেন নাই। মোটের উপর কয়েকটি সুবিধাজনক অঞ্চল ব্যতীত ভারতীয় কৃষিজীবীদের অবস্থা মন্দই হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বৎসর সরকারী রাজস্ব অপেক্ষা জমিদারের খাজনা তুলনায় অনেক বেশী বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধির হার (যতদূর স্মরণ হয়) এক টাকায় পাঁচ টাকা। ইহাতে সরকারী রাজস্বও যেমন মোটা হারে বাড়িয়াছে, তেমনি জমিদারদের আরও অনেক বেশী বাড়িয়াছে; কৃষকদের অবস্থা পূর্বের মতই অনশনের কাছাকাছি। এমন কি যেখানে দ্রব্যমূল্য কমিয়াছে, অথবা অনাবৃষ্টি, বন্যা, পঙ্গপাল, ঝড়, তুফান প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটিয়াছে, সেখানেও অত্যন্ত ইতস্ততঃ করিয়া সেই বৎসরের জন্য কিছু খাজনা মাপ করা হইয়াছে। ভাল বৎসরে খাজনার হার অত্যন্ত বেশী এবং অন্য সময়েও খাজনার হার এত বেশী যে, মহাজনের নিকট ধার না করিয়া পরিশোধের উপায় থাকিত না। এইভাবে কৃষি-ঋণ বাড়িয়াছে।

জমিদার, তালুকদার, কৃষক-মালিক, রায়ত কৃষির উপর নির্ভরশীল সকল শ্রেণীই মহাজনের নিকট ঋণের দায়ে আবদ্ধ। বর্তমান ব্যবস্থায় পল্লীর আধিক অর্থনৈতিক জীবনে এই মহাজন শ্রেণীর অস্তিত্ব অপরিহার্য, এই মহাজন শ্রেণী অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া জমির উপর এবং জমির সহিত সংশ্লিষ্ট

ব্যক্তিদের উপর যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। তাহাকে সংযত করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। আইন তাহার সহায়, সে তাহার ঋণপত্রে লিখিত সর্ত অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য 'অর্ধসের মাংস' ঠিক বুঝিয়া পায়। ক্রমে ছোট ছোট জমিদার হইতে কৃষক পর্যন্ত সকলের জমি তাহার হাতে আসিতে থাকে, এইরূপে মহাজন বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিক হইয়া নিজেই বড় জমিদারবাবু হইয়া বসে। যে কৃষক নিজের জমি চাষ করিত, সে বেনিয়া জমিদার অথবা সাহুকারের ক্রীতদাসে (ভূমিশূন্য বর্গাদার) পরিণত হয়। রায়তের অদৃষ্ট আরও মন্দ। সে হয় সাহুকারের ক্রীতদাস, নয় ক্রমবর্ধিত ভূমিশূন্য দিন-মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। যে মহাজন বা কুসীদজীবী এইরূপে জমির মালিক হয়, তাহার সহিত জমি বা প্রজাদের কোন প্রাণগত যোগ নাই। সে সাধারণতঃ সহরে থাকিয়া সুদী কারবার চালায়, খাজনা-পত্র আদায়ের জন্য গোমস্তা নিয়োগ করে; ইহারা যন্ত্রের মত নিষ্ঠুর ও অমানুষিক উপায়ে নিজেদের কর্তব্য পালন করে।

ক্রমবর্ধিত কৃষি-ঋণ হইতেই বুঝা যায়, ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থা কত যুক্তিবিরুদ্ধ, কত শিথিল, অধিকাংশ ব্যক্তিরই কোন সঞ্চয়, কোন সঞ্চিত অস্থাবর সম্পত্তি নাই, দুর্দিনে আত্মরক্ষার উপায় নাই, সর্বদাই তাহারা অন্নাভাবের বিভীষিকার মধ্যে বাস করে। দুর্যোগ বা আকস্মিক বিপদ হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না। সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯২৯-৩০-এ গভর্ণমেন্ট-নিয়োজিত ব্যাঙ্কিং-তদন্ত কমিটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ভারতে (ব্রহ্মদেশ সহ) মোট কৃষি-ঋণের পরিমাণ ৮৬০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে জমিদার, কৃষক-মালিক ও রায়ত সকলের ঋণই ধরা হইয়াছে, কিন্তু ইহার বড় অংশ হইল চাষীদের ঋণ। গভর্ণমেন্টের মুদ্রাবিনিময় বাট্টা-নীতি মহাজন শ্রেণীর পক্ষেই সুবিধাজনক, ইহাও ঋণভার বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। টাকার বিনিময়হার এক শিলিং চার পেন্স না করিয়া এক শিলিং ছয় পেন্স করায় (ভারতবাসীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও) কৃষিঋণের পরিমাণ শতকরা ১২॥০ টাকা অর্থাৎ ১০৭ কোটি টাকা বাড়িয়াছে।*

মহাযুদ্ধের পর সহসা স্বল্পস্থায়ী মূল্য বৃদ্ধি এবং পরে ক্রমাগত বাজার পড়িয়া যাওয়ায় কৃষকদের অবস্থা মন্দ হইতেছিল। ১৯২৯-এ জগদ্ব্যাপী অর্থ-সঙ্কট তাহার উপর আসিয়া পড়ায় মহাসঙ্কট দেখা দিল।

কৃষি-পণ্যের মূল্যের সহিত হারা-হারিসূত্রে খাজনা ধার্য হউক, ১৯০১ সালে যুক্তপ্রদেশে আমাদের প্রস্তাব ছিল ইহাই। অর্থাৎ ১৯০১ সালে কৃষিপণ্যের যে মূল্য, অতীতে ঐরূপ মূল্য থাকাকালীন যে হারে খাজনা লওয়া হইত, বর্তমানেও তাহাই লওয়া হউক। মোটামুটি ভাবে ত্রিশ বৎসর পূর্বে ১৯০১ সালে ঐ অবস্থা ছিল। ইহা মোটামুটি হিসাব হইলেও, ইহার প্রয়োগ সহজ ছিল না;

---

* ভারতের কৃষি-ঋণের পরিমাণ ৮৬০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে, আমার মতে ইহা অত্যন্ত কম করিয়া ধরা হইয়াছে। প্রকৃত ঋণের পরিমাণ অনেক বেশী। যাহা হউক, এই চার পাঁচ বৎসরে উহা আরও বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। পাঞ্জাব প্রদেশের ঋণের পরিমাণ, পাঞ্জাব ব্যাঙ্কিং-তদন্ত-কমিটির (১৯২৯) হিসাবে ১৩৫ কোটি টাকা। পাঞ্জাবের ঋণ-সালিশ আইন সম্বন্ধে নিয়োজিত কমিটির (অক্টোবর, ১৯৩৪) রিপোর্টে প্রকাশ, "পাঞ্জাবে কৃষকদের ঋণের বোঝা অত্যন্ত বেশী, খুব কম করিয়া হিসাব ধরিলেও ২০০ কোটি টাকার কম হইবে না।" এই নূতন হিসাবে, পূর্বের তদন্ত-কমিটি অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকা বেশী ধরা হইয়াছে। এই বর্ধিত হার যদি ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ সম্বন্ধেও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বর্তমানে (১৯৩৪) ভারতের কৃষি-ঋণের পরিমাণ ১২০০ কোটি টাকারও অধিক দাঁড়াইবে।

কেন না, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট, দখলীস্বত্বহীন, চুকানদার, দরচুকানদার প্রভৃতি নানা-শ্রেণীতে রায়তগণ বিভক্ত। আর এক উপায় ছিল এবং নিঃসন্দেহ তাহাই সদুপায় যে, কৃষিকার্যের ব্যয় ও জীবনধারণোপযোগী মজুরী বাদ দিয়া প্রত্যেকের খাজনা দিবার ক্ষমতানুযায়ী ব্যবস্থা করা। যাহা হউক, এই শেষোক্ত উপায়েও জীবনযাত্রার ব্যয় যথাসম্ভব কম করিয়া ধরিলেও দেখা গিয়াছে যে, ভারতে অধিকাংশ জমি ও জমা মোটেই লাভজনক নহে এবং আমরা ১৯৩১ সালে যুক্তপ্রদেশেও ইহার বহুতর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। অনেক রায়তের পক্ষেই সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া (যদি বিক্রয় করিবার কিছু থাকে) অথবা উচ্চ হারে সুদ কবুল করিয়া ঋণ করা ব্যতীত খাজনা শোধ করিবার উপায় নাই।

যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির প্রাথমিক ও পরীক্ষামূলক প্রস্তাব ছিল যে, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজনা শতকরা পঞ্চাশ টাকা কম করা হউক এবং তদতিরিক্ত অধিকতর দুর্দশাপন্ন প্রজাদের খাজনা আরও কম লওয়া হউক। ১৯৩১ সালের মে মাসে যখন গান্ধিজী যুক্ত-প্রদেশে আসিয়া গভর্ণর স্যর ম্যালকম হেলীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল, তাঁহারা একমত হইতে পারিলেন না। ইহার পরই গান্ধিজী যুক্ত-প্রদেশের জমিদার ও প্রজাদের নিকট এক আবেদনপত্র প্রচার করিলেন, তিনি প্রজাদিগকে সাধ্যানুযায়ী খাজনা দিবার অনুরোধ করিলেন। তিনি যে সংখ্যা নির্দেশ করিলেন, তাহা আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট হার অপেক্ষা অনেক বেশী। আমাদের প্রাদেশিক কমিটি গান্ধিজীর সংখ্যা মানিয়া লইলেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না, কেন না, গভর্ণমেণ্ট রাজী হইলেন না।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অবস্থাও সঙ্গীন ছিল। ভূমিরাজস্বই তাঁহাদের প্রধান আয়, ইহা একেবারে ছাড়িয়া দিলে বা বহুল পরিমাণে কমাইয়া দিলে দেউলিয়া হইতে হয়। অন্যদিকে কৃষক-চাঞ্চল্য সম্পর্কে তাঁহাদের ভীতিও ছিল, যথাসম্ভব খাজনা মকুব করিয়া তাঁহারা কৃষকদিগকে শান্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু দুইকূল রক্ষা করা যায় না। কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে আছেন জমিদারগণ, অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহারা অকর্মণ্য ও অপ্রয়োজনীয় পরগাছা। রাষ্ট্র ও কৃষকের হিতকল্পে ইহাদের ক্ষতি করিয়াও কিছু করা সম্ভব ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বর্তমানে যে ভাবে গঠিত, তাহাতে রাজনৈতিক কারণে, এখনও যে অল্পসংখ্যক শ্রেণী তাঁহাদের হাতে আছে, তাহার অন্যতম এবং নির্ভরশীল জমিদার শ্রেণীকে তাঁহারা স্নেহবঞ্চিত করিতে পারেন না।

অবশেষে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট জমিদার ও প্রজাদের খাজনা হ্রাসের ব্যবস্থা ঘোষণা করিলেন। এই ব্যবস্থা এত জটিল যে, সহজে কিছু বুঝিবার উপায় নাই। তবে প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যে অনেক কম, তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। ইহার মধ্যে চলতি সালের খাজনার কথাই উল্লেখ ছিল, প্রজাদের বাকি বকেয়া খাজনা ও দেনার কথা উল্লেখ ছিল না। যদি প্রজারা চলতি বৎসরের প্রথম ছয় মাসের কিস্তীর টাকা দিতে না পারে, তাহা হইলে বাকী বকেয়া ও পুরাতন দেনা কিরূপে শোধ দিবে। জমিদারদের প্রচলিত প্রথা এই যে, তাঁহারা বকেয়া খাজনা ওয়াশীল না করিয়া হাল খাজনা লয় না। প্রজাদের দিক হইতে এই নিয়ম অত্যন্ত বিপজ্জনক, কেন না, যে কোন সময়ে কিস্তী খেলাপের দায়ে তাহার জমি নীলামে বিক্রয় হইতে পারে।

প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি মহা অসুবিধার মধ্যে পড়িলেন। আমরা বুঝিলাম যে, রায়তদের প্রতি অবিচার করা হইল, কিন্তু আমরা কেন

প্রতিকার করিতে পারিলাম না। রায়তদিগকে খাজনা না দিবার পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব লইবার আমাদের ইচ্ছা ছিল না। আমরা তাহাদের যথাসাধ্য খাজনা দিবার পরামর্শ দিতে লাগিলাম এবং তাহাদের দুর্ভাগ্যের সহিত সহানুভূতিজ্ঞাপন ও আশাভরসা দিতে লাগিলাম। খাজনা মাপ দেওয়ার পরও তাহাদের নিকট সাধ্যের অতিরিক্ত দাবী করা হইল।

আইনী ও বে-আইনী পীড়ন-যন্ত্র চলিতে আরম্ভ করিল। হাজার হাজার উচ্ছেদের মামলা দায়ের হইল; গরু-বাছুর, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, জমিদারের গোমস্তাদের মারধর চলিতে লাগিল। অনেক রায়ত অংশতঃ খাজনা পরিশোধ করিল, তাহাদের মতে, তাহারা যথাসাধ্য দিতে কসুর করিল না সম্ভবতঃ কোন কোন স্থলে কেহ কেহ কিছু বেশী দিতে পারিত, কিন্তু অধিকাংশ প্রজার পক্ষেই ইহা অত্যন্ত বেশী। আংশিক খাজনা দিয়া তাহারা রেহাই পাইল না। আইনের জগদ্দল পাথর গড়াইয়া চলিল, যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই নির্মম-ভাবে পিষ্ট করিল। আংশিক খাজনা দেওয়া সত্ত্বেও, উচ্ছেদের মামলাগুলি ডিক্রী হইতে লাগিল, গরু, বাছুর, ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামে বিক্রয় হইতে লাগিল। খাজনা না দিলেও রায়তদের অবস্থা ইহার চেয়ে মন্দ হইত না। বরং তাহাদের ভালই হইত, কেননা অন্ততঃ ঐ পরিমাণ টাকা তাহারা বাঁচাইতে পারিত।

তাহারা দলে দলে আসিয়া আমাদের নিকট দুঃখের সহিত অনুযোগের সুরে বলিতে লাগিল, আমাদের কথামত খাজনা দিয়াও তাহাদের এই দশা হইল। এক এলাহাবাদ জেলাতেই হাজার হাজার কৃষক জমি হারাইল, আরও বহু সহস্র কৃষকের নামে মামলা চলিতে লাগিল। জেলা কংগ্রেসের কার্যালয়ে সারাদিন উত্তেজিত জনতা ভিড় করিয়া থাকিত। আমার বাড়ীর অবস্থাও তদ্রূপ—সময় সময় এই অবস্থা হইতে নিষ্কৃতির জন্য আমার পলায়ন করিবার, লুকাইয়া থাকিবার ইচ্ছা হইত। অনেক রায়ত আসিয়া শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখাইয়া বলিত, জমিদারের গোমস্তা, পাইকেরা মারিয়াছে। আমরা হাসপাতালে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতাম। তাহারাই বা কি করিবে? আমরাই বা কি করিব? আমরা অবস্থা বর্ণনা করিয়া প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট দীর্ঘ পত্র লিখিতে লাগিলাম। নৈনীতাল ও লক্ষ্ণৌয়ে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্তার আদান-প্রদানের জন্য কংগ্রেস কমিটি গোবিন্দবল্লভ পন্থকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনিও গভর্ণমেণ্টের নিকট সর্বদা পত্র লিখিতে লাগিলেন। আমাদের সভাপতি ডাক্তার এ. কে. শেরোয়ানী এবং আমিও মাঝে মাঝে পত্র লিখিতাম।

জুন ও জুলাই মাসে বর্ষাকালে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। এখন চাষ আবাদ ও বীজ বুনিবার সময়। যে সমস্ত প্রজাকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে তাহারা অলসভাবে বসিয়া তাহাদের পতিত জমি দেখিবে? কৃষকের পক্ষে ইহা কঠিন, ইহা তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আইনতঃ উচ্ছেদ সাব্যস্ত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে জমি বে-দখল হয় নাই। আদালতের ডিক্রীর পর বিশেষ কিছু করা হয় নাই। এখন যদি তাহারা জমিতে লাঙ্গল দেয়, তাহা ফৌজদারী আইনে অনধিকার প্রবেশ হইবে, ছোটখাট দাঙ্গাহাঙ্গামাও হইতে পারে। অপরে আসিয়া তাহার জমি চাষ করিবে, ইহা সহ্য করাও কৃষকের পক্ষে কঠিন। তাহারা আমাদের উপদেশ চাহিল। আমরা কি উপদেশ দিতে পারি?

গ্রীষ্মকালে আমি যখন গান্ধীজীর সহিত সিমলায় গিয়াছিলাম, তখন ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিকট এই অসুবিধার কথা বলিয়াছিলাম

এবং আমাদের মত অবস্থায় তিনি পড়িলে কি করিতেন, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহার উত্তরে আমার চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন, যে রায়তকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছে, সে এই প্রশ্ন করিলে আমি কোন উত্তরই দিতাম না। যদিও আইনতঃ সে উচ্ছেদ হইয়াছে, তথাপি তিনি তাহাকে এমন কথাও বলিতেন না যে, জমি চাষিও না। সিমলার উচ্চশৃঙ্গে বসিয়া তাঁহার পক্ষে একথা বলা সহজ। কিন্তু ইহা ফাইলের উপর হুকুম লেখা বা অঙ্ক কষিয়া ফল বাহির করার মত ব্যাপার নহে। তিনি অথবা নৈনীতালের বড়কর্তাগণ কখনও মানুষের সংস্পর্শে আসেন না, মানুষের দুঃখ-বেদনা তাঁহাদের চক্ষে পড়ে না।

সিমলায় আমাদিগকে বলা হইল যে, আমরা কৃষকদিগকে একটি মাত্র উপদেশ দিতে পারি যে, তাহাদের পুরো খাজনা দেওয়া কর্তব্য, একান্ত নিরুপায় হইলে যথাসাধ্য দেওয়া উচিত। কার্যতঃ আমরাও তাহাদের যথাসাধ্য খাজনা দেওয়ার কথা বলিয়াছি। অবশ্য তাহাদিগকে আমরা গৃহপালিত পশু বিক্রয় করিতে বা পুনরায় ঋণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম এবং ফল কি হইল, তাহাও দেখিলাম।

সে বারের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে আমাদের শ্রান্তি ক্লান্তির অন্ত ছিল না। ভারতীয় কৃষকদের দুঃখ-দুর্ভাগ্য সহ্য করিবার এক আশ্চর্য শক্তি আছে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ব্যাধি, মড়ক, চিরদারিদ্র্যের পেষণ—এ সকলের অধিকাংশই তাহাদের স্কন্ধে পড়ে; যখন আর সহ্য করিতে পারে না, তখন নীরবে, কাহাকেও দোষ না দিয়া হাজারে হাজারে মৃত্যু আলিঙ্গন করে। তাহাদের সম্মুখে এই পথই খোলা আছে। অতীতের দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতার তুলনায় ১৯৩১ সালে নূতন কিছু ঘটে নাই। কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক, এ বৎসর সে দেখিল যে, ইহা কোন দুর্বোধ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ নহে যে নিরুপায় ভাবে সহ্য করিতে হইবে; এই দুর্দশা মানুষের রচনা দেখিয়াই তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অভিনব রাজনৈতিক শিক্ষা ফলপ্রসূ হইল। আমাদের নিকটও ১৯৩১-এর ঘটনাবলী অত্যন্ত বেদনাবহ; কেন না, ইহার জন্য আমরাও অংশতঃ দায়ী—কৃষকেরা কি আমাদের পরামর্শানুসারে কাজ করে নাই? এবং আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, আমরা সদাসর্বদা সাহায্য না করিলে অবস্থা আরও শোচনীয় হইত। আমরাই তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া শক্তিশালী করিয়াছিলাম বলিয়াই তাহারা বর্ধিত হারে খাজনা মাপ পাইয়াছিল, অন্যথা ইহা সম্ভব হইত না। জোরজুলুম ও অসদ্ব্যবহার যাহা তাহারা পাইয়াছে, তাহা যতই মন্দ হউক, এই হতভাগ্য লোকদের নিকট তাহা নূতন নহে। কেবল প্রয়োগের তারতম্য (বর্তমানে ইহা আরও বেশী) এবং প্রচারের উপরই ইহা নির্ভর করে। সাধারণতঃই গ্রামে জমিদারের গোমস্তার দুর্ব্যবহার ও পীড়ন সচরাচর ঘটনা, যদি হতভাগ্য ব্যক্তি মারা না যায়, তাহা হইলে অল্পলোকেই তাহা শুনিতে পায়। বর্তমানে ইহার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, কেন না আমাদের সঙ্ঘবদ্ধতা এবং কৃষকদের নব-জাগরণের ফলে সকল প্রকার দুর্ব্যবহারের সংবাদই কংগ্রেসের কার্যালয়ে আসে।

গ্রীষ্ম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বলপূর্বক খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা শিথিল হইল, অত্যাচারও কমিল। জমি হইতে বঞ্চিত বহুসংখ্যক রায়তকে লইয়া আমরা বিব্রত হইয়া উঠিলাম। ইহাদের কি করা যায়? অধিকাংশ জমি পতিত পড়িয়াছিল বলিয়াই আমরা উহাদিগকে জমি ফিরাইয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। ভবিষ্যতের প্রশ্ন আরো জরুরী। যে খাজনা মাপ হইয়াছে, তাহা অতীত কিস্তির জন্য, ভবিষ্যতের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। অক্টোবর হইতে নূতন কিস্তীর খাজনা আদায় আরম্ভ হইবে। তখন কি ঘটিবে? আমরা কি

পূর্বের মতই পীড়নের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে? ইহা বিবেচনা করিবার জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সরকারী কর্মচারী ও কয়েকজন জমিদার লইয়া একটি কমিটি গঠন করিলেন। কৃষকদের কোন প্রতিনিধি ইহাতে লওয়া হইল না। শেষ মুহূর্তে যখন কমিটির কাজ সুরু হইয়াছে, তখন আমাদের পক্ষ হইতে গোবিন্দ-বল্লভ পন্থকে গভর্ণমেণ্ট কমিটিতে যোগ দিবার অনুরোধ করিলেন। তখন জরুরী বিষয়গুলির আলোচনা শেষ হইয়া গিয়াছে, অতএব এত বিলম্বে কমিটিতে যোগ দেওয়া তিনি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না।

যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও কৃষিসম্পর্কিত অতীত ও বর্তমান তথ্য সংগ্রহ করিয়া বর্তমান অবস্থা নির্ণয়ের জন্য একটি ছোট কমিটি নিযুক্ত করিলেন। এই কমিটি যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক সুদীর্ঘ বিবরণী রচনা করিলেন; কৃষি-পণ্যের মূল্য হ্রাস হওয়ায় অবস্থা কতদূর শোচনীয় হইয়াছে, তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি ব্যাপক। গোবিন্দবল্লভ পন্থ, রফি আহম্মদ কিদোয়াই এবং বেঙ্কটেশ নারায়ণ তেওয়ারীর স্বাক্ষরিত বিবরণী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার বহুপূর্বেই গান্ধিজী গোলটেবিল বৈঠকের জন্য লণ্ডনে গিয়াছিলেন। প্রস্থানের পূর্বে তিনি ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন এবং ইহার অন্যতম কারণ যুক্ত-প্রদেশের কৃষক সমস্যা। এমন কি, তিনি স্থির করিয়াছিলেন, যদি লণ্ডনে না যাওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি যুক্ত-প্রদেশে আসিয়া এই জটিল সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করিবেন। সিমলায় গভর্ণমেণ্টের সহিত সর্বশেষ আলোচনায় অন্যান্য বিষয়ের সহিত যুক্ত-প্রদেশের কথাও আলোচিত হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডে প্রস্থানের পর, আমরা নিয়মিতভাবে তাঁহাকে সংবাদ দিতাম। প্রথম দুই মাস, আমি নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে, সাধারণ ও বিমানডাকে তাঁহার নিকট পত্র দিতাম। শেষের দিকে শীঘ্রই তাঁহার প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশা করিয়া নিয়মিতভাবে পত্র দিতাম না। তিনি আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি তিন মাসের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন। নভেম্বর মাসে তিনি না ফেরা পর্যন্ত ভারতে কোন সঙ্কট উপস্থিত হইবে না আমরা এইরূপ আশা করিয়াছিলাম। তাঁহার অনুপস্থিতিতে গভর্ণমেণ্টের সহিত কোন সংঘর্ষ না হয়, সেজন্য আমরা সাবধান ছিলাম। যাহা হউক তাঁহার ফিরিবার বিলম্ব হইতে লাগিল এবং কৃষক সমস্যাও অতি দ্রুত সঙ্গীন হইয়া উঠিল। আমরা তারযোগে বিস্তারিত সংবাদ তাঁহাকে জানাইলাম এবং কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ চাহিলাম। তিনি তারে উত্তর দিলেন যে, এবিষয়ে তিনি নিজেকে অসহায় বোধ করিতেছেন এবং আমাদিগকে নিজেদের বিবেচনানুযায়ী কাজ করিবার উপদেশ দিলেন।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কার্যকরী সমিতিকেও সমস্ত অবস্থা জানাইলেন। আমি নিজে তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে সংবাদ দিতে লাগিলাম। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কার্যকরী সমিতি আমাদের প্রাদেশিক সভাপতি তাসাদ্দুক শেরোয়ানী এবং এলাহাবাদ জিলার সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

গভর্ণমেণ্ট কৃষি-কমিটির রিপোর্ট কতকগুলি মন্তব্যসহ শীঘ্রই প্রকাশিত হইল। জটিল ও অস্পষ্ট ব্যবস্থার ভার বহুল পরিমাণে স্থানীয় কর্মচারীদের উপর অর্পিত হইল। বিগত কিস্তি অপেক্ষা এবারে আরও কিছু বেশী খাজনা মাফের প্রস্তাব হইল। কিন্তু আমাদের মতে তাহা পর্যাপ্ত নহে। সরকারী ব্যবস্থার নীতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি—এই উভয় ব্যাপারেই আমরা আপত্তি প্রকাশ করিলাম।

সরকারী রিপোর্টে কেবল ভবিষ্যতের কথাই ধরা হইয়াছিল; বকেয়া খাজনা, দেনা এবং অগণিত ভূমিহীন কৃষকের বিষয়, কৃষকের কথার কোন উল্লেখ ছিল না। এখন আমরা কি করিব? গত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে আমরা যে-ভাবে কৃষকদের যথাসাধ্য খাজনা দিবার উপদেশ দিয়াছি, তাহাই করিব? কিন্তু তাহার পরিণাম কি একই প্রকার হইবে না? আমরা পূর্ব-অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি যে, এরূপ নির্বোধ উপদেশের পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয় নহে। হয় কৃষকেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া নির্দিষ্ট ও সংশোধিত দাবী অনুযায়ী পুরা খাজনা আদায় দিক, অন্যথা বর্তমানে কিছুই না দিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করুক। আংশিক খাজনা দিলে এদিক ওদিক কোনদিকই রক্ষা হয় না। কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হয় এবং তাহাদের জমি হস্তান্তরিত হইয়া যায়।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, সরকারী প্রস্তাবগুলি ঐ আকারে গ্রহণ করার পক্ষে অনুকূল নহে; তবে বিগত গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা এবার কিছু অধিক হারে খাজনা মাপের ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকারী প্রস্তাবগুলি কৃষকদের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক করিবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া আমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু আশার বিশেষ লক্ষণ দেখিলাম না। এবং যে সংঘর্ষ আমরা এড়াইতে চাহি, তাহাই দ্রুত-গতিতে আমাদের সম্মুখীন হইতে লাগিল। কংগ্রেসের প্রতি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট তথা ভারত গভর্ণমেণ্টের মনোভাব ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিল। আমাদের বড় বড় চিঠিগুলির উত্তরে অতি সংক্ষেপে স্থানীয় কর্মচারীদের নিকট জানাইবার নির্দেশ দেওয়া হইত। স্পষ্টই বুঝা গেল যে, গভর্ণমেণ্ট কোনমতেই আমাদিগকে উৎসাহ দিতে রাজী নহেন। কৃষকদিগকে খাজনা মাপ দিবার দরুণ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বাড়িবার সম্ভাবনা আছে, ইহা গভর্ণমেণ্টের নিকট অসন্তোষ-জনক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দীর্ঘকালের অভ্যাসবশতঃ তাঁহারা সরকারী মর্যাদার দিক দিয়া সকল বিষয় ভাবিতে অভ্যস্ত। জনসাধারণ খাজনা মাপের জন্য কংগ্রেসকে বাহাদুরী দিবে, ইহা তাঁহাদের অসহ্য বোধ হইয়াছিল। এবং যাহাতে এরূপ ধারণার উদ্ভব না হয়, সেজন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে দিল্লী ও অন্যান্য স্থান হইতে আমরা সংবাদ পাইতে লাগিলাম যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে দমননীতি অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। একটি কনিষ্ঠাঙ্গুলীর সঙ্কেতে আমাদিগকে যষ্টিক দ্বারা শাসন করিবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইবে। সরকারী সঙ্কল্পের বিস্তৃত বিবরণও আমরা পাইতে লাগিলাম। নভেম্বর মাসের কোন সময়, আমার মনে আছে, ডাঃ আন্সারী আমাকে (স্বতন্ত্রভাবে কংগ্রেসের সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেলকে) সংবাদ দিলেন যে, আমরা পূর্বে যে সকল সংবাদ পাইয়াছি, তাহা সত্য, সীমান্ত-প্রদেশে ও যুক্ত-প্রদেশে কি শ্রেণীর অর্ডিন্যান্স জারী হইবে, তাহারও বিস্তৃত বিবরণ জানাইলেন। বাঙ্গলাদেশ, আমার বিশ্বাস, ইতিমধ্যেই নূতন অর্ডিন্যান্স পুরস্কারস্বরূপ পাইয়াছে কিংবা শীঘ্রই পাইবে। দুই মাস পরে যখন নূতন অর্ডিন্যান্সগুলি জারী হইল, তখন দেখা গেল যে, ডাঃ আন্সারীর বিবরণ বর্ণে বর্ণে সত্য। গোলটেবিল বৈঠকের অপ্রত্যাশিত দৈর্ঘ্যের দরুণ গভর্ণমেণ্ট নূতন অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। যখন গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যগণ আশার কথায় পরস্পরের কর্ণে মধুবর্ষণ করিতেছিলেন, তখন ভারতে পাইকারী ভাবে দমন-নীতি প্রয়োগ গভর্ণমেণ্ট যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। অতএব মনকষাকষি বাড়িতে লাগিল, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘটনার গতি

ধরিতে লাগিল। ইহার অপরিহার্য গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করা আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত ছিল না। আমাদের পক্ষে ইহার সম্মুখীন হইয়া ব্যক্তিগতভাবে বা সম্মিলিত ভাবে জীবন-নাট্যের এই বিয়োগান্তক অভিনয়ের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করিতেছিলাম যে, যবনিকা উত্তোলিত হইয়া অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা আরম্ভ হইবার পূর্বেই গান্ধিজী আসিয়া সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধেই লইবেন, যুদ্ধ না শান্তি তিনিই নির্ণয় করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব স্কন্ধে লইবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না।

যুক্ত-প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট আর একটি এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন যে পল্লী অঞ্চলে ভীতির সঞ্চার হইল। খাজনা মাপের যে সকল পরোয়ানা প্রজাদের মধ্যে বিলি করা হইল, তাহাতে খাজনা মাপের পরিমাণ উল্লিখিত ছিল। এবং উহার সহিত এই ভীতিপূর্ণ সাবধানবাণী ছিল যে, একমাসের মধ্যে (কোন ও বা তাহারও কম সময় উল্লেখ ছিল) সম্পূর্ণ টাকা আদায় না দিলে খাজনা মাপ প্রত্যাহার করা হইবে এবং পুরা টাকা আদায় করিবার জন্য আইন-সঙ্গত উপায় অবলম্বন করা হইবে। ইহার অর্থ জমি হইতে উচ্ছেদ, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ইত্যাদি। সাধারণ বৎসরে রায়তেরা ২।৩ মাসের কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দিয়া খাজনা শোধ করে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে সময়টুকুও দেওয়া হইল না। সমস্ত পল্লী অঞ্চল অকস্মাৎ সঙ্কটের মধ্যে পড়িল, প্রজারা পরোয়ানা হস্তে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া প্রতিবাদ ও অভিযোগ করিতে লাগিল এবং পরামর্শ চাহিল। গভর্ণমেণ্ট অথবা তাহাদের স্থানীয় কর্মচারীদের পক্ষে এই ভীতি প্রদর্শন—অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছিল। আমরা পরে শুনিলাম যে ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। কিন্তু ইহার ফলে শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইল এবং ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া ইহা সংঘর্ষকে অপরিহার্য করিয়া তুলিল।

কি কৃষকগণ, কি কংগ্রেস অনুভব করিল যে শীঘ্রই কার্য স্থির করার প্রয়োজন, গান্ধিজীর প্রত্যাবর্তনের আশায় আমরা ইতিকর্তব্য নির্ধারণ স্থগিত রাখিতে পারি না। আমরা কি করিব, কি উপদেশ দিব? আমরা জানি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে কৃষকদের পক্ষে দাবীর অনুরূপ খাজনা দেওয়া সম্ভব নহে; এই অবস্থায় কি করিয়া আমরা তাহাদিগকে ঐরূপ উপদেশ দেই? এবং বকেয়া খাজনারই বা কি হইবে? যদি তাহারা দাবীর সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ পরিশোধও করে তাহা হইলে তাহা বকেয়া বাকীতে জমা হইয়া তাহাদের উচ্ছেদের সম্ভাবনাও থাকিয়া যাইবে নাকি?

এলাহাবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটি শক্তিশালী কৃষকদের লইয়া বিব্রতার প্রবৃত্ত হইল। ইঁহারা স্থির করিলেন যে কৃষকদিগকে খাজনা আদায় দিবার উপদেশ দেওয়া যায় না। যাহা হউক, কথা উঠিল যে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ তথা নিখিল ভারত কার্যকরী সমিতির সম্মতি ব্যতীত এরূপ আক্রমণশীল উপায় অবলম্বন করা যায় না। অতএব জিলা ও প্রদেশের পক্ষ হইতে পুরুষোত্তমদাস টাণ্ডন ও তাসাদ্দুক শেরোয়ানী কার্যকরী সমিতির নিকট তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিলেন। সমস্যা কেবলমাত্র এলাহাবাদ জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক প্রশ্ন হইলেও রাজনৈতিক অসন্তোষের দরুণ ইহার পরিণাম বহুদূর পর্যন্ত যাইতে পারে, ইহা আমরা অনুভব করিলাম। এলাহাবাদ জিলা কমিটি কি সাময়িক ভাবে কৃষকদিগকে খাজনা প্রদান বন্ধ রাখিবার উপদেশ দিয়া সন্ধিমূলক সর্তের জন্য পুনরায় গভর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্তা চালাইবে? এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলাম, কিন্তু আমরা কি করিতে পারি? কার্যকরী সমিতি গান্ধিজীর

প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ নিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্থনৈতিক সমস্যা শ্রেণী সমস্যায় পরিণত না হইতে পারে সেদিকেও তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। কার্যকরী সমিতি রাজনৈতিক দিক দিয়া যথেষ্ট অগ্রসর হইলেও সমাজনীতির দিক দিয়া ততটা ছিলেন না। এবং রায়ত বনাম জমিদার প্রশ্ন উত্থাপন করা তাঁহারা অপছন্দ করিতেন।

আমার সমাজতান্ত্রিক মনোবৃত্তির জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে আমার পরামর্শ লওয়া তাঁহারা নিরাপদ মনে করিতেন না। কিন্তু কার্যকরী সমিতি যুক্ত-প্রদেশের সমস্যা সম্যকরূপে উপলব্ধি করুন, আমার এই ইচ্ছা ছিল। কেন না আমাদের মধ্যে অধিকতর চরমপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী সদস্যেরাও নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘটনাচক্রে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছিলেন। কাজেই আমাদের কার্যকরী সমিতির সভায় শেরোয়ানী ও আমাদের প্রদেশের অন্যান্যের উপস্থিতিতে আমি আনন্দিত হইলাম। শেরোয়ানী (আমাদের প্রাদেশিক সভাপতি) কোন মতেই উগ্রপন্থী ছিলেন না। কি রাজনীতি কি অর্থনীতি উভয় দিক হইতেই তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ছিলেন। এবং বৎসরের আরম্ভ হইতেই তিনি যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু তিনি সভাপতি হইয়া যখন দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন তখন বুঝিতে পারিলেন যে আমাদের সম্মুখে অন্য কোন পথ ছিল না। পরবর্তী প্রত্যেক কাজে প্রাদেশিক কমিটি তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা লাভ করিয়াছে। এমন কি সভাপতি হিসাবে তিনিও কমিটিকে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

তাসাদ্দুক শেরোয়ানীর যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যে কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ প্রভাবান্বিত হইলেন—আমিও এতখানি করিতে পারিতাম না। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া যখন তাঁহারা আর অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না তখন তাঁহারা প্রাদেশিক কমিটিকে যে কোন অঞ্চলে খাজনা ও রাজস্ব প্রদান বন্ধ রাখিবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা যুক্ত-প্রদেশের জনসাধারণকে সাধ্যমত এই উপায় অবলম্বন না করিয়া প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা চালাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

কিছুকাল এই আলোচনা চলিল, কিন্তু বিশেষ ফল হইল না। আমার বিশ্বাস এলাহাবাদ জিলায় খাজনা মাপের পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছিল। সাধারণ অবস্থায় একটা আপোষ, অন্ততঃ পক্ষে প্রকাশ্য সংঘর্ষ নিবারণ সম্ভবপর হইত। মতভেদের কারণ অল্পই থাকিত। কিন্তু অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। দুইপক্ষই—গভর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেস—আগতপ্রায় সংঘর্ষের অপরিহার্য সম্ভাবনা চিন্তা করিতেছিলেন; কাজেই আমাদের পারস্পরিক আলোচনায় মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না। উভয় পক্ষের আচরণের মধ্যেই কৌশলদ্বারা স্ব স্ব ভূমি দৃঢ় করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট গোপনে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। আমাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপেই জনসাধারণের চরিত্রবল ও দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে। এবং তাহা কোন গোপন উপায়ে গড়িয়া তোলা যায় না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ—আমিও সেই অপরাধীদের একজন—সাধারণের সম্মুখে বক্তৃতায় বলিতাম যে স্বাধীনতার সংঘর্ষ শেষ হইতে এখনও বহু বাকী এবং আমাদিগকে অদূর ভবিষ্যতেই বহু পরীক্ষা ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। আমরা জনসাধারণকে নিজেদের প্রস্তুত রাখিতে উপদেশ দিতাম বলিয়া আমাদিগকে যুদ্ধের গুজব সৃষ্টিকারী বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু কার্যতঃ আমাদের মধ্যশ্রেণীর কংগ্রেসকর্মীরা বাস্তব ঘটনার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন। এবং তাঁহারা

আশা করিতেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক সংঘর্ষ আর হইবে না। লণ্ডনে গান্ধিজীর উপস্থিতির ফলে সংবাদপত্রের পাঠকশ্রেণীর মন বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হইয়াছিল। তথাপি দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও ঘটনার গতি অগ্রসর হইল, বিশেষ ভাবে বাঙ্গলা, সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্ত-প্রদেশে নভেম্বর মাসে অনেকেই বুঝিতে পারিলেন যে সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতেছে।

ঘটনার গতি দেখিয়া যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ভীত হইলেন এবং যদি সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে সেজন্য পূর্ব হইতেই কতকগুলি ঘরোয়া ব্যবস্থা করিলেন। এলাহাবাদ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক এক কৃষক সম্মিলনী আহূত হইল। এই সম্মেলনে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তি স্বরূপ একটি প্রস্তাব এই ভাবে গ্রহণ করা হইল যে, অধিকতর সুবিধাজনক সর্ত না পাইলে তাঁহারা কৃষকদিগকে খাজনা বা রাজস্ব বন্ধ রাখিবার উপদেশ দিবেন। এই প্রস্তাবে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট মহা বিরক্ত হইলেন এবং ইহাতে সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করা হইয়াছে এই অজুহাত দেখাইয়া আমাদের সহিত আর কোন আলাপ আলোচনায় অসম্মত হইলেন। এদিকে উহাই আবার প্রতিক্রিয়ার মুখে ঝটিকার পূর্বাভাস মনে করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস নিজেদের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এলাহাবাদে আর একটি কৃষক সম্মেলনে পূর্বাপেক্ষা দৃঢ় ও মিলিত ভাবে আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কৃষকদিগকে অধিকতর সুবিধাজনক সর্ত না পাইলে খাজনা বন্ধ রাখিবার উপদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু এ পর্যন্ত "খাজনা বন্ধ" আন্দোলন করা হয় নাই, বরং "ন্যায্য খাজনা" প্রদানের আন্দোলন করা হইয়াছিল। এবং আমরা কথাবার্তা চালাইবারই প্রস্তাব করিতেছিলাম, যদিও প্রতিপক্ষ জাঁক দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এলাহাবাদ প্রস্তাবে যদিও জমিদার এবং প্রজা সকলের কথাই সমান ভাবে উল্লেখ ছিল, কিন্তু আমরা জানিতাম কার্যতঃ ইহা রায়ত এবং ছোট জমিদারেরাই মান্য করিবে।

১৯৩১-এ নভেম্বর মাসের শেষে এবং ডিসেম্বরের প্রারম্ভে যুক্ত-প্রদেশের অবস্থা এইরূপ ছিল। ইতিমধ্যে বাঙ্গলা ও সীমান্ত প্রদেশের ঘটনা সঙ্গীন হইয়া উঠিল এবং বাঙ্গলায় এক নূতন, ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী অর্ডিন্যান্স জারী করা হইল। শান্তির পরিবর্তে এই যুদ্ধের আভাস দেখিয়া সর্বত্র এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—গান্ধিজী কখন ফিরিবেন? যে আক্রমণের জন্য গভর্ণমেণ্ট পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছেন, তাহা আরম্ভ হইবার পূর্বেই কি তিনি ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইবেন? অথবা তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিবেন যে তাঁহার সহকর্মীরা কারাগারে এবং সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে? আমরা সংবাদ পাইলাম, তিনি যাত্রা করিয়াছেন এবং বৎসরের শেষ সপ্তাহে বোম্বাই উপস্থিত হইবেন। আমরা প্রত্যেক কংগ্রেসের প্রত্যেক বিশিষ্ট কর্মী কি কেন্দ্রীয় আফিসে কি প্রদেশে তাঁহার প্রত্যাগমন পর্যন্ত সংঘর্ষ এড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এমন কি সংঘর্ষ আরম্ভ করিতে হইলেও তাঁহার পরামর্শ ও নির্দেশের জন্য তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক। এই অসম প্রতিযোগিতায় আমরা নিজেদের অসহায় বোধ করিতে লাগিলাম। আরম্ভ করিবার দায়িত্ব ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে।

সন্ধির অবসান

যুক্ত-প্রদেশের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল যাবৎ অন্যান্য অসন্তোষের কেন্দ্র, বাঙ্গলা ও সীমান্ত প্রদেশে যাইবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত ছিলাম। প্রত্যক্ষভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং পুরাতন বন্ধুদের সহিত মিলিত হওয়ার আগ্রহও ছিল, অনেকের সহিত দুই বৎসর সাক্ষাতের সুযোগ পাই নাই। সর্বোপরি ঐ প্রদেশদ্বয়ের জনসাধারণের সাহস ও জাতীয় সংগ্রামে তাঁহাদের ত্যাগস্বীকারের শক্তির প্রতি আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেও আমি উন্মুখ হইয়াছিলাম। সাময়িকভাবে সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশের উপায় ছিল না, কোন খ্যাতনামা কংগ্রেসপন্থীর তথায় গমন ভারত গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিতেন না; এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কলহ সৃষ্টির অভিপ্রায় আমাদের ছিল না।

বাঙ্গলার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রদেশের প্রতি আমার গভীর আকর্ষণ সত্ত্বেও আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। আমি অনুভব করিলাম, সেখানে গিয়া নিজেকে অসহায়ই মনে করিব এবং হয়ত কোন উপকারেই লাগিব না। এই প্রদেশে কংগ্রেসপন্থীদের দুই দলের দীর্ঘস্থায়ী শোচনীয় কলহের দরুণ, বাহিরের কংগ্রেসপন্থীরা ভয়ে দূরে সরিয়া থাকিতেন, পাছে কোন পক্ষের সহিত জড়াইয়া পড়েন। ইহা উট পাখীর আত্মগোপনের নিস্ফল চেষ্টার মত দুর্বল নীতি। বাঙ্গলাকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দেওয়াও হয় না, তাহার সমস্যাগুলি সমাধানেরও সুবিধা হয় না। গান্ধিজী লণ্ডনে যাওয়ার কিছুকাল পরেই দুইটি ঘটনায় সহসা বাঙ্গলার প্রতি সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। ঘটনা দুইটি হিজলী ও চট্টগ্রামে ঘটিয়াছিল।

হিজলীতে বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের একটি বিশেষ বন্দিশালা ছিল। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইল যে, বন্দিশালার ভিতরে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, বন্দীরা সিপাহীদিগকে আক্রমণ করায় তাহারা গুলি করিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে একজন নিহত ও অনেকে আহত হইয়াছে। স্থানীয় সরকারী অনুসন্ধান সমিতি অব্যবহিত পরেই ঘটনার তদন্ত করিয়া গুলিবর্ষণ ও তাহার ফলাফলের নিন্দা হইতে কারারক্ষীদের অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু দাঙ্গার বর্ণনার মধ্যে অনেক কৌতূহলজনক ব্যাপার ছিল, ক্রমে দুই একটি করিয়া ঘটনা প্রকাশ পাইতে লাগিল, যাহা সরকারী বিবৃতির এবং পূর্ণ তদন্তের জন্য তীব্র দাবী উত্থাপিত করিল। ভারতে সাধারণ সরকারী প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া, বাঙ্গলা সরকার বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের লইয়া এক তদন্ত কমিটি গঠন করিলেন। ইহা সম্পূর্ণ সরকারী কমিটি; এই সমিতি সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়া ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলেন এবং ইঁহাদের সিদ্ধান্ত বন্দিশালার রক্ষীদেরই দোষ অনেক বেশী এবং গুলি করা অত্যন্ত অযৌক্তিক হইয়াছে। কাজেই পূর্বে প্রচারিত সরকারী ইস্তাহার একেবারেই মিথ্যা প্রমাণিত হইল।

হিজলীর ঘটনায় মধ্যে অত্যাশ্চর্য কিছুই ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই শ্রেণীর ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা ভারতে বিরল নহে। প্রায়ই সংবাদপত্রে 'জেলে হাঙ্গামার' কথা পাঠ করা যায়৮ সশস্ত্র ওয়ার্ডার ও প্রহরীরা কি আশ্চর্য বীরত্বের সহিত নিরস্ত্র ও অসহায় কয়েদীদের দমন করিয়া ফেলে, তাহার বিবরণও উহাতে থাকে।

হিজলীতে অভিনবত্ব এই যে, সরকারী কমিটিই গভর্ণমেণ্ট ইস্তাহারের একদেশ-দর্শিতা, এমন কি, ঘটনার মিথ্যা বিবৃতির কথা উদ্ঘাটন করিলেন। অতীতেও এই সকল সরকারী ইস্তাহারে লোকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিত না, এ ক্ষেত্রে তো হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া গেল।

হিজলীর ঘটনার পরেও সমস্ত ভারতবর্ষে জেলে অনেক "ঘটনা" ঘটিয়াছে। কোথাও গুলি চলিয়াছে অথবা জেল কর্মচারীরা অন্যাবিধ বল প্রয়োগ করিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই শ্রেণীর "জেল দাঙ্গায়" কেবল মাত্র কয়েদীরাই আহত হয়। সরকারী প্রচারিত ইস্তাহারে কয়েদীদের অনেক অপকার্যের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং কারাকর্মচারীর নির্দোষিতা প্রতিপন্ন হয়। তদন্তের দাবী সরাসরি অস্বীকার করা হয় এবং বিভাগীয় তদন্তই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। হিজলীর ঘটনা হইতে গভর্ণমেণ্ট এই শিক্ষা লাভ করিলেন যে, সম্যক ও নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং অভিযোক্তা স্বয়ংই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। হিজলীর দৃষ্টান্ত হইতে জনসাধারণের এই শিক্ষালাভ করা উচিত যে সরকারী ইস্তাহারগুলিতে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ থাকিবে না, গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে যাহা বিশ্বাস করিতে বলিবেন তাহাই থাকিবে।

চট্টগ্রামের ব্যাপার আরও গুরুতর। একজন টেরোরিষ্ট কোন মুসলমান পুলিশ ইনসপেক্টারকে গুলী করিয়া হত্যা করে, তারপর যাহা ঘটিল তাহাকেই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বলিয়া অভিহিত করা হইল। যাহা হউক, আসলে ইহা সচরাচর অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উহার গুরুত্বও অধিক। টেরোরিষ্টদের কার্যের সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক নাই ইহা সর্বজনবিদিত, পুলিশ কর্মচারীই তাঁহাদের লক্ষ্য, সে হিন্দুই হউক, মুসলমানই হউক কিছু যায় আসে না। তথাপি ইহা সত্য যে, পরে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হইয়াছিল। কেন ইহা ঘটিয়াছিল, ইহার কি কারণ ছিল তাহা কখনও স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয় নাই, যদিও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা অনেক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই দাঙ্গার একটি বিশেষত্ব ছিল। অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিরা, এংলো-ইণ্ডিয়ানগণ, প্রধানতঃ রেল কর্মচারী এবং গভর্ণমেণ্ট কর্মচারীরাও ব্যাপকভাবে প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। জে এম. সেনগুপ্ত এবং বাঙ্গলার অন্যান্য বিখ্যাত নেতারা চট্টগ্রামের ঘটনা সম্বন্ধে কতক-গুলি নির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তদন্তের দাবী করিয়াছিলেন; অন্যথা তাঁহাদের নামে মানহানির মামলা করা হউক, ইহাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কোনটাই করিলেন না।

চট্টগ্রামের এই অভূতপূর্ব ঘটনার মধ্যে দুইটি বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভাবিবার অনেক কিছু আছে। বহু দিক হইতে বিচার করিয়া টেরোরিজম যে নিন্দার্হ, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি, আধুনিক বৈপ্লবিক কর্ম-কৌশলের মধ্যেও উহার স্থান নাই। কিন্তু আকস্মিক সাম্প্রদায়িক হিংসানীতি ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িতে পারে, উহার এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিলে আমি বিশেষ-ভাবে ভীত হই। আমি একজন "নিরীহ হিন্দু" নহি যে, হিংসা দেখিয়া ভয় পাইব। যদিও আমি নিশ্চয়ই ইহা পছন্দ করি না, কিন্তু আমি জানি যে, ভারতে অনৈক্য ও আত্মকলহের বহুতর কারণ বিদ্যমান এবং এখানে ওখানে অনুষ্ঠিত হিংসা-নীতির ফলে ঐগুলি প্রবল হইবে। ইহাতে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত জাতি-গঠনকার্য অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিবে। যখন লোকে ধর্মের নামে অথবা যেহেতু

স্থান সংগ্রহ করিবার জন্য নরহত্যা করে, তখন তাহাদিগকে টেরোরিজম সংশ্লিষ্ট হিংসা-নীতিতে অভ্যস্ত করিয়া তোলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাজনৈতিক হত্যা-কাণ্ডও মন্দ; কিন্তু রাজনৈতিক টেরোরিস্টকে যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝাইয়া অন্য পথে আনা যাইতে পারে, কেন না তাহার উদ্দেশ্য একান্ত পার্থিব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় উদ্দেশ্যেই সে চালিত হয়। পক্ষান্তরে, ধর্মের জন্য নরহত্যা অধিকতর মন্দ। কেন না ইহার সহিত সম্পর্ক পরলোকের এবং এই শ্রেণীর ঘটনায় যুক্তিতর্কের অবতারণা করিবার চেষ্টাও বৃথা। এই দ্বিবিধ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে, সময় সময় উহা অন্তর্হিত হয় এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড দার্শনিক ব্যাখ্যায় প্রায় ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে পরিণত হয়।

একজন টেরোরিস্ট কর্তৃক চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মচারী হত্যা এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাগুলি উজ্জ্বল অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিল যে, টেরোরিস্টদের কার্যপ্রণালীর মধ্যে কত বিপজ্জনক সম্ভাবনা লুক্কায়িত আছে এবং ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতার ইহা কি বিপুল অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। ইহার পরবর্তী প্রতিশোধমূলক কার্যগুলি হইতে আমরা দেখিলাম যে, ভারতে ফাসিস্ত পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহার পর এই শ্রেণীর প্রতিশোধমূলক অন্যান্য দৃষ্টান্ত হইতে, বিশেষভাবে বাঙ্গলা দেশের ঘটনাগুলি হইতে বুঝা গিয়াছে যে, ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ে ফাসিস্ত মনোভাব নিশ্চিতরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল কতকগুলি ভারতীয়ও ঐ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িয়াছিল।

ইহা আশ্চর্য যে, টেরোরিস্টগণেরও, অন্ততঃ তাহাদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গীও এই শ্রেণীর ফাসিস্ত ভাবাপন্ন, তবে ইহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তাহাদের জাতীয় ফাসিজম ইউরোপীয়ান, এংলো-ইণ্ডিয়ান ও কতকগুলি উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয়ের সাম্রাজ্যনীতিক ফাসিজমের বিরোধী।

১৯৩১-এর নভেম্বর মাসে আমি কয়েকদিনের জন্য কলিকাতা গিয়াছিলাম। এই কয়দিন আমার উপর অত্যন্ত কাজের চাপ পড়িয়াছিল। ব্যক্তিবিশেষের সহিত দেখা শুনা, বিভিন্ন দলের সহিত ঘরোয়া বৈঠক ছাড়াও আমি কতকগুলি জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম। এই সকল সভায় আমি টেরোরিজম-এর প্রশ্ন আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে ইহা কত অন্যায় নিষ্ফল ও অনিষ্টকর। আমি টেরোরিস্টদের গালাগালি করি নাই, কিম্বা আমাদের এক শ্রেণীর স্বদেশবাসীর ফ্যাসনের অনুকরণ করিয়া তাহাদিগকে “কাপুরুষ” বা “ভীরু”ও বলি নাই। এ কথা তাহারাই বলেন যাঁহারা দুঃসাহসিক কাজ করিবার কি নিজেকে বিপন্ন করিবার প্রলোভন সর্বদাই জয় করেন। যে নর কিংবা নারী সর্বদা নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতেছে, তাহাকে ‘কাপুরুষ’ বা ‘ভীরু’ বলা আমার মতে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা। যে ব্যক্তি নিজে কিছু করিতে পারে না অথচ দূর হইতে চীৎকার করে, সেই নিরীহ সমালোচককে তাহারা প্রতিক্রিয়ার মুখে ঘৃণাই করিয়া থাকে।

আমার কলিকাতায় অবস্থিতির সর্বশেষ সন্ধ্যায় ষ্টেশনে যাইবার কিছুকাল পূর্বে দুজন যুবক আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। তাহাদের বয়স ২০-এর বেশী হইবে না, তাহাদের বিবর্ণ মুখমণ্ডলে উদ্বেগের চিহ্ন, চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল। আমি তাহাদের চিনিতাম না; কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের আগমনের কারণ বুঝিতে পারিলাম। আমার টেরোরিস্ট হিংসা-নীতির বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে তাহারা ক্রোধ প্রকাশ করিল। তাহারা বলিল যে, ইহাতে যুবকদের চিত্তে অত্যন্ত খারাপ ধারণা হইতেছে এবং তাহারা আমার এই অনধিকার চর্চা কিছুতেই সহ্য করিবে না।

আমরা কিয়ৎকাল তর্ক করিলাম, আমার যাত্রার সময় নিকটবর্তী বলিয়া অতি তাড়াতাড়ি কথা শেষ করিতে হইল। কথায় কথায় আমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিল। আমি তাহাদের কয়েকটি কড়া কথা শুনাইয়া দিলাম। বিদায়ের প্রাক্কালে তাহারা আমাকে বলিয়া গেল যে, যদি ভবিষ্যতে আমি এই প্রকার দুর্ব্যবহার করিতে থাকি, তাহা হইলে অন্যান্যকে তাহারা যে ভাবে শিক্ষা দিয়াছে আমাকেও তদ্রূপ শিক্ষা দিবে।

কলিকাতা ত্যাগ করিবার পর রাত্রে ট্রেনের বার্থে শুইয়া শুইয়া আমার মনে সেই বালকদ্বয়ের উত্তেজিত মুখ দুইটি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। জীবনের প্রাচুর্য ও স্নায়ুপুঞ্জ তাহাদের ছিল; ইহারা যদি সত্য পথে চলিত, তাহা হইলে কত ভাল কাজ হইতে পারিত! অতিদ্রুত এবং কতকটা রূঢ়ভাবে তাহাদের সহিত কথাবার্তার জন্য আমি দুঃখ বোধ করিলাম; মনে হইল, তাহাদের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনার সুযোগ পাইলে সম্ভবতঃ আমি তাহাদের বুঝাইতে পারিতাম যে, তাহাদের উৎসাহপূর্ণ তরুণ জীবনের সার্থকতার অন্য পথও আছে। ভারতবর্ষের উন্নতি ও স্বাধীনতার সেই সকল পথেও সেবা ও আত্মোৎসর্গের সুযোগের অভাব নাই। কয়েক বৎসর পরে এখনও তাহাদের কথা আমার মনে পড়ে। আমি তাহাদের নাম খুঁজিয়া পাই নাই, তাহারা কোথায় আছে তাহাও জানি না। এবং সময় সময় বিস্মিত হইয়া ভাবি, হয় তাহারা মৃত, নয় আন্দামানের কোন 'সেলে' কাল কর্তন করিতেছে।

ডিসেম্বর মাস। এলাহাবাদে দ্বিতীয় কৃষক সম্মেলন হইয়া গেল। আমার পুরাতন সহকর্মী হিন্দুস্থানী সেবাদলের ডক্টর এন. এস. হার্দিকারের নিকট প্রদত্ত পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি তাড়াতাড়ি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে যাত্রা করিলাম। সেবাদল স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহারা জাতীয় আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক এবং কংগ্রেসের সৈন্যদল। যাহা হউক, ১৯৩১-এর গ্রীষ্মকালে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি হিন্দুস্থানী সেবাদলকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অংশরূপে গ্রহণ করিয়া ইহাকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বিভাগে পরিণত করিল। আমার ও হার্দিকারের উপর ইহার ভার অর্পিত হইল। দলের প্রধান কার্যালয় কর্ণাটক প্রদেশের হুবলীতেই রহিল এবং হার্দিকার আমাকে দল সম্পর্কিত কতকগুলি কার্য পরিদর্শনের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কয়েক দিন আমি কর্ণাটকের নানাস্থানে ভ্রমণ করিলাম এবং সর্বত্রই জনসাধারণের অসীম উৎসাহ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ফিরিবার পথে আমি সামরিক আইনের জন্য বিখ্যাত শোলাপুর পরিদর্শন করিয়া আসিলাম।

কর্ণাটক ভ্রমণ আমার নিকট বিদায় অভিনন্দনের অনুষ্ঠানের মত হইয়াছিল। আমার বক্তৃতাগুলিতেও শেষ সঙ্গীতের সুরের রেশ দেখা দিত, তাহার মধ্যে উন্মাদনা থাকিলেও আমার আশঙ্কা হয়, সঙ্গীতে মাধুর্য ছিল না। বঙ্গপ্রদেশ হইতে নিশ্চিত ও স্পষ্ট সংবাদ আসিল যে, গভর্নমেন্ট আঘাত করিয়াছেন এবং অতি কঠিন আঘাত করিয়াছেন। এলাহাবাদ হইতে কর্ণাটকে যাইবার পথে আমি কমলাকে লইয়া বোম্বাইয়ে গিয়াছিলাম। সে পুনরায় পীড়িতা হইয়াছিল বলিয়া বোম্বাইয়ে আমাকে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই বোম্বাইতেই, এলাহাবাদ হইতে আমাদের আগমনের অব্যবহিত পরেই আমরা জানিতে পারিলাম, ভারত গভর্নমেন্ট যুক্ত-প্রদেশের জন্য এক বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। তাঁহারা গান্ধিজীর আগমনের জন্য অপেক্ষা না করাই স্থির করিয়াছিলেন, যদিও তখন তিনি সমুদ্রে জাহাজে আছেন এবং শীঘ্রই বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

যদিও অর্ডিন্যান্সটি কৃষক আন্দোলন উপলক্ষেই জারী হইয়াছিল, তথাপি ইহার ধারাগ্‌লি এত ব্যাপক, সর্বগ্রাসী যে, সর্ববিধ রাজনৈতিক ও জনসাধারণের কাজ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন কি, ইহাতে সন্তান-সন্ততির অপরাধে পিতামাতা ও অভিভাবকদিগেরও শাস্তির ব্যবস্থা হইল—প্রাচীন বাইবেলীয় প্রথার প্‌নরাব্‌ত্তি।

এই সময় আমরা রোমে 'গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎকারের বর্ণনা' বলিয়া 'জিওর্ণালে দ্য' ইতালীয়া'য় প্রকাশিত একটি বিবরণ পাঠ করিলাম। রোমে এই শ্রেণীর বিব্‌তি তিনি দিতে পারেন, ইহাতে আমরা আশ্চর্য হইলাম; কেন না, ইহা তাঁহার স্‌পরিচিত মতবাদ হইতে প্‌থক্। গান্ধিজী প্রতিবাদ করিবার প্‌র্বেই আমরা উহার শব্দবিন্যাস এবং রচনাভঙ্গী পরীক্ষা করিয়া ব্‌ঝিতে পারিলাম যে, প্রকাশিত বিব্‌তি তাঁহার নহে। আমাদের মনে হইল, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বহ্‌ল পরিমাণে বিকৃত করা হইয়াছে। তাহার পর তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিলেন এবং একটা বিব্‌তি দিয়া জানাইলেন যে, রোমে কাহারও সহিত তাঁহার ঐর্‌প আলোচনা হয় নাই। স্পষ্ট ব্‌ঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত এই চাতুরী করিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, ব্রিটিশ সংবাদপত্র এবং জননেতাগণ তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না এবং অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতে লাগিলেন। ইহাতে আমরা আহত ও ক্‌দ্ধ হইলাম।

কর্ণাটক ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া আমি এলাহাবাদে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। আমার য্‌ক্ত-প্রদেশে গিয়া সহকর্মীদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। যখন গ্‌হে দ্‌র্দৈব উপস্থিত, তখন দ্‌রে সরিয়া থাকা অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ। যাহা হউক কর্ণাটকের নির্দিষ্ট কাজ আমাকে শেষ করিতেই হইবে। আমি বোম্বাইয়ে ফিরিয়া আসিবার পর কয়েকজন বন্ধ্‌ আমাকে গান্ধিজীর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার আগমনের ঠিক এক সপ্তাহ বিলম্ব ছিল। কিন্তু ইহা অসম্ভব। এলাহাবাদ হইতে প্‌র্‌ষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন ও অন্যান্যের গ্রেফ্‌তারের খবর আসিল। তা ছাড়া, এই সপ্তাহেই এটোয়ার আমাদের প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনের দিন নির্দিষ্ট ছিল। কাজেই আমি এলাহাবাদ যাত্রা এবং ছয়দিন পরে প্‌নরায় বোম্বাইয়ে ফিরিবার সঙ্কল্প স্থির করিলাম। যদি আমি ম্‌ক্ত থাকি, তাহা হইলে তখন আমি গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ এবং কার্যকরী সমিতির সভায় যোগদান করিতে পারিব। কমলাকে রোগশয্যায় রাখিয়া আমি বোম্বাই পরিত্যাগ করিলাম।

আমি এলাহাবাদ পৌঁছিবার প্‌র্বেই চিওকী ষ্টেশনে আমার উপর ন্‌তন অর্ডিন্যান্স অন্‌সারে এক হ্‌কুমনামা জারী করা হইল। এলাহাবাদ ষ্টেশনে প্‌নরায় ঐ হ্‌কুমনামাই আমার উপর জারী করার চেষ্টা হইল। আমার বাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া তৃতীয়বার ঐ চেষ্টা করিলেন। এই আদেশপত্রে কোন বিপদের ইঙ্গিত ছিল না। আমার উপর হ্‌কুম দেওয়া হইল যে, আমি এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির সীমার বাহিরে যাইতে পারিব না, কোনও সাধারণ সভা-সমিতিতে বা অন্‌ষ্ঠানে যোগ দিতে পারিব না, বক্তৃতা করিতে পারিব না, সংবাদ-পত্রে বা প্‌স্তিকায় কিছ্‌ লিখিতে পারিব না, ইত্যাদি ও প্রভৃতি। আমি দেখিলাম, তাসাদ্দ্‌ক শেরোয়ানী ও অন্যান্য সহকর্মীদের উপরও অন্‌র্‌প আদেশ জারী হইয়াছে। পরদিন প্রভাতে আমি জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট (যিনি আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন) হ্‌কুমনামা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া এক পত্র দিলাম এবং

শ্রীমতী কমলা নেহরু

তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম যে, আমি কি করিব না করিব, সে সম্বন্ধে তাঁহার হুকুম মত চলিতে প্রস্তুত নহি। আমি সাধারণভাবে সাধারণ কাজ করিয়া যাইব এবং ইতিমধ্যে আমাকে বোম্বাই গিয়া মিঃ গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে এবং সম্পাদক হিসাবে আমাকে কার্যকরী সমিতির সভায় যোগ দিতে হইবে।

এক নূতন সমস্যা দেখা দিল। ঐ সপ্তাহে এটোয়ায় আমাদের প্রাদেশিক সম্মেলনের দিন নির্দিষ্ট ছিল। গান্ধিজীর আগমন দিবসে, গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ না ঘটে, এইজন্য আমি উহা স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার এলাহাবাদে উপস্থিতির পূর্বেই আমাদের সভাপতি শেরোয়ানী যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এক বার্তা পাইয়াছিলেন, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, সম্মেলনে কৃষক সমস্যা আলোচিত হইবে কি না। যদি হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সম্মেলন বন্ধ করিয়া দিবেন। যে বিষয় লইয়া সমস্ত প্রদেশ উত্তেজিত, সেই কৃষক সমস্যা আলোচনা করাই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সম্মেলন আহ্বান করিয়া তাহাতে ঐ বিষয় আলোচনা না করা অযৌক্তিক এবং আত্মপ্রতারণা মাত্র। যে কোন কারণেই হউক, আমাদের সভাপতি বা অন্য কাহারও সম্মেলনের আলোচনা সীমাবদ্ধ করিবার অধিকার ছিল না। গভর্ণমেণ্ট ভীতি প্রদর্শন না করিলেও আমরা সম্মেলন স্থগিত রাখিবার ইচ্ছাই করিয়াছিলাম কিন্তু এই ভীতিপ্রদর্শনের ফল অন্যরূপ হইল।

আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ব্যাপারে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ মত চলা, কোনদিক দিয়াই রুচিকর মনে হইল না। দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা আমাদের গর্ব পরিপাক করিয়া ফেলিলাম এবং সম্মেলন স্থগিত রহিল। গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে আরম্ভ হইলেও আমরা গান্ধিজীর আগমন পর্যন্ত, যে কোন ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সংঘর্ষ এড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তিনি আসিয়া হাল ধরিতে অক্ষম হইবেন, এমন অবস্থা সৃষ্টি করা আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আমরা প্রাদেশিক কনফারেন্স স্থগিত রাখা সত্ত্বেও, পুলিশ ও সৈন্যদল লইয়া এটোয়ায় খুব আড়ম্বর করা হইল, কয়েকজন একক প্রতিনিধিকে গ্রেফ্‌তার করা হইল, স্বদেশী প্রদর্শনী সৈন্যদল দখল করিল।

২৬শে ডিসেম্বর প্রভাতে আমি ও শেরোয়ানী বোম্বাই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। যুক্তপ্রদেশের অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য কার্যকরী সমিতি বিশেষ ভাবে শেরোয়ানীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ সহর পরিত্যাগ না করিবার হুকুমনামা আমাদের উভয়ের উপরই জারী ছিল। এলাহাবাদের পল্লী অঞ্চলে ও যুক্ত-প্রদেশের অন্যান্য জিলায় খাজনা ও কর বন্ধ আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্যই বিশেষভাবে ঐ অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে পল্লী অঞ্চলে যাইতে দিবেন না, ইহা আমরা সহজেই বুঝিলাম। কিন্তু বোম্বাই সহরে গিয়া আমরা যে কৃষক আন্দোলন করিব না, ইহাও স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় এবং অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য যদি কৃষক আন্দোলনই হইত, তাহা হইলে আমাদের যুক্তপ্রদেশ হইতে প্রস্থানে তাঁহারা আনন্দিতই হইতেন। অর্ডিন্যান্স জারী হইবার পর হইতে আমরা সংঘর্ষ এড়াইয়া আত্মরক্ষার নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অনেকের দুই চারিটি দৃষ্টান্ত অবশ্য ছিল। যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি, গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ এড়াইতে অথবা স্থগিত রাখিবার জন্য অসম্ভবরকম ভদ্রলোকের মত চেষ্টা করিয়াছিল, ইহাও স্পষ্ট। শেরোয়ানী ও আমি এই সকল বিষয় লইয়া গান্ধিজী ও কার্যকরী সমিতির সহিত পরামর্শ করিবার জন্যই বোম্বাই যাত্রার উদ্যোগ করিলাম; কেন না, কেহই জানিত না—আমি তো নিশ্চয়ই

জানিতাম না যে, তাঁহারা কি সিম্ধান্ত করিবেন।

এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমাদিগকে বোম্বাই যাত্রার অনুমতি দেওয়া হইবে। অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে অন্তরীণের তথাকথিত আদেশ অমান্য গভর্ণমেণ্ট সহ্য করিবেন। কিন্তু ইহাতে আমার অন্তরাত্মা সায় দিল না।

সকালবেলায় ট্রেনে বসিয়া সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, সীমান্ত প্রদেশে নূতন অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছে, এবং আবদুল গফুর খাঁ, ডাঃ খাঁ সাহেব প্রভৃতি গ্রেফ্তার হইয়াছেন। হঠাৎ আমাদের ট্রেন (বোম্বাই মেইল) ইরাদৎগঞ্জ নামে একটি ছোট ষ্টেশনে থামিয়া গেল, পুলিশ কর্মচারীরা আমাদের কামরায় গ্রেফ্তার করিবার জন্য প্রবেশ করিল। রেল লাইনের পার্শ্বে পুলিশের কালো গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। আমি ও শেরওয়ানী সেই রুদ্ধদ্বার কয়েদীগাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী আমাদিগকে লইয়া নৈনী জেলে ছুটিয়া চলিল। সেদিন প্রভাতে খৃষ্টমাস পর্ব উপলক্ষ্যে মুষ্টিযুদ্ধের খেলা ছিল। আমাদিগকে গ্রেফ্তার করিবার জন্য আগত ইংরাজ পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে অত্যন্ত বিষণ্ণ ও নিরানন্দ দেখাইতেছিল। আমাদের জন্য বেচারার বড়দিনের আমোদটা নষ্ট হইল।

আবার কারাগার!

৪১

গ্রেফ্তার, বাজেয়াপ্ত, অর্ডিন্যান্স

আমাদের গ্রেফ্তারের দুইদিন পর গান্ধিজী বোম্বাইয়ে অবতরণ করিলেন এবং সমস্ত সংবাদ অবগত হইলেন। বাঙ্গলার অর্ডিন্যান্সের কথা তিনি লণ্ডনে থাকিতেই শুনিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে নামিয়া বড়দিনের উপহারস্বরূপ যুক্ত-প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশের অর্ডিন্যান্স লাভ করিলেন এবং শুনিলেন, উক্ত দুই প্রদেশের তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা গ্রেফ্তার হইয়াছেন। ভাগ্যের চক্র ঘুরিয়াছে, শান্তির আর কোন সম্ভাবনাই নাই; তথাপি শেষবার চেষ্টা করিবার জন্য তিনি বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলেন। নয়াদিল্লী হইতে তাঁহাকে জানান হইল যে, কতকগুলি সর্তে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইতে পারে। তাহার মধ্যে এই সর্ত ছিল যে, তিনি বাঙ্গলা, যুক্ত-প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশের নূতন অর্ডিন্যান্সগুলি ও তদানুসঙ্গিক গ্রেফ্তারের বিষয় আলোচনা করিতে পারিবেন না (আমি স্মৃতি হইতে লিখিতেছি, বড়লাটের উত্তরের প্রতিলিপি একণে আমার নিকট নাই)। যে বিষয় লইয়া সমস্ত দেশ উত্তেজিত, তাহাই যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আর কি বিষয় লইয়া গান্ধিজী ও কংগ্রেসের নেতাগণ বড়লাটের সহিত আলোচনা করিতে পারেন, তাহা কল্পনাতীত। ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, কোন কথা না শুনিয়াই কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতে ভারত গভর্ণমেণ্ট দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন, কার্যকরী সমিতির পক্ষে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। তাঁহারা প্রতিমুহূর্তে গ্রেফ্তার প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন এবং কারাগারে যাইবার পূর্বে দেশকে কর্ম নির্দেশ দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তথাপি আপোষের পথ খোলা রাখিয়া নিরুপদ্রব প্রতিরোধের প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং গান্ধিজী বড়লাটের সহিত দেখা করিবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিলেন। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় তারে বিনা সর্তে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন।

উত্তরে গভর্ণমেণ্ট গান্ধিজী ও কংগ্রেসের সভাপতিকে বন্দী করিলেন এবং সমগ্র দেশে দমননীতিকে উগ্র ও তীব্র করিয়া তুলিলেন। তুমি সংঘর্ষ চাও আর নাই চাও, গভর্ণমেণ্ট ব্যগ্রভাবে সেজন্য প্রস্তুত।

আমরা তখন জেলে, অসংলগ্ন ও অস্পষ্টভাবে এই সকল সংবাদ আমরা পাইতে লাগিলাম। নববর্ষের জন্য আমাদের বিচার স্থগিত ছিল বলিয়া বিচারাধীন বন্দী হিসাবে আমরা দেখা সাক্ষাতের অধিকতর সুযোগ পাইতাম। আমরা শুনিলাম বড়লাট দেখা করিবেন কি করিবেন না, ইহা লইয়া তুমুল আলোচনা চলিতেছে; যেন বর্তমান অবস্থায় উহাই একমাত্র গুরুতর ব্যাপার।

এই সাক্ষাতের প্রশ্ন মুখ্য হইয়া অন্যান্য ব্যাপার চাপা পড়িবার উপক্রম হইল। কথা উঠিল, লর্ড আরুইন থাকিলে সাক্ষাতে রাজী হইতেন এবং তাঁহার সহিত গান্ধিজীর দেখা হইলে সন্তোষজনক মীমাংসা হইত। বাস্তব ঘটনা উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির এই অনন্যসাধারণ পল্লবগ্রাহিতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—এই দুই চিরবিরুদ্ধ শক্তির অনিবার্য সংঘাতের কারণ বিশ্লেষণ করিলে কি এই বুঝা যায় যে, ইহা কাহারও ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর নির্ভর করে? দুইটি ঐতিহাসিক শক্তির সংঘাত কি পরস্পরের হাস্য ও সৌজন্যে অবসান হয়? অতি গুরুতর ব্যাপারে, বৈদেশিক নির্দেশ স্বেচ্ছায় মান্য করিয়া লইয়া ভারতের জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রক্ষেত্রে আত্মহত্যা করিতে পারে না। ভারতের ব্রিটিশ বড়লাটও জাতীয়তাবাদের এই স্পর্ধিত স্বপ্ন হইতে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের বিশিষ্ট উপায়ে চেষ্টা করিবেন; সে বড়লাট যিনিই হউন কিছু আসে যায় না। লর্ড উইলিংডন যাহা করিয়াছেন, লর্ড আরুইনকেও তাহাই করিতে হইত, কেন না তাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির যন্ত্র মাত্র, মূলনীতির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংশোধন বা পরিবর্তন ব্যতীত, তাঁহারা আর কিছুই করিতে পারেন না। ভারতে ব্রিটিশ নীতির জন্য ব্যক্তিবিশেষ বড়লাটকে প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার মতে অত্যন্ত অযৌক্তিক, যাঁহারা ইহা করেন তাঁহারা হয় অজ্ঞ, নয় ইচ্ছা করিয়া মূল বিষয়টি এড়াইয়া যান।

১৯৩২-এর ৪ঠা জানুয়ারী এক স্মরণীয় দিবস। সমস্ত তর্ক ও আলোচনার অবসান হইল। অতি প্রত্যুষে গান্ধিজী ও কংগ্রেসের সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল গ্রেফ্‌তার হইলেন, তাঁহাদিগকে রাজবন্দীরূপে বিনাবিচারে আটক রাখা হইল। চারিটি নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা দেওয়া হইল। ব্যক্তিস্বাধীনতা বলিয়া কিছু রহিল না, কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে যাহাকে খুসী গ্রেফ্‌তার এবং যে কোন দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। সমস্ত ভারতবর্ষ যেন সামরিক শক্তিদ্বারা অবরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল; কোথায় কিভাবে কি ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে, তাহার ভার স্থানীয় কর্মচারীদের উপর অর্পিত হইল।*

৪ঠা জানুয়ারী নৈনী জেলের ভিতরে যুক্ত-প্রদেশের জরুরী ক্ষমতাযুক্ত অর্ডিন্যান্স অনুসারে আমাদের বিচার হইল। শেরোয়ানীর ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দেড়শত টাকা অর্থদণ্ড হইল· আমার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচশত

---

* ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ১৯৩২-এর ২৪শে মার্চ পার্লামেন্টে বলিয়াছিলেন,—“আমরা যে সকল অর্ডিন্যান্স অনুমোদন করিয়াছি, তাহা অত্যন্ত চরম ও কঠোর তাহা আমি স্বীকার করি। ভারতীয় জীবনের সর্ববিধ কর্ম তাহার আওতায় আছে।”

টাকা অর্থদণ্ড (অনাদায়ে ছয়মাস অধিক) হইল। আমাদের উভয়ের অপরাধ এক, আমাদের উপর একই হুকুমনামা দিয়া আমাদের এলাহাবাদ নগরে অন্তরীণ থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল; আমরা উভয়ে একত্রে বোম্বাই যাত্রা করিয়া একই ভাবে আদেশ ভঙ্গ করিয়াছি; আমাদের একসঙ্গে গ্রেফ্‌তার করিয়া একই ধারায় বিচার করা হইল, তথাপি দণ্ডাদেশের মধ্যে এই পার্থক্য। অবশ্য একটি পার্থক্য ছিল, আমি আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বোম্বাই যাইব, ইহা পূর্বেই জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলাম। শেরোয়ানী সেরূপ কিছু করেন নাই। কিন্তু তাঁহার যাত্রার সঙ্কল্পও সকলে জানিত, কেন না সংবাদপত্রে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। দণ্ডাদেশ প্রদানের অব্যবহিত পরেই শেরোয়ানী যখন বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দণ্ডাদেশের এই পার্থক্য সাম্প্রদায়িক কারণে কিনা, তখন উপস্থিত ব্যক্তিগণ কৌতুক অনুভব করিলেন এবং বিচারক অপ্রস্তুত হইলেন।

৪ঠা জানুয়ারীর স্মরণীয় দিবসে দেশের সর্বত্র অনেক ঘটনা ঘটিল। আমাদের কারাগারের অদূরে এলাহাবাদ নগরে বিশাল জনতার সহিত পুলিশ ও সৈন্যদলের সংঘর্ষ হইল, লাঠিচালনার ফলে অনেকে হতাহত হইল। নিরুপদ্রব প্রতিরোধকারী বন্দীরা আসিয়া কারাগার পূর্ণ করিতে লাগিল। প্রথমে জিলার জেলগুলি পূর্ণ হইল, তাহার পর নৈনী ও অন্যান্য সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী আসিতে লাগিল। যখন স্থায়ী জেলগুলিতে আর স্থান সঙ্কুলান হয় না, তখন কতকগুলি অস্থায়ী বন্দীনিবাস স্থাপিত হইল।

নৈনীতে আমাদের ছোট ব্যারাকে বড় বেশী লোক আসেন নাই। আমার পুরাতন বন্ধু নর্মদাপ্রসাদ, রণজিত পণ্ডিত এবং আমার জ্ঞাতিভ্রাতা মোহনলাল নেহরু এখানে ছিল। একদিন সহসা আমাদের ৬নং ব্যারাকে আমার সিংহলী যুবক বন্ধু বারনার্ড আলুবিহার আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সবেমাত্র বিলাত হইতে ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া ফিরিয়াছে। আমার ভগ্নীর নিষেধ সত্ত্বেও মুহূর্তের উত্তেজনায় সে কংগ্রেসের শোভাযাত্রায় যোগদান করে এবং তাহার ফলে পুলিশের কালো গাড়ীতে উঠিয়া জেলে আসিয়াছে।

কংগ্রেস বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল—কার্যকরী সমিতি হইতে প্রাদেশিক, জিলা, তালুক, সর্ববিধ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হইল। তাহা ছাড়া, কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সহানুভূতিসম্পন্ন কিংবা অগ্রগামী বহুতর কৃষক-সভা, প্রজা-সমিতি, যুবক-সমিতি, ছাত্র-সঙ্ঘ, প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল, হাসপাতাল, স্বদেশী ভাণ্ডার, ব্যায়াম-শালা, পুস্তকাগার কত যে বে-আইনী ঘোষিত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার তালিকা সুদীর্ঘ, প্রত্যেক প্রদেশে এই বে-আইনী ঘোষিত প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা কয়েক শত করিয়া হইবে। ভারতে কয়েক সহস্র প্রতিষ্ঠান বে-আইনী হইয়া কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের গৌরব ঘোষণাই করিল।

আমার স্ত্রী বোম্বাই-এ রোগশয্যায় শায়িতা, তিনি নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। আমার মাতা ও ভগ্নীদ্বয় উৎসাহের সহিত আন্দোলনে যোগ দিলেন। শীঘ্রই আমার ভগ্নীদ্বয় প্রত্যেকে এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও জেলে প্রেরিত হইল। কারাগারে নবাগতদের নিকট এবং জেলে আমাদের যে সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়িতে দেওয়া হইত, তাহা হইতে আমরা বাহিরের কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম। আমরা বাহিরের ঘটনা অনুমান ও কল্পনা করিতাম মাত্র, কেন না সংবাদপত্র ও সংবাদ

সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের উপর কঠোর নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল; প্রচুর অর্থ-দণ্ড ও বাজেয়াপ্ত ভীতি দ্বারা আন্দোলন সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কোন কোন প্রদেশে বন্দী অথবা কারাদণ্ডিত ব্যক্তির নাম পর্যন্ত প্রকাশ করাও দণ্ডনীয় হইয়াছিল।

এই ভাবে বাহিরের সংবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা নৈনী জেলে বসিয়া নানাভাবে সময় কাটাইতাম। চরকায় সূতাকাটা, লেখাপড়া, কোন বিষয়ে আলোচনা প্রভৃতি চলিত; কিন্তু সব সময় এক চিন্তা থাকিত—কারা-প্রাচীরের বাহিরে কি ঘটিতেছে। আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়াও আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিলাম। সময় সময় আমরা প্রত্যাশায় অধীর হইতাম, কখনও বা কোন ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষুব্ধ হইতাম ও দুর্বলতা ও স্থূলরুচি দেখিয়া বিরক্ত হইতাম। কখনও বা অত্যন্ত অনাসক্ত হইয়া পড়িতাম এবং ধীর ও অনুত্তেজিত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতাম, এই বিশাল শক্তি-সংঘাত ও বৃহৎ পেষণযন্ত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত ত্রুটী ও দৌর্বল্য কত তুচ্ছ। আমি বিস্মিত হইয়া আগামী দিনের কথা ভাবিতাম, এই সংঘর্ষ-সংঘাত, এই কল-কোলাহল, এই দুঃসাহসী উৎসাহ, এই নিষ্ঠুর দমননীতি ও ঘৃণ্য কাপুরুষতা—ইহার পরিণাম কি? আমরা কোথায় চলিয়াছি? ভবিষ্যৎ নেপথ্যের যবনিকায় আবৃত। ভবিষ্যৎ আবৃত মন্দ কি! বর্তমানের উপরেও অস্পষ্টতার আবরণ। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া জানি, কি বর্তমান কি ভবিষ্যৎ—সংঘর্ষ, দুঃখ, আত্মত্যাগ আমাদের নিত্য সঙ্গী।

"ঐ সমতল ক্ষেত্রে কল্য পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ হইবে; জানথাস পুনরায় শোণিতে অনুরঞ্জিত হইবে। *হেক্টর* ও আজাক্স পুনরায় আবির্ভূত হইবেন; হেলেন প্রাচীরের উপর আসিয়া সে দৃশ্য দেখিবেন।"

"তখন আমরা হয় ছায়ায় বিশ্রাম করিব, নয় সংগ্রামের মধ্যে দীপ্যমান হইয়া উঠিব। অন্ধ আশা ও অন্ধ নৈরাশ্যের মধ্যে আমাদের মন দুলিতে থাকিবে; কল্পনা করিব, আমাদের এই জীবনদান কি সম্পদ আনিবে, তাহা আমরা কখনও জানিতে পারিব না।"*

৪২

আত্মপ্রচারের ধূমে

১৯৩২ সালের প্রথম কয়েক মাস ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য আত্মপ্রচারের ধূমে পড়িয়া গেল। ছোট ও বড় সকলশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা কত শান্তিপ্রিয় ও ধার্মিক, আর কংগ্রেস কত পাপী, কত কলহপ্রিয়। তাঁহারা চাহেন গণতন্ত্র, আর কংগ্রেস চাহে ডিক্টেটরী। কংগ্রেসের সভাপতিকে কি ডিক্টেটর বলা হয় না? মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের উৎসাহে তাঁহারা অর্ডিন্যান্স, ব্যক্তিস্বাধীনতাহরণ, সংবাদপত্র ও ছাপাখানা দলন, বিনাবিচারে আটক, টাকাকড়ি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং দৈনন্দিন আরও অনেক ঘটনা,—এই সকল তুচ্ছ ঘটনা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল প্রকৃতিও তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন। গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিগণ (আমাদেরই

---

* [illegible]

স্বদেশবাসী) ক্রমে মুখর হইয়া উঠিলেন। বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, কংগ্রেসের লোকেরা যখন কারাগারে বসিয়া নিজের স্বার্থের দিকে দেখিতেছেন, তখন তাঁহারা মাসে অতি সামান্য কয়েক সহস্র মুদ্রা বেতন লইয়া জনসাধারণের হিতের জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতেছেন। অধস্তন ম্যাজিস্ট্রেটেরা আমাদের গুরু দণ্ড দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, রায়দান প্রসঙ্গে আমাদের বক্তৃতা শুনাইতেন, কখনও বা কংগ্রেস বা তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিন্দা করিতেন। এমন কি স্যার স্যামুয়েল হোর পর্যন্ত ভারত সচিবের মহিমান্বিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, কুকুর চীৎকার করিলেও সার্থবাহ উষ্ট্রদল অগ্রসর হইবে। তিনি সাময়িক ভাবে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, কুকুরগুলি সবাই জেলে আবদ্ধ, সেখান হইতে চীৎকার করা সহজ নয় এবং যাহারা বাহিরে আছে, তাহাদের মুখও উত্তমরূপে বন্ধ।

সর্বাধিক আশ্চর্য এই যে, কানপুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সমস্ত অপবাদ কংগ্রেসের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা হইল। সেই ভয়াবহ পৈশাচিক দাঙ্গার নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানগুলি প্রচার করিয়া পুনঃ পুনঃ বলা হইতে লাগিল যে, এইগুলির জন্য কংগ্রেসই দায়ী; কিন্তু কার্যতঃ কংগ্রেস মহত্ত্ব ও করুণার সহিত উহা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিল এবং ইহার জন্য সে তাহার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানকে বলি দিয়াছিল, যাঁহার জন্য কানপুরের সর্বশ্রেণীর লোকই শোকসন্তপ্ত হইয়াছিল। করাচী কংগ্রেসের দাঙ্গার সংবাদ পৌঁছিবামাত্র এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়; এই কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব বিষয় অনুসন্ধান করেন। কয়েক মাস পরিশ্রমের পর তাঁহাদের সুবৃহৎ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু গভর্নমেণ্ট তাড়াতাড়ি উহা বাজেয়াপ্ত করিয়া মুদ্রিত পুস্তকগুলি হস্তগত করিয়া ফেলেন। আমার ধারণা, তাঁহারা সেগুলি নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তদন্তের ফল এইভাবে চাপিয়া দিয়াও তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না, আমাদের সরকারী সমালোচক এবং ব্রিটিশ কর্তৃত্বে পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি সময় ও সুবিধামত পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, কংগ্রেসের কার্যের ফলেই দাঙ্গা ঘটিয়াছে!

অবশ্য এই ক্ষেত্রে এবং অনত্রও পরিণামে সত্যই জয়ী হইবে; কিন্তু সময় সময় মিথ্যার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়। "মিথ্যা তাহার কার্য শেষ হইলে আপনা হইতেই ধ্বংস হইবে। যখন কেহ সত্যের জয় কি পরাজয়ের কথা ভাবিবে না, তখন মহান্ সত্য জয়ী হইবে।"

সংগ্রামক্ষিপ্ত মানসিক বিকারের এই বহিঃপ্রকাশ অতি স্বাভাবিক। পারি-পার্শ্বিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে কেহই সত্য ও সংযম প্রত্যাশা করিতে পারে না, ইহাই আমার ধারণা। কিন্তু ইহার তীব্রতা ও প্রাচুর্য অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত এবং আশ্চর্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইহা ভারতীয় শাসক সম্প্রদায়ের মানসিক অবস্থার নিদর্শন এবং কিছুকাল পূর্বে তাঁহারা কি ভাবে নিজেদের দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ, আমাদের কোন কথা বা কাজের জন্য ক্রোধের উৎপত্তি হয় নাই। তাঁহাদের সাম্রাজ্য হারাইবার পূর্বতন ভীতি হইতেই ইহার উদ্ভব। যে সমস্ত শাসক নিজেদের শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা এরূপে আচরণ করেন নাই। উভয় পক্ষের বৈষম্যও অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। অপর দিকে নিস্তব্ধতার রাজত্ব; এই নিস্তব্ধতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অথবা আত্মবিশ্বাসসূচক সন্তোষের দ্যোতক নহে, ইহা কারাবাস, ভীতি এবং সর্ববিধ প্রচারকার্য রুদ্ধ করার ব্যবস্থাজনিত নিস্তব্ধতা। এইভাবে বলপূর্বক কণ্ঠরোধ করিয়া অপর পক্ষ বিকারবিক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাস, অতিরঞ্জন ও কুৎসা প্রচারের

চূড়ান্ত দেখাইতে লাগিলেন। যাহা হউক, প্রকাশের একমাত্র পথ ছিল—বিভিন্ন সহর হইতে মাঝে মাঝে বে-আইনী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত।

ব্রিটিশ কর্তৃত্বে পরিচালিত এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি এই আত্মপ্রচারের ধূমধামে যোগ দিয়া মনের আনন্দে রসাস্বাদ করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা মনের গোপন অন্ধকারে যে সকল আক্রোশ দমন করিয়া রাখিয়াছিল, এতদিনে সেই সকল চিন্তা ও কথা প্রকাশিত হইতে লাগিল। সাধারণ সময়ে তাহারা নিজেদের মনোভাব সাবধানতা সহকারে ব্যক্ত করে, কেন না ইহাদের অধিকাংশ পাঠকই ভারতীয়; কিন্তু ভারতের এই সঙ্কট কালে এই সংযম আর রহিল না, ইংরাজ ও ভারতীয় নির্বিশেষে সকলের মনোভাবই আমরা বুঝিতে পারিলাম। এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র ভারতে অতি অল্পই আছে, একে একে সেগুলি বিলুপ্ত হইতেছে। অবশিষ্টগুলির মধ্যে কয়েকখানি, কি সংবাদের দিক দিয়া, কি বাহ্য সৌষ্ঠবের দিক দিয়া অতি উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকা। তাহাদের আন্তর্জাতিক ব্যাপারের উপর লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি রক্ষণশীল মনোবৃত্তি লইয়া লিখিত হইলেও উহার মধ্যে কুশলতা, জ্ঞান ও মর্মগ্রহণের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংবাদপত্র হিসাবে এইগুলি নিঃসন্দেহ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা। কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তাহাদের আলোচনা অত্যন্ত নিম্নস্তরের এবং অতি আশ্চর্যরূপে একদেশদর্শী। এবং সঙ্কটের সময়ে তাহাদের পক্ষপাতিত্ব, বিকারের প্রলাপ স্থূলরুচির পরিচায়ক হইয়া উঠে। তাহারা বিশ্বস্তভাবে ভারত সরকারের মনোভাব প্রচার করেন এবং সতত এই সরকারী প্রচারকার্যের মধ্যেও প্রগল্‌ভ উচ্ছৃঙ্খলতার অভাব নাই।

এই সকল এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের সহিত তুলনায় ভারতীয় সংবাদ-পত্রগুলি অতি দরিদ্র। তাহাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল নহে এবং কাগজের উন্নতি করিবার জন্য মালিকেরাও বড় বেশী চেষ্টা করেন না। অতি কষ্টে তাঁহারা দৈনন্দিন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলেন এবং মন্দভাগ্য সম্পাদকীয় বিভাগের লোকেরা অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। এগুলির কাগজ ও মুদ্রণ শ্রীহীন, অনেক আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন প্রায়শঃই প্রকাশিত হয়, রাজনীতি বা জাতীয় জীবন সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাব অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও উচ্ছ্বাসময়। আমার ধারণা, ইহার আংশিক কারণ এই যে, আমরা ভাবপ্রবণ জাতি, আরও কারণ এই যে, বিদেশী ভাষায় (ইংরাজী কাগজগুলি) সরল অথচ জোরের সহিত লেখা সহজ নহে। কিন্তু আসল কারণ, দীর্ঘকালের পরাধীনতা ও দমননীতির প্রতিক্রিয়া হইতে যে মনোভাব গড়িয়া উঠে, তাহা সহজেই প্রকাশের পথে ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ভারতীয় পরিচালিত ইংরাজী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ মাদ্রাজের "দি হিন্দু"ই সংবাদসংগ্রহ, ছাপা ও কাগজের দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দু দেখিলেই আমার মনে হয়, এ যেন শুচিস্নিগ্ধা প্রবীণা বিধবা মহিলা; অত্যন্ত গম্ভীর ও রাশভারি, যাঁহার সম্মুখে একটি চপল কথা উচ্চারণ করিলেই তিনি মর্মাহত হইবেন। ইহা স্বচ্ছল অবস্থার বুর্জোয়া কাগজ; জীবনযুদ্ধের সংঘর্ষ, কর্কশ কোলাহল বা দুশ্চিন্তা ইহার নাই, আরও কয়েকখানি মডারেট মতাবলম্বী সংবাদপত্রও ঐ "প্রবীণা বিধবা"র আদর্শে চালিত হয়। কিন্তু তাঁহারা হিন্দুর মত বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারেন নাই এবং সকল দিক দিয়াই বৈশিষ্ট্যহীন।

গভর্ণমেণ্ট আঘাত করিবার জন্য বহু পূর্ব হইতে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং প্রথম সুযোগেই বজ্রসম প্রচণ্ড আঘাত করিয়া অভিযান

তাঁহাদের ছিল। ১৯৩০ সালে নব নব অর্ডিন্যান্স দিয়া ঘটনার স্রোত রুদ্ধ করিতেই তাঁহারা চেষ্টা করিতেছিলেন। সে বার কংগ্রেসই প্রথম আক্রমণ করিয়াছিল। ১৯৩২-এর উপায় স্বতন্ত্র এবং গভর্ণমেণ্টই সকল দিক দিয়া প্রথম আক্রমণ করিয়া বসিলেন। কতকগুলি সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক অর্ডিন্যান্স দ্বারা যত প্রকার সম্ভব ক্ষমতা গ্রহণ ও প্রদান করা হইল। বহু সভা-সমিতি বে-আইনী হইল, বাড়ী, সম্পত্তি, মোটর গাড়ী, ব্যাঙ্কে আমানতী টাকা দখলে লওয়া হইল ও জনসভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইল। সংবাদপত্র ও ছাপাখানা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইল। অন্যদিকে এই সময় গান্ধিজী নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি এড়াইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। কার্যকরী সমিতির প্রায় সকল সদস্যের মনোভাবও ঐরূপ ছিল। আমি ও আর দুই একজন ভাবিয়াছিলাম যে, আমাদের যতই অনিচ্ছা থাকুক না কেন, সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। অতএব, পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। যুক্তপ্রদেশ এবং সীমান্ত প্রদেশে ক্রমবর্ধিত মনোমালিন্যের ফলে জনসাধারণ বুঝিতে পারিতেছিল যে, সংঘর্ষ আসিতেছে। কিন্তু মোটের উপর মধ্যশ্রেণী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদিও সংঘর্ষের সম্ভাবনা অস্বীকার করিতে পারিতেছিলেন না, তথাপি তাঁহারা তৎকালে সে ভাবে চিন্তা করিতেন না। তাঁহাদের আশা ছিল, গান্ধিজী ফিরিয়া আসিলেই যে কোন প্রকারে সংঘর্ষ নিবারণ করিবেন—এই আশাই পূর্বোক্ত প্রকার চিন্তার প্রসূতি।

এই ভাবে ১৯৩২-এর প্রথম ভাগে গভর্ণমেণ্টই আক্রমণ করিলেন এবং কংগ্রেস আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। অর্ডিন্যান্স ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধের যুগপৎ দ্রুত আবির্ভাবে অনেক স্থানীয় কংগ্রেস-নেতা বিহ্বল হইলেন। তথাপি কংগ্রেসের আহ্বানে দেশ আশ্চর্যরূপে সাড়া দিল এবং নিরুপদ্রব প্রতিরোধকারীর অভাব হইল না। আমার বিবেচনায় ১৯৩০ অপেক্ষাও ১৯৩২-এ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অধিকতর প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এবার সর্বত্র, বিশেষভাবে বৃহৎ নগরীগুলিতে ১৯৩০-এর মত বাহ্য আন্দোলন ও প্রচার ছিল না। ১৯৩২-এ যদিও জনসাধারণ অধিকতর সহনশীলতা দেখাইয়াছিল এবং শান্তিপূর্ণ ছিল, তথাপি ১৯৩০-এর মত উৎসাহের প্রেরণা ছিল না। ইহা যেন অনিচ্ছার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতির মত। ১৯৩০ সালে ইহার যে গৌরব ছিল, দুই বৎসর ব্যবধানে তাহা অনেকাংশে ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সমস্ত শক্তি লইয়া কংগ্রেসের সম্মুখীন হইলেন। ভারতে কার্যতঃ সামরিক আইন প্রবর্তিত হইল। কংগ্রেস স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু করিবার সুযোগ অথবা কোন কাজ করিবার কোন স্বাধীনতা পাইল না। প্রথম আঘাতেই ইহা মুহ্যমান হইল, অতীতে কংগ্রেসের প্রধান সমর্থক বুর্জোয়া সদস্যগণই অধিকতর শঙ্কিত হইলেন। তাঁহাদের পকেটে হাত পড়িল এবং ইহা বুঝা গেল যে, যাহারা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদান করিবে অথবা ইহাকে সাহায্য করিতেছে বলিয়া জানা যাইবে, তাহারা কেবল স্বাধীনতা হারাইবে না, সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কাও রহিয়াছে। যুক্ত-প্রদেশে ইহাতে আমরা বিশেষ চিন্তিত হই নাই; কারণ এখানে কংগ্রেস-পন্থীরা সকলেই দরিদ্র। কিন্তু বোম্বাই প্রভৃতি বৃহৎ সহরে অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। ইহাতে ব্যবসায়ী শ্রেণীর সর্বনাশ এবং বৃত্তিজীবী শ্রেণীর বহুল ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। কেবলমাত্র ভীতি প্রদর্শনেই (কোন কোন স্থানে প্রয়োগ করাও হইয়াছে) সহরের ধনী ও মধ্যম শ্রেণী পঙ্গু হইয়া পড়িলেন। আমি পরে শুনিয়াছি, একজন ভীরু কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী যিনি

কদাচিৎ চাঁদা দেওয়া ছাড়া রাজনীতির ত্রি-সীমানায়ও আসেন নাই, তাঁহাকে পুলিশ পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা ও দীর্ঘ কারাদণ্ডের ভয় দেখাইয়াছিল। এই প্রকার ভীতিপ্রদর্শন সচরাচর ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল এবং ইহা ফাঁকা কথা ছিল না, কেন না পুলিশের হাতে তখন অপর্যাপ্ত ক্ষমতা এবং প্রত্যহই মৌখিক ভীতি অনুযায়ী কার্যের দৃষ্টান্ত দেখা যাইত।

গভর্ণমেণ্ট যে পন্থতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে আমার মতে কোন কংগ্রেসকর্মীর আপত্তি করিবার অধিকার নাই। অবশ্য সম্পূর্ণরূপে অহিংস আন্দোলনের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট যে পীড়ন ও হিংসামূলক কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সভ্যতার মাপকাঠিতে তাহা নিশ্চয়ই আপত্তিজনক। যদি আমরা বৈপ্লবিক প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক উপায় অবলম্বন করি, তাহা যত অহিংসই হউক না কেন আমাদিগকে সর্ববিধ বাধার জন্য প্রস্তুত থাকিতেই হইবে। বৈঠকখানায় বসিয়া বৈপ্লবিক খেলা খেলা যায় না; কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে দুইয়েরই সুবিধা চাহেন। যে ব্যক্তি বৈপ্লবিক পন্থতি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে চায়, তাহাকে সর্বস্ব হারাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ধনী এবং সম্পন্ন ব্যক্তিরা কদাচিৎ বিপ্লবী হইয়া থাকেন, কেহ এইরূপ হইলে সেই নির্বোধকে বিষয়ী ব্যক্তিরা তাঁহাদের শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করেন।

অবশ্য জনসাধারণকে দমন করিবার জন্য স্বতন্ত্র পন্থতি আবশ্যক। ইহাদের মোটর গাড়ী, ব্যাঙ্কে আমানতী টাকা অথবা বাজেয়াপ্ত করিবার মত কোন সম্পত্তি নাই; অথচ ইহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে আন্দোলনের ভার বহন করিতেছে। সকল দিক দিয়া সরকারী কঠোরতার আর একটি ফল দেখা গেল যে, একদল লোক সহসা কর্মতৎপর হইয়া উঠিল, কোন সদ্য প্রকাশিত পুস্তকের ভাষায় ইহাদিগকে "গভর্ণমেণ্টেরিয়ানস্" অর্থাৎ সরকার পক্ষীয় লোক বলা যাইতে পারে। কতকগুলি লোক ভবিষ্যতে কি হইবে বুঝিতে না পারিয়া কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইহা সহ্য করিলেন না। তাঁহারা কেবল নিষ্ক্রিয় রাজভক্তি চাহেন না। সিপাহী বিদ্রোহের খ্যাতনামা ফ্রেডারিক কুপারের ভাষায় কর্তৃপক্ষ, "সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল এবং সুস্পষ্ট রাজভক্তির কম কিছু সহ্য করিবেন না। গভর্ণমেণ্ট প্রজাবৃন্দের কেবলমাত্র নৈতিক বশ্যতা স্বীকারের উপর নির্ভর করিতে সম্মত হইবেন না।" এক বৎসর পূর্বে যখন বৃটিশ উদারনৈতিক দলের নেতারা ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্টে যোগ দিয়াছিলেন, তখন সেই সকল প্রাচীন সহকর্মীকে লক্ষ্য করিয়া মিঃ লয়েড্ জর্জ বলিয়াছিলেন, "যাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে গায়ের রং বদলায় ইহারা সেই জাতীয় সরীসৃপ।" ভারতের নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কোন নিরপেক্ষ রং সহ্য করা হইত না এবং আমাদের কতিপয় স্বদেশবাসী শাসকগণের নয়নানন্দকর উজ্জ্বল বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। সঙ্গীত, শোভাযাত্রা, ভোজসভা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা শাসকবৃন্দের প্রতি অনুরক্তি ও প্রেম জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। অর্ডিন্যান্স, বহুতর বাধা-নিষেধ, সর্বান্ত আইন প্রভৃতি হইতে তাঁহাদের কোনই ভয় নাই; কেন না সরকারী ভাবে ঘোষণাই করা হইয়াছিল যে, ঐগুলি কেবল অবাধ্য সিডিশন প্রচারকারীদের জন্য, রাজভক্তদের উহাতে চিন্তিত হইবার কিছুই নাই। কাজেই তাঁহাদের স্বদেশবাসীর আতঙ্ক, সংঘর্ষ ও সংঘাতের মধ্যেও তাঁহারা নির্বিকার চিত্তে উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা সেই লিখিত ফিলিপিনী দেশপ্রেমিকের সহিত একমত হইবেন। সে বলিয়াছিল, "একটি জাতের কারণ হইতে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, আমাকে ক্রীতদাস করা অসম্ভব, কেন না আমি

সর্বদাই সম্মত।”

গভর্ণমেণ্টের মনে কোন প্রকারে এই ধারণা জন্মিল যে, কংগ্রেস স্ত্রীলোকদিগকে আন্দোলনে আনিয়া জেলখানা পূর্ণ করিতেছে। কংগ্রেসের আশা যে, নারীরা লঘুদণ্ড পাইবে ও সদ্ব্যবহার পাইবে। ইহা অত্যন্ত আজগুবী ধারণা, যেন লোকে ইচ্ছা করিয়া পরিবারস্থ নারীদের কারাগারে পাঠায়! সাধারণতঃ নারীরা যখন আন্দোলনে যোগদান করেন, তখন পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করেন, অন্ততঃ তাঁহাদের পূর্ণ সহানুভূতি পান না। যাহা হউক, গভর্ণমেণ্ট দীর্ঘ কারাদণ্ড এবং জেলে খারাপ ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীলোকদিগকে নিরুৎসাহ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। আমার ভগ্নীর গ্রেফ্‌তার ও কারাদণ্ড হইবার পর পনর ষোল বৎসর বয়স্কা কতকগুলি তরুণী বালিকা কর্তব্য নির্ধারণের জন্য সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের উৎসাহ ছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতা ছিল না। তাহারা পরামর্শ করিতেছিল। এমন সময় রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যেই তাহাদিগকে গ্রেফ্‌তার করা হইল এবং প্রত্যেককে দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ভারতে প্রত্যহ অনুষ্ঠিত ইহা একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র। অধিকাংশ বালিকা ও নারী কারাগারে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে, এমন কি সময় সময় পুরুষদের অপেক্ষাও নির্যাতন সহিয়াছে। আমি অনেক বেদনাবহ দৃষ্টান্তের কথা শুনিয়াছি। বোম্বাই জেলে অন্যান্য সত্যাগ্রহী নারীবন্দিনীদের সহিত মীরাবেন (মেডিলিন স্লেড্) যে অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আমি তাহা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছি।

যুক্ত-প্রদেশে আমাদের আন্দোলন পল্লী-অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। কৃষকদের প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেস ক্রমাগত চাপ দেওয়ায় ফলে বেশ মোটা রকম খাজনা মাপের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, যদিও আমরা তাহা উপযুক্ত বিবেচনা করি নাই। আমাদের গ্রেফ্‌তারের অব্যবহিত পরেই আরও খাজনা মাপের কথা ঘোষণা করা হইল। ইহা আশ্চর্য যে কিছু পূর্বে এই ঘোষণা হইলে অবস্থার অনেক পার্থক্য হইত। তাহা হইলে আমাদের পক্ষে উহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হইত; কিন্তু কংগ্রেস যাহাতে এই খাজনা মাপের কৃতিত্বের প্রশংসা না পায়, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন, এই জন্য একদিকে তাঁহারা কংগ্রেসকে পিষিয়া মারিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন, অন্য দিকে কৃষকদিগকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য যথাসম্ভব খাজনা মাপ দিতে লাগিলেন। যেখানেই কংগ্রেসের চাপ অত্যধিক হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা সর্বোচ্চহারে খাজনা মাপ দিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এই খাজনা মাপের পরিমাণ অনেক বেশী হইলেও ইহাতে কৃষক সমস্যার সমাধান হইল না বটে, কিন্তু অবস্থা অনেক শান্ত হইল। কৃষকদের প্রতিরোধের জোর কমিয়া গেল এবং আমাদের বৃহত্তর আন্দোলনের দিক দিয়া আমরাও সাময়িকভাবে দুর্বল হইয়া পড়িলাম। এই আন্দোলনে যুক্ত-প্রদেশের সহস্র সহস্র লোক দুর্দশাগ্রস্ত হইল, অনেকে সর্বস্বান্ত হইল। কিন্তু এই আন্দোলনের চাপে লক্ষ লক্ষ কৃষক সর্বোচ্চ হারে খাজনা মাপ পাইয়া (আইন অমান্য আন্দোলন ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপার ছাড়া) বহুতর বিরক্তিকর হয়রানির হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। সাময়িক ভাবে এক বৎসরের জন্য এই খাজনা মাপ পাওয়া কৃষকদের পক্ষে অবশ্য খুব বড় কথা নয়। কিন্তু ইহাও কৃষকদের পক্ষ হইতে যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অবিরত চেষ্টার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছিল, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সাধারণ কৃষকগণ সাময়িক ভাবে ইহাতে লাভবান হইলেও

এই আন্দোলনের আঘাত তাহাদের মধ্যে সাহসী ব্যক্তিরাই সহ্য করিয়াছে।

১৯৩১-এর ডিসেম্বরে যখন যুক্ত-প্রদেশে বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারী হয়, তাহার সহিত একটি বিবৃতিমূলক পরিশিষ্টও ছিল। এই বিবৃতি অথবা অন্যান্য অর্ডিন্যান্সের সহিত প্রকাশিত বিবৃতিগুলিতে প্রচারকার্যের সুবিধার জন্য অনেক অর্ধসত্য ও অসত্য ছিল। ইহাও আত্মপ্রচারের কৌশলমাত্র এবং আমাদের পক্ষে উহার উত্তর দেওয়া অথবা ভুলগুলির প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না। শেরোয়ানী সম্পর্কে একটি মিথ্যা ঘটনা প্রচারের চেষ্টায়, তিনি গ্রেফতার হইবার প্রাক্কালে প্রতিবাদ করেন। গভর্ণমেন্টের বিবৃতি ও ত্রুটিস্বীকারমূলক প্রত্যাহার পত্রগুলি অত্যন্ত কৌতুককর। উহাতে বুঝা যায়, গভর্ণমেন্ট কত বিচলিত এবং তাঁহাদের মানসিক অস্থিরতা কত বেশী। স্পেনের রাজা বুর্বোবংশীয় তৃতীয় চার্লস তাঁহার রাজত্ব হইতে জেসুইটদের নির্বাসিত করিবার যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন, একদিন তাহা পাঠ করিতে গিয়া ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ঘোষণাপত্র অর্ডিন্যান্স ও তাহার যুক্তিগুলি বিশেষভাবে মনে পড়িল। ১৭৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত ঐ ঘোষণাপত্রে রাজা তাঁহার কার্যের বৈধতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিয়াছেন,—"আনুগত্য, শান্তি ও সুবিচার প্রজাবৃন্দের মধ্যে রক্ষা করিবার জন্য আমার কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি গুরুতর কারণে ইহার আবশ্যক হইয়াছে। এবং অন্যান্য জরুরী, বিচারসঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় যুক্তি, তাহা আমার রাজহৃদয়ে আবদ্ধ রহিল।"

ঠিক এইরূপেই অর্ডিন্যান্সের প্রকৃত কারণগুলি বড়লাটের হৃদয়ে অথবা তাঁহার পরামর্শদাতাদের সাম্রাজ্যবাদী হৃদয়ে আবদ্ধ রহিল, যদিও উহা স্পষ্ট করিয়াই বুঝা গিয়াছিল। সরকারীভাবে যে সকল যুক্তি ঘোষণা করা হইল, তাহা হইতে আমরা ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রচারকার্যের অভিনব কৌশলগুলির সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা বুঝিতে পারিলাম। কয়েকমাস পরে আমরা জানিতে পারিলাম, আধা-সরকারী ভাবে বহু পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপনী পল্লী-অঞ্চলে প্রচার করা হইতেছে। ঐগুলি অতি আশ্চর্য ভ্রান্ত বিবৃতিতে পূর্ণ এবং বিশেষভাবে কংগ্রেসের জন্যই যে দ্রব্যমূল্যে হ্রাস পাইয়া কৃষকদের দুর্দশা হইয়াছে, তাহাও ঐ গুলিতে উল্লিখিত হইত। কংগ্রেসই জগদ্ব্যাপী মন্দা ঘটাইয়াছে, কংগ্রেসের শক্তির প্রতি কি অসামান্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপন! কিন্তু কংগ্রেসের মর্যাদা নষ্ট করার আশায়, এই মিথ্যা কথাটা অক্লান্তভাবে পুনঃ পুনঃ প্রচার করা হইতে লাগিল।

ইহা সত্ত্বেও যুক্ত-প্রদেশের প্রধান প্রধান জিলার কৃষকগণ নিরুপদ্রব প্রতিরোধের আহ্বানে (যাহা অনিবার্যরূপে খাজনা মকুবের আন্দোলনের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল) চমৎকার সাড়া দিয়াছিল। ইহা ১৯৩০ হইতে অধিকতর ব্যাপক এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ। ইহার মধ্যে খোস মেজাজ ও রঙ্গ রহস্যের অভাব ছিল না। রায়বেরিলী জিলার বাকুলিয়া গ্রামে পুলিশ দলের আগমন সম্পর্কে একটি হাসির গল্প শুনিয়াছিলাম। বাকী খাজনার দায়ে তাহারা মালপত্র ক্রোক করিতে গিয়াছিল। গ্রামবাসীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল এবং তাহারা অনেকটা তেজস্বী প্রকৃতির। তাহারা দেওয়ানী আদালতের কর্মচারী ও পুলিশদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীর দরজা কপাট খুলিয়া দিল এবং তাহাদিগকে যেখানে খুসী প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিল। কিছু গরু বাছুর প্রভৃতি ক্রোক করা হইল। তারপর গ্রামবাসীরা তাহাদের 'পান সুপারী' দিয়া সম্মানের সহিত বিদায় দিল। তাহারা লজ্জিতভাবে যেন জব্দ হইয়া চলিয়া গেল! কিন্তু ইহা অতি বিরল ঘটনা। অল্পদিন পরেই রঙ্গ রহস্য বা দয়া-দাক্ষিণ্যের লেশমাত্রও রহিল না। বাকুলিয়ার ক্রোকের

গ্রামবাসীরা তাহাদের ব্যঙ্গপ্রিয়তা ও বেপরোয়া সাহসের শাস্তি অনেকখানিই পাইয়াছিল।

এই সকল জিলায় কয়েকমাস ধরিয়া প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখিল এবং সম্ভবতঃ গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভ হইতে খাজনা আদায় সুরু হইল। গভর্ণমেণ্টের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু লোককে গ্রেফ্‌তার করিতে হইল। সাধারণতঃ, বিশেষ কর্মী কিংবা গ্রামের নেতাদের গ্রেফ্‌তার করা হইত, বাদ বাকী সকলকে প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কারাদণ্ড দেওয়া অথবা গুলি চালনা অপেক্ষা প্রহার করাকেই তাঁহারা উৎকৃষ্টতর পন্থা বলিয়া মনে করিতেন। যেখানে যতবার ইচ্ছা প্রয়োজন মত ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং দূরবর্তী পল্লীগ্রাম হইতে ইহা বাহিরে প্রচারের সম্ভাবনাও অতি কম ছিল এবং ইহাতে জেলে বন্দীর সংখ্যাও বাড়িত না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছেদ, ক্রোক, গরু-বাছুর, সম্পত্তি নীলাম প্রভৃতিও চলিতেছিল। নামমাত্র মূল্যে কৃষকদের যথাসর্বস্ব বিক্রয় তাহারা অসহায় বেদনায় নিরীক্ষণ করিত।

অন্যান্য অনেক বাড়ীর মতই গভর্ণমেণ্ট 'স্বরাজ ভবন'ও দখল করিয়াছিলেন। স্বরাজ ভবনে অবস্থিত কংগ্রেস হাসপাতালের অনেক মূল্যবান সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রও দখল করা হইল। কয়েকদিন হাসপাতালের কাজ বন্ধ রহিল, তারপর নিকটস্থ উদ্যানে খোলা জায়গায় চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল। ইহার পর উহা স্বরাজ ভবনের সংলগ্ন একটি ছোট বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। সেই হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় এখানে আড়াই বৎসর ছিল।

আমাদের আবাস গৃহ 'আনন্দ ভবন'ও গভর্ণর দখল করিতে পারেন ইহা লইয়া কথা উঠিতে লাগিল, কেন না আমি আয়করের একটা মোটা টাকা দিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম। ১৯৩০ সালে আমার পিতার উপর যে আয় ধার্য হইয়াছিল আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য তিনি তাহা প্রদান করেন নাই। ১৯৩১ সালে দিল্লী সন্ধির পর আয়কর বিভাগের কর্তৃপক্ষের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে আমি উহা কিস্তিবন্দী হারে পরিশোধ করিতে সম্মত হইয়াছিলাম এবং এক কিস্তীর টাকাও দিয়াছিলাম। অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ার পর আমি টাকা না দিবার সঙ্কল্প করিলাম। কৃষকদিগকে খাজনা বন্ধ করিবার পরামর্শ দিব অথচ নিজে আয়কর দিব, ইহা আমার নিকট অত্যন্ত অন্যায় এবং দুর্নীতিপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল। অতএব, আমাদের বাড়ী গভর্ণর ক্রোক করিবেন, আমি ইহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। যে ধারণা আমার নিকট মর্মান্তিক হইয়াছিল তাহা এই যে, আমার মাতা গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইবেন, আমাদের পুঁথি পুস্তক, কাগজ পত্র, আসবাব ও অনেক অস্থাবর সম্পত্তি—যেগুলির প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত আসক্তি রহিয়াছে এবং অনেক স্মৃতি যাহার সহিত জড়াইয়া আছে—সেগুলি পরহস্তগত হইবে, অথবা বিনষ্ট হইবে, আমাদের জাতীয় পতাকা নামাইয়া লইয়া সেখানে ইউনিয়ন জ্যাক উড্ডীন করা হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী হারাইবার ধারণা আমার নিকট ভালই লাগিল; ইহার ফলে জমি হইতে বঞ্চিত বহু কৃষকের সহিত আমি সমান হইব এবং তাহারাও বল ও সান্ত্বনা লাভ করিবে। আমাদের আন্দোলনের দিক হইতে বিচার করিলে ইহা হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। সম্ভবতঃ আমার মাতার প্রতি সুবিবেচনা বশতঃ অথবা ইহার ফলে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন বলশালী হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহারা নিরস্ত হইলেন। বহুদিন পরে আমার কতকগুলি রেল কোম্পানীর শেয়ার আবিষ্কৃত হইল এবং আয়কর না দেওয়ার দরুন সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা

হইল। আমার এবং আমার ভগ্নীপতির মোটর গাড়ী ইতঃপূর্বেই বাজেয়াপ্ত করিয়া বিক্রয় করা হইয়াছিল।

এই কালের আর একটি ব্যাপারে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছিলাম। বহু মিউনিসিপালিটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষভাবে যেখানে কংগ্রেস সদস্যরাই সংখ্যাধিক বলিয়া প্রকাশ, সেই কলিকাতা কর্পোরেশনের বাড়ী হইতেও জাতীয় পতাকা টানিয়া নামান হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট ও পুলিশ, আদেশ অমান্য করিলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে এই ভীতি প্রদর্শনের চাপ দিয়া পতাকা সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কঠোর ব্যবস্থার অর্থ সম্ভবতঃ মিউনিসিপালিটি দখল করিয়া লওয়া অথবা তাহার সদস্যদিগকে দণ্ড দেওয়া। কায়েমী স্বার্থ-সংশিলষ্ট এরূপ ভীরুতা স্বাভাবিক এবং তাঁহাদের হয়ত এরূপ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না; কিন্তু তথাপি আমি আহত হইলাম। আমাদের যাহা কিছু প্রিয় ও মহান, এই পতাকা তাহার প্রতীকে পরিণত হইয়াছিল এবং পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া আমরা কতবার ইহার মর্যাদা রক্ষার শপথ গ্রহণ করিয়াছি। নিজ হস্তে পতাকা অবনমিত করা অথবা অন্যকে উহা করিতে আদেশ দেওয়া কেবল মাত্র শপথ ভঙ্গ করা নহে; পরন্তু পবিত্রতার অপহ্নবসূচক ইহা মিথ্যার, প্রবলতর দৈহিক বলের নিকট অবনতি স্বীকার, ইহা সত্যকে অস্বীকার, ইহা দুর্বল আনুগত্য। যাঁহারা এই ভাবে আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড বক্র করিয়াছেন এবং তাহার আত্মসম্মানে আঘাত করিয়াছেন।

তাঁহারা বীরের মত ব্যবহার করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন, কেহই তাহা প্রত্যাশা করেন নাই। কেহ সম্মুখের সারিতে আসিয়া কারাবরণ করেন নাই অথবা অন্যবিধ দুঃখ ও ক্ষতি স্বীকার করেন নাই বলিয়া তাহার নিন্দা করা অন্যায় ও গর্হিত। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে, কাহারও তাহা লইয়া বিচার করিবার অধিকার নাই। কিন্তু পিছনে বসিয়া থাকা বা কাজ করা এক কথা, আর সত্যকে—একজন যাহা নিজে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে—তাহা অস্বীকার করা আর এক কথা। জাতীয় স্বার্থের বিরোধী কোন কার্য করিতে আদিষ্ট হইলে মিউনিসিপালিটির সদস্যগণের পক্ষে পদত্যাগ করার পথ খোলাই ছিল। কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব আসনে অধিষ্ঠিত থাকাই সুবিবেচনার কার্য বলিয়া মনে করিলেন।

"মৌমাছি ফুলের উপর বসিলে আর গুঞ্জন করে না· তেমনি স্ব স্ব আসনে বসিয়া হুইগগণ মৌনী রহিলেন।"—টমাস মুর।

আকস্মিক সঙ্কটের মুহূর্তে বিহ্বল হইয়া কেহ যখন কোন কাজ করে, তখন তাহার সমালোচনা করা সম্ভবতঃ অবিচার। অতি সাহসী ব্যক্তিও ঘটনার মুহূর্তে সাময়িক দৌর্বল্যে অভিভূত হয়, ইহা গত মহাযুদ্ধে বহুবার দেখা গিয়াছে। তাহার পূর্বে ১৯১২ সালে সেই স্মরণীয় টাইটানিক জাহাজ ডুবিবার সময় অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি, যাঁহাদিগকে কাপুরুষ মনে করা ধারণারও অতীত, তাঁহারা অপরকে ফেলিয়া রাখিয়া, মাঝি মাল্লাদের ঘুষ দিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্বে মোরো ক্যাসল্ জাহাজে অগ্নিকাণ্ডে অত্যন্ত লজ্জাকর ঘটনা ঘটিয়াছিল। সঙ্কটের মুহূর্তে কে কিরূপ আচরণ করিবে, তাহা কেহই জানিতে পারে না, কেন না, তখন বুদ্ধি ও সংযমের উপর আত্মরক্ষার আদিম সংস্কারই প্রবল হইয়া উঠে। অতএব, আমাদের দোষ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট না হইতে পারে তৎসম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করিব না, এমন কোন কথা নাই। জাতীয় তরণীর হাল যে ধরিবে, তাহার হস্ত যেন কম্পিত না হয়, প্রয়োজনের মুহূর্তে তাহা পঙ্গু না হইয়া যায়, সে বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্য

নিশ্চয়ই সাবধান হইতে হইবে। অক্ষমতার অন্কূলে যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে যথাযোগ্য ব্যবহার বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা অধিকতর গর্হিত। ব্যর্থতা অপেক্ষাও তাহা অধিকতর গুর্ অপরাধ।

বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষ সংঘাত বহুল পরিমাণে নৈতিক শক্তি ও মস্তিষ্কের বলের উপর নির্ভর করে। এমন কি রুধির-রঞ্জিত সংগ্রাম সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। মার্সাল ফোস্ বলিয়াছেন, "সমরক্ষেত্রে চরম মুহূর্তে মস্তিষ্কবলেই জয়লাভ হইয়া থাকে।" অহিংস সংঘর্ষে চরিত্র ও মস্তিষ্কের বল আরও অধিক আবশ্যক এবং যে তাহার আচরণের দ্বারা এই চরিত্র বল কলঙ্কিত করে এবং জাতির মনে নৈরাশ্য আনিয়া দেয়, সে আন্দোলনের অতি গুরুতর ক্ষতি করিয়া থাকে।

মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, কত সুসংবাদ দুঃসংবাদ শুনিলাম এবং আমরা কারাজীবনের নীরস ও একঘেয়ে কর্মপদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম। জাতীয় সপ্তাহ আসিল—৬ই হইতে ১৩ই এপ্রিল—আমরা জানিতাম এই সপ্তাহে অনেক কিছুই ঘটিবে। ঘটিয়াছিলও অনেক। তাহার মধ্যে একটি ঘটনা আমার নিকট মুখ্য হইয়া উঠিল। এলাহাবাদে আমার মাতা কর্তৃক পরিচালিত একটি শোভা-যাত্রার গতি পুলিশ রোধ করিল এবং পরে যষ্টি চালনা করিল। মিছিল থামিয়া গেলে একজন আমার মাতার জন্য একখানি চেয়ার লইয়া আসিল। তিনি মিছিলের পুরোভাগে রাস্তার উপর উপবেশন করিলেন। আমার খাস মুন্সী ও অন্যান্য যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে গ্রেফ্তার করিয়া সরাইয়া ফেলা হইল এবং তারপর পুলিশ চড়াও করিল। আমার মাতা ধাক্কা খাইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার মস্তকে পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাত করা হইল। মাথা কাটিয়া রক্ত ঝরিল, তিনি অজ্ঞান হইয়া রাস্তার ধারে পড়িয়া রহিলেন। ততক্ষণে রাজপথ হইতে শোভাযাত্রাকারী ও অন্যান্য জনসাধারণকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে একজন পুলিশ কর্মচারী তাঁহাকে কুড়াইয়া লইয়া নিজের গাড়ীতে করিয়া 'আনন্দ ভবনে' রাখিয়া যান।

সেই রাত্রে এলাহাবাদে এক মিথ্যা গুজব রটিল যে, আমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। ক্রুদ্ধ জনতা দলবদ্ধ হইল, শান্তি ও অহিংসার কথা ভুলিয়া গিয়া পুলিশকে আক্রমণ করিয়া বসিল এবং পুলিশের গুলি বর্ষণে কয়েকজনের মৃত্যু হইল।

ঘটনার কয়েকদিন পর আমি এই সকল সংবাদ (আমাদিগকে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দেওয়া হইত) পাইলাম। আমার বৃদ্ধা দুর্বলা জননী রক্তাক্ত দেহে ধূলিমলিন রাজপথে পড়িয়া আছেন, এই কল্পনা আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। আশ্চর্য, আমি সেখানে উপস্থিত থাকিলে না জানি কি করিতাম! আমার অহিংসা কতখানি অটুট থাকিত? আমার আশঙ্কা হয়, সেই দৃশ্য দেখিয়া সহজেই দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ভুলিয়া যাইতাম এবং কি ব্যক্তিগত কি জাতীয় ফলাফল আমি অল্পই চিন্তা করিতাম।

তিনি অল্পে অল্পে আরোগ্য লাভ করিলেন, যখন পরের মাসে তিনি বেরিলী জেলে আমাকে দেখিতে আসিলেন, তখন তাঁহার মাথায় পটি বাঁধা ছিল। কিন্তু তিনি আমাদের স্বেচ্ছাসেবিকা ও কর্মীদের সহিত একত্রে যষ্টি ও বেত্রাঘাতের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত গর্ব ও হর্ষ প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক, আরোগ্য লাভ করিলেও সেই বয়সে এই গুরুতর আঘাতবেদনা তাঁহার দেহযন্ত্রকে বিকল করিয়াছিল 'এবং এক বৎসর পরে উহার গভীরতর লক্ষণগুলি অত্যন্ত সঙ্কটজনক আকারে দেখা দিয়াছিল।

বেরিলী ও দেরাদুন জেল

ছয় সপ্তাহ পরে আমাকে নৈনী জেল হইতে দেরাদুন জেলে বদলী করা হইল। আমার স্বাস্থ্য পুনরায় খারাপ হইল এবং প্রত্যহ একটু জ্বর হইতে লাগিল, ইহাতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। চার মাস বেরিলীতে কাটাইলাম। গ্রীষ্ম প্রচণ্ড হইয়া উঠিলে আমাকে অপেক্ষাকৃত শীতল হিমালয়ের পাদদেশে দেরাদুন জেলে বদলী করা হইল। এখানে আমি, আমার দুই বৎসর কারাদণ্ডের প্রায় শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ একাদিক্রমে সাড়ে চৌদ্দমাস ছিলাম। দেখা শুনা, চিঠিপত্র ও নির্বাচিত সংবাদ-পত্র হইতে কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম বটে, কিন্তু বাহিরের ঘটনাবলীর সহিত আমার যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, কেবল প্রধান ঘটনাগুলি অস্পষ্টভাবে মনে আছে মাত্র।

আমার কারামুক্তির পর ব্যক্তিগত ব্যাপার ও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি লইয়া কার্যে আত্মনিয়োগ করিলাম। কিন্তু পাঁচমাসের কিছু অধিককাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া পুনরায় আমাকে কারাগারে আসিতে হইল, তদবধি এইখানেই আছি। এইরূপে তিন বৎসরের অধিকাংশ সময় কারাগারে কাটিয়াছে,—ফলে ঘটনাবলীর সহিত আমার যোগ ছিল না এবং এই কালের ব্যাপারগুলি বিশদভাবে জানিবার আমি বিশেষ সুযোগ পাই নাই। যে বৈঠকে গান্ধিজী যোগ দিয়াছিলেন, সেই দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক সম্বন্ধেও আজ পর্যন্ত আমার ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার কোন কথা বলিবারই সুযোগ হয় নাই, তিনি অথবা অন্য কাহারও সহিত পরবর্তী ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে পারি নাই।

১৯৩২ ও ১৯৩৩—এই দুই বৎসর কালে আমাদের জাতীয় সংঘর্ষের গতিপথ আলোচনা করিবার মত আমি বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু আমি রঙ্গমঞ্চ জানি, ইহার নেপথ্যভূমি ও অভিনেতাগণ আমার সুপরিচিত, কাজেই আমি সহজাত বুদ্ধি হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনারও মর্ম গ্রহণ করিতে পারি। প্রথম চারিমাস কাল নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন দৃঢ়তার সহিত চলিল, তারপর ক্রমশঃ তাহা শিথিল হইয়া আসিল। মাঝে মাঝে কোথাও বা কদাচিৎ স্থানীয় সংঘর্ষ দেখা দিত। কোনও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক আন্দোলন বৈপ্লবিক উচ্চ গ্রামে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। ইহা স্থিতিশীল নহে বলিয়াই হয় উপরে উঠিবে নয় নীচে নামিবে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ, প্রথম উৎসাহের অবসানে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল। কিন্তু মন্দীভূত অবস্থায়ও ইহা দীর্ঘকাল চলিতে পারে। বে-আইনী ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান অনেকাংশে সাফল্যের সহিত কার্য চালাইতে লাগিল। ইহার সহিত প্রাদেশিক কর্মীদের যোগ ছিল, কর্ম-নির্দেশাদি প্রেরণ, আন্দোলনের সংবাদাদি আদান-প্রদান এবং কখনও বা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইত।

প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলিও অপেক্ষাকৃত সাফল্যের সহিত কাজ চালাইতেছিল। যে কয় বৎসর আমি জেলে ছিলাম, অন্যান্য প্রদেশের তথ্যকার খবর আমি বেশী জানি না, তবে আমি কারামুক্তির পর কার্যপ্রণালীর কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি নিয়মিত ভাবে ১৯৩২ সালে কার্য পরিচালনা করিয়াছে এবং গান্ধিজীর পরামর্শে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি আইন অমান্য আন্দোলন প্রথম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত (১৯৩৩

সালের মধ্যভাগ) ইহা বরাবর কাজ চালাইয়া গিয়াছে। এই কালের মধ্যে ইহা প্রত্যেক জিলায় সর্বদাই কর্মনির্দেশ প্রদান করিয়াছে, মুদ্রিত অথবা সাইক্লোস্টাইল যন্ত্রে ছাপা ইস্তাহারাদি নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছে, মাঝে মাঝে জিলার কার্য পরিদর্শন করিয়াছে এবং আমাদের কর্মীদিগকে যথানিয়মে ভাতা দিয়াছে। অবশ্য ইহার অধিকাংশই গোপনে করিতে হইত কিন্তু প্রাদেশিক কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সর্বদাই প্রকাশ্যে কাজ করিতেন এবং তিনি গ্রেফ্তার হইলে অপরে তাঁহার স্থান গ্রহণ করিত।

১৯৩০ ও ৩২-এর অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিয়াছি, সমস্ত ভারতবর্ষে গুপ্তভাবে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা অতি সহজ। বাধা সত্ত্বেও বিশেষ চেষ্টা না করিয়াও এবিষয়ে আমরা কৃতকার্য হইয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে মনে করিতেন যে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধের আদর্শের সহিত এই গোপনতা খাপ খায় না এবং এই কারণে জনসাধারণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। বৃহৎ প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনের অতি ক্ষুদ্র অংশ রূপে ইহা অনেকাংশে কার্যকরী কিন্তু ইহার একটা আশঙ্কার দিকও আছে। বিশেষ ভাবে যখন আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া আসে তখন কিছু কিছু নিষ্ফল গুপ্ত প্রচেষ্টা গণ-আন্দোলনের স্থান গ্রহণ করে। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে গান্ধিজী সর্ববিধ গোপনতার নিন্দা করিয়াছিলেন।

যুক্ত-প্রদেশ ছাড়াও গুজরাট ও কর্ণাটকে কিছুকাল যাবৎ কৃষকদের মধ্যে খাজনা বন্ধ আন্দোলন চলিয়াছিল। গুজরাট ও কর্ণাটকে কৃষক-জমিদারেরা গভর্ণমেণ্টকে খাজনা দিতে অস্বীকার করায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সম্পত্তি ও জমি হইতে বঞ্চিত দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য। যুক্ত-প্রদেশের ভূমিবঞ্চিত রায়তদের, প্রাদেশিক কংগ্রেস সাহায্য করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। এখানে সমস্যা অনেক বৃহত্তর (কৃষক-জমিদার অপেক্ষা রায়তদের সংখ্যা বহুগুণে অধিক) এবং অঞ্চলও অধিকতর বিস্তীর্ণ। প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাহায্য করিবার ক্ষমতাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে সাহায্য করা আমাদের সাধ্যাতীত ছিল, অর্ধাশনক্লিষ্ট সাহায্যপ্রার্থী কৃষকগণ হইতে পূর্বোক্ত শ্রেণীকে পৃথক করিয়া দেখাও অতি কঠিন। মাত্র কয়েক সহস্রকে সাহায্য করিতে গেলেই বিব্রত হইতে হইত এবং মনোমালিন্য দেখা দিত। এই কারণে আমরা প্রথম হইতেই অর্থ সাহায্য না করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম এবং তাহা সর্বসাধারণকে জানাইয়া দিয়াছিলাম। কৃষকেরাও আমাদের অবস্থা ও মনোভাব সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। কোন অভিযোগ না করিয়া বা অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তাহারা যে কতদূর সহ্য করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে, বিশেষতঃ কারারুদ্ধ কর্মীদের স্ত্রীপুত্রদিগকে কিছু কিছু সাহায্য দানের চেষ্টা আমরা করিয়াছি। এই হতভাগ্য দেশের দারিদ্র্য এত অধিক যে, মাসিক একটাকা সাহায্য করিলেও লোকে তাহা দৈব-প্রেরিত বলিয়া মনে করে।

এই আন্দোলনকালে যুক্ত-প্রাদেশিক কমিটি (বে-আইনী প্রতিষ্ঠান) কর্মীদিগকে নিয়মিতভাবে যৎসামান্য ভাতা দিয়াছে এবং তাহারা জেলে গেলে তাহাদের পরিবারবর্গকে ভরণপোষণ করিয়াছে। ইহা একটা মোটা খরচের অঙ্ক, তারপর ছাপার খরচ, পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপন সাইক্লোস্টাইল যন্ত্রে ছাপাইবার খরচও একটা মোটা অঙ্ক। ইহা ছাড়া, যাতায়াত খরচ ছিল এবং অপেক্ষাকৃত গরীব জেলাগুলিকে

সাহায্য করিতে হইত। তৎসত্ত্বেও এক শক্তিশালী সঙ্ঘবদ্ধ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন পরিচালনা করিতে গিয়া যুক্ত-প্রাদেশিক কমিটি ১৯৩২-এর জানুয়ারী হইতে ১৯৩৩-এর আগষ্ট পর্যন্ত এই বিশ মাসে মাত্র ৬০,০০০ টাকা অর্থাৎ মাসে ৩১৪০ টাকা ব্যয় করিয়াছে। (এই হিসাবে অবশ্য শক্তিশালী ও অধিকতর স্বচ্ছল এলাহাবাদ, আগ্রা, কানপুর ও লক্ষ্ণৌ জেলা কংগ্রেস কমিটির ব্যয় ধরা হয় নাই।) প্রদেশ হিসাবে ১৯৩২ ও ৩৩-এ যুক্ত-প্রদেশ বরাবর সংঘর্ষের পুরোভাগেই ছিল এবং আমার বিবেচনায় ফল দেখিয়া বিচার করিলে তুলনায় ব্যয় অতি সামান্যই হইয়াছে। আইন অমান্য আন্দোলন বিনষ্ট করিবার জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যে বিশেষ ব্যয় করিয়াছেন, তাহার সহিত এই সামান্য ব্যয় তুলনা করিলে অনেক শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। আমার ধারণা (যদিও আমার ভাল জানা নাই), আরও কয়েকটি প্রধান কংগ্রেস প্রদেশে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় হইয়াছিল। কংগ্রেসের দৃষ্টিতে বিহার তাহার প্রতিবেশী যুক্ত-প্রদেশের তুলনায় অধিকতর দরিদ্র হইলেও আমাদের সংঘর্ষে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়াছিল।

যাহা হউক, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিল, তবুও ইহা কোন মতে চলিতে লাগিল, অবশ্য তাহাতেও কৃতিত্বের অভাব ছিল না। কিন্তু গতিপথে ইহা আর গণ-আন্দোলন রহিল না। গভর্ণমেণ্টের তীব্র দমন নীতি ছাড়াও ১৯৩২-এর সেপ্টেম্বরে ইহা এক প্রচণ্ড আঘাত পাইল। গান্ধিজী হরিজন সমস্যা লইয়া এই প্রথমবার অনশনব্রত গ্রহণ করিলেন। এই অনশন লইয়া জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহাদের চিন্তার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়া গেল। অবশেষে, ১৯৩৩-এর মে মাসে আন্দোলন স্থগিত হওয়ায় কার্যতঃ নিরুপদ্রব প্রতিরোধের মৃত্যু হইল। পরে কার্যলেশহীন মতবাদ রূপে উহা কিছু-কাল চলিয়াছে মাত্র। অবশ্য ইহা সত্য যে, ঐরূপে স্থগিত না করা হইলেও ইহা ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। দমন নীতির কঠোরতা ও পীড়নে ভারতবর্ষ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। জাতির মানসিক শক্তি সাময়িক ভাবে নিঃশোষিত হইল, পুনরায় তাহা ভরিয়া তোলা গেল না। ব্যক্তিগত ভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ করিতে পারেন এমন ব্যক্তি অনেকেই ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এক প্রকার কৃত্রিম পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করিতেছিলেন।

জেলে বসিয়া এক মহান আন্দোলনের ক্রমশঃ শোচনীয় পরিণতির সংবাদ পাওয়া আমাদের পক্ষে আনন্দের ব্যাপার ছিল না। তবে আমাদের মধ্যে অতি অল্পলোকই একটা দৃশ্যমান সাফল্য প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। যদি জন-জাগরণ অদম্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে অঘটন ঘটিলে ঘটিতে পারে, এমন প্রত্যাশাও ছিল বটে, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করা চলে না। কখনও নীচে, কখনও উপরে, কখনও বা স্তব্ধ হইয়া দীর্ঘকাল সংঘর্ষ চলিবে এবং ইহার মধ্যেই জনসাধারণকে সুশৃঙ্খলিত, ঐক্যবদ্ধ কার্যপ্রণালী ও সুস্পষ্ট মতবাদে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, আমরা এইরূপে ভাবিতে লাগিলাম। ১৯৩২-এর প্রথমভাগে একসময়ে আমি দ্রুত দৃশ্যমান সাফল্যের আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহার ফলে আপোষ অনিবার্য হইয়া উঠিত এবং 'সরকার পক্ষীয়' ও সুবিধাবাদীরাই তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিত। ১৯৩১-এর অভিজ্ঞতায় আমাদের চোখের পর্দা খুলিয়া দিয়াছিল। যখন জন-সাধারণ দৃঢ় থাকে এবং তাহাদের ধারণা স্পষ্ট থাকে, তখন সাফল্য আসিলেই তাহারা তাহার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে। অন্যথা জনসাধারণ যুদ্ধ করে, ত্যাগ স্বীকার করে এবং সুযোগের মুহূর্তে, অন্যান্য ব্যক্তিরা দিব্য আরামে বাহিরে

আসিয়া তাহাদের অর্জিত সম্পদ হস্তগত করে। এই আশঙ্কা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল, কংগ্রেসের মধ্যেও অনেকে শিথিলভাবে চিন্তা করিতেন, আমরা কি প্রণালীর গভর্ণমেণ্ট বা সমাজ চাহি সে সম্বন্ধে অনেকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অনেক কংগ্রেসপন্থী বর্তমান গভর্ণমেণ্টের বিশেষ পরিবর্তন চাহেন না, কেবল ব্রিটিশ বা বিদেশীর পরিবর্তে স্বদেশী-মার্কা শাসক হইলেই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করেন।

আদি ও অকৃত্রিম 'সরকার-পন্থী'দের অবশ্য গণনার মধ্যেই আনা উচিত নহে, কেন না তাঁহাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান মূলনীতি—রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাহার হাতে থাকিবে, তাহারই আনুগত্য স্বীকার। এমন কি, মডারেট ও রেসপন্‌সিভিস্টরাও গভর্ণমেণ্টের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; ফলে, তাঁহাদের সাময়িক সমালোচনাগুলি নিষ্ফল ও তুচ্ছ হইয়া যাইত। ইঁহারা সর্বদা সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত আইননিষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন এবং এই কারণে ইঁহারা কখনও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ সমর্থন করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন। সর্ববিধ ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে দমন করিবার উদ্যম তাঁহারা ভয়চকিত নীরব দর্শকের মত দেখিতে লাগিলেন। ইহা কেবল গভর্ণমেণ্টের আইন অমান্য আন্দোলনের সম্মুখীন হইয়া উহাকে দমন করার প্রশ্ন নহে, সর্ববিধ রাজনৈতিক কার্যই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, অথচ ইহার বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারিত হইল না। যাঁহারা সাধারণতঃ ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করেন, তাঁহারা আন্দোলনের সহিত জড়িত হইয়া পড়িলেন এবং সরকারী পীড়নের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করিবার শাস্তিও গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য সকলে ভয়ার্ত হইয়া হীনভাবে বশ্যতা স্বীকার করিলেন; কোন সমালোচনা তাঁহাদের কণ্ঠস্বরে ফুটিল না। মৃদু সমালোচনাকালেও কত অনুনয় বিনয় এবং তাহার সহিত কংগ্রেস এবং সংঘর্ষ পরিচালনকারীদের তীব্র নিন্দা যোগ করিয়া দেওয়া হইত।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ব্যক্তিস্বাধীনতার অনুকূলে শক্তিশালী জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে, উহা সঙ্কুচিত করিবার প্রত্যেকটি চেষ্টার ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ হয়। (সম্ভবতঃ ইহা এখন অতীত ইতিহাসের কথা।) এমন বহু ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা নিজেরা কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক আন্দোলনে যোগ দিতে চাহেন না, অথচ বক্তৃতা ও লিখিবার স্বাধীনতা, সঙ্ঘ ও সমিতি গঠন, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অবিরত আন্দোলন করিয়া থাকেন। ভারতীয় উদারনীতিকগণ ব্রিটিশ উদারনীতিকদলের মত ও আদর্শ অনুকরণ করিয়া চলিবার দাবী করেন (যদিও এক নাম ছাড়া ইঁহাদের মধ্যে আর কোন সাদৃশ্য নাই)। এই সকল স্বাধীনতা সঙ্কোচের অন্ততঃ বাচনিক প্রতিবাদও তাঁহাদের নিকট প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, কেন না ইহাতে তাঁহাদেরও অসুবিধা হয়। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ কিছুই করেন না। ইঁহারা ভলতেয়ারের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে পারেন না যে,—"আমি তোমার বক্তব্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন মতাবলম্বী; কিন্তু তোমার উহা বলিবার অধিকার আমি মৃত্যুবরণ করিয়াও রক্ষা করিব।"

সম্ভবতঃ ইহার জন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া উচিত নহে, কেন না তাঁহারা কখনও নিজেদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সমর্থক বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। তাঁহারা এমন অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন যে, একটি শিথিল বাক্যের ফলে বিপদে পড়িতে হইত। জগতে বহুল নীতি, স্বাধীনতার প্রাচীন উপাসক ব্রিটিশ

লিবারেলগণ এবং ব্রিটিশ শ্রমিকদলের নূতন সমাজতন্ত্রীদের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা আলোচনা করা অধিকতর প্রাসঙ্গিক। দুঃখের হইলেও তাঁহারা যথাসম্ভব ধীরতা রক্ষা করিয়া ভারতীয় দমন নীতির অনুষ্ঠানগুলি দেখিতেন এবং 'মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের' জনৈক পত্রলেখকের ভাষায়, "দমন নীতির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের" সাফল্য দেখিয়া সন্তোষলাভ করিতেন। সম্প্রতি গ্রেট ব্রিটেনের ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট একটি সিদিসান বিল পাশ করাইতে উদ্যোগী হওয়ায় তাহার অনেক কিছু সমালোচনা হইয়াছে। বিশেষভাবে লিবারেল ও শ্রমিকদলের সদস্যগণ, অন্যান্য কারণের সহিত এই আপত্তি প্রকাশ করেন যে, ইহার ফলে বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইবে এবং ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে খানাতল্লাসীর পরোয়ানা জারী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে। এই সকল সমালোচনা পাঠ করিলে আমার চিত্তে সহানুভূতির উদ্রেক হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কথাও মনে পড়ে, এখানে অধুনা যে সকল আইন প্রচলিত রহিয়াছে, প্রস্তাবিত ব্রিটিশ সিদিসান বিল অপেক্ষা তাহা অন্ততঃ শতগুণে অধিক মন্দ। যে সকল ব্রিটেনবাসী ইংলণ্ডে একটি মশা দেখিয়া ভীত হন, তাঁহারা ভারতে অম্লান বদনে উট গিলিয়া ফেলেন, ইহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হই। প্রত্যেক সাম্রাজ্যনীতিক উদ্দেশ্যের মধ্যেই সাধুতা দেখা, বৈষয়িক স্বার্থের অনুপাতে নৈতিক আদর্শ ঠিক করিয়া লওয়ার ব্রিটিশ জাতির আশ্চর্য দক্ষতা আমি প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অপহরণকারী বলিয়া তাঁহারা সরল বিশ্বাস ও নৈতিক ক্ষোভের সহিত হিটলার ও মুসোলিনীর নিন্দা করিয়া থাকেন। আবার অনুরূপ সরল বিশ্বাস লইয়া তাঁহারা ভারতে স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিবার ব্যবস্থাগুলি নির্বিকার চিত্তে দর্শন করেন। উহা যে অপরিহার্য প্রয়োজন, তাহা উচ্চাঙ্গের নৈতিক যুক্তি দিয়া তাঁহারা বুঝাইয়া দেন। প্রকৃত নিরপেক্ষ ব্যবহার করিতে হইলে উহা করা ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর নাই!

যখন ভারতে বহু নরনারী অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন, তখন সুদূর লণ্ডনে বাছা বাছা ব্যক্তিরা মিলিত হইয়া ভারতের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিতে লাগিলেন। ১৯৩২ সালে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক এবং বহুতর কমিটির ব্যবস্থা হইল, ব্যবস্থা পরিষদের বহু সদস্যকে ঐ সকল কমিটির সদস্য করা হইল যাহাতে তাঁহারা কর্তব্য পালনের সহিত ব্যক্তিগত আনন্দও উপভোগ করিতে পারেন। সরকারী খরচায় এক বৃহৎ জনতা লণ্ডনে গেল। ১৯৩৩ সালে ভারতীয় এসেসরদের লইয়া জয়েণ্ট কমিটি বসিল, আবার উদার গভর্ণমেণ্ট সাক্ষ্য দিবার জন্য একদল লোককে রাহাখরচ দিয়া বিলাতে পাঠাইলেন। ভারতের সেবা করিবার আন্তরিক আগ্রহে জনসাধারণের অর্থে অনেকে আবার সমুদ্র পাড়ি দিলেন। শোনা যায়, রাহাখরচের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য অনেকে নয়ছয়কারীর করিয়াছিলেন।

ভারতে গণ-আন্দোলন দেখিয়া ভীত কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিগণ লণ্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুশীতল ছায়ার আশ্রয়ে সমবেত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। কিন্তু যখন মাতৃভূমি জীবন মরণ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত, তখন কোন ভারতীয়ের এই শ্রেণীর ব্যবহার দেখিলে আমাদের জাতীয়তাবোধ আহত হয়। কিন্তু একটি কারণে আমাদের অনেকের নিকট ইহা শুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে হইয়াছিল, আমরা ভাবিলাম (এখন দেখিতেছি, ভুল) ইহা চূড়ান্তভাবে ভারতের প্রগতিবিরোধীদের সহিত প্রগতিপন্থীদের বিচ্ছেদ ঘটিল। এই ভাগাভাগির ফলে জনসাধারণ রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করিবে এবং সকলেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবে যে, কেবলমাত্র স্বাধীনতার দ্বারাই আমরা সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধান

ও জনসাধারণকে দর্বহ ভারমর্ক্ত করিতে পারি।

কিন্তু এই সমস্ত ব্যক্তিরা কেবল তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নহে, চিন্তা ও চরিত্রের দিক হইতেও ভারতীয় জনসাধারণ হইতে যে কতখানি পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ই'হাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র নাই। এত ত্যাগ স্বীকার, এত দঃখবরণ যে কিসের প্রেরণায়, তাহা তাঁহারা বর্ঝিতে পারেন না। এই সমস্ত খ্যাতনামা রাজনৈতিকের নিকট একটি মাত্র বাস্তব সত্য—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি—যাহার বিরর্দ্ধতা করিয়া কোন লাভ নাই, অতএব ভাল হউক মন্দ হউক ইহাকে স্বীকার করাই কর্তব্য। একথা তাঁহাদের চিত্তে কখনও উদয় হয় না যে, জনসাধারণের শর্ভেচ্ছা ব্যতীত ভারতের কোন সমস্যার সমাধান অথবা প্রকৃত জীবন্ত শাসনতন্ত্র রচনা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। মিঃ জে. এ. স্পেণ্ডার তাঁহার সদ্য প্রকাশিত "সমসাময়িক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"-এ লিখিয়াছেন যে, কিরূপে নিয়মতান্ত্রিক সঙ্কটের অবসানকল্পে আহূত ১৯১০ সালের আইরিশ জয়েণ্ট কন্‌ফারেন্স ব্যর্থ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, যে শ্রেণীর লোক বাড়ীতে আগর্ন লাগিলে তাহা বীমা করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, সেই শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারাই সঙ্কটের সময় শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ১৯১০ সালের আয়র্লণ্ডের অপেক্ষাও ১৯৩২-৩৩ সালে ভারতবর্ষে অধিকতর অগ্নি ছিল এবং যদিও শিখা নিবিয়া গিয়াছে তথাপি ভস্মাচ্ছাদিত জ্বলন্ত অঙ্গার বহর্দিন বিদ্যমান থাকিবে, তাহা ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মতই উত্তপ্ত ও অতৃপ্ত।

ভারতবর্ষে শাসকদের মধ্যে হিংসা প্রবর্ত্তি অতি আশ্চর্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য ইহার ধারা পরাতন এবং এই দেশ ব্রিটিশ কর্তৃক প্রধানতঃ পর্লিশ রাষ্ট্র-রূপেই শাসিত হইয়া আসিতেছে। এমন কি সিভিলিয়ান শাসকবৃন্দের প্রভুত্ব-মূলক দৃষ্টিভঙ্গীও সামরিক ধরণের; যেন বিজিত দেশ বলপূর্বক দখলকারী সৈন্যদলের শত্রুতামূলক মনোভাব। বর্তমান ব্যবস্থার বিরর্দ্ধে গর্রুতর দ্বন্দ্বের অবতারণা হওয়ায় মনোভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গলা ও অন্যত্র অনর্ষ্ঠিত টেরোরিজমের ফলে আমলাতান্ত্রিক হিংসাবর্ত্তির খোরাক জর্টে এবং ইহা হইতে তাঁহারা নিজেদের কার্যের বৈধতা প্রতিপন্ন করেন। বহর্তর অর্ডিন্যান্স এবং গভর্ণমেণ্টের নীতির ফলে শাসক ও পর্লিশদের হাতে এত প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, কার্যতঃ ভারতবর্ষ পর্লিশরাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার কোন প্রতিবেধক ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে।

অল্পাধিকতর ভারতের প্রত্যেক প্রদেশকেই তীব্র দমন নীতির অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে; কিন্তু সীমান্ত-প্রদেশ ও বাঙ্গলাই দঃখ ভোগ করিয়াছে সর্বাধিক। সীমান্ত প্রদেশ সর্বদাই প্রধান সামরিক কেন্দ্র এবং ইহার শাসনকার্যও অর্ধসামরিক নিয়ম প্রণালীতে হইয়া থাকে। ইহার সামরিক গর্রুত্ব অধিক থাকায় 'লালকুর্তা' আন্দোলনে গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে বিচলিত হইলেন। এই প্রদেশকে 'শান্ত' করিবার জন্য সৈন্যদল কুচকাওয়াজ করিতে লাগিল এবং "দর্দান্ত গ্রামবাসীদিগকে" সায়েস্তা করিতে লাগিল। সমস্ত ভারতবর্ষে গ্রাম-গর্লির উপর অত্যধিক পাইকারী জরিমানা ধার্য করা এবং কখনও কখনও সহরেও (বিশেষতঃ বাঙ্গলায়) উহা ধার্য করা সচরাচরের ব্যবস্থা হইয়া উঠিল। কোথাও পিটুনী পর্লিশ বসান হইত এবং যাহাদের অপরিমিত ক্ষমতা অথচ সংযমের ব্যবস্থা নাই সেখানে পর্লিশের অতিশাসন অনিবার্য। শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে বিশৃঙ্খলা ও বে-আইনী ঘটনার দৃষ্টান্ত আমরা বহর দেখিয়াছি।

বাঙ্গলার কোন কোন অংশে এক আশ্চর্য দৃশ্যের অবতারণা হইল। গভর্ণমেণ্ট সমস্ত অধিবাসীদিগকে (অথবা ঠিক ঠিক বলিতে হইলে হিন্দু অধিবাসীদিগকে) শত্রু বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং প্রত্যেককে—বার হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক নর ও নারী, বালক-বালিকা—পরিচয়পত্র রাখিতে হইবে এই ব্যবস্থা হইল। বহিষ্কার, অন্তরীণ, পোষাক সম্পর্কে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা, স্কুলগুলি নিয়ন্ত্রণ অথবা বন্ধ, বাই-সাইকেল চড়া নিষেধ, পুলিশে গতিবিধির সংবাদ দান, সান্ধ্য আইন, সামরিক রুটমার্চ, পিটুনী পুলিশ, পাইকারী জরিমানা এবং অন্যান্য আরও অনেক বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছিল। বিস্তৃত অঞ্চল যেন সামরিক বল দ্বারা অবরুদ্ধ প্রতীয়মান হইতেছিল এবং অধিবাসীরা, নরনারী প্রত্যেকেই কঠোর নজরবন্দী হইয়া যেন ছুটির ছাড়পত্র হাতে করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মতে এই সকল আশ্চর্য ব্যবস্থা ও বিধিনিষেধ প্রয়োজন হইয়াছিল কিনা সে বিচারের অধিকার আমার নাই। যদি ইহার প্রয়োজন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করার, অপমানিত করার, পীড়ন করার গুরুতর অপরাধে গভর্ণর নিশ্চয়ই দোষী সাব্যস্ত হইবেন। যদি এইগুলির প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ব্যর্থতার চূড়ান্ত প্রমাণ।

এই হিংসামূলক মনোভাব আমাদের পিছু পিছু কারাগারে গিয়াও উপস্থিত হইল। কারাগারে শ্রেণীবিভাগ একটা প্রহসন মাত্র। যাঁহারা উচ্চশ্রেণী ভুক্ত হইলেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা এক পীড়ন হইয়া উঠিল। অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকেই উচ্চশ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছিল এবং বহু সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ নরনারী এমন এমন অবস্থার মধ্যে পতিত হইলেন, যাহা অবিরাম এক মানসিক যন্ত্রণাবিশেষ। গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়াই রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা সাধারণ কয়েদীদের অপেক্ষাও কঠোর ও দুঃখপূর্ণ করিতে লাগিলেন। কারাবিভাগের জনৈক ইনস্পেক্টার জেনারেল সমস্ত কারাগারে এক গুপ্ত ইস্তাহার দ্বারা আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দীদিগকে "কঠোর ব্যবহার" করিবার অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।* জেলে বেত্রদণ্ড সচরাচরের শাস্তি হইয়া উঠিল। ১৯৩০-এর ২৭শে এপ্রিল পার্লামেণ্টে সহকারী ভারতসচিব বলিয়াছিলেন যে, "১৯৩২-এ আইন অমান্য আন্দোলন সংশ্লিষ্ট অপরাধে ৫০০ জন বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, ইহা স্যার স্যামুয়েল হোর অবগত আছেন।" জেল-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবার অপরাধে যাহারা বেত্রদণ্ড পাইয়াছে, সেই সংখ্যা ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে কিনা পরিষ্কার ভাবে বুঝিবার উপায় নাই। ১৯৩২ সালে আমরা জেলে প্রায়ই বেত্রদণ্ডের সংবাদ পাইতাম। একটি কি দুইটি বেত্রদণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ আমরা ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে তিনদিন অনশন করিয়াছিলাম, তাহা মনে আছে। তখন আমি এই পাশবিক দণ্ডে ব্যথিত হইয়াছিলাম। এখনও আমি এরূপ সংবাদে মর্মাহত হই এবং সর্বদা বেদনা অনুভব করি কিন্তু প্রতিবাদস্বরূপ অনশন করিবার কথা মনে উদয় হয় না। কালক্রমে পাশবিকতার বিরুদ্ধে অনুভূতির তীব্রতাও কমিয়া আসে। অন্যান্য ব্যবস্থাও দীর্ঘস্থায়ী হইলে জগত উহাতে অভ্যস্ত হওয়া উঠে।

---

* এই ইস্তাহার ১৯৩২-এর ৩০শে জুন প্রকাশিত হয়। ইহাতে ইহাও লিখিত ছিল যে, "ইনস্পেক্টার জেনারেল, জেলা সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ ও অন্যান্য কর্মচারীদের এই বিষয়টি স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন যে, আইন অমান্য বন্দীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক ভাল ব্যবহার করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। এই শ্রেণীর কয়েদীদিগকে শৃঙ্খলায় রাখিবার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।"

আমাদের কর্মীদিগকে জেলখানায় ঘানি, যাঁতা টানা প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রমের কাজ দেওয়া হইত, কাজকর্ম ও ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে এত অসহ্য করিয়া তোলা হইত, যাহাতে তাহারা ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া ও গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়া মুক্তি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হয়। জেল কর্তৃপক্ষ ইহা একটা প্রকাণ্ড জয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

যাহারা পীড়ন ও অপমানে ক্ষুব্ধ হইত, সেই সকল বালক ও যুবকদের ভাগ্যেই এই শ্রেণীর কঠিন পরিশ্রম জুটিত। এই সমস্ত সুন্দর সুন্দর বালক, আত্মমর্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন ও দুরাকাঙ্ক্ষায় দুঃসাহসী,—যে শ্রেণীর বালক ব্রিটিশ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশংসা ও উৎসাহ পাইত, ইহারা সেই শ্রেণীর। কিন্তু ভারতে তাহাদের যৌবনোচিত আদর্শবাদ ও গর্বের জন্য তাহারা পায় শৃঙ্খল, নির্জন কারাবাস ও বেত্রদণ্ড!

আমাদের নারীরা কারাগারে যে কঠোর ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহা চিন্তা করিতেও ক্লেশ হয়। ইঁহারা অধিকাংশই মধ্য শ্রেণীর এবং অন্তঃপুরে থাকিতে অভ্যস্ত। পুরুষের সুবিধার জন্য রচিত অনেক সামাজিক প্রথার পীড়ন ও অপমান ইঁহারা সহ্য করিয়া থাকেন। স্বাধীনতার আহ্বান তাঁহাদের নিকট দ্ব্যর্থক,—যে উৎসাহ ও শক্তি লইয়া তাঁহারা আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পশ্চাতে গার্হস্থ্যজীবনের দাসত্ব হইতে মুক্তির একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষাও ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। অল্প কয়েকজন ছাড়া, অধিকাংশকেই সাধারণ কয়েদী শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল এবং অসচ্চরিত্রা সঙ্গিনীদের মধ্যে, অতি ভয়াবহ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাঁহাদিগকে রাখা হইয়াছিল। একবার আমি নারীদের জন্য নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের পার্শ্বের ব্যারাকে ছিলাম; আমাদের মধ্যে একটা প্রাচীরের ব্যবধান ছিল। সেই ব্যারাকে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দিনীর সহিত সাধারণ কয়েদীরাও ছিল। যাঁহার গৃহে আমি একবার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, যিনি আমাকে সবিশেষ আদর যত্ন করিয়াছিলেন, তিনিও ঐ ব্যারাকে ছিলেন। উচ্চ দেওয়ালের ব্যবধান সত্ত্বেও, স্ত্রীলোক কয়েদীদের কুৎসিত ভাষায় ভীতি প্রদর্শন ও ভর্ৎসনাগুলি আমার কাণে আসিত এবং আমাদের বান্ধবীরা কি সহ্য করিতেছেন, তাহা ভাবিতেও আমার হৃদ্‌কম্প হইত।

দুই বৎসর পূর্বে ১৯৩০ সালের সহিত তুলনায় ১৯৩২ এবং ১৯৩৩-এ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহার যে অধিকতর মন্দ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ব্যক্তিবিশেষ কর্মচারীর খেয়াল বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই; অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে এই ধারণায় উপনীত হইতে হয় যে, ইহা গভর্ণমেণ্টের পূর্বসঙ্কল্পিত নীতিরই ফল। রাজনৈতিক বন্দীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই কালে যুক্ত-প্রদেশের জেলকর্মচারীরা যাহা কিছু মনুষ্যোচিত ও মানবতার দ্যোতক, তাহারই উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা ইহার একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্তের অতি নির্দোষ প্রমাণ পাইয়াছি। একজন খ্যাতনামা জেল পরিদর্শক একবার আমাদিগকে জেলে পরিদর্শন করিতে আসেন। ইনি একজন মাননীয় নাইট (স্যার) আমাদের মত বিদ্রোহী বা সিডিসান প্রচারকারী নহেন; ইঁহাকে আনন্দের সহিত গভর্ণমেণ্ট সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি আমাদিগকে বলিলেন যে, কয়েকমাস পূর্বে তিনি অন্য এক জেল পরিদর্শন করিতে গিয়া পরিদর্শন-পুস্তকে মন্তব্য লিখিতে গিয়া জেলরকে "সহৃদয় শৃঙ্খলা-রক্ষাকারী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, ইহাতে উক্ত জেলর তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া বলেন যে, তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণাবলীর

কথা উল্লেখ না করিলেই ভাল হয়, কেন না কর্তৃপক্ষ উহা বড় পছন্দ করেন না। কিন্তু স্যার মহোদয় স্বীকার করিলেন না যে ঐ বর্ণনায় জেলরের কোন ক্ষতি হইতে পারে, তিনি ইচ্ছামত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। ফল হইল, কিছুদিন পরেই উক্ত জেলরকে এক দূরবর্তী দুর্গম স্থানে বদলী করা হইল, যাহা তাঁহার নিকট একপ্রকার শাস্তি।

কয়েকজন জেলর যাঁহাদের ভয়ঙ্কর ও অবিবেচক বলিয়া খ্যাতি আছে, তাঁহাদের পদোন্নতি হইল, খেতাব দেওয়া হইল। অবৈধ উপায়ে চাকুরী লাভের চেষ্টা ও পাওয়া জেলে এত সচরাচর ঘটনা যে, প্রায় কেহই ইহা হইতে মুক্ত নহে। কিন্তু আমার নিজের এবং আমার অনেক বন্ধুবান্ধবের অভিজ্ঞতা এই যে, যে সকল কারাকর্মচারী নিজেদের কঠোর শৃঙ্খলারক্ষাকারী বলিয়া জাহির করিয়া বেড়ায়, এ বিষয়ে তাহারাই অধিক অপরাধী।

সৌভাগ্যক্রমে জেলে এবং জেলের বাহিরে আমাকে যাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই আমার প্রতি সদয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। যাহা হউক একটি ঘটনায় আমি এবং আমার পরিবারবর্গ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম। আমার মাতা, কমলা এবং আমার কন্যা ইন্দিরা, এলাহাবাদ জিলা জেলে আমার ভগ্নীপতি রণজিৎ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের কোন অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও, জেলর তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া বাহির করিয়া দেয়। এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম এবং এ ব্যাপারে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া আরও মর্মাহত হইলাম। জেলকর্মচারিগণ কর্তৃক মাতার পুনরায় অপমান সম্ভাবনা নিবারণকল্পে আমি সমস্ত দেখাশুনা বন্ধ করিবার সংকল্প করিলাম। দেরাদুন জেলে থাকাকালীন প্রায় সাতমাস আমি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করি নাই।

৪৪

জেলে মানব প্রকৃতি

বেরিলী জিলা জেল হইতে আমরা দুইজন—আমি ও গোবিন্দবল্লভ পন্থ—দেরাদুন জেলে বদলী হইলাম। জনতার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য আমাদিগকে বেরিলী ষ্টেশনে গাড়ীতে না তুলিয়া পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হইল। রাত্রে গোপনে আমাদের মোটর গাড়ীতে তোলা হইল, কয়েকমাস আবদ্ধ থাকিবার পর রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাসের মধ্য দিয়া মোটরে ভ্রমণ কত দুর্লভ আনন্দ।

বেরিলী জেল পরিত্যাগের প্রাক্কালে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আমার হৃদয় আলোড়িত করিয়াছিল, স্মৃতিতে তাহা এখনও অম্লান রহিয়াছে। বেরিলীর পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট, একজন ইংরাজ ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি, এমন সময় তিনি একটু সলজ্জভাবে এক তাড়া কাগজ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, ইহাতে কতকগুলি পুরাতন জার্মান সচিত্র পত্রিকা আছে। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, আমি জার্মান ভাষা শিখিতেছি, তাই আমার জন্য তিনি এই পত্রিকাগুলি আনিয়াছেন। তাঁহার সহিত পূর্বে আমার কখনও দেখা হয় নাই, পরেও আর তাঁহাকে দেখি নাই। আমি তাঁহার নাম পর্যন্ত জানি

না। তথাপি দয়ার্দ্র চিন্তা-প্রসূত এই স্বতঃস্ফূর্ত সৌজন্য আমার হৃদয় স্পর্শ করিল এবং কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ হইল।

সেই দীর্ঘ মধ্যরাত্রে গাড়ীতে বসিয়া আমি, ইংরাজ ও ভারতবাসী, শাসক ও শাসিত, সরকারী ও বে-সরকারী, যাঁহারা আদেশ দেন এবং যাহাদের আদেশ পালন করিতে হয়, তাঁহাদের পরস্পরের সম্পর্ক চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই উভয় জাতির মধ্যে কি বিস্তীর্ণ ব্যবধান, পরস্পরের প্রতি কত অবিশ্বাস, কত বিরাগ! কিন্তু অবিশ্বাস ও বিরাগ অপেক্ষাও পারস্পরিক অপরিচয়ের অজ্ঞতাই অধিক প্রবল এবং সেই কারণে পরস্পর মিলিত হইলে উভয় পক্ষই একটু শঙ্কার সহিত সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। একে অপরকে রূক্ষপ্রকৃতি ও বিরসবদন ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করেন। একথা কাহারও মনে আসে না যে এই বাহ্য আচরণের পশ্চাতে বিনয় শালীনতা দয়াও আছে। দেশের শাসক হিসাবে, তাঁহাদের হাতে অনুগ্রহ করিবার অপরিমিত ক্ষমতাও রহিয়াছে; এই কারণে ইংরাজগণের চারপাশে চাকুরী-প্রার্থী ও সুবিধান্বেষীদের কলগুঞ্জন মুখরিত হইতে থাকে এবং এই শ্রেণীর বিরক্তিকর নমুনা দেখিয়া তাঁহারা ভারতকে বিচার করেন। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে ইংরাজ হৃদয়হীন যন্ত্রের মত একজন শাসক, যিনি সর্বদা তাঁহাদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্য উগ্র ও উদ্গ্রীব হইয়া আছেন। একজন শাসক অথবা সৈন্যদলের সৈনিকের আচরণ হইতে স্বকীয় মানসিক আবেগের প্রেরণায় ব্যক্তিগতভাবে আচরণের পার্থক্য কতখানি! সৈনিক তাহার শৃঙ্খলার মধ্যে মানবোচিত গুণ বিসর্জন দিয়া যন্ত্রে পরিণত হয় এবং যাহারা তাহার কোন অনিষ্ট করে নাই, সেই সকল নিরীহ নির্দোষ ব্যক্তিকেও গুলি করিয়া মারে। তাই আমি ভাবিলাম, যে পুলিশ কর্মচারী কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করেন, তিনিই হয়ত পরদিন নির্দোষ ব্যক্তিদের উপর লাঠি চালাইবার হুকুম দিলেন। তিনি নিজেকেও ব্যক্তিবিশেষ মানুষ মনে করিবেন না এবং যাহাদের উপর লাঠিচালনা বা গুলিচালনা করিবেন সেই জনতাকেও মনুষ্যসমষ্টি বলিয়া মনে করিবেন না।

যখন কোন ব্যক্তি অপর পক্ষকে জনতারূপে দেখেন, তখনই মানবীয় যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। জনতা যে নরনারী ও শিশুদের মিলিত মূর্তি, ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইহাদেরও ভালবাসা আছে, ঘৃণা আছে, দুঃখানুভূতি আছে। একজন সাধারণ ইংরাজ যদি সরলভাবে কথা বলেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্র ভারতীয়কে জানেন, কিন্তু তাঁহারা নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র, মোটের উপর ভারতবাসীরা বিরক্তিকর ইতর সাধারণ মাত্র। সেইরূপ সাধারণ একজন ভারতবাসীও স্বীকার করিবেন যে, কতকগুলি ইংরাজ সত্য সত্যই শ্রদ্ধার পাত্র; কিন্তু ঐ কয়-জনকে বাদ দিলে সাধারণ ইংরাজেরা প্রভুত্বগর্বী, নৃশংস এবং অত্যন্ত মন্দপ্রকৃতির। আশ্চর্য এই, কেমন করিয়া মানুষ ভিন্ন-জাতির ব্যক্তিকে বিচার করে। তাহারা যাহাদের সংস্পর্শে আসে সেই সকল ব্যক্তি-বিশেষকে বাদ দিয়া যাহাদের সম্বন্ধে সে অল্প জানে অথবা একেবারেই জানে না, তাহাদের লইয়াই জাতির দোষগুণ সম্পর্কে ধারণা করিয়া ফেলে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এ বিষয়ে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আমি সর্বত্রই আমার স্বদেশবাসী এবং ইংরাজ, উভয়ের নিকটই ভদ্র ব্যবহার পাইয়াছি। যে সকল পুলিশ কর্মচারী আমাকে বন্দীরূপে পাহারা দিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এবং জেলের কর্মচারীরা সর্বদাই আমার সহিত সদয় ব্যবহার

করিয়াছেন। এই মানবোচিত ব্যবহারে, কারাজীবনের তিক্ততা, সংঘাত এবং দুঃখের দংশন বহুলাংশে হ্রাস হইয়াছে। আমার স্বদেশবাসীরা যে আমার সহিত সদয় ব্যবহার করেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই, কেন না আমি তাঁহাদের নিকট কতকাংশে সুখ্যাতি বা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। এমন কি, ইংরাজরাও আমাকে ইতর সাধারণ হইতে পৃথক ব্যক্তি বিবেচনা করেন, আমার মতে, ইহার কারণ আমি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছি, বিশেষতঃ আমি ইংলণ্ডের স্কুলের ছাত্র ছিলাম। এই কারণে তাঁহারা আমার সহিত নৈকট্য অনুভব করেন এবং আমি অল্পবিস্তর যে তাঁহাদের ছাঁচে ঢালাই সভ্য, আমার রাজনৈতিক কার্যপ্রণালী যতই মন্দ হউক না কেন, ইহা না ভাবিয়া তাঁহারা পারেন না। আমার অন্যান্য সঙ্গীদের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া সময় সময় আমি বিশেষ সদ্ব্যবহারের জন্য বিব্রত ও লজ্জিত হইয়াছি।

এই সকল সদ্ব্যবহার ও সুবিবেচনা সত্ত্বেও জেল জেলই; তাহার নিরানন্দ আবহাওয়া এমনভাবে বুকে চাপিয়া বসে যে, সময় সময় অসহ্য বোধ হয়। ইহার বাতাস, হিংসা, নীচতা, অবৈধ উৎকোচ, অসত্য, হীন তোষামোদ ও নিন্দিত শপথবাক্যে ভরা। যাহার আত্মমর্যাদাজ্ঞান তীব্র, সে সর্বদাই উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। অতি সামান্য ঘটনাতেই যে কেহ বিচলিত হয়। পত্রে কোন দুঃসংবাদ অথবা সংবাদপত্রে কোন লেখা, কিছুকালের জন্য উৎকণ্ঠার চিত্ত ব্যথিত করিয়া তোলে। বাহিরে জীবন ও কর্মধারার বৈচিত্র্য এবং স্বচ্ছন্দগতি, দেহ ও মনের সামঞ্জস্য ও ভারকেন্দ্র ঠিক রাখে। জেলে বহিঃপ্রকাশের পথ বন্ধ, মনের কামনা মনেই চাপিয়া রাখিতে হয়, তাহার ফলে মানুষের মন ঘটনা সম্পর্কে একদেশদর্শী হয় ও তাহা বিকৃত করিয়া দেখে। জেলে পীড়া হইলে তাহা বিশেষভাবে বিড়ম্বনাজনক।

তথাপি আমি জেলের নিয়মে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম এবং শারীরিক পরিশ্রম এবং অনেকাংশে কিছু কঠিন মানসিক শ্রম করিয়া শরীর ও মেজাজ ঠিক রাখিতাম। ব্যায়াম ও পরিশ্রমের বাহিরে যে প্রয়োজনই থাকুক না কেন জেলে তাহা অত্যাবশ্যক; নতুবা ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা পদে পদে। আমি প্রত্যেক কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম এবং সেই নিয়মে চলিতে চেষ্টা করিতাম। যথাসম্ভব সাধারণ অভ্যাসগুলি রক্ষা করিতাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ দৈনিক ক্ষৌর-কার্যের কথা উল্লেখ করিতে পারি (আমাকে সেফ্‌টি রেজর দেওয়া হইয়াছিল)। এই সামান্য ব্যাপারটা উল্লেখ করিবার কারণ, অনেকেই ইহা একেবারেই পরিত্যাগ করেন এবং অন্যান্য ব্যাপারেও শিথিল হইয়া উঠেন। সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম এবং অতি আরামে নিদ্রা হইত।

এইভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হইত। কখনও বা মাস শেষ হইতে চাহিত না, মনে হইত, সময়ের গতি নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সময় সময় আমার চিত্ত বিরক্তিবিকৃত হইয়া উঠিত, সকলের উপর, সব কিছুর উপর রাগ হইত—জেলে আমার সঙ্গিগণ, জেলের কর্মচারিগণ, কোন কিছু কাজ করার বা না করার দরুণ বাহিরের লোকদের উপর, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর (কিন্তু ইহা স্থায়ী নয়), সর্বোপরি নিজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতাম। আমার স্নায়ুপুঞ্জ এমন হইয়া উঠিত যে, কারাজীবনের সর্ববিধ জোয়ারই আমাকে পাইয়া বসিত। সৌভাগ্যক্রমে এই শ্রেণীর মানসিক অবস্থা হইতে অল্পেই নিষ্কৃতি পাইতাম।

বাহিরের আত্মীয়বর্গের সহিত সাক্ষাতের দিন জেলে এক স্মরণীয় দিন।

সেই দিনটি লোকে কামনা করে, তাহার জন্য অপেক্ষা করে, প্রত্যহ দিবস গণনা করে। দেখা সাক্ষাতের উত্তেজনার অবসানে প্রতিক্রিয়ামুখে নিঃসঙ্গ শূন্যতা অনুভূত হয়। যদি কখনও দেখা সাক্ষাতের সার্থকতা লাভ করিতে না পারিতাম —কোন দুঃসংবাদ বা অন্য কোন কারণে—তাহা হইলে পরে বড় আর্ত হইয়া পড়িতাম। দেখা সাক্ষাতের সময় অবশ্যই জেলের কর্মচারীরা উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু বেরিলীতে দুই তিন বার একজন গোয়েন্দা বিভাগের লোক কাগজ পেন্সিল লইয়া উপস্থিত থাকিত এবং আমাদের কথাবার্তা ব্যগ্রভাবে লিখিয়া লইত। আমার নিকট ইহা অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হইত এবং এই সকল সাক্ষাতের কোন সার্থকতাই হইত না।

তাহার পর এলাহাবাদ জেলে দেখা সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে আমার মাতা ও পত্নী জেলে এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট যে ব্যবহার পাইলেন, তাহাতে এই দুর্লভ দেখা সাক্ষাৎও আমাকে বন্ধ করিতে হইল। প্রায় সাত মাস আমি কাহারও সহিত দেখা করি নাই। এই দিনগুলি কি নিরানন্দেই না কাটিয়াছে। যখন আমি পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য সম্মত হইলাম এবং আমার আত্মীয়গণ আমাকে দেখিতে আসিলেন, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম। আমার ভগ্নীর ছেলে মেয়েরাও আসিয়াছিল। তাহার ছোট মেয়েটি পূর্বের অভ্যাস মত যখন আমার কাঁধে উঠিতে চাহিল, তখন ভাবাবেগ দমন করা আমার পক্ষে কঠিন হইল। দীর্ঘকাল সঙ্গ লাভের জন্য লালায়িত থাকিয়া পারিবারিক জীবনের এই মধুর স্পর্শে আমি বিহ্বল হইয়া গেলাম।

দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইবার পর, পনর দিন পরে বাহির হইতে এবং অন্য জেল হইতে (আমার দুই ভগ্নীই তখন জেলে) যে পত্রগুলি আসিত, তাহার জন্য আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করিতাম। নির্দিষ্ট দিনে পত্র না আসিলে আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িতাম। আবার পত্র পাইলেও খুলিতে ইতস্ততঃ করিতাম। মানুষ যেমন আনন্দদায়ক বস্তু লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে, আমিও চিঠি লইয়া নাড়াচাড়া করিতাম, মনে আশঙ্কাও হইত, হয় তো বা চিঠির মধ্যে এমন সংবাদ বা ইঙ্গিত আছে, যাহাতে আমি বিরক্ত হইব। জেলের শান্তিপূর্ণ ও নিস্তরঙ্গ জীবনে চিঠি লেখা ও পাওয়া দুই-ই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ হইয়া উঠে। ইহাতে এমন একটা ভাবাবেগ উপস্থিত হয়, যাহার ফলে দু'এক দিন মন উন্মনা হইয়া থাকে এবং দৈনন্দিন কাজে মন বসান কঠিন হয়।

নৈনী ও বেরিলী জেলে আমার অনেক সাথী ছিল। দেরাদুন জেলে প্রথমে আমরা তিনজন—গোবিন্দবল্লভ পন্থ, কাশীপুরের কুনোয়ার আনন্দ সিং এবং আমি,—কিন্তু দুই মাস পরে ছয় মাস কারাদণ্ড শেষ হওয়ার পন্থজী মুক্তি পাইলেন। পরে আর দুইজন আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। ১৯৩৩-এর জানুয়ারীর প্রথম ভাগে আমার সঙ্গীরা সকলেই চলিয়া গেলেন, আমি একা রহিলাম। আগস্ট মাসের শেষে আমার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রায় আট মাস কাল আমি দেরাদুন জেলে প্রায় নির্জনে কাটাইয়াছি; কয়েক মিনিটের জন্য কোন কারাকর্মচারী ব্যতীত কথা বলিবার সুযোগ কদাচিৎ মিলিত। ঠিক আইনতঃ ইহা নির্জন কারাবাস নহে, অথচ প্রায় তাহাই, এবং আমার পক্ষে এই সময়টা অত্যন্ত নিরানন্দে কাটিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি দেখা সাক্ষাৎ আরম্ভ করিয়াছিলাম বলিয়া একটু শান্তি পাইতাম। আমি মনে করি, বিশেষ অনুগ্রহ-স্বরূপে আমাকে প্রত্যহ বাহির হইতে সদ্য ফোটা ফুল পাইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং কয়েকখানি ফটোগ্রাফও কাছে রাখিতে দেওয়া হইত। ইহাতে

আমি অনেক আনন্দলাভ করিতাম। সাধারণতঃ ফুল কি ফটোগ্রাফ্ রাখিতে দেওয়া হয় না। কয়েকবার বাহির হইতে প্রদত্ত ফুল আমাকে দেওয়া হয় নাই। আমার সেলের জিনিসপত্র সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে উৎসাহ দেওয়া হয় না। আমার মনে আছে, আমার পাশের সেলে আমার একজন সঙ্গী তাঁহার প্রসাধন দ্রব্যগুলি বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, তিনি যেন সেলটি চিত্তাকর্ষক বিলাস-গৃহ না করিয়া তোলেন। বিলাস দ্রব্যগুলির তালিকা এই—একটি দাঁত মাজিবার ব্রাস, টুথপেস্ট, ফাউন্টেনপেনের কালি, এক বোতল মাথার তেল, চিরুণী, ব্রাস, সম্ভবতঃ আর দুই একটি ছোটখাট জিনিস।

জেলে মানুষ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুও কত মূল্যবান তাহা অনুভব করে। জেলে লোকের নিজস্ব বস্তু সংখ্যা একেই অতি কম, তাহার উপর ইচ্ছামত সেগুলি অদল বদল করা যায় না ; কাজেই সকলে যত্ন সহকারে এত সামান্য জিনিসও সযত্নে কুড়াইয়া রাখে, যাহা বাহিরে লোকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দেয়। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা এত প্রবল যে, কিছু না থাকিলেও উহা বিনষ্ট হয় না।

সময় সময় জীবনের আরামগুলির জন্য দৈহিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়—শরীরের আরাম-আয়েস, মনোরম নিরালা, বন্ধু সমাগম, প্রাণবন্ত আলাপ আলোচনা, শিশুদের সহিত ক্রীড়া···সংবাদপত্রের কোন ছবি বা মন্তব্য, প্রাচীন-দিনের স্মৃতি জাগাইয়া তোলে, যৌবনের চিন্তাহীন দিনগুলি মনে পড়ে, গৃহে ফিরিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠে, সমস্ত দিন অতি অশান্তিতে অতিবাহিত হয়।

আমি প্রত্যহ কিছু সূতা কাটিতাম। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের পর ইহাতে আরাম, অবকাশ ও তৃপ্তি পাইতাম। অবশ্য আমি প্রধানতঃ লেখা পড়া লইয়াই থাকিতাম। অবশ্য চাহিবামাত্র সব বই যে পাইতাম তাহা নহে, বাধা নিষেধ ছিল এবং বইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেওয়া হইত। যাহার উপর পরীক্ষার ভার ছিল, তিনি সে কাজের খুব যোগ্য ছিলেন না। স্পেণ্গলারের "পাশ্চাত্যের প্রভাব হ্রাস" নামক বইখানি আটক করা হইল, কেন না নামটা বিপজ্জনক ও সিদিসানীয় ধরণের। কিন্তু আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই, কেন না মোটের উপর আমি অনেক প্রকার ভাল বই রাখিতে পারিতাম। এ ক্ষেত্রেও আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইত। কেন না আমার অনেক সঙ্গী ('এ' শ্রেণীর বন্দী) সমসাময়িক ব্যাপার লইয়া লিখিত পুস্তকাদি পাইতে অনেক দুর্ভোগ ভুগিতেন। আমি শুনিয়াছি, বারাণসী জেলে, রাজনৈতিক কথা আছে, এই অজুহাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত "হোয়াইট পেপার" পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। কেবল ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক ও উপাখ্যান ব্রিটিশ শাসকগণ অতি সন্তোষের সহিত দিবার অনুমতি দেন। ধর্মের প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এত প্রগাঢ় অনুরাগ যে, তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে সকল প্রকার ধর্মকেই সমান উৎসাহ দিয়া থাকেন।

যখন ভারতে সর্ববিধ সাধারণ ব্যক্তিস্বাধীনতাও সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, তখন কয়েদীদের অধিকারের আলোচনা খুব বেশী প্রাসঙ্গিক নহে। তবুও কিছুটার মূল্য আছে। যখন কোন আদালত কাহাকেও কারাদণ্ড দেন, তাহার অর্থ কি এই যে, তাহার দেহের সহিত মনকেও বন্দী করিতে হইবে? তাহার দেহ বন্দী হইলেও মন স্বাধীনতা পাইবে না কেন? ভারতে যাঁহাদের হাতে কারাগার

পরিচালনের ভার রহিয়াছে, তাঁহারা এই শ্রেণীর প্রশ্নে নিশ্চয়ই ভয় পাইবেন; কেন না তাঁহাদের ন়ূতন আদর্শ ও ভাব গ্রহণ করা অথবা ধীর ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবন্ধ। 'সেন্সর' করা সব সময়েই মন্দ এবং ইহা একদেশদর্শিতা ও নির্ব়ুন্ধিতা। ভারতে এই কারণে আমরা অনেক আধ়ুনিক প়ুস্তক, প্রগতি-ম়ূলক সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র পাই না। নিষিন্ধ ও বাজেয়াপ্ত প়ুস্তকের তালিকা অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছে এবং উহার সহিত নিত্য ন়ূতন নাম যোগ হইতেছে। তাহার উপর জেলে স্বতন্ত্র ও দ্বিতীয়বার 'সেন্সরের' ব্যবস্থা থাকার দর়ুণ, যে সকল প়ুস্তক অথবা সাময়িক পত্রিকা বৈধভাবেই বাহিরে কিনিয়া পড়া যায়, জেলে তাহা পাওয়ার উপায় নাই।

কতকগ়ুলি কম্য়ুনিষ্ট সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়ার কিছ়ুদিন প়ূর্বে নিউইয়র্কের বিখ্যাত সিং সিং জেলে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আমেরিকার শাসক সম্প্রদায়ের মনে কম্য়ুনিষ্ট বির়ুন্ধতা অত্যন্ত প্রবল, তৎসত্ত্বেও জেল কর্তৃপক্ষ সিন্ধান্ত করিলেন, কয়েদীরা ইচ্ছা করিলে কম্য়ুনিষ্ট সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি সহ যে কোন ম়ুদ্রিত প়ুস্তিকাদি পাইতে পারিবে। জেলের ওয়ার্ডেন (কারাধ্যক্ষ) অত্যধিক উত্তেজনাপ্রদ বলিয়া ব্যঙ্গচিত্র নিষিন্ধ করিয়াছিলেন।

এ দেশের কারাগারে মনের স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করা অনেকাংশে নিষ্ফল, কেন না, কার্যতঃ অধিকাংশ কয়েদীকেই কোন সংবাদপত্র বা লিখিবার সরঞ্জামাদি দেওয়া হয় না। ইহা একেবারেই নিষিন্ধ, এখানে 'সেন্সরের' প্রশ্নই উঠে না। কেবলমাত্র 'এ' শ্রেণীর (বাঙ্গলায় প্রথম ডিভিসন) কয়েদীদিগকে লিখিবার সরঞ্জামাদি দেওয়া হয়, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই দৈনিক সংবাদপত্র দেওয়া হয় না। গভর্ণমেন্টের অন়ুমোদিত দৈনিক সংবাদপত্র দেওয়া চলিতে পারে। 'বি' বা 'সি' শ্রেণীর, রাজনৈতিক কি অরাজনৈতিক কোন কয়েদীই লিখিবার সরঞ্জাম পাইতে পারে, ইহা বিবেচনা করা হয় না। প্রথমোক্ত শ্রেণীর বন্দীরা বিশেষ স়ুবিধা হিসাবে উহা পাইতে পারে, তবে প্রায়ই তাহাদিগকে সে স়ুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয়, 'এ' শ্রেণীর কয়েদীদের সংখ্যা প্রতি হাজারে একজন হইবে কি না সন্দেহ, অতএব কয়েদীদের অবস্থা বিবেচনাকালে তাহারা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে অন্যান্য সভ্যদেশের সাধারণ কয়েদীরা প়ুস্তক ও সংবাদপত্র সম্পর্কে যে স়ুবিধা পায়, এখানে বিশেষ স়ুবিধাপ্রাপ্ত 'এ' শ্রেণীর কয়েদীরাও তাহা পায় না।

হাজার করা অবশিষ্ট ৯৯৯ জন একসঙ্গে দ়ুই তিনখানা বই পাইতে পারে, কিন্তু তাহার সর্ত এত কঠিন যে এই স়ুবিধা তাহারা প্রায়শঃই গ্রহণ করিতে পারে না। লেখা অথবা বই হইতে কোন কিছ়ু টুকিয়া লওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক বিলাসিতা, কেহ যেন উহা না করে। মানসিক বিকাশ সম্পর্কে এই ইচ্ছাকৃত নির়ুৎসাহ করিবার ব্যবস্থা অতি আশ্চর্য এবং স়ুস্পষ্ট। কয়েদীকে সংস্কার করিয়া তাহাকে সাধ়ুজীবন যাপন করাইবার উদ্দেশ্যের দিক হইতে দেখিলে, প্রথমেই তাহার মনের গতি পরিবর্তনের ব্যবস্থা আবশ্যক এবং তাহাকে লেখাপড়া শিখান ও কোন বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু ভারতের জেল কর্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ এই দিক দিয়া চিন্তা করে না। য়ুক্ত-প্রদেশে তো এর়ূপ কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়। সম্প্রতি জেলখানায়, বালক ও য়ুবকদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার পন্থতি প্রবর্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অযোগ্য লোকের হাতে ইহার ভার দেওয়ার ফলে, মোটেই কার্যকরী হয় নাই। কখনও এর়ূপ কথাও বলা হয় যে কয়েদীরা লেখাপড়া শিখিতে চাহে না। কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা ইহার সম্প়ূর্ণ

বিপরীত, আমি এমন অনেককে দেখিয়াছি, যাহারা আমার নিকট আসিয়া লেখাপড়া শিখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত। আমাদের সংস্পর্শে যে সকল কয়েদী আসিত, আমরা তাহাদের পড়াইতাম এবং তাহারা শিখিবার জন্য রীতিমত পরিশ্রম করিত। অনেক সময় হয় তো মধ্যরাত্রে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আমি আশ্চর্য হইয়া দেখিয়াছি, তাহারা দু'একজন তখনও তাহাদের ব্যারাকে মৃদুভাতি লণ্ঠনের সম্মুখে বসিয়া পরদিনের পাঠ অভ্যাস করিতেছে।

আমি নানাশ্রেণীর বই পড়িয়া জেলে সময় কাটাইতাম, সাধারণতঃ আমি "গুরুপাক" পুস্তকই পড়িতাম, হাল্কা উপন্যাস পড়িলে মন শিথিল হইয়া যায় বলিয়া আমি বেশী উপন্যাস পড়িতাম না। সময় সময় অতিরিক্ত পাঠ জনিত ক্লান্তি আসিত, তখন কেবল লেখা লইয়া থাকিতাম। আমার কন্যার নিকট লিখিত ঐতিহাসিক পত্রগুলি আমি কারাগারে দুই বৎসর ধরিয়া লিখিয়াছি; এবং উহা আমার মানসিক স্থৈর্য রক্ষার্থে সহায়তা করিয়াছে। লিখিবার সময় আমি অতীত ইতিহাসের মধ্যে ডুবিয়া কারাগারের কথা বিস্মৃত হইতাম।

ভ্রমণ-কাহিনী পড়িতে আমার ভাল লাগিত; হিউয়েন সাং, মার্কোপোলো, ইবন বাটুটা এবং অন্যান্য পুরাতন ভ্রমণ-কাহিনী--আধুনিক কালের সেভেন হেডিনের মধ্য এশিয়ার মরুভূমির মধ্য দিয়া ভ্রমণের বিবরণ, রোরিখের তিব্বত ভ্রমণের অত্যাশ্চর্য কাহিনী পাঠ করিয়াছি। ছবির বইও ভাল লাগিত, গিরি-শৃঙ্গ, চিরতুষারমণ্ডিত পর্বত, মরুভূমি--কারাগারে মরুভূমি ও সমুদ্রের অসীম বিস্তারের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। আমার নিকট মণ্টব্ল্যাঙ্ক, আল্পস্ ও হিমালয়ের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ছবির বই ছিল। যখন আমার সেল ও ব্যারাকের উত্তাপ ১১৫ ডিগ্রীরও উপরে, তখন ছবির বই-এর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আমি তুষার-পর্বতের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। ভূমণ্ডলের মানচিত্র দেখিতেও বড় আনন্দ হইত। যে সমস্ত স্থান দেখিয়াছি, তাহার পূর্বস্মৃতি ও স্বপ্নগুলি মনে ভাসিয়া উঠে, আবার যে স্থানগুলি দেখিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও দেখিতে পারি নাই, তাহার কথাও মনে হয়। পুরাতন দিনের স্মৃতি ভাসিয়া উঠে—ক্ষুদ্র বিন্দুর মধ্যে মহানগরী, কৃষ্ণ রেখার পর্বত, নীলবর্ণে রঞ্জিত সমুদ্র—এই সৌন্দর্যময়ী ধরিত্রীর কত আকর্ষণ, যেখানে সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়া মনুষ্য পরিবর্তিত হইতেছে, সেই কঠিন কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইবার আকাঙ্ক্ষা যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরে। বিষণ্ণ চিত্তে তাড়াতাড়ি ভূচিত্রাবলী বন্ধ করিয়া অতি পরিচিত কারাপ্রাচীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করি; কারাগারের দৈনন্দিন নীরস কর্তব্যের কথা মনে পড়িয়া যায়।

৪৫

কারাগারে জীবজন্তু

দেরাদুন জেলের ক্ষুদ্র সেল বা কক্ষে আমি চৌদ্দ মাস পনর দিন অতিবাহিত করিয়াছি। আমি উহার এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইয়াছিলাম। ইহার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অংশও আমার কত পরিচিত, চুনকাম করা দেওয়াল, অসমান মেজে ও ছাদের প্রত্যেকটি দাগ ও খাঁজ, ঘুণে-ধরা উইএ-খাওয়া কড়ি বর্গা—সব খুঁটিনাটি মনে আছে। বাহিরের উঠানে কয়েক গোছা ঘাস ও কয়েকখণ্ড পাথর আমার পুরাতন বন্ধু ছিল। আমার সেলে আমি একা থাকিতাম না, বোলতা

ও ভীমরুলেরা কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং টিকটিকিরা দিনের বেলায় বরগার অন্তরালে থাকিত এবং রাত্রে শিকারের আশায় বাহির হইয়া আসিত। যদি বাহ্য বস্তুর উপর চিন্তা ও ভাবাবেগ রেখাপাত করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সেলের বায়ুমণ্ডলে তাহা এখনও থম থম করিতেছে এবং সেই স্থানের প্রত্যেক বস্তুর সহিত তাহা জড়াইয়া আছে।

অন্যান্য জেলে আমি দেরাদুন অপেক্ষা অনেক ভাল সেলে থাকিয়াছি; কিন্তু এখানে একটি বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলাম। জেলটি অত্যন্ত ছোট বলিয়া প্রাচীরের বাহিরে অথচ জেলের হাতার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হাজতে আমাদের রাখা হইয়াছিল। স্থান এত অপরিসর যে হাঁটিয়া বেড়াইবার উপায় ছিল না। সেইজন্য সকালে ও বিকালে জেলের দরজা পর্যন্ত আমাদের হাঁটিয়া বেড়াইতে দেওয়া হইত—ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় একশত গজ হইবে। জেলের হাতার মধ্যে থাকিলেও প্রাচীরের বাহিরে আসার দরুণ, আমরা পর্বত, শস্যক্ষেত্র এবং রাজপথের কিয়দংশ দেখিতে পাইতাম। এই সুবিধা কেবল আমাকেই দেওয়া হয় নাই, দেরাদুনে 'এ' ও 'বি' শ্রেণীর প্রত্যেক কয়েদীই এই সুবিধা পাইতেন। প্রাচীরের বাহিরে জেল হাতার মধ্যে আর একটা ছোট বাড়ী ছিল তাহাকে ইয়োরোপীয়ান হাজত বলা হইত। ইহার চারিদিকে কোন দেওয়াল ছিল না বলিয়া সেলে বসিয়াই মনোহর পর্বত ও বাহিরের লোকচলাচল দেখা যাইত; এই হাজতের ইয়োরোপীয়ান ও অন্যান্য কয়েদীদেরও জেলের দরজা পর্যন্ত সকালে বিকালে বেড়াইতে দেওয়া হইত।

যে বন্দী দীর্ঘকাল উচ্চপ্রাচীরের অন্তরালে বাস করিয়াছে, এই বাহিরে ভ্রমণ ও নৈসর্গিক দৃশ্য দেখার মানসিক সন্তোষ যে কতখানি সে-ই অনুভব করিতে পারে। বাহিরে বেড়ান আমার ভাল লাগিত। বর্ষাকালে যখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইত, তখনও আমি এই অধিকার ত্যাগ করি নাই। জলে পা ডুবিয়া গেলেও আমি তাহার মধ্যেই হাঁটিতাম। অন্যত্র হইলেও এই বাহিরে ভ্রমণ আমার ভালই লাগিত। কিন্তু এখানে অদূরবর্তী হিমালয়ের সুউচ্চ গিরিমালার মনোহর শ্রী দেখিবার আনন্দ, কারাজীবনের অনেক ক্লান্তি দূর করিয়া দেয়। যখন দীর্ঘকাল দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল এবং কয়েক মাস আমি একাকী ছিলাম, তখন আমার চিরপ্রিয় হিমালয়ের দিকে চাহিয়া সময় কাটাইবার সৌভাগ্য অল্প নহে। সেল হইতে আমি পর্বত দেখিতে পাইতাম না, কিন্তু আমার মনে তাহা স্পষ্টরূপে জাগিয়া উঠিত; হিমালয়ের সহিত এই নৈকট্যবোধ আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিত।

"ঊর্ধ্বে আকাশে পাখীরা দল বাঁধিয়া উড়িয়া গেল; একখণ্ড নিঃসঙ্গ মেঘও ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেল। আমি অদূরবর্তী চিং-টিং পর্বতস্তূপের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। আমি ও পর্বত, পরস্পরের প্রতি চাহিয়া আমাদের কখনও ক্লান্তি আসে না।"

আমার আশঙ্কা হয়, কবি লি তাই পোর সহিত সমস্বরে আমি বলিতে পারি না যে, এমন কি পর্বত দেখিয়াও আমার ক্লান্তি আসে না। তবে সে ক্ষণিকের; সাধারণতঃ পর্বতের সান্নিধ্যে আমি শান্তি পাইতাম, ইহা চিরস্থির, মহামৌন মহিমায় লক্ষ বর্ষের জ্ঞান-গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত, আমার চিত্তচাঞ্চল্য ও চপলতাকে ব্যঙ্গ করিত, আমার উত্তেজনাক্ষুব্ধ মনে অপূর্ব প্রশান্তি আনিয়া দিত।

দেরাদুনে বসন্তকাল মনোহর, নিম্নের সমতল অপেক্ষা এখানে বসন্ত দীর্ঘ-স্থায়ী। শীতকালে সমস্ত বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া যায়, তাহাদের কঙ্কালসার মূর্তি

বাহির হইয়া পড়ে। এমন কি, আমি আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, জেলের দরজায় দণ্ডায়মান চারটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছও নিষ্পত্র হইয়া গিয়াছে। তারপর বসন্ত আসিয়া তাহাদের কঙ্কালসার নিরানন্দ দেহে নবজীবনের চেতনায় প্রত্যেক শিরা উপশিরা চঞ্চল করিয়া তুলিল। সহসা অশ্বত্থ এবং অন্যান্য বৃক্ষে যেন এক সাড়া পড়িয়া গেল, যেন যবনিকার অন্তরালে এক গোপন আয়োজনের রহস্যের ইঙ্গিত আসিতেছে। তাঁহাদের অঙ্গে অঙ্গে কচি ক্ষুদ্র সবুজ পল্লবের ঈষৎ বিকাশ, আমি চমকিত হইয়া আবিষ্কার করি। ইহা দেখিয়া কত আনন্দ, কত সন্তোষ! দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ নবপত্রে দেহ ভূষিত হইল, সূর্যালোকে উজ্জ্বল হইয়া তাহারা বাতাসের সহিত ক্রীড়ারত হইল। পল্লবের অঙ্কুর হইতে সহসা পত্ররূপে এই দ্রুত পরিবর্তন কি মনোহর!

আমি ইতিপূর্বে কখনও লক্ষ্য করি নাই যে, আম্রের নবপল্লব ঈষল্লোহিত কপিশবর্ণ—কাশ্মীরের পর্বতে শরৎকালে যে বর্ণের বিভা ফুটিয়া উঠে তাহার সহিত কি আশ্চর্য সাদৃশ্য। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ইহা সবুজ হইয়া যায়।

বর্ষার জন্য প্রত্যাশা স্বাভাবিক, কেন না, বর্ষাগমের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীষ্মতাপ শীতল হইয়া আসে। কিন্তু ভাল জিনিসেরও অতিপ্রাচুর্য মানুষ সহিতে পারে না, দেরাদুনের উপর জলদেবতার কৃপা অত্যন্ত অধিক। বর্ষারম্ভের পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যেই ৫০।৬০ ইঞ্চি বারিপাত হয়। ক্ষুদ্র সেলের মধ্যে বন্দী হইয়া বসিয়া থাকা, অথবা ছাদ দিয়া জলপড়া ও জানালা দিয়া ঝাপটার হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য চেষ্টা করা খুব মধুর নহে।

শরৎকালও মনোহর, বৃষ্টির দিন ছাড়া শীতকালে যখন বজ্রের গর্জনে বৃষ্টি নামিয়া আসে, হাড়-কাঁপানো শীতল বাতাস বহিতে থাকে, তখন মনের মধ্যে সুদূরের লোকালয়ে একটু উষ্ণ গৃহকোণে আরামের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে। সময় সময় শিলাবৃষ্টি হয়, মার্বেল অপেক্ষাও বড় বড় শিল টিনের ছাদের উপর পড়িয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকে, মনে হয়, গোলন্দাজেরা অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করিতেছে।

একটি দিনের কথা আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে। ১৯৩২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর। সমস্ত দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও ঝটিকার গর্জন এবং অসহ্য শীত; শরীরের দিক হইতে জেলে ইহাই আমার সকলের চেয়ে দুঃখের দিন। কিন্তু সন্ধ্যাকালে সহসা আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। যখন দেখিলাম অদূরবর্তী পর্বতমালা শুভ্রতুষারমণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে তখন আমার সমস্ত দুঃখ নিমেষে দূর হইয়া গেল। পর দিন—বড়দিন, আকাশ উজ্জ্বল, চারিদিক মনোরম, অদূরে তুহিনাবৃত পর্বতমালার কি মনোহর শোভা!

সাধারণ কাজকর্ম ছিল না বলিয়া আমরা প্রকৃতির পর্যবেক্ষক হইয়া উঠিলাম। বিবিধ জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ যাহা চোখে পড়িত তাহাই আমরা অনুসন্ধিৎসার সহিত লক্ষ্য করিতাম। আমার অনুসন্ধিৎসা যতই বাড়িতে লাগিল ততই লক্ষ্য করিলাম যে, আমার সেলে এবং ছোট্ট উঠানে কত বিবিধ শ্রেণীর কীট-পতঙ্গ বাস করিতেছে। আমি অনুভব করিলাম, যাহা পূর্বে আমার নিকট প্রাণহীন শূন্যময় বলিয়া বোধ হইত, তাহাই জীবনের প্রাচুর্যে ভরপুর। কেহ বুকে হাঁটে, কেহ ধীরে ধীরে চলে, কেহ বা উড়িয়া বেড়ায়। ইহারা আমার কোন বাধা উৎপাদন না করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, আমিও ইহাদের বিঘ্ন উৎপাদন করিবার কারণ খুঁজিয়া পাইতাম না। কিন্তু ছারপোকা ও মশা এবং কতকগুলিকালে মাছির সহিত আমাকে অবিরত যুদ্ধ করিতে হইত। বোলতা ও

ভীমরুলগুলি আমি সহ্য করিতাম, আমার সেলের মধ্যে তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে বাস করিত। কিন্তু একদিন আমি একটু কুপিত হইয়াছিলাম, একটা বোল্‌তা সম্ভবতঃ অন্যমনস্কভাবে আমাকে দংশন করিয়াছিল। আমি রাগিয়া গিয়া তাহাদিগকে ঝাড়ে বংশে উচ্ছেদ করিবার জন্য চেষ্টা করিলাম। তাহারাও তাহাদের অস্থায়ী চাকগুলি রক্ষা করিবার জন্য সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। হয়ত ঐ গুলির মধ্যে তাহাদের ডিম ছিল; কাজেই আমি যুদ্ধে বিরত হইলাম এবং স্থির করিলাম যে তাহারা যদি আমার বিঘ্নোৎপাদন না করে তাহা হইলে আমিও তাহাদের শান্তিতে থাকিতে দিব। এই ঘটনার পর এক বৎসর কাল আমি বোলতা ও ভীমরুল বেষ্টিত হইয়া সেলে বাস করিয়াছি। তাহারা কখনও আমাকে আক্রমণ করে নাই এবং আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিতাম।

চামচিকা আমি পছন্দ করিতাম না কিন্তু আমাকে তাহাদের সহ্য করিতে হইত। সন্ধ্যাকাশে তাহারা নিঃশব্দে উড়িত এবং প্রায়ান্ধকার আকাশে তাহাদের ছায়ার মত দেখা যাইত। কি ভীতি-উদ্দীপক প্রাণী, দেখিলে আমার গা ছম্‌ ছম্‌ করে। মনে হয় যেন উহারা আমার মুখ ছুঁইয়া উড়িয়া গেল, আঘাত করিবে, ভয়ে আমি শিহরিয়া উঠি। বহুদূর ঊর্ধ্বে বড় বড় বাদুড় উড়িয়া যাইত।

আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া পিপীলিকা ও উই পোকা লক্ষ্য করিতাম। সন্ধ্যাবেলা যখন টিকটিকিগুলি বাহির হইয়া লাফাইয়া শিকার ধরিত এবং হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গীতে লেজ নাড়িয়া পরস্পরকে তাড়া করিত, তাহাও চাহিয়া দেখিতাম। সাধারণতঃ তাহারা বোলতার কাছে ঘেঁসিত না কিন্তু আমি দুইবার টিকটিকিকে অতি সাবধানতার সহিত সম্মুখ দিক হইতে বোলতাকে ধরিতে দেখিয়াছি। আমি জানি যে তাহারা ইচ্ছা করিয়া বা ঘটনাচক্রে হুলের দিকটা এড়াইয়া বোল্‌তা ধরে।

ইহা ছাড়া নিকটবর্তী বৃক্ষে বহু কাঠবিড়ালী বাস করিত। এগুলি বেশ সাহসী এবং আমাদের অতি নিকটে আসিত। লক্ষ্ণৌ জেলে যখন আমি নিঃশব্দে বসিয়া পড়াশুনা করিতাম তখন একটা কাঠবিড়ালী আমার পা বাহিয়া জানুর উপর বসিয়া চারিদিকে তাকাইত এবং যখন সে চোখের দিকে চাহিত তখনই বুঝিতে পারিত যে আমি বৃক্ষ কিংবা তাহার ধারণানুযায়ী কোন বস্তু নই। ভয়ে সে মুহূর্তের জন্য আড়ষ্ট হইয়া যাইত, কিন্তু পরক্ষণেই লাফাইয়া পলাইত। কাঠবিড়ালীর ছোট ছোট বাচ্চাগুলি কখনও গাছ হইতে পড়িয়া যাইত, তাহাদের মা দৌড়িয়া আসিয়া বলের মত পাকাইয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইত, সময় সময় বাচ্চাগুলির মা খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। একবার আমার একজন সঙ্গী তিনটি কাঠবিড়ালীর হারান বাচ্চা কুড়াইয়া আনিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন। তাহারা এত ছোট যে খাওয়ান একটা সমস্যা হইয়া উঠিল। যাহা হউক আমরা কৌশল আবিষ্কার করিয়া সমস্যার সমাধান করিলাম। ফাউন্টেন পেনে কালী ভরিবার কাচের নলের মুখে তুলা ভরিয়া আমরা দুধ খাওয়াইবার বোতল তৈরী করিলাম।

একমাত্র আলমোড়ার পার্বত্য জেল ব্যতীত সকল জেলেই আমি অসংখ্য পায়রা দেখিয়াছি। হাজার হাজার পায়রা সন্ধ্যায় আকাশ ছাইয়া ফেলিত, কখনও বা জেলকর্মচারীরা ঐগুলি গুলী করিয়া মারিয়া আহার করিত। সর্বত্র ময়নার প্রাচুর্য ছিল। দেরাদুন জেলে আমার সেলের দরজার উপরে একজোড়া ময়না বাসা বাঁধিয়াছিল; আমি তাহাদিগকে খাইতে দিতাম, ক্রমে তাহারা এত পোষ মানিয়াছিল যে সকালে বিকালে আমার খাইতে দিতে দেরী হইলেই তাহারা আমার নিকটে বসিয়া কিচির মিচির করিয়া আহারের দাবী জানাইত। তাহাদের ভাবভঙ্গী

দেখিয়া এবং অধীর চীৎকার শুনিয়া আমি বেশ আনন্দ বোধ করিতাম।

নৈনী জেলে হাজার হাজার টিয়া পাখী ছিল এবং আমার ব্যারাকের প্রাচীরের ফাটলে অনেকগুলি বাস করিত। ইহাদের পূর্বরাগ ও প্রেম করিবার ভাবভঙ্গী অত্যন্ত কৌতুককর দৃশ্য। কখনও কখনও নারী-টিয়ার জন্য দুইটি পুরুষ-টিয়ার মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাইত, নারী-টিয়াটি শান্তভাবে বসিয়া যুদ্ধের ফলাফল লক্ষ্য করিত এবং বিজয়ীর গলায় বরমাল্য দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিত।

দেরাদুনে বহুশ্রেণীর পাখী ছিল। তাহাদের সঙ্গীত ও কলকাকলীতে দিক মুখরিত হইত এবং সর্বোপরি কোকিলের দ্রুত স্বর সকলকে ছাপাইয়া উঠিত। বর্ষার অব্যবহিত পূর্বে পাপিয়া দেখা দিত এবং সমস্ত বর্ষাকাল থাকিত। অল্পদিনেই আমি ইহার নামের সার্থকতা* বুঝিতে পারিলাম। কি দিবা কি রাত্রি, সূর্যালোকই থাকুক, আর অবিশ্রান্ত বর্ষাই হউক, এই পাখী বিরামহীন একঘেয়ে সুরে ডাকিতে থাকিত। অধিকাংশ পাখী আমরা দেখিতে পাইতাম না, কেবল তাহাদের ডাক শুনিতাম, কেন না আমাদের ক্ষুদ্র উঠানে কোন গাছ ছিল না। কিন্তু ঊর্ধ্বে আকাশে ঈগল ও চিলের সাবলীল গতিভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতাম। কখনও তাহারা তীরবেগে নীচের দিকে নামিত আবার বায়ুতে ভর দিয়া উপরে উঠিয়া যাইত। কখনও কখনও বন্য হংস বলাকা আমাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইত।

বেরিলী জেলে বহুতর বানর ছিল। তাহাদের হাস্যোদ্দীপক ভাবভঙ্গী দেখিবার বিষয় ছিল। একটি ঘটনার কথা মনে আছে; একটা বানরের বাচ্চা কেমন করিয়া আমাদের ব্যারাকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু উহা দেওয়াল বাহিয়া উপরে উঠিতে পারিতেছিল না, ওয়ার্ডার, সার্জন, কয়েদী ওভারসিয়ার ও কয়েদীরা মিলিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং উহার গলায় একটি দড়ি বাঁধিল। অন্যদিকে উঁচু দেওয়ালের উপর বসিয়া উহার পিতা মাতা (সম্ভবতঃ) এই সব লক্ষ্য করিতেছিল এবং রাগে ফুলিতেছিল। সহসা তাহাদের মধ্যে একটি বেশ বড় আকারের বানর লম্ফ দিয়া নীচে নামিল এবং বানর শিশু বেষ্টনকারী জনতাকে আক্রমণ করিল। ইহা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ, কেন না ইহারা সংখ্যায়ও অধিক ছিল এবং ওয়ার্ডার ও কয়েদী ওভারসিয়ারদের হাতে লাঠি ছিল এবং তাহারা দস্তুরমত লাঠি ঘুরাইতেছিল। কিন্তু পরিণামে দুঃসাহসই জয়ী হইল। মানুষেরা ভয় পাইয়া লাঠি ফেলিয়া পলাইয়া গেল। বানরের বাচ্চাটি মুক্তি পাইল।

আমরা সময় সময় অবাঞ্ছনীয় জীবজন্তু দেখিতাম। আমাদের সেলে সর্বদাই, বিশেষভাবে বড় বৃষ্টির পর অনেক বৃশ্চিক দেখা যাইত। কখনও বা আমার বিছানায়, কখনও বা বই তুলিতে গিয়া দেখি তাহার উপর বৃশ্চিক বসিয়া আছে। এইভাবে নানা অপ্রত্যাশিত স্থানে আমি প্রায়ই বৃশ্চিকের দেখা পাইতাম, কিন্তু আশ্চর্য এই কখনও একটিও আমাকে দংশন করে নাই। একবার একটা কৃষ্ণবর্ণ বিষাক্ত-দর্শন বৃশ্চিককে কিছু দিন বোতলের মধ্যে রাখিয়াছিলাম এবং ইহাকে মাছি ইত্যাদি খাইতে দিতাম। একদিন উহাকে সূতা দিয়া বাঁধিয়া দেওয়ালের উপর রাখিয়াছি, সহসা দেখিলাম যে সূতা কাটিয়া সে পলাইয়াছে। তাহাকে মুক্ত দেখিবার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কাজেই আমি সমস্ত সেল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু আর তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। আমার সেলে অথবা তাহার নিকটে তিন চারটি সাপও দেখিয়াছি। একবারের ঘটনা, সংবাদপত্রে বড়

---

* [illegible] Brain fever bird.

বড় শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কার্যতঃ এই বৈচিত্র্য আমার ভালই লাগিয়াছিল। কারাজীবন অত্যন্ত নীরস, ইহার একটানা গতির মধ্যে যাহা কিছ্ নূতনত্ব আসে তাহাই ভাল লাগে। কিন্তু তাই বলিয়া আমি সাপ ভালবাসি অথবা তাহাদের আগমনে পুলকিত হই তাহা নহে, বরং সাধারণ মানুষের মত আমিও সাপ দেখিলে ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠি। আমি যদি সাপ দেখি তাহা হইলে দংশনের ভয়ে আমি নিশ্চয়ই আত্মরক্ষা করিব। কিন্তু তাহা ঘৃণা হইতে নহে অথবা ভয়ে অভিভূত হইয়াও নহে। কেন্নুই দেখিলে আমি অধিকতর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি! ইহা ঠিক ভয় নয়, একটা সহজাত ঘৃণা। কলিকাতার আলিপুর জেলে একবার আমি মধ্যরাত্রে জাগিয়া অনুভব করিলাম, কি যেন আমার পায়ের উপর হাঁটিতেছে। আমার নিকট টর্চ ছিল, জ্বালাইয়া দেখি বিছানার উপর একটা কেন্নুই। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অতি দ্রুত আমি বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িলাম, অল্পের জন্য সেলের দেওয়ালে আঘাত পাই নাই। পাভ্লোভের ইচ্ছার সম্পর্কহীন প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার অর্থ আমি পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

দেরাদুনে আমি একটি নূতন প্রাণী দেখিলাম অর্থাৎ আমার নিকট ইহা নূতন প্রাণী। আমি জেলের দরজায় দাঁড়াইয়া জেলারের সহিত কথা বলিতেছি, এমন সময় দেখিলাম বাহিরে একটি লোক ঐ অদ্ভুত প্রাণীটাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। জেলার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি দেখিলাম ইহা টিক্‌টিকি ও কুমীরের মাঝামাঝি প্রায় দুই ফুট লম্বা হইবে, পায়ে নখর আছে এবং সমস্ত শরীর পুরু শল্কাবৃত। এই কুৎসিতদর্শন প্রাণীটি অত্যন্ত অস্থির এবং ক্রমাগত নিজেকে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে পাকাইয়া এক প্রকার গ্রন্থীর মত করিতেছিল এবং ইহার মালিক স্বচ্ছন্দে ঐ গ্রন্থীর মধ্য দিয়া লাঠি চালাইয়া দিয়া ঘাড়ে করিয়া চলিতেছিল। তাহার নিকট শুনিলাম যে ইহার নাম "বো"। জেলার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহা দিয়া সে কি করিবে। উত্তরে লোকটা এক গাল হাসিয়া বলিল যে সে উহা "ভাজ্জি" অর্থাৎ ঝোল রান্না করিয়া খাইবে। সে জঙ্গলে বাস করিয়া থাকে। পরে আমি এফ ডাবলিউ চাম্পিয়ানের "দি জাঙ্গল্ ইন্ সান্ লাইট এণ্ড স্যাডো" পুস্তকে দেখিলাম এই জানোয়ারের নাম 'প্যাঙ্গলীন'*।

কয়েদীদের বিশেষতঃ দীর্ঘদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের হৃদয় সর্বদাই উপবাসী থাকে। সময় সময় তাহারা কোন প্রাণী পুষিয়া হৃদয়াবেগের চরিতার্থতা সাধন করে। সাধারণ কয়েদীরা অবশ্য ইহা পারে না। কিন্তু কয়েদী মেটদের একটু স্বাধীনতা আছে এবং জেলের কর্মচারীরা সাধারণতঃ আপত্তি করেন না। সচরাচর কাঠবিড়াল এবং আশ্চর্য এই বেজীও তাহারা পুষিয়া থাকে। জেলে কুকুর প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না কিন্তু বিড়ালের অভাব নাই। একবার একটা বিড়ালের বাচ্চার সহিত আমার ভাব হইয়াছিল। ইহা একজন জেল কর্মচারীর এবং তিনি বদ্‌লী হইবার সময় উহাকে লইয়া গেলেন। কয়েক দিন আমি ইহার অভাব বোধ করিয়াছিলাম। যদিও কুকুর রাখিতে দেওয়া হয় না তথাপি অপ্রত্যাশিতভাবে দেরাদুন জেলে আমাকে কয়েকটি কুকুরের ভার লইতে হইয়াছিল। একজন জেল কর্মচারীর একটি মাদি কুকুর ছিল, তিনি বদ্‌লী হইবার সময় ইহাকে ফেলিয়া গেলেন। বেচারী গৃহহারা হইয়া একটি জলনালীর নীচে থাকিত, ওয়ার্ডারদের

---

* ইহার সংস্কৃত নাম বজ্রকীট। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের জঙ্গলে ইহা পাওয়া যায়। উত্তর বাংলার তরাইয়ের লোকেরা ইহাকে 'বনরুই' বলে। ইহার মাংস সুস্বাদু। ইহার পৃষ্ঠ শল্ক হইতে নির্মিত আংটী ধারণ করিলে অর্শ রোগ আরোগ্য হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে। —অনুবাদক।

উচ্ছিষ্ট খুঁটিয়া খাইত এবং প্রায়ই খাইতে পাইত না। আমি জেলের বাহিরে হাজতে ছিলাম বলিয়া সে মাঝে মাঝে খাদ্যের আশায় আমার নিকট আসিত। আমি নিয়মিতভাবে তাহাকে খাবার দিতে লাগিলাম এবং অল্পদিন পরেই সেই জলনালীর নীচে সে একপাল বাচ্চা প্রসব করিল। কয়েকটি বাচ্চা লোকে লইয়া গেল, তিনটি রহিল, আমি তাহাদের খাওয়াইতাম। একটি বাচ্চার একবার কঠিন পীড়া হইল। ইহাকে লইয়া আমি অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছিলাম, আমি উহার সেবা করিতাম এবং কয়েক দিন রাত্রে দশ-বার বার উঠিয়া আমার তাহা দেখিতে হইত। বেচারী বাঁচিয়া গেল। আমার সেবা সার্থক হইল দেখিয়া আমিও খুসী হইলাম।

বাহির অপেক্ষা কারাগারের মধ্যেই আমি অধিকতর পশু প্রাণীর সংস্পর্শে আসিয়াছি। আমি সর্বদাই কুকুর ভালবাসি, আমার কয়েকটি কুকুরও ছিল, কিন্তু কাজের চাপে নিজে তত্ত্বাবধান করিতে পারিতাম না। জেলে ইহাদের সঙ্গ পাইয়া আমি খুসী হইয়াছিলাম। ভারতবাসীরা সাধারণতঃ বাড়ীতে পশু প্রাণী পোষা পছন্দ করে না। আশ্চর্য এই, পশু পাখীর প্রতি অহিংসার উপদেশ থাকা সত্ত্বেও তাহারা উহাদের প্রতি সাধারণতঃ উদাসীন এবং নিষ্ঠুর। এমন কি যে গাভী হিন্দুদের সর্বাধিক প্রিয় ও অনেকে পূজা পর্যন্ত করিয়া থাকে, যাহা লইয়া দাঙ্গা বাধে, তাহার প্রতিও সদয় ব্যবহার করা হয় না। পূজা ও দয়া প্রায়ই একত্রে দেখা যায় না।

বিভিন্ন দেশ তাহাদের জাতীয় চরিত্র অথবা আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে বিভিন্ন পশু পক্ষী গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর ঈগল, ইংলণ্ডের সিংহ ও বুল-ডগ, ফ্রান্সের যুধ্যমান কুক্কুট, প্রাচীন রুশিয়ার ভল্লুক। এই সকল ইষ্টদেবতাতুল্য প্রাণী জাতীয় চরিত্র গঠনে কতটুকু সহায়তা করিয়াছেন? ইহারা প্রায় সকলেই আক্রমণশীল, হিংস্র ও শিকারী প্রাণী। এই সকল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যাহারা সচেতন ভাবে চরিত্র গঠন করে, তাহারা যে হিংস্রস্বভাব হইবে এবং গর্জন করিয়া অপরের স্কন্ধে পড়িবে, ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। গাভী যাহাদের ইষ্টদেবতা সেই হিন্দুরা যে নিরীহ ও অহিংস হইবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য কি?

৪৬

সংঘর্ষ

বাহিরে সংঘর্ষ চলিতে লাগিল; সাহসী নরনারীরা শক্তিশালী ও সুসংবদ্ধ গভর্ণমেণ্টের আদেশ শান্তিপূর্ণ উপায়ে অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে বর্তমানে অথবা অদূর ভবিষ্যতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। বিরামহীন দমননীতি ক্রমশঃ অধিকতর কঠোর হইয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে কোন চাতুর্যের আবরণ রহিল না, ইহাতে আমরা কতকটা সান্ত্বনা পাইলাম। বেয়োনেট জয়ী হইল, কিন্তু একজন বিখ্যাত যোদ্ধা বলিয়াছিলেন, "তুমি বেয়োনেট দিয়া সব করিতে পার, কিন্তু উহার উপর বসিতে পার না।" নিজের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া যান্ত্রিক দুর্নীতি অপেক্ষা এইভাবে শাসিত হওয়া অনেক ভাল। আমরা জেলখানার

দৈহিকভাবে নিরুপায় হইয়াও অনুভব করিতাম, বাহিরের অনেকের অপেক্ষা অধিক সেবা করিতেছি। আমরা দুর্বল বলিয়াই কি আত্মরক্ষার জন্য ভারতের ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিব? মানুষের বীর্য, মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। অনেকে দৈহিকভাবে অকর্মণ্য হইয়াছেন। অনেকের মৃত্যু হইয়াছে, অনেকে দূরে সরিয়া গিয়াছে, কেহ কেহ বা উদ্দেশ্যের প্রতি কৃতঘ্নতা করিয়াছে; কিন্তু প্রতিরোধ সত্ত্বেও উদ্দেশ্য অব্যাহত রহিল,—আদর্শ যদি ম্লান না হয়, আত্মা যদি ভয়হীন থাকে, তাহা হইলে ব্যর্থতা আসিতেই পারে না। মূলনীতি ত্যাগ, নিজেদের অধিকার অস্বীকার এবং অন্যায়ের নিকট গ্লানিকর বশ্যতা স্বীকারই প্রকৃত ব্যর্থতা। শত্রুর আঘাত-জনিত ক্ষত অপেক্ষা আত্মকৃত ক্ষত আরোগ্য হইতেই অধিক সময় লাগে।

আমাদের দুর্বলতা, জগতের অন্যায় গতি দেখিয়া মাঝে মাঝে অবসাদ আসে, তথাপি আমরা যাহা সাধন করিয়াছি তাহার জন্য গর্ববোধও করিয়া থাকি। আমাদের জাতির আচরণ নিশ্চয়ই গৌরবময় এবং এই সাহসী সৈন্যদলের অন্যতমরূপে নিজেকে চিন্তা করা বড় আনন্দ।

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় একবার দিল্লীতে এবং একবার কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। কোন বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাধারণভাবে শান্তির সহিত মিলিত হওয়া সম্ভবপর নহে; চেষ্টা করিতে গেলে পুলিশের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য। কার্যতঃ এই সকল সভা পুলিশ লাঠিচালনা করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল এবং বহুলোককে গ্রেফতার করা হইয়াছিল। এই সকল বে-আইনী সম্মেলনের বিশেষ বিশেষত্ব এই যে ভারতের নানাপ্রান্ত হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি ইহাতে প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়াছিলেন। যুক্ত-প্রদেশের লোকেরাই অধিক সংখ্যায় এই দুই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন, এই সংবাদে আমি হৃষ্ট হইয়াছিলাম। ১৯৩৩-এর মার্চ মাসের শেষভাগে আমার মাতা কলিকাতা কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য জিদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পণ্ডিত মালব্যজী ও অন্যান্যর সহিত কলিকাতার পথে গ্রেফতার হইয়া আসানসোল জেলে কয়েকদিন ছিলেন। রুগ্না ও দুর্বলা হইলেও তিনি যে উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে আমি আশ্চর্য হইলাম। জেলের ভয় তাঁহার অল্পই ছিল, তাহা অপেক্ষাও অধিক অগ্নিপরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র, দুই কন্যা ও অন্যান্য প্রিয়জন সকলেই কারাগারে; শূন্যভবন নৈশ দুঃস্বপ্নের মত তাঁহার শ্বাসরোধ করিত।

আন্দোলন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া অতি মৃদুভাবে চলিতে লাগিল, কদাচিৎ উত্তেজনার কিছু ঘটিত। কাজেই আমার চিন্তা ক্রমে অন্যান্য দেশের প্রতি ধাবিত হইল। কারাগারে যতটা সম্ভব, বৃহৎ অর্থসঙ্কটের মধ্যে পতিত জগতের ঘটনা-বলীর গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। এই বিষয়ে যথাসম্ভব পুস্তকাদি পড়িতে লাগিলাম। যতই পাঠ করি ততই আমার আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হইতে লাগিল। জগতের রঙ্গমঞ্চে যে বৃহৎ নাট্যের অভিনয় হইতেছে, সর্বত্র রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক শক্তিপুঞ্জের যে সংঘাত ও সংঘর্ষ চলিতেছে, ভারতের সমস্যা ও সংঘর্ষ তাহারই একটা অংশমাত্র। এই সংঘর্ষের মধ্যে আমার সহানুভূতি ক্রমবর্ধমান গতিতে কম্যুনিস্টদের দিকেই প্রবাহিত হইল।

বহুকাল হইতে আমি সমাজতন্ত্রবাদ ও কম্যুনিজম-এর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, রুশিয়ার প্রতিও আমার অনুরাগ ছিল। সোভিয়েট রুশিয়ার অনেক কিছুই আমার ভাল লাগে না—বিপরীত মতবাদ নিষ্ঠুরভাবে দমন, সর্বসাধারণকে সৈন্যদলে যোগ দিতে বাধ্য করা, অনাবশ্যক বলপ্রয়োগে (আমার বিশ্বাস) বিভিন্ন

কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে বাধ্য করা প্রভৃতি। ধনতান্ত্রিক জগতেও পীড়নমূলক দমন ও হিংসানীতির অসদ্ভাব নাই এবং আমি অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝিতে লাগিলাম যে অর্জন ও সঞ্চয়মূলক সমাজ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি ও আশ্রয়ের মূলে রহিয়াছে হিংসানীতি। হিংসানীতি ব্যতীত ইহা বেশীদিন চলিতে পারিত না। সর্বত্রই অধিকাংশ ব্যক্তি ক্ষুধার ভয়ে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছে,—তাহার মহিমা ও সুবিধা বিবিধ প্রকারে বৃদ্ধি করিতেছে, সেখানে খানিকটা রাজনৈতিক সুবিধার মূল্য কতটুকু.

উভয় স্থলেই হিংসানীতি আছে; কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে হিংসানীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত; কিন্তু রুশিয়ার হিংসানীতি যতই মন্দ হউক, তাহার লক্ষ্য ও ভিত্তি শান্তি ও সহযোগিতা; জনসাধারণের প্রকৃত স্বাধীনতা। ত্রুটি ও ভুল সত্ত্বেও সোভিয়েট রুশিয়া পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করিয়াছে এবং নূতন সমাজ বিন্যাসের দিকে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে। যখন অবশিষ্ট জগৎ অর্থনৈতিক মন্দায় বিব্রত হইয়া নানাদিক দিয়া পিছাইয়া যাইতেছে, তখন সোভিয়েট রাষ্ট্রে আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই নূতন জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে। মহান লেনিনের অনুগামী রুশিয়ার দৃষ্টি ভবিষ্যতে নিবদ্ধ, তাহার চিন্তা, কি হইতে হইবে; পক্ষান্তরে অন্যান্য দেশ অতীতের জীর্ণ মৃতভারে অভিভূত এবং অতীতের অকর্মণ্য নিদর্শনগুলি রক্ষার জন্য বৃথা শক্তিক্ষয় করিতেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পশ্চাৎপদ মধ্য এশিয়ার বিস্ময়কর উন্নতির বিবরণ পাঠে আমি মুগ্ধ হইলাম। দুই দিক বিচার করিয়া আমি সর্বতোভাবে রুশিয়ারই পক্ষপাতী,—এই অন্ধকার ও বিষণ্ণ জগতে রুশিয়াই উৎফুল্ল আশার আলোকবর্তিকা তুলিয়া ধরিয়াছে।

কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপনে সোভিয়েট রুশিয়ার পরীক্ষামূলক কার্যগুলির সাফল্য বা ব্যর্থতার গুরুত্ব অনেক অধিক হইলেও, কম্যুনিষ্ট মতবাদের অভ্রান্ততার উহাতে কোন ইতরবিশেষ হয় না। বলশেভিকেরা ভুল করিতে পারে, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কারণে তাহারা ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু তথাপি কম্যুনিষ্ট মতবাদ অভ্রান্তই থাকিতে পারে। এই মতবাদই নির্দেশ করিতেছে যে, রুশিয়ায় যাহা ঘটিয়াছে, অন্ধভাবে তাহার অনুকরণ করা অযৌক্তিক; কোন দেশের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির স্তর এবং তাহার সমসাময়িক বিশেষ অবস্থার উপরই উহার প্রয়োগ কৌশল নির্ভর করে। ইহা ছাড়া বলশেভিকদের সাফল্য এবং অপরিহার্য ভুল হইতে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারে। সম্ভবতঃ চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত বলশেভিকরা বাহ্য আক্রমণের আশঙ্কায় অতি দ্রুত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ধীরে কাজ হইলে হয়ত পল্লী অঞ্চলের অনেক দুঃখদুর্দশা নিবারণ করা যাইত। কিন্তু তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিবে যে পরিবর্তনের গতি মন্থর করিলে, আদৌ পরিবর্তনের প্রকৃত ফল পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। কোন গুরুতর সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজবিন্যাসকে ঢালিয়া সাজিতে হইলে সংস্কারমূলক উপায় দ্বারা তাহা অসম্ভব। পরে উন্নতির গতি যতই ধীর হউক না কেন, প্রথম পদক্ষেপের সূচনাতে প্রচলিত ব্যবস্থা ভাঙ্গিতেই হইবে, কেন না, উহার প্রয়োজন অবসান হওয়া সত্ত্বেও উহা ভাবিকাল উন্নতির পথে ভার স্বরূপ হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভারতে ভূমি ও কলকারখানা সংক্রান্ত ও দেশের অন্যান্য প্রধান সমস্যাগুলি একমাত্র বৈপ্লবিক কার্যপদ্ধতি দ্বারাই সমাধান করা যাইতে পারে। মিঃ নেহের্‌ বর্ষ তাঁহার "আত্মস্মৃতি"তে যথার্থ বলিয়াছেন যে, "দুই দলের মধ্যে

উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টার মত মূঢ়তা আর নাই।”

রুশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও মার্কসীয় মতবাদ ও দর্শন আমার মনের অনেক অন্ধকার কোণ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। আমার দৃষ্টিতে ইতিহাসের এক নূতন রূপ উদ্‌ঘাটিত হইল। মার্কসীয় বিশ্লেষণ-প্রণালী ইহার উপর এক নূতন আলোক সম্পাত করিল; অজ্ঞাতসারে হইলেও ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি এক শৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়াই প্রকটিত হইতেছে। অতীত ও বর্তমানের দুঃখ ও অপচয় যতই ভয়াবহ হউক না কেন, বহু বিপত্তির বাধা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ আশায় সমুজ্জ্বল। অযৌক্তিক মতবাদ হইতে মুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই আমি মার্কসীয় মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। অন্যান্য স্থানে ও রুশিয়ার সরকারী কম্যুনিজম-এর মধ্যে অনেক যুক্তিনিরপেক্ষ মতবাদ আছে সত্য এবং প্রায়ই অধিবাসীদিগের প্রতি পীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহা গভীর আক্ষেপের বিষয় হইলেও, ইহা বুঝা কঠিন নহে। সোভিয়েট দেশগুলিতে যখন অতি দ্রুত গুরুতর পরিবর্তন চলিতেছে, তখন কোন বিরুদ্ধতাকে প্রবল হইতে দিলে ব্যর্থতা অতি শোচনীয় হইতে পারিত।

জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কট ও মন্দা হইতে মার্কসীয় বিশ্লেষণের যৌক্তিকতাই প্রমাণিত হয়। যখন অন্যান্য পদ্ধতি ও মতবাদ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে তখন কেবলমাত্র মার্কসীয় মতবাদই ইহা অল্পবিস্তর সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত সমাধানের পথ নির্দেশ করিতেছে।

এই বিশ্বাস আমার মধ্যে যতই বর্ধিত হইতে লাগিল, আমি ততই নূতন উত্তেজনায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলাম; নিরুপদ্রব প্রতিরোধের অসাফল্যজনিত অবসাদ বহুলাংশে উপশম হইল। জগত কি ঈপ্সিত পরিণতির দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে না? সম্মুখে যুদ্ধ ও খণ্ড-প্রলয়ের আশঙ্কা, তথাপি আমরা অগ্রসর হইতেছি। কেহ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া নাই। আমাদের জাতীয় সংঘর্ষ এক সুদীর্ঘ যাত্রাপথের ক্ষণিক বিশ্রাম স্থল। দমননীতি ও দুঃখভোগের পরিণাম ভালই, ইহা আমাদের জনসাধারণকে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত করিবে; যে সকল নূতনভাব জগৎকে আলোড়িত করিতেছে, তাহারাও তাহা ভাবিতে বাধ্য হইবে। আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তিরা সরিয়া গেলে আমরা অধিকতর শৃঙ্খলাবদ্ধ, অধিকতর শক্তিশালী হইব, সময় আমাদের অনুকূল।

রুশিয়া, জার্মাণী, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, চীন, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী ও মধ্য ইউরোপের ঘটনাস্রোত আমি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর জটিল জাল বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক দেশ স্বতন্ত্রভাবে এবং মিলিতভাবে ঝড়ের মধ্য দিয়াও তরী চালাইবার জন্য কিরূপ উদ্যম করিতেছে, আমি কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতি সমাধানকল্পে ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের জন্য আহূত বিবিধ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যর্থতা আমাকে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র অথচ বিরক্তিকর সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। জগতে সদিচ্ছার অভাব না থাকা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হইল না;—যদিও অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস যে, ব্যর্থতার পরিণাম জগদ্ব্যাপী বিপর্যয়, তথাপি ইউরোপ ও আমেরিকার খ্যাতনামা রাজনীতিকগণ একত্র মিলিত হইতে পারিতেছেন না। যে ভাবেই হউক, তাঁহারা ভুল পথে মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সত্যপথ গ্রহণ করিবার সাহস নাই।

জগতের ক্লেশ ও সংঘাত চিন্তা করিতে করিতে আমি ব্যক্তিগত ও জাতীয়

অশান্তি ও ক্লেশের কথা অনেকাংশে বিস্মৃত হইলাম। জগতের ইতিহাসের এই বৃহৎ বৈপ্লবিক অবস্থার মধ্যে আমি জীবিত আছি, এই চিন্তায় মাঝে মাঝে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম। যে মহান পরিবর্তন আসিতেছে, সম্ভবতঃ আমিও জগতে আমার এই গৃহকোণে তাহার মধ্যে কোন যৎসামান্য ভূমিকার অভিনয় করিতে পারি। কখনও বা সমগ্র জগতের সংঘাত ও হিংসানীতির আবহাওয়ায় আমি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতাম। বুদ্ধিমান নরনারীরা, মানুষের অধঃপতন ও দাসত্ব দেখিতে এত অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহাদের অনুভূতিহীন হৃদয়ে দারিদ্র্য, দুর্দশা ও অমানুষিকতা দেখিয়া ক্রোধের উদ্রেক হয় না; নীতির কণ্ঠরোধ করিয়া অশিষ্ট ইতরতা ও শূন্যগর্ভ আস্ফালন মুখর হইয়া উঠিয়াছে অথচ ন্যায়বান ব্যক্তিরা নীরব। হিটলারের জয় এবং তাহার পর "খাকী ভীতি"র রাজত্ব দেখিয়া আমি মর্মাহত হইলেও উহা সাময়িক মনে করিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম। মনে হয়, মানুষের সমস্ত চেষ্টা যেন ব্যর্থ। অন্ধ আবেগে যন্ত্র চালিত হইতেছে, ইহার ক্ষুদ্র এক চক্রদন্ত কি করিতে পারে?

তথাপি জীবনের কম্যুনিস্ট-দার্শনিক ব্যাখ্যার মধ্যে সান্ত্বনা ও আশা পাইলাম। ভারতে ইহা কি ভাবে প্রয়োগ করা যায়? আমরা এখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সমস্যার সমাধান করিতে পারি নাই, এখনও জাতীয়তার ভাবেই আমাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া আছে। আমরা কি এখনই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টিত হইব, না, ব্যবধান যতই সঙ্কীর্ণ হউক একের পর আর গ্রহণ করিব? জগতের তথা ভারতের ঘটনাপ্রবাহ সামাজিক সমস্যাগুলিকেই মুখ্য করিয়া তুলিতেছে এবং মনে হয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আর ইহার সহিত স্বতন্ত্র করা সম্ভব হইবে না।

ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতির ফলে সামাজিক উন্নতিবিরোধী শ্রেণীগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা অপরিহার্য এবং ভারতে বিভিন্ন শ্রেণী বা দলের সীমারেখা স্পষ্ট হইয়া উঠুক, আমি ইহা প্রত্যাশা করি। কিন্তু এই ঘটনা সকলে অনুভব করেন কি? দেখা যায়, অনেকেই করেন না। বড় বড় সহরে মুষ্টিমেয় গোঁড়া কম্যুনিস্ট আছেন, তাঁহারা জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী ও তীব্র সমালোচক। বিশেষভাবে বোম্বাইয়ে এবং কতক পরিমাণে কলিকাতায় সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনও এক প্রকার শিথিল সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, কিন্তু ইহাও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমন কি বুদ্ধিমান সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও অস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক ভাব এবং কম্যুনিজম বিস্তার লাভ করিতেছে। কংগ্রেসের তরুণ নরনারীরা যাঁহারা পূর্বে ব্রাইসের গণতন্ত্র, মিল এবং মর্লি পাঠ করিতেন, এখন তাঁহারা হাতের কাছে পাইলে সমাজতন্ত্রবাদ, কম্যুনিজম ও রুশিয়া সংক্রান্ত গ্রন্থাদি পাঠ করেন। জনসাধারণের দৃষ্টি এই সকল নূতন ভাবের প্রতি আকৃষ্ট করিতে মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা অনেক সহায়তা করিয়াছে এবং জগতের বর্তমান সঙ্কটের ফলে উহার প্রতি মনোযোগ অধিকতর একাগ্র হইয়াছে। অনুসন্ধানের আগ্রহ, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা এবং বর্তমান প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সন্দেহ সর্বত্রই দেখা যায়। মনের হাওয়ার গতি কোন দিকে তাহা বুঝা যাইতেছে, তবে ইহা এখনও মৃদুমন্দ মলয় পবন—অনিশ্চিত, আত্মপ্রত্যয়হীন। কেহ কেহ ফ্যাসিস্ট ভাব লইয়াও নাড়াচাড়া করেন। স্পষ্ট ও নিশ্চিত মতবাদের এখনও অভাব। জাতীয়তাবাদই চিন্তাজগতে সর্বাপেক্ষা প্রবল।

যে পর্যন্ত না কতকটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া যায়, ততদিন জাতীয়তা-

বাদই ম্খ্য প্রেরণার বিষয় থাকিবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। এই কারণে অতীত এবং বর্তমানে কংগ্রেসই (কোন কোন শ্রমিক সঙ্ঘ ছাড়া) ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ও তুলনায় বহ্গ্ণে অধিক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। গত তের বৎসরে গান্ধিজীর নেতৃত্বে ইহা জনসাধারণের মধ্যে অপ্র্ব জাগরণ আনিয়াছে এবং ইহার মধ্যে ব্র্জোয়া মতবাদ সত্ত্বেও ইহা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। ইহার প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই এবং যতদিন না জাতীয়তাবাদের স্থান সমাজতান্ত্রিক প্রেরণা গ্রহণ করে, ততদিন ইহা থাকিবে। অতএব মতবাদ ও কার্যপদ্ধতির দিক দিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অগ্রসর বহ্ল পরিমাণে কংগ্রেসের সহিতই সংশ্লিষ্ট থাকিবে, তবে অন্যান্য উপায়ও যে ব্যবহৃত হইবে না তাহা নহে।

এই সকল কারণে কংগ্রেস পরিত্যাগ করা আমার মতে জাতীয় অভিব্যক্তির প্রধান ধারা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা, যে শক্তিশালী অস্ত্র আমরা হাতে পাইয়াছি তাহার তীক্ষ্ণতা হ্রাস করা এবং সম্ভবতঃ নিষ্ফল বীরত্ব প্রকাশ করিয়া শক্তির অপব্যয় করা। তথাপি কংগ্রেস বর্তমানে যে ভাবে গঠিত তাহাতে তাহার পক্ষে কি কোন আম্ল পরিবর্তনম্লক সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর? যদি ঐর্প কোন প্রস্তাব ইহাতে উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে ইহা দ্ই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে, অন্ততঃ বহ্সংখ্যক ব্যক্তি ইহার বাহিরে চলিয়া যাইবেন। তবে যদি স্স্পষ্ট মতবাদের ভিত্তিতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ দল কোন আম্ল পরিবর্তনম্লক সমাজতান্ত্রিক কার্যপ্রণালী গ্রহণ করেন, তাহা অবাঞ্ছনীয় নিশ্চয়ই নহে।

কিন্তু বর্তমানে কংগ্রেস অর্থই গান্ধিজী। তিনি কি করিবেন? সময় সময় মতবাদের দিক দিয়া তিনি আশ্চর্যর্পে পশ্চাৎপদ অথচ কার্যক্ষেত্রে আধ্নিক ভারতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অনন্যসাধারণ, প্রচলিত মাপকাঠি দিয়া তাঁহাকে বিচার করা যায় না, ন্যায়শাস্ত্রের সাধারণ স্ত্রও তাঁহার উপর প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু তিনি অন্তরে বৈপ্লবিক এবং ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ,—রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিরলসভাবে কর্ম করিবেন। এই চেষ্টায় গণশক্তি অধিকতর উদ্বোধিত হইবে এবং তিনি নিজেও ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবেন বলিয়া আমি কিছ্ ভরসা রাখি।

ভারতীয় ও বৈদেশিক কম্যনিষ্টেরা বহ্ বৎসর ধরিয়া গান্ধিজী ও কংগ্রেসকে তীব্রভাবে আক্রমণ এবং কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশ্যের উপর সর্ববিধ হীন অভিসন্ধি আরোপ করিয়া আসিতেছেন। কংগ্রেসের মতবাদ সম্পর্কে তাঁহাদের আন্মানিক সমালোচনায় কোন কোন অংশে যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরবর্তী ঘটনায় অনেকগ্লির যৌক্তিকতাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রথম দিকে কম্যনিষ্টগণ যে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্যর্পে সত্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যখন সমালোচনাম্খে তাঁহারা তাঁহাদের সাধারণ নীতি হইতে বিস্তীর্ণ বর্ণনার ভূমিতে অবতীর্ণ হন, বিশেষভাবে কংগ্রেসের নির্দিষ্ট কার্য বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখনই তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। ভারতে কম্যনিষ্টদের সংখ্যাল্পতার ও প্রভাব প্রতিপত্তি না হইবার অন্যতম কারণ এই যে, বৈজ্ঞানিকভাবে কম্যনিজম সম্পর্কে প্রচার ও অপরকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা প্রধানতঃ অপরকে গালি দিতেই অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ইহাই প্রতিক্রিয়া-স্বর্পে তাঁহাদের গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। ইঁহাদের অধিকাংশই শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করিয়া

থাকেন এবং শ্রমিকদের চিত্তজয় করিবার পক্ষে কয়েকটি বাঁধাবুলিই যথেষ্ট। কিন্তু কতকগুলি বুলি বা জয়ধ্বনি দিয়া শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের ভুলান যায় না। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, বর্তমানে মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত ব্যক্তিরাই ভারতের সর্বপ্রধান বৈপ্লবিক শক্তি। গোঁড়া কম্যুনিস্টদের অপেক্ষা না করিয়াই বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তি কম্যুনিজম-এর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং তথাপি তাঁহাদের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে।

কম্যুনিস্টদের মতে কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশ্য হইল, জনসাধারণ কর্তৃক গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়া ভারতীয় মূলধনী ও জমিদারদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কল-কারখানা ও বাণিজ্যের সুবিধা আদায় করা। কংগ্রেসের কাজ হইল, "কৃষক, কারখানার শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষকে বোম্বাই, আহম্মাদাবাদ ও কলিকাতার ধনীদের রথে জুড়িয়া দেওয়া।" কথিত হয় যে, ভারতীয় ধনীরা পশ্চাতে থাকিয়া কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিকে গণ-আন্দোলন পরিচালনা করিবার আদেশ দেন। অধিকন্তু কংগ্রেসের নেতারা ব্রিটিশগণ চলিয়া যান ইহা চাহেন না, তাঁহাদের সাহায্যে ক্ষুধিত জনসাধারণকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়া শোষণ করিতে চাহেন; ভারতের মধ্যশ্রেণী এই কাজে নিজেদের সম্যক পারদর্শী বলিয়া মনে করেন না।

শক্তিমান কম্যুনিস্টগণ এই প্রকার আজগুবী বিশ্লেষণে বিশ্বাস করেন ইহা অতি আশ্চর্য কথা এবং এই প্রকার বিশ্বাসের জন্যই তাঁহারা ভারতবর্ষে ব্যর্থকাম হইয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। তাঁহাদের আসল ভুল হইল, তাঁহারা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের মাপ-কাঠিতে বিচার করেন। সেখানে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি শ্রমিক নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্তে তাঁহারা অভ্যস্ত বলিয়া সেই উপমানগত সাদৃশ্য ভারতেও প্রয়োগ করেন। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলনও নহে, কৃষক শ্রমিক বৃত্তিজীবীদের (প্রোলেটারিয়ান) আন্দোলনও নহে। ইহা যে বুর্জোয়া আন্দোলন, নামেই তাহার প্রমাণ এবং ইহার উদ্দেশ্য একাল পর্যন্তও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার পরিবর্তন নহে। এই উদ্দেশ্য প্রয়োজনানুরূপ ব্যাপক নহে বলিয়া সমালোচনা করা যাইতে পারে এবং জাতীয়তাবাদকে বর্তমান কালের অনুপযোগী বলা যাইতে পারে। কিন্তু আন্দোলনের মূল ভিত্তিকে মানিয়া লইলে নেতারা ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থা অথবা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উল্টাইবার চেষ্টা করেন না বলিয়া তাঁহারা জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, একথা বলা অযৌক্তিক। তাঁহারা এরূপ কথা কখনও ঘোষণা করেন নাই। কংগ্রেসের মধ্যে এমন অনেকে আছেন,—যাঁহাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে,—যাঁহারা ভূমিসংক্রান্ত ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহাদের কংগ্রেসের নামে কিছু বলিবার অধিকার নাই।

ইহা সত্য যে, ভারতের ধনী সম্প্রদায় (বড় জমিদার বা তালুকদারগণ সমেত) জাতীয় আন্দোলনের ফলে প্রচুর লাভবান হইয়াছেন; ব্রিটিশ এবং বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী প্রচারের ফলে তাঁহাদের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অপরিহার্য। জাতীয় আন্দোলন মাত্রেই দেশীয় শিল্পের উৎসাহ দান এবং বিদেশী বর্জন প্রচার করিয়া থাকে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, যখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে এবং আমরা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলন চালাইতেছি তখন বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের মালিকেরা ল্যাঙ্কাশায়ারের সহিত চুক্তি করিবার স্পর্ধা দেখাইয়াছিল। কংগ্রেসের দৃষ্টিতে ইহা জাতীয় উদ্দেশ্যের প্রতি অতি

জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা এবং উহাকে ঐর়ুপেই অভিহিত করা হইয়াছিল। যখন আমরা অধিকাংশই কারার়ুদ্ধ তখন বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদের প্রতিনিধি ব্যবস্থা পরিষদে বারম্বার কংগ্রেস ও চরমপন্থীদের নিন্দা করিয়াছেন।

গত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে ধনী সম্প্রদায় যাহা করিয়াছেন, তাহা কলঙ্ককর সন্দেহ নাই। এমন কি জাতীয়তাবাদ ও কংগ্রেসের দৃষ্টিতেও তাহা গর্হিত। ওট্টাওয়া চুক্তিতে সাময়িকভাবে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি লাভবান হইয়াছেন বটে, কিন্তু মোটের উপর ইহাতে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতিই হইয়াছে এবং ইহাকে ব্রিটিশ মূলধন ও বাণিজ্যের পশ্চাতে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর এবং যখন সংঘর্ষ চলিতেছিল যখন বহু সহস্র ব্যক্তি কারাগারে তখন এই চুক্তির কথাবার্তা চলিতেছিল। ফলে প্রত্যেকটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ইংলণ্ডের নিকট হইতে মোটা রকম সর্ত আদায় করিয়া লইয়াছে এবং ভারতবর্ষ কেবল দাতার আসন পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। গত কয়েক বৎসর আর্থিক ভাগ্যান্বেষীরা ভারতবর্ষের সর্বনাশ করিয়া সোনা ও র়ুপার অবৈধ ব্যবসায় চালাইয়াছে।

বড় জমিদার ও তালুকদারেরা গোলটেবিল বৈঠকে সম্পূর্ণর়ুপে কংগ্রেসের বির়ুদ্ধতা করিয়াছে এবং নির়ুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনকালে তাহারা প্রকাশ্য-ভাবে নিজেদের গভর্ণমেণ্টের পক্ষীয় ঘোষণা করিয়া আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। ইহাদেরই সহায়তায় বিভিন্ন প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট নানাবিধ অর্ডিন্যান্স আইনসভা-গুলিতে পাশ করাইয়া লইয়াছেন। যুক্ত-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় অধিকাংশ জমিদার সদস্যই নির়ুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের বন্দীদের মুক্তিপ্রস্তাবের বির়ুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন।

জনসাধারণের চাপে পড়িয়া ১৯২১ ও ১৯৩০-এ গান্ধিজী দৃশ্যতঃ আক্রমণ-মূলক আন্দোলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এইর়ুপ কথা সর্বৈব ভুল। অবশ্য জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য ছিল, কিন্তু গান্ধিজীই তাহাতে গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছিলেন। ১৯২১-এ তিনি প্রায় একক চেষ্টায় কংগ্রেসকে অসহযোগ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তিনি যদি কোন প্রকারে বাধা দিতেন তাহা হইলে ১৯৩১-এ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কোন আক্রমণশীল আন্দোলন অসম্ভব হইত।

ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে, এমন নির্বোধ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগত সমালোচনা করা হয় যাহাতে মূল বিষয় হইতে দৃষ্টি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। গান্ধিজীর সদিচ্ছাকে আক্রমণ করা আত্মঘাতী চেষ্টা মাত্র, কেন না, লক্ষ কোটি ভারতবাসীর দৃষ্টিতে তিনি সত্যের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁহাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বলিবেন, কি ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি সতত ন্যায্য কাজ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

কম্যুনিস্টগণ বড় বড় সহরে কারখানার শ্রমিকদের সহিত মেলামেশা করিয়া থাকেন। পল্লী-অঞ্চলের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক বা অভিজ্ঞতা নাই বলিলেই হয়। কারখানার শ্রমিকদের গুরুত্ব কম নহে এবং ভবিষ্যতে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু তাহাদের স্থান কৃষকদের পশ্চাতে, কেননা ভারতের প্রধান সমস্যাই কৃষক-সমস্যা। পক্ষান্তরে কংগ্রেসকর্মীরা পল্লী-অঞ্চলেই ছড়াইয়া আছেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেস এক বৃহৎ কৃষক-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। কৃষকেরা আশু অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে কদাচিৎ বৈপ্লবিক মনোভাব দেখাইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে ভারতেও নয়া ধরনের পল্লী, কারখানার শ্রমিক ধরনের কৃষক-সমস্যা দেখা দিবে।

বহুসংখ্যক কংগ্রেস নেতা ও কর্মীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ হইয়াছে এবং ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নরনারীর সঙ্গলাভের জন্য আমার চিত্তে কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। তথাপি ইহাদের সহিত আমি অনেক মূল বিষয়ে ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছি যাহা আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ, তাহা ইহারা বুঝিতে বা অনুভব করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া আমি বিষন্ন হইয়াছি। ইহা বুদ্ধির অভাব নহে, আমরা স্বতন্ত্র মতবাদের ক্ষেত্রে বিচরণ করি বলিয়া। এই সীমারেখা সহসা অতিক্রম করা কত কঠিন! প্রত্যেকের স্বগঠিত জীবনের দার্শনিক ভিত্তি স্বতন্ত্র এবং তাহার মধ্যে আমরা অজ্ঞাতসারেই বর্ধিত হই। অপর পক্ষকে দোষ দেওয়া নিষ্ফল। সমাজতন্ত্রবাদ, জীবন ও তাহার সমস্যা সম্পর্কে এক নিশ্চিত মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর অপেক্ষা রাখে। ইহা ন্যায়শাস্ত্রের বাঁধা রাস্তায় চলে না। লৌকিক গুণ, শিক্ষা দীক্ষা, অতীতের অদৃষ্ট প্রভাব ও বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর এই দৃষ্টিভঙ্গী বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। জীবনের অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা আমাদিগকে নূতন পথে ঠেলিয়া দেয় এবং পরিণামে আরও কঠোরতর অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া আমাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিতে শিখায়। হয়ত বা আমরা এই পরিণতির পথে কিছু সাহায্য করিতে পারি। এবং হয়ত বা—"নিয়তিকে এড়াইবার জন্য মানুষ যে পথ গ্রহণ করে, সেই পথেই নিয়তি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়।"

৪৭

ধর্ম কি?

১৯৩২-এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে আমাদের শান্তিপূর্ণ বৈচিত্র্যহীন কারাজীবনের দৈনন্দিন কার্যপ্রণালী সহসা এক বজ্রাঘাতে বিপর্যস্ত হইয়া গেল। মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রদত্ত সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায়, অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতির প্রতিবাদস্বরূপ গান্ধিজী "মৃত্যুপণে অনশন" করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছেন। লোককে মর্মাহত করিবার তাঁহার কি আশ্চর্য ক্ষমতা! সহসা নানাবিধ চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, মনের মধ্যে নানা সম্ভাবনা ও অনিশ্চিত আশঙ্কা ভাসিয়া উঠিল এবং আমি সম্পূর্ণরূপে স্থৈর্য হারাইলাম। দুইদিন আমি অন্ধকারের মধ্যে কোন আলোক দেখিতে পাইলাম না। গান্ধিজীর কার্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় দমিয়া গেল। ব্যক্তিগত আকর্ষণও অত্যন্ত প্রবল এবং হয়ত তাঁহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া আমি অত্যন্ত যাতনা অনুভব করিতে লাগিলাম। এক বৎসর পূর্বে ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার সহিত আমার শেষ দেখা হইয়াছিল। তাহাই কি সর্বশেষ দেখায় পরিণত হইবে?

নির্বাচনের মত একটা সামান্য বিষয় লইয়া তিনি চরম আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার উপর আমার বিরক্তিও হইল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিণাম কি হইবে? অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও বৃহত্তর সমস্যাগুলি কি চাপা পড়িয়া যাইবে না? যদি তাঁহার আশু উদ্দেশ্য সফল হয় যদি অনুন্নত শ্রেণীদের যুক্ত নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃত হয় তাহা হইলে তাহাদের প্রতিক্রিয়ার

ফলে কি অনেকেই, কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছি, অতএব এখন আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া পড়িবে না? তাঁহার এই কার্যের ফলে কি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রসূত শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনাগুলি স্বীকার ও গ্রহণ করা হইবে না? ইহার সহিত অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কি সঙ্গতি আছে? এত ত্যাগ স্বীকার করিয়া এত সাহসিক প্রচেষ্টার পর আমাদের আন্দোলন কি বিশীর্ণ হইয়া অবশেষে তুচ্ছ ব্যাপারে পর্যবসিত হইবে?

তাঁহার রাজনৈতিক ব্যাপারে ধর্ম ও ভাবপ্রবণতার অবতারণা এবং এই সম্পর্কে প্রায়ই ঈশ্বরের আদেশ উল্লেখে আমার তাঁহার উপর অত্যন্ত রাগ হইল। এমন কি তিনি এমন কথাও বলিলেন যে, ঈশ্বর তাঁহার উপবাসের দিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিতেছেন!

যদি বাপুর মৃত্যু হয়? তখন ভারতবর্ষ কিরূপ হইবে? ভারতের রাজনীতি কি আকার ধারণ করিবে? এই চিন্তায় আমার হৃদয় নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠিল। ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় ও নীরস মনে হইতে লাগিল।

যিনি এই বিপর্যয়ের কারণ তাঁহার প্রতি প্রেম ও অসহায় ক্রোধে চিন্তার পর চিন্তায় আমি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিলাম, আমার মস্তিষ্ক বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না আমার মেজাজ বিগড়াইয়া গেল, সকলের উপর রূঢ় হইয়া উঠিলাম, সর্বোপরি নিজের উপরই বেশী রাগ হইতে লাগিল।

তাহার পর এক আশ্চর্য ভাবান্তর ঘটিল। ভাবোন্মাদনার অবসানে আমি শান্ত হইয়া দেখিলাম ভবিষ্যৎ তত অন্ধকারময় নহে। সঙ্কটের মুহূর্তে সম্যক্‌-ভাবে কার্য করিবার বাপুজীর এক আশ্চর্য কুশলতা আছে। আমার মতে যদিও তাহার যৌক্তিকতা নির্ধারণ অসম্ভব তথাপি এমনও হইতে পারে যে, তাঁহার কার্য এমন মহৎ ফল প্রসব করিবে যাহা ঐ নির্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপক ক্ষেত্রেও তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। যদি বাপুর মৃত্যুও হয় তাহা হইলেও আমাদের জাতীয় আন্দোলন চলিবে। অতএব যাহাই ঘটুক না কেন, প্রত্যেকেরই তাহার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এমন কি গান্ধিজীর যদি মৃত্যুও হয়, তাহা হইলেও পরাঙ্মুখ হইব না এই ভাবে মনকে প্রস্তুত করিলাম। আমি শান্তভাবে আত্মসম্বরণ করিয়া জগতের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

তারপর দেশব্যাপী বিরাট আলোড়নের সংবাদ আসিল, সমস্ত হিন্দু সমাজ যেন যাদুমন্ত্রে জাগিয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল যেন অস্পৃশ্যতার অন্তিমকাল উপস্থিত। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এরোডা জেলে উপবিষ্ট এই ক্ষীণ মানুষটি কি আশ্চর্য যাদুকর, কি নিপুণ ভাবে সূত্র আকর্ষণ করিয়া তিনি জনগণচিত্ত অভিভূত করিতেছেন।

তাঁহার নিকট হইতে আমি একখানি তার পাইলাম। আমার কারাদণ্ডের পর তাঁহার নিকট হইতে এই প্রথম সংবাদ আসিল। দীর্ঘকাল পরে তাঁহার এই তার পাইয়া সুখী হইলাম। তারে তিনি লিখিয়াছেন,—

"এই কয়দিনের যন্ত্রণার মধ্যেও তুমি আমার অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছ। তোমার মতামত জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। তোমার মত আমার নিকট কত মূল্যবান, তাহা তুমি জান। ইন্দু ও স্বরূপের ছেলেমেয়েদের সহিত দেখা হইয়াছে। ইন্দুকে বেশ সুখী মনে হইল, তাঁহার শরীরও একটু মোটা হইয়াছে। আমি ভালই আছি। তারে উত্তর দাও। ভালবাসা জানিও।"

ইহা অনন্যসাধারণ কিন্তু ইহাই তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। অনশনক্লেশে এবং অন্যান্য অনেক কাজের মধ্যেও তিনি আমার কন্যা ও ভাগিনের ভাগিনেয়ীদের সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এমন কি ইন্দিরা যে একটু মোটা হইয়াছে তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। (আমার ভগ্নীও তখন জেলে, এই সব ছেলে-মেয়েরা পুণার স্কুলে পড়িত।) জীবনের অতি ছোটখাট ব্যাপারও তিনি ভোলেন না এবং তাহা কত হৃদয়গ্রাহী!

নির্বাচন-প্রথা লইয়া আপোষ হইয়া গিয়াছে সে সংবাদও আসিল। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে গান্ধিজীর তারের উত্তর দিতে সম্মতি দিয়া যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন। আমি তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত তার করিলাম।

"আপনার তার এবং আপোষ হইয়া গিয়াছে এই সংবাদে আমি আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলাম। আপনার উপবাসের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া আমি মর্মাহত ও বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, অবশেষে আশার উপর নির্ভর করিয়া আমার মন শান্ত হইয়াছিল। নির্যাতিত পদ-দলিত শ্রেণীর জন্য কোন স্বার্থত্যাগই বড় নহে। স্বাধীনতাকে সর্বনিম্নতমের স্বাধীনতা দিয়াই বিচার করিতে হইবে কিন্তু অন্যান্য সমস্যায় আমাদের লক্ষ্য অস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে এই আশঙ্কা করিতেছি। ধর্মের দিক দিয়া বিচার করিতে আমি অক্ষম। আশঙ্কা হয়, আপনার প্রদর্শিত উপায়ের সুবিধা অপরে গ্রহণ করিবে; কিন্তু যাদুকরকে আমি কি উপদেশ দিব। প্রণাম জানিবেন।"

পুণায় সম্মিলিত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা একখানা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী অতি অস্বাভাবিক দ্রুততার সহিত তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। এবং তদনুসারে তাঁহারা বাঁটোয়ারার পরিবর্তন করিলেন। উপবাস ভঙ্গ হইল। এই শ্রেণীর চুক্তি ও আপোষ আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি; কিন্তু উহার বিষয়বস্তু বাদ দিয়াও পুণা-চুক্তি আমি গ্রহণ করিলাম।

উত্তেজনার অবসানে আমরা পুনরায় জেলের দৈনন্দিন কর্মধারার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। হরিজন আন্দোলন ও জেল হইতে গান্ধিজীর কার্যপদ্ধতির সংবাদ আমাদের নিকট আসিল; আমি এই ব্যাপারে সুখী হইলাম না। মন্দভাগ্য নির্যাতিত শ্রেণীর উন্নতি সাধন ও অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনে অপূর্ব শক্তি সঞ্চারিত হইল সন্দেহ নাই—ইহা চুক্তির ফল নহে, দেশব্যাপী উৎসাহের ফল। ইহাকে সাদরে গ্রহণ করাই কর্তব্য। কিন্তু ইহাও নিঃসন্দেহ যে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের অনিষ্ট হইল। দেশের দৃষ্টি বিষয়ান্তরে চলিয়া গেল এবং অনেক কংগ্রেসকর্মী হরিজন আন্দোলনে যোগ দিলেন। সম্ভবতঃ এই সকল ব্যক্তি নিরাপদ ক্ষেত্রে কাজ করিবার অছিলা খুঁজিতেছিলেন যাহাতে কারাগমন অথবা ততোধিক মন্দ যষ্টিপ্রহার ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ভয় নাই। ইহা স্বাভাবিক। সহস্র সহস্র কর্মী প্রত্যেকেই সর্বদা তীব্র দুঃখভোগ ও ভিটেমাটি উচ্ছন্ন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে, ইহা প্রত্যাশা করা অন্যায়। তথাপি আমাদের বিরাট আন্দোলনের এই ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা বড় বেদনাজনক। যাহা হউক, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে ১৯৩৩-এর মার্চ-এপ্রিলে কলিকাতা কংগ্রেসের মত দুঃসাহসিক ব্যাপার ঘটিত। গান্ধিজী তখন এরোডা জেলে, তাঁহাকে হরিজন আন্দোলন সম্পর্কে নির্দেশ দিবার এবং লোকজনের সহিত দেখা করিবার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, ইহার ফলে তাঁহার কারাগারে অবস্থিতিজনিত দেশের চিত্তবেদনা অনেকাংশে উপশমিত হইল। এই সকল দেখিয়া আমি বিরক্ত হইলাম।

কয়েক মাস পরে, ১৯৩৩-এর মে মাসে, গান্ধিজী তাঁহার একুশ দিন উপবাস আরম্ভ করিলেন। প্রথম সংবাদ পাইয়াই আমি প্নরায় মর্মাহত হইলাম কিন্তু আমি নিজেকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং অপরিহার্য ঘটনার মত ইহাকে গ্রহণ করিলাম। আমার নিকট এই শ্রেণীর উপবাস দ্র্বোধ্য ব্যাপার এবং সংকল্প গ্রহণের প্র্বে আমার মত জানিতে চাহিলে আমি নিশ্চয়ই দ্ঢ়তার সহিত ইহার বির্দ্ধে মত দিতাম। গান্ধিজীর বাক্যের কি ম্ল্য তাহা আমি জানি, তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করাইবার চেষ্টা আমার নিকট অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে হইল। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত ব্যাপারের গ্র্ত্ব তাঁহার নিকট অনেক বেশী। অতএব দ্ঃখবোধ করিলেও আমি ইহা সহ্য করিলাম।

উপবাস আরম্ভ করিবার কয়েকদিন প্র্বে তিনি আমার নিকট তাঁহার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে একখানি পত্র লিখিলেন, পত্র পাইয়া আমি অভিভূত হইলাম। তিনি আমার নিকট উত্তর চাহিয়াছিলেন বলিয়া আমি নিম্নলিখিত তার করিলাম।

আপনার পত্র পাইলাম। যে বিষয় আমি ব্ঝি না, সে সম্বন্ধে কি বলিব? আমি যেন কোন অজ্ঞাতদেশে হারাইয়া গিয়াছি যেখানে আপনিই একমাত্র পরিচিত স্থান, আর আমি অন্ধকারে হাতড়াইয়া অগ্রসর হইতেছি কিন্তু পদস্খলন হইতেছে। যাহাই ঘট্ক, আমার অন্রাগ ও চিন্তা আপনারই অভিম্খীন হইয়া রহিল।

একদিকে তাঁহার কার্যে আমার সম্প্র্ণ অসম্মতি অন্যদিকে তাঁহাকে আঘাত না করিবার অভিপ্রায়—আমার চিত্তে দ্বন্দ্ব বাধিল। যাহা হউক আমার মনে হইল আমি তাঁহাকে উৎসাহ দেই নাই; এখন তিনি যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ম্ত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে অতএব আমার সাধ্যমত তাঁহার সন্তোষ বিধান করাই কর্তব্য। সামান্য ব্যাপারেও মানসিক অবস্থার কত পরিবর্তন হয়, তাঁহাকে বাঁচিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। আমি আরও ভাবিলাম যাহাই ঘট্ক না কেন, দ্র্ভাগ্যক্রমে তাঁহার ম্ত্যু ঘটিলেও আমরা দ্ঢ়হ্দয়ে তাহা সহ্য করিব। অতএব, আমি তাঁহার নিকট আর একখানি তার করিলাম :—

আপনি এক্ষণে মহা পরীক্ষায় প্রব্ত্ত হইয়াছেন। আমি প্নরায় আপনার নিকট প্রেম ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি; আমি এখন স্পষ্টভাবে ব্ঝিতেছি, যাহাই ঘট্ক, তাহাতে কল্যাণই হইবে এবং আপনার জয় অবধারিত।

তিনি উপবাস কাটাইয়া উঠিলেন। উপবাসের প্রথম দিনেই তাঁহাকে কারাগার হইতে ম্ক্তি দেওয়া হইল এবং তাঁহার উপদেশে ছয় সপ্তাহের জন্য নির্পদ্রব প্রতিরোধনীতি বন্ধ রহিল।

প্নরায় অনশনকালে দেশব্যাপী ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল। আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইহা সম্যক উপায় কিনা। ইহা নিছক ধর্মোন্মাদনা এবং ইহার মধ্যে স্পষ্টভাবে চিন্তা প্রত্যাশা করা যায় না। সমস্ত ভারত অথবা অধিকাংশ ব্যক্তি ভক্তিভরে মহাত্মার দিকে অপলকে চাহিয়া রহিল এবং প্রত্যাশা করিতে লাগিল, তিনি অলৌকিক কার্যদ্বারা অস্প্শ্যতা দূর করিবেন, স্বরাজ লাভ করিবেন ইত্যাদি। গান্ধিজী অপরকে চিন্তা করিতে উৎসাহ দেন না, তিনি কেবল পবিত্রতা ও ত্যাগস্বীকার চাহেন। তাঁহার প্রতি আবেগময় আসক্তি সত্ত্বেও আমি অন্ভব করিলাম যে, আমি মানসিক দিক দিয়া তাঁহার নিকট

হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি। বহুবার তিনি অভ্রান্ত সহজাত বুদ্ধি লইয়া তাঁহার রাজনৈতিক কার্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহার কর্মে জ্বলন্ত উৎসাহ আছে কিন্তু বিশ্বাসের পথ কি জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার সত্যপথ? সাময়িক ভাবে ইহাতে সুফল হইলেও পরে কি হইবে?

হিংসা ও সংঘর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে তিনি কি করিয়া স্বীকার করেন আমি বুঝিতে পারি না। আমার মধ্যেও দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, দুই পৃথক আনুগত্যের দো-টানায় আমি ছিন্নভিন্ন হইতেছি। যখন স্কুলের এই বাধ্যতামূলক বাধা অপসারিত হইবে তখন আমাকে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বুঝিলাম। আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ ও গৃহহারা মনে করিতে লাগিলাম এবং এই ভারতবর্ষ, যাহাকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, যাহার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছি, তাহা আমার নিকট আশ্চর্য ও বিহ্বলকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমার স্বদেশবাসীর চিন্তা ও হৃদয়াবেগের মধ্যে আমি প্রবেশ করিতে পারি না, তাহা কি আমার দোষ? এমন কি আমার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের সহিতও এক অদৃশ্য ব্যবধান অনুভব করি; দুঃখের কথা, আমি তাহা অতিক্রম করিতে না পারিয়া নিজের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি। প্রাচীন জগৎ তাহার পুরাতন মতবাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাহাদিগকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। নবীন জগৎ এখনও বহুদূরে।

"দুইটি জগতের মধ্যে তাহার লক্ষ্যহীন ভ্রমণ; একটি মৃত, অপরটির জন্মলাভ করিবার শক্তি নাই, তাহার মাথা গুঁজিবার ঠাঁই কোথায়!"

কথিত হয়, ভারতবর্ষ সর্বোপরি ধর্মের দেশ। হিন্দু মুসলমান শিখ প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাসের গর্ব করিয়া থাকে এবং পরস্পরের মাথা ফাটাইয়া তাহা প্রমাণ করে। ধর্ম বলিতে যাহা দেখা যায়, অন্ততঃ প্রণালীবদ্ধ যে ধর্ম আমরা ভারতে ও অন্যান্য দেশে দেখি তাহা আমার নিকট বিভীষিকাপ্রদ। আমি প্রায়ই তাহার নিন্দা করি এবং উহা সমূলে উৎখাত করিবার ইচ্ছা হয়। সর্বত্রই ইহা অন্ধবিশ্বাস ও প্রতিক্রিয়াশীলতা, যুক্তিহীন মতবাদ ও গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও শোষণ এবং কায়েমী স্বার্থরক্ষার প্রশ্রয় দিয়া থাকে। তথাপি আমি জানি, ইহার মধ্যে এমন অতিরিক্ত কিছু আছে, যাহা মানবচিত্তের গভীর আবেগকে পরিতৃপ্ত করে। নতুবা ইহা সেই বিপুল শক্তি কোথায় পাইল যাহা লক্ষ লক্ষ আর্ত নরনারীকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়াছে? এই শান্তি কি আজ অন্ধবিশ্বাসের আবরণ, ইহা কি সংশয়সঙ্কুল প্রশ্নের অভাব অথবা ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্র হইতে নিরাপদ বন্দরে উত্তীর্ণ হইবার প্রশান্তি অথবা আরও কিছু বেশী? কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চয়ই কিছু বেশী।

কিন্তু প্রণালীবদ্ধ ধর্ম অতীতে যাহাই থাকুক না কেন বর্তমানে ইহা প্রাণহীন বাহ্য অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র। মিঃ জি. কে. চেস্টারটন ইহাকে (তাঁহার নিজস্ব মার্কামারা ধর্ম নহে, অপরের!) প্রাচীনযুগের প্রস্তরীভূত জীবদেহের সহিত তুলনা করিয়াছেন—যাহার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গাদি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার উপাদানে পূর্ণ হইয়া ইহা বাহ্য আকার বজায় রাখিয়াছে মাত্র। যদিও কোথাও কোন মূল্যবান কিছু থাকিয়া থাকে, তাহাও নানা অনিষ্টকর বস্তুর সহিত মিশ্রিত।

এই ব্যাপার কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য উভয় দেশের ধর্মেই ঘটিয়াছে। ইংলিশ চার্চ সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর ধর্মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় উহাতে তাহার কিছুই নাই। এই কথা অন্যান্য প্রণালীবদ্ধ প্রোটেস্টান্ট মত সম্বন্ধে

থাটে, কিন্তু চার্চ অফ্ ইংলন্ড আরও অগ্রসর হইয়াছে, কেন না দীর্ঘকাল যাবৎ ইহা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।*

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক উন্নত-চরিত্র ব্যক্তি আছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই চার্চ যে ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের উপর নৈতিক ও খৃষ্টানী আবরণ দিয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্রিটিশ লুণ্ঠন-নীতিকে ইহা উচ্চতম নৈতিক আদর্শের দিক হইতে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং ব্রিটিশ সর্বদাই ন্যায় কাজ করিতেছে, এই ধারণা জন্মাইয়া গিয়াছে। চার্চই এই শ্রেণীর চোস্ত ন্যায়পরায়ণ মনোভাবের জন্ম দিয়াছে, না, উহাই চার্চকে সম্ভব করিয়াছে, তাহা আমি জানি না। ইউরোপের অন্যান্য স্বল্প ভাগ্যবান জাতি এবং আমেরিকা প্রায়ই ইংলণ্ডকে ভণ্ডামির অপবাদ দিয়া থাকে; "বিশ্বাসঘাতক অ্যালবিয়ন" একটি অতি পুরাতন বিদ্রূপ, কিন্তু সম্ভবতঃ ব্রিটিশের সাফল্যে ঈর্ষা হইতেই এই শ্রেণীর অপবাদের উদ্ভব; অন্য কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও ইংলণ্ডের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে পারে না, কেন না তাহাদের নিজের কার্যাবলীও অনুরূপ গ্লানিজনক। এমন সচেতনভাবে ভণ্ডামি করিয়া কোন জাতিই অগাধ সঞ্চিত শক্তি লাভ করিতে পারে নাই, যাহা ব্রিটিশ পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিয়াছে। যে শ্রেণীর "ধর্ম" তাহারা অবলম্বন করিয়াছে, তাহা যেখানে নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্রব সেখানে তাহাদের নৈতিক অনুভূতিপ্রবণতা হ্রাসের সহায়ক হইয়াছে। ব্রিটিশ যাহা করিয়াছে, অন্যান্য দেশের লোক বা জাতি তদপেক্ষা অধিকতর মন্দ ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ব্রিটিশের ন্যায় নিজেদের লাভের চেষ্টাকে পুণ্যকর্ম বলিয়া অনুভব করিতে সক্ষম হয় নাই। আমরা সকলেই অতি সহজে পরের চোখে ধূলিকণা দেখাইয়া দিতে পারি, কিন্তু নিজেদের চোখের পর্বতও দেখিতে পাই না; কিন্তু ইহাতেও ব্রিটিশের জুড়ি নাই।†

---

* ভারতে চার্চ অফ্ ইংলন্ডের সহিত গভর্ণমেণ্টের পার্থক্য বুঝিবার উপায় নাই। সরকারী বেতনভোগী (ভারতের রাজস্ব হইতে) পাদ্রী পুরোহিতেরা উচ্চ কর্মচারীদের মতই সাম্রাজ্যের শক্তির প্রতীক। মোটের উপর, ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে চার্চ রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তি এবং সাধারণতঃ সমস্ত প্রকার উন্নতি ও সংস্কারের বিরোধী। মোটামুটি ভাবে পাদ্রীরা ভারতের অতীত ইতিহাস সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর ভাবেই অজ্ঞ, এবং উহা কি ছিল, বর্তমানে কি তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেন না। তাঁহারা হিদেনদের পাপ ও দোষ দেখাইতেই ব্যস্ত। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম আছে। চার্লি এনড্রুজ ভারতের একজন অকৃত্রিম বন্ধু, তাঁহার অপার প্রেম ও সেবার আগ্রহ সর্বদাই আনন্দদায়ক। পুণার খৃষ্টসেবা সঙ্ঘেও কতিপয় উন্নত-হৃদয় ইংরাজ রহিয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম সেবা, মুরুব্বীয়ানা নহে এবং তাঁহারা নিস্বার্থভাবে উচ্চপ্রবৃত্তি লইয়া ভারতবাসীর সেবা করিতেছেন। আরও অনেক ইংরাজ মিশনারির স্মৃতি ভারতের স্মৃতিভাণ্ডারে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

ক্যান্টারবেরীর আর্চ-বিশপ, ১৯৩৪-এর ১২ই ডিসেম্বর, লর্ড সভার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ১৯১৯-এর মণ্ট-ফোর্ড শাসনসংস্কারের ভূমিকা উল্লেখ করিয়া বলেন—অনেক সময় তাঁহার মনে হইয়াছে যে, ঐ মহান ঘোষণা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ক্ষিপ্রভাবে করা হইয়াছিল এবং যুদ্ধের পর উদারতা প্রকাশ করিবার আবেগের ফলে উহা ঘটিলেও, যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার করা যায় না। ইংলিশ চার্চের প্রধান কর্তা ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে এরূপ প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাহা ভারতীয় জনমতের নিকট অসম্পূর্ণ মনে হইয়াছিল এবং যাহার ফলে অসহযোগ আন্দোলন উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা আর্চ-বিশপের নিকট "অবিবেচনাপ্রসূত এবং উদার" বলিয়া মনে হইল। ইংরাজ শাসকদলের নিকট ইহা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ এবং ঐকান্তিকতার সহিত প্রকাশিত হইলেও বিদ্রোহের উদারতার জন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই এক আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিবেন।

† চার্চ অব ইংলন্ড কি অর্থে ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্রে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে,

প্রোটেস্টান্ট মতবাদ নিজেকে নূতন অবস্থায় উপযোগী করিবার জন্য প্রাচীন ও নবীন উভয়ের ভালগুলি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ঐহিক ব্যাপারে ইহা আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু ধর্মের দিক দিয়া ইহা ব্যর্থ হইয়াছে; প্রণালীবন্ধ ধর্মমত হিসাবে ইহা দো-টানায় পড়িয়া ক্রমশঃ ধর্মের পরিবর্তে ভাবপ্রবণতা এবং বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম এই দুর্ভাগ্য হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং প্রাচীন ভূমির উপরেই দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া আছে এবং যতদিন এই ভিত্তি থাকিবে, ততদিন ইহার বিনাশ নাই। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে ইহাই একমাত্র (সীমাবন্ধ অর্থে) জীবন্ত ধর্ম। একজন রোমান ক্যাথলিক বন্ধু আমার নিকট জেলে, ক্যাথলিক মত ও পোপের ধর্ম সম্বন্ধীয় পত্রাবলী সম্বন্ধে কতকগুলি বই পাঠাইয়াছিলেন, আমি সেগুলি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছি। পড়িতে পড়িতে আমি বুঝিতে পারিলাম, কেন বহুলোক ইহার অনুরক্ত। ইস্‌লাম ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্মের মতই ইহা সংশয় ও মানসিক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত করিয়া মানুষকে ভাবিবার জীবনের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেয়; ইহজীবনে যাহা জুটিল না, পরজন্মে তাহা পাওয়া যাইবে।

আমার আশঙ্কা হয়, এই প্রকার নিরাপদ বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব; আমি চাই উন্মুক্ত সমুদ্র, তরঙ্গসঙ্কুল, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ। মৃত্যুর পর কি ঘটে, সেই পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে আমার বিশেষ আগ্রহ নাই। এই জীবনের সমস্যাগুলিই আমার মনকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট। চীনের প্রাচীন পরম্পরাগত ধারা যাহা মূলতঃ নৈতিক অথচ ধর্মের সহিত সম্পর্কহীন কিম্বা আধ্যাত্মিক সংশয়বাদ, উহার প্রতি আমার আকর্ষণ আছে কিন্তু আমি উহা জীবনে প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নহি। "টাও"—অর্থাৎ পথ জানিতে হইবে—জীবনের পথ আমার ভাল লাগে, ইহাকে জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, ইহাকে ত্যাগ করিয়া নহে, গ্রহণ করিয়াই ইহাকে প্রতিষ্ঠা ও উন্নত করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী ইহজগতের সহিত সম্পর্কহীন। আমার মতে ইহা সুস্পষ্ট চিন্তার শত্রু বলিয়াই মনে হয়; নির্বিচারে কতকগুলি অপরিবর্তনীয় ও সুনির্দিষ্ট মত ও ধারণা স্বীকার করিয়া লওয়া এবং তদনুসারে ভাবাবেগ, মনের ও ইন্দ্রিয়ের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করার উপরেই ইহা প্রতিষ্ঠিত। আমি যাহাকে আধ্যাত্মিক বা আত্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করি, ইহা তাহা হইতে বহু দূর এবং ইহা ইচ্ছা করিয়াই বাস্তবকে অস্বীকার করিতে এবং এড়াইতে চাহে; ভয়, বাস্তব হয়ত ইহার পূর্বনির্দিষ্ট ধারণার বিরোধী হইবে। ইহা সঙ্কীর্ণ, পরমত অসহিষ্ণু, ইহা আত্মনিষ্ঠ ও আত্মকেন্দ্রী এবং স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদীরা সহজেই ইহাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইতে পারে।

ধার্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্চতম আধ্যাত্মিক বা নৈতিক জীবন ছিল না এবং নাই, আমি এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, পরলোকের মাপকাঠিতে বিচার না করিয়া যদি ইহজগতের মাপকাঠিতে নীতি ও

তাহার একটি দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আমার মনে আসিয়াছে। ১৯০৪-এর [illegible] মিঃ ই. ডি. [illegible]—খৃষ্টান হিসাবে [illegible] মার্কিন [illegible] দৃষ্টান্ত [illegible] খৃষ্টান [illegible]

আধ্যাত্মিকতার পরিমাপ করা যায়, তাহা হইলে ধর্মপ্রবণতা জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন সহায়তা করে না বরং বাধা দিয়া থাকে। ধর্ম সাধারণতঃ ঈশ্বর বা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্য অন্‌সন্ধান এবং ধার্মিক ব্যক্তি সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা নিজের মুক্তি লইয়াই ব্যস্ত। নৈতিক আদর্শের সহিত সামাজিক প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক নাই। উহা উচ্চাঙ্গের দার্শনিক পাপবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই প্রণালীবদ্ধ আন্‌ষ্ঠানিক ধর্ম স্বভাবতঃই কায়েমী স্বার্থরূপে পরিণত হয় এবং অনিবার্যরূপে সমস্ত প্রকার পরিবর্তন ও উন্নতির বিরুদ্ধ শক্তিরূপে কার্য করিয়া থাকে।

খৃষ্টান চার্চ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ক্রীতদাসদের সামাজিক উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই, ইহা সর্বজনবিদিত। অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যই মধ্যযুগে ইউরোপে ক্রীতদাসেরা সমস্ত জমিদারদের ভূমিদাসে পরিণত হইয়াছিল। দুইশত বৎসর পূর্বেও (১৭২৭ সালে) চার্চের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দক্ষিণ আমেরিকার ঔপনিবেশিক ক্রীতদাসদের মালিকদের নিকট লণ্ডনের বিশপ কর্তৃক লিখিত একখানি পত্রে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।*

বিশপ লিখিয়াছিলেন, "খৃষ্টধর্ম অথবা খৃষ্টশিষ্যগণ-রচিত সর্বগ্রাসী সুসমাচার লৌকিক সম্পত্তি এবং লৌকিক সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত কর্তব্যের কোন পরিবর্তন করিতে চাহে না; এসকল বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব স্ব রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নিয়মাধীন। খৃষ্টধর্ম যে স্বাধীনতার কথা বলে, সে স্বাধীনতা পাপ ও শয়তানের কবল হইতে মুক্তি, কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম ও অপরিমিত কামনা হইতে মুক্তি, কিন্তু তাহাদের বাহ্য অবস্থা যাহাই হউক—দাসই হউক আর স্বাধীনই হউক, ব্যাপ্তাইজ হইয়া খৃষ্টান হইলেও তাহার কোন পরিবর্তনই হইবে না।"

কোন প্রণালীবদ্ধ ধর্মই আজকাল এতটা খোলাখুলিভাবে অভিমত প্রকাশ করিবে না, কিন্তু মূলতঃ সম্পত্তি ও প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে ইহার ধারণা পূর্বের মতই আছে।

শব্দ দ্বারা মনোভাব গোপন করিবার উপায় অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং একই কথা বিভিন্ন ব্যক্তি নানাভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু "রিলিজ্যান্" এই শব্দটিকে বিভিন্ন ব্যক্তি যত বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সম্ভবতঃ আর কোন শব্দের এরূপ বিবিধ ব্যাখ্যা সম্ভব হয় নাই (রিলিজান্ শব্দের অন্যান্য ভাষার প্রতিশব্দ ইহার সহিত বুঝিতে হইবে)। ধর্ম এই শব্দটি শুনিলে অথবা পাঠ করিলে মনে যে সকল ভাবমূর্তির উদয় হয়, হয়ত কোন দুই ব্যক্তির ধারণা সেই সম্বন্ধে এক হইবে না। এই সকল ধারণা ও মূর্তির মধ্যে আচার, অনুষ্ঠান, ধর্মপুস্তক, জনসমাবেশ, কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ মতবাদ, নৈতিক ধারণা, ভক্তি, ভালবাসা, ভয়, ঘৃণা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ত্যাগস্বীকার, কঠোর তপস্যা, উপবাস, ভোজ, প্রার্থনা, প্রাচীন ইতিহাস, বিবাহ, মৃত্যু, পরলোক, দাঙ্গা, মাথা কাটাকাটি এইরূপ কত কি আছে। এই সকল বহুতর বিমিশ্র ভাবমূর্তি ও ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিলেও ধর্মের মধ্যে এমন এক তীব্র ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে, যাহার ফলে নিরপেক্ষভাবে কোন বিষয় বিচার করা অসম্ভব। ধর্ম শব্দ তাহার মূল অর্থ (যদি কিছু থাকিয়া থাকে) হারাইয়া ফেলিয়াছে। এখন ইহাতে কেবল চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হয় এবং

---

* এই পত্রখানি জেরাল্ড হেয়ার্ডের "[illegible]" নামক মূল-পত্র ও [illegible] পুস্তক (১৭৮৫ খৃঃ) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রায়শঃই পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা লইয়া তর্ক ও আলোচনা হইয়া থাকে। যদি এই শব্দটি একেবারে বর্জন করিয়া, সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা যায় এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা যাইত, তাহা হইলে অনেক ভাল হইত, যথা—আস্তিক্যবাদ, দর্শন, নীতি, লোকব্যবহার, আধ্যাত্মিকতা, তত্ত্ববিজ্ঞান, কর্তব্য, পর্বোৎসব ইত্যাদি। এই সকল শব্দের মধ্যেও অস্পষ্টতা আছে বটে, তাহা হইলেও ইহাদের অর্থ সীমাবদ্ধ "ধর্মের" মত ব্যাপক নহে। এই সকল শব্দের প্রধান সুবিধা এই যে, এইগুলি ধর্মশব্দের ন্যায় ভাবাবেগ ও অনুমানের দ্বারা ততটা আচ্ছন্ন হয় না।

তাহা হইলে ধর্ম কি (অসুবিধা সত্ত্বেও এই শব্দটিই ব্যবহার করিতে হইতেছে)? সম্ভবতঃ ইহা ব্যক্তির অন্তঃপ্রকৃতির পরিপুষ্টি এবং তাহার আত্মচেতনাকে বিকশিত করিয়া কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। এই কল্যাণের পথ কি তাহাও তর্কের বিষয়। কিন্তু আমি যতদূর বুঝিয়াছি, ধর্ম এই অন্তঃপ্রকৃতির বিকাশের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে, বাহিরের পরিবর্তন উহারই বাহ্যবিকাশ মাত্র। অন্তঃপ্রকৃতির এই বিকাশ বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরও প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অন্তঃপ্রকৃতির বিকাশকে অনুরূপ প্রভাবান্বিত করে। উভয়েই পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে। আধুনিক পাশ্চাত্য যন্ত্রবিজ্ঞানের ফলে বাহ্য উন্নতি, আত্মোন্নতিকে বহুদূরে ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছে, ইহা একটি পুরাতন কথা। কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না যে (প্রাচ্যে অনেকে এইরূপ ভাবিয়া থাকেন), যেহেতু আমাদের বাহ্য উন্নতি অতি ধীরে ধীরে হইতেছে, সেইজন্য আমাদের আত্মোন্নতি অনেক বেশী। এই শ্রেণীর ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা আমরা সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করি এবং নিজেদের হীনতাবোধ ঢাকিতে চাই। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিবিশেষ হয়ত আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারেন। কিন্তু বহুলোক বা জাতির পক্ষে কতকাংশে বাহ্য অবস্থার উন্নতি না হইলে মানসিক সমুন্নতি সম্ভবপর নহে। যে ব্যক্তি আর্থিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাস, জীবন-সংগ্রামের মধ্যে যাহার শক্তি সীমাবদ্ধ ও অবরুদ্ধ, তাহার পক্ষে উচ্চাঙ্গের আত্মোন্নতি সাধন প্রায় অসম্ভব। পদদলিত ও শোষিত শ্রেণী কখনও মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। যে জাতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরাধীন, যাহাদের গতি সীমাবদ্ধ, সঙ্কুচিত, যাহারা শোষিত তাহারা কখনও আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারে না। অতএব আত্মোন্নতি করিতে হইলেও স্বাধীনতা ও অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন। বাহ্য স্বাধীনতা লাভ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিবর্তনের চেষ্টার জন্য এমন উপায় অবলম্বন করা উচিত, যাহা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের অপহ্নব ঘটাইবে না। আমার মনে হয়, গান্ধিজী যখন বলেন উদ্দেশ্য অপেক্ষা উপায়ের গুরুত্ব অনেক বেশী, তখন তাঁহার মনে হয়ত ঐ শ্রেণীর ধারণা থাকে। কিন্তু উপায় এমন হওয়া উচিত, যাহা আমাদিগকে শেষ পর্যন্ত লইয়া যাইবে, অন্যথা বৃথা শক্তিক্ষয় হইবে এবং এমন কি ভিতরে বাহিরে অধিকতর অধঃপতন হইতে পারে।

গান্ধিজী কোন এক স্থানে লিখিয়াছেন, "ধর্ম ছাড়া কেহই বাঁচিতে পারে না। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা অহঙ্কারের সহিত ঘোষণা করেন, ধর্মের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি কেহ বলে যে, নিঃশ্বাস লয় অথচ তাহার নাক নাই, ইহা সেই শ্রেণীর কথা।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "আমার সত্যানুরাগই আমাকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছে; যাঁহারা বলেন যে, ধর্মের সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই, তাঁহাদিগকে আমি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিতে

সহিত বলিব, তাঁহারা ধর্ম কি তাহা বুঝেন না।" সম্ভবতঃ এই কথা বলিলে অধিকতর সত্য হইত যদি তিনি বলিতেন, যে সকল ব্যক্তি জীবন ও রাজনীতি হইতে ধর্মকে পৃথক করিয়া রাখিতে চাহে, তাহারা "ধর্ম" বলিতে যাহা বুঝে, তাহা তাঁহার ধারণা হইতে স্বতন্ত্র। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি উহা যে-অর্থে ব্যবহার করেন—সম্ভবতঃ অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর নৈতিক অর্থে—তাহা ধর্মের সমালোচকগণের ধারণা হইতে পৃথক। এই ভাবে একই শব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিলে পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া অধিকতর কঠিন হইয়া উঠে।

অধ্যাপক জন ডেওয়ে ধর্মের যে অতি-আধুনিক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, ধার্মিকেরা তাহার সহিত নিশ্চয়ই একমত হইবেন না। তাঁহার মতে, "যাহা দৃশ্যমান জগতের বিক্ষিপ্ত ও গতিশীল ঘটনাপ্রবাহকে এক নির্দিষ্ট স্থিরভূমি হইতে সম্যকরূপে পরিপ্রেক্ষণের সহায়তা করে" তাহাই ধর্ম। অথবা অন্যত্র তিনি বলিতেছেন,—"অথবা কোন আদর্শ সিদ্ধির জন্য সমস্ত প্রকার বাধার বিরুদ্ধে কর্ম করা, ভীতিপ্রদর্শন অথবা ব্যক্তিগত ক্ষতি সত্ত্বেও উহার সর্বজনীন ও অবিনশ্বর কল্যাণের উপর আস্থা রাখাই ধর্মের লক্ষণ।" ইহাই যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কেহ বিন্দুমাত্র আপত্তি করিবেন না।

রোম্যাঁ রোল্যাঁ ধর্মের অর্থ যে ভাবে প্রসারিত করিয়াছেন তাহাতে সম্ভবতঃ আনুষ্ঠানিক ধর্মের গোঁড়ারা ভয় পাইবেন। তিনি "শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী"তে বলিতেছেন,—

"............এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা সমস্ত প্রকার ধর্মবিশ্বাস হইতে মুক্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা অতিমাত্রায় যুক্তিপন্থী আত্মচেতনার এক প্রকার অবস্থার মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। ইহাকে তাঁহারা সমাজ-তন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ, মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, এমন কি যুক্তিবাদও বলেন। বিষয়বস্তু দেখিয়া নহে, চিন্তার প্রকৃতি দেখিয়াই আমরা উহার উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করি এবং উহা ধর্মভাব হইতে উদ্ভূত কিনা বিচার করি। যদি দেখা যায় যে, ইহা সর্বস্বপণ করিয়া নির্ভীকভাবে সত্য অনুসন্ধান করিতেছে, একাগ্রচিত্তে অকৃত্রিম বিশ্বাস লইয়া যে কোন আত্মত্যাগে প্রস্তুত, আমি তাহাকেই ধর্ম বলিব। কেন না, মানুষের উদ্যমের উপর পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট এক দৃঢ় বিশ্বাস হইতে বিদ্যমান, যাহা প্রচলিত সমাজ-জীবন এমন কি মানবের সমষ্টি জীবন হইতেও উন্নততর, এমন কি, সংশয়বাদও যখন আপনাতে আপনি অটল শক্তিশালী চরিত্র হইতে উত্থিত হয়, তখন তাহা দুর্বলতা নহে, শক্তিরই পরিচায়ক; তখন সে ধর্মপ্রাণ আত্মার মহান সৈন্যদলের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়াই চলে।"

রোম্যাঁ রোল্যাঁ যে সকল নিয়ম ও পণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমি সেগুলি পূরণ করিতে পারিব এমন ভরসা রাখি না, তবে ঐ সর্তে আমিও সেই মহান সৈন্যদলের একজন অনুচর হইতে প্রস্তুত।

৪৮

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দ্বৈতনীতি

প্রথমে এরোডা জেল হইতে, পরে বাহির হইতে, গান্ধিজীর নির্দেশে হরিজন আন্দোলন চলিতে লাগিল। মন্দির-প্রবেশের বাধা অপসারিত করিবার জন্য তীব্র আন্দোলন চলিতে লাগিল, ঐ মর্মে ব্যবস্থা-পরিষদে এক আইনের পাণ্ডুলিপিও উপস্থাপিত হইল। এই সময় এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, কংগ্রেসের একজন প্রধান নেতা দিল্লীতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন এবং মন্দির-প্রবেশ-বিলের অনুকূলে ভোট দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গান্ধিজী নিজেও তাঁহার মারফতে সদস্যদিগের নিকট এক অনুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন। এদিকে কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে, আমাদের লোকেরা জেলে যাইতেছে এবং কংগ্রেস ব্যবস্থা-পরিষদ বয়কট করিয়াছে, কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যগণ উহা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বাকবাকী যে কয়জন অপদার্থ রহিয়া গেলেন এবং যাঁহারা আসিয়া শূন্যস্থান পূরণ করিলেন, তাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধিতা এবং গভর্ণমেন্টকে সমর্থন করিয়া সেই সঙ্কটের দিনে বেশ খ্যাতিমান হইয়া উঠিলেন। অধিকাংশ সদস্য অর্ডিন্যান্সের ধারাসম্বলিত দমননীতিমূলক আইন প্রণয়ন ও পাশ করাইতে গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করিলেন। তাঁহারা ওটাওয়া চুক্তি নিঃশব্দে গিলিয়া ফেলিলেন; দিল্লী, সিমলা ও লণ্ডনে বড় বড় লোকের সহিত খানাপিনা ও আনন্দ-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গুণগান করিতে লাগিলেন; এবং ভারতে "দ্বৈতনীতির" সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থার মধ্যে গান্ধিজীর আবেদন এবং কয়েক সপ্তাহ পূর্বেও যিনি কংগ্রেসের অস্থায়ী স্বজাভিষিক্ত সভাপতি ছিলেন সেই রাজাগোপালাচারীর কর্ম-তৎপরতায় আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলাম। ইহাতে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতির নিশ্চয়ই ক্ষতি হইল,—কিন্তু আমি ইহার নৈতিক দিক চিন্তা করিয়া অধিকতর মর্মাহত হইলাম। গান্ধিজী এবং যে কোনও কংগ্রেস নেতার এই শ্রেণীর আচরণ আমার নিকট অ-নৈতিক এবং যাহারা কারাগারে আছে অথবা সংগ্রাম চালাইতেছে, তাহাদের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের মত মনে হইল। কিন্তু আমি জানি যে, গান্ধিজীর বিচার করিবার প্রণালী স্বতন্ত্র।

মন্দির-প্রবেশ-বিলের প্রতি গভর্ণমেন্টের মনোভাব তৎকালীন ও পরবর্তী ঘটনায় অতি আশ্চর্যরূপে উদ্ঘাটিত হইল। তাঁহারা বিলের সমর্থকদের পথে যথাসম্ভব বাধা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, স্থগিত রাখিতে লাগিলেন। বাধাদান-কারীদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহারাও প্রকাশ্য ভাবে বিরোধিতা করিয়া বিলটির মৃত্যু ঘটাইলেন। ভারতে সমাজ-সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার প্রতি তাঁহাদের মনোভাব অল্পবিস্তর এইরূপই; ধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতার অছিলা লইয়া গভর্ণমেন্ট সামাজিক উন্নতিতে বাধা দেন। তবে ইহা বলা বাহুল্য যে, ইহাতে আমাদের সামাজিক দোষত্রুটির সমালোচনা করিতে বা অপরকে ঐরূপ সমালোচনায় উৎসাহ দিতে তাঁহাদের বাধে না। এক অপ্রত্যাশিত সুযোগে বাল্য-বিবাহ নিরোধ বা শারদা বিল আইনে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু এই অসফল আইনের পরবর্তী ইতিহাস দেখাইয়া দিল যে, উহা প্রয়োগ করিতে গভর্ণমেন্ট কত অনিচ্ছুক। যে গভর্ণমেন্ট রাতারাতি অর্ডিন্যান্স সৃষ্টি করিতে পারেন, অভিনব

অপরাধ সৃষ্টি করিতে পারেন; উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া শাস্তি দিতে পারেন, তাঁহাদের নিজেদের সৃষ্ট অপরাধের জন্য হাজার হাজার ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইতে পারেন, সেই গভর্ণমেণ্টই শারদা আইনের মত বিধিবদ্ধ আইন প্রয়োগ করিতে ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িলেন। এই আইনের প্রথম ফল হইল এই যে, যাহা নিবারণ করা ইহার উদ্দেশ্য, লোকে তাহাই করিতে লাগিল,—অর্থাৎ বাল্য-বিবাহের ধূম পড়িয়া গেল। আইন পাশ হওয়ার ছয় মাস পর ইহা বলবৎ হইবে, এই নির্বোধ সিদ্ধান্তই উহার জন্য দায়ী। তাহার পর দেখা গেল, এই আইন একটা পরিহাস মাত্র, অতি সহজেই ইহাকে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে, গভর্ণমেণ্ট কিছুই করেন না। সরকারী ভাবে প্রচারকার্যের কোন ব্যবস্থাও করা হয় নাই,—পল্লী অঞ্চলের লোকেরা এই আইন যে কি, তাহা জানে না। তাহারা হিন্দু ও মুসলমান প্রচারকদের নিকট এক বিকৃত বিবরণ শুনিয়াছে মাত্র এবং ঐ প্রচারকেরাও আইনের ধারাগুলি জানেন না।

ভারতের সামাজিক অন্যায়গুলির প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আশ্চর্য সহিষ্ণুতার কারণ যে ঐগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব নহে, ইহা অবশ্যই স্বতঃসিদ্ধ। তবে ইহা সত্য যে, ঐগুলি দূর করিবার জন্য তাঁহাদের কোন আগ্রহ নাই, কেন না ঐ সকল অন্যায়ের ফলে ভারতে তাঁহাদের শাসনকার্য অথবা তাহার ধনসম্পদের সদ্ব্যবহার করিবার কোনও বিঘ্ন হয় না। সমাজ-সংস্কারের প্রস্তাবের ফলে নানা শ্রেণীর লোকের বিরক্তির সম্ভাবনাও রহিয়াছে; রাজনীতিক্ষেত্রে ক্রোধ ও বিরক্তির অসদ্ভাব নাই, তাহার উপর আরও বিরক্তি ও দুশ্চিন্তার কারণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বৃদ্ধি করিতে চাহেন না। কিন্তু সমাজ-সংস্কারকের দৃষ্টিতে কালক্রমে এই অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, ব্রিটিশগণ ক্রমে ক্রমে ঐ সকল অন্যায়ের মৌন রক্ষক হইয়া উঠিতেছেন। ইহা তাঁহাদের ভারতে প্রগতিবিরোধী ব্যক্তিদের সহিত অতি ঘনিষ্ঠতার ফল। তাঁহাদের শাসনের প্রতি বিরুদ্ধতার ফলে তাঁহারা অতি আশ্চর্য মিত্রদের সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং বর্তমানে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান সমর্থক হইলেন, অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী, ধর্মান্ধ প্রগতিবিরোধী এবং সংস্কারবিরোধী ব্যক্তিগণ। মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ, সকলদিক দিয়াই অতি কুৎসিতভাবে প্রগতিবিরোধী। হিন্দু মহাসভা ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী; কিন্তু পশ্চাদ্দিকে গমনের দৌড়ের পাল্লায় সনাতনীরা তাঁহাদিগকে হারাইয়া দিয়াছেন,—সনাতনীরা চরমতম ধর্মান্ধ সংস্কার-বিরোধিতা উৎসাহের সহিত ঘোষণা করিয়া তাহার সহিত ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য একত্র মিলাইয়া লইয়াছেন।

যদি গভর্ণমেণ্ট নীরব থাকিয়া শারদা-আইনকে জনপ্রিয় করিতে যা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস ও অন্যান্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলি উহার অনুকূলে প্রচারকার্য করে না কেন? এই প্রশ্ন ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশী সমালোচকেরা তুলিয়া থাকেন। কংগ্রেসের পক্ষে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ইহা গত পনর বৎসর ধরিয়া—বিশেষভাবে ১৯০০ সাল হইতে—ব্রিটিশ শাসকগণের সহিত জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অতি তীব্র জীবনমরণ-সংঘর্ষে লিপ্ত রহিয়াছে; অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কোন শক্তিও নাই, জনসাধারণের সহিত যোগও নাই। আদর্শবাদী ও চরিত্রবান নরনারী, যাঁহাদের জনসাধারণের উপর প্রভাব আছে, তাঁহারা কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশ সময়ই ব্রিটিশ জেলে থাকিতে হয়।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণের সংস্পর্শের ভয়ে ভীত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের

লইয়া প্রস্তাব পাশ করা ছাড়া আর বেশী অগ্রসর হন না। তাঁহারা অভিজাত ভদ্র-ব্যক্তির মত, অথবা নিখিল ভারত মহিলা-সম্মেলনের মাননীয়া মহিলাদের মত কাজ করেন—আক্রমণশীল প্রচারকার্য তাঁহাদের ধাতে সহে না। ইহা ছাড়া অর্ডিন্যান্স ও অনুরূপ আইনদ্বারা সাধারণ কার্যপ্রণালী তীব্রভাবে দমনের ব্যবস্থার মধ্যেও তাঁহারা পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিলেন। সামরিক আইন বৈপ্লবিক কার্যপদ্ধতি ধ্বংস করিতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহা সভ্যতা ও তদানুষঙ্গিক কার্যপ্রণালীও পঙ্গু করিয়া ফেলে।

কিন্তু কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি যে সমাজসংস্কারমূলক কার্য করিতে পারেন না, তাহার কারণ আরও গভীর। আমরা জাতীয়তাবাদরূপ ব্যাধিগ্রস্ত, এবং উহার প্রতিই আমাদের সমস্ত লক্ষ্য নিবিষ্ট থাকে। যতদিন পর্যন্ত না আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতেছি, ততদিন এইরূপই চলিবে। যেমন বার্ণাড শ বলিয়াছেন—"বিজিত-জাতি, দুষিত ক্ষত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মত, সে অন্য কিছু ভাবিতে পারে না। কোন জাতির পক্ষে জাতীয় আন্দোলনের মত অধিকতর অভিশাপ কিছু নাই। স্বাভাবিক কাজকর্ম বলপূর্বক দাবাইয়া রাখিলে যাহা হয়, উহা সেই তীব্র যন্ত্রণার পরিস্ফুট লক্ষণ। বিজিত জাতিরা জগতের যাত্রাপথে স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিতে পারে না, কেন না, জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধার করিয়া জাতীয় আন্দোলনের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই।"

অতীত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা ইহাই দেখিয়াছি যে, নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে কতকগুলি হস্তান্তরিত বিভাগ থাকা সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে সমাজসংস্কার-মূলক কার্য অতি অল্পই সম্ভব। গভর্নমেণ্টের বিপুল আড়ম্বর অবস্থা সর্বদাই রক্ষণশীলদের সহায়ক এবং অতীতে কয়েক পুরুষ ধরিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত কর্মস্পৃহা একেবারে ধ্বংস করিয়াছেন এবং পীড়নমূলক অথবা পিতৃ-বাৎসল্যের নীতি লইয়া শাসন করিয়াছেন, ইহা তাঁহারাই বলেন। ব্যাপকভাবে বে-সরকারী কোন সুব্যবস্থ উদ্যম তাঁহারা পছন্দ করেন না এবং উহার গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে এরূপ সন্দেহ করেন। কর্মীদের যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও হরিজন আন্দোলনেও শাসকদের সহিত সংঘর্ষ হইয়াছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, কংগ্রেস যদি অধিকতর সাবধান ব্যবহার করিবার জন্য কোন দেশব্যাপী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও অনেকস্থলে গভর্নমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ হইবে।

আমার মতে রাষ্ট্র দায়িত্ব গ্রহণ করিলে জনসাধারণকে সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত করান বেশী কঠিন নহে। কিন্তু বিদেশী শাসকগণ সর্বদাই সন্দেহাতুর, জন-সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে তাঁহারা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন না; যদি বিদেশী শাসকদলকে সরাইয়া অর্থনৈতিক উন্নতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে উৎসাহী ও শক্তিশালী শাসনপদ্ধতি দ্বারা সহজেই স্থায়ী ও দূরপ্রসারী সমাজসংস্কারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, জেলে আমরা সমাজসংস্কার, শারদা-আইন অথবা হরিজন আন্দোলন লইয়া মাথা ঘামাইতাম না। তবে হরিজন আন্দোলনের উপর আমি একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম, কেন না, ইহা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছিল। ১৯৩৩-এর মে মাসের প্রথম ভাগে ছয় সপ্তাহের জন্য নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন স্থগিত হইল এবং আমরা পরবর্তী খবরের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম। এই স্থগিত রাখায় আন্দোলনের উপর নির্মম খাঁড়ার ঘা পড়িল, কেন না জাতীয় সংঘর্ষ লইয়া এমন খেলা ও চালনা চলে না।

কেহ ইচ্ছামত ইহাকে বন্ধ বা পরিচালনা করিতে পারে না। এমন কি স্থগিত রাখার পূর্বেই এই আন্দোলনের পরিচালনা বিশেষভাবে দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অতি তুচ্ছ পরামর্শ-সভা হইত এবং এমন সমস্ত গুজব রটিত, যাহা আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কংগ্রেসের কয়েকজন স্থলাভিষিক্ত সভাপতি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক আন্দোলনের সেনাপতি-পদে তাঁহাদের নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা যে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এরূপ ইঙ্গিতের অভাব ছিল না। এবং অসুবিধাজনক অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও ছিল। উপরের দিকে এই অনিশ্চিত সংশয় ও অব্যবস্থিত-চিত্ততার বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগ্রত হইল, কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি বে-আইনী বলিয়া তাহা যথাযথভাবে প্রকাশিত হইতে পারিল না।

ইহার পরে গান্ধিজীর একুশ দিন উপবাস, কারামুক্তি এবং ছয় সপ্তাহের জন্য নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন স্থগিত হইল। উপবাস শেষ হইল, তিনি ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। জুন মাসের মধ্যভাগে আন্দোলন স্থগিত রাখার মেয়াদ আরও ছয় সপ্তাহ বাড়াইয়া দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্ট কোন দিক দিয়াই দমননীতি শিথিল করেন নাই। আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীরা (বাঙলার হিংসামূলক অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিরা তথায় প্রেরিত হইয়াছিল) দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করিল, তাহাদের মধ্যে একজন কি দুইজনের মৃত্যু হইল—অনশনে প্রাণত্যাগ করিল। অনেকে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভারতে আন্দামানের ব্যাপার লইয়া যাঁহারা জনসভায় বক্তৃতা করিলেন, তাঁহারা ধরা পড়িয়া কারাদণ্ড লাভ করিলেন। আমরা যে কেবল সহ্য করিব তাহা নহে, প্রতিবাদও করিতে পারিব না; এমন কি প্রতিকারের অন্য পথ না পাইয়া অনশনের ভয়াবহ দুঃখ বরণ করিয়া বন্দীরা যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবুও নহে।

কয়েকমাস পরে ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে (তখন আমি জেলের বাহিরে) একখানি আবেদনপত্র প্রচারিত হইল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি. এফ. এনড্রুজ এবং কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এমন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। ইহাতে আন্দামানের বন্দীদের প্রতি অধিকতর মানবোচিত ব্যবহার এবং তাহাদিগকে ভারতীয় জেলে বদলী করিবার আবেদন ছিল। ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিব এই বিবৃতির প্রতি তাঁহার গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং বন্দীদের প্রতি সহানুভূতির জন্য স্বাক্ষরকারীদের তীব্র সমালোচনা করিলেন। পরে, আমার যতদূর স্মরণ হয়, এই শ্রেণীর সহানুভূতি প্রকাশ বাঙলাদেশে দণ্ড-যোগ্য অপরাধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত রাখিবার দ্বিতীয় ছয় সপ্তাহ শেষ হইবার পূর্বেই দেরাদুন জেলে আমরা সংবাদ পাইলাম, গান্ধিজী পুনরায় একটি ঘরোয়া বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। দুই তিন শত ব্যক্তি সেখানে একত্রিত হইলেন এবং গান্ধিজীর নির্দেশে, সর্বজনীন ভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত করিয়া ব্যক্তিগত আইন অমান্যের অনুমতি দেওয়া হইল এবং সর্বপ্রকার গুপ্ত উপায় নিষিদ্ধ হইল। এই সিদ্ধান্ত এমন কিছু নবীন আশার উদ্দীপক নহে; কিন্তু আমি এই ব্যাপারে বিশেষ কোন আপত্তি করিলাম না। সর্বজনীন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত করার অর্থ, বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লওয়া, কেন না প্রকৃত প্রস্তাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ তখন জনসাধারণের আন্দোলন ছিল না। গুপ্তভাবে কাজ করাটা কেবল আমরা যে কাজ করিতেছি তাহার [illegible] পর্যবসিত

হইয়াছিল এবং ইহাতে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দৌর্বল্য প্রকাশিত হইত।

পুণার আলোচনায় আমাদের বর্তমান অবস্থা ও আমাদের লক্ষ্যের বিষয় আলোচনার অভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। প্রায় দুই বৎসর তীব্র সংঘর্ষ ও দমননীতির পর কংগ্রেসপন্থীরা একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, এই সময়ের মধ্যে ভারতে এবং বৃহত্তর জগতে কত-কিছু ঘটিয়াছে; শাসনতন্ত্র-সংস্কারে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব-সমন্বিত "হোয়াইট পেপার"ও প্রকাশিত হইয়াছে। এইকালে আমাদিগকে বলপূর্বক নিস্তব্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল; অন্যদিকে মূল বিষয়গুলিকে অস্পষ্ট করিবার জন্য অবিরত বিকৃত প্রচারকর্ম চলিতেছিল। গভর্ণমেণ্টের সমর্থকগণ তো বটেই, লিবারেল ও অন্যান্য অনেকে প্রায়ই বলিতে লাগিলেন যে, কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়াছে। আমার মতে অন্ততঃ আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের উপর অধিকতর জোর দিয়া তাহা পুনরায় স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা উচিত ছিল এবং সম্ভব হইলে উহার সহিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যগুলি প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহার পরিবর্তে আলোচনা—ব্যক্তিগত না সর্বজনীন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ, গুপ্তভাবে না ব্যক্তভাবে—ইহাতেই সীমাবদ্ধ রহিল। গভর্ণমেণ্টের সহিত "শান্তি" স্থাপনের অদ্ভুত প্রস্তাবও সেখানে উঠিয়াছিল। আমার যতদূর স্মরণ হয়, গান্ধিজী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া তার করিলেন, বড়লাট উত্তর দিলেন,—"না" এবং গান্ধিজী তাহার পরেও দ্বিতীয় তারে "সম্মানজনক শান্তি" সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করিলেন। যখন গভর্ণমেণ্ট বিজয়-গর্বে সর্বতোভাবে জাতিকে দাবাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, যখন মানুষ আন্দামানে অনশনে দেহত্যাগ করিতেছে, তখন চিত্তহারী শান্তির জন্য লালায়িত হইলেও তাহা কোথায় মিলিবে? কিন্তু আমি জানিতাম যে, সর্বদাই শান্তির জন্য প্রস্তুত থাকা গান্ধিজীর স্বভাব।

দমন-নীতি পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল, জনসাধারণের স্বাধীন কার্য বন্ধ করিবার জন্য রচিত বিশেষ আইনগুলি কার্যকরী রহিল। এমন কি, ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসে আমার পিতার মৃত্যুবার্ষিকী স্মৃতিসভাও পুলিশ বন্ধ করিয়া দিল; যদিও এই সভা অ-কংগ্রেসীয় ব্যক্তিরাই ডাকিয়াছিলেন এবং স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রুর মত একজন বিশিষ্ট মডারেট ইহার সভাপতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। এবং ভবিষ্যতের অনুগ্রহ কিরূপ হইবে, তাহা কল্পনা করিবার জন্য আমাদিগকে 'হোয়াইট পেপার' উপহার দেওয়া হইল।

ইহা এক অপূর্ব দলিল,—পড়িতে গেলেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসে। ভারতকে এক পরিবারর ভারতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা হইবে, সেই যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যের সামন্ত প্রতিনিধিগণ আসিয়া মুরুব্বীয়ানা করিবেন। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির উপর বাহির হইতে কোনও হস্তক্ষেপ সহ্য করা হইবে না, সেখানে খাঁটি স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রবর্তিত থাকিবে। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত শৃঙ্খল—স্বর্ণ-শৃঙ্খল—আমাদিগকে চিরদিন লণ্ডন নগরীর সহিত বাঁধিয়া রাখিবে এবং ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে আমাদের মুদ্রানীতি ও বিনিময় দরের হার নিয়ন্ত্রণ করিবে। সমস্ত প্রকার কায়েমী স্বার্থ রক্ষার দুর্ভেদ্য ব্যবস্থার সহিত নূতন নূতন কায়েমী স্বার্থও সৃষ্টি হইতে থাকিবে। আমাদের রাজস্ব হস্তপদবন্ধ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থের নিকট বন্ধক দেওয়া থাকিবে। মহান এবং আমাদের অতি আদরের ইম্পিরিয়াল সার্ভিস অব্যাহত ও [illegible] [illegible] থাকিয়া আমাদিগকে আর এক দফা স্বায়ত্তশাসনের জন্য শিক্ষা দিতে থাকিবে। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইবে

বটে, কিন্তু দয়ালু ও সর্বশক্তিমান গভর্ণর ডিক্টেটররূপে আমাদিগকে শান্ত রাখিবেন। সর্বোপরি থাকিবেন, সর্বশ্রেষ্ঠ মহাডিক্টেটর বড়লাট, ইচ্ছামত যাহা কিছু করিবার সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে এবং ইচ্ছা হইলেই তিনি যাহা কিছু বারণ করিতে পারিবেন। ঔপনিবেশিক গভর্ণমেন্ট তৈয়ারীর জন্য ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায়ের সৃজনী-প্রতিভার এমন অদ্ভুত বিকাশ কখনও এত প্রত্যক্ষ হয় নাই এবং হিটলার ও মুসোলিনী প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভারতের বড়লাটের দিকে চাহিয়া নিশ্চয়ই ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিবেন।

ভারতের হস্তপদ কষিয়া বাঁধিবার মত শাসনতন্ত্র রচনা করিবার পর "বিশেষ দায়িত্ব" ও রক্ষাকবচের কতকগুলি অতিরিক্ত বেড়ী লাগাইয়া দেওয়া হইল, যাহাতে এই দুর্ভাগা বন্দী দেশ এক পা'ও নড়িতে না পারে। যেমন মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বলিয়াছেন,—"মানুষের বুদ্ধিতে যত প্রকার উদ্ভাবন করা যাইতে পারে, সেই সকল রক্ষাকবচ দিয়া প্রস্তাবগুলি সুরক্ষিত করিতে তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।"

তারপর আমাদিগকে আরও শুনান হইল যে, এই অনুগ্রহের মূল্যস্বরূপ মোটা টাকা দিতে হইবে—প্রথমে একযোগে কয়েক কোটি টাকা; পরে বাৎসরিক বরাদ্দ। উপযুক্ত মূল্য না দিলে আমরা স্বরাজের আশীর্বাদ কেমন করিয়া লাভ করিব? আমরা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া মনে করি যে, ভারত দারিদ্র্যপীড়িত, বোঝা অত্যন্ত দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে, ভার লাঘবের জন্য আমরা স্বাধীনতা প্রত্যাশা করি। এই কারণেই জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য আগ্রহশীল হয়। কিন্তু এখন বুঝা গেল যে, ঐ বোঝা আরও ভারী হইয়া উঠিবে।

ভারতীয় সমস্যার এই হাস্যকর সমাধান যথোচিত ব্রিটিশ সৌজন্য সহকারে প্রদত্ত হইল এবং আমরা শুনিলাম যে, আমাদের শাসকগণ কত উদার। ইতিপূর্বে আর কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরাধীন জাতিকে এতখানি ক্ষমতা ও সুযোগ প্রদান করে নাই। যাহারা এতখানি ঔদারতায় ভীত হইয়া প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, তাহাদের সহিত দাতাদের ইংলণ্ডে তুমুল তর্ক চলিতে লাগিল। তিনটি গোল-টেবিল বৈঠক, অসংখ্য কমিটি ও পরামর্শসভা, তিন বৎসর বহু ব্যক্তির ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াতের পর এই ফললাভ হইল!

কিন্তু ইংলণ্ড গমন পর্ব শেষ হইল না। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিযুক্ত 'জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি', 'হোয়াইট পেপার' লইয়া বিচার করিতে বসিলেন, কতিপয় ভারতীয় সাক্ষী বা এসেসররূপে বিলাতে গেলেন। লণ্ডনে আরও কতকগুলি কমিটি বসিল, বিনা খরচায় যাতায়াত ও লণ্ডনে বাস করিবার লোভে, যে কোন কমিটির সদস্যপদের জন্য তলে তলে অমর্যাদাকর তদ্বির ও কাড়াকাড়ি চলিল। হোয়াইট পেপারের পাষাণ-কঠিন ধারাগুলি দেখিয়াও বীরগণ ভীত হইলেন না, সমুদ্রযাত্রা বা বিমানপোতে যাত্রার বিপদ্বিপত্তি তুচ্ছ করিলেন, লণ্ডনে বাস করিবার অধিকতর বিপদ গ্রাহ্য করিলেন না; বাগ্মিতা ও তদ্বির করিবার সমস্ত নৈপুণ্য লইয়া তাঁহারা হোয়াইট পেপারের ধারাগুলি পরিবর্তন করিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেলেন। তাঁহারা জানিতেন এবং বলিতেন যে, ফললাভের কোন আশাই নাই; তাই বলিয়া তাঁহারা পিছাইয়া যাইবার লোক নহেন, তাঁহাদের যাহা বলিবার আছে, তাহা তাঁহারা বলিবেনই, শুনিবার লোক কেহ না থাকিলেও তাঁহারা বলিবেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন রেসপন্সিভিস্ট দলের নেতা সকলে চলিয়া আসার পরও লণ্ডনে রহিয়া গেলেন,—ইংলণ্ডের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাতের পর সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন; বহু 'ডিনার' খাইলেন এবং সেই

সুযোগে তাঁহার ঈপ্সিত রাজনৈতিক পরিবর্তন তাঁহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া উন্মুখ জনসাধারণকে শুনাইলেন যে, মারাঠীর ধৈর্য ও অধ্যবসায় লইয়া তিনি কর্তব্যপালনে বিমুখ হন নাই এবং লণ্ডনে থাকিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহার কথা শুনাইয়াছেন।

আমার পিতা প্রায়ই অনুযোগ করিতেন যে, তাঁহার রেসপন্সিভিস্ট বন্ধুগণের রসবোধ নাই। পরিহাস করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হইত; তাঁহারা উহার রসগ্রহণ করিতে পারিতেন না, অগত্যা তিনি বুঝাইয়া তাঁহাদের শান্ত করিতেন—অত্যন্ত ঝকমারী ব্যাপার! রণপ্রিয় মারাঠাদের কেবল অতীত বীরত্ব নহে, আমাদের জাতীয় সংগ্রামে বর্তমানের বীরত্বের কথাও আমি ভাবি এবং সেই মহান ও অপরাজেয় তিলকের কথাও মনে হয়, যিনি ভাঙিলেও নত হইতে জানিতেন না।

লিবারেলগণও হোয়াইট পেপার একেবারেই না-পছন্দ করিলেন। ভারতে দিনের পর দিন যে দমননীতি চলিতেছিল, তাহাও তাঁহারা ভাল বোধ করিতেন না, কদাচিৎ তাঁহারা উহার প্রতিবাদও করিতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে কংগ্রেস ও তাহার কার্যপদ্ধতির নিন্দা করিতেও ভুলিতেন না। তাঁহারা সময় সময় কোন কোন কংগ্রেস-নেতাকে কারামুক্তি দিবার জন্য গভর্নমেণ্টকে পরামর্শ দিতেন—তাঁহাদের পরিচিত ব্যক্তিদের দিক দিয়াই তাঁহারা ভাবিতে অভ্যস্ত। লিবারেল ও রেসপন্সিভিস্টরা এই যুক্তি দেখাইতেন যে, অমুক অমুককে ছাড়িয়া দিলে বর্তমানে সাধারণের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা নাই। যদি সে ব্যক্তি দুর্ব্যবহার করে, তাহা হইলে, গভর্নমেন্টের পক্ষে তাহাকে পুনরায় গ্রেফতার করার পথ খোলাই থাকিবে এবং তখন গভর্নমেন্টের কার্যের যৌক্তিকতা অধিকতর প্রমাণিত হইবে। এই সকল যুক্তি দেখাইয়া ইংলণ্ডেও কেহ কেহ অত্যন্ত সদয়ভাবে কার্যকরী সমিতির কয়েকজন সদস্য বা কোন ব্যক্তিবিশেষের মুক্তির জন্য আবেদন করিতে লাগিলেন। যখন আমরা জেলে, তখন যে সকল ভদ্রমহোদয় আমাদের কথা ভাবিতেছেন, আমরা তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া পারি না; তবে সময় সময় মনে হইত যে, এই সকল সহৃদয় বন্ধুরা যদি আমাদের নিষ্কৃতি দিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্যে আমরা অণুমাত্র সন্দেহ করি না; কিন্তু তাঁহারা যে সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ এবং তাঁহাদের ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশী।

লিবারেলরাও ভারতের এই সকল ঘটনা বিশেষ প্রীতিপ্রদ মনে করিতেন না, তাঁহারা অস্বস্তি বোধ করিতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা কি করিতে পারেন? গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করা তাঁহাদের ধারণারও অতীত। কেবলমাত্র নিজেদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা জনসাধারণ অথবা দেশ-কর্মীদের নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছিলেন এবং ভাসিতে ভাসিতে এমন জায়গায় গিয়া তাঁহারা পৌঁছিলেন, যেখানে তাঁহাদের মতবাদ, গভর্নমেন্টের মতবাদ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা কঠিন। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প এবং জনসাধারণের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন, কাজেই তাঁহারা গণ-আন্দোলনের কোন ইতরবিশেষ ঘটাইতে অক্ষম। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা ও সুপরিচিত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে সম্মান পান। এই সকল নেতা এবং সমগ্র লিবারেল ও রেসপন্সিভিস্টেরা সংকটের সময় সরকারী নীতি সমর্থন করিয়া, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রকৃত সেবা করিয়াছিলেন। কার্যকরী সমালোচনার অভাব এবং লিবারেলদের কর্তৃক সমর্থন ও অনুমোদনের ফলে গভর্নমেন্টের বে-আইনী

চণ্ডনীতির পক্ষে মহা সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইরূপে যে সময় গভর্ণমেণ্ট নিজেরাই দমননীতির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে গলদঘর্ম হইতেছিলেন, তখন লিবারেল ও রেসপন্সিভিস্টরা তীব্র ও অভূতপূর্ব দমননীতিকে নৈতিক সমর্থন প্রদান করিয়াছিলেন।

লিবারেল নেতারা বলিতে লাগিলেন, হোয়াইট পেপার মন্দ—অতিশয় মন্দ। কিন্তু ইহা লইয়া কি করা হইবে? ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাসে কলিকাতায় মডারেট বৈঠক বসিল। লিবারেল নেতাদের সর্বপ্রধান মুখপাত্র মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিলেন যে, শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন যত অসন্তোষজনকই হউক না কেন, তাঁহাদের উহা লইয়া কার্য করাই উচিত। তিনি বলিলেন, "এখন দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘটনা-প্রবাহ দেখার সময় নহে।" তাঁহার মতে কেবল একটি কাজ করা যাইতে পারে, তাহা হইল যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা লইয়া কাজ করা। তাহা না হইলে অকর্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। তিনি আরও বলিলেন,—"যদি আমাদের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, আত্মসংযম, বুঝাইয়া কার্যোদ্ধারের ক্ষমতার প্রতীতি, শান্ত প্রভাব এবং প্রকৃত যোগ্যতা—এই সকল গুণ থাকে, তাহা হইলে পূর্ণোদ্যমে সেগুলি দেখাইবার সময় আসিয়াছে।" কলিকাতার ষ্টেটসম্যান পত্রিকা এই আবেগময় আবেদনে মন্তব্য করিলেন, "আলোময় বাণী" (সাইনিং ওয়ার্ড)।

মিঃ শাস্ত্রী সর্বদাই আবেগময় বক্তৃতা করেন। তাঁহার বাগ্মিসুলভ মনোহর শব্দচয়ন এবং ঝঙ্কারময় প্রয়োগ-নৈপুণ্যে অনুরাগ আছে। কিন্তু তিনি উৎসাহের আধিক্যে আত্মহারা হন এবং তাঁহার সৃষ্ট শব্দের যাদুমন্ত্র অপরের নিকট, সম্ভবতঃ তাঁহার নিজের নিকটও অর্থহীন হইয়া উঠে। যখন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় কলিকাতায় ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাসে তাঁহার এই আবেদন বিশেষভাবে বিচার্য। মূলনীতি অথবা উদ্দেশ্য ছাড়াও দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ যাহাই ঘটুক না কেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যতই অপমানিত, নিপীড়িত, পরাভূত এবং শোষণ করুক না কেন, আমাদিগকে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের এক নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা উচিত নহে, তবে সে সীমারেখা কখনও অঙ্কিত হইবে না। দলিত কীটও মাথা ফিরায়, কিন্তু মিঃ শাস্ত্রীর উপদেশে ভারতবাসীর তাহাও করা উচিত নহে। তাঁহার মতে অন্য পথ নাই। ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার নিজের দিক দিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তগুলি আনুগত্য স্বীকারের সহিত গ্রহণ করা ধর্ম (যদি এই অস্পষ্ট শব্দটি ব্যবহার করা সঙ্গত হয়)। আমরা চাই আর নাই চাই, সকলে মিলিয়া অদৃষ্ট, নিয়তি অথবা কিসমৎকে গ্রহণ করিতে বাধ্য।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তিনি কোন নিশ্চিত পরিস্থিতি সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন নাই। যদিও ফল যে মন্দ হইবে, সে সম্বন্ধে সকলের মোটামুটি ধারণা থাকিলেও শাসনতন্ত্রগত পরিবর্তন তখনও গঠন করা হইতেছিল। তিনি যদি বলিতেন যে, হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলি মন্দ হইলেও সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমি বলিতেছি যে, ঐগুলি আইনে পরিণত হইলে উহা লইয়া কাজ করা উচিত, তাহা হইলে তাঁহার উপদেশ ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহার সহিত বাস্তব ঘটনার সম্বন্ধ থাকিত। কিন্তু মিঃ শাস্ত্রী আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন, যত অসন্তোষজনকই হউক না কেন, তাঁহার উপদেশ ঐরূপ থাকিবে। জাতির অতি মর্মান্তিক বিষয় লইয়াও তিনি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। কোন ব্যক্তি বা দল কিরূপে অদৃষ্টপূর্ব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন স্বীকৃতিমূলক

মনোভাব দেখাইতে পারেন, আমার পক্ষে তাহা বুঝা কঠিন। হয়ত ইঁহাদের কোন প্রকার নীতি বা নৈতিক ও রাজনৈতিক মাপকাঠি নাই, ইঁহাদের মনোভাব ও কর্মনীতি হইল শাসকদের হুকুম বা আদেশ অবিচারিত আনুগত্যের সহিত গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় বিষয় হইল কর্মকৌশলের কথা। নূতন শাসন-সংস্কার আইনে পরিণত হইবার দীর্ঘ যাত্রাপথে হোয়াইট পেপার অন্যতম বিশ্রামস্থল। গভর্ণমেণ্টের দিক হইতে ইহা এক প্রয়োজনীয় বিরামকেন্দ্র,—পরবর্তী যাত্রাপথে আরও এরূপ অনেক অবসর আছে, যেখানে ইহা ভাল কি মন্দ দুইদিকেই পরিবর্তিত হইতে পারে। বিভিন্ন স্বার্থের দিক হইতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তথা পার্লামেণ্টের উপর চাপ দেওয়ার উপর এই পরিবর্তন নির্ভর করে। এই টানাটানিতে ভারতীয় লিবারেলদিগকে হাত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবগুলিকে অধিকতর উদার—অন্ততঃ অধিকার সঙ্কোচের কঠোরতা হ্রাস—করিতে চেষ্টা করিতে পারিতেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রহণ কি বর্জন, নূতন শাসনতন্ত্র লইয়া কাজ করা কি না করা, এ প্রশ্ন উঠিবার বহু পূর্বেই, মিঃ শাস্ত্রীর সুস্পষ্ট ঘোষণা হইতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভাল করিয়াই বুঝিলেন যে, তাঁহারা ভারতীয় লিবারেল-দিগকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করিতে পারেন। ইঁহাদিগকে হাত করার কোন কথাই উঠে না। ইঁহাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেও ইঁহারা গভর্ণমেণ্টকে ছাড়িবেন না। আমি যতটা পারি, কলিকাতায় মিঃ শাস্ত্রীর বক্তৃতা লিবারেলদের দৃষ্টি দিয়া বিচার করিয়া আমার মনে হইল, কর্মকৌশল হিসাবেও ইহা অতি মন্দ এবং লিবারেলদের উদ্দেশ্যও ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

মিঃ শাস্ত্রীর পুরাতন বক্তৃতার উপর এত কথা লিখিবার কারণ ইহা নহে যে, ঐ বক্তৃতা বা কলিকাতার মডারেট-বৈঠকের বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে; লিবারেল নেতাদের মনস্তত্ত্ব ও মানসিক অবস্থা বুঝিবার আগ্রহ হইতেই ইহা আমি আলোচনা করিলাম। ইঁহারা যোগ্য ও শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি, তথাপি অশেষ সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি বুঝিতে পারি না যে, ইঁহারা কেন এরূপ কাজ করেন। জেলে মিঃ শাস্ত্রীর আর একটি বক্তৃতা পড়িয়া আমি অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়াছিলাম। ১৯৩৩-এর জুন মাসে পুণায় তিনি সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে (তিনিই উহার সভাপতি) একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সংবাদে প্রকাশ, ভারতে ব্রিটিশ প্রভাব সহসা অন্তর্হিত হইলে কি বিপদ হইবে তাহা দেখাইতে গিয়া তিনি বলিলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে ঘৃণা, উৎপীড়ন, এক দল কর্তৃক অন্য দলের নির্যাতন বৃদ্ধি পাইবে। অন্যদিকে পরমতসহিষ্ণুতাই ব্রিটিশ রাজনৈতিক জীবনের চিরন্তন নীতি; অতএব, ভবিষ্যতে ভারত ব্রিটেনের সহিত সহযোগিতা করিলে ভারতেও পরমতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। জেলে থাকায় আমাকে কলিকাতার ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত মিঃ শাস্ত্রীর বক্তৃতার সারাংশের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। ষ্টেটস্‌ম্যান মন্তব্য করিয়াছেন, "ইহা অত্যন্ত মজার ব্যাপার, আমরা দেখিলাম, তাহার পূর্বেও এই মর্মে বক্তৃতা করিয়াছেন।" সংবাদে আরও প্রকাশ যে, মিঃ শাস্ত্রী রুশিয়া, ইতালী ও জার্মানীতে স্বাধীনতা অপহরণ এবং ঐ সকল দেশে অনুষ্ঠিত অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরতার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহা পড়িবামাত্র আমার প্রথমেই মনে পড়িল, ভারত ও ব্রিটেন সম্পর্কে মিঃ শাস্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের মিঃ [illegible] খুঁটিনাটি ব্যাপারে পার্থক্য থাকিলেও, মূল মতবাদ এক। নিম্নের উদ্ধৃত [illegible]

ক্ষুণ্ণ না করিয়াও মিঃ উইনস্টন চার্চিল ঠিক এই ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন। এহেন মিঃ শাস্ত্রী লিবারেল দলের মধ্যেও বামপন্থী এবং তাহাদের একজন সুযোগ্য নেতা!

আমার আশঙ্কা হয়, মিঃ শাস্ত্রীর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, জগতের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে, বিশেষভাবে ভারত ও ব্রিটেন সম্পর্কে, তাঁহার মতবাদ আমি মানিয়া লইতে অক্ষম। সম্ভবতঃ ইংরাজ নহেন এমন কোন বিদেশীও উহা গ্রহণ করিবেন না এবং প্রগতিশীল মতবাদী অনেক ইংরাজও উহার সহিত ভিন্নমত অবলম্বন করিবেন। ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায়ের রঙীন চশমা দিয়া জগৎ ও স্বদেশকে দেখিবার অতি আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি অর্জন করিয়াছেন। তবুও ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, গত আঠার মাস ধরিয়া ভারতে দিনের পর দিন যাহা ঘটিতে-ছিল এবং তাঁহার বক্তৃতার সময়েও যাহা ঘটিতেছিল, তিনি বক্তৃতায় তাহা বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করেন নাই। তিনি রুশিয়া, জার্মাণী, ইতালীর কথা বলিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশের তীব্র দমন-নীতি ও সর্ববিধ স্বাধীনতার বিলোপ লইয়া কিছুই বলেন নাই। সীমান্তপ্রদেশ ও বাঙ্গলার ভয়াবহ ঘটনাগুলির বিষয় তিনি নাও জানিতে পারেন—রাজেন্দ্রবাবু সম্প্রতি তাঁহার কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে যাহা "বাঙ্গলার উপর বলাৎকার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—কেন না সংবাদনিয়ন্ত্রণ ও গোপনের সতর্ক ব্যবস্থায় অনেক ঘটনাই প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু ভারতের মর্মবেদনা, প্রবল প্রতিপক্ষের সহিত তাঁহার জাতি স্বাধীনতার জন্য যে জীবন-মরণ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইলেন কি করিয়া? বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর পুলিশ-রাজ প্রতিষ্ঠা—প্রায় সামরিক আইনের কাছাকাছি অবস্থা, অনশন ধর্মঘট, কারাগারের দুঃখভোগ ইহা কি তিনি জানিতেন না? যে সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতার জন্য তিনি ব্রিটেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সেই ব্রিটেনই যে ভারতে উহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতেছে, তাহা কি তিনি বুঝিতে পারেন না?

তিনি কংগ্রেসের সহিত একমত হউন আর নাই হউন, কিছু আসিয়া যায় না। কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা ও নিন্দা করিবার অধিকার তাঁহার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একজন ভারতীয়, একজন স্বাধীনতাপ্রেমিক, একজন আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার স্বদেশের নরনারীদের আশ্চর্য সাহস ও আত্মত্যাগ তাঁহার মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে? আমাদের শাসকগণ যখন ভারতের হৃদয়ে কুঠারাঘাত করিতেছিলেন তখন তিনি কি কোন বেদনা কোন মর্মযাতনা বোধ করেন নাই! অহঙ্কৃত সাম্রাজ্যের বাহুবলের নিকট যাহারা নত হইল না, যাহারা দৈহিক পীড়ন অম্লানবদনে সহ্য করিল, যাহাদের গৃহ বিনষ্ট হইল, যাহাদের প্রিয়জন দুঃখভোগ করিল তথাপি আত্মাবমাননা করিল না, সেই সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট কি কিছুই নহে? আমরা কারাগারে ও কারার বাহিরে মুখে সাহস দেখাইয়া হাসিয়াছি কিন্তু আমাদের সে হাস্য প্রায়ই অশ্রুতে অভিষিক্ত এবং ক্রন্দনের রূপান্তর।

সাহসী ও উদারহৃদয় ইংরাজ মিঃ ভেরিয়ার এলউইন, তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। ১৯৩০ সালে তিনি লিখিয়াছেন, "সমগ্র জাতি মানসিক দাসত্বের বন্ধন দূরে নিক্ষেপ করিয়া নির্ভীক আত্মমর্যাদা প্রদর্শন করিতেছে, এ দৃশ্য দর্শন এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা!" আরও বলিয়াছেন, "সত্যাগ্রহ সংঘর্ষে কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক যে আশ্চর্য শৃঙ্খলা দেখাইয়াছে, একজন প্রাদেশিক গভর্ণর পর্যন্ত উদারভাবে তাহা স্বীকার করিয়াছেন......।"

মিঃ শাস্ত্রী সহানুভূতিপ্রবণ এবং ভদ্রব্যক্তি, দেশবাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে;

সংঘর্ষের সময় তাঁহার দেশবাসীর জন্য তিনি অনুরূপ সমবেদনা অনুভব করিলেন না, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সর্ববিধ সম্মিলিত কার্যক্রম ও ব্যক্তিস্বাধীনতা বিলোপের বিরুদ্ধে তাঁহার কণ্ঠ হইতে প্রতিবাদ উত্থিত হইবে, ইহা সকলেই প্রত্যাশা করিতে পারে। অনেকে ইহাও আশা করিয়াছিল যে, তিনি এবং তাঁহার সহকর্মীরা পীড়িত অঞ্চলে—সীমান্ত ও বাঙলায় গিয়া স্বচক্ষে সব দর্শন করিবেন, কংগ্রেস বা নিরুপদ্রব প্রতিরোধের সাহায্য করিবার জন্য নহে, ঘটনা প্রকাশ করিয়া পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের অতিরিক্ত পীড়ন সংযত করিবার জন্য। অন্যান্য দেশের স্বাধীনতাপ্রেমিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উপাসকগণ ইহা করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি ইহা করিলেন না। যখন শাসকবৃন্দ ভারতের নরনারীকে সরাসরি দলন করিতেছে, এমন কি, সাধারণ স্বাধীনতাও বিলুপ্ত হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহাদিগকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন না, কি ঘটিতেছে তাহাও দেখিতে চাহিলেন না। এমন এক সময়ে তিনি সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশজাতিকে প্রশংসাপত্র প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন, যখন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে ঐ দুইটি সদ্‌গুণের একান্ত অভাব। তিনি তাঁহার নৈতিক সমর্থন দ্বারা দমন-নীতির কঠোর কর্তব্য পালনে তাঁহাদিগকে উৎসাহী ও চাঙ্গা করিয়া তুলিলেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না এবং তাঁহার কাজের কি ফল হইবে, তাহাও তিনি ভাবেন নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার যে ঐরূপ ফল হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। অতএব কেন তিনি এই ভাবে চিন্তা ও কার্য করেন?

আমি এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাই নাই বরং দেখিতেছি, লিবারেলগণ তাহাদের স্বদেশবাসী হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন এবং আধুনিক চিন্তাধারার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা যে সকল বস্তাপচা পুরাতন পুঁথি পড়েন তাহা তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে, ভারতের জনসাধারণকে আবৃত করিয়া রাখে এবং তাঁহারা এই প্রকার আপনাতে আপনি মুগ্ধ অবস্থায় থাকেন। আমরা জেলে গিয়াছি, আমাদের দেহ জেলে তালাচাবি বন্ধ কিন্তু আমাদের মন মুক্ত, আমাদের চিত্ত প্রফুল্ল। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের মনোমত করিয়া এক মানসিক কারাগার রচনা করিয়াছেন, যেখানে তাঁহারা চক্রাকারে অবিশ্রান্ত ঘুরিতে থাকেন, বাহির হইতে পথ পান না। তাঁহারা বস্তুত অপরিবর্তনীয় সত্তার উপাসক, কিন্তু এই পরিবর্তনশীল জগতে যখন পরিবর্তন হয়, তখন তাঁহারা দিশাহারা হইয়া উঠেন। কোন আদর্শ বা পরিবর্তনকে বুঝিবার মত কোন উপায় হাতড়াইয়া পান না। আমাদের সম্মুখে দুইটি প্রশ্ন,—হয় সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে, নয় ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইতে হইবে, এই তীব্র গতিশীল জগতে আমরা স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। পরিবর্তন ও গতির ভয়ে লিবারেলগণ তাঁহাদের চারিদিকে বড় দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন, অথচ, দুর্বল পদে তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অতএব ঝড়ের ঝাপটায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন এবং যে কোন তৃণ-খণ্ড সম্মুখে পাইলেই তাহা ব্যাকুল মুষ্টিতে ধরিতে লাগিলেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে তাঁহারা হ্যামলেট্,—চিন্তায় জর্জর, কিংকর্তব্য-বিমূঢ়, সর্বদাই সন্দিগ্ধ, সংশয়াকুল এবং অকর্মণ্যতাচিত্ত।

লিবারেলদের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি সারভেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া' নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের গোড়ার দিকে কংগ্রেসপন্থীদিগকে এই বলিয়া অপমান দিয়াছিলেন যে, তাহারা জেলে যাইতে চাহে এবং যখন তাহারা জেলে যায় তখন

আবার বাহিরে আসিবার জন্য ব্যাকুল হয়। বিরক্তির সহিত ইহাতে মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, ইহাই কংগ্রেসের নীতি হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিবর্তে লিবারেলদের মতে ইংলণ্ডে ডেপুটেশন লইয়া গিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রীদের নিকট ধর্ণা দেওয়া উচিত অথবা গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তনের জন্য ইংলণ্ডে গিয়া আবেদন নিবেদন করা উচিত।

অবশ্য কতক পরিমাণে একথা সত্য যে, তখন প্রধানতঃ কংগ্রেসের এই কর্ম-নীতি ছিল যে, অর্ডিন্যান্সীয় আইন এবং অন্যান্য দমননীতিমূলক ব্যবস্থাগুলি অমান্য করা। তাহার ফলে কারাদণ্ড হইত। ইহাও অবশ্য সত্য যে, কংগ্রেস ও জাতি দীর্ঘ সংঘর্ষে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং গভর্ণমেণ্টের উপর কোনও ফলপ্রসূ চাপ দিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তথাপি তাহার এক বাস্তব ও নৈতিক মূল্যও ছিল।

যে উলঙ্গ দমন-নীতি ভারতবর্ষ সহ্য করিয়াছে তাহা শাসকবর্গের পক্ষেও এক ব্যয়বহুল ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি তাঁহাদিগকেও অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ মানসিক অবস্থার মধ্যে কাল কাটাইতে হইয়াছে এবং তাঁহারা ভাল করিয়া জানিতেন, পরিণামে ইহা তাঁহাদের ভিত্তিকেও দুর্বল করিবে। ইহাতে নির্যাতিত জনসাধারণ এবং জগতের সম্মুখে তাঁহাদের শাসনের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাঁহারা সর্বদাই লৌহমুষ্টি মখমলের কোমল আবরণে লুকাইয়া রাখিতে ভালবাসেন। চরম ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ফলাফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া জনসাধারণ যখন গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছার নিকট নত হয় না, তখন তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বিরক্তি-কর এবং অনিষ্টকরও বটে। কাজেই দমন-নীতিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাময়িক ও স্থানীয় প্রকাশ্য বিরোধিতায়ও মূল্য আছে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে দৃঢ়তা জাগে এবং গভর্ণমেণ্টের নৈতিক শক্তি দুর্বল করিয়া ফেলে।

ইহার নৈতিক দিকের গুরুত্ব অনেক বেশী। এক স্মরণীয় অধ্যায়ে থুরো বলিয়াছেন, "যখন নরনারীরা অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ হয়, তখন ন্যায়পরায়ণ প্রত্যেক নরনারীর স্থানও ঐ কারাগারে।" এই উপদেশ লিবারেল এবং অন্যান্য অনেকের নিকট শ্রুতিসুখকর হইবে না। কিন্তু আমরা অনেকে অনুভব করিতেছিলাম যে বর্তমান অবস্থার মধ্যে নৈতিক জীবন অসহ্য। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের অনেক সহকর্মী সর্বদাই জেলে থাকিতেন এবং রাষ্ট্রের দমন-নীতির অস্ত্র অবিরত আমাদিগকেও পীড়ন করিতেছিল এবং উহা জনসাধারণের শোষণেরও সহায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের নিজের দেশে আমরা সন্দিগ্ধ ব্যক্তির মত বিচরণ করি, গুপ্তচর ছায়ার মত পশ্চাতে অনুসরণ করে, আমাদের প্রত্যেকটি কথা যত্ন সহকারে টুকিয়া লওয়া হয়, আশঙ্কা আমরা সর্বত্র বিস্তৃত নিষিদ্ধনীয় আইন ভঙ্গ করিয়া ফেলি। আমাদের চিঠিপত্র খুলিয়া দেখা হয়, নিষেধাজ্ঞা ও ক্রোক্ তালের সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। আমাদিগকে নির্বাচন করিয়া লইতে হইবে,—রাষ্ট্রের শক্তির নিকট হীন আনুগত্য স্বীকার, আত্মিক অধঃপতন, আমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহা অস্বীকার, যাহাকে আমরা হীন বলিয়া জানি তাহাকে স্বীকার করিয়া নৈতিক গণিকা-বৃত্তি অথবা ফলাফল সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইহার প্রতিরোধ। কেহই ইচ্ছা করিয়া জেলে যায় না অথবা বিপদকে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু সময় সময় অনেক কিছুর পরিবর্তেই কারাগার বাঞ্ছনীয়। যেমন বার্নার্ড শ' বলিয়াছেন, "যাহা তুমি হীন বলিয়া জান, সেই উদ্দেশ্যেই অপরের দ্বারা প্রবৃত্ত হইবার মত বিরোধাত্মক জীবনে আর

কিছু নাই। অন্যান্য শোচনীয় ব্যাপারে হয় দুর্ভাগ্য কিম্বা মৃত্যু; কিন্তু একমাত্র ইহাই দুঃখ, দাসত্ব মর্তের নরক।"

৪১

দীর্ঘ কারাদণ্ডের অবসান

আমার কারামুক্তির দিন ঘনাইয়া আসিল। "সদ্ব্যবহারের জন্য" সাধারণ নিয়মে আমার কিছু দণ্ড মকুব হইয়াছিল অর্থাৎ দুই বৎসরের মধ্যে সাড়ে তিন মাস কম হইয়াছিল। আমার মনের শান্তি অথবা জেলের মধ্যে স্বভাবতঃই মনের মধ্যে যে নিস্তেজ অবসন্নভাব দেখা যায়, তাহা কারামুক্তির সম্ভাবনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আমি উত্তেজনা বোধ করিতে লাগিলাম। বাহিরে গিয়া আমি কি করিব? অতি কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দিতে গিয়া আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম, এই প্রশ্ন মুক্তির আনন্দ হরণ করিল। কিন্তু ইহাও সাময়িক চিত্তবিকার। আমার বলপূর্বক দাবাইয়া রাখা শক্তি মাথা তুলিতে লাগিল। আমি বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম।

১৯৩৩-এর জুলাই মাসের শেষভাগে এক মর্মান্তিক সংবাদে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলাম—জে. এম সেনগুপ্তের অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে আমরা বহুবর্ষ যাবৎ সহকর্মী ছিলাম তো বটেই, আমার কেম্ব্রিজের ছাত্রজীবনের প্রথম দিকে তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছিলাম। কেম্ব্রিজে আমাদের প্রথম দেখা, আমি নবাগত এবং তিনি সদ্য ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন।

অন্তরীণে আবদ্ধ অবস্থায় সেনগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯৩২-এর প্রথম ভাগে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর বোম্বাইয়ে জাহাজের উপরই তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া রাজবন্দী করা হয়। তাহার পর হইতেই তিনি বন্দী অথবা অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনেক রকম সুবিধা দিয়াছিলেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্যাধির কোন পরিবর্তন হইল না। কলিকাতায় তাঁহার শোকযাত্রায় বিপুল জনসংঘ যে ভাবে পরলোকগত নেতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিল, তাহাতে মনে হইল, বাঙ্গলার হৃদয়ে বহুদিন অবরুদ্ধ বেদনা অন্ততঃ অল্পকালের জন্যও যেন প্রকাশের পথ পাইয়াছে।

সেনগুপ্তও চলিয়া গেলেন। আর একজন রাজবন্দী সুভাষ বসু কয়েক বৎসরের কারাদণ্ড ও অন্তরীণে ভগ্নস্বাস্থ্য, অবশেষে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাইবার অনুমতি দিলেন। প্রবীণ বিঠলভাই প্যাটেল ইউরোপে অসুস্থ। আরও কতজন স্বাস্থ্য হারাইয়াছে, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, কারাজীবনের শারীরিক দুঃখ ও বাহিরের কর্মপ্রেরণা কেহ সহ্য করিতে পারে নাই! কতজনের, (যদিও বাহির হইতে দেখিলে একরূপই মনে হয়) অস্বাভাবিক জীবন যাপনের ফলে মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে!

সমগ্র দেশ কি অসহ্য দুঃখ নীরবে বহন করিতেছে, সেনগুপ্তের মৃত্যুতে তাহা স্পষ্টভাবে মনে পড়িল, আমি ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ করিতে লাগিলাম। ইহার পরিণাম কি? কোথায় ইহার শেষ?

সৌভাগ্যক্রমে আমার স্বাস্থ্য ভালই ছিল, কংগ্রেসের কার্যে অনিয়মিত জীবন যাপন সত্ত্বেও মোটের উপর আমি ভালই ছিলাম। ইহার কারণ, পিতার নিকট

হইতে আমি সুগঠিত দেহ লাভ করিয়াছিলাম এবং দেহের যত্ন করিতাম। রোগ, দুর্বল দেহ এবং অতিরিক্ত মেদ, এ তিনটিই আমার নিকট অশোভন মনে হইত; নিয়মিত ব্যায়াম, মুক্ত-বায়ু এবং সাদাসিধা খাদ্য এই তিন উপায়ে আমি উহা হইতে মুক্ত ছিলাম। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে, মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং গুরুপাক খাদ্যের দোষে প্রায়ই পীড়া ভোগ করেন (যাঁহাদের অপচয় করিবার মত অর্থ আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য)। স্নেহদুর্বলা জননীরা অতিরিক্ত মিষ্ট ও মুখরোচক খাদ্য দিয়া অতিভোজনে বাল্যকাল হইতেই সন্তানসন্ততির দেহে বদহজমের বনিয়াদ গড়িয়া তোলেন। আমাদের দেশে শিশুদিগকে অতিরিক্ত কাপড়চোপড় দিয়া মুড়িয়া রাখা হয়। ভারতে ইংরাজগণও অতি-ভোজন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের খাদ্যে ঘি মশলা কম থাকে। সম্ভবতঃ একপুরুষ পূর্বের ইংরাজগণের অপেক্ষা তাঁহারা একটু উন্নত হইয়াছেন, কেননা পূর্বোক্ত শ্রেণী প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ ও তীব্র পানাহার করিতেন।

খাদ্য সম্পর্কে আমার কোন বিশেষ বাতিক নাই, কেবল অতি ভোজন ও গুরুপাক খাদ্য বর্জন করিয়া থাকি। অন্যান্য কাশ্মিরী ব্রাহ্মণদের মত আমাদের পরিবারেও মাংসাহার প্রচলিত, বাল্যকাল হইতেই আমি মাংসাহারে অভ্যস্ত, তবে উহা আমার বেশী প্রিয় ছিল না। ১৯২০-এ অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হইতেই আমি মাংসাহার ত্যাগ করিয়া নিরামিষাশী হইয়াছিলাম। তারপর ইউরোপ গমনের পূর্ব পর্যন্ত ছয় বৎসর কাল আমি নিরামিষাশী ছিলাম। ইউরোপে গিয়া অবশ্য মাংসাহার করিয়াছি। ভারতে ফিরিয়া আমি পুনরায় নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করি এবং এখন পর্যন্ত প্রায় তাহাই আছি। মাংস আমার শরীরে সহ্য হয়, তবে আমি উহার প্রতি অরুচি প্রদর্শন করিয়া থাকি, কেন না, উহা আমার নিকট অত্যন্ত স্থূলরুচি বলিয়া মনে হয়।

১৯৩২-এ জেলে একবার আমার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়াছিল। কয়েকমাস প্রত্যহ একটু জ্বর হইত, ইহাতে আমার স্বাস্থ্যের গর্ব ক্ষুন্ন হইত বলিয়া আমি বিরক্ত হইতাম। আমি এতকাল জীবন ও শক্তির যে প্রাচুর্য অনুভব করিতাম, এই প্রথম তাহাতে সন্দেহের ছায়াপাত হইল, ক্রমশঃ ক্ষয় ও জরার বিভীষিকা সম্মুখে দেখিয়া আমি ভীত হইলাম। আমি যে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়াছিলাম তাহা নহে, কিন্তু ধীরে ধীরে শারীরিক ও মানসিক বলক্ষয় স্বতন্ত্র বস্তু। যাহা হউক, আমার ভয় একটু অতিরঞ্জিত, এই অসুস্থতা জয় করিয়া আমি শরীর আয়ত্তের মধ্যে আনিলাম। শীতকালে দীর্ঘকাল সূর্যালোকে থাকিয়া আমি সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। যখন আমার জেলের সঙ্গীরা কোট ও শাল গায়ে দিয়া শীতে কাঁপিতেন, আমি দিব্য আনন্দে উলঙ্গ দেহে রৌদ্র পোহাইতাম। ইহা কেবল শীত-কালে উত্তর ভারতেই সম্ভব, অন্যত্র সূর্যালোক অত্যন্ত প্রখর।

ব্যায়ামের মধ্যে—"শিরশাসন" অর্থাৎ হাতের তালু ও মাথা মাটিতে রাখিয়া উপরের দিকে পদদ্বয় উত্তোলন করা, তাহার পর মাথার পশ্চাৎ দিকে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি রাখিয়া কনুইয়ের উপর ভর দিয়া শরীর সোজা উপরে রাখায় আমি বড় আনন্দ পাই। আমার মনে হয়, শরীরের দিক দিয়া ইহা খুব ভাল, আমার ইহা আরও ভাল লাগে, কেন না ইহাতে আমার মনও প্রসন্ন হয়। কিঞ্চিৎ হাস্যকর এই ভঙ্গীতে আমার মেজাজ ভাল হয় এবং জীবনের খামখেয়ালীগুলি সহ্য করিবার শক্তি পাই।

আমার সাধারণ ভাল স্বাস্থ্য এবং সুস্থদেহজনিত আনন্দে আমি কারাজীবনে

অপরিহার্য সাময়িক অবসাদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহাতে কি কারাগারে কি বাহিরে সতত পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যেও নিজেকে উপযোগী করিয়া লইয়াছি। আমি জীবনে বহু আঘাত পাইয়াছি, আঘাতের মুহূর্তে মনে হইয়াছে যে, আমি বুঝি লুটাইয়া পড়িব। কিন্তু বিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছি, প্রত্যাশাতীত অল্পকালের মধ্যেই আমি নিজেকে সংহত করিয়াছি। আমার চরিত্রের প্রশান্তি ও সংযমের লক্ষণ আমার মতে এই যে, আমার কখনও বেশী মাথা ধরে নাই বা অনিদ্রায় কষ্ট পাই নাই। আধুনিক সভ্যতার সাধারণ ব্যাধিগুলিও আমার নাই, এমন কি অতিরিক্ত লেখাপড়া করা, বিশেষভাবে জেলে স্বল্পালোকে লেখাপড়া করা সত্ত্বেও আমার দৃষ্টিশক্তি মন্দ নহে একজন চক্ষু-বিশেষজ্ঞ গত বৎসর আমার উৎকৃষ্ট দৃষ্টি-শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আট বৎসর পূর্বে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, দুই এক বৎসরের মধ্যেই আমাকে চশমা লইতে হইবে। তিনি অত্যন্ত ভুল করিয়াছিলেন, কেন না আমি এখনও চশমা ছাড়াই কাজ চালাইতেছি। এই সকল ঘটনা যদিও আমার প্রশান্তি ও সংযমের খ্যাতির পরিচায়ক, তথাপি বলিয়া রাখি, যে সকল লোক সর্বদাই ধীর-মস্তিষ্ক এবং সংযত, তাঁহাদিগকে আমি ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকি।

আমি যখন কারামুক্তির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, তখন বাহিরে ব্যক্তিগত নিরুপদ্রব প্রতিরোধের নূতন আন্দোলন চলিতেছে। গান্ধিজী এই আন্দোলনের পুরোভাগে আসিতে প্রস্তুত হইলেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি ১লা আগস্ট হইতে গুজরাটের কৃষকদের মধ্যে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রচার করিতে যাইবেন। তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফ্‌তার করা হইল, এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি এরোডা জেলে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার কারাগমনে আমি আনন্দিত হইলাম। কিন্তু শীঘ্রই নূতন সমস্যা দেখা দিল। গান্ধিজী কারাগার হইতে পূর্বের মত হরিজন আন্দোলন চালাইবার সুবিধা দাবী করিলেন, গভর্ণমেণ্ট তাহা দিলেন না। সহসা আমরা শুনিলাম, এই ব্যাপার লইয়া অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। সামান্য ব্যাপার লইয়া এইরূপ বিপদসঙ্কুল কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া অভূতপূর্ব বলিয়া মনে হইল। গভর্ণমেণ্টের সহিত তর্কযুক্তিতে তিনি অভ্রান্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা আমার পক্ষে কঠিন হইল। আমাদের করিবার কিছুই নাই, বিহ্বল হইয়া ঘটনার গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

এক সপ্তাহ উপবাসের পরেই তাঁহার অবস্থা অতিশয় মন্দ হইল। তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল কিন্তু তখনও তিনি বন্দী; গভর্ণমেণ্ট হরিজন আন্দোলন পরিচালনার সুবিধা দিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বাঁচিবার ইচ্ছা ছাড়িয়া দিলেন (পূর্ববার অনশনকালে ইহা ছিল) এবং ক্রমশঃ নিজেকে মৃত্যুপথে আগাইয়া দিতে লাগিলেন। শেষ সময় উপস্থিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি সকলের নিকট হইতে বিদায় লইলেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহারের যে কয়েকটি বস্তু ছিল, তাহাও নার্স ও অন্যান্যের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি গভর্ণমেণ্টের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে প্রাণত্যাগ করুন, এ অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিল না। সেইদিন অপরাহ্নেই তাঁহাকে সহসা মুক্তি দেওয়া হইল। অল্পের জন্য তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। সম্ভবতঃ, আর একদিন দেরীতেই বহু বিলম্ব হইয়া যাইত। সম্ভবতঃ ইহা সি. এফ. এণ্ড্রুজের চেষ্টার ফল, গান্ধিজীর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তাড়াতাড়ি ভারতে ফিরিয়া ছিলেন।

ইতিমধ্যে আমি দেরাদুন জেল হইতে, অন্যান্য জেলে দেড়বৎসর কাটাইবার

পুনরায় ১৩ই আগস্ট নৈনী জেলে ফিরিয়া আসিলাম। তখনই মাতার পীড়া এবং তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এই সংবাদ আসিল। মাতার অবস্থা সংকটাপন্ন বলিয়া ১৯৩৩-এর ৩০শে আগস্ট আমি কারাগার হইতে মুক্তি পাইলাম। সাধারণভাবে আমি পূর্ণদণ্ড ভোগান্তে ১২ই সেপ্টেম্বর মুক্তি পাইতাম। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট আমাকে আরও তের দিন কারাদণ্ড মাপ করিলেন।

৫০

গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ

কারামুক্তির অব্যবহিত পরেই আমি লক্ষ্ণৌয়ে মাতার রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার সহিত কয়েকদিন থাকিলাম। দীর্ঘকাল পরে কারাগারের বাহিরে আসিয়া আমি অনুভব করিলাম, আমার চারিদিকের পরিবেষ্টনের সহিত আমার যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সকলের মনের ভাব যেমন হয়, তেমনি ভাবে আমিও আশ্চর্য হইয়া অনুভব করিলাম, যখন আমি কারাগারে নিশ্চল হইয়া ছিলাম, তখনও জগৎ চলিয়াছে, কত কি পরিবর্তন হইয়াছে। ছেলেমেয়েরা বড় হইয়াছে—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, প্রেম, কলহ, খেলাধূলা, কাজকর্ম, সুখ-দুঃখের নিত্য আবর্তন। জীবনের নূতন আকর্ষণ, আলাপের নূতন বিষয়, যাহা দেখি শুনি, সবই একটু অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের। আমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া জীবন যেন অগ্রসর হইয়াছে। ইহা খুব সুখের অনুভূতি নয়। অল্পকালের মধ্যেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইলাম, কিন্তু কোন আগ্রহ বোধ করিলাম না। আমি বুঝিলাম, অল্প কয়েকদিনের জন্য জেল হইতে ছাড়া পাইয়াছি মাত্র, শীঘ্রই হয়ত আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে। যাহা শীঘ্রই ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টায় ফল কি?

রাজনীতির দিক দিয়া ভারত অপেক্ষাকৃত শান্ত, আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত কাজকর্ম গভর্ণমেণ্ট সংযত ও দমন করিয়া ফেলিয়াছেন; কদাচিৎ কেহ গ্রেফ্‌তার হয়। কিন্তু ভারতের এই নিস্তব্ধতার মধ্যে বহু ইঙ্গিত ছিল। দীর্ঘকাল তীব্র দমন-নীতির ফলে ক্লান্তিজনিত এই নিস্তব্ধতা অশুভ সম্ভাবনায় পূর্ণ। এ নিস্তব্ধতা যেন মুখর; যাঁহারা দমন করেন, ইহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বাহ্যতঃ সমস্ত অবাধ্যতা দমিত হইয়াছে, গোয়েন্দা ও গুপ্তচরের বিপুল বাহিনী দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। সর্বত্র ছত্রভঙ্গ অবস্থা, জনসাধারণ সন্ত্রস্ত। সর্ববিধ রাজনৈতিক কার্য—বিশেষভাবে পল্লী-অঞ্চলে—দমন করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ডের চাকুরী হইতে কংগ্রেস-পন্থীদের তাড়াইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত। মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির উপর অত্যধিক চাপ দেওয়া হইতে লাগিল, যদি দুষ্ট কংগ্রেসপন্থীদিগকে পদচ্যুত না করা হয়, তাহা হইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ করা হইবে বলিয়া ভয় দেখান হইল। এই প্রকার জবরদস্তীর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা গেল কলিকাতা কর্পোরেশনে। অবশেষে, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট আইন করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়োগ বন্ধ করিয়া দিলেন।

জার্মানীতে নাৎসী দলের অত্যাচারের বিবরণ ভারতীয় ব্রিটিশ কর্মচারিগণ এবং ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির উপর এক আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। তাঁহারা

ভারতে যাহা করিয়াছেন, যেন উহার মধ্যে তাহার বৈধ যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইলেন, অহঙ্কারের সহিত তাঁহারা আমাদের শুনাইতে লাগিলেন যে, যদি নাৎসীদের হাতে পড়িতে, তাহা হইলে অবস্থা কি হইত একবার ভাবিয়া দেখ। নাৎসীরা নূতন নীতি, নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে; তাহাদের সহিত পাল্লা দেওয়া নিশ্চয়ই সহজ নহে। সম্ভবতঃ তাহাদের হাতে পড়িলে আমাদের দুর্ভোগ আরও বেশী হইত। তবে গত পাঁচ বৎসরে ভারতের নানা অংশে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আনুপূর্বিক বিবরণ আমি জানি না বলিয়া আমার পক্ষে তুলনামূলক বিচার করা কঠিন। দক্ষিণ হস্তে যাহা দান করিবে, বাম হস্ত তাহা জানিবে না, ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এই নীতিতে বিশ্বাসী, কাজেই [illegible]পক্ষ তদন্তের প্রস্তাবে তাঁহারা কর্ণপাত করিলেন না, অথবা এই শ্রেণীর তদ[illegible]ত শাসকবর্গের নির্দোষিতা প্রমাণের ঝোঁকই বেশী দেখা যায়। আমার মতে সাধারণ ইংরাজগণ বর্বর অত্যাচারকে ঘৃণা করেন, ইহা সত্য। নাৎসীদের মত ইংরাজেরাও প্রকাশ্যে গর্বভরে "ব্রুতালিতাৎ" (অথবা ইংরাজী প্রতিশব্দ) বলিয়া সর্বত্র জয়ধ্বনি দিয়া ফিরিতেছেন, ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। যখন ইংরাজেরা ঐরূপ করেন, তখন তাঁহারা একটু লজ্জাবোধও করিয়া থাকেন। আমরা ইংরাজ হই, জার্মাণ বা ভারতীয়ই হই, আমাদের সুসভ্য ব্যবহারের উপর আবরণ অত্যন্ত পাতলা, রিপুর উদ্রেক হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবরণ মুছিয়া গিয়া যে দৃশ্য প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিতে মনোহর নয়। বিগত মহাযুদ্ধ মানুষকে ভয়াবহ বর্বরতার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল এবং যুদ্ধ-বিরতির সন্ধির পরও আমরা দেখিয়াছি, জার্মাণীকে না খাইতে দিয়া পিষিয়া মারিবার জন্য অবরোধ করিবার চেষ্টা; যাহা একজন ইংরাজ লেখকের মতে, "কোন জাতি এত বড় হৃদয়হীন অমানুষিক বর্বরতা ও পাশবিক নৃশংসতা দেখায় নাই।" ভারতবর্ষ ১৮৫৭-৫৮র কথা ভুলিয়া যায় নাই। যখনই আমাদের স্বার্থে হাত পড়িবার উপক্রম হয়, তখনই আমরা সুশিক্ষা ও সভ্য ব্যবহার ভুলিয়া যাই। তখন অসত্যের নাম হয় "প্রচারকার্য", বর্বরতার নাম হয় "বৈজ্ঞানিক দমননীতি" এবং "আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা"।

ইহা কোন বিশেষ জাতি বা ব্যক্তির দোষ নহে। সমান অবস্থায় পড়িলে সকলেই অল্পবিস্তর ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের মত প্রত্যেক বৈদেশিক শাসনাধীন দেশেই শাসকবর্গের প্রতি একটা বিরুদ্ধতা সর্বদাই থাকে, সময় সময় উহা প্রত্যক্ষ ও বিপজ্জনক হইয়া উঠে। এই বিরুদ্ধতা হইতেই শাসক সম্প্রদায়ের চরিত্রে সামরিক দম্ভ ও পাপাচার উদ্ভূত হইয়া উঠে। গত কয়েক বৎসরে আমাদের বিরুদ্ধতা প্রবল ও কার্যকরী হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া আমরা ভারতেও ঐ শ্রেণীর সামরিক দম্ভ ও পাপাচার দেখিয়াছি। কিন্তু ভারতে আমরা কতক পরিমাণে এই সামরিক মনোবৃত্তি (অথবা তাহার অভাব) সহ্য করিয়াছি। সাম্রাজ্যের ইহাই পরিণাম, উহা উভয় পক্ষকেই অধঃপতিত করে। ভারতবাসীদের অধঃপতন তো সর্বত্রই প্রত্যক্ষ; অপর পক্ষের অধঃপতন অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু সঙ্কটের সময় তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া, এক তৃতীয় দল আছে, যাহাদের মধ্যে উভয়বিধ অধঃপতনই দেখা যায়।

জেলে বসিয়া সরকারী উচ্চকর্মচারীদের বক্তৃতা, ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের তাঁহাদের উত্তর এবং গভর্নমেন্টের বিবৃতিগুলি পাঠ করিবার প্রচুর অবসর পাইতাম। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, গত তিন বৎসরে তাঁহাদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহা ক্রমশঃই প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে ভয় দেখাইবার ভাব প্রবল হইয়াছে এবং সার্জেন্ট মেজর যে ভঙ্গীতে সৈন্যদের

সম্বোধন করেন, তাঁহারাও ক্রমশঃ তাহা আরম্ভ করিতেছেন। ১৯৩৩-এর নভেম্বর কি ডিসেম্বরে বাংলায় মেদিনীপুর ডিভিসনের (আমার মনে হয়) কমিশনারের বক্তৃতা ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই বক্তৃতার প্রত্যেকটি কথা যেন "পরাজিতের প্রতি কিছুমাত্র করুণা প্রদর্শন না করিয়া জয়ের পূর্ণ ফল আদায় করিবার দৃঢ়সংকল্প প্রকাশের" মনোবৃত্তির সূত্রে গ্রথিত। বে-সরকারী ইংরাজগণ, বিশেষতঃ বাংলায়, সরকারী নমুনা অপেক্ষাও অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বক্তৃতা ও আচরণে ফাসিস্ত মনোভাব প্রকাশিত হইত।

সম্প্রতি সিন্ধুদেশে একজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে প্রকাশ্যস্থলে ফাঁসিতে লটকান, বর্বরতার আর একটি দৃষ্টান্ত। সিন্ধুদেশে অপরাধীর সংখ্যা বাড়িতেছে; কাজেই অপরকে সাবধান করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে প্রাণদণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই পৈশাচিক দৃশ্য দেখিবার জন্য জনসাধারণকে সকল প্রকার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল এবং শুনা যায়, বহু সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিল।

কারামুক্তির পর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে উৎসাহিত হইবার কিছু ছিল না। আমার বহু সহকর্মী তখনও জেলে, নূতন নূতন গ্রেফ্‌তারও চলিয়াছিল। সমস্ত অর্ডিন্যান্সীয় আইনের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল; সেন্সরের প্রতাপে সংবাদপত্র রুদ্ধকণ্ঠ; আমাদের চিঠিপত্র বিপর্যস্ত। আমার সহকর্মী রফি আহম্মদ কিদোয়াই তাঁহার চিঠিপত্র সম্বন্ধে সেন্সরের খামখেয়ালীতে মহা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। চিঠিপত্র আটকান হইত, কখনও আসিতে বিলম্ব হইত, কখনও বা হারাইত; এরূপ অবস্থায় তিনি দেখাসাক্ষাৎ, নিমন্ত্রণ, কাজকর্মের নির্দিষ্ট সময় রক্ষা করিতে পারিতেন না। সেন্সর যাহাতে একটু তৎপরতার সহিত কার্য করে, এ জন্য তিনি পত্র লিখিবার সংকল্প করিলেন, কিন্তু কাহাকে লিখিবেন? সেন্সর কোন রাজনৈতিক কর্মচারী নহে। হয়ত একজন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী গোপনে এই কাজ করে, যাহার অস্তিত্ব ও কার্যপ্রণালী প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করা হয় না। রফি আহম্মদ এই সমস্যা সমাধান করিলেন; তিনি সেন্সরের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া খামের উপর নিজের ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। চিঠিখানা যে ঠিক লোকের হাতে পড়িয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তাহার পর হইতে রফি আহম্মদ অনেকটা নিয়মিতরূপে চিঠিপত্র পাইতেন।

আমার জেলে ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক কার্য হইতে অবসর গ্রহণ না করিলে, ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায়ও আমি দেখিলাম না। আমার সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না, কাজেই আমি অনুভব করিলাম যে, গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য। যে কোন মুহূর্তে হয়ত আমার উপর কিছু করিতে অথবা না করিতে আদেশ জারী করা হইবে; কোন নির্দিষ্ট নিয়মে বলপূর্বক কার্য করিতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত প্রকৃতি বিদ্রোহ করিবে। ভারতীয় জনসাধারণকে ভয় দেখাইয়া অবনমিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। আমি নিরুপায়, ব্যাপক ক্ষেত্রে আমার করিবার কিছুই নাই কিন্তু অন্ততঃপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ভয়ে নত হইয়া আনুগত্য স্বীকার করিতে অস্বীকার করিতে পারি।

জেলে যাইবার পূর্বে কতকগুলি কাজ শেষ করিবার সংকল্প করিলাম। প্রথমতঃ পীড়িতা মাতাকে লইয়া বিব্রত হইলাম। ধীরে ধীরে তিনি আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন, এত ধীরে যে, এক বৎসর তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। গান্ধীজীকে দেখিবার জন্য আমি ব্যগ্র হইলাম; সর্বশেষ উপবাসের পর তিনি পুনায় ধীরে

ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছিলেন। দুই বৎসরের অধিককাল তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আমার সহকর্মীদের সাক্ষাৎ লাভের জন্যও আমি আগ্রহান্বিত হইলাম। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও, জগতের অবস্থা এবং আমার মনের মধ্যে যে সকল ভাব জাগিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব আলোচনা করিতে ইচ্ছা হইল। আমি তখন ভাবিতাম, জগৎ অতি দ্রুত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এক খণ্ডপ্রলয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে; উহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের জাতীয় কর্মপন্থা নির্ণয় করা উচিত।

আমার পারিবারিক ব্যাপারের দিকেও নজর দেওয়ার আবশ্যক হইল। এতকাল আমি উহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম, এমন কি, পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার কাগজপত্রগুলি দেখিবার পর্যন্ত অবসর পাই নাই। আমরা আমাদের ব্যয় অনেক কমাইয়া ফেলিয়াছিলাম, তথাপি যাহা ছিল, তাহাও আমাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু আমাদের বর্তমান বাটীতে বাস করিয়া উহা আর বেশী কমান কঠিন। আমাদের আর মোটর গাড়ী ছিল না, কেন না, উহার ব্যয় বহন করার সাধ্য আমাদের নাই, দ্বিতীয়তঃ যে কোন মুহূর্তে গভর্ণমেণ্ট উহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। এই অর্থসঙ্কটের মধ্যেও আমি রাশি রাশি ভিক্ষার জন্য পত্র পাইতাম (সেসব এপ্রেলি আটকাইত না)। দেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণভারতে, একটা প্রচলিত এবং অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, আমি একজন মহাধনী ব্যক্তি।

আমি জেল হইতে বাহির হইবার পরেই আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী কৃষ্ণার বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হইল এবং আমার অনিচ্ছাকৃত কারাগমনের পূর্বেই তাহার বিবাহ সম্পন্ন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলাম। কৃষ্ণাও এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগান্তে কয়েক মাস পূর্বে মুক্তি পাইয়াছিল।

মায়ের শরীর একটু ভাল হইলে আমি গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাতের জন্য পুণা রওনা হইলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আমি সুখী হইলাম; তখন তিনি দুর্বল হইলেও ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছেন। আমাদের অনেক কথাবার্তা হইল। রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য প্রচুর, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তিনি উদারতার সহিত আমার বক্তব্য বিষয় যথাসম্ভব অনুমোদন করিবার চেষ্টা করিলেন, ইহাতে আমি কৃতজ্ঞ হইলাম। পরে প্রকাশিত আমাদের পত্রাবলীতে যে সকল সমস্যা তখন আমার মনে জাগিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিয়াছিলাম; ভাষা একটু অস্পষ্ট হইলেও আমাদের মতভেদ পরিষ্কাররূপেই বুঝা গিয়াছিল। আমি দেখিয়া সুখী হইলাম, গান্ধিজীও ঘোষণা করিলেন যে, কায়েমী স্বার্থ লোপ করিতে হইবে, তবে তিনি বাধ্য করা অপেক্ষা বুঝাইয়া স্বমতে আনার উপর জোর দিলেন। স্বমতে আনয়ন করিবার তাঁহার প্রণালীগুলি আমার মতে সৌজন্য ও সুবিবেচনার সহিত বাধ্য করা অপেক্ষা অধিক দূরবর্তী নহে; অতএব পার্থক্যটা আমার নিকট খুব বেশী বোধ হইল না। পূর্বের মত তখনও তাঁহার সম্বন্ধে আমার এই ধারণা ছিল যে, মতবাদ লইয়া আলোচনা করিতে তিনি বিমুখ হইলেও ঘটনার গতি ও যৌক্তিকতা তাঁহাকে একপদ একপদ করিয়া সামাজিক আমূল পরিবর্তনের অপরিহার্য প্রয়োজনের অভিমুখে লইয়া যাইবে। তিনি এক অনন্যসাধারণ বিস্ময়, কিছু তোকিমার এনার্কিস্টদের ভাবের অনুরাগী ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের মত এ মনোবৃত্তি, ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ একজন কূলকর্মী অনন্যসাধারণ। সঙ্কটের মুহূর্তে তিনি যে কোন্ দিকে ঝুঁকিবেন, তাহা অনুমান করা কঠিন, কিন্তু তিনি যে দিকেই যান, একটা সাড়া দিবেই। আমাদের মতে তিনি ভুলপথে গেলেও, সে পথ হইতে

সরল। তাঁহার সহিত মিলিত ভাবে কাজ করা সব সময়েই ভাল; কিন্তু প্রয়োজন হইলে পৃথক পথে চলিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

তখন ভাবিলাম, আপাততঃ এ প্রশ্ন উঠে না। আমরা তখনও জাতীয় সংঘর্ষের মধ্যে আছি এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ হইলেও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ তখনও কংগ্রেসের মতবাদে পর্যবসিত কার্যপদ্ধতি। এই অবস্থার মধ্যেই আমাদিগকে জনসাধারণ, বিশেষভাবে রাজনীতি-ঘেঁষা কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করিতে হইবে এবং যখন পুনরায় কার্যপদ্ধতি ঘোষণা করিবার সময় আসিবে, তখন আমরা আরও অনেকখানি অগ্রসর হইতে পারিব। ইতিমধ্যে কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান হইয়াই আছে এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট উহাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদিগকে এই আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইবে।

গান্ধিজী নিজেকে লইয়াই বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তিনি নিজেকে লইয়া কি করিবেন? তিনি এক জটিল জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। যদি তিনি পুনরায় জেলে যান, তাহা হইলে আবার হরিজন কার্যের সুবিধার কথা উঠিবে, গভর্ণমেণ্ট রাজী হইবেন না, ফলে পুনরায় অনশন। আবার কি তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে? এই ইন্দুর-বিড়াল খেলার মধ্যে যাইতে তিনি অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, এই সুবিধার জন্য যদি তাঁহাকে পুনরায় উপবাস করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি মুক্তি পাইলেও অনশন ত্যাগ করিবেন না। তাহার অর্থ অনশনে মৃত্যু!

তাঁহার সম্মুখে সম্ভবপর দ্বিতীয় পথ, কারাদণ্ডের এক বৎসরকাল (তখনও সাড়ে দশমাস বাকী) পুনরায় কারাবরণ না করা এবং হরিজন আন্দোলন লইয়া থাকা। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেসকর্মীদের সহিত মিলিত হইবেন এবং প্রয়োজনমত উপদেশাদি দিবেন।

তিনি আমাকে তৃতীয় উপায়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, কিছুদিনের মত তিনি কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন এবং উহা, তাঁহার ভাষায়, "যুবক সম্প্রদায়ের" হাতে অর্পণ করিবেন।

প্রথম উপায়ের শেষফল যখন অনশন মৃত্যু, তখন তাঁহাকে সে পরামর্শ দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কংগ্রেস যতক্ষণ বে-আইনী প্রতিষ্ঠান থাকিবে, ততক্ষণ তৃতীয় উপায়ও অবাঞ্ছনীয় মনে হইল। ইহার ফলে অবিলম্বে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বর্জন এবং সর্ববিধ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্য ত্যাগ করিয়া আইনসঙ্গত নিয়মতান্ত্রিকতার পথে প্রত্যাবর্তন, অথবা বে-আইনীঘোষিত সাহায্যবঞ্চিত কংগ্রেস অবশেষে গান্ধিজী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক আরও নিষ্পিষ্ট হইবে। যে বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য একত্র মিলিত হইয়া আলোচনা সম্ভবপর নহে, কোন দলই তাহার ভার গ্রহণ করিতে চাহিবে না। এই ভাবে ছাড়িতে ছাড়িতে আমরা তাঁহার নির্দেশিত দ্বিতীয় পথের কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের প্রায় সকলেরই ইহা ভাল বোধ হইল না, কেন না ইহাতে নিরুপদ্রব প্রতিরোধের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহাও ভাঙ্গিয়া পড়িবে। স্বয়ং নেতাই যদি সংগ্রাম হইতে সরিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে উৎসাহী কংগ্রেসকর্মীরা আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু এই জটিল অবস্থা হইতে বাহির হইবার অন্য পথও ছিল না, অতএব গান্ধিজী তাঁহার ঐ অভিপ্রায় ঘোষণা করিলেন।

যদিও আমাদের যুক্তি ও কারণ স্বতন্ত্র, তথাপি আমি ও গান্ধিজী একমত হইয়া স্থির করিলাম, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি বর্জন করিবার সময় এখনও আসে নাই এবং মৃদুভাবেও আমাদিগকে ইহা চালাইতে হইবে। অন্যান্য বিষয়ে

আমি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও জগতের বর্তমান অবস্থার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলাম।

ফিরিবার পথে আমি কয়েকদিনের জন্য বোম্বাইয়ে ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে এখানে উদয়শঙ্কর ছিলেন, আমি তাঁহার নৃত্য দেখিবার সুযোগ পাইলাম। এই অপ্রত্যাশিত আনন্দ আমি উপভোগ করিলাম। নাটক, সিনেমা, সঙ্গীত, টকি, রেডিয়ো প্রভৃতি বহু বৎসর ধরিয়া আমার আয়ত্তের বাহিরে, এমন কি, সাময়িক মুক্তির সময়ও আমি এত কাজে ব্যস্ত থাকিতাম যে, সময় হইত না। আমি একবার মাত্র 'টকি' দেখিয়াছি; খ্যাতনামা সিনেমা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নামগুলি আমার নিকট কেবল নামেই পর্যবসিত। নাটকের কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়িত, বিদেশে নূতন নাটকাভিনয়ের বিবরণ আমি ঈর্ষার সহিত সংবাদপত্রে পাঠ করিতাম। কারার বাহিরে থাকিলেও উত্তর ভারতে উত্তম অভিনয় দেখিবার কোন সুযোগ ছিল না। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গলা, গুজরাটী ও মারাঠী নাটকের অনেক উন্নতি হইয়াছে কিন্তু হিন্দুস্থানী রঙ্গমঞ্চের সেরূপ উন্নতি হয় নাই। উহা (পরে উন্নতি হইয়াছে কিনা জানি না) অত্যন্ত স্থূল ও কলানৈপুণ্যহীন। আমি শুনিয়াছি, ভারতীয় মুখর বা নির্বাক ছায়াচিত্রগুলি স্থূলরুচির পরিচায়ক। ঐগুলি সাধারণতঃ অপেরা কিম্বা ভারতের পুরাণ ও প্রাচীন ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত নাটক।

আমার মনে হয় তাহারা সহরবাসীদের রুচির খাদ্য জোগাইয়া থাকেন। এই সকল স্থূল ও পীড়াদায়ক চিত্রের সহিত আমাদের লোক সঙ্গীত ও নৃত্যের, এমন কি গ্রাম্য যাত্রাভিনয়াদিরও, পার্থক্য কত বেশী! বাঙ্গলা, গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে সময় সময় দেখা যায় এবং দেখিয়া আনন্দে বিস্মিত হইতে হয় যে, আমাদের পল্লীবাসীরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই কি গভীর ভাবে কলানিপুণ ও রসজ্ঞ। কিন্তু মধ্যশ্রেণীরা এরূপ নহেন, তাঁহারা জাতিদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরম্পরাগত সৌন্দর্য-রসজ্ঞান হারাইয়াছেন। তাঁহাদের ঘরে ঘরে জার্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার সস্তা ছাপা কুৎসিত ছবি, বড় জোর তাঁহাদের দৌড় রবিবর্মা পর্যন্ত। তাঁহাদের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়ম (আমি এই আশায় বাঁচিয়া থাকিব যে, স্বরাজ গভর্ণমেণ্টের অন্যতম প্রাথমিক কাজ হইবে, এই ভয়াবহ যন্ত্রটি বন্ধ করা)। লক্ষ্ণৌ এবং অন্যত্র বড় বড় তালুকদারের বাড়ীতে অসামঞ্জস্য এবং কলানৈপুণ্যের ব্যভিচারের যে পরাকাষ্ঠা দেখা যায়, অন্যত্র তাহা আছে কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের খরচ করিবার মত পয়সাও আছে, লোককে দেখাইবার স্পৃহাও আছে, তাঁহারা তাহা করিয়াও থাকেন এবং যে সকল লোক তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে যান, তাঁহারা উঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে গিয়া পীড়িত হন।

প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের প্রভাবে অধুনা ভারতের সর্বত্র কারু-শিল্প-রুচি জাগিতেছে। কিন্তু যে দেশের লোকের প্রতিপদে বাধা-বিপত্তি, নিষেধাজ্ঞা ও দমন, যেখানে এক সর্বব্যাপী ভয়ের রাজত্ব, সেখানে কি কোনও কলাবিদ্যার উন্নতি হইতে পারে?

বোম্বাইয়ে অনেক সহকর্মীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, অনেকেই সদ্য কারামুক্ত। বোম্বাইয়ে সমাজতন্ত্রীদল বেশ শক্তিশালী দেখিলাম, আধুনিক কতকগুলি ঘটনায়, কংগ্রেসের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপর অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে গান্ধিজীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা চলিতেছে। এই সকল সমালোচনার সহিত আমি প্রায় একমত; কিন্তু আমি স্পষ্টই বুঝিলাম যে, আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই; ইহার মধ্যেই কাজ

চালাইতে হইবে। নির্পদ্রব প্রতিরোধ বর্জন করিলেই যে আমরা রেহাই পাইব, এমন সম্ভাবনা নাই; গভর্ণমেণ্ট আক্রমণ চালাইতে থাকিবেন এবং কোন কাজ করিতে গেলেই জেলে যাওয়া অনিবার্য। আমাদের জাতীয় আন্দোলন এখন এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে, হয় গভর্ণমেণ্ট ইহা দলিত করিয়া ফেলিবেন, নয় ইহা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ইহার ইচ্ছামত কার্য করিতে বাধ্য করিবে। ইহার অর্থ এই যে, ইহা বর্তমানে এমন এক অবস্থায় আসিয়াছে, যেখানে বে-আইনী ঘোষিত হইবার সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান এবং নির্পদ্রব প্রতিরোধ বর্জন করিলেও এই আন্দোলন পিছাইয়া যাইতে পারে না। নির্পদ্রব প্রতিরোধ চালাইয়া যাওয়ার মূল্য কার্যতঃ অতি অল্প হইলেও নৈতিক আত্মরক্ষার দিক দিয়া ইহার একটা মূল্য আছে। সংঘর্ষ চলিবার সময় নূতন ভাব প্রচার সহজ সাময়িক ভাবে সংঘর্ষে ক্ষান্ত দিলেই সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে। সংঘর্ষের পরিবর্তে এক মাত্র পথ,—আপোষের মনোভাব লইয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সম্মুখীন হওয়া এবং আইন-সভায় নিয়মতান্ত্রিক কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া।

ইহা অত্যন্ত সঙ্কটের অবস্থা, সহসা মন স্থির করা সহজ নহে। আমি সহকর্মীদের মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত হৃদয়ঙ্গম করিলাম, কেন না আমার নিজের মনেও আলোড়ন চলিতেছিল। কিন্তু আমি এখানেও দেখিলাম, ভারতের অন্যত্রও দেখিয়াছি, কেহ কেহ উচ্চাঙ্গের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা কর্মহীন আলস্যকে প্রশ্রয় দিতে চাহেন। যাঁহারা সংঘর্ষের মধ্যে ধূলি ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া বিঘ্নবহুল দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়াছেন, তাঁহাদিগকে, যাঁহারা প্রায় কিছুই করেন নাই, তাঁহারা যখন দূর হইতে প্রগতিবিরোধী বলিয়া সমালোচনা করেন, তখন তাহা বিরক্তিকর সন্দেহ নাই। এই সকল বৈঠকখানা-বিলাসী সমাজতান্ত্রিকের আক্রোশ, "প্রধান প্রগতিবিরোধী" গান্ধিজীর উপরই সর্বাধিক। ন্যায়শাস্ত্রের দিক দিয়া ইহাদের যুক্তিতর্ক নিপুণ ও নিখুঁৎ সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা বাস্তব ঘটনা যে, এই "প্রগতিবিরোধী" মনুষ্যটি ভারতবর্ষকে জানেন, বুঝেন এবং ইনিই কৃষক-ভারতের প্রতীক। ইনি ভারতবর্ষকে যেরূপ প্রচণ্ড আলোড়নে আলোড়িত করিয়াছেন, কোন তথাকথিত বিপ্লবীর দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই। এমন কি, তাঁহার অতি-আধুনিক হরিজন-আন্দোলন ধীর অথচ অনিবার্য গতিতে হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামির ভিত্তি কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। যদিও তিনি গোঁড়াদের প্রতি ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেন, তথাপি তাঁহাকে পরম শত্রুজ্ঞানে তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে এমন ভাবে শক্তি সঞ্চার করেন, যাহা জলতরঙ্গের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে অভিভূত করিয়া ফেলে। প্রগতিবিরোধীই হউন আর বিপ্লবীই হউন, তিনি ভারতকে রূপান্তরিত করিয়াছেন, ভয়চকিত অধঃপতিত জনসাধারণের মধ্যে গর্ব ও চরিত্রবল সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাদের শক্তি ও চেতনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন এবং ভারতের সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করিয়াছেন। উদ্দেশ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের কথা ছাড়াও তিনি ভারতবর্ষ ও জগতকে অতি শক্তিশালী ও অনুপম অহিংস অসহযোগ এবং নির্পদ্রব প্রতিরোধের উপায় প্রদান করিয়াছেন এবং ইহা যে ভারতের বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগ সবিশেষ অনুকূলে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

আমার মতে সততই সাধু সমালোচনায় উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য এবং আমাদের সমস্যাগুলি যথাসম্ভব প্রকাশ্যে আলোচনা করা উচিত। গান্ধিজীর উপর নির্ভর করা এবং সিদ্ধান্তের জন্য তাঁহার মুখাপেক্ষী হওয়ার ভাব সর্বদাই দেখা যায়।

ইহা অত্যন্ত ভুল। অন্ধ আনুগত্য দ্বারা নহে, যুক্তিযুক্তভাবে উদ্দেশ্য ও উপায় স্থির করিয়া এবং সেই ভিত্তিতে সহযোগিতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যদ্বারাই জাতি অগ্রসর হইতে পারে। যিনি যত বড়ই হউন না, কেহই সমালোচনার অতীত নহেন। কিন্তু যখন সমালোচনা কর্মবিমুখতার ছলনামাত্র, তখন তাহা অন্যায়। সমাজ-তন্ত্রীরা এই শ্রেণীর কাজ করিলে জনসাধারণের ধিক্কারই লাভ করিবেন, কেন না লোকে কাজ দেখিয়া বিচার করে। লেনিন বলিয়াছেন, "ভবিষ্যতের কোমল স্বপ্নে বিভোর হইয়া যে উপস্থিত কঠিন কর্তব্য অস্বীকার করে, সে-ই সুবিধাবাদী। তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বাস্তব জীবনের বিকাশ ও পরিপুষ্টির মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিয়া, স্বপ্নালস কল্পনার দোহাই দিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা।"

সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্টগণ প্রধানতঃ কলকারখানার শ্রমিক সম্পর্কিত সাহিত্য হইতে পুষ্টি আহরণ করেন। কোন বিশেষ অঞ্চলে বোম্বাই বা কলিকাতার সহরতলীতে বহুসংখ্যক কারখানার শ্রমিক আছে বটে, কিন্তু অবশিষ্ট ভারত কৃষক পরিপূর্ণ। কাজেই কারখানার শ্রমিকদের কথাই মুখ্য করিয়া ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধান অথবা তাহা লইয়া কোন কাজ করা যাইতে পারে না। জাতীয়তাবাদ ও পল্লীর আর্থিক ব্যবস্থা—এই দুইটি মুখ্য কথা; ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদে কদাচিৎ ইহার আলোচনা দেখা যায়। মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী রুশিয়ার সহিত ভারতের অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও, সেখানে যে অভূতপূর্ব ও অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে অন্যত্র তাহার পুনরাভিনয় প্রত্যাশা করা মূঢ়তা মাত্র। আমি বিশ্বাস করি, কম্যুনিজম-এর দার্শনিকতা আমাদিগকে প্রত্যেক দেশের বর্তমান অবস্থা বুঝিতে সাহায্য করে এবং অধিকন্তু ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও নির্দেশ করে। কিন্তু ঘটনা ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া উহাকে অন্ধভাবে প্রয়োগ করা উহার প্রতি অবিচার ও জবরদস্তী মাত্র।

জীবন একটা জটিল ব্যাপার; জীবনের মধ্যে স্ববিরোধিতা ও সংঘাত দেখিয়া সময় সময় হতাশ হইতে হয়। মানুষের মধ্যে যে মতভেদ হইবে, তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই; এমন কি, সহকর্মীরা পর্যন্ত একই উপায়ে সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া বিপরীত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য বড় বড় বুলি আওড়ায় এবং মহান নীতির কথা বলে, তাহাকে সন্দেহ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কারাগার হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট প্রতিশ্রুতি অথবা মুচলেকা দেয় এবং অন্যান্য সন্দেহজনক আচরণ করে, আবার অপরকে সমালোচনা করিবার দুঃসাহস দেখায়, সে যে পথ বা মত সমর্থন করে, তাহারই ক্ষতি হয়।

বোম্বাই সকল জাতির জনপূর্ণ বৃহৎ সহর, এখানে নানাশ্রেণীর লোকের বিচিত্র রীতি-নীতি দেখা যায়। যাহা হউক, একজন প্রধান নাগরিক তাঁহার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কিত মতবাদের উদারতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রমিক নেতা হিসাবে তিনি সমাজতান্ত্রিক; রাজনীতিক্ষেত্রে সাধারণতঃ নিজেকে গণতন্ত্রী বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি হিন্দুসভার অতিশয় প্রিয় এবং ধর্ম ও সমাজের প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আইনের হস্তক্ষেপের তিনি বিরোধী। নির্বাচনের সময় তিনি প্রাচীন ধর্মমতের আধ্যাত্মিকতার পূজারী সনাতনীদের মনোনীত প্রার্থী। এত বহুমুখী ও বিভিন্ন কার্যের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও তাঁহার শক্তির শেষ নাই, অবসর পাইলে তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা এবং গান্ধিজীকে "প্রগতিবিরোধী" বলিয়া নিন্দা করিতে

নিয়োগ করেন। আরও কয়েকজনের সহিত মিলিত হইয়া ইনি কংগ্রেস গণতন্ত্রীদল গঠন করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে গণতন্ত্রের সহিত ইঁহার কোন যোগাযোগ নাই এবং সেই মহান প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করা ছাড়া কংগ্রেসের সহিত ইঁহার আর কোন সম্পর্ক নাই। ন্তন রাজ্য জয় করিবার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া ইনি শ্রমিক প্রতিনিধির্পে জেনেভায় শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন, ইঁহার কাজকর্ম দেখিয়া মনে হয়, ইনি যেন ইংরাজ নম্নায়, "ন্যাশনাল" গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী-পদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছেন।

এত বহ্ বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গী এবং কার্যশক্তি লাভ করিবার দ্র্লভ সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই থাকে। তথাপি কংগ্রেসের সমালোচকদের অনেকেই ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে ভ্রমণ করিয়াছেন, অনেক কিছ্ই হাতড়াইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন আবার নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলেন; ইঁহারা সমাজতন্ত্রবাদকেই কলঙ্কিত করেন।

৫১

লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গী

গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাতের জন্য প্ণায় অবস্থানকালে একদিন সন্ধ্যায় তাঁহার সহিত 'সার্ভেণ্টস অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটী'র বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সমিতির কতিপয় সদস্য রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং তিনি উত্তর দিতে লাগিলেন; এইর্পে এক ঘণ্টারও কিছ্ অতিরিক্ত কাল অতিবাহিত হইল। সমিতির সভাপতি মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তথায় উপস্থিত ছিলেন না এবং অন্যান্য সদস্যগণ অপেক্ষা বহ্গ্ণে যোগ্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জর্ও ছিলেন না; তবে কয়েকজন প্রবীণ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আমরা অল্প কয়েকজন এই কালে উপস্থিত ছিলাম, অতিশয় তুচ্ছ ঘটনা লইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন শ্নিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। গান্ধিজীর সেই বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা এবং বড়লাটের অসম্মতি, অধিকাংশ প্রশ্নই ঐ প্রাতন বিষয় লইয়া হইতে লাগিল। এই বহ্সমস্যাপীড়িত জগৎ এবং যখন তাহাদের স্বদেশ স্বাধীনতার জন্য কঠোর সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যখন শত শত প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা উহা ছাড়া আর কি আলোচনার কোন গ্রুত্বর বিষয় খ্ঁজিয়া পাইলেন না? কৃষকের দ্দর্শা, ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দাজনিত ব্যাপক বেকার-সমস্যা রহিয়াছে। বাঙ্গলা, সীমান্ত এবং ভারতের অন্যান্য অংশে ভয়াবহ ঘটনা ঘটিতেছে। স্বাধীন-চিন্তা, বক্তৃতা, লেখা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে, এমনই আরও কত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের প্রশ্নগ্লি তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। গান্ধিজী অগ্রসর হইলে বড়লাট কিম্বা ভারত গভর্ণমেণ্ট কি করিবেন, সেই সম্ভাবনা লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত।

আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমি একটা মঠে প্রবেশ করিয়াছি। এখানকার অধিবাসীরা সমস্ত বহির্জগতের সহিত যেন সকল যোগস্ত্র ছিন্ন করিয়াছেন। তথাপি 'আমাদের এই বন্ধ্রা রাজনৈতিক কর্মী' এবং যোগ্য ব্যক্তি। ইঁহারা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন এবং দীর্ঘকাল জনসেবায় ব্রতী আছেন।

কয়েকজনের সহিত মিলিত হইয়া ইঁহারাই লিবারেল দলের প্রকৃত মেরুদণ্ড। এই দলের অন্যান্য ব্যক্তিরা কোন নির্দিষ্ট মতামতের ধার ধারেন না। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে যোগ দিয়া ক্ষণিক উত্তেজনা অনুভব করেন মাত্র। এই শ্রেণীর মডারেটদের অনেকের, বিশেষতঃ বোম্বাই ও মাদ্রাজে, সরকারী কর্মচারীদের সহিত পার্থক্য বুঝাই কঠিন।

কোন্ দেশের রাজনৈতিক উন্নতি কতখানি হইয়াছে, সেই দেশের নিকট উহাই প্রধান প্রশ্ন। সেই দেশের ব্যর্থতার যদি কোন কারণ থাকে, তাহা হইলে তাহা এই যে, সে নিজের নিকট প্রকৃত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নাই। আমরা সম্প্রদায় হিসাবে আসন বণ্টন লইয়া সময় ও শক্তি নষ্ট করিতেছি। সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা লইয়া স্বতন্ত্র দল গড়িতেছি এবং নিষ্ফল তর্কযুদ্ধ চালাইতেছি ও মূল সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি না। আমরা যে রাজনীতি ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ, ইহা তাহারই প্রমাণ। ঠিক এই ভাবেই 'সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটী'র সদস্যগণ সেদিন গান্ধিজীকে যে সকল প্রশ্ন করিলেন, তাহার মধ্য ঐ সমিতি এবং লিবারেল দলের অদ্ভুত মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, তাঁহাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নীতি নাই, কোন উদার দৃষ্টিভঙ্গী নাই, তাঁহাদের রাজনীতি যেন বৈঠকখানা অথবা দরবারী ধরনের উচ্চ রাজকর্মচারীরা কি করিবেন অথবা কি করিবেন না।

"লিবারেল পার্টি" এই নাম শুনিয়া অনেকের ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে। অন্যত্র এবং বিশেষভাবে ইংলণ্ডে এই নামের একটা সার্থকতা আছে। সেখানে উহাতে এক নিশ্চিত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য—স্বাধীন-বাণিজ্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ না করা প্রভৃতি এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও কতকগুলি সামাজিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত মতবাদ বুঝায়। ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের পরম্পরাগত নীতি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাণিজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা এবং রাজার একচেটিয়া অধিকার ও ইচ্ছামত ট্যাক্স ধার্য করিবার ব্যবস্থার বিলোপ করিবার চেষ্টা হইতেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল। ভারতীয় লিবারেলদের সেরূপ কোন ভিত্তি নাই। তাঁহারা স্বাধীন বাণিজ্যে বিশ্বাস করেন না; প্রায় সকলেই সংরক্ষণবাদী এবং আধুনিক ঘটনাগুলিতে প্রমাণ হইয়াছে যে, তাঁহারা পৌর স্বাধীনতাগুলিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেন না। প্রায় সামন্ততান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী দেশীয় রাজ্যগুলি, যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নাই, ঐগুলির সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠতা এবং সর্বদা সমর্থন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা ইউরোপীয় শ্রেণীর লিবারেল নহেন—অর্থাৎ ভারতীয় লিবারেলগণ কোন দিক দিয়াই উদার নহেন। বস্তুতঃ তাঁহারা যে কি তাহা বলা কঠিন। কেন না, তাঁহাদের কোন দৃঢ় মতবাদ বা বিশ্বাস নাই এবং সংখ্যায় অত্যল্প হইলেও পরস্পরের সহিত মতভেদ ঘটিয়া থাকে। কেবল গা বাঁচাইবার বেলায় তাঁহাদের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা সর্বত্রই বিপদ দেখেন এবং তাহা এড়াইতে চান এবং আশা করেন যে, এইভাবে তাঁহারা সত্য আবিষ্কার করিবেন। সত্য অবশ্য তাঁহাদের নিকট মধ্যপন্থা। তাঁহাদের মতে চরম কিছু মনে হইলেই তাঁহারা সমালোচনা করেন এবং সমালোচনার পর নিজেদের মার্জিত, ধীরপ্রকৃতি এবং ভদ্রমানুষ মনে করিয়া পুলকিত হন। এই উপায়ে তাঁহারা তাঁহাদিগকে জটিল চিন্তা হইতে মুক্ত রাখেন, কোন পরিণামের সম্ভাবনা ভাবিয়া ভাবিবার ক্লেশ স্বীকার করেন না। অনেকের অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, লিবারেলিজম ইউরোপে পূর্ণভাবে কৃতকার্য হয় নাই এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায়

মধ্যে পড়িয়াছে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রবাদ একেবারেই মন্দ, কেন না ইহা কায়েমী স্বার্থকে আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ, ভবিষ্যতে এক অলৌকিক সমাধান খ‍ুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা হইবে এবং ততদিন কায়েমী স্বার্থগ‍ুলি রক্ষা করা উচিত। যদি তর্ক উঠে যে, প‍ৃথিবী গোল কি চ্যাপ্টা, তাহা হইলে তাঁহারা সম্ভবতঃ এই দ‍ুই চরম মতেরই নিন্দা করিবেন এবং বলিবেন, ইহাকে চতুষ্কোণ অথবা ডিম্বাকৃতি বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অতি তুচ্ছ এবং সামান্য ব্যাপার লইয়াও তাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং এমন চেঁচামেচি গোলমাল স‍ুর‍ু করিয়া দেন যে, দেখিতে বিস্ময় লাগে। জ্ঞাতসারেই হউক এবং অজ্ঞাতসারেই হউক, তাঁহারা ম‍ূল সমস্যাগ‍ুলির ধার দিয়াও যান না। কেন না, তাহা হইলে খাঁটী প্রতিকারোপায় নির্দেশ করিতে হইবে এবং তাহাতে চিন্তা ও কার্যের সাহসিকতা আবশ্যক। ইহার ফলে জয়পরাজয় লইয়া লিবারেলরা মোটেই উদ্বিগ্ন হন না। তাঁহাদের কোন নীতি নাই; এই দলের প্রধান বিশেষত্ব হইল এই,—যদি ইহাকে বিশেষত্ব বলা যায়,—যে ভালমন্দ সকল বিষয়েই মধ্যপথে থাকা। জীবনের এই দ‍ৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাঁদের প‍ুরাতন নাম মডারেটই অধিকতর শোভন ও সঙ্গত।

"মিতাচারের উপরেই আমার গৌরব প্রতিষ্ঠিত। রক্ষণশীলেরা আমাকে বলে উদারনৈতিক আর উদারনীতিকেরা বলে আমি রক্ষণশীল।"

আলেকজাণ্ডার পোপ।

কিন্তু সদ্‌গ‍ুণ হিসাবে মিতাচার যতই প্রশংসার হউক না কেন, ইহা প্রখর ও প্রদীপ্ত নহে। ইহাতে অন‍ুভূতিপ্রবণতা মন্দীভূত হইয়া যায়. সেই কারণেই ভারতীয় লিবারেলগণ "নিরানন্দ সৈন্যদল", ইহাঁদের হাবভাব গ‍ুর‍ুগম্ভীর ও চিন্তাশীল, ইহাঁদের কথাবার্তা বলিবার এবং লিখিবার ভঙ্গী নীরস এবং পরিহাস-পট‍ুতা আদৌ নাই। ইহার ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে। যেমন স্যার তেজ বাহাদ‍ুর সপ্র‍ু, ইনি ব্যক্তিগত জীবনে মোটেই নিস্তেজ ও রসবোধহীন নহেন এবং নিজের বির‍ুদ্ধে পরিহাসও উপভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু মোটের উপর লিবারেলগণ চরম ব‍ুর্জোয়াতান্ত্রিক এবং ইহাঁদের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য আছে। লিবারেল দলের ম‍ুখপত্র এলাহাবাদের "লীডার" গত বৎসর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মনো-ব‍ৃত্তির এক প্রকৃষ্ট দ‍ৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। লেখা হইয়াছিল, মহাপ‍ুর‍ুষ ও অসাধারণ ব্যক্তিরা জগৎকে বড় বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করেন, অতএব সাধারণ মাঝারী গোছের মান‍ুষ অনেক ভাল। অতি সরল ও নিখ‍ুঁৎ ভাবে "লীডার" মধ্যপন্থার জয়ধ্বজা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

মিতাচার, রক্ষণশীলতা, আকস্মিক পরিবর্তন ও বিঘ্ন এড়াইবার চেষ্টা ব‍ৃদ্ধ বয়সের সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু যৌবনের ইহাতে অন‍ুরাগ নাই। আমাদের এই প্রাচীন ভূমিতে অনেকেই জন্ম হইতেই অবসন্ন, নিরাশ, তাঁহাদের ম‍ুখে দীপ্তিহীন পক্কতার ছাপ। কিন্তু এই প্রাচীন ভূমিতেও পরিবর্তনের শক্তি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং মডারেট-মনোব‍ৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিহ্বল হইতেছেন। প্রাচীন জগৎ অন্তর্হিত হইতেছে; লিবারেলগণ যথাসাধ্য তাঁহাদের মধ‍ুর যৌক্তিকতা দিয়াও তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না। ইহাঁরা ঘ‍ূর্ণিবাত্যা, বন্যা ও ভূমি-কম্পের সহিত যেন তর্ক করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহাদের অত্যন্ত প‍ুরাতন কৌশল ব্যর্থ অথচ তাঁহারা ন‍ূতনভাবে চিন্তা ও কার্য করিতে সাহস পান না। ইউরোপীয় পরম্পরাগত কৌলিক য‍ুগ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ডাঃ এ. এন. হোয়াইটহেড বলিতেছেন, "প‍ূর্বপ‍ুর‍ুষগণ যে সকল বিধি ব্যবস্থার দ্বারা পালিত

হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন, বংশানুক্রমিক তাহাই চলিবে এবং উহা দ্বারাই সন্তান-সন্ততিগণের জীবনও বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইবে, এই নীতি-বিগর্হিত ধারণার উপরই সমস্ত পারম্পর্য অবস্থিত। আমরা মানবেতিহাসের এমন এক প্রথম অধ্যায়ে আসিয়াছি, যেখানে ঐরূপ ধারণা ভ্রান্ত।" ডাঃ হোয়াইটহেড এই বিশ্লেষণে যথেষ্ট সংযম দেখাইয়াছেন, কেন না হয়ত এই ধারণা সর্বকালেই মিথ্যা ছিল। যদি ইউরোপের পারম্পর্য রক্ষণশীল হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশে উহার প্রভাব কত অধিক! কিন্তু যখন পরিবর্তনের সময় আসে তখন ইতিহাসের গঠয়িতাগণ ঐ সকল পারম্পর্যকে অল্পই গ্রাহ্য করেন। আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে আমরা অসহায়ভাবে তাহা নিরীক্ষণ করি এবং অপরের উপর দোষ দেই! যেমন মিঃ জেরাল্ড হিয়ার্ড বলিয়াছেন যে, "পরিকল্পনার ব্যর্থতা হইতে কাহারও মনে এরূপ ধারণা হয় যে, তাহার নিজের চিন্তার ভুল নহে, অপরে ইচ্ছা করিয়া উহা পন্ড করিয়াছে, তবে তাহার মত ভ্রান্তির বিড়ম্বনা আর নাই।"

আমরা সকলেই এই ভয়াবহ ভ্রান্তি দ্বারা পীড়িত। সময় সময় আমার মনে হয়, গান্ধিজীও ইহা হইতে মুক্ত নহেন। কিন্তু আমরা অন্ততঃ কার্য করি এবং জীবনের সহিত যোগ রাখিবার চেষ্টা করি; পরীক্ষা ও ভুলের দ্বারা সময় সময় ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত হয় এবং আহত ব্যাহত হইয়াও আমরা অগ্রসর হই। কিন্তু লিবারেলদের দুঃখ অনেক বেশী। বুঝি বা ভুল করিয়া ফেলিব, এই ভয়ে তাঁহারা কাজই করিতে চাহেন না, তাঁহারা জনসাধারণের প্রাণপ্রদ সংস্রবে আসেন না এবং আত্মসম্মোহিত মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিজেদের মনের মধ্যে বাস করেন। কেহ বৎসর পূর্বে মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাঁহার লিবারেল সঙ্গীদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "দূরে দাঁড়াইয়া ঘটনার স্রোত লক্ষ্য করিও না।" এই সাবধান-বাণীর মধ্যে যে উচ্চতর সত্য নিহিত আছে, সম্ভবতঃ তিনি তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। গভর্ণমেন্টের কার্যের সহিত সতত চিন্তা করিতে অভ্যস্ত শাস্ত্রী মহাশয়, বিভিন্ন সরকারী কমিটি তা' দিয়া যে শাসনতন্ত্র ফুটাইতেছিল, তাহার প্রতিই অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু লিবারেলদের দুর্ভাগ্য এই যে, যখন তাঁহাদের স্বদেশবাসীরা অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাঁহারা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঘটনার স্রোত লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের আপন জনসাধারণের ভয়েই তাঁহারা ভীত; আমাদের শাসকগণের সহিত কলহ করা অপেক্ষা জনসাধারণের সংস্রব বর্জন করাই তাঁহারা শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে নিজেদের দেশে অপরিচিত অতিথি হইবেন এবং জীবন তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া অগ্রসর হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? যখন জীবন ও স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদের স্বদেশ-বাসীরা তীব্র সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তাঁহারা কোন পক্ষে ছিলেন, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। নিরাপদ অন্তরাল হইতে তাঁহারা আমাদের অনেক সদুপদেশ দিয়াছেন, বড় বড় নীতিকথা শুনাইয়াছেন এবং আঠার মত গভর্ণমেন্টে লাগিয়াছিলেন। গোলটেবিল বৈঠক ও বিভিন্ন কমিটিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত তাঁহাদের সহযোগিতাকে গভর্ণমেন্ট বিশেষ মর্যাদা দিয়াছিলেন। অস্বীকার করিলে অবস্থা অন্যরূপ হইত। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল সম্মেলনের একটিতে ব্রিটিশ শ্রমিকদল পর্যন্ত যোগদান করেন নাই কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহারা যোগ না দিয়া পারেন নাই।

বিভিন্ন বিষয়ে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর মাত্রান্তরে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী। কোন বিষয়ে যদি আমাদের আসক্তি থাকে, তবে তাহার প্রতি আমাদের অনুভূতি অতিমাত্রায় সচেতন থাকিবে এবং তাহাই চরমপন্থীর লক্ষণ।

অন্যক্ষেত্রে আমরা সৌজন্যপূর্ণ সহিষ্ণুতা, দার্শনিক সংযম দেখাইতে পারি; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা আমাদের ঔদাসীন্যের আবরণ মাত্র। আমি দেখিয়াছি, মডারেটদের মধ্যেও নিরীহ ব্যক্তি কোন বিশেষ শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ লোপের প্রস্তাব শুনিয়া উগ্র চরমপন্থীসুলভ মনোভাব দেখাইয়াছেন। আমাদের লিবারেল বন্ধুরা কিয়দংশে ধনী ও সচ্ছলশ্রেণীর প্রতিনিধি। তাঁহারা স্বরাজের জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন; উহা লইয়া তাঁহাদের উত্তেজিত হইয়া উঠিবার প্রয়োজনাভাব। কিন্তু কোন গুরুতর সামাজিক পরিবর্তনের প্রস্তাব শুনিলেই তাঁহারা অধৈর্য হইয়া উঠেন, তাঁহাদের সংযম ভাসিয়া যায় অথবা মধুর যৌক্তিকতা আর থাকে না। বস্তুতঃ তাঁহাদের সংযম কেবল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহাদের মনোভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁহারা মনে মনে এই আশা পোষণ করেন যে, তাঁহারা যদি গভর্ণমেণ্টকে শ্রদ্ধা করিয়া আপোষের ভাব দেখান, তাহা হইলে পুরস্কারস্বরূপ তাঁহারা ইঁহাদের কথা শুনিবেন। এই অবস্থায় ব্রিটিশ মতামতই পূর্ণভাবে মানিয়া লওয়া ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। এরস্কাইন মের "পার্লামেণ্টারী প্রাকটিস্" ইঁহাদের নিত্যপাঠ্য, এই শ্রেণীর পুস্তক, সরকারী নানাবিধ রিপোর্ট তাঁহারা ভক্তির সহিত পাঠ করেন, নূতন কোন সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ হইলেই তাঁহারা উৎসাহের সহিত গবেষণা আরম্ভ করেন। লিবারেল নেতারা ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া "হোয়াইট হলে"র (ইংলণ্ডের মন্ত্রীদের দপ্তরখানা) বড় কর্তাদের সম্বন্ধে রহস্যময় বিবৃতি দেন; লিবারেল, রেসপনসিভিস্ট ও এই প্রকার অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট হোয়াইট হল হইল ইন্দ্রলোক। একটা পুরাতন প্রবাদ আছে যে, ভাল আমেরিকানরা মৃত্যুর পর প্যারীতে যায়, হয়ত ভাল লিবারেলরা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া হোয়াইট হলের আনাচে-কানাচে বিচরণ করেন।

আমি লিবারেলদের কথা লিখিতেছি বটে; কিন্তু এই সকল কথা অনেক কংগ্রেসপন্থীদের সম্বন্ধেও খাটে। ইহা রেসপনসিভিস্টদের প্রতিই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কেন না আত্মসংযমের দিক দিয়া ইঁহারা লিবারেলদেরও হারাইয়া দিয়াছেন। সাধারণ একজন লিবারেলের সহিত সাধারণ একজন কংগ্রেসপন্থীর অনেক কিছুই পার্থক্য আছে, কিন্তু এই পার্থক্যের সীমা সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট নহে। মতবাদের দিক দিয়া অগ্রগতিসম্পন্ন লিবারেল এবং মডারেট কংগ্রেসপন্থীর মধ্যে পার্থক্য অল্পই। তবে গান্ধিজীর ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক কংগ্রেসপন্থীই দেশ ও জনসাধারণের সহিত কিছু সংস্পর্শ রাখিয়া থাকে, তাহাকে কিছু কাজও করিতে হয়, এই কারণে তাহার মতবাদ অস্পষ্ট ও ঝাপসা হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু লিবারেলদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না, তাঁহারা কি প্রাচীন, কি আধুনিক উভয়ের সহিতই যোগসূত্র হারাইয়াছেন। দল হিসাবে ইঁহারা ক্ষয়িষ্ণু এবং ক্রমে বিলীয়মান হইতেছেন।

আমার মনে হয়, আমরা অনেকেই প্রাচীন পৌরাণিক ভাব হারাইয়াছি অথচ কোন নূতন অন্তর্দৃষ্টি পাই নাই। আমরা আর দেখিব না যে, উর্বশী সমুদ্র মন্থনে আবির্ভূতা হইতেছেন অথবা মহাদেবের পিনাক টঙ্কারও শুনিব না। এ সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই হয়, যাঁহারা—"বালুকা কণার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন; বিকশিত বনফুলে স্বর্গ দেখেন, অনন্তকে করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করেন, মুহূর্তে অনন্তকাল অনুভব করেন।"

দুঃখের কথা, আমরা অনেকেই প্রকৃতির রহস্যময় লীলাখেলা অনুভব করিতে পারি না, আমাদের কানে কানে সে গোপন কথা বলে না, তাহার স্পর্শে আমরা

পুলকে উজ্জ্বল হইয়া উঠি না। তেহি নো দিবসা গতাঃ। পুরাকালের মত আমরা প্রকৃতির মধ্যে মহানের আবির্ভাব না দেখিলেও আমরা তাহাকে মনুষ্যের গৌরব ও বেদনার মধ্যে দেখিতে পাই। কি বিপুল ইহার স্বপ্ন, ইহার অন্তরে কি প্রমত্ত ঝটিকার আলোড়ন, ইহার সংঘর্ষ ও দুঃখাভিঘাত এবং সর্বোপরি দেখি, ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা ও স্বপ্নের সার্থকতায় ইহার কি অগাধ বিশ্বাস। ইহার অনুসন্ধানেই আমরা আশাভঙ্গজনিত বেদনার উপশম বোধ করি এবং সময় সময় আমরা জীবনের ক্ষুদ্রতা হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাই। কিন্তু অনেকেই এই অনুসন্ধানের পথে অগ্রসর হন না, প্রাচীন ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্তমানেও তাঁহারা অনুসরণ করিবার মত পথ পান না। ইঁহাদের কোন স্বপ্ন নাই, কোন কর্ম নাই। বিপুল ফরাসী বিদ্রোহ বা রুশ-বিপ্লবে মনুষ্যজাতির প্রচণ্ড আলোড়নের মর্মকথা ইঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না। দুর্দিন নির্জিত মানুষের ক্ষুব্ধ দুরাশা নিষ্ঠুর আবেগে বিস্ফুরিত হইয়া উঠিলে ইঁহারা ভয় পান। ইঁহাদের দৃষ্টিতে 'বাস্তিল' এখনও ধ্বংস হয় নাই।

সময় সময় অনেকে ন্যায়সঙ্গত ক্ষোভের সহিত বলিয়া উঠেন, "দেশাত্মবোধ কংগ্রেসেরই একচেটিয়া নহে।" এই একই বুলি পুনঃ পুনঃ বলিতে বলিতে ইহার মৌলিকতা নষ্ট হইয়া অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। আমি আশা করি, কোন কংগ্রেসপন্থীই মনে এরূপ ভাবাবেগ পোষণ করেন না। আমি তো নিশ্চয়ই ইহা কংগ্রেসের একচেটিয়া অধিকার বলিয়া মনে করি না এবং যে কেহ চাহিলেই আমি ইহা তাহাকে সানন্দে উপহার দিতে পারি। অনেক সময় ইহা সুবিধাবাদী ও ভাগ্যান্বেষীদের আশ্রয়স্থল; সকল শ্রেণী, সকল স্বার্থ ও সকল রুচিকে তৃপ্ত করিবার জন্য অবশ্য নানা নমুনার স্বদেশপ্রেম আছে। জুডাস যদি আজ জীবিত থাকিত, তাহা হইলে সেও স্বদেশপ্রেমের নামেই কাজ করিত। এখন আর স্বদেশ-প্রেমই যথেষ্ট নহে, আমরা আরও উচ্চতর, মহত্তর ও ব্যাপক আরও কিছু চাই।

মিতাচারের জনাই মিতাচার পর্যাপ্ত নহে। সংযম ভাল এবং উহা আমাদের মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক কিন্তু সংযমেরও অনেক অন্তরায় আছে, যেগুলিকে সংযত করিতে হয়। মানবের নিয়তি, তাহাকে জড়প্রকৃতি আয়ত্তের মধ্যে আনিতে হইবে। বজ্র ও বিদ্যুৎ হইবে তাহার বাহন; জ্বলন্ত হুতাশন, খরস্রোতে কল্লোলিত সলিল হইবে তাহার দাস। কিন্তু যে অন্ধ আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা তাহাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহাকে সংযমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখা অধিকতর কঠিন। যতদিন পর্যন্ত না সে ইহা জয় করিতেছে, ততদিন মনুষ্যত্বের সম্পদের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। কিন্তু আমরা কি পশু, পক্ষাঘাত ও অসাড় হস্তকে সংযত করিব?

দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপন্যাসিকদের লক্ষ্য করিয়া লিখিত রয় ক্যাম্বেলের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ আমি সংবরণ করিতে পারিতেছি না। ভারতীয় কয়েকটি রাজনৈতিক দল সম্পর্কেও উহা প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয় :—

"তোমরা যেরূপ দৃঢ় সংযমের সহিত লেখ, লোকে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে। আমিও তাহার সহিত একমত। তোমাদের হাতে বল্গা আছে, সংযত করিবার লোহ লাগাম আছে, কিন্তু হায় তোমাদের বেচারা ঘোড়া কোথায়?"

আমাদের লিবারেল বন্ধুরা বলেন যে তাঁহারা, এক দিকে কংগ্রেস অন্য দিকে গভর্নমেন্ট, এই দুই চরম বস্তুকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া সংকীর্ণ অথচ [illegible] পথে [illegible]। উভয়ের দোষত্রুটি তাঁহারা [illegible] সমালোচক এবং দুই পক্ষের দোষ হইতে তাঁহারা মুক্ত বলিয়া নিজেদের [illegible] [illegible]।

তাঁহারা ন্যায়ের তুলাদণ্ডধারী বিচারকের মত চক্ষু বুজিয়া বা বাঁধিয়া রাখেন বলিয়া মনে হয়। কল্পনায় আমি সুদূর অতীত যুগের সেই বাণী কান পাতিয়া শুনি,—"শাস্ত্রব্যাখ্যাতা ধর্মধ্বজী ইহুদিগণ...হে অন্ধ পথপ্রদর্শক, তোমরা মশা দেখিলে আঁৎকাইয়া উঠ; কিন্তু উট গিলিতে পটু।"

৫২

স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন

গত সতর বৎসর যাঁহারা কংগ্রেসের নীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মধ্যশ্রেণীর লোক। কি লিবারেল কি কংগ্রেসপন্থী উভয়েই একই শ্রেণীভুক্ত এবং একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্ধিত। ইঁহাদের সামাজিক জীবন, কুটুম্বিতা, বন্ধুত্ব একই প্রকার এবং তাঁহাদের উভয় জাতীয়-বুর্জোয়া আদর্শের মধ্যে প্রভেদ অল্পই। চরিত্রগত ও মানসিক অবস্থার বিভিন্নতা হইতেই তাঁহারা পৃথক হইতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহারা দুই বিপরীত দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। একদল গভর্ণমেণ্ট, ধনী সম্প্রদায় ও উচ্চ মধ্যশ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অন্যদল নিম্নমধ্যশ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইলেন। একই মতবাদ, উদ্দেশ্যেরও তারতম্য নাই। কিন্তু দ্বিতীয় দলের পশ্চাতে আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অগণিত লোক হাটবাজার হইতে, সাধারণ বৃত্তিজীবীদের মধ্য হইতে এবং শিক্ষিত বেকারগণ। সুর ঘুরিয়াছে, ভাষা এখন আর শ্রুতিমধুর ও ভদ্র নহে; ইহা কর্কশ ও আক্রমণশীল। কার্যতঃ কিছু করিতে না পারিয়া, উগ্র ভাষার মধ্যে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা। এই নূতন অবস্থা দেখিয়া মডারেটগণ ভয় পাইয়া সরিয়া গেলেন এবং নিরাপদ কোণে আশ্রয় লইলেন। তবুও উচ্চ মধ্যশ্রেণীর একটা বড় অংশ কংগ্রেসে রহিল, তবে সংখ্যায় নিম্ন মধ্যশ্রেণীর বুর্জোয়ারাই অধিক। কেবল জাতীয় সংঘর্ষের সাফল্যের জন্যই তাহারা আসে নাই, সংঘর্ষের মধ্যে আত্মতৃপ্তি লাভ করিবার আশাতেই তাহারা আসিয়াছে। তাহারা অবলুপ্ত অহঙ্কার ও আত্মসম্মানবোধ পুনরুদ্ধার করিতে চায়, প্রনষ্ট মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে উদ্‌গ্রীব। ইহা অতি সাধারণ জাতীয়তাবাদের প্রেরণা এবং উভয় পক্ষেই ইহা সমান; তথাপি রুচি ও প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যের জন্য ইহাই মডারেট ও চরমপন্থী-দিগকে পৃথক করিয়াছে। ক্রমে নিম্নমধ্যশ্রেণী কংগ্রেসের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কৃষক-সম্প্রদায়ের প্রভাবও অনুভূত হইতেছে।

কংগ্রেস ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া যতই পল্লীর জনসাধারণের প্রতিনিধি হইয়াছে, ততই লিবারেলদের সহিত তাহার ভেদ বাড়িয়াছে এবং এখন কংগ্রেসের বক্তব্য বিষয় বুঝিয়া উঠাই লিবারেলদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে। অতি উচ্চশ্রেণীর ড্রয়িং রুমে বসিয়া দরিদ্রদের গৃহ অথবা মৃৎকুটীর বুঝা কঠিন। তথাপি উভয় মতবাদই জাতীয় ও বুর্জোয়া ধরণের—ইহার পার্থক্য কেবল স্তরভেদে, মূলে বস্তুগত নহে। কংগ্রেসে এখনও এমন অনেক ব্যক্তি টিকিয়া আছেন, যাঁহারা মডারেট দলে মিশিতেও বিশেষ অসুবিধা বোধ করিবেন না।

কয়েক পুরুষ ধরিয়া ব্রিটিশগণ ভারতবর্ষকে নিজেদের বৃহৎ মফস্বলের বাড়ী (প্রাচীন ইংরেজগণের মতন) বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত। এ-বাড়ীতে তাঁহারাই ভদ্রলোক এবং ভাল অংশে বাস করিবেন, ভারতীয়েরা চাকরদের ঘরে, আস্তাবলে,

রান্নাঘরে থাকিবে। প্রত্যেক মফঃস্বলের বাড়ীতে নিম্নপদগুলি নির্দিষ্ট হইয়া আছে, সর্দার চাকর বাজার সরকার ও তদ্বিরকারক, পাচক, খানসামা, চাকরাণী, কোচওয়ান প্রভৃতি এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব নির্দিষ্ট নিয়মে চলা ফেরা করে। কিন্তু বাড়ীর উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন সম্বন্ধ নাই, ব্যবধান অনতিক্রমণীয়, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে এই ব্যবস্থা আমাদের উপর চাপাইয়া দিবেন, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই; বিস্ময়ের এই যে, আমরা প্রায় সকলেই এই ব্যবস্থাকে আমাদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ও অনিবার্য নিয়তি বলিয়া মানিয়া লই। বড়লোকের বাড়ীর ভাল চাকরের মনোবৃত্তিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। সময় সময় আমরা অতি দুর্লভ সম্মান পাই, বৈঠকখানায় আমাদিগকে এক-আধ পেয়ালা চা খাইতে দেওয়া হয়। আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা হইল ইংরাজের নিকট সম্মানলাভ ও ব্যক্তিগতভাবে উচ্চশ্রেণীতে 'প্রমোশন' পাওয়া। অস্ত্রবলে জয় বা কূট রাজনৈতিক কৌশলে জয় অপেক্ষা এই মানসিক দাসত্বই ভারতে ইংরাজের সর্বশ্রেষ্ঠ জয়। প্রাচীন কালের জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেমন বলিয়াছেন যে, ক্রীতদাস নিজেকে ক্রীতদাস বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করে।

কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে, মফঃস্বলের বড়বাবুর বাড়ী-শ্রেণীর সভ্যতা কি ইংলণ্ড কি ভারতবর্ষ, কোথাও কেহ স্বেচ্ছায় মানিয়া লইতে চাহে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনও এমন লোক আছে, যাহারা চাকরদের ঘরে থাকিতে ভালবাসে এবং তকমা, চাপরাশ, উর্দীর বড়াই করে। আবার লিবারেলদের মত অনেকে এই ব্যবস্থা ও ইহার নির্মাণ-প্রণালীর প্রশংসা করেন এবং আশা করেন, একজন একজন করিয়া মালিকদের তাড়াইয়া তাঁহারাই মালিক হইয়া বসিবেন। তাঁহারা ইহাকে বলেন, ভারতীয়করণ। তাঁহাদের মতে সমস্যা হইল বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার বর্ণপরিবর্তন, অথবা বড়জোর নূতন শাসনব্যবস্থা। কিন্তু তাঁহারা নূতন রাষ্ট্র ভাবিতে পারেন না।

তাঁহারা স্বরাজ বলিতে বুঝেন, সবই ঠিক থাকিবে, কেবল কালা আদমীর আধিক্য ঘটিবে। তাঁহারা কেবল এক প্রকার ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতে পারেন, সেখানে তাঁহারা অথবা তাঁহাদের মত ব্যক্তিরা বর্তমান ইংরাজ উচ্চকর্মচারীদের পদ গ্রহণ করিয়া প্রধান হইয়া উঠিবেন, একই শ্রেণীর চাকুরী, সরকারী বিভাগ, আইনসভা, ব্যবসা-বাণিজ্য। একই ভাবে সিভিলিয়ানরা কাজ করিবেন, রাজা মহারাজারা তাঁহাদের প্রাসাদে থাকিবেন, মাঝে মাঝে উৎসবভূষায় সজ্জিত ও মণিমাণিক্যখচিত হইয়া প্রজাদের দর্শন দিবেন, জমিদারেরা প্রজাকে হয়রাণ করিবেন এবং বিশেষ অধিকার রক্ষার জন্য দাবী করিবেন, টাকার থলিয়া লইয়া মহাজন, জমিদার ও প্রজা উভয়কেই হয়রাণ করিবেন, উকীলেরা মোটা মোটা 'ফি' পাইবেন এবং ভগবান স্বর্গে থাকিবেন।

তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থা রক্ষা করিয়া চলার উপর স্থাপিত; রামের বদলে শ্যামের নিয়োগ, এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত পরিবর্তন ছাড়া তাঁহারা বড় বিশেষ কিছু চাহেন না। ব্রিটিশের সদিচ্ছার সাহায্যে অতি ধীরে তাঁহারা এই পরিবর্তন সাধন করিতে চাহেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও প্রতিষ্ঠার উপরই তাঁহাদের সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের ভিত্তি স্থাপিত। এই সাম্রাজ্য চিরদিন থাকিবে, অন্ততঃ দীর্ঘকাল থাকিবে, তাঁহারা ইহা ধরিয়া লইয়া ইহার সহিত নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। ইহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা শান্ত হন নাই,

ব্রিটিশ প্রভুত্ব রক্ষার জন্য রচিত লোকব্যবহারের নৈতিক মানদণ্ডও ইঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন।

কংগ্রেসের মনোভাব ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; কংগ্রেস নূতন রাষ্ট্র চাহে, কেবল মাত্র স্বতন্ত্র প্রকার শাসন-প্রণালী চাহে না। সেই নূতন রাষ্ট্র কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে সাধারণ কংগ্রেসপন্থীদের হয়ত স্পষ্ট ধারণা নাই এবং মতভেদও হয়ত আছে। কিন্তু কংগ্রেসের সকলেই (মুষ্টিমেয় মডারেট ছাড়া) এ বিষয়ে একমত যে, বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা আর চলিতে দেওয়া উচিত নহে, ঢালিয়া সাজার প্রয়োজন হইয়াছে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার পার্থক্য ইহার মধ্যে নিহিত। প্রথমটিতে সেই পুরাতন ঠাটই বজায় থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এবং ব্রিটিশ অর্থনীতির বহু দৃশ্য ও অদৃশ্য বন্ধনে উহা আবদ্ধ থাকিবে; শেষোক্ত ব্যবস্থায় আমরা পাইব মুক্তি, অন্ততঃ উহা আমাদিগকে আমাদের অবস্থার অনুকূল নূতন ব্যবস্থা গঠনের স্বাধীনতা দিবে।

ইহা ইংলণ্ড বা ইংরাজ জাতির সহিত চিরন্তন শত্রুতার প্রশ্ন নহে, যে কোন ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক বর্জন করিবার কথাও নহে। এ পর্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহার ফলে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ক্ষমতার মত্ততা চাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া শাবল ব্যবহার করিতেছে।" আমাদের হৃদয়ের দ্বার খুলিবার চাবী বহু পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছে এবং যেরূপ দরাজ হাতে আমাদের উপর শাবল মারা হইতেছে, তাহাতে আমরা মোটেই ব্রিটেনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছি না। কিন্তু যদি আমরা মনুষ্যত্ব ও ভারতবর্ষের সেবার দাবী করি, তাহা হইলে কোন সাময়িক ভাবাবেগে বিচলিত হওয়া উচিত নহে। এবং যদিই বা আমাদের ঐরূপ অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলেও গত পনর বৎসর আমরা গান্ধিজীর নিকট যে কঠোর শিক্ষা পাইয়াছি, তাহাই আমাদিগকে সংযত রাখিবে। আমি ব্রিটিশ কারাগারে বসিয়াই ইহা লিখিতেছি, কয়েক মাস যাবৎ আমার মন উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়া আছে এবং সম্ভবতঃ আমি এই নিঃসঙ্গ কারাবাসে যাহা সহ্য করিতেছি, আমার কারাজীবনে ইতিপূর্বে তাহা ঘটে নাই। নানা ঘটনায় আমার মন ক্রোধে ও ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া উঠে; তথাপি এইখানে বসিয়া যখন আমি মনের গভীর অতলে দৃষ্টিপাত করি, সেখানে ইংরাজ জাতি বা ইংলণ্ডের প্রতি কোন ক্রোধ দেখি না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমি অপছন্দ করি, ভারতের উপর বলপূর্বক উহা চাপাইয়া দেওয়ায় আমি ক্ষুব্ধ; আমি ধনতন্ত্রবাদ অপছন্দ করি, ব্রিটেনের শাসক সম্প্রদায়-গুলি যে ভাবে ভারত শোষণ করিতেছে, তাহা আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণার্হ। কিন্তু ইহার জন্য আমি সমগ্র ইংলণ্ড বা সমস্ত ইংরাজ জাতিকে দায়ী করি না। করিলেও যে অবস্থার কিছু ইতর বিশেষ হইত এমন নহে, তবে সমগ্র জাতিকে নিন্দা করা নির্বুদ্ধিতা ও ধৈর্যহীনতার পরিচায়ক হইত। তাহারাও আমাদের মতই অবস্থার দাস।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মানসিক গঠনের জন্য আমি ইংলণ্ডের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী। তাহাকে আমি সম্পূর্ণ বিদেশী ও বিরুদ্ধ-প্রকৃতি বলিয়া ভাবিতেই পারি না। আমি যাহাই করি না কেন, আমার মানসিক অভ্যাসকে অতিক্রম করিতে পারি না; আমি ইংলণ্ডের স্কুল কলেজে যাহা কিছু অর্জন করিয়াছি, সেই যুক্তি এবং মাপকাঠিতেই অন্যান্য দেশ ও সাধারণ ভাবে জীবনের সকল কাজ বিচার করিয়া থাকি। আমার সমস্ত আসক্তিই (রাজনীতি ক্ষেত্র ছাড়া) ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডবাসীদের দিকে। আমি যাহা হইয়াছি, যেজন্য আমাকে ভারতের ব্রিটিশ

শাসনের সকল অবস্থার বিরোধী বলিয়া বলা হয়, তাহা আমি প্রায় নিজের বিরুদ্ধেই হইয়াছি।

এই যে শাসন, এই যে প্রভুত্ব যাহার সহিত আমরা কিছুতেই স্বেচ্ছায় আপোষ করিতে পারি না, তাহার জন্য ইংরাজ জাতি দায়ী নহে। আমরা সর্বপ্রযত্নে ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিব। ভারতে বাহিরের তাজা বাতাস আসুক, নবীন ও সতেজ ভাবধারা আসুক, আমরা সহযোগিতা চাহি; আমরা বয়সদোষে অত্যন্ত জরাজীর্ণ হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু ইংরাজ যদি ব্যাঘ্রের মূর্তি ধরিয়া আসে, তাহা হইলে সে বন্ধুত্ব বা সহযোগিতা প্রত্যাশা করিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী ব্যাঘ্রের সহিত কেবল মাত্র তীব্র বিরোধিতা চালাইতে পারে এবং বর্তমানে আমাদের দেশ সেই হিংস্র পশুর সম্মুখীন হইয়াছে। বনের বাঘকে পোষ মানাইয়া তাহার আদিম হিংস্র প্রকৃতি দূর করাও সম্ভব, কিন্তু যখন ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যনীতি একত্র হইয়া কোন দুর্ভাগা দেশের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, তখন পোষ মানান সম্ভব হয় না।

যদি কেহ বলে, সে এবং তাহার দেশ কিছুতেই আপোষ করিবে না তবে এক দিক দিয়া তাহা অতি নির্বোধ মন্তব্য, কেন না জীবন আমাদিগকে প্রতি পদে আপোষের জন্য প্রেরণা দিতেছে। অন্য দেশ বা জাতির সম্পর্কে ঐ কথা বলাও সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু যখন কোন ব্যবস্থা বা বিশেষ শ্রেণীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে ঐ কথা বলা হয়, তখন উহাতে কিছু পরিমাণে সত্য থাকে; কেন না, তখন উহা সকলের সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়ায়। ভারতের স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—এ দুইটি পরস্পরবিরোধী বস্তু; কি সামরিক আইন, কি জগতের সমস্ত মধু আনিয়া ঢালিয়া দিলেও এ দুই-এর মিলন মিশ্রণ কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কেবল যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অপসারিত হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত ব্রিটিশ-ভারতীয় সহযোগিতার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হইবে।

আমরা শুনিয়াছি, আধুনিক জগতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বা অনধীনতা অতি সঙ্কীর্ণ আদর্শ; কেন না, অধুনা সকলেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অতএব, আমরা উহা দাবী করিয়া সেকেলে হইয়া পড়িতেছি। লিবারেল, শান্তিবাদী, এমন কি ব্রিটেনের তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা পর্যন্ত এই অজুহাত তুলিয়া আমাদের সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের জন্য ভর্ৎসনা করেন এবং প্রসঙ্গতঃ আমাদের বলেন যে, "ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ অব নেশনস্‌"এর মধ্যেই আমাদের জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর। ইহা আশ্চর্য যে, ইংলণ্ডের লিবারেল, শান্তিবাদী, সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি সকলের পথই সাম্রাজ্য-রক্ষার মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ট্রটস্কী বলিয়াছেন, "শাসক জাতির প্রচলিত ব্যবস্থা রক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা জাতীয়তা অপেক্ষাও উচ্চতর ভাবের আবরণে প্রকাশ পায়, যেমন বিজয়ী জাতি লুণ্ঠনলব্ধ সম্পদ হস্তগত করিয়া সহজেই শান্তিবাদী সাজিয়া বসে। এইরূপে গান্ধীর সম্মুখে ম্যাকডোনাল্ড নিজেকে আন্তর্জাতিকতাবাদী মনে করিতেছেন।"

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলে ভারত কি হইবে, কি করিবে, তাহা আমি জানি না। তবে আমি ইহা জানি যে, আজ যাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ব্যাপক আন্তর্জাতিকতাতেও বিশ্বাসী। সমাজতান্ত্রিকের নিকট জাতীয়তাবাদের কোন অর্থ নাই কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নহেন এমন অনেক কংগ্রেসপন্থীও আন্তর্জাতিকতার অনুরাগী। আমরা জগৎ হইতে স্বতন্ত্র হইবার জন্য স্বাধীনতা চাহিতেছি না। পক্ষান্তরে, প্রকৃত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য অন্যান্য দেশের সহিত সমানভাবে আমরাও স্বাধীনতার নিদর্শন

ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু কোন সাম্রাজ্যনীতিক পদ্ধতি, তাহাকে যে কোন বড় নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, ঐ প্রকার ব্যবস্থার তাহা বিরোধী এবং উহা দ্বারা কোন দিন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অথবা জগতে শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা নাই।

আধুনিক ঘটনার গতি হইতে জগতের সর্বত্রই দেখা যাইতেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ক্রমশঃ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা আত্মনির্ভরশীল হইবার চেষ্টা করিতেছে। আন্তর্জাতিকতার প্রসার ও পরিপুষ্টির পরিবর্তে আমরা উহার বিপরীত গতিই দেখিতে পাইতেছি। ইহার কারণ আবিষ্কার করা খুব কঠিন নহে, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় উহা দৌর্বল্যেরই পরিচায়ক। এই নীতির ফলে সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইলেও ইহাতে অবশিষ্ট জগৎ হইতে স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টারও অভাব নাই। ভারতেও আমরা ওট্টাওয়া ও অন্যান্য চুক্তি দেখিয়াছি, যাহার ফলে বিভিন্ন দেশের সহিত সম্পর্ক ও আদান-প্রদান ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। আমরা পূর্বাপেক্ষা ব্রিটিশ বাণিজ্যনীতির অধিকতর মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি। ইহার আশু অনিষ্টকারিতা তো রহিয়াছেই, ভবিষ্যৎ ফলও ভয়াবহ। এইভাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বাতন্ত্র্যেরই পথ, আন্তর্জাতিকতার পথ নহে।

কিন্তু আমাদের লিবারেল বন্ধুদের ব্রিটিশ নীল চশমার মধ্য দিয়া জগৎকে—বিশেষভাবে তাঁহাদের স্বদেশকে—দেখিবার এক আশ্চর্য দক্ষতা আছে। কংগ্রেস কি বলে, কেন বলে তাহা তাঁহারা বুঝিবার চেষ্টাও করেন না, তাঁহারা পুরাতন বৃটিশ-যুক্তি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া বলেন, স্বাধীনতা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের তুলনায় সঙ্কীর্ণতর। আন্তর্জাতিকতা বলিতে তাঁহাদের দৌড় লণ্ডনের ব্রিটিশ সরকারী দপ্তরখানা পর্যন্ত। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে তাঁহারা গভীরভাবেই অজ্ঞ, ইহার কারণ ভাষার বিভিন্নতা, আরও কারণ যে তাঁহারা উদাসীন থাকিয়াই সুখী। তাঁহারা নিশ্চয়ই ভারতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক অথবা আক্রমণশীল রাজনীতি পছন্দ করেন না। তবে বিস্ময়ের এই যে, এই দলের কয়েকজন নেতা অন্যদেশে অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে আপত্তি করেন না। দূর হইতে তাঁহারা উহার তারিফ করেন এবং পাশ্চাত্য দেশের কতিপয় আধুনিক ডিক্টেটরকে তাঁহারা মনে মনে পূজা করেন।

নাম দেখিয়া অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু ভারতে আমাদের সম্মুখে প্রধান প্রশ্ন—এক নূতন রাষ্ট্র আমাদের লক্ষ্য, না, কেবলমাত্র এক নূতন শাসনপদ্ধতি আমরা কামনা করিতেছি? লিবারেলদের উত্তর অতি স্পষ্ট, তাঁহারা শেষোক্ত ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই চাহেন না; এমন কি, ক্রম-অগ্রসরমূলক দূরবর্তী আদর্শরূপেও নহে। 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন' শব্দটি তাঁহারা বারম্বার উচ্চারণ করেন, কিন্তু উঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য "কেন্দ্রীয় দায়িত্ব" এই রহস্যময় দাবীর আকারে প্রকাশ পায়। ক্ষমতা, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি শব্দ তাঁহাদের নিকট ভয়াবহ। আইনজীবীর ভাষা ও ভঙ্গীর প্রতিই তাঁহাদের অত্যধিক অনুরাগ, তাহাতে জনসাধারণ কোন প্রেরণা না পাইলেও ক্ষতি নাই। বিশ্বাস ও স্বাধীনতার জন্য ব্যক্তি বা দল বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করিয়াছে, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু মডারেটগণ "কেন্দ্রীয় দায়িত্ব" অথবা অনুরূপ কোন আইনসম্মত বাক্যের জন্য ইচ্ছা করিয়া একদিনের অন্ন বা এক রাত্রির সুনিদ্রা নষ্ট করিতে প্রস্তুত আছেন কি না সন্দেহ।

অতএব তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁহারা কোন 'প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক' অথবা আক্রমণমূলক কার্য করিবেন না। কিন্তু যাহা তাঁহারা করিবেন, তাহা মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর ভাষায়,—"বুদ্ধি, বিবেচনা, অভিজ্ঞতা, সংযম, খোসামোদ করিবার শক্তি, স্নিগ্ধপ্রভাব এবং প্রকৃত যোগ্যতা" প্রদর্শন। তাঁহাদের ভরসা যে, আমরা সদ্ব্যবহার ও ভাল কাজ দেখাইয়া পরিণামে আমাদের শাসকগণকে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে রাজী করাইতে পারিব। এ কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদের আক্রমণ-মূলক কাজকর্মে তাঁহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছেন অথবা আমাদের যোগ্যতায় তাঁহারা সন্দেহ করেন; কিম্বা উভয় কারণেই তাঁহাদের মনোভাব আমাদের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদ ও বর্তমান অবস্থায় এই বিশ্লেষণ বালকোচিত সন্দেহ নাই। শাসকশ্রেণীর সহিত সহযোগিতা করিয়া ধাপে ধাপে ক্ষমতা লাভ করা সম্পর্কে অধ্যাপক আর. এইচ. টাউনী অতি সঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি ব্রিটিশ শ্রমিকদলকে লক্ষ্য করিয়া লিখিলেও ভারতের পক্ষেই উহা সমধিক প্রযোজ্য, কেন না, ইংলণ্ডে অন্ততঃপক্ষে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রহিয়াছে এবং মতবাদের দিক দিয়া অধিকাংশের মতের মর্যাদা আছে, ইহাও স্বীকৃত হয়। অধ্যাপক টাউনী লিখিতেছেন,—

"পেঁয়াজের খোসা একটি একটি করিয়া ছাড়াইয়া খাওয়া যায়; কিন্তু জীবন্ত বাঘের এক একটি থাবা ধরিয়া ছাল ছাড়ান যায় না, কেন না, জীবন্ত জীবদেহ ছিন্নভিন্ন করা তাহার পেশা এবং তুমি ছাল ছাড়াইবার পূর্বে সে-ই তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করিবে......

"যদি কোন দেশের বিশেষ সুবিধাভোগী সম্প্রদায় সরল ও বোকা থাকে, তবে সে দেশ ইংলণ্ড নহে। কৌশল ও অমায়িকতার সহিত শ্রমিকদলের স্বার্থের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ঐগুলি যে তাঁহাদের স্বার্থেরও অনুকূল, ইহা বুঝাইয়া ঠকাইবার আশা নিষ্ফল; যেমন যাহার হাতে সম্পত্তির পাকা দলিল আছে, সেই ঝানু এটর্নীকে ধাপ্পা দিয়া সম্পত্তি হস্তগত করা অসম্ভব। ব্রিটিশ ধনীসমাজ বিনয়ী, চতুর, শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসী এবং চাপে পড়িলে তাঁহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হন। তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন যে, তাঁহাদের রুটির কোন্ দিকে মাখন এবং এই মাখন সরবরাহে টান না পড়ে, সেদিকে তাঁহাদের খর দৃষ্টি। যদি তাঁহাদের অবস্থা বিপন্ন হইবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে তাঁহারা প্রত্যেকটি পয়সা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আক্রমণে নিয়োজিত করিবেন—লর্ডসভা, রাজমুকুট, সংবাদপত্র, সৈন্যদলে অসন্তোষ, অর্থনৈতিক সঙ্কট, আন্তর্জাতিক জটিলতা, এমন কি ১৯৩১ সালে সংবাদপত্রে পাউণ্ডের উপর আক্রমণকালে যাহা দেখা গিয়াছে, সেই ভাবে ফরাসী-বিদ্রোহের সময় পলায়িত রাজতন্ত্রীদের ন্যায় তাঁহারাও পকেট বাঁচাইবার জন্য স্বদেশের ক্ষতি করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না।"

ব্রিটিশ শ্রমিকদল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। ইহার পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ চাঁদাদানকারী সদস্য-সমন্বিত ট্রেড্-ইউনিয়ন বা শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি রহিয়াছে; ইহাদের সমবায়-সমিতিগুলিও বহুল পরিমাণে উন্নত, উচ্চতর বুদ্ধিজীবি-সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহাদের অনেক সদস্য ও সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি রহিয়াছেন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ব্রিটেনে আছে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতারও প্রাচীন পরম্পরাগত ধারণা বিদ্যমান। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও মিঃ টাউনীর মতে শ্রমিকদল সহজে হাসিয়া অনুনয় করিয়া প্রকৃত ক্ষমতা অর্জন করিতে পারিবেন না। আধুনিক ঘটনাগুলিতে তাঁহার এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ টাউনীর মতে, যদি বৃটিশ শ্রমিকদল ক্ষমতা দখল

সংখ্যাগরিষ্ঠও হন, তাহা হইলেও, বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিয়া কোন আমূল পরিবর্তনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারিবেন না; কেন না, তাহারাই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজস্ব সম্পর্কিত এবং সামরিক দুর্গগুলি অধিকার করিয়া আছে। ভারতের অবস্থা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। এখানে কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নাই, তাহার পারম্পর্যও নাই। তাহার পরিবর্তে আমাদের আছে—সুপ্রতিষ্ঠিত অর্ডিন্যান্স, ডিক্টেটরী শাসন, ব্যক্তিগত বক্তৃতা, লেখা, সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচ ও দমন। লিবারেলদের পশ্চাতে কোন শক্তিশালী সঙ্ঘ নাই। হাসিমুখ ছাড়া তাঁহাদের অন্য কোন সম্বল নাই।

লিবারেলগণ "নিয়মতন্ত্র-বিরোধী" এবং "বে-আইনী" কার্যপদ্ধতির তীব্র নিন্দা করিয়া থাকেন। যে সকল দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে, সেখানে "নিয়মতান্ত্রিক" শব্দটি এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা আইন প্রণয়ন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ হয়, ইহা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে, ইহা শাসকগণকে সংযত রাখে, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধনের অনুকূল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইহাতে থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ কোন নিয়মতন্ত্র নাই এবং ঐ শব্দ দ্বারা এখানে পূর্বকথিত কোন ব্যবস্থা বুঝায় না।* ঐ শব্দটি এদেশে ব্যবহার করার ফলে যে ধারণার সৃষ্টি হয়, বর্তমান ভারতের কোথাও তাহার স্থান নাই। 'নিয়মতান্ত্রিক' এই শব্দটি এদেশে প্রায়ই শাসক-শ্রেণীর অল্পবিস্তর স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যের সমর্থনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অথবা ইহা ছাড়া "আইনসংগত" এই অর্থেও ঐ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আমাদের পক্ষে "আইনসংগত" ও "বে-আইনী" এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করা অনেক ভাল যদিও উহার অর্থও অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট; কেন না, দিনে দিনে উহারও অনেক পরিবর্তন হয়।

নূতন অর্ডিন্যান্স ও নূতন আইন নূতন নূতন অপরাধ সৃষ্টি করে। কোন সভায় উপস্থিত হওয়া অপরাধ হইতে পারে; এমনি ভাবে বাইসাইকেল চড়া, কোন বিশেষপ্রকার পোষাক পরা, সূর্যাস্তের সময় গৃহে না থাকা, প্রত্যহ পুলিশে হাজিরা না দেওয়া, এই শ্রেণীর বহুতর কাজ আজ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে অপরাধ বলিয়া গণ্য। কোন বিশেষ কাজ দেশের এক অঞ্চলে হয়ত অপরাধ, অন্যত্র নহে। এবং এই শ্রেণীর আইন যখন জনমতের নিকট দায়িত্বহীন শাসকগণ যে কোন মুহূর্তে খুসীমত রচনা করিতে পারেন, তখন "আইনসঙ্গত" এই শব্দটির অর্থ শাসকমণ্ডলীর ইচ্ছা ছাড়া অধিক কিছু নহে। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, এই ইচ্ছা মানিতে হইবে, অমান্য করিলে যে ফল হইবে তাহা প্রীতিপ্রদ নহে। যদি কেহ বলে যে, সে সর্বদাই ইহা মান্য করিবে, তাহার অর্থ ডিক্টেটরী অথবা দায়িত্বহীন প্রভুত্বের নিকট হীন বশ্যতা স্বীকার, নিজের বিবেক বর্জন এবং তাহার কার্যপ্রণালী দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন চিরদিন অসম্ভবই থাকিবে।

নিয়মতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা বর্তমানে হাতে আছে, তাহা দিয়াই সাধারণ উপায়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর কি না, ইহা লইয়াই আজকাল প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই আলোচনা চলিতেছে। অনেকের মতে ইহা সম্ভবপর

* বিখ্যাত লিবারেল নেতা এবং 'লীডার' পত্রের সম্পাদক মিঃ সি. ওয়াই. চিন্তামণি যুক্তপ্রদেশের আইনসভায় পার্লামেন্টারী জয়েন্ট কমিটির রিপোর্ট সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, ভারতে কোন প্রকার নিয়মতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট নাই, বর্তমানে নিয়মতন্ত্রহীন গভর্নমেন্ট বরং ভাল, ভবিষ্যতের গভর্নমেন্ট অধিকতর নিয়মতন্ত্রহীন এবং অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতি-বিরোধী হইবে।"

নহে, কিন্তু অসাধারণ বা বৈপ্লবিক উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতে আমাদের উদ্দেশ্যের দিক দিয়া এই যুক্তিতর্কের নির্ধারণ একান্তই মূল্যহীন, কেন না আমাদের প্রার্থিত পরিবর্তন সাধনের উপযোগী কোন নিয়মতন্ত্রই আমাদের নাই। যদি হোয়াইট পেপার বা অনুরূপ কোন শাসন-ব্যবস্থা আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে নানাদিকে নিয়মতান্ত্রিক উন্নতির পথ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যাইবে। বিদ্রোহ বা বে-আইনী কার্য ছাড়া অন্য কোন পথই থাকিবে না। তাহা হইলে লোকে কি করিবে? সমস্ত পরিবর্তনের আশা ছাড়িয়া দিয়া নিয়তির নিকট আত্মসমর্পণ করিবে।

বর্তমান ভারতের অবস্থা অধিকতর অস্বাভাবিক। সর্বপ্রকার জনসাধারণের সম্মিলিত কার্য শাসকমণ্ডলী বন্ধ করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন। যে কোন কাজ তাঁহাদের মতে বিপজ্জনক হইলেই তাহা বন্ধ করা হয়। এইভাবে সমস্ত প্রকার কার্যকরী প্রচেষ্টার পথই রুদ্ধ করা যাইতে পারে এবং গত তিন বৎসর তাহা করা হইয়াছে। ইহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করার অর্থ সর্বপ্রকার সম্মিলিত কার্য একেবারে পরিত্যাগ করা। কিন্তু এরূপ অবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া অসম্ভব।

কেহ বলিতে পারে না যে, সে তিলমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া সর্বদাই আইন-সংগত কার্য করিবে। এমন কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও অনেকে বিবেকের নির্দেশে ভিন্নরূপ আচরণ করিতে বাধ্য হন। স্বেচ্ছাচারমূলক অথবা খামখেয়ালীর সহিত যে সকল দেশ শাসিত হয়, সেখানে সচরাচরই এই শ্রেণীর ঘটনা ঘটিতে বাধ্য; কেন না, এরূপ রাষ্ট্রের আইনের কোন নৈতিক যৌক্তিকতা নাই।

লিবারেলগণ বলেন, "প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ডিক্টেটরীর অনুকূল, গণতন্ত্রের নহে, যাহারা গণতন্ত্রের জয় কামনা করে তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়িতে হইবে।" ইহা চিন্তার আবিলতা ও শিথিল লেখনীর পরিচায়ক। সময় সময় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ-মূলক কার্য, যেমন—শ্রমিক ধর্মঘট—সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু সম্ভবতঃ এখানে রাজনৈতিক কার্যের কথা বলা হইয়াছে। আজ জার্মাণীতে হিটলারের অধীনে কোন্ প্রকার কার্য করা সম্ভব? হয় হীনভাবে বশ্যতা স্বীকার, নয়, বে-আইনী বা বৈপ্লবিক কার্য। সেখানে কিভাবে গণতন্ত্রের সেবা করা যাইতে পারে?

ভারতীয় লিবারেলেরা প্রায়ই গণতন্ত্রের উল্লেখ করেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও উহার নিকট যাইবার অভিপ্রায় নাই। অন্যতম প্রধান লিবারেল নেতা স্যর পি. এস. শিবস্বামী আয়ার ১৯৩৪ সালের মে মাসে বলিয়াছেন, "গণ-পরিষদ আহ্বানের পক্ষে ওকালতী করিতে গিয়া কংগ্রেস জনতার বুদ্ধি বিবেচনার উপর অতিমাত্রায় বিশ্বাস দেখাইয়াছেন এবং ইহার দ্বারা বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকে যে সকল ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের যোগ্যতা ও আন্তরিকতার উপর সুবিচার করা হয় নাই। গণ-পরিষদ যে ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু করিতে পারিবে, তাহাতে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।" কাজেই দেখা যাইতেছে, স্যর শিবস্বামী গণতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝেন, তাহা 'জনতা' হইতে পৃথক এবং উহা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত 'বিশ্বস্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিদের সহিত বেশ খাপ খায়। তিনি হোয়াইট পেপারকে দুই হাতে বরণ করিয়াছেন, যদিও উহাতে তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই তথাপি তিনি মনে করেন যে, সরাসরি ভাবে ইহার প্রতিবাদ করা দেশের পক্ষে সুবিবেচনার কার্য হইবে না।" ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং পি. এস. শিবস্বামী আয়ারের মধ্যে অতি প্রগাঢ় সহযোগিতা না হইবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কংগ্রেস নির্পদ্রব প্রতিরোধ প্রত্যাহার করায় লিবারেলগণ স্বভাবতঃই আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই 'নির্বোধ ও অযৌক্তিক' আন্দোলন হইতে দ্রে সরিয়া থাকিয়া তাঁহারা যে স্‌বিবেচনা দেখাইয়াছেন, সে জন্য তাঁহারা বাহাদ্‌রী লইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছ্‌ই নাই। তাঁহারা আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন, 'আমরা কি ইহা প্‌র্বেই বলি নাই?' ইহা এক অদ্ভুত য্‌ক্তি! যেহেতু আমরা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি এবং প্রাণপণে য্‌দ্ধ করিয়াছি, অবশেষে ধরাশায়ী হইয়াছি, অতএব তাহা হইতে এই নৈতিক সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইল যে, উঠিয়া দাঁড়ান অত্যন্ত মন্দ। ব্‌কে হাঁটাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাধিক নিরাপদ। ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় থাকিলে ধাক্কা দিয়া ধরাশায়ী করা একান্তই অসম্ভব ব্যাপার।

৫৩

প্রাচীন ও নবীন ভারত

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যে পর-শাসনের প্রতি র্‌ষ্ট হইবে ইহা অনিবার্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা অত্যন্ত কৌতুকের বিষয়। এই মতবাদের উপর তাঁহারা নিজেদের য্‌ক্তিজাল রচনা করিতেন এবং কেবলমাত্র কতকগ্‌লি বাহ্য লক্ষণের সমালোচনা করিবার সাহস দেখাইতেন। স্কুল এবং কলেজে ইতিহাস, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সমস্তই ব্‌টিশ সাম্রাজ্যনীতির মতবাদের দিক হইতে রচিত এবং উহাতে আমাদের অতীত ও বর্তমানের বহ্‌তর দোষ ত্র্‌টি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে এবং ব্‌টিশের গ্‌ণাবলী ও উচ্চ আদর্শের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিকৃত বিবরণ আমরা কতকাংশে গ্রহণ করিয়াছি এবং এমন কি, যখন আমরা ইহাকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি তখনও অলক্ষ্যভাবে আমরা ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছি। প্রথমভাগে ব্‌দ্ধির দিক হইতে ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায় ছিল না; কেন না, অন্য প্রকার ঘটনা ও য্‌ক্তিজাল আমরা জানিতাম না। কাজেই আমরা এক প্রকার ধর্মগত জাতীয়তাবাদের মধ্যে সান্ত্বনা খ্‌ঁজিয়াছি এবং ভাবিয়াছি, অন্ততঃ ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা জগতে কোনও জাতি অপেক্ষা কম নহি। আমাদের দ্‌র্ভাগ্য ও অধঃপতনের মধ্যেও আমরা নিজেদের এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছি যে, যদিও পাশ্চাত্যের বাহ্য চাকচিক্য, ঐশ্বর্য আমাদের নাই, তথাপি আমাদের যে চিন্তাসম্পদ আছে, তাহা বহ্‌ গ্‌ণে ম্‌ল্যবান ও দ্‌র্লভ। বিবেকানন্দ, আমাদের প্রাচীন দর্শন-শাস্ত্রে অন্‌রাগী পণ্ডিতগণ এবং আরও কেহ কেহ আমাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাজ্ঞান অনেকাংশে জাগ্রত করিয়াছেন এবং অতীতকাল সম্পর্কে আমাদের প্রস্‌প্ত গৌরব-বোধকে প্‌নর্‌জ্জীবিত করিয়াছেন।

ক্রমশঃ আমরা সন্দেহ করিতে লাগিলাম, আমাদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ব্‌টিশ বিবরণগ্‌লি সমালোচকের দ্‌ষ্টিতে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু তখনও আমাদের চিন্তা ও কার্যপ্রণালী ব্‌টিশ মতবাদের কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যদি কোন জিনিষ মন্দ হয়, তাহাকে বলা হইত 'অ-ব্রিটিশ'; যদি ভারতে কোন ইংরাজ দ্‌র্ব্যবহার করিত, তাহা হইলে সে দোষ তাহার ব্যক্তিগত,

কোন ব্যবস্থা তাহার জন্য দায়ী নহে। কিন্তু গ্রন্থকারদিগের মডারেটীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী সত্ত্বেও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনামূলক যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছে এবং আমাদের জাতীয়তাবাদের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি রচনা করিয়াছে। এইভাবে দাদাভাই নৌরজীর 'Poverty and Un-British Rule in India', রমেশ দত্ত, উইলিয়ম ডিগবি এবং অন্যান্য ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ আমাদের জাতীয় চিন্তাধারা পরিপুষ্টির পথে বৈপ্লবিক প্রেরণা যোগাইয়াছে। অধিকতর অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বহু সুদূর অতীতকালের কীর্তি-সমুজ্জ্বল সুসভ্য যুগ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আমরা অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত তাহা পাঠ করিয়াছি। আমরা আরও দেখিলাম যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যে বিবরণ তাঁহাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিয়া তাঁহারা আমাদিগকে বিশ্বাস করাইয়াছেন, তাহা প্রকৃত ঘটনা হইতে পৃথক।

ব্রিটিশ-রচিত ইতিহাস, অর্থনীতি ও ভারতের শাসনব্যবস্থার সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধিতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহাদের মতবাদের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াই কাজ করিতে লাগিলাম। শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্রভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অবস্থা ইহাই ছিল। এখনও লিবারেল দল ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শ্রেণীগুলি, এমন কি কতিপয় মডারেট কংগ্রেস-পন্থীও প্রায় সেই অবস্থাতেই আছেন, যদিও মাঝে মাঝে ভাবাবেগে তাঁহারা অগ্রসর হন, তথাপি জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক দিয়া তাঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বাস করেন। এই কারণেই লিবারেলগণ ভারতীয় স্বাধীনতার কথা ধারণায় আনিতে পারেন না। কেন না, এই দুই পৃথক মনোভাবের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। তাঁহারা কল্পনা করেন, ধাপে ধাপে তাঁহারা বড় বড় সরকারী উচ্চপদ পাইবেন এবং মোটা মোটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল লইয়া নাড়াচাড়া করিবেন। গভর্ণমেণ্টের শাসনযন্ত্র পূর্বের মতই মসৃণভাবে চলিতে থাকিবে, কেবল তাঁহারা থাকিবেন ধুরন্ধর এবং বহুদূরে পশ্চাতে থাকিবে ব্রিটিশ সৈন্যদল; কিন্তু তাহারা বড় বেশী হস্তক্ষেপ করিবে না, কেবল প্রয়োজনের সময় আসিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে। সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন লাভের ইহাই তাঁহাদের ধারণা। এই বালকোচিত আশা কোন দিনই পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না বৃটিশের আশ্রয়-প্রার্থনার মূল্যই হইল ভারতের পরাধীনতা। এমন কি, যদি ইহা এক মহান দেশের আত্ম-মর্যাদার অপমানজনক নাও হয়, তথাপি আমরা দুই কূল বজায় রাখিতে পারিব না। স্যার ফ্রেডারিক হোয়াইট (ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতী নহেন) সদ্য প্রকাশিত একখানি পুস্তকে লিখিয়াছেন, 'তাহারা (ভারতীয়গণ) এখনও বিশ্বাস করে যে, ইংলণ্ড বিপদের সময় তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যতদিন পর্যন্ত তাহারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবে, ততদিন তাহারা তাহাদের নিজস্ব স্বায়ত্ত-শাসনের আদর্শের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না।" তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি থাকাকালীন যে শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, সেই সকল লিবারেল, প্রগতিবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী শ্রেণীর ভারতীয়ের মনোভাবই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের এরূপ বিশ্বাস নাই এবং অগ্রগামী দলও এরূপ বিশ্বাস করেন না। যাহা হউক, তাঁহারা সকল শ্রেণীর লোকের সহিত এবিষয়ে একমত হইবেন। ঐ ভ্রান্ত ধারণা থাকা পর্যন্ত স্বাধীনতা আসিতে পারে না এবং যদি ভারতের অদৃষ্টে কোনও বিপদ থাকে, তবে তাহাকে একাকী সে বিপদের সম্মুখীন হইতে দেওয়া উচিত। ভারতের ব্রিটিশ সামরিক নিয়ন্ত্রণ

সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া লওয়ার পর ভারতের স্বাধীনতার আরম্ভ হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ব্রিটিশ মতবাদের মধ্যে আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু ইহাই বিস্ময়ের যে এই বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তন ও যুগান্তকারী ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও বহুলোক এই ভ্রান্ত ধারণা লইয়াই বসিয়া আছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ শাসকশ্রেণীগুলি জগতের সেরা অভিজাত ছিলেন, ঐশ্বর্য, সাফল্য, শক্তির কৌলিক গৌরব তাঁহাদের ছিল। এই বংশপরম্পরাগত কীর্তি এবং তাহার শিক্ষা হইতে তাঁহারা যেমন বহু গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন তেমনি অভিজাতসুলভ অনেক দোষও তাঁহাদের মধ্যে ছিল। গত পৌণে দুই শতাব্দী ধরিয়া আমরা এই আভিজাত্যের গুণগরিমা বিকাশের রসদ জোগাইয়াছি এবং তাহাতে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। অতীতে অন্যান্য সম্প্রদায় বা জাতি যাহা করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপেই ইংরাজরাও ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন যে, তাঁহারা ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট এবং তাঁহাদের সাম্রাজ্য মর্তের স্বর্গরাজ্য। যদি তাঁহাদের এই বিশেষ মর্যাদা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে প্রশ্ন না উঠে, তাহা হইলে তাঁহারা সর্বদাই দয়ালু ও অতি অমায়িক। অবশ্য নিজেদের অনিষ্ট না হইলে অনুগ্রহ করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধতা করার অর্থই হইতেছে ঐশ্বরিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করা। সে ক্ষেত্রে তাহা দমন করিতেই হইবে।

ব্রিটিশ মনস্তত্ত্বের এই দিকটা মঃ আঁদ্রে সিগফ্রিদ অতি সুন্দররূপে তাঁহার "লা ক্রিজ ব্রিতানিক য়ো ভ্যাঁতিয়েম সিয়েকল" নামক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন।

"শক্তি ও ঐশ্বর্যের সমবায়ে বংশানুক্রমিক অভ্যাসবশতঃ তাহার জীবনযাত্রার ভঙ্গীর মধ্যে এমন এক আভিজাত্যের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে যে, সে মনে করে, তাহার জন্মপ্রাপ্ত অধিকার বিধাতৃনির্দিষ্ট। যখনই বৃটিশের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে, তখন ঐ ভাব অধিকতর উগ্র হইয়া উঠে। শতাব্দীর শেষভাগে নবীন ব্রিটনগণ একরূপ অজ্ঞাতসারেই মনে করিতেন যে, এই সাফল্য তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য।

"এই ধারণার ভিত্তিতে বস্তু ও ঘটনার বিচারে অভ্যস্ত ব্রিটিশ ব্যবহারগুলি দেখিলে, উহা অতি লঘু ও সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে ব্রিটিশ মনস্তত্ত্বের উপর কি প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। যে কেহ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, ইংলণ্ড তাহার বর্তমান সঙ্কটগুলির কারণ নানা বাহ্য ব্যাপারের উপর আরোপ করিতে চাহে। সে সর্বদাই অপরের দোষ দেখে এবং মনে করে ঐ অপর যদি আত্মসংশোধন করে, তাহা হইলেই ব্রিটিশ তাহার পুরাতন ঐশ্বর্য ফিরিয়া পায়। নিজের কোন সংস্কার বা পরিবর্তন না করিয়া ব্রিটিশগণ সর্বদাই পরের সংশোধন ও সংস্কার করিতে ব্যগ্র থাকে।"

যদি অবশিষ্ট জগতের প্রতি ইহাই ব্রিটিশ মনোভাব হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষেই তাহা সর্বাধিক প্রভাক। ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটিশ মনোভাব যদিও অত্যন্ত বিরক্তিকর তথাপি উহা কৌতূহলোদ্দীপক। নিজেদের অভ্রান্ততা এবং অতি গুরুদায়িত্ব বোঝাভার সহিত বহন করা সম্পর্কে অবিচলিত আস্থা, তাঁহাদের জাতীয় ভাগ্য এবং নিজস্ব নমুনায় সাম্রাজ্যনীতির উপর বিশ্বাস, এই সত্য বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সন্দেহাতুর অবিশ্বাসী ও পাপীদিগের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ, এই মনোভাব ধর্মান্দোলনের মতই গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ। প্রাচীনকালে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধবাদী পাষণ্ডদের উদ্ধার ও দমনের জন্য যে দল গঠিত হইয়াছিল, সেই "ইনকুইজিটরদের" মতই, আমাদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়াও তাঁহারা আমাদিগকে

উদ্ধার করিতে ব্যগ্র। ঘটনাচক্রে এই ধর্মের ব্যবসায়ে তাঁহাদের বেশ লাভ হয়। তাঁহারা সেই প্রাচীন প্রবচনের সত্যতা প্রমাণ করিয়া দেখাইতেছেন যে, "সাধুতাই সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি।" ভারতকে সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা এবং বাছা বাছা ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ ছাঁচে গড়িয়া তোলা আর ভারতের উন্নতি একই কথা। ব্রিটিশ আদর্শ ও উদ্দেশ্য আমরা যত বেশী গ্রহণ করিব, আমরা ততই "স্বায়ত্তশাসনের" যোগ্য হইব। যদি আমরা কার্যতঃ প্রমাণ করি এবং প্রতিশ্রুতি দেই যে, ব্রিটিশ অভিপ্রায় অনুসারেই আমরা স্বাধীনতার ব্যবহার করিব, তাহা হইলে অবিলম্বে উহা পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না।

ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের অতীত ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয়, ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে মতানৈক্য দৃষ্ট হইবে। সম্ভবতঃ ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু যখন ভারত-সচিবগণ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী ভারতের বর্তমান ও অতীতের সম্পর্কে কল্পনাপ্রসূত চিত্র অঙ্কিত করেন অথবা কোন বিবৃতি দেন যাহা প্রকৃত ঘটনার সহিত সম্পর্কহীন তখন উহা অত্যন্ত মর্মান্তিক হইয়া উঠে। মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞ ও কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরাজদের অজ্ঞতা অতিশয় গভীর। ঘটনাই যখন ইঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, তখন ভারতের মর্মনিহিত সত্য ইঁহাদের আয়ত্তের কত বেশী বাহিরে! তাঁহারা ভারতের বাহ্য দেহ অধিকার করিয়াছেন কিন্তু ইহা হিংসামূলক বাহুবলের অধিকার। তাঁহারা ভারতবর্ষকে জানেন না, জানিবার চেষ্টাও করেন না। তাঁহারা কখনও ভারতের চক্ষুর প্রতি চাহিয়া দেখেন নাই। কেন না, তাঁহাদের দৃষ্টি বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ এবং লজ্জা ও অপমানে ভারতের দৃষ্টি অবনত। শতাব্দীচক্রের সংস্রবের পরেও তাহারা পরস্পরের নিকট অপরিচিত এবং পরস্পরের প্রতি অপ্রীতিসম্পন্ন।

দারিদ্র্য ও অধঃপতন সত্ত্বেও এখনও ভারতের গর্ব ও গৌরবের অনেক কিছুই আছে। প্রাচীন পারম্পর্য ও বর্তমানের দুঃখ-ভারপীড়িত ভারতের চক্ষুতে ক্লান্তির ছায়া, তথাপি "তাহার অন্তরের সৌন্দর্য যাহা দেহে বিকশিত; কত আশ্চর্য চিন্তা, কত অপরূপ অনুধ্যান, কত মধুর আবেগ তাহার প্রাণের পরতে পরতে রহিয়াছে।" তাহার বিচূর্ণিত দেহের ভিতরে ও বাহিরে এখনও যে কেহ আত্মার মহিমা চাকিতে দেখিতে পায়। কত যুগ ধরিয়া ইতিহাস-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে সে কত জ্ঞান অর্জন করিয়াছে, কত অপরিচিত অতিথি আসিয়া তাহার বৃহৎ পরিবারে মিলিয়া গিয়াছে, কত উত্থান, কত পতন, প্রচণ্ড বেদনা, গভীর অসম্মান, কত আশ্চর্য দৃশ্য সে পর্যায়ক্রমে দেখিয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘ ভ্রমণেও সে তাহার চিরস্মরণীয় সংস্কৃতিকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে শক্তি ও তেজ আহরণ করিয়াছে এবং অন্যান্য দেশে তাহা বিতরণ করিয়াছে। উন্নতি অধঃপতনে—দুয়েরই চরম সে দেখিয়াছে, তাহার দুঃসাহসী চিন্তাজীবনও জগতের রহস্য মীমাংসা করিবার জন্য ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর লোকে গিয়াছে, আবার জঘন্য নরকের অতলে ডুবিবার তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাহার আছে। কুসংস্কার ও অধঃপতনের কদর্য স্তূপে আচার ও প্রথাগুলি ক্রমশঃ জমিয়া উঠিয়া তাহাকে দৃঢ়বলে চাপিয়া ধরিয়া অধঃপতনের দিকে লইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে তাহার প্রাচীন ঋষিগণ প্রদত্ত প্রেরণা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যায় নাই, যাঁহারা ইতিহাসের প্রথম প্রভাতে তাহাকে উপনিষদের বাণী শুনাইয়াছিলেন। তাঁহাদের তীক্ষ্ণ মন অবিরাম আবেগে তন্ন তন্ন করিয়া তথ্যানুসন্ধান করিয়াছে, কোনও যুক্তিহীন মতবাদ অথবা প্রাণহীন বাহ্য অনুষ্ঠানের পঙ্কে পড়িয়া আবর্তনের মধ্যে তাঁহারা নিমজ্জিত হ

ঢালিয়া দেন নাই। তাঁহারা ইহলোকে ব্যক্তিগত সুখ অথবা পরলোকে স্বর্গ কামনা করেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন আলোক, চাহিয়াছেন প্রজ্ঞা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই প্রার্থনা, 'আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও'! আজিও লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যহ যে বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া থাকে, তাহাও জ্ঞান লাভের, সত্যদৃষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা।

রাজনীতির দিক দিয়া ছিন্নভিন্ন হইলেও সে তাহার সর্বজনীন পরম্পরাগত সম্পদ রক্ষা করিয়াছে এবং বাহ্যতঃ বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক আশ্চর্য ঐক্য রক্ষা করিয়াছে।* অন্যান্য প্রাচীন ভূমির মতই তাহার মধ্যেও ভাল ও মন্দের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ভাল আজ লুক্কায়িত তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কিন্তু ধ্বংসের পচা গন্ধ সর্বত্রই প্রকাশিত এবং তীব্র সূর্যালোক নির্মমভাবে তাহার মন্দগুলি উদ্ঘাটিত করিতেছে।

ভারত ও ইতালীর মধ্যে অনেকটা ঐক্য বিদ্যমান। এই দুই প্রাচীন দেশের সুদীর্ঘকালের পরম্পরাগত সংস্কৃতি রহিয়াছে। তবে, ইতালী ভারতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নবীন এবং ভারতবর্ষ তুলনায় বিশালতর দেশ। উভয় দেশই রাষ্ট্রক্ষেত্রে বহুধা-বিভক্ত হইলেও ভারতের মত ইতালীর ঐক্যবোধ কখনও বিনষ্ট হয় নাই এবং তাহাদের সমস্ত বিভিন্নতার মধ্যেও এই ঐক্য সুপরিস্ফুট ছিল। ইতালীর ঐক্য প্রধানতঃ রোমান ঐক্য, সেই মহান নগরী সমগ্র দেশের উপর আধিপত্য করিয়াছে এবং ইহাই ঐক্যের উৎপত্তিস্থল ও প্রতীক ছিল। ভারতবর্ষে এরূপ কোন স্বতন্ত্র কেন্দ্র অথবা নগরীর আধিপত্য ছিল না। যদিও বারাণসীকে প্রাচ্যের 'চিরন্তন নগরী' বলা যাইতে পারে। ইহা কেবল ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র পূর্ব এশিয়ারই। কিন্তু রোমের মত বারাণসী কখনও সাম্রাজ্যলিপ্সু হয় নাই অথবা পার্থিব সম্পদের কথা চিন্তা করে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতি সমস্ত ভারতে এমন ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, দেশের কোন বিশেষ অংশকে ঐ সংস্কৃতির হৃৎপিণ্ড বলা যাইতে পারে না। কন্যাকুমারী হইতে হিমালয়ের অমরনাথ ও বদ্রিনাথ, দ্বারকা হইতে পুরী পর্যন্ত একই ভাবধারা প্রবাহিত—যদি কোন স্থানে ভাবধারাগুলির মধ্যে সম্ঘাত হইত, তাহা হইলে সে কোলাহল অনতিবিলম্বে দেশের অতি দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতেও গিয়া পৌঁছিত।

ইতালী যেমন সমস্ত পশ্চিম ইউরোপকে ধর্ম ও সংস্কৃতি দান করিয়াছে, ভারতবর্ষও পূর্ব এশিয়ার তাহাই করিয়াছে। অবশ্য চীনদেশ ভারতের মতই প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ। এমন কি, যখন ইতালী রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভূমিলুণ্ঠিত তখনও তাহার জীবনধারা ইউরোপের নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবাহিত হইয়াছে।

মেটার্নিক বলিয়াছেন যে, ইতালী একটি 'ভৌগোলিক অভিব্যক্তি' এবং অনেক পরবর্তী মেটার্নিক ভারতবর্ষ সম্পর্কেও ঐ বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং আশ্চর্য যে, এই উভয় দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেও সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। অস্ট্রিয়ার সহিত ইংলণ্ডের তুলনাও কম কৌতূহলপ্রদ নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অস্ট্রিয়ার

---

* "ভারতে বহু স্ববিরোধিতার মধ্যে ও সমস্ত বৈচিত্র্যের উপর এক অদ্ভুত ঐক্য বিদ্যমান—যাহা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। কেন না, ইহা রাষ্ট্রীয় ঐক্যরূপে কখনও সমগ্র দেশকে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির দিক দিয়া এক করিতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি ইহা অত্যন্ত বাস্তব এবং অত্যন্ত শক্তিশালী। এমন কি, ভারতের মুসলিম জনগণ পর্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকেন যে ইহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারাও অনিবার্যভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।"—স্যার ফ্রেডারিক হোয়াইট, 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্যের ভবিষ্যৎ'।

মতই বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ড গর্বিত উদ্ধত এবং প্রভুত্বপ্রবণ। কিন্তু যে শিকড় দিয়া সে শক্তি আহরণ করে, তাহা শুকাইয়া আসিতেছে এবং তাহার শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্ষয়রোগ প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে উহা জীর্ণ করিতেছে।

কোন দেশের উপর দেবত্ব আরোপ করিবার প্রলোভন অনেকেই দমন করিতে পারেন না, আদিম চিন্তার এমনই প্রভাব। ভারতবর্ষ ভারতমাতা হইয়াছেন—সুন্দরী নারী, অতি প্রাচীনা, কিন্তু চিরযৌবনা; বিষণ্ণ দৃষ্টি, ক্লিষ্ট মুখ, বিদেশী ও শত্রুর দ্বারা নিষ্ঠুর ব্যবহারে বিপন্না হইয়া সন্তানগণকে রক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এই শ্রেণীর চিত্র শত সহস্র হৃদয়ে ভাবাবেগ জাগ্রত করে এবং তাহাদিগকে আত্মত্যাগ ও কার্য করিতে প্রেরণা দেয়। কিন্তু ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষক ও শ্রমিকের দেশ, দেখিতে সুন্দর নহে; কেন না, দারিদ্র্যের মধ্যে কোন সৌন্দর্য নাই। আমাদের কল্পিত এই সুন্দরী নারী কি উলঙ্গদেহ, বক্রমেরুদণ্ড কারখানা ও কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকদের প্রতিচ্ছবি? অথবা ইহা সেই মুষ্টিমেয় শ্রেণীর, যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে জনসাধারণকে পদদলিত করিয়া শোষণ করিয়াছে, তাহাদের উপর নিষ্ঠুর প্রথা নিয়ম চালাইয়াছে, এমন কি, বহু সংখ্যককে একেবারে অস্পৃশ্য করিয়া ফেলিয়াছে? আমরা কল্পনার মূর্তি গড়িয়া সত্যকে আবৃত করিতে চাই, বাস্তবকে এড়াইবার জন্য স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করি।

বিভিন্ন শ্রেণীগত পার্থক্য এবং তাহাদের পরস্পরের বিভেদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষে সকলের মধ্যে এক সাধারণ ঐক্যসূত্র রহিয়াছে, ইহার অফুরন্ত প্রাণশক্তি, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এই শক্তি কিসের? ইহা কেবল মাত্র নিষ্ক্রিয় শক্তির তামসিক জড়ত্বের ভাব অথবা ঐতিহ্য নহে। অবশ্য যথাস্থানে ঐগুলিও মহান। ইহার মধ্যে এক সংরক্ষণমূলক ক্রিয়াশীল নীতি রহিয়াছে। কেন না, ইহা অতি শক্তিশালী বাহিরের প্রভাবকে সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করিয়াছে এবং ভিতর হইতে উদ্ভূত বিরুদ্ধ শক্তিকেও গ্রাস করিয়াছে। কিন্তু তথাপি এত শক্তি লইয়াও ইহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই, অথবা রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে চেষ্টা করিতে পারে নাই। এই বিষয়টিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই, অত্যন্ত নির্বোধের মত ইহাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে এবং আমরা ইহার ফলভোগ করিতেছি। ইতিহাসের মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ইহা কখনও রাজনৈতিক অথবা সামরিক জয়কে গৌরব প্রদান করে নাই, ইহা অর্থ এবং অর্থ-উপার্জনকারী শ্রেণীগুলিকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়াছে। সম্মান ও ঐশ্বর্য একত্র থাকিতে পারে না। অন্ততঃ মতবাদের দিক হইতেও যে ব্যক্তি বৎসামান্য অর্থ লইয়া সমাজের সেবা করিত, সম্মান তাহারই প্রাপ্য ছিল।

বহু ঝড়-ঝাপটার আঘাতে বিপর্যস্ত হইয়াও প্রাচীন সংস্কৃতি কোন মতে বাঁচিয়া আছে কিন্তু ইহার বাহিরের আকারই রহিয়াছে, ভিতরের বস্তু আর নাই। বর্তমান ভারত এবং অভিনব শক্তিমান প্রতিপক্ষ, ধনতন্ত্রী পাশ্চাত্যের বণিক-সভ্যতার সহিত নিঃশব্দে এবং জীবন-মরণ যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই নূতনের নিকট ইহার পরাজয় হইবে; কেন না, পাশ্চাত্যের হাতে বিজ্ঞান আছে এবং বিজ্ঞান লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিতকে অন্ন দিতে পারে। এই নূতন সভ্যতার প্রতিষেধকও পাশ্চাত্য আনিয়াছে, সমাজতন্ত্রবাদের নীতি, সহযোগিতা এবং সকলের কল্যাণের জন্য সমাজের সেবা। ইহা প্রাচীন ব্রাহ্মণদের সেবার আদর্শ হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। ইহার উদ্দেশ্য সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ করিয়া তোলা (অবশ্য, ধর্মের দিক দিয়া নহে) এবং সর্ববিধ শ্রেণীভেদ বিলুপ্ত

করা; এমনও হইতেও পারে, যখন ভারত তাহার জরাজীর্ণ প্রাচীন বসন ত্যাগ করিয়া নববস্ত্র গ্রহণ করিবে, তখন উহা সে এমন ভাবে নির্মাণ করিয়া লইবে, যাহা বর্তমান অবস্থার ও তাহার প্রাচীন চিন্তা উভয়েরই উপযোগী হইবে। তাহার ভূমিতে সতেজে বর্ধিত হইতে পারে, এমন ভাবেই সে উহা গ্রহণ করিবে।

৫৪

ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমষ্টিগত বিবরণ কি? এই সুদীর্ঘ কাহিনী নিরপেক্ষ ও বাস্তব দৃষ্টিতে দেখা কোন ভারতীয় বা ইংরাজের পক্ষে সম্ভব কি না আমার সন্দেহ আছে এবং এমন কি, যদি ইহা সম্ভবপরও হয়, তাহা হইলেও সমসাময়িক মনস্তত্ত্ব ও অন্যান্য ব্যাপারের মাপকাঠিতে তাহা বিচার করা অধিকতর কঠিন। আমরা শুনিয়াছি যে, ব্রিটিশ শাসন "ভারতবর্ষকে এমন এক গভর্ণমেণ্ট দিয়াছে, যাহার প্রভুত্বে এই বিশাল দেশের কোন অংশে কেহ কোন প্রশ্ন করে না। অতীতের কোন শতাব্দীতেই ভারতবর্ষের ইহা ছিল না"* ইহা আইনসংগত এবং ন্যায়পরায়ণ, কর্মক্ষম শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ইহা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও পাশ্চাত্যের পার্লামেণ্টীয় গভর্ণমেণ্টের ধারণা ভারতবর্ষকে দিয়াছে এবং "সমগ্র ব্রিটিশ ভারতকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া ভারতীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত করিয়াছে" ও এইরূপে জাতীয়তাবাদের প্রথম বিকাশের উদ্বোধন করিয়াছে।* ইহাই ব্রিটিশ পক্ষের বলিবার কথা—ইহার মধ্যে অবশ্য অনেক সত্য আছে, যদিও বহুবর্ষ যাবৎ আইনের শাসন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অস্তিত্ব নাই।

ভারতীয় দৃষ্টিতে এই বৃটিশ যুগের এমন অনেক ঘটনা প্রতিভাত হয়, যাহা হইতে বুঝা যায় যে, বিদেশী শাসনের ফলে আমাদের কি মানসিক, কি বাহ্যিক কত ক্ষতি হইয়াছে। উভয়ের বিচার-প্রণালীর পার্থক্য এত বেশী যে, যে বিষয়ের প্রশংসায় ব্রিটিশ পঞ্চমুখ, ভারতীয়েরা তাহারই নিন্দা করিয়া থাকেন। যেমন, ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী লিখিয়াছেন, "ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এক স্মরণীয় নিদর্শন এই যে, ইহা বাহ্যতঃ করুণার মূর্তি ধরিয়াই ভারতবাসীর সর্বাধিক ক্ষতি করিয়াছে।"

কার্যতঃ বিগত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশেই অল্পাধিক ঘটিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি এবং পরে সমগ্র জগতে উহার প্রসারের সহিত জাতীয়তাবোধ আসিয়াছে এবং সর্বত্র রাষ্ট্রগুলি সংহত ও শক্তিশালী হইয়াছে। ব্রিটিশগণই প্রথম ভারতের দ্বার পশ্চিমের দিকে খুলিয়া দিয়াছে এবং পাশ্চাত্য শিল্প-বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের বার্তা আনিয়াছে, এ গর্ব তাঁহারা করিতে পারেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যতদিন পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে পড়িয়া বাধ্য হন নাই, ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা এই দেশের বাণিজ্যের উন্নতির কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ইতিপূর্বেই পূর্ব এশিয়ার নিজস্ব সৃষ্ট সংস্কৃতির সহিত পশ্চিম এশিয়ার ঐস্‌লামিক সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়াছিল। তাহার পর আসিল অধিকতর শক্তিশালী সুদূর

* ১৯৩৪ সালের জয়েন্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট হইতে উদ্ধরণগুলি গৃহীত।

পাশ্চাত্যের নূতন সভ্যতা এবং ভারতবর্ষ বহুতর প্রাচীন ও নবীন আদর্শের মিলনকেন্দ্র ও সংগ্রামভূমি হইয়া উঠিল। এই তৃতীয় শক্তি জয়ী হইয়া ভারতের বহু প্রাচীন সমস্যা সমাধান করিত সন্দেহ নাই কিন্তু যে ব্রিটিশ জাতি ইহা আনিলেন, তাঁহারাই ইহার উন্নতির পথ বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহারা আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি বন্ধ করিলেন, ইহাতে আমাদের রাজনৈতিক বিকাশের বিলম্ব ঘটিল এবং তাঁহারা এ দেশে বর্তমান কালের অনুপযোগী সামন্ততান্ত্রিক ও অন্যান্য যে সব প্রাচীন স্মৃতি পাইলেন তাহাই সযত্নে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আইন ও প্রথা-নিয়ম তাঁহারা যে আকারে তখন পাইয়াছিলেন, তাহাই জমাট করিয়া আমাদের অগ্রগতি বন্ধ এবং ঐ শৃঙ্খলগুলি হইতে মুক্তি পাওয়া অতিশয় কঠিন করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের সদিচ্ছা ও সহানুভূতিতে ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু ভারতে রেলপথ প্রবর্তিত হওয়ায় ও অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্যের প্রবর্তন হওয়ায় তাঁহারা পরিবর্তনের চক্র রোধ করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য উহাকে সংযত করিয়াছেন এবং উহার গতিও ধীর করিয়াছেন।

"এই দৃঢ় ভিত্তির উপর ভারত গভর্ণমেণ্টের মহান সৌধ স্থাপিত। এবং ইহা দৃঢ়তার সহিত দাবী করা যাইতে পারে যে, ১৮৫৮ সালের পর হইতে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে সমস্ত অধিকৃত ভূ-খণ্ডের উপর ব্রিটিশ মুকুটের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন হইতে ভারত শিক্ষার দিক দিয়া এবং পার্থিব উন্নতির দিক দিয়া যাহা অর্জন করিয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জটিল ইতিহাসের কোন যুগেই তাহা অর্জন করা তাহার ক্ষমতার অতীত ছিল।"* এই বিবরণ স্বতঃসিদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহা নহে; বরং বহুবার বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ-শাসনের পর হইতে শিক্ষার দিক দিয়া ভারত অবনত হইয়া পড়িয়াছে। যদি এই বিবৃতি সম্পূর্ণরূপে সত্যও হইত, তাহা হইলেও উহা আধুনিক যন্ত্রযুগের সহিত অতীত যুগগুলি তুলনার চেষ্টা মাত্র। বিজ্ঞান ও কলকারখানার জন্য বিগত শতাব্দীতে জগতের প্রায় সকল দেশেই শিক্ষা ও সম্পদের বিস্ময়কর উন্নতি ঘটিয়াছে এবং ইহাও নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, কোনও দেশের ঐ শ্রেণীর উন্নতি "তাহার সুদীর্ঘ জটিল ইতিহাসের কোন যুগেই অর্জন করা তাহার ক্ষমতার অতীত ছিল।" যদিও সেই সব দেশের ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাসের সহিত তুলনায় তত দীর্ঘ নাও হইতে পারে। এমন কি, ব্রিটিশ শাসন ছাড়াও এই যন্ত্রযুগে ঐ শ্রেণীর কিছু উন্নতি লাভ করিতে আমরা সমর্থ হইতাম, এ কথা বলিলে কি তাহা আমাদের নির্বুদ্ধিতা ও বিকৃত রুচির পরিচায়ক হইবে? অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের ভাগ্যের তুলনা করিয়া দেখিলে, আমরা কি কল্পনা করিতে পারি না যে, উন্নতি আরও অধিকতর হইতে পারিত? কেন না, আমাদিগকে ব্রিটিশগণ কর্তৃক ঐ উন্নতির গতিরোধ-চেষ্টার সহিত বিরোধিতা করিয়াই অগ্রসর হইতে হইতেছে। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি নিশ্চয়ই ব্রিটিশ শাসনের সদিচ্ছা ও উপকারের নিদর্শন নহে। এইগুলির প্রয়োজন আছে; কিন্তু যেহেতু ঘটনাক্রমে ব্রিটিশের মারফতেই এইগুলি প্রথম আসিয়াছে, সেইজন্য আমাদের তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু তথাপি, ভারতে কলকারখানার প্রথম প্রবর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ-বাণিজ্যের সুবিধা করা। ঐ সকল শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া জাতির রক্ত প্রবাহিত হইবে,

* জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্ট—১৯৩৪।

তাহার বাণিজ্য বাড়িবে, কাঁচা মাল রপ্তানি হইবে এবং লক্ষ লক্ষ মানব নূতন জীবন ও ঐশ্বর্য লাভ করিবে। হয়তো দীর্ঘকাল পরে এইরূপ কিছু সম্ভবপর হইবে; কিন্তু বর্তমানে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও প্রযুক্ত হইয়াছে—সাম্রাজ্যের বন্ধন দৃঢ় করা এবং ব্রিটিশ পণ্য দিয়া ভারতের বাজার দখল করা—এবং তাঁহারা সফলকাম হইয়াছেন। আমি কল-কারখানা ও আধুনিক যান-বাহনের পক্ষপাতী; কিন্তু সময় সময় জীবনপ্রদ রেলগাড়ীতে আমি যখন ভ্রমণ করি, তখন দুইদিকে বিশাল প্রান্তর-মধ্যবর্তী রেলপথ দেখিয়া মনে হয়, উহা যেন ভারতবর্ষকে শৃংখলাবদ্ধ বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

ভারত-শাসন সম্পর্কে ব্রিটিশ ধারণা পুলিশ শাসিত রাষ্ট্রের অনুরূপ। গভর্ণমেণ্টের কাজ হইল রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, অন্যান্য কাজ অপরের উপর অর্পিত। সাধারণ রাজস্ব তাঁহারা সমরবিভাগ, পুলিশ, শাসনবিভাগ, ঋণের সুদে ব্যয় করেন। জনসাধারণের অর্থনৈতিক প্রয়োজন লক্ষ্য করা হয় না এবং ব্রিটিশ স্বার্থের নিকট তাহা বলি দেওয়া হয়। অতি ক্ষুদ্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যতীত জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত প্রয়োজন উপেক্ষা করা হয়। সাধারণ রাজস্ব সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার পরিবর্তনের সহিত, অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষাপদ্ধতি, স্বাস্থ্যোন্নতি, দরিদ্র, উন্মাদ, দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের ভরণপোষণ, শ্রমিকদের রোগ, বৃদ্ধবয়স ও বেকারের জন্য বীমার ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্যান্য দেশে প্রবর্তিত হইয়াছে; কিন্তু এখানে গভর্ণমেণ্টের তাহা ধারণারও বাহিরে। এই সকল ব্যয়বহুল কার্যে বিলাসিতা করিবার ইহার শক্তি নাই। ইহার ট্যাক্স আদায়ের পদ্ধতি নিম্নাভিমুখী, অর্থাৎ যাহার আয় যত কম তাহাকে অধিকতর উপার্জন অপেক্ষা হারাহারি সূত্রে বেশী ট্যাক্স দিতে হয়। এবং ইহার দেশরক্ষা ও শাসনবিভাগের খরচ এত অধিক যে, রাজস্বের অধিকাংশই ইহাতে নিঃশেষিত হইয়া যায়।

ব্রিটিশ-শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা দেশের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ঐ সকল কেন্দ্রে সংহত করেন। বাদ বাকী আর যাহা কিছু উপলক্ষ্য মাত্র। যদি তাঁহারা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এবং কর্মকুশল পুলিশ-বাহিনী গঠিত করিয়া থাকেন, তবে সে সাফল্যের জন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই গর্ববোধ করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে ভারতবাসীর নিজেকে ধন্য মনে করিবার কোনই কারণ নাই। ঐক্য খুব ভাল কথা, কিন্তু দাসত্বের ঐক্য লইয়া গর্ব করা চলে না। যে কোন স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেণ্টের শক্তি জনসাধারণের নিকট দুর্বহ ভারে পরিণত হইতে পারে। পুলিশবাহিনী নানাদিকে প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা যে জনসাধারণের রক্ষক বলিয়া কথিত হয়, তাহাদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং প্রায়শঃ তাহা করাও হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদের সহিত আধুনিক সভ্যতার তুলনা করিতে গিয়া বারট্রাণ্ড রাসেল লিখিয়াছেন, "আমাদের সহিত তুলনায় গ্রীক সভ্যতা কেবলমাত্র এই দিক দিয়া উন্নত ছিল যে, তাহাদের কর্ম-কুশল পুলিশবাহিনী ছিল না, ফলে বহু ভদ্রব্যক্তি রক্ষা পাইতেন।"

ব্রিটিশ-প্রাধান্য ভারতবর্ষে শান্তি আনিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষ যে দুর্ভাগ্য ও বিপদের মধ্যে পড়িয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই শান্তি কামনা করিয়াছিল। শান্তি বহুমূল্য সম্পদ, উন্নতির জন্য ইহা আবশ্যক। আমরা ইহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু শান্তির জন্য অত্যধিক মূল্য দিতে হইতে পারে? আমরা শ্মশানের শান্তিও পাইতে পারি। পিঞ্জর অথবা কারাগারের নিরাপদ জীবনও লাভ করিতে পারি। অথবা শান্তি আত্মোন্নতি

সাধনে অক্ষম মানবের নিস্তেজ নৈরাশ্যও হইতে পারে। বিদেশী বিজেতা বলপূর্বক যে শান্তি স্থাপন করে, তাহার মধ্যে প্রকৃত শান্তির বিশ্রাম ও আরামের অবকাশ নাই। যুদ্ধ ভয়ঙ্কর বস্তু; উহা নিবারণ করাই উচিত। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক উইলিয়ম জেম্‌সের মতে, উহাতে চরিত্রের বিবিধ সদ্‌গুণের বিকাশ হয়—বিশ্বস্ততা, সঙ্ঘশক্তি, অধ্যবসায়, বীরত্ব, বিবেক, শিক্ষা, উদ্ভাবনী শক্তি, ব্যয়-সঙ্কোচ, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং বীর্য। এই সকল কারণে জেম্‌স যুদ্ধের অনুরূপ একটা কিছু অন্বেষণ করিয়াছিলেন, যাহাতে যুদ্ধের ভয়াবহ কিছু থাকিবে না, অথচ এই সকল উদ্দীপিত করিবে। সম্ভবতঃ যদি তিনি অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধের নীতি অবগত হইতেন, তাহা হইলে হয়ত স্বীয় মনোমত বস্তু খুঁজিয়া পাইতেন—যাহা যুদ্ধের সমতুল্য, অথচ নৈতিক ও শান্তিপূর্ণ।

ইতিহাসে 'যদি' ও সম্ভাবনা লইয়া বিচার করা নিষ্ফল। আমার মতে ভারতবর্ষ যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্পে উন্নত পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহার ফল ভালই হইয়াছে। বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতের এক মহৎ দান। ভারতে ইহা ছিল না এবং ইহার অভাবে সে ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতেছিল। কিন্তু আমাদের যোগাযোগের ভঙ্গীটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের এবং তথাপি সম্ভবতঃ পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আঘাত ব্যতীত আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিত না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে প্রটেস্টান্ট, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী, এংলো-স্যাক্সন ইংরাজেরাই অধিকতর উপযোগী। কেন না, অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশবাসী অপেক্ষা আমাদের সহিত তাহাদের পার্থক্য অনেক অধিক এবং তাহারা আমাদের অধিকতর আঘাত করিতে সক্ষম।

তাহারা আমাদিগকে রাজনৈতিক ঐক্য দিয়াছে, উহা আকাঙ্ক্ষার বস্তু সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের ঐক্য থাকুক আর নাই থাকুক, ভারতীয় জাতীয়তা পুষ্টিপুষ্ট হইয়া ঐক্যের দাবী করিতই। আরব জাতি বিভক্ত হইয়া বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে—স্বাধীন, রক্ষিত, ম্যাণ্ডেটের অধীন প্রভৃতি—কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আরবের ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা প্রবাহিত। যদি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা পথ অবরোধ না করিতেন, তাহা হইলে আরব জাতীয়তা বহুল পরিমাণে সাফল্য অর্জন করিতে পারিত, নিঃসন্দেহ। কিন্তু ভারতের মতই এই সকল শক্তিই বিচ্ছেদমূলক ভাবগুলিকে উস্কাইয়া তুলেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা সৃষ্টি করেন, যাহা জাতীয়তার প্রেরণাকে দুর্বল এবং অবনত প্রতিরোধ করে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে নিরপেক্ষ বিচারকের মূর্তিতে অবস্থান করিবার ছলনাও যোগায়।

সাম্রাজ্যের অগ্রগতির মুখে উপলক্ষ্য হিসাবে ঘটনাচক্রে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে আমরা দেখিয়াছি, যখন এই ঐক্য জাতীয়তার সহিত যুক্ত হইয়া পর-শাসনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে, তখনই অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িকতাকে ইচ্ছা করিয়া উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, যাহা আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে প্রবল বাধা।

ব্রিটিশ এদেশে আসিয়াছে, কত দীর্ঘকালের কথা, পৌনে দুই শতাব্দী ধরিয়া তাহারা আধিপত্য করিতেছে! স্বেচ্ছাচারী গভর্নমেন্টের মতই তাহাদের কর্তৃত্ব ছিল অবাধ, তাহাদের ইচ্ছামতই ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার সুযোগ ছিল প্রচুর। এই কালের মধ্যে জগতে কত বিচিত্র পরিবর্তন হইয়াছে—প্রাচীনকে চেনা চলেই না—ইংলণ্ডে, ইউরোপে, আমেরিকায়, জাপানে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আটলান্টিক তীরবর্তী অতি নগণ্য আমেরিকান উপনিবেশগুলি আজ সর্বাধিক ঐশ্বর্যশালী, অধিক ক্ষমতাশালী এবং কলাকৌশলের দিক দিয়া অতি মহান আদর্শ

জাতিতে পরিণত হইয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপানের কি বিস্ময়কর পরিবর্তন হইয়াছে! অল্পদিন প্র্বেও র্শিয়ার যে বিশাল ভূখণ্ড জার গভর্ণমেণ্টের স্থ্ল হস্তে পীড়িত হইয়া অবর্দ্ধগতি ছিল, আজ সেখানে নব-জীবনের স্পন্দন এবং আমাদের চক্ষ্র সম্ম্খেই ন্তন জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে। ভারতেও ব্হৎ পরিবর্তন হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বর্তমানে পার্থক্য কত বেশী—রেলওয়ে, সেচ ব্যবস্থা, কারখানা, স্কুল ও কলেজ, বিশাল সরকারী দপ্তরখানা প্রভৃতি।

কিন্তু এই পরিবর্তন সত্ত্বেও অদ্যকার ভারত কির্প? দাসবৎ পরপদলেহী রাষ্ট্র, ইহার অপ্র্ব শান্ত পিঞ্জরাবদ্ধ, সহজভাবে নিঃশ্বাস লইতেও ভীত, দ্রদেশাগত অপরিচিত বিদেশী কর্তৃক শাসিত, জনসাধারণের দারিদ্র্যের তুলনা নাই; ক্ষীণজীবী, ব্যাধি ও মড়কের হস্ত হইতে আত্মরক্ষায় অক্ষম, নিরক্ষরতায় দেশ প্র্ণ, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বাস্থ্যরক্ষা বা চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই, মধ্য-শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে তুল্যর্পে বিশাল বেকার-সমস্যা। আমরা শ্নিয়াছি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কম্যুনিজম প্রভৃতি, কর্মকৌশলহীন আদর্শবাদীর বাঁধাব্লি, ইহারা তত্ত্বোপদেশক ও প্রতারক, সমগ্র জনসাধারণের কল্যাণই হইল আসল পরীক্ষা। অবশ্য উহাই পরীক্ষার সর্বোত্তম মাপকাঠি, কিন্তু ইহা দ্বারা পরিমাপ করিলে বর্তমান ভারত কত হীন, কত দরিদ্র। অন্যান্য দেশে দ্র্গতি-মোচন ও বেকার-সমস্যা দ্র করিবার জন্য কত বড় বড় পরিকল্পনার কথা আমরা পাঠ করি, কিন্তু আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার ও চিরস্থায়ী দেশব্যাপী দ্ঃখদৈন্যের কি প্রতিকার হইয়াছে? অন্যান্য দেশে দরিদ্রের গ্হনির্মাণের পরিকল্পনার বিষয় পাঠ করি, কিন্তু আমাদের দেশের লক্ষকোটী নরনারীর গ্হ বলিতে কি আছে? কতকগ্লি মাটির খোঁয়াড় অথবা ব্ক্ষতল। আমরা যেখানে ছিলাম সেইখানেই আছি, অথবা শম্ব্কের মত মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছি; অথচ অন্যান্য দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা, শিক্ষা সংস্কৃতির স্বিধা, পণ্য উৎপাদন সকল দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে; ইহা দেখিয়া কি ঈর্ষ্যা হয় না? র্শিয়া মাত্র বার বৎসরের মধ্যে তাহার বিশাল রাজ্য হইতে নিরক্ষরতাকে নির্বাসিত করিয়াছে, জনসাধারণের জীবনের সহিত সামঞ্জস্যময় এক অপ্র্ব অভিনব শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে। অনগ্রসর তুরস্কও আতাতুর্ক কামালের নেতৃত্বে শিক্ষাপ্রচারের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ফাসিস্ত ইতালী স্চনা হইতেই বিপ্ল বলে নিরক্ষরতাকে আক্রমণ করিয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী জেন্টাইল জাতিকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "সম্ম্খয্দ্ধে অশিক্ষাকে আক্রমণ কর। এই দ্ষিত ক্ষত আমাদের জাতিদেহকে দ্র্বল করিতেছে, তপ্ত লৌহ দ্বারা উহার উচ্ছেদ কর।" বৈঠকী আলোচনার পক্ষে অত্যন্ত অশোভনীয় ভাষা, কিন্তু এই চিন্তার পশ্চাতে রহিয়াছে দ্ঢ়বিশ্বাস এবং বলিষ্ঠ সংকল্প। আমরা এক্ষেত্রে অতি ভদ্র এবং ঘ্রাইয়া ফিরাইয়া কথা বলি। আমাদের কর্তারা অত্যন্ত অবসরভাবে অগ্রসর হন এবং কমিশন ও কমিটিতে শক্তিক্ষয় করেন।

কথা বেশী বলে, কাজ করে কম, ভারতবাসীর এ দ্র্নাম আছে। এ অভিযোগ সত্য। কিন্তু আমরাও দেখিয়া অবাক হই যে কমিটি ও কমিশন বসিবার জন্য মিটিংয়ের কত অর্থব্যয়, কত পরিশ্রমের পর জ্ঞানগর্ভ রিপোর্ট রচিত হয়। "অতি ম্ল্যবান সরকারী দলিল" যথাবিহিত প্রশংসাবাদের পর, তাহাও কি দপ্তরখানার কুল্ঙ্গিতে প্রস্প্ত থাকে না? এই ভাবে আমরা অগ্রসর হইতেছি, উন্নতি লাভ করিতেছি ভাবিয়া প্লক অন্ভব করি, অথচ যেখানে ছিলাম, সেইখানে আছি

সুবিধাও পাই। আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ তৃপ্ত হয়, কায়েমী স্বার্থ নিরাপদ থাকে। অন্যান্য দেশ চিন্তা করে, আমরা কেমন করিয়া অগ্রসর হইব, আর আমরা চিন্তা করি, অগ্রগতি যাহাতে দ্রুত না হয়, সেজন্য বাঁধন কষণ ও রক্ষাকবচ আবশ্যক। জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি বলিয়াছেন, মোগল আমলে "সাম্রাজ্যের জাঁকজমকই জনসাধারণের দারিদ্র্যের পরিমাপক হইয়া পড়িয়াছিল।" এই অভিমত সত্য। চিন্তায় আমরা আজও কি ঐ মাপকাঠি প্রয়োগ করিতে পারি না? নয়াদিল্লীর অদ্যকার বড়লাটের জাঁকজমক শোভাযাত্রা এবং প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট-গণের আড়ম্বর ও সমারোহ কি? এ সকলের পশ্চাতে রহিয়াছে অতি দীন ভয়াবহ দারিদ্র্য। ইহার বিরূপতায় চিত্ত আহত হয়। হৃদয়বান মাণুষে ইহা কেমন করিয়া সহ্য করেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। সম্মুখে সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যের ঔজ্জ্বল্যের পশ্চাতে অদ্যকার ভারতবর্ষ দরিদ্র ও নিরানন্দ। বাহিরে অনেকখানি চুণকাম ও বাহ্য চাকচিক্যের পশ্চাতে বর্তমান অবস্থায় দুর্ভাগা নিম্নস্তরের বুর্জোয়া শ্রেণী দলিত হইতেছে। তাহার পশ্চাতে শ্রমিক শ্রেণী দারিদ্র্যপিষ্ট হইয়া দুঃখময় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। তারপর আছে ভারতবর্ষের প্রতীকরূপী কৃষক-সম্প্রদায়—যাহাদের ভাগ্যে দুঃখনিশা আর প্রভাত হয় না।

"শতাব্দীচয়ের দুর্বহ ভারে সে বক্র-মেরুদণ্ড হইয়া নিড়ানি হাতে ভূমিনিবদ্ধ-দৃষ্টি, তাহার মুখে যুগ-যুগান্তরের শূন্যতা, তাহার পৃষ্ঠে জগতের দুর্বহ ভার।" ..

"এই ভয়াবহ দৃশ্যের মধ্যে যুগ-যুগান্তের দুঃখের প্রতিচ্ছবি। সেই বেদনাতুর আনমিত মূর্তির মধ্যে কালের বিয়োগান্তক দৃশ্য। এই ভয়াবহ মূর্তির মধ্য দিয়া কৃতঘ্নতায় আহত, লুণ্ঠিত, কলুষিত এবং অধিকার-বঞ্চিত মনুষ্য আর্ত ক্রন্দনে, যে শক্তিসমূহ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিতেছে—ইহা প্রতিবাদও বটে, ভবিষ্যদ্বাণীও বটে।"*

ভারতের সর্ববিধ দুর্ভাগ্যের জন্য ব্রিটিশকে দোষী করা বৃথা। দায়িত্ব আমাদিগকেও বহন করিতে হইবে, আমাদের সঙ্কুচিত হওয়া উচিত নয়, আমাদের নিজস্ব দৌর্বল্যের অনিবার্য পরিণামের জন্য অপরকে দোষী সাব্যস্ত করা অশোভনীয়। প্রভুত্বপ্রবণ পদ্ধতির গভর্নমেন্ট—বিশেষতঃ যাহা বৈদেশিক তাহা—নিশ্চয়ই দাস-মনোভাব বৃদ্ধির উৎসাহ দেয় এবং জনসাধারণের মানসিক দৃষ্টির সীমা সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করে। ইহা যুবকদের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও মহান তাহা পিষিয়া ফেলে, দুঃসাহসিক উদ্যম, দুর্জ্ঞেয় সন্ধানের আগ্রহ, মৌলিকতা ও তেজস্বিতা বিনষ্ট করিতে চায় এবং ভীরু কাপুরুষতা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, খোসামোদ করিয়া প্রভুর মনোরঞ্জনের চেষ্টা প্রভৃতিতে উৎসাহ দেয়। এই প্রকার শাসন-পদ্ধতি কখনও প্রকৃত সেবার মনোবৃত্তি উদ্বোধিত করিতে পারে না, জনসেবা বা আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইতে পারে না। ইহা এমন সব লোক বাছিয়া লয়, যাহাদের মধ্যে পরার্থপর তেজবীর্য নাই, যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। ভারতে কোন্ শ্রেণীর লোককে ব্রিটিশ তাহাদের দলে টানিয়া লয়, আমরা নিত্যই দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধিমান এবং ভাল কাজ করিতে সক্ষম। অন্যত্র সুযোগ সুবিধার অভাবে ইহারা সরকারী বা আধা-সরকারী চাকুরী গ্রহণ করে এবং ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া এক বৃহৎ যন্ত্রের অংশরূপে পরিণত হয়। বৈচিত্র্যহীন বাঁধাধরা দৈনন্দিন কর্মের মধ্যে তাহাদের

---

* আমেরিকান কবি ই. মার্কহাম-এর 'দি ম্যান উইথ দি হো' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

মন বন্দী হইয়া পড়ে। "কেরাণীগিরির উপযোগী জ্ঞানী এবং আফিস চালাইবার কূটনীতি"রূপ আমলাতান্ত্রিক গুণাবলী তাহারা আয়ত্ত করিয়া লয়। বড়জোর জনসাধারণের কার্যে তাহাদের এক নিষ্ক্রিয় নিষ্ঠা দেখা যায়। জ্বলন্ত উৎসাহ সেখানে নাই, হইতেও পারে না; বিদেশী গভর্ণমেণ্টের অধীনে তাহা সম্ভবও নহে।

ইহা ছাড়া, ক্ষুদ্র কর্মচারীদের অধিকাংশই মোটেই প্রশংসার যোগ্য নহে। তাহারা কেবল শিখিয়াছে, উপরওয়ালাদের হীনভাবে তোষামোদ করিতে এবং তাহাদের নিম্নপদস্থদের প্রতি ভীতি-প্রদর্শনমূলক তর্জন গর্জন করিতে। অপরাধ অবশ্য তাহাদের নহে। প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই তাহারা এই শিক্ষা পায় এবং এই অবস্থায় যে তোষামোদ ও পক্ষপাতিত্ব প্রবল হইবে, যেমন হইয়া থাকে, তাহা কি খুব বেশী আশ্চর্যের? তাহাদের চাকুরীর কোন আদর্শ নাই, বেকার হইবার ভয় এবং তাহার ফল স্বরূপ উপবাস বিভীষিকার মত তাহাদের মনে জাগিয়া থাকে এবং তাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য, সর্বপ্রযত্নে চাকুরীতে লাগিয়া থাকা এবং আত্মীয় ও বন্ধুগণের জন্য অন্য চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া। যাহাদের পশ্চাতে গোয়েন্দা এবং অতি ঘৃণ্যজীবী গুপ্তচর অহরহঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেখানে লোকের মধ্যে বাঞ্ছনীয় সদ্‌গুণের বিকাশ সহজ নয়।

আধুনিক ঘটনাবলীর পরিণতির ফলে হৃদয়বান পরার্থপর ব্যক্তিদের পক্ষে গভর্ণমেণ্টের চাকুরীতে যোগদান করা অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগকে চাহেন না এবং তাঁহারাও অর্থনৈতিক কারণে বাধ্য না হইলে গভর্ণমেণ্টের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাইতে ইচ্ছা করেন না।

কিন্তু সমস্ত জগৎ জানে যে, বাদামী রঙের লোকেরা নহে, শ্বেতাঙ্গ লোকেরাই সাম্রাজ্যের ভার বহন করিতেছেন। আমাদের দেশে সাম্রাজ্যের পারম্পর্য রক্ষা করিবার জন্য বহুতর ইম্পিরিয়াল সার্ভিস আছে। তাহাদের বিশেষ সুবিধা রক্ষার জন্য প্রয়োজন মত রক্ষাকবচের ব্যবস্থাও আছে এবং কথিত হয়, এই সকলই নাকি ভারতের স্বার্থের জন্য। এই সকল চাকুরীর উন্নতি ও স্বার্থের সহিত ভারতের কল্যাণও যেন একসূত্রে গ্রথিত। ভারতীয় 'সিভিল সার্ভিস'-এর কোন সুবিধা অথবা পুরস্কার স্বরূপ কোন পদ যদি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা শুনি যে, তাহার ফলে অযোগ্যতা ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবে। ভারতীয় 'মেডিক্যাল সার্ভিস'-এর সুরক্ষিত চাকুরীগুলির সংখ্যা যদি কমান হয়, তবে নাকি তাহা "ভারতের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক।" যদি সেনাবিভাগে ব্রিটিশ কর্মচারী কমাইবার কথা উঠে, তাহা হইলে আমরা যে সর্ববিধ ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হইব, ইহা বলাই বাহুল্য।

যদি উচ্চকর্মচারীরা সহসা চলিয়া যান এবং তাঁহাদের বিভাগগুলির ভার নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের হস্তে অর্পিত হয়, তাহা হইলে যোগ্যতা ও কুশলতার অপচয় ঘটিবে; আমার মতে এই কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কিন্তু সমস্ত পদ্ধতি এমনভাবে গঠন করা হইয়াছে যে, অধীনস্থ কর্মচারীরা কোনরূপেই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি নহেন অথবা তাহাদিগকে দায়িত্ব বহন করিবার কোন শিক্ষাও দেওয়া হয় নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব নাই, এবং যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহার অর্থ, আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন অর্থাৎ এক নূতন রাষ্ট্র চাই। এই অবস্থার মধ্যে আমরা শুনিয়াছি যে, নিয়মতান্ত্রিক যন্ত্রের যে কোন পরিবর্তনই হউক না কেন, আমাদের হর্তাকর্তা-

বিধাতা স্বরূপ বড় বড় বিভাগীয় চাকুরীগুলির কাঠামো পূর্বের মতই থাকিবে। গভর্ণমেন্টের পবিত্র রহস্যের একমাত্র নিগূঢ় বেত্তা ও শিক্ষাদাতারূপে তাঁহারা সরকারী মন্দির পাহারা দিবেন এবং ইতর সাধারণকে সেই পবিত্র প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে বাধা দিবেন। ক্রমশঃ আমরা ঐ সুবিধার উপযোগী হইব, তাঁহারা একের পর আর আবরণ মোচন করিবেন, অবশেষে, কোন এক সুদূর ভবিষ্য যুগে, যাহা পবিত্র হইতে পবিত্রতর, আমাদের বিস্মিত ও শ্রদ্ধালু দৃষ্টির সম্মুখে তাহার আবরণ উন্মোচিত হইবে।

সর্ববিধ ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের মধ্যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের স্থান সকলের ঊর্ধ্বে এবং ভারত গভর্ণমেন্ট পরিচালনের নিন্দা বা প্রশংসার অধিকাংশই ইঁহাদের। এই সিভিল সার্ভিসের বহুতর গুণাবলী অহরহঃ পরিকীর্তিত হয় এবং সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনার মধ্যে ইহার মহত্ত্ব এক নীতিবাক্যে পরিণত হইয়াছে। ভারতে ইহার অবিসম্বাদী প্রভুত্ব, ইহার স্বেচ্ছাচারী শক্তি এবং যে অপরিমিত প্রশংসা-বাক্য ও উৎসাহ-বাণী ইহার উপর বর্ষিত হয়, তাহা কখনই ব্যক্তির বা শ্রেণীর মানসিক স্থৈর্য ও স্বাস্থ্যের অনুকূল হইতে পারে না। এই সার্ভিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা সত্ত্বেও আমার আশঙ্কা হয় যে, কি ব্যক্তিগত, কি শ্রেণীগতভাবে ইঁহাদের সেই প্রাচীন অথচ কিয়ৎপরিমাণে আধুনিক ব্যাধি—মানসিক বিকৃতি (Paranoia) দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অত্যধিক।

আই. সি. এস-এর গুণাবলী অস্বীকার করা কঠিন, আমাদিগকে কিছুতেই উহা ভুলিতে দেওয়া হয় না। সিভিল সার্ভিসের জন্য যে পরিমাণ প্রশংসা ও করতালিধ্বনি করা হয়, তাহাতে আমার মনে হয়, মাঝে মাঝে বিদ্রূপ করতালিও আবশ্যক। আমেরিকান অর্থনীতিজ্ঞ ভেব্‌লেন সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলিকে বলিয়াছেন, "রক্ষিতাশ্রেণী।" আমার মতে আই. সি এস ও অন্যান্য ইম্পিরিয়াল সার্ভিসকে "রক্ষিতাশ্রেণী" বলিয়া অভিহিত করিলে সত্য কথাই বলা হইবে। ইহারা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিলাস।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব সদস্য এবং ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে কৌতূহলী মেজর ডি গ্রেহাম পোল কিছুদিন পূর্বে "মডার্ণ রিভিয়ু" পত্রে লিখিয়াছিলেন, "সিভিল সার্ভিসের যোগ্যতা ও কুশলতা সম্পর্কে কেহ কখনও কোন প্রশ্ন তুলে নাই।" এই শ্রেণীর কথা ইংলণ্ডে প্রায়ই প্রচার করা হয় এবং লোকে বিশ্বাসও করে। অতএব ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। এই প্রকার সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত বিবৃতি প্রদান নিরাপদ নহে, কেন না সহজেই ইহা যে অমূলক তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। ঐ শ্রেণীর বিবৃতির কখনও প্রতিবাদ হয় নাই, ইহা কল্পনা করিয়া গ্রেহাম পোল অত্যন্ত ভুল করিয়াছেন। দীর্ঘকাল হইতেই ঐ শ্রেণীর উক্তির প্রতিবাদ হইয়া আসিতেছে, এমন কি, মিঃ জি. কে. গোখলে পর্যন্ত সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে অনেক কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন। কংগ্রেসপন্থী হউন আর নাই হউন, সাধারণ ভারতবাসী এ বিষয় লইয়া মেজর গ্রেহাম পোলের সহিত নিশ্চয়ই আলোচনা করিতে পারেন। হয়তো উভয় পক্ষই আংশিকভাবে সত্য এবং সম্পূর্ণ পৃথক গুণ ও যোগ্যতার কথা ভাবিয়াছেন। যোগ্যতা ও কুশলতা কিসের? ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং এই দেশ শোষণে সহায়তা করা, এই দিক হইতে যদি যোগ্যতা ও কুশলতা বিচার করা যায়, তাহা হইলে সিভিল সার্ভিস নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। ভারতীয় জনসাধারণের কল্যাণের দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। তাঁহারা যে জনসাধারণের সেবক এবং তাহাদের

তাঁহাদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য আরামের উপকরণ যোগায়, তাহাদের সহিত উপার্জন ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর বিপুল ব্যবধানই তাঁহাদের ব্যর্থতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অবশ্য ইহা সত্য যে সিভিল সার্ভিস মোটের উপর একটা ধারা বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন এবং ইহার আদর্শ অত্যন্ত মাঝারীগোছের; তবে দুই একজন শক্তিমান কদাচিৎ দেখা যায়। ভাল ও মন্দ লইয়া ইহা ব্রিটিশ পাব্লিক স্কুলের ভাবে অনুপ্রাণিত (যদিও অনেক সিভিলিয়ান পাব্লিক স্কুলের ছাত্র নহেন)। একটা সাধারণ আদর্শের ঐক্যের মাপকাঠির কেহ বাহিরে গেলে, তাহার জন্য অত্যন্ত বিরাগ প্রকাশ হয়, ব্যক্তিগত কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকিলেও তাহা দৈনন্দিন নীরস কর্মের মধ্যে তলাইয়া যায়, সাধারণ ধারা হইতে পৃথক প্রতিভাত হইবার ভয়ও আছে। অনেক আগ্রহশীল ব্যক্তির সেবার অনুরাগ আছে; কিন্তু সে সেবা মুখ্যতঃ সাম্রাজ্যের সেবা, ভারতের কথা পরে। ইঁহাদের শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এরূপ যে তাঁহারা ঐরূপ না করিয়া পারেন না। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প, বিদেশী এবং প্রায়শঃই বন্ধুভাবাপন্ন নহে এমন জনসাধারণের আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁহারা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ থাকিয়া একটা সাধারণ ধারা বজায় রাখিয়া চলেন। পদগৌরব ও জাতিগত মর্যাদাবোধও ইহার পশ্চাতে আছে। তাঁহাদের হাতে অপরিমিত স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা আছে বলিয়া, তাঁহারা সর্ববিধ সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হন এবং উহা এক প্রধান পাপ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ক্রমে অসহিষ্ণু গুরুমহাশয় হইয়া পড়েন এবং দায়িত্বহীন শাসকসুলভ নানাদোষ তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায়। তাঁহারা আত্মতৃপ্ত, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, সঙ্কীর্ণচেতা ও কূপমণ্ডূক। এই পরিবর্তনশীল জগতে তাঁহারা চিরস্থির এবং উন্নতিশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুপযোগী। যখন তাঁহাদের অপেক্ষাও যোগ্য ও উদারহৃদয় ব্যক্তিরা ভারতীয় সমস্যায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন তাঁহারা ক্রুদ্ধ হন, নানা আপত্তিকর বিশেষণে অভিহিত করিয়া তাঁহাদের দমন করেন এবং তাঁহাদের পথে নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত করেন। মহাযুদ্ধের পর অভূতপূর্ব পরিবর্তনের গতিবেগের মধ্যে তাঁহারা দিশাহারা হইয়াছিলেন এবং সেই অবস্থার সহিত নিজেদের সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সীমাবদ্ধ বাঁধাধরা শিক্ষা এই অভিনব অবস্থা এবং সঙ্কটের সময় কোন কাজেই আসিল না। দীর্ঘকালের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় তাঁহাদের স্বভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দল বা শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে, তাঁহারা নামে মাত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণের অধীন। "ক্ষমতা চরিত্রভ্রষ্টতা আনে"—লর্ড অ্যাক্‌টন বলিয়াছেন—"নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চরিত্রভ্রষ্টতাকেও পূর্ণতা দান করে।"

মোটের উপর তাঁহারা সীমাবদ্ধভাবেও নির্ভরযোগ্য কর্মচারী, খুব কৃতিত্ব না দেখাইলেও দৈনন্দিন কর্ম বেশ যোগ্যতার সহিত চালাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি এরূপ যে, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিলেই তাঁহারা বিহ্বল হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস, প্রণালীবদ্ধ কার্য করিবার অভ্যাস এবং শ্রেণীগত শৃঙ্খলাবদ্ধতার বলে তাঁহারা আশু বিপদাদি অতিক্রম করেন। বিখ্যাত মেসোপোটেমিয়ার গোলমালে ব্রিটিশ ভারতীয় গভর্নমেন্টের অযোগ্যতা ও "নিষ্প্রাণ জড়ত্ব" প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু অল্পরূপে অনেক অক্ষমতার কথা চাপা পড়িয়া থাকে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধেও তাঁহাদের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্থূল। গুলি করিয়া, দুর্গে রাখিয়া প্রতিপক্ষকে অল্পকালের জন্য নিরস্ত করা যায়, কিন্তু তাহাতে সমস্যার সমাধান হয় না এবং যে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান তাঁহারা রক্ষা করিতে

চাহেন, উহাতে তাহারই ভিত্তি শিথিল হয়। ক্রমবর্ধিত ও আক্রমণশীল জাতীয় আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য তাঁহারা যে হিংসানীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। ইহা অপরিহার্য, কেন না সাম্রাজ্যই বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐ উপায় ছাড়া অন্য কোন ভাবে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইতে তাঁহারা শিক্ষালাভ করেন নাই। কিন্তু অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক বলপ্রয়োগ হইতে বুঝা গিয়াছে যে সমস্যা আয়ত্তের মধ্যে রাখিবার শক্তি আর তাঁহাদের নাই এবং সাধারণ অবস্থায় যে আত্মসংযম ও সহনশীলতা তাঁহাদের ছিল বলিয়া অনুমিত হইত, তাহাও আর নাই। স্নায়ুপুঞ্জ প্রায়ই বিক্ষিপ্ত হইত এবং তাঁহাদের সাধারণ বক্তৃতাতেও বিকারবিক্ষিপ্ত উত্তেজনার আভাস পাওয়া যাইত। সঙ্কট অতি নিষ্ঠুরভাবে আমাদের আভ্যন্তরীণ দৌর্বল্যগুলি প্রকাশ করিয়া দেয়। নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি তেমনই একটা সঙ্কট ও পরীক্ষা এবং দুই পক্ষের—কংগ্রেস ও গভর্ণমেন্ট—অতি অল্পলোকই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সঙ্কটের দিনে প্রথম শ্রেণীর মেরুদণ্ড অতি অল্পসংখ্যক নরনারীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মিঃ লয়েড জর্জ বলিয়াছেন, "সঙ্কটের দিনে অবশিষ্ট ব্যক্তিদের গণনার মধ্যেই আনা উচিত নহে। সাধারণ অবস্থায় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত-পিণ্ড সমুন্নতশির বলিয়া মনে হয়, বন্যা আসিলে সেগুলি ডুবিয়া যায়,—কেবল সর্বোচ্চ শিখরগুলি জলের উপরে মাথা তুলিয়া থাকে।"

যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য সিভিলিয়ানগণের মন, বুদ্ধি ও হৃদয় প্রস্তুত ছিল না। ইঁহাদের অধিকাংশই প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালী হইতে মার্জিত রুচি, সংস্কৃত ও চরিত্রমাধুর্য আহরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচীন জগতের, ভিক্টোরিয়াযুগের উপযোগী; কিন্তু বর্তমান অবস্থার মধ্যে উহার কোন সার্থকতা নাই। তাঁহারা সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ এক নিজস্ব জগতে বাস করেন—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—যাহা ইংলণ্ডও নহে, ভারতও নহে। সমসাময়িক সমাজে যে সকল শক্তি কার্য করিতেছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। নিজেদের ভারতীয় জনসাধারণের অভিভাবক ও অছিরূপে জাহির করিবার হাস্যকর ভঙ্গী সত্ত্বেও, তাঁহারা জনসাধারণকে অল্পই জানেন এবং নূতন আক্রমণশীল বুর্জোয়া শ্রেণীকে আরও কম জানেন। তাঁহারা খোসামোদে ও চাকুরীর উমেদারদের দেখিয়া ভারতবাসীকে বিচার করেন, অন্যান্য সকলকে হয় আন্দোলনকারী "এজিটেটর", নয়, প্রবঞ্চক বলিয়া উপেক্ষা করেন। মহাযুদ্ধের পর যে সকল পরিবর্তন, বিশেষভাবে অর্থনীতি-ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অতি অল্প এবং তাঁহারা চির অভ্যস্ত পথচিহ্নের সহিত এমনভাবেই আটকাইয়া গিয়াছেন যে, পরিবর্তিত ধারার সহিত নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহারা যে ব্যবস্থা চালাইতেছেন, বর্তমান অবস্থায় তাহাতে ঘুণ ধরাইয়াছে এবং শ্রেণী হিসাবে তাঁহারা টি এস এলিয়টের "দি হলো মেন" বর্ণিত চরিত্রের প্রতীক হইয়া পড়িয়াছেন।

তথাপি যতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আছে, ততদিন এই ব্যবস্থা চলিবে এবং এখনও ইহার যথেষ্ট শক্তি আছে, ইহাদের পশ্চাতে যোদ্ধা ও কুশলকর্মা সেনাবাহিনী রহিয়াছেন। ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট পোকাধরা দাঁতের মত, তবে এখনও ইহা মাড়ীর সহিত শক্ত করিয়া লাগিয়া আছে। ইহা বেদনাদায়ক, তবে সহজে তুলিয়া ফেলিবার উপায় নাই। যতদিন না ইহা তুলিয়া ফেলা যায়, অথবা আপনা হইতে খসিয়া পড়ে, ততদিন এই বেদনা চলিতে থাকিবে এবং বাড়িতেও পারে।

এমন কি ইংলণ্ডেও পাব্লিক স্কুলে শিক্ষিত শ্রেণীর সুদিন চলিয়া গিয়াছে।

সাধারণকার্যে এখনও তাহাদের কিছ়ু প্রাধান্য থাকিলেও প়ূর্বের প্রভাব-প্রতিপত্তি আর নাই। ইহারা ভারতের পক্ষে অধিকতর অন়ুপযোগী; স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার উন্ম়ুখ জাতীয়তাবাদের সহিত ইহার সহযোগিতা বা সামঞ্জস্যবিধান অসম্ভব; যাঁহারা সামাজিক পরিবর্তনপ্রয়াসী হইয়া কর্ম করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত তো নহেই।

অবশ্য সিভিল সার্ভিসে অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় ভাল লোক আছেন, কিন্তু যতদিন বর্তমান ব্যবস্থা থাকিবে ততদিন তাঁহাদের সদিচ্ছা এমন সমস্ত বিষয়ে নিয়়ুক্ত হইবে, যাহার সহিত জনসাধারণের কল্যাণের কোনও যোগ নাই। অনেক ভারতীয় সিভিলিয়ন বিলাতী পাবলিক স্কুলের ভাবে এতই অন়ুপ্রাণিত যে, "ইহাদের রাজভক্তি স্বয়ং রাজা হইতেও অধিক।" একবার এক ভারতীয় য়ুবক সিভিলিয়নের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল, তাঁহার নিজের সম্বন্ধে ধারণা এত উচ্চ যে দ়ুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। তিনি সিভিল সার্ভিসের বহ়ু সদ্গ়ুণ বর্ণনা করিলেন; অবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন়ুক়ূলে এই অখণ্ডনীয় য়ুক্তি দেখাইলেন যে, ইহা কি অতীতের রোমসাম্রাজ্য অথবা চেঙ্গিস খাঁ বা তৈম়ুরের সাম্রাজ্য অপেক্ষা ভাল নহে?

সিভিলিয়নগণের ধারণা তাঁহারা অতিশয় যোগ্যতার সহিত তাঁহাদের কর্তব্য পালন করেন, অতএব তাঁহাদের দাবীগ়ুলি তাঁহারা জোরের সহিতই প্রকাশ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের নানাবিধ দাবীর অন্ত নাই। ভারতবর্ষ দরিদ্র, সেজন্য তাহার সমাজব্যবস্থা, বেনিয়া ও কুশীদজীবীরা দায়ী, সর্বোপরি তাহার জনসংখ্যা অপরিমিত। কিন্তু ভারতে সকল বেনিয়ার শ্রেষ্ঠ বেনিয়া যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, নিজেদের স়ুবিধার জন্য সে কথা উল্লেখ করা হয় না। আমি জানি না এই বিরাট জনসংখ্যা তাঁহারা কিভাবে কমাইবেন. উচ্চতর ম়ৃত্যুর হার সত্ত্বেও এবং দ়ুর্ভিক্ষ ও সংক্রামক ব্যাধির নিকট অনেক সাহায্য পাওয়া গেলেও, জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করা হইয়া থাকে, আমি স্বয়ং এ বিষয়ের জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিতে হইলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা-প্রণালী উন্নত হওয়া আবশ্যক, সাধারণ শিক্ষার উন্নতি আবশ্যক এবং দেশের সর্বত্র অসংখ্য 'ক্লিনিক' প্রতিষ্ঠা করা উচিত। বর্তমান অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায়গ়ুলি গ্রহণ করা জনসাধারণের ক্ষমতা ও আয়ত্তের বাহিরে। মধ্যশ্রেণী ইহার স়ুযোগ গ্রহণ করিতে পারে এবং আমার বিশ্বাস তাহারা ইহা অধিকতর ভাবে গ্রহণ করিতেছে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার য়ুক্তি যে অসার তাহার অনেক প্রমাণ আছে। জগতের সম্ম়ুখে আজ খাদ্যাভাব বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারের অভাব সমস্যা নহে; সমস্যা এই যে কাহারা খাইবে পরিবে, অন্য কথায় বলিলে বলিতে হয়, যাহাদের প্রয়োজন তাহাদের খাদ্যই কিনিবার সামর্থ্য নাই। স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে, ভারতেও খাদ্যাভাব নাই, জনসংখ্যা ব়ৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণও বাড়িয়াছে এবং এই হারে বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বহ়ুঘোষিত ভারতের বর্তমান জনসংখ্যার (গত ১৯২১-৩১ ছাড়া) ব়ৃদ্ধির অন়ুপাত অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা অনেক কম। অবশ্য ভবিষ্যতে পার্থক্য হইবে, কেন না নানা কারণে পাশ্চাত্য দেশগ়ুলিতে জনসংখ্যার ব়ৃদ্ধি হ্রাস পাইতেছে, কোনস্থলে বা সমান রহিয়াছে। হয়ত শীঘ্রই ভারতেও ঐ কারণগ়ুলি দেখা দিয়া জনসংখ্যা ব়ৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করিবে।

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হইবে, ইংলণ্ডও নিজের ন়ূতন জীবন গড়িতে পারিবে,

তখন সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উৎকৃষ্টতম নরনারীর আবশ্যক হইবে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ সর্বত্রই দুর্লভ, ভারতে উহা সুদুর্লভ, কেন না ব্রিটিশ শাসনাধীনে আমাদের অনেক সুবিধাই নাই। সর্বজনীন কার্যের বিভিন্ন বিভাগে—বিশেষতঃ যেখানে বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান আবশ্যক সেখানে—বহু বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে। সিভিল সার্ভিস এবং অন্যান্য ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় আছেন, নূতন ব্যবস্থায় যাঁহাদের প্রয়োজন আছে এবং তাঁহারা আনন্দের সহিতই গৃহীত হইবেন। কিন্তু যতদিন সরকারী চাকুরী ও সাধারণ শাসন-ব্যবস্থায় সিভিলিয়ানী মনোবৃত্তি প্রবল থাকিবে, ততদিন কোন নূতন ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব হইবে না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রভুত্বের অহমিকা সাম্রাজ্যবাদের মিত্র; উহা স্বাধীনতার সহিত পাশাপাশি থাকিতে পারে না। ইহা হয় স্বাধীনতাকে ধ্বংস করিবে, নয়, নিজে বিনষ্ট হইবে। কেবল একমাত্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ইহার স্থান হইতে পারে, সে হইল ফাসিস্ত রাষ্ট্র। অতএব, কোন নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পূর্বে সিভিল সার্ভিস বা অনুরূপ সার্ভিস-গুলি বর্তমানে যে আকারে আছে, তাহার বিলুপ্তি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ঐ সকল সার্ভিসের কোন কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছুক হন এবং নূতন চাকুরীর যোগ্য হন, তাঁহাদের সাদরে গ্রহণ করা হইবে কিন্তু তাঁহাদের নূতন সর্তে রাজী হইতে হইবে। বর্তমানে তাঁহারা যেরূপ উচ্চহারে বেতন ও ভাতা পাইতেছেন, তাহাই পাইতে থাকিবেন, ইহা অবশ্যই কল্পনাতীত। নবীন ভারত তাহার সেবার জন্য চাহে আগ্রহশীল ও কুশলকর্মা সেবক, যাহাদের উদ্দেশ্যের উপর গভীর বিশ্বাস আছে, যাহারা সাফল্যের জন্য প্রাণপণ করিবে; যাহারা আনন্দ ও গৌরবের জন্য কার্য করিবে, উচ্চ বেতনের প্রলোভনে নহে। অর্থই একমাত্র লক্ষ্য, এই ধারণা যথা-সম্ভব কমাইতে হইবে। বৈদেশিক সাহায্য বহুল পরিমাণে আবশ্যক হইবে, কিন্তু আমার ধারণা বিশেষ-শিক্ষাহীন সাধারণ সিভিলিয়ন শাসকশ্রেণী কোন প্রয়োজনেই লাগিবে না। ভারতে এরূপ লোকের অভাব হইবে না।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় লিবারেল ও অনুরূপ শ্রেণীর লোকেরা ভারত-গভর্নমেণ্ট সম্পর্কে ব্রিটিশ মতবাদ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সার্ভিস-গুলি সম্পর্কেই উহা বিশেষ প্রত্যক্ষ, তাঁহারা "ভারতীয়করণ" দাবী করেন কিন্তু রাষ্ট্রের কাঠামো বা সার্ভিসের মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্তন দাবী করেন না। কিন্তু এই মূল বিষয়ে আপোষ করা কঠিন। কেন না স্বাধীন ভারত হইতে কেবল যে ব্রিটিশ সামরিক ও শাসক শ্রেণীকে সরাইতে হইবে তাহা নহে, তাহাদের বেতন, ভাতা ও সুবিধাগুলিকেও নীচে নামাইয়া আনিতে হইবে। এই শাসনতন্ত্র নির্মাণের যুগে, রক্ষাকবচ সম্পর্কে অনেক কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। যদি ঐ রক্ষাকবচগুলি ভারতীয় স্বার্থেরই অনুকূল হয় তাহা হইলে অন্যান্য বিষয়ের সহিত ইহাও স্পষ্ট করিয়া লওয়া উচিত যে, সিভিল সার্ভিস বা অনুরূপ সার্ভিস-গুলি বিলুপ্ত হইবে অর্থাৎ তাহাদের বর্তমান ক্ষমতা, সুবিধা, এ সকল থাকিবে না এবং নূতন শাসনতন্ত্রের উপর তাহাদের কোন প্রভুত্ব থাকিবে না।

তথাকথিত দেশরক্ষামূলক সামরিক চাকুরীগুলি অধিকতর রহস্যময় ও অলঙ্ঘ্য। আমরা তাহাদের সমালোচনা করিব না, তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিব না, কেন না আমরা ও সব ব্যাপারের কি জানি? আমরা কেবল বিপুল অর্থরাশি যোগাইয়া চলিব, কোন আপত্তি করিব না। কিছুদিন পূর্বে ১৯৩৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে, ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার ফিলিপ শেট্উড্, সিমলায় বক্তৃতাকালে, ঝাঁঝালো সামরিক ভাষায় ভারতীয় রাজনৈতিকদিগকে তাঁহার কাজে দৃষ্টি না

দিয়া নিজের চরকায় তৈল দিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কোন প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাবের উত্থাপককে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "তিনি এবং তাঁহার বন্ধুরা কি মনে করেন যে, বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞ ও রণনিপুণ ব্রিটিশ জাতি, যাহারা তরবারিবলে সাম্রাজ্য জয় করিয়াছে এবং তরবারিবলে তাহা রক্ষা করিতেছে, তাহারা আরামকেদারাবিলাসী সমালোচকদের নিকট জাতিগত অভিজ্ঞতা ও রণ-পাণ্ডিত্য বিসর্জন দিবে...?" তিনি এইরূপ আরও অনেক ভাল ভাল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা যাহাতে এরূপ মনে না করি যে তিনি সাময়িক উত্তেজনায় ঐ শ্রেণীর কথা বলিয়াছেন, সেইজন্য তিনি পূর্ব হইতে যত্নসহকারে লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করেন।

একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সামরিক বিষয় লইয়া প্রধান সেনাপতির সহিত তর্ক করা ধৃষ্টতা সন্দেহ নাই, তথাপি আরামকেদারাবিলাসী সমালোচককে তিনি সম্ভবতঃ কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিবার অনুমতি দিবেন। যাঁহারা তরবারিবলে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছেন এবং যাঁহাদের মস্তকের উপর ঐ উজ্জ্বল অস্ত্র অহরহ উদ্যত, তাঁহাদের উভয়ের স্বার্থের পার্থক্য বুঝা যায়। ভারতীয় সৈন্যদল দিয়া ভারতের স্বার্থরক্ষা করা যাইতে পারে, সাম্রাজ্যের কার্যেও তাহাদের নিয়োগ করা যাইতে পারে, ঐ দুই স্বার্থের পার্থক্য, এমন কি পরস্পরবিরোধী হইলেও তাহা সম্ভব। মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর যদি কোন খ্যাতনামা সেনাপতি অপরের হস্তক্ষেপ হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন তাহা হইলে যে কোন রাজনৈতিক ও আরামকেদারাবিলাসী সমালোচকও নিশ্চয়ই আশ্চর্য হইবেন। তৎকালে তাঁহাদের অনেকাংশের অবাধ স্বাধীনতা ছিল এবং যুদ্ধের বিবরণ হইতে দেখা যায় যে তাঁহারা প্রায় সর্বক্ষেত্রে, প্রত্যেক সৈন্যদলে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন—ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, অস্ট্রিয়ান, ইতালীয়ান, রাশিয়ান, সর্বত্র। বিখ্যাত ব্রিটিশ সামরিক ইতিহাস লেখক ও রণ-নীতি বিশারদ কাপ্তেন লিডেল হার্ট, তাঁহার 'মহাযুদ্ধের ইতিহাসে' লিখিয়াছেন, যুদ্ধের কোন এক বিশেষ অবস্থায় সৈন্যদল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, আর ব্রিটিশ সেনাপতিরা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। জাতীয় সঙ্কটেও তাঁহাদের চিন্তা ও চেষ্টায় ঐক্য সম্ভব হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "মহাযুদ্ধ, আমাদের পূর্বপুরুষের উপর বিশ্বাস, বীরপূজার বিশ্বাস, তাঁহারা যে স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত এ বিশ্বাস, ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। নেতার প্রয়োজন আছে, সম্ভবতঃ অধিকতর প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমরা যদি বুঝি যে তাঁহারাও সাধারণ মানুষ, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট অত্যধিক প্রত্যাশা করিব না বা তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিব না।"

রাজনীতিক চূড়ামণি লয়েড্ জর্জ তাঁহার "সমরস্মৃতি"তে মহাযুদ্ধের সেনাপতি, নৌ-সেনাপতিদের অতি ভয়াবহ ভুল, অবিবেচনা ও ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার ফলে শত সহস্র লোক প্রাণ হারাইয়াছে; ইংলণ্ড ও তাহার মিত্রগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহা "শোণিতসিক্তপথে টলিতে টলিতে জয় লাভ।"। উচ্চতম কর্মচারীরা মনুষ্যের জীবন ও ঘটনা সম্ভার লইয়া বেপরোয়া ও নির্বুদ্ধিতার সহিত খেলা করিয়াছেন এবং যাহার ফলে ইংলণ্ড প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছিল; কিন্তু শত্রুপক্ষেরও অনুরূপ মূঢ়তার ফলেই ইংলণ্ড ও তাহার মিত্রগণ রক্ষা পাইয়াছে। ইহা মহাযুদ্ধের আমলে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিজের কথা—তিনি লিখিয়াছেন, লর্ড জেলিকোর মাথায় কোন ভাব ঢুকাইতে হইলে তাঁহার খুলিতে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছে, বিশেষ ভাবে বাণিজ্যিক রক্ষি-দলের প্রস্তাব তাঁহাকে গ্রহণ করাইতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। ফ্রেঞ্চ

মার্শাল জোফ্রে সম্বন্ধে তিনি মনে করেন, তাঁহার প্রধান গুণ ছিল তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, যাহা শক্তির প্রেরণা দিত। "বিপদে পড়িয়া আর্ত মানব সহজাত বুদ্ধি হইতে ইহার শরণ লইত। তাহারা এই ভুল ধারণা পোষণ করিত যে, বুদ্ধির স্থান (মগজে নহে) চিবুকে।"

কিন্তু মিঃ লয়েড জর্জ প্রধান অভিযোগ করিয়াছেন, ব্রিটিশ সমর-নায়ক প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল হেইগের বিরুদ্ধে। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, লর্ড হেইগের অসংযত অহমিকা এবং রাজনীতিক ও অন্যান্য ব্যক্তির কথায় ভ্রুক্ষেপ-হীনতার দরুণ তিনি ব্রিটিশ-মন্ত্রিসভার নিকটও অনেক গুরুতর ঘটনা গোপন করিয়াছেন, ফ্রান্সে ব্রিটিশ সৈন্যদলকে, অন্যতম প্রধান অনর্থের মধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। ব্যর্থতা যখন তিনি চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতেছেন, তখনও অন্ধ জিদের বশবর্তী হইয়া তিনি পাসেনদেল ও কামতেইর ভয়াবহ কর্দমাক্ত ক্ষেত্রে কয়েক মাস ধরিয়া আক্রমণমূলক যুদ্ধ চালাইয়াছেন, তাহার ফলে সত্তর হাজার সামরিক কর্মচারী মৃত বা মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছে এবং চার লক্ষ সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক প্রাণ হারাইয়াছে। মৃত্যুর পর আজ "অপরিচিত সৈনিক"-এর স্মৃতিপূজা চলিতেছে, ভাল কথা, কিন্তু যখন সে জীবিত ছিল তখন সে কোন সুবিবেচনা পায় নাই, তাহার জীবনের মূল্য কত তুচ্ছ ছিল!

রাজনীতিকরাও অন্যান্য লোকের মত ভুল করিয়া থাকেন, কিন্তু গণতন্ত্রী রাজনীতিককে ব্যক্তি ও ঘটনা লক্ষ্য করিতে হয়, বুঝিতে হয়, সকলের কথা শুনিতে হয় এবং তাঁহারা সাধারণতঃ নিজেদের ভুল বুঝিয়া সংশোধনের চেষ্টাও করেন। কিন্তু সৈনিক স্বতন্ত্র আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়, সেখানে প্রভুত্বের রাজত্ব, সমালোচনা সহ্য করা হয় না। কাজেই সে ভুল করিলে অপরে উপদেশ দিতে গেলে ক্রুদ্ধ হয় এবং সে নিখুঁতভাবে ভুল করিতে থাকে এবং জিদের সহিত তাহা আঁকড়াইয়া ধরে। মন ও মগজ অপেক্ষা তাহার নিকট চিবুকের গুরুত্ব অনেক বেশী। ভারতে আমাদের বিশেষ সুবিধা এই যে, এখানে আমরা ঐ দুইশ্রেণী হইতে এক দো-আঁশলা শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছি, এখানে সাধারণ শাসনকশ্রেণীও এক অর্ধ-সামরিক প্রভুত্ব ও আত্মতৃপ্ত আবহাওয়ায় বর্ধিত হন এবং তাঁহারাও অনেকাংশে সৈনিকের চিবুক ও অন্যান্য গুণাবলী অর্জন করেন।

আমরা শুনিয়াছি, সামরিক বিভাগের "ভারতীয়করণ" উৎসাহের সহিত চলিতেছে, আগামী ত্রিশ বৎসর কি আরও কিছুকাল পরে ভারতের রণাঙ্গনে একজন ভারতীয় জেনারেল আবির্ভূত হইবেন। সম্ভবতঃ একশত বৎসরের মধ্যেই এই ভারতীয়করণ অনেকটা অগ্রসর হইবে। কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে, ইংলণ্ড কেমন করিয়া দুই এক বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সৈন্যদল গড়িয়া তুলিবে তাহা বিস্ময়ের সহিত ভাবিবার কথা। যদি ইহাতে আমাদের উপদেষ্টা ও শিক্ষকগণ থাকিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহারা অধিকতর সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইত। সম্ভবতঃ সুশিক্ষিত সৈন্যদল প্রস্তুত হইবার পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইত। রাশিয়ান সোভিয়েট সৈন্যদলের কথাও মনে হয়, যেখানে কিছু ছিল না, বহু শত্রুপক্ষের সহিত পাল্লা দিয়া সেখানে যে বিপুল চতুরঙ্গ বাহিনী গঠিত হইয়াছে, বর্তমান জগতে তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। দেখা যাইতেছে, তাহাদের "যুদ্ধ করিতে করিতে পাকা এবং রণ-বিশারদ" জেনারেল উপদেষ্টা ছিল না।

আমাদের দেশে দেরাদুনে একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানে ভদ্রলোকের ছেলেদের সামরিক কর্মচারিরূপে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আমরা শুনিয়াছি, তাহারা নাকি খুবকায়দামত বেশ পরে এবং জীবনে উৎকৃষ্ট সামরিক

কর্মচারী হইবে। কিন্তু আমি সময় সময় বিস্মিত হইয়া ভাবি, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যতীত ইহার মূল্য কি? আজকাল পদাতিক বা অশ্বারোহী সৈন্যদলের, রোমান গুরুভার তরবারিধারী সৈন্যব্যূহের মতই অবস্থা এবং রাইফেল তীরধনুক অপেক্ষা একটু ভাল; কেন না এখন যুদ্ধ হইবে আকাশে, বিষবাষ্প পূর্ণ বোমা, ট্যাঙ্ক এবং শক্তিশালী কামান দিয়া। তাহাদের শিক্ষক ও উপদেষ্টাদের এ ধারণা আছে সন্দেহ নাই।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস কি? যাহা আমাদের নিজেদের দুর্বলতার জন্যই ঘটিয়াছে, তাহার দোষত্রুটি লইয়া অভিযোগ করিবার আমরা কে? যদি আমরা পরিবর্তনের ধারার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বদ্ধজলায় আটকাইয়া পড়ি এবং উটপাখীর মত বালুকায় মাথা গুঁজিয়া ঘটনা না দেখি, তাহাতে আমাদেরই বিপদ। জগতের নূতন প্রাণবন্যার তরঙ্গশীর্ষে ভাসিয়া ব্রিটিশ আমাদের নিকট আসিয়াছিল, ঐতিহাসিক শক্তিপুঞ্জের সে কি প্রবল রূপ, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই! শীতের তুহিনস্পর্শ বায়ুর বিরুদ্ধে আমরা কি অভিযান করিব? আইস আমরা অতীত এবং তাহার কলহ-কোলাহল ছাড়িয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করি। আমরা নিশ্চয়ই ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞ হইব। কেন না তাহাদের হাত হইতেই আমরা এক মহৎ দান পাইয়াছি—সে দান বিজ্ঞান এবং তাহার নব নব মূল্যবান আবিষ্ক্রিয়া। অবশ্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যেভাবে ভারতে ভেদ, সংস্কার-বিরোধিতা, প্রগতিবিরোধিতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সুবিধাবাদকে উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিতেছেন, তাহা বিস্মৃত হওয়া বা শান্তভাবে নিরীক্ষণ করা কঠিন। সম্ভবতঃ এই পরীক্ষা এবং এই দ্বন্দ্বেরও আমাদের প্রয়োজন আছে, ভারতের নবজন্মের পূর্বে হয়ত আমাদিগকে বারম্বার অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ হইতে হইবে; যাহা দুর্বল, যাহা অপবিত্র, যাহা দুর্নীতি তাহা পুড়িয়া ছাই হউক।

৫৫

অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমস্যা

১৯৩০-এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে এক সপ্তাহ পুণা ও বোম্বাই-এ কাটাইয়া আমি লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া আসিলাম। মাতা তখনও হাসপাতালে থাকিয়া অল্পে অল্পে আরোগ্যলাভ করিতেছিলেন, কমলাও লক্ষ্ণৌ-এ থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিল, তবে তাহার নিজের শরীরও ভাল ছিল না। আমার ভগ্নীও এলাহাবাদ হইতে সপ্তাহ অন্তে একবার করিয়া আসিত। আমি লক্ষ্ণৌ-এ দুই তিন সপ্তাহ থাকিলাম, এলাহাবাদ অপেক্ষা এখানে আমি অবসর ও বিশ্রাম অনেক বেশী পাইলাম; আমার প্রধান কাজ ছিল প্রত্যহ দুইবার করিয়া হাসপাতালে যাওয়া। অবসর সময়ে আমি সংবাদপত্রের জন্য কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এগুলি দেশে বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। "ভারত কোন পথে?" এই নাম দিয়া আমি কয়েকটি প্রবন্ধে জগতের ঘটনাবলীর সহিত ভারতীয় অবস্থা বিচার করিয়া যাহা লিখিলাম, তাহা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি পরে শুনিয়াছি, এই প্রবন্ধগুলি পারসী ভাষায় অনূদিত হইয়া তিহরান ও কায়রো প্রকাশিত হইয়াছিল। যাঁহারা আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা ইহার মধ্যে নূতন বা মৌলিক কিছুই পাইবেন না। কিন্তু

স্বদেশবাসীরা ঘরের ব্যাপার লইয়া এত ব্যস্ত যে বাহিরে নজর দিবার অবসর পান না। আমার প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আগ্রহ ও অন্যান্য ব্যাপারে আমি দেখিলাম যে, আমাদের দৃষ্টির সীমা উদার ও প্রসারিত হইতেছে।

মাতা হাসপাতালে থাকিতে থাকিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে এলাহাবাদ লইয়া যাওয়া স্থির করিলাম। আরও কারণ এই যে আমার ভগ্নী কৃষ্ণার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। আমার সহসা পুনরায় কারাগারের তলব আসিতে পারে এই আশঙ্কায় আমি যত সত্বর সম্ভব বিবাহ ব্যাপার নির্বাহ করিতে ব্যগ্র হইলাম। আমি যে কতদিন বাহিরে থাকিতে পারিব, সে সম্বন্ধে নিজের কোন ধারণা ছিল না। কেন না তখনও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ কংগ্রেসের সরকারী কার্যপদ্ধতি এবং কংগ্রেস ও অন্যান্য বহুতর প্রতিষ্ঠান বে-আইনী।

এলাহাবাদে অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিবাহের সময় নির্দিষ্ট হইল। ইহা অসবর্ণ বিবাহ। আমি আনন্দিত হইলেও এই ব্যাপারে আমাদের কোন হাত ছিল না। ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহে কোন প্রকার ধর্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠানই ব্রিটিশ ভারতের আইনমতে সিদ্ধ নহে। সৌভাগ্যক্রমে সম্প্রতি আইনে পরিণত "সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট"-এ আমাদের সুবিধা হইল। এরূপ দুইটি আইন আছে। যে আইনে আমার ভগ্নীর বিবাহ হইল তাহা কেবল হিন্দু এবং আনুষঙ্গিক বৌদ্ধ জৈন ও শিখের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যদি উভয়পক্ষ জন্ম বা ধর্মান্তর গ্রহণ দ্বারা উল্লিখিত কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হন, তাহা হইলে এই আইনে বিবাহ চলিবে না; প্রথম 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্টের' (১৮৭২-এর ৩ আইন) শরণ লইতে হইবে। এই আইনে উভয়পক্ষকে সমস্ত প্রধান ধর্মের নিন্দা করিতে হয়, অথবা এমন বিবৃতি দিতে হয়, যাহাতে তাঁহারা কোন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন ইহা প্রকাশ পায়। এই অনাবশ্যক ধর্মদ্রোহিতা প্রদর্শন অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার। ধর্মপ্রাণ না হইয়াও অনেকে উহাতে আপত্তি করেন বলিয়া ঐ আইনের সুবিধা গ্রহণ চাহেন না। যাহাতে অসবর্ণ বিবাহের সুবিধা হয়, এমন কোন পরিবর্তনের কথা উঠিলেই, সকল ধর্মের গোঁড়ার দল তারস্বরে প্রতিবাদ করিতে থাকেন। ইহার ফলে লোকে হয় ধর্মনিন্দা করিতে বাধ্য হয় অথবা আইন বাঁচাইবার জন্য ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ব্যক্তিগত ভাবে আমি অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহ দিবার পক্ষপাতী; তবে উৎসাহ দেওয়া হউক আর নাই হউক এমন একটা সাধারণ অসবর্ণ বিবাহের আইন থাকা উচিত, যাহাতে সকল ধর্মের নরনারীই, ধর্ম নিন্দা বা ধর্ম পরিবর্তন না করিয়াও বিবাহিত হইতে পারে।

আমার ভগ্নীর বিবাহে কোন আড়ম্বর ছিল না, যথাসম্ভব সাদাসিধা ভাবে উহা নির্বাহ হইয়াছে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে বিবাহ ব্যাপারে যে হৈ চৈ হয়, আমি তাহা পছন্দ করি না। একে মায়ের অসুখ, তাহার উপর তখনও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ চলিতেছিল, আমার বহু সহকর্মী কারাগারে, কাজেই লোকদেখান আড়ম্বরের কথা উঠিতেই পারে না। অল্প কয়েকজন আত্মীয় কুটুম্ব ও স্থানীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা হইল। ইহাতে আমার পিতার অনেক পুরাতন বন্ধু মনোবেদনা পাইলেন, তাঁহারা ভুল করিয়া ভাবিলেন যে আমি ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের অবজ্ঞা করিয়াছি।

বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র ইংরাজী (লাটিন) অক্ষরে হিন্দুস্থানীতে লেখা হইয়াছিল। ইহা অভিনব, কেন না এই শ্রেণীর নিমন্ত্রণপত্র সাধারণ নাগরী কিম্বা পারসী অক্ষরে লেখা হয়, ইংরাজী অক্ষর ব্যবহার করা সৈন্যদল ও খৃষ্টান পাদ্রী ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। আমি পরীক্ষা করিবার জন্য ইংরাজী অক্ষর ব্যবহারে

করিলাম, লোকে ইহা কিভাবে গ্রহণ করে জানিবার কৌত্হল ছিল। অধিকাংশ লোকই ইহা পছন্দ করিলেন না। অল্প কয়েকখানা পত্র দেওয়া হইয়াছিল, যদি অধিক সংখ্যায় পত্র বিতরিত হইত তাহা হইলে প্রতিবাদ অধিকতর হইত সন্দেহ নাই। গান্ধিজী আমার এই কার্য অন্মোদন করিলেন না।

আমি লাটিন অক্ষরের অন্রাগী হইলেও উহা প্রচলিত করিবার কোন উদ্দেশ্য লইয়া ব্যবহার করি নাই। তুরস্ক ও মধ্য এশিয়ায় ইহার অন্কূল য্ক্তিগ্লিরও গ্র্ত্ব আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই, হইলেও, আমি ইহা ভাল করিয়াই জানি যে, বর্তমানে ভারতে লাটিন অক্ষর গ্রহণ করিবার অতি ক্ষীণ আশাও নাই। সকল শ্রেণী হইতেই ইহার বির্দ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হইবে। জাতীয়তাবাদী, ধর্মসম্প্রদায়, হিন্দ্, ম্সলমান, প্রাচীন, নবীন কেহ বাদ যাইবেন না। এবং আমি ইহাও ব্ঝি যে এই প্রতিবাদ কেবল ভাবাবেগ নহে। যে ভাষার অতীত ঐশ্বর্য ও মহত্ত্ব আছে, তাহার অক্ষর পরিবর্তন এক গ্র্তর পরিবর্তন, কেন না অক্ষর ভাষার মর্মবস্তু। অক্ষর পরিবর্তন করিবামাত্র শব্দের চেহারা বদ্লাইয়া যায়, স্বতন্ত্র ধ্বনি, স্বতন্ত্র ভাব মনে আসে। ইহাতে প্রাচীন সাহিত্য ও নবীন সাহিত্যের মধ্যে এক অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়িয়া উঠে এবং প্রথমোক্ত সাহিত্য বৈদেশিক ভাষার মত হইয়া অবশেষে বিল্প্ত হয়। যেখানে রক্ষা করিবার মত কোন সাহিত্য নাই, সেখানেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভারতে আমি কোন পরিবর্তন কল্পনাই করিতে পারি না, কেন না আমাদের ভাষা যে কেবল ঐশ্বর্যশালী ও ম্ল্যবান তাহা নহে, আমাদের ইতিহাস, আমাদের চিন্তার সহিত ইহার যোগ অবিচ্ছেদ্য এবং আমাদের জনসাধারণের জীবনের সহিত ইহা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জোর করিয়া ইহা চালাইতে যাওয়া জীবন্তদেহে অস্ত্রোপচারের মতই নিষ্ঠ্রতা এবং তাহাতে লোকশিক্ষার গতি র্দ্ধ হইবে।

এই প্রশ্ন আলোচনার সময় এখনও আসে নাই। আমার মতে অক্ষর সংস্কার করিতে আমাদের সংস্কৃত ভাষার কন্যাস্বর্পা—হিন্দী, বাঙলা, মারাঠী ও গ্জরাটী ভাষার জন্য এক সাধারণ অক্ষর গ্রহণের বিষয় প্রথমে চিন্তা করিতে হইবে। ঐ সকল ভাষার অক্ষরগ্লির উৎপত্তিস্থল ম্লতঃ এক এবং পার্থক্যও খ্ব বেশী নহে। কাজেই এক সাধারণ অক্ষর নির্ণয় করা কঠিন নহে। ইহার ফলে এই চারিটি একশ্রেণীর প্রধান ভাষা পরস্পরের অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইবে।

ভারত সম্পর্কে এই গল্প আমাদের ব্রিটিশ শাসকেরা অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত সমগ্র জগতে প্রচার করিয়াছেন যে ভারতে কয়েক শত ভাষা প্রচলিত; নির্দিষ্ট সংখ্যাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। প্রমাণ স্বর্প আদমস্মারীর বিবরণ আছে। এই কয়েক শত ভাষার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজই অন্ততঃ একটি ভাষাও মোটাম্টি জানেন। দীর্ঘকাল এদেশে বাস করিয়াও তাঁহারা উহা শিক্ষা করেন না, ইহা এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। এই সমস্ত ভাষাকে একত্র করিয়া তাঁহারা নাম দিয়াছেন, "ভার্নাকুলার" অর্থাৎ দাসজাতির ভাষা। (লাটিন ভার্না শব্দের অর্থ, যে সকল দাস পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে) আমাদের দেশের লোকেরাও অজ্ঞাতসারে না ব্ঝিয়া এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্ত জীবন ভারতে কাটাইলেও ইংরাজেরা আমাদের ভাষা ভালভাবে শিক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করেন না, ইহা আশ্চর্য। তাঁহারা খানসামা ও আয়াদের সাহায্যে এক অদ্ভুত উচ্চারণভঙ্গীর অপভ্রংশ হিন্দ্স্থানীকে প্রকৃত বস্তু বলিয়া কল্পনা করেন। যে ভাবে তাঁহারা অধীনস্থ কর্মচারী ও মোসাহেবদের নিকট হইতে ভারতীয় জীবন

সম্পর্কে ঘটনা সংগ্রহ করেন, তেমনি ভাবে চাকর-বাকরের নিকট হইতে হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা করেন। এই চাকরেরা 'সাহেব-লোগ' বুঝিতে পারিবেন না এই ভয়ে, তাঁহাদের পছন্দমত বাজারিয়া হিন্দুস্থানীতে কথা বলে। হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও বিপুল সাহিত্য আছে, এ সম্বন্ধে তাঁহারা গভীর ভাবেই অজ্ঞ।

আদমসুমারীর রিপোর্ট যদি বলে যে ভারতে দুই তিন শত ভাষা আছে, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস উহা হইতেই দেখা যাইবে যে জার্মানীতেও ৫০ কি ৬০টি ভাষা প্রচলিত আছে। এই ঘটনাকে জার্মানীর অনৈক্য বা ভেদের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে পড়ে না। আদমসুমারীর বিবরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষার কথাও উল্লেখ করা হয়, কয়েক সম্প্র লোকের কথ্য ভাষাকেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিধার জন্য বহুতর কথ্য ভাষাকে পৃথক ভাষা হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। আয়তনের তুলনায় ভারতে অতি অল্প সংখ্যক ভাষাই প্রচলিত। ইউরোপের সহিত তুলনায় ভাষার দিক দিয়া ভারতবর্ষ অধিকতর ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু ব্যাপক নিরক্ষরতার দরুণ সাধারণ কথ্য ভাষা গড়িয়া উঠে নাই। কথ্য ভাষার নানারূপ ইতর বিশেষ আছে। ভারতের প্রধান ভাষা (ব্রহ্মদেশ বাদে) হিন্দুস্থানী (হিন্দী ও উর্দু), বাঙ্গলা, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম ও কানাড়ী। ইহার সহিত যদি আসামী, উড়িয়া, সিন্ধী, পুস্তু ও পাঞ্জাবী জুড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কয়েকটি পার্বত্য ও অরণ্যবাসী সম্প্রদায় ছাড়া ভারতের সমস্ত ভাষার কথাই বলা হয়। উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির পরস্পরের সহিত গভীর ঐক্য রহিয়াছে। দক্ষিণের দ্রাবিড় ভাষাগুলি স্বতন্ত্র হইলেও তাহার উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অত্যধিক, সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্যও উহাতে কম নহে।

যে আটটি প্রধান ভাষার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহার প্রত্যেকটিই প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদে সমৃদ্ধ। এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সকল ভাষা কথ্য ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব কথ্য ভাষার দিক দিয়া এগুলি পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান ভাষার সহিত একত্রে আসন পাইবার যোগ্য। পাঁচ কোটি লোক বাঙ্গলায় কথা কহে, অল্পবিস্তর উচ্চারণে পার্থক্য থাকিলেও আমার ধারণা (হাতের কাছে নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই) ভারতে প্রায় ১৪ কোটি লোক হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করে এবং এই ভাষা দেশের সর্বত্র বহুলোক অল্পবিস্তর বুঝিতে পারে।* এই ভাষার বিপুল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহা সংস্কৃতের দৃঢ়

---

* একজন হিন্দুস্থানী অনুরাগী আমাকে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি দিয়াছেন। এগুলি ১৯০১ কি ১৯২১-এর আদমসুমারীর বিবরণ হইতে গৃহীত কি না জানি না, তবে মনে হয় ইহা ১৯২১-এর; বর্তমানে অবশ্য এই সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

হিন্দুস্থানী (পশ্চিম অঞ্চলের হিন্দী, পাঞ্জাবী ও রাজস্থানী সহ)	১০,১০ লক্ষ
বাঙ্গলা	৪,৯০ ,,
তেলেগু	২,৩৬ ,,
মারাঠী	১,৮৮ ,,
তামিল	১,৮৮ ,,
কানাড়ী	১,০০ ,,
উড়িয়া	১,০১ ,,
গুজরাটী	৯৬ ,,

পুস্তু, আসামী এবং ছোটখাটো অন্যান্য উপজাতি ও প্রাকৃত অঞ্চলের ভাষা এই তালিকায় ধরা হয় নাই।

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পারসী ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই দুই ঐশ্বর্য ভাণ্ডার হইতে এই ভাষা পুষ্ট এবং সম্প্রতি ইংরাজী হইতেও ইহা অনেক কিছু সংগ্রহ করিতেছে। দাক্ষিণাত্যে অবশ্য হিন্দী ভাষা একেবারেই বিদেশী ভাষা, তবে সেখানেও হিন্দী ভাষা শিক্ষাদানের বিপুল চেষ্টা চলিতেছে। দুই বৎসর পূর্বে (১৯৩২) আমি তত্রত্য হিন্দী প্রচার সমিতি প্রদত্ত সংখ্যা দেখিয়াছিলাম, তাঁহারা চৌদ্দ বৎসরের চেষ্টায় কেবলমাত্র মাদ্রাজ প্রদেশেই ৫,৫০,০০০ জন লোককে হিন্দী শিক্ষা দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টায় এই সাফল্য অল্প নহে, এবং যাঁহারা হিন্দী শিখিয়াছেন, তাঁহারা আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অপরকে শিখাইতেছেন।

হিন্দুস্থানী যে ভারতের সাধারণ ভাষায় পরিণত হইবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সাধারণ কাজ চালাইবার জন্য এখনও ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। হিন্দুস্থানী নাগরীতে লেখা হইবে, না, পারসী অক্ষরে লেখা হইবে, ইহা সংস্কৃত শব্দবহুল হইবে, না, পারসী শব্দবহুল হইবে, ইহা লইয়া নির্বোধ তর্ক ও বাদানুবাদের ফলে উহার উন্নতি ব্যাহত হইতেছে। অক্ষরের অসুবিধা দূর করার উপায় নাই, কেন না দুই পক্ষের মনোভাবই প্রবল, অতএব দুই প্রকার অক্ষরই মানিয়া লইয়া লোককে ইচ্ছামত যে কোনটি ব্যবহার করিতে দেওয়াই সঙ্গত। তবে উভয়দিকের চরমপন্থা বর্জন করিয়া মোটামুটি কথ্যভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সাহিত্যের ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন কর্তব্য। জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তনকালে ইহাই অবশ্যম্ভাবী। বর্তমানে যাঁহারা নিজেদের সাহিত্যের লিখনভঙ্গী ও মাধুর্যের নিয়ামক বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই মুষ্টিমেয় মধ্যশ্রেণী, প্রত্যেকে নিজ নিজ মত সম্পর্কে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ও সঙ্কীর্ণমনা। তাঁহারা প্রাচীন পদ্ধতি আঁকড়াইয়া আছেন, যাহার সহিত তাঁহাদের পাঠক জনসাধারণের অথবা জগতের সাহিত্যের গতিভঙ্গীর যোগ নাই।

হিন্দুস্থানী ভাষার পরিপুষ্টি ও বিস্তারের সহিত বাঙ্গলা, গুজরাটী, মারাঠী, উড়িয়া বা দ্রাবিড় ভাষা প্রভৃতি ভারতের উৎকৃষ্ট ভাষাগুলির পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধির সংঘর্ষ হইবে না, হওয়া উচিত নহে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ভাষা অত্যন্ত সচেতন এবং হিন্দুস্থানী অপেক্ষাও বৃদ্ধির দিক দিয়া সতর্ক; বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা ও অন্যান্য কার্যের জন্য এই ভাষাগুলি রাষ্ট্র-ভাষারূপেই থাকিবে। কেবল ঐগুলির সহায়তাতেই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্রুত বিস্তার সম্ভব।

কেহ কেহ কল্পনা করেন, ইংরাজীই ভারতের সর্বজনীন ভাষায় পরিণত হইবে। মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিকে বাদ দিলে, ইহা আমার নিকট উন্মাদের কল্পনা বলিয়াই মনে হয়। ইহার সহিত জনসাধারণের শিক্ষা-সংস্কৃতির কোন সম্পর্কই নাই। এখন যেরূপ আছে, হয়তো আরও ব্যাপকভাবে ইংরাজী ভাষা, 'টেকনিক্যাল', বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায় সম্পর্কিত ব্যাপারে এবং বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হইবে। জগতের চিন্তা ও কর্মধারার সহিত যোগ রাখিবার জন্য আমাদের অনেকেরই বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা উচিত এবং আমার মনে হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজী ভাষা ছাড়াও, ফরাসী, জার্মান, রুশিয়ান, স্পেনীয় ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত। অবশ্য ইংরাজীকে অবজ্ঞা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, তবে জগতের মতামত তুলনায় বিচার করিতে হইলে আমাদের কেবল ইংরাজীর চশমা ব্যবহার করিলেই চলিবে না। ইতিমধ্যেই আমাদের মানসিক বিকাশের ধারা বহুল পরিমাণে একদেশদর্শী

হইয়া পড়িয়াছে, কেন না আমরা কেবল একদিকের কথা ও মতবাদ ভাবিতে অভ্যস্ত। এমন কি আমাদের অতি উগ্র জাতীয়তাবাদীরা পর্যন্ত বুঝিতে পারেন না যে ভারত সম্পর্কে তাঁহাদের ধারণা ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা কি পরিমাণে আচ্ছন্ন।

কিন্তু অন্যান্য বিদেশীভাষা শিক্ষায় আমরা যতই উৎসাহ দেই না কেন, বাহিরের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য ইংরাজী ভাষাই আমাদের প্রধান অবলম্বন থাকিবে। ইহাই হওয়া উচিত, পুরুষানুক্রমে আমরা ইংরাজী শিখিতেছি এবং ইহাতে অনেকটা কৃতকার্যও হইয়াছি। এই দীর্ঘকালের শিক্ষার ধারা একেবারেই মুছিয়া ফেলিয়া নূতন কিছু গ্রহণ করিবার চেষ্টা নির্বুদ্ধিতাই হইবে। বর্তমানে ইংরাজী ভাষা বহু দূরপ্রসারী এবং ইহা দ্রুতগতিতে অন্যান্য ভাষাকে অতিক্রম করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আন্তর্জাতিক আলোচনা এবং রেডিয়ো ঘোষণায় এই ভাষাই প্রধান বাহন হইবে, যদি না "আমেরিকান" ইহার স্থান গ্রহণ করে। অতএব আমাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তৃত করিতে হইবে। যথাসম্ভব ইহা আমাদের শিক্ষা করা উচিত, তবে এই ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রস উপভোগ করিবার জন্য অনেকে যেমন ভাবে অতিরিক্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করেন, আমি তাহার কোন প্রয়োজন দেখি না। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশের উপর এই বোঝা চাপাইয়া দিলে অন্যান্য দিকে তাহাদের উন্নতি অবরুদ্ধ হয়।

সম্প্রতি "বেসিক ইংলিশ"-এর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমার মনে হয় ইহাতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার পথ অত্যন্ত সরল ও সুগম করা হইয়াছে, ভবিষ্যতে ইহার প্রচলনের সমধিক সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমাদের পক্ষে এই "বেসিক ইংলিশ" শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করাই ভাল, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইংরাজী বিশেষজ্ঞ বা বিশিষ্ট ছাত্রের জন্য নির্দিষ্ট থাকুক।

ব্যক্তিগতভাবে আমি হিন্দুস্থানী ভাষায় ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণের পক্ষপাতী। ইহার প্রয়োজন আছে, কেন না আধুনিক অনেক নাম ও শব্দের প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নাই, সংস্কৃত, পারসী বা আরবী হইতে কঠিন শব্দ রচনা না করিয়া সর্বজন-পরিচিত শব্দ ব্যবহার করাই ভাল। ভাষার পবিত্রতা রক্ষাকারীরা ইহাতে আপত্তি করিবেন, কিন্তু আমার মনে হয় ইহা মস্ত ভুল, অন্যান্য ভাষা হইতে শব্দ ও ভাব পরিপাক করিবার শক্তি ও সহজ নমনীয়তার দ্বারাই ভাষা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে।

আমার ভগ্নীর বিবাহের পরেই আমি কাশী যাত্রা করিলাম। আমার পুরাতন বন্ধু ও সহকর্মী শিবপ্রসাদ গুপ্ত এক বৎসরকাল পীড়িত ছিলেন। লক্ষ্ণৌ জেলে থাকিবার সময় তিনি পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হন, তখন হইতে অতি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছেন। কাশীতে অবস্থান কালীন একটি ক্ষুদ্র হিন্দী-সাহিত্য সমিতি আমাকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন এবং আমি সদস্যদের সহিত সাধারণভাবে কিছু আলাপ আলোচনা করি। আমি বলিলাম, যে বিষয় আমি অল্প জানি, তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনায় আমার সঙ্কোচ হয়, তবুও আমি কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিলাম। হিন্দী লিখিবার আলঙ্কারিক ও জটিল প্রচলিত প্রথার সমালোচনা করিয়া আমি বলিলাম যে কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ, কৃত্রিম ও আড়ষ্ট প্রাচীন রচনাপদ্ধতি ধরিয়া থাকার কোনই সার্থকতা নাই। আমি বলিলাম মুষ্টিমেয় ব্যক্তির জন্য এইরূপ রাজদরবারী রীতিতে সাহিত্য রচনা ত্যাগ করিয়া হিন্দী লেখকগণ দৃঢ়তার সহিত সর্বজনবোধ্য

ভাষায় জনসাধারণের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি কর্ন। জনসাধারণের সহিত সংস্পর্শে ভাষা জীবন্ত ও অকৃত্রিম হইয়া উঠিবে, লেখকগণও জনসাধারণের ভাবাবেগ হইতে শক্তি লাভ করিয়া অধিকতর উন্নতধরণে রচনা করিতে সমর্থ হইবেন। আমি আরও বলিলাম যে, হিন্দী গ্রন্থকারেরা যদি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সাহিত্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হন, তাহা হইলে তাঁহারা বহ্ল পরিমাণে উপকৃত হইবেন। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা হইতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও আধ্নিক ভাব-ধারা সংক্রান্ত গ্রন্থগ্লির অন্বাদ হওয়াও বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গতঃ আমি উল্লেখ করিলাম যে আধ্নিক হিন্দী অপেক্ষা, আধ্নিক বাঙ্গলা, মারাঠী ও গুজরাটী ভাষা অধিক অগ্রসর, বিশেষভাবে আধ্নিক বাঙ্গলা সাহিত্যের মৌলিকতা ও সৃজনীপ্রতিভা হিন্দী হইতে অনেক অধিক।

এই সকল কথা বন্ধ্ভাবে আলোচনা করিয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু উহা যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে, এ ধারণাও আমার ছিল না, কিন্তু সভায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি উহার বিবরণ হিন্দী সংবাদপত্রগ্লিতে প্রকাশ করিয়া দিলেন।

আমার বির্দ্ধে হিন্দী সংবাদপত্রগ্লিতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিল, যেহেতু আমি বাঙ্গলা, গুজরাটী ও মারাঠী অপেক্ষা হিন্দীকে হীন করিয়া সমালোচনা করিতে স্পর্ধা প্রকাশ করিয়াছি। আমাকে গভীরভাবে অজ্ঞ—এ বিষয়ে আমি অজ্ঞ তাহাতে সন্দেহ কি—ও আরও কঠিন কঠিন বিশেষণ দ্বারা পরাহত করা হইল। এই বাদান্বাদ পড়িবার আমি সময় পাই নাই, শ্নিয়াছি কয়েকমাস ধরিয়া,—আমি প্নরায় কারাগারে না যাওয়া পর্যন্ত—উহা চলিয়াছিল।

এই ঘটনায় আমার একটা শিক্ষা হইল। আমি ব্ঝিলাম, হিন্দী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা অতিমাত্রায় অসহিষ্ণ্, একজন হিতাকাঙ্ক্ষীর নিকট হইতেও তাঁহাদের সঙ্গত সমালোচনা শ্নিবার মত ধৈর্য নাই। ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই হীনতাবোধ রহিয়াছে। আত্মসমালোচনার একান্ত অভাব, সমালোচনার আদর্শ অতি দীন। গ্রন্থকার ও সমালোচক ব্যক্তিগত অভিসন্ধি আরোপ করিয়া কলহ করিতেছেন, এ দৃশ্য বিরল নহে। ইঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ ব্র্জোয়া শ্রেণীর এবং ক্পমণ্ড্কত্বে পূর্ণ দেখিয়া মনে হয় যেন গ্রন্থকার ও সাংবাদিকেরা পরস্পরের জন্য এবং অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির জন্য লিখিয়া থাকেন; জনসাধারণের স্বার্থ বা মনোভাব একেবারেই অবজ্ঞা করেন। যেখানে ক্ষেত্র প্রশস্ত এবং বিস্তৃত সেখানে এভাবে শক্তির অপব্যয় করা কত শোচনীয়।

হিন্দী সাহিত্যে অতীত সম্পদ প্রচুর· কিন্তু কেবল অতীতের উপর নির্ভর করিয়া ইহা বাঁচিতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহার মহৎ ভবিষ্যৎ আছে এবং হিন্দী সংবাদপত্রগ্লি কালক্রমে দেশে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত প্রথা বর্জন করিয়া সাহসের সহিত জনসাধারণের জন্য সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত না হইলে উন্নতির আশা নাই।

৫৬

সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

আমার ভগ্নীর বিবাহের প্রাক্কালে সংবাদ আসিল, ইউরোপে বিঠলভাই প্যাটেলের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল রোগভোগ করিতেছিলেন এবং এই কারণেই ভারতে তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাবহ ঘটনা, আমাদের সংগ্রামের মধ্যে প্রধান নেতাদের একের পর আর এইভাবে মহাপ্রস্থান, অত্যন্ত অবসাদজনক। বিঠলভাই এর গুণকীর্তন করিয়া অনেকেই লিখিতে লাগিলেন। এবং প্রায় সকলেই তাঁহাকে একজন পার্লামেণ্টারী নীতিবিশারদ এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতিরূপে তাঁহার সাফল্যের কথা উল্লেখ করিতে লাগিলেন। ইহা নিঃসংশয়ে সত্য কিন্তু ইহার বারম্বার পুনরুক্তিতে আমি অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করিতে লাগিলাম। ভারতে কি পার্লামেণ্টারী কার্যে পরিপক্ক এবং যোগ্যতার সহিত সভাপতির কার্য পরিচালনা করিতে পারেন, এমন লোকের অভাব আছে? এই কাজের জন্য আমাদের আইনজীবীরা যথেষ্ট শিক্ষিত। বিঠলভাই উহা অপেক্ষাও অনেক বড় ছিলেন—তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার একজন দুর্দমনীয় যোদ্ধা।

আমার বারানসীতে অবস্থানকালীন আমি হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নিকট বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়াছিলাম। আমি আনন্দের সহিত আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম এবং ভাইস-চ্যান্সেলর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে এক বিশাল সভায় বক্তৃতা করিলাম। প্রসঙ্গতঃ আমাকে সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে হইল, আমি তীব্রভাবায় উহার নিন্দা করিলাম এবং বিশেষভাবে হিন্দু মহাসভার কার্যপ্রণালীরও নিন্দা করিলাম। আক্রমণ করিবার জন্য পূর্ব হইতে আমি কোন সঙ্কল্প করি নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার মনের মধ্যে বিভিন্ন দলের সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যপদ্ধতির জন্য ক্রোধ সঞ্চিত ছিল এবং আলোচনামুখে উৎসাহ ও উত্তেজনায় সেই ক্রোধের কিয়দংশ বাহিরে প্রকাশিত হইল। আমি বিশেষ জোরের সহিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রগতি-বিরোধী চরিত্রের কথা বলিলাম, কেন না সম্পূর্ণ হিন্দু শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের স্বরূপ বর্ণনার কোন অর্থ হয় না। তখন আমার একথা মনে হয় নাই যে, যে সভার সভাপতি মালব্যজী, সেই সভায় হিন্দু মহাসভার সমালোচনা করা সুরুচির পরিচায়ক নহে, কেন না তিনি উহার অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ। উহা আরও মনে না পড়িবার কারণ এই যে, ইদানীং তিনি উহার সহিত ততটা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন না, নূতন আক্রমণশীল নেতারা তাঁহাকে অনেকটা কোণ-ঠাসা করিয়া ফেলিয়াছিল। যতদিন তাঁহার প্রভাব ছিল, ততদিন মহাসভা সাম্প্রদায়িকতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা প্রভাব হইয়া উঠে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহাতে মালব্যজীর কোন হাত ছিল না এবং তিনি নিশ্চয়ই ইহা অনুমোদন করেন নাই। তথাপি আমার পক্ষে ইহা উচিত হয় নাই। আমি পরে বুঝিলাম যে, তাঁহার আমন্ত্রণের অপব্যবহার করিয়া আমি যে সকল মন্তব্য করিয়াছি, তদ্দ্বারা তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। এজন্য আমি দুঃখিত হইয়াছিলাম।

আমার নির্দোষিতাপ্রসঙ্গে আর একটি ভুলের জন্যও আমি দুঃখিত হইয়াছি। একজন আমার নিকট একটি প্রস্তাবের নকল পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন, আমারই

হিন্দু যুবক-সম্মেলনে ঐ প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবটি অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং আমার বারাণসীর বক্তৃতায় উহা উল্লেখ করিয়াছিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ কোন সম্মেলনে ঐ প্রস্তাব গৃহীতই হয় নাই, উহা দুষ্টলোকের ধাপ্পাবাজী মাত্র।

আমার বারাণসীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় হৈ হৈ পড়িয়া গেল। এই শ্রেণীর ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত হইলেও হিন্দুমহাসভার নেতাদের আক্রমণে বিষের জ্বালা দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। এই সকল আক্রমণ ব্যক্তিগত এবং আলোচ্য বিষয়ের সহিত উহার কোন সংস্রব নাই। তাঁহারা সীমা অতিক্রম করিলেন, ইহাতে আমি আনন্দিতই হইলাম, কেন না, আমি এ বিষয়ে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার সুযোগ পাইলাম। মাসের পর মাস ধরিয়া, এমন কি যখন আমি কারাগারে ছিলাম, তখন হইতেই এই সকল কথা আমার মনের মধ্যে গর্জন করিতেছিল, কিন্তু প্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। ইহাতে যেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া হইল, যদিও ভীমরুল আমার গা-সহা, তথাপি যে বাদানুবাদ গালাগালিতে পর্যবসিত হয়, তাহাতে আনন্দ নাই। কিন্তু আমার বিচার করিবার অবসর রহিল না। আমার ধারণানুযায়ী যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিলাম, আমি উহাতে দেখাইলাম, দুই পক্ষের কেহই "খাঁটি" সাম্প্রদায়িকতাবাদী নহে, আসলে রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিরোধীরাই সাম্প্রদায়িকতার মুখোস পরিয়া আত্মগোপন করিয়া আছে। সংবাদপত্র হইতে জেলে সংগ্রহ করা, সাম্প্রদায়িক নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতির কতকগুলি বিবরণ আমার নিকট ছিল। আমার নিকট এত বেশী উপাদান ছিল যে, সেগুলিকে সংবাদপত্রের প্রবন্ধের মধ্যে সাজাইয়া গুছাইয়া ঠাসিয়া দিতে আমাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে।

আমার এই প্রবন্ধটি ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে বহুল প্রচার লাভ করিল। কিন্তু কি হিন্দু কি মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী, কোন পক্ষ হইতেই কোন জবাব আসিল না; যদিও আমার প্রবন্ধে উভয়ের সম্বন্ধেই অনেক কথা ছিল। হিন্দুমহাসভার যে সকল নেতা নানা ছন্দে জোরালো ভাষায় আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা একেবারেই মৌনাবলম্বন করিলেন। মুসলমানদের পক্ষ হইতে কেবল স্যর মহম্মদ ইকবাল, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ভ্রম সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহা ছাড়া তিনি আমার যুক্তিসম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। ইহার উত্তর দিতে গিয়াই আমি ইঙ্গিত করিলাম যে, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি গণ-পরিষদ আহ্বান করিয়া মীমাংসা করা উচিত। পরে সাম্প্রদায়িকতা লইয়া আমি আরও দুই একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই সকল প্রবন্ধ লোকে সাদরভাবে গ্রহণ করায় এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উপর এগুলির প্রভাব দেখিয়া আমি আশান্বিত হইলাম। অবশ্য আমি কল্পনাও করি নাই যে সাম্প্রদায়িকতার পশ্চাতে যে তীব্র মনোভাব বিদ্যমান, তাহা আমি কোন যাদুমন্ত্রে উড়াইয়া দিতে পারিব। আমার কেবল দেখাইবার উদ্দেশ্য ছিল যে সাম্প্রদায়িক নেতারা ভারতের ও ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত এবং কার্যক্ষেত্রে তাঁহারা সর্ববিধ রাজনৈতিক, বিশেষভাবে সামাজিক উন্নতির বিরোধী। তাঁহাদের দাবীগুলির সহিত জনসাধারণের কোন সম্পর্ক নাই। উপরের দিকের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া উহার আর কোন সার্থকতা নাই। এই ভাবে যুক্তিতর্ক

দ্বারা যখন আমি আক্রমণ করিতে সংকল্প করিলাম, তখনই কারাগারের ডাক আসিল। হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদনের সার্থকতা আছে সন্দেহ নাই কিন্তু অনৈক্যের কারণগুলি বুঝিবার চেষ্টা না করিলে, উহা শূন্য-গর্ভ উক্তিমাত্র। যাহা হউক, অনেকে এরূপ কল্পনা করেন যে, ঐ যাদুমন্ত্রটি বারে বারে আওড়াইলেই একদিন মিলন আসিয়া পড়িবে।

১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর হইতে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্পর্কে ব্রিটিশ-নীতি খতাইয়া দেখিলে অনেক কিছু বুঝিবার উপাদান পাওয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমানকে একত্র মিলিত হইয়া কাজ করিতে বাধা দেওয়া এবং এককে অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা মূলতঃ অপরিহার্য নীতি ছিল। ১৮৫৭-র পর ব্রিটিশের কঠিন হস্ত হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের উপরই কঠোরভাবে পতিত হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, মুসলমানেরাই অধিক আক্রমণশীল ও রণপ্রিয়, ভারত-শাসনের অল্প-দিন পূর্বের স্মৃতি তাঁহাদের রহিয়াছে, অতএব ইহারাই অধিকতর বিপজ্জনক। মুসলমানেরাও নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে সরিয়া রহিলেন এবং গভর্ণমেন্টের অধীনে অল্প চাকুরীই তাঁহারা পাইলেন। এ সমস্তই তাঁহারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। হিন্দুরা ইংরাজী ভাষা শিখিয়া কেরাণী শ্রেণীর চাকুরী আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তাহাদের বেশ নিরীহ মনে হইতে লাগিল।

উপরের দিকে অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ে আধুনিক জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হইল এবং স্বাভাবিকভাবেই ইহা হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কেন না, মুসলমানেরা তখন শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। এই জাতীয়তাবাদের সুর অতি শান্ত নিরীহ হইলেও গভর্ণমেন্ট তাহা পছন্দ করিলেন না, তাঁহারা মুসলমানদিগকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন, যাহাতে তাঁহারা নূতন জাতীয়তাবাদ হইতে দূরে সরিয়া থাকেন। ইংরাজী শিক্ষার অভাবই ছিল মুসলমানদের প্রধান বাধা, কিন্তু তাহা ধীরে ধীরেই অন্তর্হিত হইবে সন্দেহ নাই। দূরদৃষ্টি লইয়া ব্রিটিশগণ ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং এই কার্যে তাঁহাদের প্রধান সহায় হইলেন প্রখর ব্যক্তিত্বশালী সার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ।

সম্প্রদায়ের অনুন্নত অবস্থা, বিশেষভাবে শিক্ষায় শোচনীয় দুর্গতি দেখিয়া সার সৈয়দ ব্যথিত হইলেন; ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের উপর ইহাদের কোন প্রভাব নাই, গভর্ণমেন্টও ইহাদের কোন অনুগ্রহ করেন না, ইহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত দুঃখ-জনক হইয়া উঠিল। তৎকালীন অনেক সমসাময়িক ব্যক্তির মত তিনিও ব্রিটিশের অনুরাগী ছিলেন এবং বিলাত ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইউরোপ—বিশেষভাবে পশ্চিম ইউরোপ—বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, সমস্ত জগতে তাহার একাধিপত্য, বড় হইতে গেলে যে সকল গুণ আবশ্যক তাহা সর্বত্র প্রকাশিত। সমস্ত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য উচ্চশ্রেণীর করায়ত্ত, প্রশ্ন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। ইহা উদারনৈতিকদলের যুগ, ইহা ভবিষ্যতের মহৎ পরিণতির উপর দৃঢ়বিশ্বাসী। এই বিস্ময়কর বাহ্য চাকচিক্য প্রত্যক্ষ করিয়া ভারতীয়েরা যে অভিভূত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? হিন্দুরাই অধিকসংখ্যায় ইউরোপে ও ইংলণ্ডে গিয়া তাহাদের অনুরাগী হইয়া স্বদেশে ফিরিতে লাগিলেন। তবে বাহ্য চাকচিক্য ও আড়ম্বর সহিয়া গেল, প্রথম দর্শনের বিস্ময় আর রহিল না। কিন্তু সার সৈয়দের মনে প্রথম দর্শনের বিস্ময় ও আসক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। ১৮৬৯ সালে ইংলণ্ডে গিয়া তিনি দেশে কতকগুলি পত্র লেখেন। ইহার একখানি পত্রে তিনি

লিখিয়াছেন,—"ভারতে ইংরাজদের অসৌজন্য এবং ভারতবাসীকে ঘৃণা ও অযোগ্য জীবজন্তুর মত ব্যবহারের জন্য যদিও আমি ইংরাজকে মার্জনা করিতে পারি না, তথাপি আমার মনে হয়, তাঁহারা ভ্রান্ত ধারণা হইতেই ঐরূপ করিয়া থাকেন এবং কিছু সঙ্কোচের সহিত আমি একথাও স্বীকার করিব যে, আমাদের সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত খুব বেশী ভুল নহে। ইংরাজের খোসামোদ না করিয়াও আমি একথা বলিতে পারি যে ভারতীয় নেটিভগণ, উচ্চ নীচ, ব্যবসায়ী ও ছোট দোকানদার, শিক্ষিত ও নিরক্ষরদের যদি আদব কায়দা শিক্ষা ও চরিত্রের মহত্ত্বের মাপকাঠিতে ইংরাজদের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে, শক্তিমান সুন্দর মানুষের সহিত একটা নোংরা জানোয়ারের যে পার্থক্য, পার্থক্য ঠিক ততখানি। ভারতের ইংরাজেরা যে আমাদিগকে নপুংসক পশু বলিয়া মনে করে, তাহার যুক্তি ও কারণ আছে।......যাহা আমি দেখিয়াছি এবং প্রত্যহ দেখিতেছি, ভারতের নেটিভরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না।......যাহা কিছু ভাল বস্তু, ঐহিক ও পারমার্থিক, যাহা কিছু মহৎ মানুষের মধ্যে দেখা যায়, সে সমস্তই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ইউরোপকে, বিশেষ ভাবে ইংলণ্ডকে দান করিয়াছেন।*

ইংলণ্ড ও ইউরোপের ইহাপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর কেহই করিতে পারেন নাই, স্যর সৈয়দ যে অতিমাত্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তুলনা করিতে গিয়া তিনি যে কঠিন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহার উদ্দেশ্য এই যে তাঁহার স্বদেশবাসীকে মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর করাইবার জন্য। এই অগ্রসর বলিতে তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, অন্যথা তাঁহার সম্প্রদায় অধিকতর শক্তিহীন ও অধঃপতিত হইয়া পড়িবে। ইংরাজী শিক্ষার অর্থই সরকারী চাকুরী, নিরাপত্তা, প্রতিপত্তি ও সম্মান। অতএব শিক্ষাবিস্তারে তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন এবং তাঁহার সম্প্রদায়কে স্বমতে আনয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি অনন্যকর্মা হইয়া এই এক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন,—গতানুগতিকতা ও সংশয় হইতে মুসলমানদিগকে মুক্ত করা অতিশয় কঠিন কাজ ছিল সন্দেহ নাই। হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর নবজাতীয়তাবাদ তাঁহার নিকট অবান্তর বিষয়ে মনোনিবেশ করা বলিয়া বোধ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি উহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় অর্ধশতাব্দীর অধিক অগ্রসর, তাহারা গভর্ণমেণ্টের সমালোচনায় বিলাস করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা প্রচারে গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যক এবং তিনি এখনই উহাতে যোগ দিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্য পণ্ড হইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন না। অতএব তিনি শিশু জাতীয় কংগ্রেস হইতে মুখ ফিরাইলেন; ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অতি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন।

স্যর সৈয়দের মুসলমানদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার সঙ্কল্প যে ঠিকই হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত তাহারা নূতন ধরণের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গঠন ব্যাপারে কোন কার্যকরী অংশ গ্রহণ করিতে পারিত না এবং উন্নততর শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নত অবস্থাপন্ন হিন্দুদের পোঁ ধরিয়াই তাহাদের কাটাইতে হইত। ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির পথে ও মতবাদের দিক দিয়া তখনও মুসলমানেরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই; কেন না হিন্দুদের মত তাহাদের বুর্জোয়া শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই। স্যর সৈয়দের কার্যপ্রণালী দৃশ্যতঃ অতিমাত্রায় মডারেট

* উদ্ধৃত অংশ হান্স্ কোনের "প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস" হইতে গৃহীত।

হইলেও, উহা সম্যক্‌রূপে বৈপ্লবিক পথেই প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যখন নবসৃষ্ট হিন্দু মধ্যশ্রেণীরা ইউরোপীয় উদারনৈতিক মতবাদের দিক হইতে চিন্তা করিতেছিলেন, তখন মুসলমানেরা গণতন্ত্র-বিরোধী সামন্ততান্ত্রিক মতবাদে আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু উভয়শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে মডারেট এবং ব্রিটিশ শাসনের উপর নির্ভরশীল ছিল। অল্পসংখ্যক ধনী মুসলমান জমিদার যে শ্রেণীর মডারেট, স্যর সৈয়দ ছিলেন সেই শ্রেণীর। হিন্দুদের মডারেট-নীতি ছিল, সতর্ক বৃত্তিজীবী ও বণিকের শিল্পবাণিজ্য ও টাকা খাটাইবার উপায় অন্বেষণ। ব্রিটিশ উদারনীতির দীপ্ত শিখা গ্লাডস্টোন, ব্রাইট প্রভৃতি হইতে হিন্দু রাজনীতিকেরা আলোক গ্রহণ করিতেন। মুসলমানেরা তাহা করিয়াছেন কিনা, আমার সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ তাঁহারা ব্রিটিশ রক্ষণশীল ও ইংলণ্ডের জমিদার সম্প্রদায়ের অনুরাগী ছিলেন। আরমেনিয়ান হত্যাকাণ্ডের জন্য, তুরস্কের পুনঃ পুনঃ নিন্দা করায় তাঁহারা গ্লাডস্টোনকে দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তবে ডিজরেলী তুরস্কের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতি (অবশ্য অল্পসংখ্যক মুসলমানই তখন এই সব ব্যাপারের খোঁজ রাখিতেন) একটু পক্ষপাত দেখাইতেন।

স্যর সৈয়দ আহম্মদ খাঁর কতকগুলি বক্তৃতা আজকাল পড়িলে অত্যন্ত আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয়। যখন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইতেছিল তখন, কংগ্রেসের অতি সাধারণ ও সামান্য দাবীরও সমালোচনা করিয়া ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি লক্ষ্ণৌ-এ এক বক্তৃতা করেন। স্যর সৈয়দ বলিয়াছিলেন— "যদি গভর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের সহিত যুদ্ধ করেন অথবা ব্রহ্মদেশ জয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নীতি সমালোচনা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই।......গভর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়নের জন্য একটি কাউন্সিল গঠন করিয়াছেন...... সকল প্রদেশ হইতে শাসনকার্যে দক্ষ এবং জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কর্মচারীদিগকে এই কাউন্সিলে লওয়া হয় এবং সমাজে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন এবং ঐ সভায় বসিবার উপযুক্ত কয়েকজন রইস্‌কেও (বড় জমিদার) উহাতে লওয়া হয়। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, যোগ্যতার পরিবর্তে সামাজিক মর্যাদা দেখিয়া তাহাদের লওয়া হয় কেন?.. ...আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি—একজন নিম্নশ্রেণীর অথবা সাধারণ বংশের লোক, হউক না কেন সে এম.এ. বা বি. এ., থাকুক তাহার যোগ্যতা,—আমাদের অভিজাত সম্প্রদায় কি অনুমোদন করিবেন যে ঐ ব্যক্তি প্রভুদের আসনে বসিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি ও জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করিবে? কদাচ নহে! ......একজন উচ্চবংশের লোক ব্যতীত, কাহাকেও বড়লাট তাঁহার সহকর্মীরূপে গ্রহণ করিয়া ভ্রাতার মত ব্যবহার করিতে পারেন না; যেখানে ডিউক এবং আর্লগণ খানা খাইবেন, সেই সকল ভোজসভাতেও তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে......আমরা কি বলিতে পারি যে গভর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়নের যে উপায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় নাই? আমরা কি বলিতে পারি যে আইন প্রণয়নে আমাদের কোন হাত নাই?—না, নিশ্চয়ই নহে।"*

ভারতে 'গণ-তান্ত্রিক ইস্‌লামের' নেতা ও প্রতিনিধির মুখে এই কথা! আজকার দিনে অযোধ্যার তালুকদার, আগ্রা, বাঙ্গলা, বিহারের জমিদারগণও ঐ শ্রেণীর বক্তৃতা করিতে সাহসী হইবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু এ ব্যাপারে স্যর সৈয়দই একা নহেন। সেকালে অনেক কংগ্রেসের বক্তৃতাও এইরূপ আশ্চর্য বোধ

* উদ্ধৃত অংশ হাসান্ জেদের "ভারতে জাতীয়তাবাদের ইতিহাস" হইতে গৃহীত।

হইবে। কিন্তু সেকালের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকে এইরূপ ছিল;—উদীয়মান ও সচ্ছল আর্থিক অবস্থার মধ্যশ্রেণীকে (হিন্দু) সামন্ততান্ত্রিক জমিদার শ্রেণী (মুসলমান) কতকাংশে বাধা দিয়াছেন ও সংযত করিয়াছেন। হিন্দু জমিদারেরা তাহাদের বুর্জোয়াশ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ায় অনেকটা নিরপেক্ষ থাকিতেন, এমন কি মধ্যশ্রেণীর দাবীগুলির প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন, কেন না, ঐ সকল দাবীর পশ্চাতে প্রায়ই তাঁহাদের প্রভাব থাকিত। ব্রিটিশগণ সর্বদাই সামন্ততান্ত্রিক অংশের পক্ষে থাকিতেন। এই অভিনয়ের কোন পক্ষেই জনসাধারণ বা নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর স্থান ছিল না।

স্যার সৈয়দের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ভারতীয় মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করিল এবং আলীগড় কলেজ তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হইয়া উঠিল। পরিবর্তনের সময় উন্নতিশীল আগ্রহ শীঘ্রই তাহার কর্তব্য শেষ করিয়া পরিণতির মুখে উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। ভারতীয় লিবারেলগণ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা পুরাতন কংগ্রেসের ভাবধারার প্রকৃত উত্তরাধিকারী, আমরাই আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছি। সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে জগৎ পরিবর্তিত হইতেছে, প্রাচীন কংগ্রেসের ভাবধারা প্রভাতের শিশিরের মত মিলাইয়া গিয়া এখন স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত। সেইরূপ স্যার সৈয়দের বার্তার প্রয়োজন ও উপযোগিতা তখন ছিল, কিন্তু ইহা কখনও উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের চরম আদর্শ হইতে পারে না। সম্ভবতঃ তিনি যদি আর এক পুরুষ পরে জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার বার্তাকে নূতন রূপ দিতেন। অথবা অন্যান্য নেতারা তাঁহার বার্তার নূতন ব্যাখ্যা করিয়া তাহা পরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু স্যার সৈয়দের সাফল্য এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ পুরাতন বিশ্বাস ছাড়িয়া অগ্রসর হওয়া অপরের পক্ষে কঠিন হইয়াছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে, যাঁহারা নূতন পথ দেখাইতে পারেন এমন অনন্যসাধারণ যোগ্যব্যক্তির একান্ত অভাব। আলীগড় কলেজ অনেক ভাল কাজ করিয়াছে, বহুসংখ্যক যোগ্যব্যক্তি প্রস্তুত করিয়াছে, শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের মানসিক গতি পরিবর্তন করিয়াছে; তথাপি উহা তাহার আদিম কাঠামো হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে না—সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব ইহার উপর রাজত্ব করিতেছে এবং ছাত্রদের সাধারণ উচ্চাশার লক্ষ্য গভর্ণমেণ্ট চাকুরী লাভ। দুর্লভের সন্ধানে গ্রহ-তারকায় ভ্রমণ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাহার নাই, একটি ডেপুটি-কলেক্টারের পদ পাইলেই সে সুখী। মহান ইসলাম-গণতন্ত্রের সে সৈনিক, এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার গর্বকে তৃপ্ত করা হয় এবং এই ভ্রাতৃত্বের প্রমাণ স্বরূপ সে মহানন্দে 'তুর্কী-ফেজ্' বলিয়া কথিত লালটুপী গর্বিত ভঙ্গীতে মাথায় চাপায়, কিন্তু অল্পদিন হইল তুর্কীরা নিজেরাই ঐ টুপী সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়াছেন। সে তাহার অপরিবর্তনীয় গণতান্ত্রিক অধিকার,—যাহার বলে সে সমস্ত মুসলমান ভ্রাতার সহিত একত্রে আহার ও উপাসনা করিতে পারে,—সে সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, ভারতে অন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অস্তিত্ব লইয়া মাথা ঘামায় না।

দৃষ্টির এই সঙ্কীর্ণতা, সরকারী চাকুরীর জন্য লালায়িত হওয়া কেবল আলীগড় ও অন্যান্য স্থানের মুসলমান ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। হিন্দু ছাত্রদের মধ্যেও ইহা সমানভাবেই দেখা যায় এবং তাহাদের মধ্যেও ত্যাগের সহিত সংগ্রামপ্রবণতার অত্যন্ত অভাব। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তাহাদের কেহ কেহ গতানুগতিক পথ হইতে ছিটকাইয়া পড়ে। তাহাদের সংখ্যা প্রচুর অথচ

চাকুরীর সংখ্যা কম, কাজেই তাহারা শ্রেণীভ্রষ্ট শিক্ষিত সম্প্রদায়ে পরিণত হয় এবং ইহারাই বৈপ্লবিক জাতীয় আন্দোলনগুলির মেরুদণ্ড।

স্যর সৈয়দ আহম্মদ খাঁর রাজনৈতিক বার্তার ফলস্বরূপ গণ্ডদ্ব হইতে যখন মুসলমান সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে নাই তখন বিংশ শতাব্দীর সেই প্রারম্ভিক বৎসরগুলিতে নবজাগ্রত জাতীয় আন্দোলনের সহিত মুসলমানদের ভেদ ঘটাইতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অনেক সুবিধা পাইয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে স্যর ভ্যালেণ্টাইন চিরোল তাঁহার "ইণ্ডিয়ান আনরেষ্ট" নামক পুস্তকে লিখিয়াছিলেন,—"ইহা নিশ্চিতরূপেই জোর করিয়া বলা যায় যে, অদ্যকার মত আর কোন সময়েই ভারতীয় মুসলমানেরা সমগ্রভাবে নিস্সন্দেহে স্বার্থ ও আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে এক করিয়া দেখে নাই।" রাজনীতিক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করা বিপজ্জনক। স্যর ভ্যালেণ্টাইনের উহা লিখিবার পাঁচ বৎসর পরেই মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়, মুসলমান উদয়ে তাঁহাদের চরণ-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কংগ্রেসের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানেরা যেন কংগ্রেসকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন এবং ইহার নেতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দশ বৎসরে মহাযুদ্ধ আসিয়াছে, গিয়াছে এবং রাখিয়া গিয়াছে বিপর্যস্ত জগৎ।

তথাপি স্যর ভ্যালেণ্টাইনের ঐরূপ সিদ্ধান্তে আসিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। আগা খাঁ মুসলমানদের নেতারূপে আবির্ভূত হইলেন এবং এই ঘটনায় প্রমাণিত হইল যে তাঁহারা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার কত অনুরক্ত, কেন না আগা খাঁ বুর্জোয়া-শ্রেণীর নেতা নহেন। তিনি একজন অতুল ঐশ্বর্যশালী সামন্ত এবং এক ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতা, ব্রিটিশ শাসকসম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার জন্য ইংরাজের দৃষ্টিতে তিনি একেবারে "মনের মানুষ"। তিনি মার্জিতরুচি ভদ্রব্যক্তি, অধিকাংশ সময়ই তিনি ইউরোপে থাকেন, ঘোড়দৌড় ও খেলা ধুলা লইয়া ধনী ইংরাজ জমিদারদের ন্যায় জীবন যাপন করেন, কাজেই ব্যক্তি হিসাবে তিনি শ্রেণী বা সম্প্রদায়গত ব্যাপারে সঙ্কীর্ণচেতা হইতেই পারেন না। তাঁহার মুসলমানদের নেতৃত্বের অর্থ, মুসলমান জমিদার সম্প্রদায় ও ক্রমবর্ধিত বুর্জোয়া শ্রেণীকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত একসূত্রে গাঁথিয়া দেওয়া। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ এক গৌণ ব্যাপার হইলেও এই মূল উদ্দেশ্যের জন্যই উহার উপর জোর দেওয়া হইত। স্যর ভ্যালেণ্টাইন চিরোল আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, আগা খাঁ, বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, "বঙ্গ বিভাগের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে মুসলমানদের অভিমত এই যে, যদি হিন্দুদের সহসা কোন রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর প্রাধান্য লাভের পথই প্রস্তুত হইবে, তাহা হইলে উহা ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের পক্ষে এবং যাহাদের রাজভক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের পক্ষে সমান ভাবে বিপজ্জনক হইবে।"

কিন্তু বাহ্যতঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইবার অন্তরালে অন্যান্য শক্তি কার্য করিতেছিল। নূতন মুসলমান বুর্জোয়া শ্রেণী অনিবার্যরূপে প্রচলিত ব্যবস্থার উপর ক্রমশঃ অসন্তুষ্ট হইয়া জাতীয় আন্দোলনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিলেন। আগা খাঁ নিজেও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি 'এডিনবরা রিভিউ'এ (ইহা যুদ্ধের অনেক পূর্বে) উপদেশ দিয়াছিলেন যে,

গভর্ণমেণ্টের হিন্দ্ ও ম্সলমানদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার নীতি পরিত্যাগ করা উচিত এবং সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে একটি দলভুক্ত করিয়া হিন্দ্ ও ম্সলমানের মিলিত নব্যভারতের নব জাতীয় আন্দোলনের বির্দ্ধে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। ইহা হইতে স্পষ্টই ব্ঝা যায় যে তিনি ম্সলমানের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ অপেক্ষা ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতিরোধের জন্যই অধিক আগ্রহশীল ছিলেন।

কিন্তু কি আগা খাঁ কি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ম্সলমান ব্র্জোয়া শ্রেণীর জাতীয়তাবাদের অভিম্খে অপরিহার্য অগ্রগতি নিবারণ করিতে পারেন নাই। মহায্দ্ধ এই অগ্রগতিকে দ্রুত করিল, ন্তন নেতারা দেখা দিলেন, মনে হইতে লাগিল আগা খাঁ পিছাইয়া পড়িলেন। আলীগড় কলেজেরও স্র ঘ্রিয়া গেল, ন্তন নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আলীভ্রাতৃদ্বয়, আলীগড় কলেজেরই ছাত্র। এখন হইতে ডাঃ এম. এ. আনসারী, মৌলানা আব্ল কালাম আজাদ ও অন্যান্য ব্র্জোয়া শ্রেণীর নেতারা ম্সলমান রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিতে লাগিলেন। একট্ মডারেট ভাবে মিঃ এম. জিন্নাও যোগ দিলেন। গান্ধিজী এই সকল নেতার অধিকাংশকে (মিঃ জিন্না ছাড়া) এবং সাধারণ ম্সলমানদিগকে অসহযোগ আন্দোলনে লইয়া আসিলেন, ইঁহারা ১৯১৯-২৩-এর ঘটনাবলীতে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তারপর প্রতিক্রিয়া আসিল। হিন্দ্ ও ম্সলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক ও নরমপন্থী অনগ্রসর ব্যক্তিরা তাঁহাদের নিভৃত কোটর হইতে প্নরায় বাহির হইয়া আসিলেন। মন্দগতিতে হইলেও ইহা চলিতে লাগিল। সাম্প্রদায়িক মন কষাকষির দর্ণ এই প্রথম হিন্দ্ মহাসভা জাঁকিয়া উঠিল, তবে রাজনীতির দিক দিয়া ইহা কংগ্রেসের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ম্সলমান সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগ্লি ম্সলমান জনসাধারণের উপর তাহাদের প্রাতন মর্যাদা প্নঃপ্রতিষ্ঠায় অধিকতর সাফল্য লাভ করিল। তথাপি এক শক্তিশালী নেতৃমণ্ডলী বরাবর কংগ্রেসের দিকে ছিলেন। ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্ট ম্সলমান সাম্প্রদায়িক নেতাদের সকল বিষয়ে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ইঁহারা অবশ্য রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল। ইহাদের সাফল্য লক্ষ্য করিয়া, হিন্দ্ মহাসভাও তাঁহাদের সহিত পাল্লা দিয়া প্রতিক্রিয়া দেখাইতে লাগিলেন; আশা, এই উপায়ে তাঁহারাও গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন হইবেন। অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি হিন্দ্-সভা হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, অনেকে স্বেচ্ছায় ছাড়িলেন; উহা ক্রমে উচ্চ-মধ্যশ্রেণী বিশেষভাবে ধনী ও মহাজনশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল।

উভয় পক্ষীয় সাম্প্রদায়িক নেতারা, যাঁহারা আইনসভার আসন-সংখ্যা লইয়া প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক করেন, তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের অন্গ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারাই ইহা নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহা ছাড়া কিছ্ ভাবিতেই পারেন না। ইহা মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য চাকুরী ও কাজ সংগ্রহের সংঘর্ষ। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার মত অধিক চাকুরী নাই, হিন্দ্ ও ম্সলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা উহা লইয়া কলহ করিতে লাগিলেন। হিন্দ্দের হাতেই বর্তমানে অধিক চাকুরী আছে বলিয়া তাঁহারা উহা রক্ষার জন্য দাবী করিতে লাগিলেন, অপর পক্ষের প্রার্থনার মাত্রা বাড়িয়া চলিল। চাকুরী লইয়া কলহের পশ্চাতে আরও অধিক কলহের কারণ ছিল; তাহা সাম্প্রদায়িক না হইলেও সাম্প্রদায়িক সমস্যাগ্লির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মোটের উপর পাঞ্জাব, সিন্ধ্ ও বাঙ্গলায় হিন্দ্রা ধনী, মহাজন ও সহরবাসী, এই সকল প্রদেশে ম্সলমানেরা দরিদ্র, খাতক ও পল্লীবাসী।

অতএব উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ কতকাংশে অর্থনৈতিক হইলেও উহা সাম্প্রদায়িকতায় রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পল্লীর ঋণের বোঝা কমাইবার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভায় উত্থাপিত (বিশেষভাবে পাঞ্জাবে) বিল লইয়া আলোচনায় ইহা স্পষ্ট-ভাবে বুঝা গিয়াছিল। হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা ধনী মহাজনশ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করিয়া ঐগুলির বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা সমালোচনা করিতে গিয়া হিন্দু মহাসভা তাঁহাদের নির্দোষ জাতীয়তাবাদের উপর জোর দিয়া থাকেন। মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহাদের অনন্যসাধারণ সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির যে সকল পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্বজনবিদিত ও অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ। মহাসভার সাম্প্রদায়িকতা তত বেশী স্পষ্ট নহে, ইহা জাতীয়তার মুখোস পরিয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের স্বার্থের ক্ষতিজনক কোন জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সমাধানের প্রস্তাব প্রায়ই পরীক্ষারূপে উপস্থিত হয় এবং এই পরীক্ষায় হিন্দু মহাসভা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য তাঁহারা সিন্ধুপ্রদেশ স্বতন্ত্রীকরণের প্রস্তাবে অবিরত বাধাপ্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা গোলটেবিল বৈঠকে অতি আশ্চর্য জাতীয়তাবাদদ্রোহিতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখাইয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র পাকা সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের মনোনীত করিবার দাবী করিয়াছিলেন এবং ইঁহারা আগা খাঁর নেতৃত্বে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল দলের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ব্রিটিশ রাষ্ট্রক্ষেত্রে এই দল, কেবল ভারতের দৃষ্টিতেই নহে, ইংলণ্ডের উন্নতিশীল দলগুলির দৃষ্টিতেও অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল। আগা খাঁ ও তাঁহার দলের সহিত লর্ড লয়েড ও তাঁহার দলের সম্মেলন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসান ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা অত্যন্ত নৈরাশ্যপ্রদ, কেন না এই এসোসিয়েসান ভারতীয় স্বাধীনতার প্রবলতম এবং অতিমাত্রায় আক্রমণশীল প্রতিদ্বন্দ্বী।

হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য নানাবিধ রক্ষাকবচ (বিশেষভাবে পাঞ্জাবে) দাবী করিতে লাগিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, তাঁহারা মুসলমান-দিগকেও হারাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। তাঁহাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল না, স্বাধীনতার প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করা হইল। মুসলমানেরা অন্ততঃপক্ষে কিছু মর্যাদার সহিত কথা বলিয়াছিল কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তাহাও ছিল না।

আমার নিকট ইহা সর্বদাই আশ্চর্য মনে হয় যে, উভয়পক্ষের সাম্প্রদায়িক নেতারাই উচ্চশ্রেণীর রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াপন্থীদের প্রতিনিধি এবং এই সকল লোক জনসাধারণের ধর্মবুদ্ধির সুযোগ ও সুবিধা লইয়া কিরূপে সমানভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেন। উভয়পক্ষই অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি গোপন করিবার অথবা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শীঘ্রই এমন সময় আসিবে, যখন ইহা আর দাবাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না, তখন উভয়পক্ষের নেতারা আগা খাঁর বিশবৎসর পূর্বের সাবধানবাণীতে কর্ণপাত করিবেন এবং মতারৈক্য একত্র হইয়া সমস্ত পরিবর্তনমূলক ভাবধারার বিরোধিতা করিবেন, ইহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা কিয়ৎ পরিমাণে এখনই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে: হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বাহিরে যতই কলহ করুন না কেন, কিন্তু রাজস্ব-

পরিষদে ও অন্যত্র, প্রতিক্রিয়াশীল আইনাদি প্রণয়ন ও প্রবর্তন করিতে ই'হারা একমত হইয়া গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া থাকেন। যে সূত্রে এই তিনপক্ষ একত্র বাঁধা, ওট্টাওয়া চুক্তি তাহার অন্যতম।

ইতিমধ্যে রক্ষণশীল দলের অতিমাত্রায় দক্ষিণ-পন্থীদের সহিত আগা খাঁর ঘনিষ্ঠতা কেমন সুন্দরভাবে চলিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯৩৪-এর অক্টোবর মাসে তিনি ব্রিটিশ নেভী লিগের ভোজসভায় সম্মানিত অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উহার সভাপতি ছিলেন লর্ড লয়েড। তিনি ব্রিস্টল রক্ষণশীল সম্মেলনে ব্রিটিশ নৌ-বল বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা আগা খাঁ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। দেখা গেল, একজন ভারতীয় নেতা সাম্রাজ্য রক্ষা ও ইংলণ্ডের নিরাপত্তার জন্য কত উৎকণ্ঠিত। মিঃ বলডুইন অথবা "ন্যাশনাল" গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষাও ব্রিটিশ রণসম্ভারবৃদ্ধির জন্য তিনি অধিকতর ব্যস্ত। অবশ্য, শান্তির জন্যই তাঁহার এত মাথাব্যথা।

সংবাদে প্রকাশ পরের মাসে, ১৯৩৪-এর নভেম্বরে লণ্ডনে ঘরোয়াভাবে একখানি ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। উহার উদ্দেশ্য, "ব্রিটিশ রাজমুকুটের সহিত মুসলিম-জগতের চিরস্থায়ী বন্ধুত্বকে দৃঢ় করা।" শুনা গেল এক্ষেত্রেও আগা খাঁ এবং লর্ড লয়েড সম্মানিত অতিথি ছিলেন। দেখিয়া বোধ হয় যেন আগা খাঁ ও লর্ড লয়েড অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ দুইটি হৃদয় এবং সাম্রাজ্যের ব্যাপারে একই ভাবে স্পন্দিত হয়; আমাদের জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন সপ্রু-জয়াকর। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যখন দুইজনের মধ্যে এত বেশী দহরম-মহরম, তখন লর্ড লয়েড, ভারতকে অনেক বেশী দেওয়া হইতেছে এই দুর্বলতার জন্য ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট ও সরকারী রক্ষণশীল দলের নেতাদিগকে ক্রমাগত তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেছিলেন।*

কিছুদিন হইল মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে একটি নূতন বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইহার কোন বাস্তব গুরুত্ব নাই, এবং অনেকে সেরূপ ভাবেন কিনা আমি সন্দেহ করি। তৎসত্ত্বেও ইহার মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট এবং ইহাকে অনেক বেশী প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে। ভারতে 'মুসলিম নেশন', 'মুসলিম কালচার' প্রভৃতি কথার উপর জোর দিয়া দেখান হইতেছে যে, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি পরস্পরবিরোধী পৃথক বস্তু, যাহার কোন সম্মেলন হইতে পারে না। ইহা হইতে অনিবার্যরূপে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে (যদিও কথাটা খোলাখুলিভাবে বলা হয় নাই) ব্রিটিশ চিরকালের জন্য ভারতে তুলাদণ্ড হস্তে উপস্থিত থাকিয়া উভয় "সংস্কৃতি"র মধ্যস্থতা করিবেন।

অল্পসংখ্যক হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাও ঠিক এইভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন; তবে পার্থক্য এই যে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া আশা করেন, তাঁহাদের সংস্কৃতিই পরিণামে জয়ী হইবে।

হিন্দু ও মুসলিম 'সংস্কৃতি' এবং "মুসলিম নেশন" এই শব্দগুলি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া গবেষণা করিবার কত চিত্তাকর্ষক নূতন নূতন পথের সন্ধান দেয়! ভারতে মুসলমান জাতি—জাতির মধ্যে আর একটা জাতি—মোটেই সম্বন্ধ নহে এবং সম্বিতহীন, সর্বত্র বিস্তৃত ও অনিয়ন্ত্রিত। রাজনীতিক্ষেত্রে এই ভাব অর্থহীন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা অসম্ভব কল্পনা; ইহা আলোচনারও

---

* সম্প্রতি কয়েকজন ব্রিটিশ লর্ড এবং ভারতীয় মুসলমান লইয়া একটি কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে। অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মধ্যে মিলন ও ঐক্য সাধনই ইহার উদ্দেশ্য।

অনুপযুক্ত, তথাপি ইহা হইতে আমরা একপ্রকার মনোবৃত্তি বুঝিতে পারি। মধ্যযুগে এবং তাহার পরও এই শ্রেণীর স্বতন্ত্র এবং স্বয়ম্পূর্ণ "বিভিন্ন জাতি" একত্রে বাস করিত। অটোম্যান সুলতানদের প্রথম আমলে কনস্টান্টিনোপল-এ এই শ্রেণীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি পৃথকভাবে বাস করিত এবং লাটিন খৃষ্টান, গোঁড়া খৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতির অনেকটা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যও ছিল। ইহাই ভৌগোলিক সীমার বাহিরে জাতিগত প্রেমের সূচনা, যাহা বর্তমানকালে বহু প্রাচ্যদেশের বুকে নৈশ দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া আছে। অতএব 'মুসলিম নেশন' বলিতে ইহাই বুঝায় যে জাতি বলিয়া কিছু নাই, কেবল ধর্মের বন্ধন আছে; ইহার অর্থ আধুনিকভাবে জাতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কিছু এই গঠন করিতে দেওয়া হইবে না, ইহার অর্থ আধুনিক সভ্যতা বিসর্জন দিয়া আবার মধ্যযুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে, ইহার অর্থ, হয় স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেন্ট নয় বৈদেশিক গভর্ণমেন্ট; চূড়ান্তভাবে ইহার অর্থ, এক মানসিক ভাববিলাস, যাহা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বাস্তবের বিশেষভাবে অর্থনৈতিক বাস্তবের সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছুক। ভাবাবেগের নিকট অনেক সময় যুক্তি পরাহত হইয়া যায়, অতএব অযৌক্তিক বলিয়াই আমরা উহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারি না। মুসলিম জাতির ধারণা কয়েকজন লোকের উর্বর কল্পনাপ্রসূত, খবরের কাগজে প্রচার না হইলে অতি অল্প লোকই ইহার কথা জানিতে পারিত। তবুও যদি অধিকাংশ লোকের ঐরূপ বিশ্বাস থাকে, তাহা বাস্তবের স্পর্শে বিলুপ্ত হইবে।

হিন্দু ও মুসলমান 'সংস্কৃতি' সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। অন্য পরে কা কথা, জাতীয় সংস্কৃতির দিনই চলিয়া যাইতেছে, সমগ্র জগতে একটা সংস্কৃতিগত ঐক্য ফুটিয়া উঠিতেছে। জাতিগুলি থাকিবে, দীর্ঘকাল তাহাদের বিশিষ্ট ভাষা, অভ্যাস, চিন্তাপ্রণালী লইয়া থাকিবে, কিন্তু যন্ত্রযুগ ও বিজ্ঞান, দ্রুত যাতায়াত, অবিশ্রান্ত জগতের সংবাদ আদান প্রদান, রেডিয়ো, সিনেমা প্রভৃতি তাহাদিগকে ক্রমশঃ একই ছাঁচে গড়িয়া তুলিবে। কেহই ইহার গতিরোধ করিতে পারিবে না! যদি কোন খণ্ডপ্রলয়ে বর্তমান সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যায় তাহা হইলেই উহা সম্ভব। পরম্পরাগত জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে নিশ্চয়ই ভেদ আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও কলকারখানার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উহাদের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে পূর্বোক্ত দুই-এর সহিত ইহার ব্যবধান এত বেশী যে, এই ভূমি হইতে উহাদের পার্থক্য বুঝাই যায় না। ভারতে যে সংঘর্ষ চলিতেছে, তাহা হিন্দু সংস্কৃতির সহিত মুসলমান সংস্কৃতির নহে; এই উভয়ের সহিত জয়দৃপ্ত আধুনিক সভ্যতার বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির সংঘর্ষ। যাঁহারা মুসলমান সংস্কৃতি রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের হিন্দু সংস্কৃতি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই; পাশ্চাত্যের এই নূতন বীরের সহিত তাঁহাদের লড়াই। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, এই চেষ্টা হিন্দুই করুক আর মুসলমানই করুক, আধুনিক বৈজ্ঞানিক কলকারখানার সভ্যতাকে বাধা দিবার চেষ্টা ব্যর্থই হইবে এবং এই ব্যর্থতা আমি বিনা-চিত্তাপে পর্যবেক্ষণ করিব। যখন রেলওয়ে ও অন্যান্য জিনিষ আসিয়াছে, তখন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা উহা গ্রহণ করিয়াছি। স্যর সৈয়দ আহম্মদ খাঁ যখন আলীগড় কলেজ স্থাপন করেন, তখন মুসলমানদের পক্ষ হইতে তিনি উহা বরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে আমাদের কাহারও কোন হাত ছিল না; জলমগ্ন ব্যক্তি উদ্ধারের আশায় হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরে, ইহা অনেকটা সেইরূপ।

কিন্তু এই মুসলমান সংস্কৃতি বস্তুটা কি? ইহা কি আরব, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতির মহৎ কার্যগুলির সম্প্রদায়গত স্মৃতি সমষ্টি! অথবা ভাষা? অথবা শিল্প ও সঙ্গীত? অথবা আচার নিয়ম? মুসলমান শিল্প, মুসলমান সঙ্গীত এই শ্রেণীর কথা আজকাল কেহ বলে আমি ইহা শুনি নাই। আরবী ও পারসী এই দুইটি ভাষা, বিশেষভাবে পারসী ভাষা ভারতে মুসলমান চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু পারসী ভাষার প্রভাবের মধ্যে ধর্মের কোন সংস্রব নাই। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পারস্যের ভাষা, আচার নিয়ম ভারতে আসিয়াছে এবং সমগ্র উত্তর ভারতে তাহার প্রভাব প্রত্যক্ষ। পারস্য প্রাচ্যের ফ্রান্স—ইহার ভাষা ও সংস্কৃতি সমস্ত প্রতিবেশীরাই গ্রহণ করিয়াছে। ভারতে আমরা সকলেই এই সাধারণ ও মূল্যবান সম্পদের উত্তরাধিকারী।

ঐসলামিক দেশ ও সম্প্রদায়গুলির অতীত কৃতিত্বই সম্ভবতঃ ঐসলামিক ঐক্যের সর্বাপেক্ষা দৃঢ়বন্ধন। বিভিন্ন জাতির মুসলমানগণের অতীত মহত্ত্বের স্মৃতির জন্য কেহ কি মুসলমানদিগকে বিদ্বেষ দৃষ্টিতে দেখে? যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা ইহা স্মরণ রাখিবেন, ইহার সমাদর করিবেন, ততদিন কেহ তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা কাড়িয়া লইতে পারিবে না। কার্যতঃ এই সকল অতীত সম্পদের আমরা সকলেই উত্তরাধিকারী। যখন আমরা ইউরোপের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সাধারণ ঐক্য অনুভব করি, সম্ভবতঃ তখন আমরা নিজেদের এশিয়াবাসীরূপেই বিবেচনা করি। আমি জানি, যখনই আমি স্পেনে আরবদের যুদ্ধ অথবা ক্রুসেডের ইতিহাস পাঠ করিয়াছি, তখন আমার সহানুভূতি তাহাদের দিকেই গিয়াছে। আমি মনে মনে নিরপেক্ষ থাকিয়া উদ্দেশ্য বিচার করিতে চাই, কিন্তু যতই চেষ্টা করি না কেন, যেখানে এশিয়াবাসী জড়িত, সেখানে আমার ভিতরের এশিয়াবাসী আমার বিচারবুদ্ধির উপর প্রস্তাব বিস্তার করে।

মুসলমান সংস্কৃতি কি, তাহা বুঝিবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আমি অসঙ্কোচে বলিব যে আমি কৃতকার্য হই নাই। আমি দেখি যে উত্তর ভারতের মুষ্টিমেয় হিন্দু মুসলমান পারসী ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত। জনসাধারণের মধ্যে মুসলমান সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রতীক এই যে, খাটোও নহে, বেশী লম্বাও নহে একপ্রকার পায়জামা, একপ্রকার বিশেষ ভঙ্গীতে গোঁফ কামান নয় ছাঁটা এবং বদনা ব্যবহার, যেমন হিন্দুদের ধুতিপরা, টিকি রাখা এবং লোটা ব্যবহার। এই ভেদও সহরেই বেশী প্রত্যক্ষ এবং তাহাও ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকদের হিন্দু হইতে স্বতন্ত্রভাবে চেনা কঠিন; শিক্ষিত মুসলমানেরা দাড়ির বাহার বড় পছন্দ করেন না, তবে আলীগড় এখনও টিকিওয়ালা তুর্কী টুপীর অনুরক্ত। (ইহাকে তুর্কী টুপী বলা হইলেও তুর্কদের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।) মুসলমান মহিলারা সাড়ী পরিয়া থাকেন এবং ধীরে ধীরে পর্দার বাহিরে আসিতেছেন। এই সকল অভ্যাসের কতকগুলির সহিত আমার নিজের রুচি খাপ খায় না, দাড়ি গোঁফ অথবা টিকির আমি ভক্ত নহি, কিন্তু আমার নিজের রুচি অপরের উপর বলপূর্বক চাপাইবার কোন ইচ্ছা না থাকিলেও একথা স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই যে, যখন কামুলে আমানুল্লা দাড়ির বংশ ধ্বংস করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন, তখন আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম।

যে সকল হিন্দু মুসলমান সর্বদাই পশ্চাদ্দৃষ্টিপরায়ণ এবং যাহা চলিয়া যাইতেছে তাহা ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা বর্তমান জগতে অতি করুণ দৃশ্য। আমি অতীতকে নিছক মন্দও বলিতে চাই না, উহা বর্জন করিতেও চাই

না, কেন না আমাদের অতীতের মধ্যেও অনেক সুন্দর, অনেক মহান বস্তু রহিয়াছে। তাহা যে টিকিয়া থাকিবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা সুন্দর ও মহান, ঐ সকল ব্যক্তি তাহা ধরিয়া রাখিতে চাহেন না, যাহা তুচ্ছ, এমন কি অনিষ্টকর তাহা লইয়াই আগ্রহ দেখান।

অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানেরা বারম্বার আঘাত পাইয়াছেন, তাঁহাদের কতকগুলি চিরপোষিত ধারণা ভাঙিয়া গিয়াছে। যে খিলাফতের জন্য ভারতীয় মুসলমানেরা ১৯২০-এ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তুর্কী—ইসলামের প্রধান যোদ্ধা—সেই খিলাফৎ তো বিলোপ করিয়াছেই, এক পা এক পা করিয়া ধর্ম হইতেও তাহারা সরিয়া যাইতেছে। তুরস্কের নূতন শাসন-তন্ত্রের একটি সূত্রে ছিল যে, তুরস্ক মুসলিম-রাষ্ট্র; কিন্তু যদি কাহারও কোন ভুল হয়, সেজন্য ১৯২৭ সালে কামাল পাশা বলিয়াছিলেন, "শাসনতন্ত্রে তুরস্ককে মুসলিম রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করা, একটা আপোষ মাত্র; প্রথম সুযোগেই উহা পরিত্যক্ত হইবে।" আমার যতদূর স্মরণ হয়, পরে তিনি এই কথামত কার্য করিয়াছেন। মিশর যদিও অধিকতর সাবধানে অগ্রসর হইতেছে, তথাপি সে ধর্ম হইতে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আরব জাতি অধ্যুষিত দেশগুলিতেও সেইরূপ; তবে খাঁটি আরবদেশ অবশ্য এখনও অনেক বেশী পশ্চাৎপদ। সংস্কৃতি-গত প্রেরণা লাভ করিবার জন্য পারস্য তাহার প্রাক্-ইস্লাম অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। সর্বত্রই ধর্ম পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে, জাতীয়তাবাদ যোদ্ধৃবেশ পরিয়া মুখ্য হইয়া উঠিতেছে; তাহার পশ্চাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্যান্য মতবাদ। তাহা হইলে 'মুসলমান জাতি' বা মুসলমান সংস্কৃতি কি? ভবিষ্যতে উহা কি কেবল দয়ালু ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কেবল উত্তর ভারতেই দেখা যাইবে?

যাহা কিছু রাজনীতি তৎসম্পর্কে ব্যক্তির উদার ধারণা পোষণ যদি উন্নতি হয়, তাহা হইলে আমাদের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ও গভর্ণমেণ্ট তাহার বিপরীত লক্ষ্যেই ইচ্ছা করিয়া চলিয়াছেন, এই ধারণাকে যথাসম্ভব সঙ্কীর্ণ করিয়া।

৫৭

বন্ধ পথ

আমার পুনরায় গ্রেফ্তার ও কারাদণ্ডের সম্ভাবনা সর্বদাই মাথার উপর ঝুলিতে লাগিল। যখন সমগ্র দেশ অর্ডিন্যান্স বা অনুরূপ ব্যবস্থার শাসিত এবং কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান তখন নিশ্চয়ই ইহা সম্ভাবনা অপেক্ষাও অনেক বেশী। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যেভাবে গঠিত এবং আমি যেভাবে গঠিত তাহাতে আমাকে দমন করা অনিবার্য। এই নিত্য বর্তমান সম্ভাবনার মধ্যেই আমি কাজ-কর্ম করিতে লাগিলাম। কোন কাজই ধীরভাবে করা হইয়া উঠে না তবুও আমি ব্যস্তভাবে যতটা পারি কাজ করিতে লাগিলাম।

তথাপি আমার গ্রেফ্তার হইবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না, যে সকল কাজে গ্রেফ্তারের সম্ভাবনা আমি তাহা বহুলাংশে এড়াইয়া চলিতাম। আমাদের প্রদেশের নানাস্থান ও বাহির হইতেও প্রচারকার্যের জন্য আহ্বান আসিতে লাগিল। আমি সম্মত হইলাম না, কেন না, বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে গেলে তাহা সহজেই বন্ধ

২৫

হইয়া যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। আমার পক্ষে মাঝামাঝি কোন পথ নাই। অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া কোন স্থানে গেলেও,—যেমন গান্ধিজীর সহিত বা কার্যকরী সমিতির সদস্যদের সহিত দেখা করা—আমি জনসভায় স্বাধীনভাবেই বক্তৃতা করিতাম। জব্বলপুরে এক বিরাট শোভাযাত্রা ও বিশাল জনতা হইয়াছিল, দিল্লীতে যে জনসভা হইয়াছিল, অতবড় জনতা আমি সেখানে আর দেখি নাই। এই সকল সভার সাফল্য হইতে বুঝা গেল যে গভর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে ইহার পুনরাবৃত্তি সহ্য করিবেন না। দিল্লীতে সভার অব্যবহিত পরেই প্রবল জনরব উঠিল যে আমার গ্রেফ্তার আসন্ন কিন্তু আমি সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম এবং এলাহাবাদে ফিরিবার পথে আলীগড়ে আসিয়া মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করিলাম।

যখন গভর্ণমেণ্ট সর্ববিধ রাজনৈতিক কার্য পিষিয়া মারিতেছেন তখন অ-রাজনৈতিক কোন জনসাধারণের কার্যে যোগ দেওয়া আমার নিকট অপ্রীতিকর মনে হইত। আমি লক্ষ্য করিলাম, অনেক কংগ্রেসপন্থীই অন্যান্য কাজের মধ্যে গিয়া পড়িতেছেন, ঐ কাজগুলি ভাল হইলেও আমাদের সংঘর্ষের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। অন্যদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার প্রবণতা স্বাভাবিক হইলেও আমার মনে হইল ইহাতে উৎসাহ দিবার সময় তখন আসে নাই।

১৯৩৩-এর অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে এলাহাবাদে যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস-কর্মীদের একসভা আহুত হইল। সভার উদ্দেশ্য বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যতে কর্মনীতি স্থির করা। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান, আইন অমান্য না করিয়া মিলিত হইবার জন্য আমরা কংগ্রেস কমিটির সভা আহ্বান করিলাম না। কিন্তু যে সকল সদস্য জেলের বাহিরে ছিলেন এবং অন্যান্য বাছা বাছা কর্মীকে আমরা ঘরোয়া বৈঠকে আহ্বান করিলাম। ঘরোয়া বৈঠক হইলেও এই সভা সম্বন্ধে কোন গোপনতা ছিল না এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা জানিতাম না যে ইহাতে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন কি না! এই সভায় জগতের বর্তমান অবস্থা লইয়া অনেক আলোচনা হইল, অর্থনৈতিক সঙ্কট, নাৎসীজম, কম্যুনিজম প্রভৃতি। আমাদের অভিপ্রায় ছিল এই যে অন্যত্র যাহা ঘটিতেছে, আমাদের সহকর্মীরা ভারতের সংঘর্ষও তাহার সহিত যুক্ত করিয়া দেখুক। অবশেষে এই সম্মেলনে আমাদের উদ্দেশ্য নির্দেশ করিয়া এক সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি বর্জনের প্রতিবাদ করা হইল। সকলেই উত্তমরূপে জানিত যে ব্যাপক ভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি চালিবার কোন সম্ভাবনা নাই, ব্যক্তিগত প্রতিরোধও মন্দীভূত হইয়া অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু প্রত্যাহারের ফলে আমাদের দিক দিয়া অবস্থার কোনই পরিবর্তন হইবে না, কেন না গভর্ণমেণ্টের অর্ডিন্যান্সীয় আইনের আক্রমণ চলিতেই থাকিবে। কাজেই কেবল একটা বাহিরের ঠাট বজায় রাখিবার মতই আমরা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ চালাইবার সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু আমরা কর্মীদিগকে উপদেশ দিলাম যে, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যেন কারাবরণ না করে। তাহারা সাধারণ ভাবে কাজ করিয়া যাইবে তাহার ফলে যদি গ্রেফ্তার হইতে হয়, তাহা হইলে হাসিমুখে তাহা গ্রহণ করিবে। বিশেষভাবে তাহাদিগকে পল্লীঅঞ্চলের সহিত যোগস্থাপন করিতে বলা হইল, সরকারী দমননীতি ও খাজনা মাপের ফলে বর্তমানে কৃষকদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাও অনুসন্ধান করিতে বলা হইল। তখন খাজনাবন্ধ আন্দোলনের কোন প্রশ্ন ছিল না। পুণা-সম্মেলনের পর উহা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছিল এবং বর্তমান

অবস্থায় উহার পুনঃপ্রবর্তন যে অসম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য।

এই কার্যপদ্ধতি অত্যন্ত নরম ও নির্দোষ, ইহাতে বে-আইনী কিছুই ছিল না, কিন্তু তথাপি আমরা জানিতাম ইহার ফলেও গ্রেফ্তার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের কর্মীরা গ্রামে ফিরিয়া যাইবার পরই তাহাদের গ্রেফ্তার করা হইতে লাগিল এবং অত্যন্ত অন্যায় ভাবে তাহাদের উপর খাজনাবন্ধ প্রচারের (অর্ডিন্যান্সীয় অপরাধ) অভিযোগ আনিয়া কারাদণ্ড দেওয়া হইতে লাগিল। আমার বহু সহকর্মীর গ্রেফ্তারের পর আমি নিজে ঐ সকল পল্লীঅঞ্চলে যাইবার সংকল্প করিলাম, কিন্তু অন্যান্য কাজের চাপে আমার যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

এই কয়মাসে ভারতের অবস্থা বিবেচনার জন্য দুইবার কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সমিতি হিসাবে ইহার কোন কাজ ছিল না, বে-আইনী বলিয়া নহে, পুণা-সম্মেলনের পর গান্ধিজীর নির্দেশে সমস্ত কংগ্রেসের কমিটি ও আনুষঙ্গিক পদগুলি প্রত্যাহৃত হইয়াছিল। জেল হইতে বাহির হইয়া আমি অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়িলাম, এই আত্ম-বিলোপমূলক অর্ডিন্যান্স মানিয়া লইতে আমার মন সায় দিল না, আমি আমাকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি শূন্যে ভাসিতে লাগিলাম। কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যালয় নাই, কর্মচারী নাই, কার্যকরী সভাপতি নাই, গান্ধিজীর সহিত পরামর্শ করা সম্ভবপর হইলেও তিনি তখন হরিজন কার্যোপলক্ষ্যে সমগ্র ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। আমরা কোন রকমে জব্বলপুর ও দিল্লীতে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, কার্যকরী সমিতির সদস্যগণসহ কিছু আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ইহা হইতে প্রত্যেকের মতভেদ স্পষ্ট করিয়া বুঝা গেল। অন্ধ গলির মধ্যে আমরা আটকাইয়া গেলাম, কোন সর্বসম্মত পথ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি যাঁহারা প্রত্যাহার করিতে ইচ্ছুক এবং যাঁহারা প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে তাঁহাদের মতামত গান্ধিজীর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। তিনি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে ছিলেন বলিয়া পূর্বের মতই চলিতে লাগিল।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা মাঝে মাঝে কংগ্রেসপন্থীরা আলোচনা করিতেন, যদিও কার্যকরী সমিতির সদস্যরা তৎকালে উহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তখনও অবশ্য এ কথা উঠে নাই,—অস্পষ্ট জল্পনা কল্পনা মাত্র। তখন "রিফর্ম" আসিতেও দুই তিন বৎসর বিলম্ব ছিল এবং ব্যবস্থা পরিষদের নব-নির্বাচনও ঘোষিত হয় নাই। ব্যক্তিগত ভাবে মতবাদের দিক দিয়া নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমার কোন আপত্তি ছিল না এবং আমার মনে নিশ্চিত ধারণা ছিল যে যখন সময় আসিবে, কংগ্রেস উহাতে যোগ দিবে। কিন্তু এখনই সে প্রশ্ন তোলা, কেবল চিত্তবিক্ষেপ সৃষ্টি করা মাত্র। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, সংঘর্ষ চলিতে থাকিলেই উপস্থিত কর্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং আপোষ রফায় উন্মুখ ব্যক্তিদের ঘটনার উপর প্রভাব বিস্তারে বাধা দিবে।

ইতিমধ্যে আমি প্রবন্ধ ও বিবৃতি লিখিয়া সংবাদপত্রে প্রেরণ করিতে লাগিলাম। আমাকে সংযত ভাবে লিখিতে হইত, কেন না আমার উদ্দেশ্য ছিল ঐগুলি প্রকাশ করা; সেন্সর ও বহুতর আইনের বেড়াজালও সর্বত্র বিস্তৃত। এমন কি, আমি যদি নিজে দায়িত্ব লই, তাহা হইলেও মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদক রাজী হইবেন না। মোটের উপর সংবাদপত্রগুলি আমার উপর সদয় ব্যবহারই করিয়াছেন এবং আমার অনুকূলে অনেক সুবিধা দিয়াছেন। তবে সব

সময় নহে। সময় সময় বিবৃতি বা অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হইত; একবার আমার অনেক কষ্ট করিয়া লেখা একটি প্রবন্ধ দিবালোক দেখিবার সুযোগ পাইল না। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে যখন আমি কলিকাতায় তখন অন্যতম প্রধান দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি বলিলেন যে, আমার বিবৃতিটি তিনি কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্রের 'প্রধান সম্পাদকের' নিকট তাঁহার মতামতের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রধান সম্পাদকের মনঃপূত না হওয়ায় উহা প্রকাশিত হয় নাই। এই 'প্রধান সম্পাদক' হইলেন, গভর্ণমেণ্টের কলিকাতার প্রেস অফিসার।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎকালে অথবা বিবৃতিতে আমি অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের তীব্র সমালোচনা করিতাম। ইহাতে অনেকে রুষ্ট হইতেন, ইহার অন্যতম কারণ এই যে গান্ধিজীর জন্য এই ধারণা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে কংগ্রেসকে সকল অবস্থাতেই সমালোচনা বা আক্রমণ করা যাইতে পারে এবং তাহাতে প্রতি-আক্রমণের ভয় নাই; গান্ধিজীই এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অল্পবিস্তর প্রধান কংগ্রেসপন্থীরা তাঁহাকে অনুসরণ করিতেন, কিন্তু সকল সময়েই যে এরূপ হইত তাহা নহে। সাধারণতঃ আমরা অনিশ্চিত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত বচন আওড়াইতাম এবং আমাদের সমালোচকেরা ইহার সুবিধা গ্রহণ করিয়া তাহাদের ভ্রান্ত যুক্তি এবং সুবিধাবাদীর কৌশল দিব্য স্বচ্ছন্দে চালাইত। প্রকৃত সমস্যা উভয় পক্ষই এড়াইয়া চলেন; যুক্তি ও তর্ককৌশলের ঘাতপ্রতিঘাত সমন্বিত আলোচনা কদাচিৎ দেখা যায়। অথচ পাশ্চাত্য দেশে ফাসিস্ত দেশগুলি ব্যতীত সর্বত্রই এরূপ হইয়া থাকে।

আমার একজন বান্ধবী আমাকে লিখিলেন যে, সংবাদপত্রে আমার কতকগুলি বিবৃতিতে জোরালো লেখা দেখিয়া তিনি একটু আশ্চর্য হইয়াছেন—আমি প্রায় 'কুপিত বিড়ালের' মত হইয়া পড়িয়াছি। ইঁহার মতামতের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। ইহা কি সত্যই আমার 'আশাভঙ্গজনিত' ক্ষোভের বিকাশ? আমি অবাক হইয়া ভাবি। আংশিকভাবে ইহা সত্য, কেন না জাতীয়ভাবে আমরা প্রায় সকলেই আশাভঙ্গের দুঃখে দুঃখী। ব্যক্তিগতভাবেও ইহা অনেকাংশে সত্য। তথাপি এই ভাব সম্পর্কে আমি বিশেষ সচেতন নহি; কেন না ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে কোন পরাভব বা ব্যর্থতার ক্ষোভ নাই। যেদিন হইতে আমি রাজনীতি-ক্ষেত্রে গান্ধিজীর সংস্রবে আসিয়াছি, তাঁহার নিকট আমি অন্ততঃ একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছি—ফল কি হইবে এই ভয়ে আমি মনের ভাব গোপন করি না। এই অভ্যাস বলে রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য করিতে গিয়া (অন্য ক্ষেত্রে ইহার অনুসরণ করা অধিকতর কঠিন এবং বিপজ্জনক) আমি প্রায়ই বিপদে পড়িয়াছি; কিন্তু ইহাতে আমি সন্তোষও লাভ করিয়াছি প্রচুর। আমার মনে হয়, এই উপায়েই আমরা চিত্তের তিক্ততা ও শোচনীয় ব্যর্থতার হাত হইতে অব্যাহতি পাই। বহুলোক একজনকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে, এই ধারণায় চিত্তদাহ জুড়াইয়া যায়, পরাভব ও ব্যর্থতার বেদনার উপর ইহা স্নিগ্ধ বিরাম আনে। আমার মনে হয় সর্বজন-বিস্মৃত নিঃসঙ্গ একাকিত্বই সমস্ত চিন্তা অপেক্ষা ভয়াবহ।

কিন্তু যাহাই হউক না কেন, এই আশ্চর্য দুঃখময় জগতে ব্যর্থতার বেদনা হইতে কে অব্যাহতি পায়? কতবার মনে হয় সমস্তই ভুল, তথাপি কাজ করিতে হয়, আমাদের চারিদিকে জনমণ্ডলীর অবস্থা দেখিয়া মন সংশয়ে পূর্ণ হইয়া উঠে। নানা ব্যাপারে ও নানা ঘটনায়, এমন কি, মানুষ ও দলের বিরুদ্ধে আমার চিত্তে রোষ ও ক্রোধের সঞ্চার হয়। ক্রমে আমি বৈঠকখানাবিলাসী অলস জীবনের

উপর অধিকতর রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছি। তাঁহারা মূল সমস্যাগুলির প্রতি উদাসীন, ঐগুলি আলোচনা করাও ভাল মনে করেন না, কেন না তাহাতে আর্থিক ক্ষতি বা চিরপোষিত কোন সংস্কারে আঘাত লাগিতে পারে। এই সকল রোষ, আশাভঙ্গজনিত বেদনা এবং "কুপিত বিড়ালের স্বভাব" সত্ত্বেও, আমার ভরসা এই যে আমি এখনও আমার নিজের ও অপরের নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া হাসিবার ক্ষমতা হারাই নাই।

দয়ালু ঈশ্বরের উপর লোকের বিশ্বাস দেখিয়া আমি সময় সময় অবাক্ হইয়া যাই; আঘাতের পর আঘাত, সর্বনাশেও ইহা অটল থাকে এবং দয়ার বিপরীত প্রমাণগুলি বিশ্বাসের পরীক্ষারূপে বিবেচনা করা হয়। জেরার্ড হপকিন্সের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশ অনেকের হৃদয়েই প্রতিধ্বনি তুলিবে, -

"তুমি নিশ্চয়ই ন্যায়বান, হে প্রভু, কিন্তু আমি যদি তোমার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হই, আমার যুক্তিও ন্যায়সঙ্গত হইবে। পাপীদের পাপের পথে সমৃদ্ধি হয় কেন? আমার সমস্ত চেষ্টাই নৈরাশ্যে পর্যবসিত হয় কেন? হে আমার বন্ধু, তুমি কি আমার শত্রু ছিলে? আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবি, তুমি আমাকে পরাজিত ও ব্যর্থ করা ছাড়া আর কি অধিক মন্দ করিতে পার? হায়, মদ্যপ ও কামুকও অবসরকালে দিব্য উন্নতিলাভ করে কিন্তু প্রভু, আমি সারাক্ষণ তোমার কাজ করিয়াও তাহা পারি না।"

উন্নতিতে বিশ্বাস, কোন কাজ, আদর্শ, মানবের সাধুতা ও মানব নিয়তিতে বিশ্বাস কি দৈবের উপর বিশ্বাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত নহে? যদি আমরা ন্যায় ও যুক্তি দ্বারা উহা প্রমাণ করিতে যাই, তাহা হইলেই বিব্রত হইতে হয়। কিন্তু আমাদের ভিতরে এমন একটা বস্তু আছে; যাহা আশা ও বিশ্বাস আঁকড়িয়া ধরে, উহা হইতে বঞ্চিত হইলে জীবন তরুগুল্মহীন মরুভূমি হইয়া পড়ে।

আমি সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করি বলিয়া কার্যকরী সমিতির আমার সহকর্মীরা পর্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহারা যেভাবে আমার এই প্রচারকার্য সহ্য করিয়া আসিতেছেন; সেই ভাবেই তাঁহাদিগকে বিনা আপত্তিতে ইহা সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু এখন আমি দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীদের অনেকাংশে ভীত করিয়া তুলিয়াছি এবং আমার কার্যপ্রণালীকে এখন আর নির্দোষ বলা চলে না। আমি জানি আমার কোন কোন সহকর্মী সমাজতন্ত্রী নহেন, কিন্তু আমি সর্বদাই ইহা মনে করি যে কংগ্রেসের কার্যকরী সভার সদস্য হিসাবে কংগ্রেসকে দায়ী বা জড়িত না করিয়াও ব্যক্তিগতভাবে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারের আমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কার্যকরী সমিতির কোন কোন সদস্য আমার এই স্বাধীনতা আছে বলিয়া বিবেচনা করেন না, একথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য হইয়াছি। আমি তাঁহাদিগকে অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে ফেলিতেছি বলিয়া তাঁহারা রুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু আমি কি করিব? আমার কাজের মধ্যে যাহাতে আমি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করি, তাহা বর্জন করিতে পারি না। যদি দুইটার মধ্যে বিরোধ বাধে, তাহা হইলে আমাকে কার্যকরী সমিতির পদত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু যখন সমিতি বে-আইনী ও কার্যতঃ ইহার কোন অস্তিত্ব নাই, তখন কাহার নিকট কোথায় পদত্যাগপত্র দিব?

পরে পুনরায় আর এক বিপদ উপস্থিত হইল, আমার মনে হয়, ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে মাদ্রাজ হইতে লিখিত গান্ধিজীর একখানি পত্র পাইলাম। 'মাদ্রাজ মেইল' হইতে তাঁহার একটি সাক্ষাতের বিবরণ তিনি কাটিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সাক্ষাৎকারী তাঁহাকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তিনি

আমার কার্যপদ্ধতির জন্য প্রায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন; আমার সততার উপর তাঁহার বিশ্বাস আছে যে, আমি কংগ্রেসকে এই ন্তন পথে লইয়া যাইব না। আমার সম্পর্কে এই কথায় আমি বিশেষ কিছু মনে করি নাই, কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে তিনি যে ভাবে বড় জমিদারীপ্রথা সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে আমি ব্যথিত হইলাম। তিনি যেন পল্লীর ও জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইহাতে আমি আশ্চর্য হইলাম, কোন বড় জমিদারী বা তাল্কদারীর ইদানীং সমর্থকের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। সমগ্র জগতে এগ্লি ভাঙিয়া গিয়াছে, ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তি মনে করেন এগ্লি আর টিকিতে পারে না। যদি জমিদারেরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পান, তাহা হইলে তাঁহারাও আনন্দের সহিত ইহার বিলোপে সম্মতি দিবেন। ১৯৩৪-এর ২৩শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় জমিদার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে মিঃ পি. এন. ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "আয়র্লণ্ডে যাহা হইয়াছে, সেইভাবে জমিদারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া যদি জমিদারদের ভূসম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত ভাবে আমি মোটেই দুঃখিত হইব না।" বাঙলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, কাজেই যে অঞ্চলে উহা নাই, সেখানের জমিদার অপেক্ষা বাঙলার জমিদারদের অবস্থা অনেক ভাল, একথা মনে রাখিতে হইবে। জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্পর্কে মিঃ পি. এন. ঠাকুরের ধারণা অস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। এই প্রথা নিজের ভারেই ভাঙিয়া পড়িতেছে। তথাপি গান্ধিজী ইহার স্বপক্ষে এবং ন্যাসরক্ষক ও অন্যান্য কথা এই সম্পর্কে ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী কত স্বতন্ত্র এবং আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভবিষ্যতে আমি তাঁহার সহিত কি পরিমাণ সহযোগিতা করিতে পারিব? আমি কি কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে কাজ করিতে থাকিব? তখনই অবশ্য কিছু করিবার ছিল না, ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে আমার কারাদণ্ড হওয়ায়, এ প্রশ্নটাই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া গেল।

পারিবারিক ব্যাপারে আমাকে অনেক সময় দিতে হইল। আমার মাতার স্বাস্থ্য অতি ধীরে উন্নত হইতেছিল। তিনি শয্যাশায়িনী হইলেও বিপদ কাটিয়া গিয়াছিল। আমি আমার আর্থিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, দীর্ঘকালের অবহেলায় উহা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া চলিয়াছি অথচ খরচ কমাইবার কোন পরিষ্কার পথও দেখিতে পাইলাম না। আয়ের অনুপাতে ব্যয় করিবার আমার কোন আগ্রহ ছিল না। যখন আমার আর অর্থ বলিয়া কিছু থাকিবে না, আমি প্রায় সেই অবস্থার জন্যই অপেক্ষা করিতেছি। বর্তমান জগতে অর্থ ও সম্পত্তির উপযোগিতা প্রচুর, কিন্তু যে দীর্ঘপথের যাত্রী অনেক সময়ই তাহার নিকট উহা ভারস্বরূপ বলিয়া মনে হয়। ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, এমন কাজ করা অর্থশালী ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাহারা সর্বদাই তাহাদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি হারাইবার ভয়ে ভীত। এই অর্থ ও সম্পত্তির মূল্য কতটুকু,—যখন গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই যে কোন সময় ইহা দখল লইতে বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন? আমার মনে হইল, যৎসামান্য যাহা আছে, তাহা গেলেই ভাল। আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প এবং আমার নিজের প্রয়োজন মত উপার্জনের ক্ষমতার উপরও বিশ্বাস আছে। আমার প্রধান চিন্তা হইল মাকে লইয়া। এই জীবনসায়াহ্নে তিনি অসুবিধা বোধ করিতে পারেন কিম্বা জীবন-যাত্রাপ্রণালীর ব্যবস্থায় সঙ্কোচ দেখিয়া ব্যথিত হইতে পারেন। আমার কন্যার শিক্ষার বাধা উপস্থিত না হয়, সে চিন্তাও আমার ছিল, কেন না

তাহাকে ইউরোপে শিক্ষাদানের অভিপ্রায় আমার আছে। ইহা ছাড়া কি আমি, কি আমার স্ত্রী, আমাদের অধিক অর্থের আবশ্যক নাই। অথবা অর্থের অভাববোধ করিতে অনভ্যস্ত বলিয়াই আমরা ঐরূপ ভাবিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস যখন এমন সময় আসিবে আমরা অর্থাভাবে পড়িব, তখন নিশ্চয়ই আমরা সুখী হইব না। এক বিষয়ে এখনও আমার ব্যয়বাহুল্য আছে; ইহা বই কেনার অভ্যাস, এই অভ্যাস ছাড়া আমার পক্ষে কঠিন।

আশু অর্থাভাব দূর করিবার জন্য আমরা আমার স্ত্রীর অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করার সঙ্কল্প করিলাম। কতকগুলি রূপার জিনিষ এবং অন্যান্য তৈজসপত্র সহ কয়েক গাড়ী আসবাবও বিক্রয় করা হইল। কমলা প্রায় বার বৎসর এবং গহনাগুলি ব্যবহার করেন নাই, উহা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি উহা ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। তিনি উহা আমাদের কন্যাকে দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

১৯৩৪-এর জানুয়ারী মাস। কোন বে-আইনী কাজ না করা সত্ত্বেও এলাহাবাদ জিলার গ্রামে গ্রামে আমাদের কর্মীরা গ্রেফ্‌তার হইতে লাগিল; এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষেও তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ঐ সকল গ্রামে যাওয়া কর্তব্য হইয়া উঠিল। আমাদের যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কুশলকর্মা সম্পাদক রফি আহম্মদ কিদোয়াই গ্রেফ্‌তার হইলেন। এদিকে ২৬শে জানুয়ারী—স্বাধীনতা দিবস আসিতেছে, উহা উপেক্ষা করা চলে না। অর্ডিন্যান্স, নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি সত্ত্বেও ১৯৩০ হইতে প্রতি বৎসর দেশের বিভিন্ন অংশে এই অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কে পুরোভাগে আসিয়া ইহা করিবে? কি ভাবে ইহা করিবার নির্দেশ দিবে? আমি ছাড়া আর কেহ নিখিল ভারত কংগ্রেসের কোন পদে আছেন, ইহা ধরিয়া লইবার উপায় নাই। আমি কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিলাম, কিছু করা সম্বন্ধে সকলেই একমত হইলেন; কিন্তু সেই কিছু কি, সে সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিল। অনেক লোক একসঙ্গে গ্রেফ্‌তার হয় এরূপ কাজ না করাই ভাল, এই সাধারণ মনোভাব আমি লক্ষ্য করিলাম। অবশেষে স্বাধীনতা দিবস যথাবিহিতভাবে পালন করিবার জন্য আমি একটি সংক্ষিপ্ত আবেদন প্রচার করিলাম। কি ভাবে করিতে হইবে, সে ভার স্থানীয় লোকদের উপর রহিল। এলাহাবাদ জিলার নানাস্থানে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আমরা ঠিক করিলাম।

আমরা বুঝিলাম, স্বাধীনতাদিবসের অনুষ্ঠাতাগণ ঐ দিন গ্রেফ্‌তার হইবেন। জেলে যাইবার পূর্বে আমার একবার বাঙ্গলায় যাইবার ইচ্ছা হইল। পুরাতন সহকর্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যও ছিল; কিন্তু কার্যতঃ গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যাহারা অবর্ণনীয় পীড়ন সহ্য করিয়াছে, বাঙ্গলার সেই জনসাধারণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানিবেদনের জনই আমি উন্মুখ হইলাম। আমি ভাল করিয়াই জানি যে আমি তাহাদের কোন সাহায্যই করিতে পারিব না। সহানুভূতি ও আত্মীয়তা যদিও আকাঙ্ক্ষার, তথাপি উহার মূল্য কতটুকুই বা। প্রয়োজনের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ তাহাকে ভুলিয়া আছে, বিশেষভাবে এই ধারণাও বাঙ্গলায় ছিল। এরূপ ধারণার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ অবশ্য নাই, তথাপি ইহা ছিল।

কমলাকে লইয়া কলিকাতায় গিয়া তাঁহার চিকিৎসা সম্পর্কে ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ করার ইচ্ছাও আমার ছিল। তাঁহার শরীর ভাল ছিল না, কিন্তু আমরা উভয়েই ইহা কতকালে উপেক্ষা করিয়াছিলাম; কলিকাতা বা অন্যত্র থাকিয়া দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিতে হইতে পারে, এই ধারণায় আমরা উহা স্থগিত রাখিয়াছিলাম। জেলের বাহিরে যতদিন আছি, ততদিন যথাসম্ভব উভয়ে একত্র

থাকিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের ছিল। আমি জেলে ফিরিয়া গেলে তিনি ডাক্তার ও চিকিৎসার যথেষ্ট সময় পাইবেন। এখন গ্রেফ্‌তার নিকটবর্তী বলিয়া মনে হওয়ায় আমি কলিকাতায় আমার উপস্থিতিতে ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ করা স্থির করিলাম। অন্যান্য ব্যবস্থা পরে হইতে পারিবে।

আমি ও কমলা ১৫ই জানুয়ারী কলিকাতা যাত্রার দিন স্থির করিলাম। স্বাধীনতাদিবসের সভার পূর্বে ফিরিয়া আসিবার যথেষ্ট সময় হাতে রহিল।

৫৮

ভূমিকম্প

১৯৩৪-এর ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ন। আমি এলাহাবাদের বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া একদল কৃষকের সহিত কথা বলিতেছিলাম। বার্ষিক মাঘমেলা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের বাড়ীতে সারাদিন দর্শকের অভাব ছিল না। সহসা আমার পা টলিতে লাগিল, পড়িতে পড়িতে নিকটস্থ একটা থাম ধরিয়া টাল সামলাইলাম। দরজা জানালা কাঁপিতে লাগিল, নিকটস্থ স্বরাজভবন হইতে গুরুগম্ভীর ধ্বনি আসিতে লাগিল, সেখানে ছাদ হইতে টালি খসিয়া পড়িতেছিল। ভূমিকম্প সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ প্রথমে আমি কিছু বুঝিতেই পারিলাম না, তবে বুঝিতে বেশী বিলম্ব হইল না। এই অভিনব অভিজ্ঞতায় আমার বড় কৌতুক বোধ হইল, আমি কৃষকদের সহিত কথা চালাইতে লাগিলাম এবং তাহা-দিগকে ভূমিকম্পের বিষয় বলিতে লাগিলাম। আমার বৃদ্ধা জেঠিমা দূরে হইতে চীৎকার করিয়া আমাকে দালান ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে বলিলেন। এই আহ্বান আমার নিকট অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হইল। প্রথমতঃ ভূমিকম্পটা আমি গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করি নাই। দ্বিতীয়তঃ আমার রুগ্না মাতা দোতলায় রহিয়াছেন, আমার স্ত্রীও সম্ভবতঃ দোতলায় যাত্রার জন্য জিনিষপত্র গুছাইতেছেন; তাহাদের ফেলিয়া আমি কোনক্রমেই নিজে নিরাপদ স্থানে যাইতে পারি না। মনে হইল বেশ কিছুকাল কম্পন চলিল, তারপর বন্ধ হইয়া গেল। এ বিষয়ে কয়েক মিনিট আলাপের পর আমরা উহা ভুলিয়া গেলাম। আমরা তখন জানিও না, কল্পনাও করিতে পারি নাই যে এই দুই তিন মিনিটের মধ্যে বিহার এবং অন্যান্য অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লোকের কি সর্বনাশ হইয়া গেল!

সেইদিন সন্ধ্যায় আমি ও কমলা কলিকাতা যাত্রা করিলাম। রাত্রির অন্ধকারে আমাদের ট্রেন যে ভূমিকম্পপীড়িত দক্ষিণ অঞ্চল দিয়া চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পরদিন কলিকাতায় ধ্বংসলীলার বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তার পরদিন কিছু কিছু সংবাদ আসিতে লাগিল। তৃতীয় দিবসে আমরা সেই দুর্বিপাকের কথা অস্পষ্টভাবে বুঝিতে আরম্ভ করিলাম।

কলিকাতায় আমাদের কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিলাম। বহু ডাক্তারের সহিত বারম্বার পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, দুই একমাস পরে কমলা চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিবেন। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর বন্ধুবান্ধব ও কংগ্রেসের সহ-কর্মীদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সমস্ত সময় আমি এক ভয়াবহ মানসিক অবসাদ অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, সকলেই যেন বিপদে পড়িবার ভয়ে যে কোন কাজ করিতে ভীত। ইহারা অনেক সহ্য করিয়াছে। ভারতের অন্যান্য

অঞ্চল অপেক্ষা এখানে সংবাদপত্রগুলি অধিক সতর্ক। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে সন্দেহ ও অনিশ্চিত মনোভাব দেখিলাম। ভয় অপেক্ষা এই অনিশ্চিত সন্দেহই কার্যকরী রাজনৈতিক কর্মধারা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ফাসিস্ত মনোভাব অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ—সমাজতান্ত্রিক বা কম্যুনিষ্ট প্রবণতাও আছে—তবে এই সমস্তই মিলিত মিশ্রিত এবং অস্পষ্ট। এই সকল বিভিন্ন দলের সীমারেখা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা কঠিন। টেরোরিষ্ট আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু দেখিবার বা জানিবার সুযোগ ও সময় আমি পাইলাম না। সরকারী তরফ হইতে উহার সম্বন্ধে ঘোষণা এবং বিশেষভাবে উহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইতেছিল। আমি যতদূর জানিতে পারিলাম, উহার রাজনৈতিক গুরুত্ব কিছু ছিল না, ঐ দলের প্রবীণ সদস্যদের টেরোরিজম্-এর উপর কোন বিশ্বাস আর ছিল না। তাহাদের চিন্তাপ্রবাহ স্বতন্ত্র পথে চালিত হইতেছিল। যাহা হউক গভর্ণমেন্টের কাজে বাঙলাদেশে যথেষ্ট ক্রোধ ছিল এবং তাহার ফলে এখানে ওখানে ব্যক্তিবিশেষ সংযম হারাইয়া শত্রুভাব প্রদর্শন করিত। উভয়পক্ষেই এই বৈরভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল সন্দেহ নাই। ব্যক্তিবিশেষ টেরোরিষ্টের মধ্যে ইহা যথেষ্ট প্রত্যক্ষ। রাষ্ট্রের মনোভাবের মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রতিহিংসা সাধন এবং চিরবৈরিতার ভাব অতিমাত্রায় প্রবল; ধীরভাবে সমাজদ্রোহী কাজগুলি আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দমনের চেষ্টার অভাব। যে কোন গভর্ণমেন্ট টেরোরিজম্ সংক্রান্ত কার্যের সম্মুখীন হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে এবং উহা দমন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু গভর্ণমেন্টের পক্ষে প্রশান্ত সংযম রক্ষা করা আবশ্যক। দোষী নির্দোষী নির্বিশেষে সকলের বিরুদ্ধে নির্বিচারে অতিরিক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে নির্দোষীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বেশী বলিয়া তাহার আঘাত তাহাদেরই উপর গিয়া পড়ে। এইরূপ ভীতিপ্রদর্শনের সম্মুখে ধীর ও সংযত থাকা সম্ভবতঃ সহজ নহে। টেরোরিজম্-সংক্রান্ত কার্য বিরল হইলেও তাহার সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান, এই ধারণাই, যাহাদের হাতে উহা দমনের ভার তাহাদিগকে ধৈর্যহীন করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এই সকল কাজ ব্যাধি নহে, ব্যাধির লক্ষণ—ইহা স্পষ্ট। ব্যাধির চিকিৎসা না করিয়া লক্ষণের চিকিৎসা করা নিষ্ফল।

যে সকল যুবক যুবতীর টেরোরিষ্টদের সহিত সংস্রব আছে বলিয়া বিবেচনা করা হয়, কার্যতঃ তাহারা গোপন কাজের মোহে আকৃষ্ট হয়, আমার ইহাই বিশ্বাস। গোপনতা ও বিপদ দুঃসাহসী যৌবনকে চিরদিনই আকর্ষণ করে; কিসের জন্য এত কোলাহল, যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া কাহারা কার্য করিতেছে জানিতে কৌতূহল হয়। ইহা ডিটেক্টিভ্ উপন্যাসের আকর্ষণ। আসলে এই সকল লোকের কোন কাজ করিবার মতলব থাকে না; টেরোরিষ্ট কার্য তো নহেই, কেবলমাত্র সন্দেহভাজনদের সংস্পর্শে গিয়া তাহারা নিজেদের পুলিশের সন্দেহভাজন করিয়া তোলে। যদি তাহাদের অধিক দুর্ভাগ্য না হয়, তাহা হইলে সহজে ও অবিলম্বে তাহারা গিয়া অন্তরীণদের দলভুক্ত হয় অথবা কারাশালায় উপনীত হয়।

আমরা শুনিয়াছি, আইন ও শৃঙ্খলা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গৌরবময় কীর্তি। আমার মনের স্বাভাবিক গতি উহার পক্ষে। আমি জীবনে শৃঙ্খলা ভালবাসি; অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও অযোগ্যতা আমার নিকট অপ্রীতিকর। কিন্তু রাষ্ট্র ও গভর্ণমেন্ট জনসাধারণের উপর যে আইন ও শৃঙ্খলা চাপাইয়া দেন, তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে তাহার মূল্য সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জাগিয়াছে। অনেক সময় লোকে ইহার জন্য অত্যধিক মূল্য দিয়া থাকে। আইন আসলে ক্ষমতাশালী

অংশের ইচ্ছামাত্র এবং শৃঙ্খলা সর্বব্যাপী ভীতির র়ূপান্তর। সময় সময় আইন ও শৃঙ্খলার অভাবকেই আইন ও শৃঙ্খলা বলা হয়। এক সর্বব্যাপী ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন সাফল্য কাহারও নিকট প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না। রাষ্ট্রের দমননীতিমূলক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত "শৃঙ্খলা", যাহা উহা ব্যতীত টিকিতে পারে না, তাহার সহিত অ-সামরিক শাসন অপেক্ষা সামরিক জবর-দখলের সাদৃশ্যই বেশী। সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত কবি কহ্লনের কাশ্মীরী ঐতিহাসিক মহাকাব্য 'রাজতরঙ্গিণী'তে আমি দেখিয়াছি, আইন ও শৃঙ্খলার সমানার্থবোধক, রাষ্ট্র ও শাসকগণের যাহা রক্ষা করা কর্তব্য, তৎসম্পর্কে পুনঃ পুনঃ ধর্ম ও অভয় এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। আইন বলিতে কেবলমাত্র নিছক আইন ছাড়া আরও কিছু বুঝায় এবং শৃঙ্খলা বলিতে জনসাধারণের ভয়হীনতা বুঝায়। ভীত জনসাধারণের উপর বলপূর্বক শৃঙ্খলা স্থাপন করা অপেক্ষা এই অভয় জাগ্রত করা কত বেশী আকাঙ্ক্ষার।

আমরা তিনদিন ও একবেলা কলিকাতায় ছিলাম, এই সময়ে আমি তিনটি জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছি। আমি পূর্বে কলিকাতায় যে ভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, এবারও সেইভাবে হিংসামূলক উপায়ের নিন্দা ও তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিলাম, তারপরে বাঙ্গলায় অবলম্বিত সরকারী উপায়গুলি আলোচনা করিলাম। এই প্রদেশের ঘটনাবলীর বিবরণ শুনিয়া আমি অতিমাত্রায় অভিভূত হইয়াছিলাম, ফলে আমার বক্তৃতা অত্যন্ত আন্তরিক হইয়াছিল। কোন অঞ্চলের সমগ্র জনতার উপর নির্বিচারে নির্যাতন চালাইয়া যে ভাবে মনুষ্যত্বের মর্যাদাকে অপমানাহত করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ শুনিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। রাজনৈতিক সমস্যা গুরুতর হইলেও তাহার স্থান মনুষ্যত্বের সমস্যার পরে। এই তিনটি বক্তৃতাই পরে কলিকাতায় আমার বিচারকালে তিনটি স্বতন্ত্র অভিযোগরূপে উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং আমার বর্তমান কারাদণ্ড তাহারই ফল।

কলিকাতা হইতে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য শান্তি-নিকেতনে আসিলাম। তাঁহাকে দেখিলে সর্বদাই আনন্দ হয়, এত নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে না দেখিয়া যাইতে মন সরিল না। আমি পূর্বে আরও দুইবার শান্তি-নিকেতনে আসিয়াছি, কমলার পক্ষে এই প্রথম; তিনি বিশেষভাবে স্থানটি দেখিতে আসিলেন, কেন না আমাদের কন্যাকে এখানে রাখার সংকল্প করিয়াছিলাম। ইন্দিরা শীঘ্রই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে, কাজেই তাহার ভবিষ্যৎ শিক্ষা লইয়া আমরা চিন্তিত ছিলাম। তাহার সরকারী বা অর্ধ-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যোগ দেওয়ার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম, কেন না ঐগুলি আমি আদৌ পছন্দ করি না। ইহার চারিদিক ব্যাপিয়া প্রভুত্বপ্রবণ পীড়াদায়ক সরকারী আবহাওয়ার পরিমণ্ডল। অবশ্য অতীতেও ইহা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ নরনারীর উদ্ভব হইয়াছে এবং আরও হইবে। অল্পসংখ্যক ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, যৌবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি নির্জীব ও দমন করিবার অভিযোগ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অব্যাহতি পাইতে পারে না। শান্তিনিকেতনে এই মৃত্যুকঠোর হস্তের অভাব বলিয়াই আমরা ইহা নির্বাচন করিয়াছিলাম। যদিও অনেক দিক দিয়া অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মত আধুনিক ব্যবস্থা বা সাজ-সরঞ্জাম ইহার নাই।

ফিরিবার পথে পাটনায় নামিয়া রাজেন্দ্রবাবুর সহিত ভূমিকম্পের সেবাকার্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। তিনি সদ্য কারামুক্ত হইয়াই বে-সরকারী সেবাকার্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের আগমন অপ্রত্যাশিত, কেন না আমাদের এক-খানা তারও দিতে হয় নাই। কমলার ভ্রাতার সহিত যে বাড়ীতে আমাদের থাকার

কথা ছিল, তাহা ভাঙিগয়া গিয়াছে; ইহা একটি বৃহৎ দোতলা ইঁটের বাড়ী ছিল। অতএব অন্যান্য সকলের মত আমরা মুক্ত-প্রান্তরে বাস করিতে লাগিলাম।

পরদিন আমি মজঃফরপুর দেখিতে গেলাম। ভূমিকম্পের পর ঠিক সাতদিন অতিবাহিত হইয়াছে, অথচ কয়েকটি প্রধান রাস্তা ছাড়া, ধ্বংসস্তূপ সরাইবার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। এই সকল রাস্তা হইতে মৃতদেহ বাহির হইতেছে, দেহ-গুলির অবয়বে বিশেষ ভঙ্গী, যেন পতিত দেওয়াল বা ছাদ ঠেকাইবার চেষ্টা। ধ্বংসস্তূপের দিকে চাহিলে আতঙ্কে অভিভূত হইতে হয়, যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারাও অভিভূত, মানসিক তীব্র আঘাতে ম্রিয়মাণ।

এলাহাবাদে ফিরিয়াই, টাকাকড়ি ও জিনষপত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল, কংগ্রেসের ও কংগ্রেসের বাহিরের লোক সকলে একযোগে একাগ্রভাবে কার্য আরম্ভ করিলাম। আমার কোন কোন সহকর্মী ভূমিকম্পের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখিবার পরামর্শ দিলেন। আমি এবং আমার অন্যান্য সহকর্মী, ভূমিকম্প হইলেও কার্যপ্রণালী স্থগিত রাখার অনুকূলে কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। অতএব ২৬শে জানুয়ারী এলাহাবাদ জিলার গ্রামগুলিতে বহু সভা হইল, সহরেও সভা হইল এবং আমরা প্রত্যাশাতীত সাফল্য লাভ করিলাম। অনেকে পুলিশ কর্তৃক বাধাদান ও গ্রেফতারের সম্ভাবনা অনুমান করিয়াছিলেন, কোথাও কোথাও সামান্য বাধা দেওয়াও হইয়াছিল। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, আমাদের সভা নির্বিবাদে সুসম্পন্ন হইল। কোন কোন গ্রামে ও সহরে কিছু লোক গ্রেফ্তার করা হইয়াছিল।

বিহার হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই ভূমিকম্পের বিবরণ দিয়া উপসংহারে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া আমি এক বিবৃতি প্রচার করিলাম। এই বিবৃতিতে আমি ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরের কয়েক দিন বিহার গভর্ণমেণ্টের চুপচাপ বসিয়া থাকার সমালোচনা করিয়াছিলাম। পীড়িত অঞ্চলের কর্মচারীদিগকে সমালোচনা করিবার আমার কোন অভিপ্রায় ছিল না, কেন না, তাঁহারা যে সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন অতি বড় সাহসী ব্যক্তির নিকটও তাহা মহাপরীক্ষা, আমার কয়েকটি কথার ঐরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে ইহাতে আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। কিন্তু আমি গভীরভাবে অনুভব করিয়াছি যে, বিহার গভর্ণমেণ্টের কেন্দ্রস্থলে, প্রারম্ভে কোন তৎপরতাই দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ ধ্বংসস্তূপ সরাইতে পারিলে অনেকের জীবন রক্ষা হইত।

একমাত্র মুঙ্গের সহরেই সহস্র ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল, তিন সপ্তাহ পরেও আমি দেখিয়াছি, অনেক ধ্বংসস্তূপে তখনও হাত দেওয়া হয় নাই; অথচ পাঁচ মাইল দূরে জামালপুরে সহস্র সহস্র রেলওয়ে শ্রমিকের উপনিবেশ রহিয়াছে, ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহাদিগকে আনিয়া এই কাজে লাগান সম্ভবপর ছিল। এমন কি ভূমিকম্পের বার দিন পরেও জীবন্ত মানুষ বাহির করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ধন সম্পত্তি রক্ষার জন্য অবিলম্বেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাড়ীর তলায় চাপা-পড়া জীবন্ত মানুষকে উদ্ধার করিতে সেরূপ তৎপরতা দেখাইতে পারেন নাই। এই অঞ্চলের মিউনিসিপালিটিগুলির কাজ কর্ম একেবারেই অচল হইয়া গিয়াছিল।

আমার সমালোচনা আমি সঙ্গত বলিয়াই মনে করি এবং পরে দেখিয়াছি, ভূকম্পপীড়িত অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই উহার সহিত একমত। কিন্তু সঙ্গতই হউক আর অসঙ্গতই হউক, উহার উদ্দেশ্য সাধু ছিল, গভর্ণমেণ্টকে অপমান দেওয়ার উদ্দেশ্যে নহে, তাঁহাদিগকে কর্মতৎপর করিয়া তোলাই আমার অভিপ্রায়

ছিল। এ সম্পর্কে কোন কাজ করা না করা লইয়া তাঁহারা কোন ইচ্ছাকৃত পাপ করিয়াছেন এমন অপবাদ কেহই দেয় নাই। ইহা এক অভিনব অভূতপূর্ব অবস্থা, এ ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি মার্জনীয়। আমি যতদূর জানি (কেন না তখন আমি জেলে) তাহাতে বিহার গভর্ণমেণ্ট পরে, ধ্বংসের উপর পুনর্নির্মাণে উৎসাহ ও যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমার সমালোচনায় ক্রোধের সঞ্চার হইল, অল্পদিন পরেই, ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিহারের কতিপয় ভদ্রলোক গভর্ণমেণ্টের অনুকূলে একখানি প্রশংসা-পত্র প্রচার করিলেন। ভূমিকম্প এবং তাহার সেবাকার্য যেন গৌণ ব্যাপার। গভর্ণমেণ্টকে সমালোচনা করা হইয়াছে, ইহাই যেন মুখ্য ব্যাপার এবং রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ নিশ্চয়ই তাঁহাদের সমর্থন করিবেন। গভর্ণমেণ্টের সমালোচনায় অপ্রীতি প্রকাশ, ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়; অথচ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। ইহা সমালোচনা-অসহিষ্ণু সামরিক মনোবৃত্তি। রাজার মতই ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কোন অন্যায় করিতে পারেন না। উহার উল্লেখ করাও রাজদ্রোহ।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গভর্ণমেণ্ট কঠোর অথবা অত্যাচারী এ অভিযোগ অপেক্ষা অযোগ্যতা ও অক্ষমতার অভিযোগ আনিলে ক্রোধে রসঞ্চার হয় বেশী। প্রথমোক্ত অভিযোগ করিলে যে কেহ কারাগারে যাইতে পারে; তবে গভর্ণমেণ্ট উহা শুনিতে অভ্যস্ত, কার্যতঃ উহা গ্রাহ্য করেন না। যাহাই হউক, সাম্রাজ্যের অধীশ্বর যে জাতি তাহার নিকট উহা স্তুতিবাদেরই রূপান্তর; কিন্তু অযোগ্য বলিলে, মানসিক বলের অভাব আছে বলিলে, তাঁহারা আহত হন, ইহাতে তাঁহাদের আত্মমর্যাদার মূলদেশে আঘাত লাগে; নিজেদের বিধাতাপ্রেরিত পুরুষ মনে করিয়া ভারতে ইংরাজ কর্মচারীরা যে মোহে মশগুল থাকেন, ইহাতে সেই মোহ ব্যাহত হয়। তাঁহারা সেই অ্যাংলিকান বিশপের মত, যিনি খৃষ্টানের পক্ষে অনুচিত ব্যবহারের অভিযোগ বিনয়ের সহিত মানিয়া লইতে রাজী, কিন্তু কেহ তাঁহাকে নির্বোধ ও অযোগ্য বলিলে রুষ্ট হইয়া অনুরূপ প্রত্যুত্তর দেন।

ইংরাজদের মনে এক সাধারণ বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসকে তাঁহারা প্রায়ই অপরিবর্তনীয় সত্যরূপে জাহির করিয়া থাকেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্টে ইংরাজ কর্মচারীর সংখ্যা কমিলে কিম্বা তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস হইলে, গভর্ণমেণ্ট অতিশয় মন্দ ও অযোগ্য হইয়া পড়িবে। এই বিশ্বাস বজায় রাখিয়া পরিবর্তন-পন্থী ও অন্যান্য অগ্রগামী ইংরাজেরা উৎসাহপূর্ণ উদারতার সহিত বলিয়া থাকেন যে, ভাল গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা স্বায়ত্তশাসন অনেক শ্রেষ্ঠ এবং যদি ইচ্ছা করিয়া ভারতবাসীরা অধঃপাতে যাইতে চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া উচিত নহে। ব্রিটিশ প্রভাব অন্তর্হিত হইলে ভারতের ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা আমি জানি না। কি ভাবে ব্রিটিশগণ সরিয়া যাইবেন, তাঁহারা যাইবার পর ক্ষমতা কাহাদের হাতে আসিবে এবং আরও অন্যান্য অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার উপর তাহা নির্ভর করে। আমাদের মনে হয় ব্রিটেনের সহায়তায় এমন সব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাইতে পারে, যাহা অধিকতর অকর্মণ্য এবং বর্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষা সর্বত্রই মন্দ হইবে, কেন না ইহাতে বর্তমান ব্যবস্থার দোষগুলি থাকিবে, অথচ উহার ভালগুলি থাকিবে না। পক্ষান্তরে আমি ইহাও ভাবিতে পারি যে, ভারতবাসীর দিক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও প্রবর্তন করা যাইতে পারে যাহা বর্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষাও অধিকতর কর্মকুশল এবং কল্যাণকর হইবে। সম্ভবতঃ বহুলনীতিমূলক ব্যবস্থাগুলি খুব বেশী কর্ম-

কুশল না হইতে পারে, শাসনব্যবস্থায় এত জাঁকজমক নাও থাকিতে পারে, কিন্তু শস্য ও পণ্য উৎপাদন, লোকের তাহাতে ভোগ করিবার সুবিধা বাড়িবে; জনসাধারণের দৈহিক, নৈতিক ও সংস্কৃতির আদর্শ উন্নত হইবে। আমার বিশ্বাস স্বায়ত্ত-শাসন সব দেশের পক্ষেই ভাল। কিন্তু প্রকৃত ভাল গভর্ণমেণ্টের বিনিময়ে আমি স্বায়ত্ত-শাসনও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। স্বায়ত্ত-শাসন যদি তাহার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চাহে, তাহা হইলে পরিণামে তাহাকে জনসাধারণের জন্য উৎকৃষ্টতর গভর্ণমেণ্টে পরিণত হইতে হইবে। কেন না আমি বিশ্বাস করি অতীতে ভারতে ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টের যে দাবীই থাকুক না কেন বর্তমানে ইহা ভারতের উত্তম গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণের জীবন-যাত্রার উন্নতি সাধনে অক্ষম এবং বর্তমান আকারে ভারতে ইহার উপযোগিতা শেষ হইয়াছে, ইহাই আমার ধারণা। ভারতের স্বাধীনতার প্রকৃত যৌক্তিকতা এই যে, ইহা উৎকৃষ্টতর গভর্ণমেণ্ট চাহে, জনসাধারণের জীবন-যাত্রা উন্নত করিতে চাহে, শিল্পবাণিজ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির পরিপুষ্টি চাহে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যনীতির শাসনপ্রণালী হইতে অনিবার্যরূপে সৃষ্ট দমন ও ভয়ের আবহাওয়া হইতে মুক্তি চাহে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও সিভিলিয়ানগণের ভারতের উপর তাঁহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা চাপাইয়া দিবার ক্ষমতা প্রচুরই আছে কিন্তু বর্তমান ভারতের সমস্যাগুলি সমাধানে ইহাদের ক্ষমতাও নাই, যোগ্যতাও নাই, ভবিষ্যতের আশা আরও কম, কেন না তাঁহাদের ভিত্তি ও পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা সমস্তই ভুল, বাস্তবের সহিত তাঁহাদের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছে। কোন গভর্ণমেণ্ট বা শাসক সম্প্রদায়ের যোগ্যতা যেখানে অতি কম ও এক অতীত ব্যবস্থার যাঁহারা সমর্থক সেখানে দীর্ঘকাল নিজেদের ইচ্ছাও তাঁহারা চালাইতে পারেন না।

এলাহাবাদের ভূকম্প-সাহায্য সমিতি আমাকে পীড়িত অঞ্চলে কি ভাবে সেবাকার্য হইতেছে, তাহার বিবরণ পাঠাইতে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ রওনা হইলাম এবং একাকী দশ দিন সেই বিধ্বস্ত ধ্বংসের শ্মশানে ভ্রমণ করিলাম। এই ভ্রমণ অত্যন্ত ক্লেশকর, আমি প্রায়ই ঘুমাইতে পারি নাই। প্রভাত পাঁচটা হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আমরা বিদীর্ণ ও বহুভাবে বক্র রাস্তার উপর দিয়া মোটরযোগে চলিতাম, সাঁকো ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নৌকায় নদী পার হইতে হইত; কোথাও বা জমি অবনত হওয়ায় রাস্তা জলে ডুবিয়া থাকিত। সহরগুলিতে ধ্বংসস্তূপের ভয়াবহ দৃশ্য, রাস্তাগুলি যেন কোন দৈত্য ছিঁড়িয়া মোচড়াইয়া দিয়াছে; কোথাও বা রাস্তাগুলি বাড়ীর ভিত্তি ছাড়াইয়া উঠিয়া গিয়াছে। এই সকল রাস্তার উপর বড় বড় ফাটল দিয়া তীব্রবেগে উৎসারিত জল ও বালুকায় মানুষ পশু একসঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে। এই সকল সহর ছাড়াও উত্তর বিহারের সমতল অঞ্চল—যাহা বিহারের উদ্যান বলিয়া কথিত হয়—তাহার সর্বাঙ্গে ধ্বংস ও শ্মশানের ভয়ঙ্কর রূপ। ক্রোশের পর ক্রোশ বালুকায় আচ্ছন্ন, কোথাও বা বিস্তীর্ণ জলরাশি, বিদীর্ণ ভূপৃষ্ঠে গভীর গহ্বর, অজস্র ফাটল হইতে জল ও বালুকা উত্থিত হইতেছে। কয়েকজন ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারী, যাঁহারা এই অঞ্চলের উপর দিয়া এরোপ্লেনে ধ্বংসলীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, মহাযুদ্ধের সময় এবং তাহার অব্যবহিত পরের উত্তর ফ্রান্সের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

ইহা এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। পাশাপাশি দুইদিক হইতে প্রবল আন্দোলনে ভূকম্পের সূচনাতেই প্রত্যেকে ধরাশায়ী হইল। তাহার পর উপরে ও নীচে, উত্থান পতনের ধ্বংসলীলা চলিল—অজস্র কামান যেন গর্জিয়া উঠিল; যেন শত শত বিমানপোত হইতে বোমাবর্ষণ হইতেছে; দেখিতে দেখিতে বিদীর্ণ জমীন ও

গহবর দিয়া প্রবল বেগে জল উঠিয়া ১০।১২ ফিট ঊর্ধ্বে ছিটাইয়া পড়িতে লাগিল। সম্ভবতঃ তিন মিনিট কি আর কিছুকাল থাকার পর ইহা শান্ত হয়, কিন্তু এই তিন মিনিটের কি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা! অনেকে ভাবিতেছিল পৃথিবীতে বুঝি প্রলয়ান্তকাল উপস্থিত, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। সহরে বাড়ী পড়ার শব্দ, জলোচ্ছ্বাস এবং ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডলে কয়েক গজ দূরের জিনিষও দেখা যায় নাই। পল্লী অঞ্চলে ধূলি ছিল না, কিছুদূর দেখা যাইত—কিন্তু মাথা ঠিক করিয়া দেখিবে কে? যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা ভূমিতে গড়াইতেছিল অথবা ভয়ে অর্ধ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

ভূমিকম্পের দশদিন পরে বার বৎসরের একটি ক্ষুদ্র বালককে (আমার মনে হয় মজঃফরপুরে) খুঁড়িয়া বাহির করা হইল। সে বিহ্বল ও বিমূঢ়, যখন সে পড়িয়া গেল এবং ভাঙ্গাবাড়ীর মধ্যে বন্দী হইল, তখন তাহার মনে হইয়াছিল যে জগত শেষ হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র সে-ই বাঁচিয়া আছে।

এই মজঃফরপুরেই যখন ভূমিকম্পে চারিদিকে বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, শত শত নরনারী সহসা মৃত্যু-কবলিত হইতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বালিকা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অনভিজ্ঞ যুবক-দম্পতি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক আমি শুনিলাম, প্রসূতি ও শিশু ভালই আছে। ভূমিকম্পের স্মৃতি স্মরণ করিয়া বালিকার নাম রাখা হইয়াছে, কম্প দেবী।

আমাদের ভ্রমণ শেষ হইল মুঙ্গের সহরে আসিয়া। নেপালের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া ধ্বংসের বহু ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিধ্বস্ত জনপদ ও ধ্বংসস্তূপ দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেও সমৃদ্ধি-শালী মুঙ্গের নগরীর শোচনীয় পরিণতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সে ভয়াবহ দৃশ্য জীবনে ভুলিব না।

কি সহরে কি পল্লীতে সর্বত্র অধিবাসীদের মধ্যে নিজের চেষ্টায় আত্মরক্ষার অভাব দেখিয়া ব্যথিত হইলাম, সম্ভবতঃ সহরের মধ্যশ্রেণীই এ বিষয়ে সর্বাধিক অপরাধী। তাহারা অপরের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছে, হয় গভর্ণমেণ্ট, নয় বে-সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্য করিবেই। অবশ্য ভূমিকম্পের ভীতিবিহ্বলতা-জনিত মানসিক বিভ্রম ইহার জন্য কতকটা দায়ী, কালে হয়ত ইহা কমিয়া গিয়াছে!

ইহার মধ্যে বিহারের অন্যান্য জিলা এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত সেবাব্রতীদের শক্তি ও যোগ্যতা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। এই সকল তরুণ নর-নারীরা বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সত্ত্বেও পরস্পরের সহযোগিতায় যেরূপ কুশলতার সহিত সেবা করিতেছিলেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ধ্বংসস্তূপ খনন ও অপসারণ আন্দোলনে স্থানীয় জনসাধারণকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য মুঙ্গেরে আমি এক নাটকীয় ভঙ্গীতে অভিনয় করিলাম। আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া কাজ আরম্ভ করিলাম, কিন্তু ফল ভাল হইল। সমস্ত সেবাপ্রতিষ্ঠানের নায়কদের সহিত আমি কোদাল ঝুড়ি হস্তে সারাদিন খনন কার্য চালাইলাম; আমরা একটি বালিকার মৃতদেহ বাহির করিলাম। সেই দিনই আমি মুঙ্গের পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু খনন কার্য চলিতে লাগিল, বহু লোক আসিয়া উহাতে যোগ দিল, বেশ সুন্দর কাজ হইতে লাগিল।

সমস্ত বে-সরকারী সেবাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিচালিত সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটির গুরুত্বই অধিক ছিল। ইহা কেবলমাত্র কংগ্রেসপন্থীদের লইয়া গঠিত হয় নাই, ক্রমে ইহা এক নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত

হইয়াছিল। বিভিন্ন দল ও দাতারা ইহার প্রতিনিধি ও সদস্য হইয়াছিলেন। পল্লী অঞ্চলের কংগ্রেস কমিটিগুলির সহায়তা পাওয়ায় ইহার অবশ্য অনেক সুবিধা হইয়াছিল। এক গুজরাট এবং যুক্ত-প্রদেশের কয়েকটি জিলা ছাড়া বিহারের মত আর কোথাও কংগ্রেসকর্মীদের সহিত কৃষকদের যোগ নাই। বিহার কৃষক-প্রধান প্রদেশ, এখানের কংগ্রেসকর্মীদের অধিকাংশই কৃষকশ্রেণীর। এমন কি মধ্যশ্রেণীও কৃষকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কিছুদিন পূর্বে আমি কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আফিস সংক্রান্ত কাজ কর্মের শৈথিল্য ও অনিয়ম দেখিয়া আমি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়াছিলাম। দাঁড়াইবার পরিবর্তে বসা, বসার পরিবর্তে শুইয়া পড়ার ভাবই যেন প্রবল। আফিসে সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নাই, সাধারণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই যেন তাহারা কাজ চালাইতে সচেষ্ট। কার্যালয় সম্পর্কে আমার আলোচনা সত্ত্বেও আমি ভাল করিয়াই জানিতাম, এই প্রদেশ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত একাগ্রচিত্তে কংগ্রেসের কাজ করিয়া থাকে। এখানে কংগ্রেসের কোন আড়ম্বর নাই বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে কৃষকশ্রেণীর সম্বন্ধ সমর্থন রহিয়াছে। এমন কি, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতেও বিহারের সদস্যরা কখন কোন ব্যাপারে উগ্রভাব প্রদর্শন করেন না, এখানে তাঁহাদের দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন আশ্চর্য হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে বিহারের কীর্তি উজ্জ্বল। এমন কি, পরবর্তী ব্যক্তিগত প্রতিরোধ নীতিতেও বিহার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে।

রিলিফ কমিটি এই উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কৃষকদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, এমন কি, গভর্ণমেণ্টও এতখানি সাহায্য করিতে পারিতেন না। কি কংগ্রেস, কি রিলিফ কমিটি উভয় প্রতিষ্ঠানের নায়কই বিহারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ। বিহারের আদর্শ-সন্তানের মতই রাজেন্দ্রবাবুর আকৃতি কৃষকের মত; প্রথম দর্শনে তাঁহার মধ্যে আকর্ষণের কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহার সরল চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টি ভোলা কঠিন; উহার মধ্যে যে সত্যের দীপ্তি, তাহা কেহই সন্দেহ করে না। কৃষকদের মতই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী সীমাবদ্ধ, আধুনিক জগতের মতে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার অনুন্নত, কিন্তু তাঁহার অসামান্য দক্ষতা, তাঁহার সর্বাঙ্গসুন্দর সারল্য, তাঁহার কর্মশক্তি এবং ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে তাঁহার নিষ্ঠার জন্য তিনি কেবল বিহারে নহেন, সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। রাজেন্দ্রবাবু বিহারে যেরূপ সর্ববাদিসম্মত নেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন, ভারতের আর কোন প্রদেশে কেহই সেরূপ নেতৃত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। গান্ধিজীর বাণীর সম্পূর্ণ মর্মগ্রহণ করিতে সক্ষম, তিনি ছাড়া এরূপ ব্যক্তি থাকিলে অল্পই আছেন।

বিহার সেবাকার্যে যে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির নেতৃত্ব লাভ করা গিয়াছে ইহা সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁহার নামের জন্যই ভারতের সকল দিক হইতে অজস্র অর্থ আসিতে লাগিল। দুর্বল দেহ লইয়াও তিনি সেবাকার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। কেন না তিনি সমস্ত কর্মের কেন্দ্র-স্বরূপ ছিলেন এবং সকলে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিত।

পীড়িত অঞ্চলে ভ্রমণকালীন অথবা যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে আমি সংবাদপত্রে গান্ধিজীর বিবৃতি পাঠ করিয়া মর্মাহত হইলাম; তিনি বলিয়াছেন অস্পৃশ্যতার পাপের শাস্তি এই ভূমিকম্প। এরূপ মন্তব্য শুনিলে বিহ্বল হইতে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার যে উত্তর দিলেন তাহা আমার মনঃপূত হইল এবং আমি

আনন্দিত হইলাম। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ইহাপেক্ষা অধিক বিরোধী কথা, কল্পনা করাও কঠিন। জড় প্রকৃতির উপর ভৌতিক ঘটনাগুলি মনোরাজ্যে যে ভাবাবেগ উদ্বোধিত করে, তাহার সম্বন্ধে বিজ্ঞানও সম্ভবতঃ বর্তমানে এতখানি যুক্তিহীন মতবাদ সমর্থন করিবে না। মানসিক আঘাতে কোন ব্যক্তির অজীর্ণ রোগ বা আরও কিছু কঠিন ব্যাধি হইতে পারে। কিন্তু মানুষের কোন আচার ব্যবহার বা ত্রুটির ফলে ভূপৃষ্ঠের স্তরগুলি সঞ্চালিত হয় এমন কথা শুনিলে বিমূঢ় হইতে হয়। পাপবোধ, ঐশ্বরিক ক্রোধ এবং সৌরজগতের ব্যাপারে মানুষের আপেক্ষিক সম্পর্ক প্রভৃতি আমাদিগকে কয়েক শতাব্দী পিছাইয়া লইয়া যায়;—যখন ইউরোপে ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের বিচার করিবার জন্য খৃষ্টান যাজকদের বিচারালয়ের প্রাবল্য ছিল, যখন ধর্মবিরোধী বৈজ্ঞানিক কথা বলার দরুণ জিওরদানো ব্রুনোকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল এবং আরও অনেককে 'ডাইনী' প্রভৃতি বলিয়া পোড়াইয়া মারা হইত! এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার বোষ্টনের প্রধান ধর্মযাজকগণ বলিয়াছিলেন, গৃহের উপর বজ্রপাত-নিবারক লৌহ-দণ্ড স্থাপনের ফলেই মাসাচুসেট্স্-এ ভূমিকম্প হইয়াছে।

এই ভূমিকম্প যদি আমাদের পাপের ঐশ্বরিক শাস্তি হয়, তাহা হইলে কি বিশেষ পাপের ফলে আমরা এই শাস্তি পাইলাম, কেমন করিয়া নির্ণয় করিব? হায়! আমাদের বহুতর প্রায়শ্চিত্ত বাকী রহিয়াছে? প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার পছন্দমত ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে। আমরা বৈদেশিক শাসনের বশ্যতা স্বীকারের পাপের দণ্ড পাইলাম, অন্যায় সমাজ ব্যবস্থা সহ্য করিতেছি বলিয়া দণ্ড পাইলাম। বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক দ্বারভাঙ্গার মহারাজাই ভূমিকম্পে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আমরা তাহা হইলে বলিতে পারি, জমিদারী প্রথার জন্যই এই শাস্তি। দক্ষিণভারতের লোকের অস্পৃশ্যতাবোধের শাস্তি আসিয়া পড়িল অল্প বিস্তর নির্দোষ বিহারের লোকের উপর, একথা বলা অপেক্ষা পূর্বের কথাগুলি লক্ষ্যের অধিকতর নিকটবর্তী। যে দেশে ছুৎমার্গের প্রাবল্য সর্বাধিক, সেখানে ভূমিকম্প হইল না কেন? অথবা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও বলিতে পারেন, এই দৈবদুর্বিপাক, আইন অমান্য আন্দোলন করার জন্য ঐশ্বরিক শাস্তি। কার্যতঃ ভূকম্পে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর বিহারই স্বাধীনতা আন্দোলনে অধিকতর অগ্রগামী ছিল।

এই ভাবে গবেষণা করিতে থাকিলে তাহা শেষ হইবে না। তারপর অবশ্যই এ প্রশ্ন উঠিবে যাহা ঈশ্বরের কার্য, সেখানে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আমরা, মানবীয় চেষ্টায় তাহাতে হস্তক্ষেপ করিব কেন? আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবি, ঈশ্বর আমাদের সহিত এই নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করিলেন কেন? আমাদিগকে বহুতর অপূর্ণতা সহ সৃষ্টি করিয়া, আমাদের চারিদিকে বহু প্রলোভনের জাল পাতিয়া, পতনের গহ্বর রচনা করিয়া, এই দুঃখময় নিষ্ঠুর জগৎ সৃষ্টি করা হইয়াছে; বাঘ ও মেষ একসঙ্গে সৃষ্টি করিয়া তারপর আমাদের শাস্তির ব্যবস্থা।

পাটনায় আমার যাত্রার পূর্বদিন রাত্রিতে, সেবাকার্যে সমবেত বিভিন্ন প্রদেশের বন্ধু ও সহকর্মীদের সহিত বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। রজনী গভীর হইল। যুক্ত-প্রদেশের কর্মীসংখ্যা যথেষ্ট ছিল, আমাদের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী যোগ দিয়াছিলেন। যে বিষয় লইয়া অনেকের মনে আলোড়ন চলিতেছিল, তাহাই ছিল আমাদের আলোচ্য বিষয়; এই ভূমিকম্পের সেবাকার্যে আমরা কতখানি জড়াইয়া পড়িব? ইহার অর্থ অন্ততঃ কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক কার্য পরিত্যাগ করা। সেবাকার্যে গভীর অভিনিবেশ আবশ্যক, আর দশটা কাজের

সহিত ইহা করা যায় না। ইহাতে যোগ দিলে দীর্ঘকাল রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে, তাহার ফলে আমাদের প্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে। যদিও কংগ্রেসে বহুলোক আছেন, তথাপি যাঁহারা ঘটনার গতি নির্দেশ করিতে পারেন এরূপ লোকের সংখ্যা কম, তাঁহাদের অন্য কাজের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। আবার অন্যদিকে ভূমিকম্পে সেবাকার্যের আহ্বানও অগ্রাহ্য করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে সেবা-কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি অনুভব করিলাম এক্ষেত্রে লোকের অভাব হইবে না কিন্তু বিপজ্জনক কার্যের জন্য অতি অল্প লোকই আছেন।

এইভাবে আলোচনায় রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইল। বিগত স্বাধীনতা দিবসে আমাদের কতিপয় সহকর্মী কি ভাবে গ্রেফ্‌তার হইলেন এবং কেমন করিয়া আমরা পরিত্রাণ পাইলাম, তাহাও আমরা আলোচন করিলাম। আমি হাস্য পরিহাস করিয়া তাহাদের বলিলাম যে, নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিয়া সামরিক রাজনীতি চালাইবার গোপন রহস্য আমি আবিষ্কার করিয়াছি।

অশ্রান্ত ভ্রমণে অতিমাত্রায় ক্লান্ত হইয়া আমি ১১ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। দশ দিনের পরিশ্রমে আমাকে রুক্ষ ও পাংশু দেখাইতেছিল, আমার চেহারা দেখিয়া পরিবারস্থ লোকেরা আশ্চর্য হইলেন। এলাহাবাদ রিলিফ কমিটির জন্য আমি আমার ভ্রমণের বিবরণ লিখিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঘুমে আমার চক্ষু জড়াইয়া আসিল। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা আমি ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি।

পরদিন অপরাহ্নে আমি ও কমলা চা খাওয়া শেষ করিয়াছি এমন সময় পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। আমরা বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় একখানি মোটর আসিয়া থামিল, একজন পুলিশ কর্মচারী নামিয়া আসিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম, আমার সময় আসিয়াছে। আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "বহুত দিনোঁ সে আপ্‌কা ইন্তেজার থা"—আপনার জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতেছি। তিনি একটু অপ্রস্তুত হইয়া দুঃখিতস্বরে বলিলেন, তাঁহার কোন দোষ নাই। কলিকাতা হইতে পরোয়ানা আসিয়াছে।

পাঁচ মাস তের দিন বাহিরে কাটাইয়া আমি পুনরায় নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্যে ফিরিয়া চলিলাম। কিন্তু প্রকৃত ভার আমার নহে, নারীদের স্কন্ধেও ইহার ভার পড়িবে, যেমন পূর্বেও আমার রুগ্না জননী, আমার পত্নী, আমার ভগ্নী ইহা বহন করিয়াছেন।

৫৯

আলীপুর জেল

সেই রাত্রেই আমাকে কলিকাতা চালান করা হইল। হাওড়া ষ্টেশন হইতে এক বিপুলকায় কৃষ্ণবর্ণ বাস আমাকে লালবাজার পুলিশ ষ্টেশনে হাজির করিল। কলিকাতা পুলিশের এই বিখ্যাত ঘাঁটির কথা আমি অনেক পড়িয়াছি; কাজেই কৌতূহলের সহিত চারিদিক লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বহু ইংরাজ সার্জেণ্ট ও ইন্‌স্‌পেক্টর, উত্তর ভারতের অন্যান্য পুলিশের প্রধান ঘাঁটিতে ইহা এত দেখা যায় না। কনষ্টেবলদিগকে দেখিয়া মনে হইল, ইহারা অধিকাংশই যুক্ত-প্রদেশের পূর্বাঞ্চল এবং বিহারের লোক। জেলের লরীতে উঠিয়া আমি বহুবার এক জেল হইতে অন্য জেলে কিম্বা জেল হইতে আদালত, আদালত হইতে জেলে আসিয়াছি; এই ভ্রমণকালে গাড়ীর মধ্যে কয়েকজন করিয়া ঐ শ্রেণীর কনষ্টেবল আমার সঙ্গে থাকিত। তাহাদিগকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাইত, তাহারা যেন কাজটা পছন্দ করিত না। আমার প্রতি তাহাদের সহানুভূতি স্পষ্টই বুঝিতাম। কখনও কখনও তাহাদের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত।

আমাকে প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হইল, সেখান হইতে আমাকে বিচারের জন্য চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে লইয়া যাওয়া হইত। ইহা এক নূতন অভিজ্ঞতা। আদালত গৃহ ও বাড়ীখানি দেখিলে প্রকাশ্য আদালত অপেক্ষা সুরক্ষিত দুর্গ বলিয়াই মনে হয়। কয়েকজন সাংবাদিক ও উকীলগণ ব্যতীত কাহাকেও নিকটে ঘেঁসিতে দেওয়া হয় নাই। পুলিশবাহিনী অবশ্য উপস্থিত ছিল। আমার জনাই বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, দেখিয়া এরূপ মনে হইল না, ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার। আদালতে যাইবার সময় আমাকে উপরে নীচে তার দিয়া ঘেরা (ঘরের মধ্যে) এক দীর্ঘ পথের মধ্য দিয়া যাইতে হইল; একটা খাঁচার মধ্য দিয়া যাওয়ার মত। ম্যাজিষ্ট্রেটের আসন হইতে ডক অনেক দূরে। আদালতগৃহ পুলিশ এবং কাল কোট, কাল গাউনধারী উকীলে বোঝাই।

আদালতের বিচারে আমি বেশ অভ্যস্ত। আমার পূর্ব পূর্ব অনেক বিচার জেলের মধ্যেই হইয়াছে। সর্বক্ষেত্রেই বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিত মুখ থাকিত, সমস্ত আবহাওয়া সহজ মনে হইত। পুলিশেরা সাধারণতঃ নেপথ্যে থাকিত এবং এ রকম তারের খাঁচার মত ব্যবস্থা কোথাও দেখি নাই। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার, আমি অপরিচিত ও আশ্চর্য মুখগুলির প্রতি চাহিয়া দেখিলাম তাহাদের সহিত আমার কোন সামঞ্জস্য নাই। এই জনতার মধ্যে চিত্তাকর্ষক কিছুই নাই। একটু ভয়ে ভয়ে বলি, গাউনপরা উকীলের দলটি মোটেই মনোহর দৃশ্য নয়, বিশেষতঃ পুলিশ আদালতের উকীলদের চেহারায় এক বিশিষ্ট অপ্রীতিকর ভঙ্গী আছে বলিয়া মনে হয়। অবশেষে সেই কাল পোষাকের সারির মধ্যে আমি একজন পরিচিত উকীলের মুখ দেখিলাম, কিন্তু তিনিও জনারণ্যে হারাইয়া গেলেন।

বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বেও বারান্দায় বসিয়া আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ ও সকল হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে লাগিলাম। আমার নাড়ীর গতি একটু চঞ্চল হইল, পূর্ব পূর্ব বারের বিচারকালে যেমন মানসিক প্রশান্তি ছিল, এখানে তাহা ছিল না। সহসা আমার মনে পড়িল, বিচার ও কারাদণ্ডের বহু অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমার মানসিক অবস্থা যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে অনভিজ্ঞ যুবকের মনে এই

সঙ্গীন অবস্থায় কি ভাবের উদ্রেক হইবে?

ডকে আসিয়া অনেকটা আরাম বোধ করিলাম। পূর্বের মতই এখানেও আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন ব্যবস্থা ছিল না; আমি একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পাঠ করিলাম। পরদিন ১৬ই ফেব্রুয়ারি আমার দুই বৎসর কারাদণ্ড হইল। আমার সপ্তমবার কারাদণ্ড ভোগ আরম্ভ হইল।

বাহিরের সাড়ে পাঁচ মাসের কথা ভাবিয়া আমি সন্তোষ লাভ করিলাম। এই সময়টা নানা কাজে সর্বদাই ব্যাপৃত ছিলাম এবং কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাজ আমি সমাধা করিতে পারিয়াছি। আমার মার স্বাস্থ্যের গতি ফিরিয়াছে, আশু কোন আশঙ্কার কারণ নাই। আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী কৃষ্ণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমার কন্যার ভবিষ্যৎ শিক্ষার ব্যবস্থাও ঠিক হইয়াছে। আমার পারিবারিক ও আর্থিক কতকগুলি জটিল ব্যাপার আমি মীমাংসা করিয়াছি। যে সকল ব্যক্তিগত ব্যাপার দীর্ঘকাল অবহেলা করিয়াছি, তাহাও একরূপ ঠিকঠাক করিয়াছি। বাহিরের কার্যক্ষেত্রে তখন কাহারও বেশী কিছু করিবার ছিল না, তাহা আমি জানিতাম। অন্ততঃ আমি কংগ্রেসের মনোভাব একটু দৃঢ় হইতে সাহায্য করিয়াছি এবং উহাকে কিয়ৎপরিমাণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছি। পুণায় গান্ধিজীর নিকট চিঠিপত্র এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলির ফলে একটু পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক সমস্যার উপর লিখিত আমার প্রবন্ধগুলিতে ভাল ফল হইয়াছিল। আমি দুই বৎসরেরও অধিককাল পর গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, অন্যান্য অনেক বন্ধু ও সহকর্মীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং কিছুকালের জন্য আমার মন ও হৃদয় নূতন আবেগ ও শক্তিতে ভরিয়া লইয়াছি।

কমলার স্বাস্থ্যহীনতা—আমার মনে কেবল এই একটি কৃষ্ণছায়া ঘনাইয়া ছিল। তিনি যে কত বেশী অসুস্থ আমার তাহা ধারণাই ছিল না, কেন না একেবারে শয্যাশায়ী না হইলে কিছু বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা হইল। তথাপি আমি মনে করিলাম, আমি জেলে থাকার দরুণ তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। আমি বাহিরে থাকিলে ইহা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে, কেন না দীর্ঘকাল আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহেন না।

আমার আর একটি ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে। এলাহাবাদ জিলার পল্লী অঞ্চলে একবারের জন্যও যাইতে পারি নাই বলিয়া আমার মনে দুঃখ হইল। আমাদের নির্দেশ মত কাজ করিতে গিয়া সেখানে অনেক তরুণ সহকর্মী সম্প্রতি গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন এবং তাহাদের অনুসরণ না করাটা অনুরাগহীনতার মত প্রতীয়মান হইতেছে।

আবার সেই কাল লরী আমাকে কারাগারে লইয়া চলিল। পথে মেশিন-গান ও সাঁজোয়া গাড়ী লইয়া অনেক সৈন্য কুচকাওয়াজ করিতেছে দেখিতে পাইলাম। আমি ভাবিলাম যে, সাঁজোয়া গাড়ী ও ট্যাঙ্কগুলি দেখিতে কি কুৎসিত। ঐগুলি যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় প্রাণী ডাইনোসারস বা আর কিছু।

আমাকে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলী করা হইল এবং আমাকে প্রায় ১০ ফিট×৯ ফিট একটি সেলে রাখা হইল। ইহার সম্মুখে একটি বারান্দা এবং ছোট উঠান। উঠানটি প্রায় সাত ফিট উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা, তাহার উপর দিয়া এক আশ্চর্য দৃশ্য আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। নানা ধরনের বিচিত্র দালান—একতলা, দোতলা, চোঙ, সমচতুষ্কোণ, নানা ছাঁদের ছাদ—নানাদিকে মাথা তুলিয়া আছে, কতকগুলি অপরগুলিকে

ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল এই ইমারতগুলির একের পর আর এই ভাবে তৈয়ারী হইয়াছে, যতটুকু স্থান পাওয়া যায় তাহার পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা দেখিতে অনেকটা গোলকধাঁধার মত, কিম্বা ভবিষ্যৎবাদীর অদ্ভুত পরিকল্পনার মত। তথাপি আমি শুনিলাম যে ইমারতগুলি সাবধানতার সহিত হিসাব করিয়া তৈরী করা হইয়াছে এবং মধ্যস্থলে একটি ঘণ্টাঘর (উহা খৃষ্টান কয়েদীদের গির্জা বাটী) স্থাপন করা হইয়াছে। জেলটি সহরের মধ্যে বলিয়া স্থান সঙ্কীর্ণ এবং প্রত্যেক স্থানটুকু ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

এই সকল অপূর্ব-দর্শন ইমারতের প্রথম দর্শন-জনিত বিস্ময় কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতে আর একটি ভয়াবহ দৃশ্য আমার চোখে পড়িল। আমার সেল ও উঠানের সম্মুখেই দুইটি চিমনী হইতে ঘনকৃষ্ণ ধূম কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে, সময় সময় বাতাসে ধূম আমার সেলে আসিয়া পড়ে, আমার শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। উহা জেলের রন্ধনশালার চিমনী। পরে আমি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে বলিয়াছিলাম যে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েদীদিগকে গ্যাস মুখোস দেওয়া উচিত।

আলীপুর জেলের এই লাল ইঁটের বাড়ীগুলি দেখা আর রান্নাঘরের চিম্‌নীর ধূম সেবন করা, আরম্ভটা মোটেই প্রীতিপ্রদ হইল না, ভবিষ্যতের ভরসাও কিছু পাইলাম না। আমার উঠানে কোন গাছ বা সবুজ কিছু ছিল না। সবটাই শান-বাঁধান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তবে প্রত্যহই চিম্‌নীর কালী জমিত—তাহা ছাড়া নিরাবরণ ও নীরস। পাশের ইয়ার্ডের একটি কি দুইটি গাছের মাথা দেখিতে পাইতাম। যখন আমি আসিলাম তখন ঐগুলিতে পাতা বা ফুল কিছু ছিল না। ক্রমে রহস্যময় পরিবর্তন দেখা দিল, শাখা-প্রশাখায় কচি সবুজ রং-এর আভাস দেখা দিল। পল্লব হইতে পত্র বিকশিত হইল, অতি দ্রুত মনোহর হরিৎ শোভায় শাখাগুলি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই আনন্দদায়ক পরিবর্তনে আলীপুর জেলও শোভাময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

একটি গাছে চিল বাসা করিয়াছিল, আমি কৌতূহলের সহিত উহা প্রায়ই লক্ষ্য করিতাম। ছোট ছোট বাচ্চাগুলি ক্রমে বড় হইতেছে এবং জাতিগত ব্যবসায়ে পটুত্ব লাভ করিতেছে। সময় সময় ইহারা অব্যর্থ লক্ষ্যে ছোঁ মারিয়া কয়েদীদের হাত হইতে রুটি লইয়া যাইত।

সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত (অল্পবিস্তর) আমাদের সেলে তালাবন্ধ করিয়া রাখা হইত, শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যা সহজে কাটিতে চাহিত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া লেখাপড়া করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া উঠিতাম, তখন ক্ষুদ্র সেলের মধ্যে এদিক ওদিক পাইচারী করিতাম, সম্মুখে চার-পাঁচ পা গিয়াই আবার ফিরিতে হইত। পশুশালার খাঁচার মধ্যে ভল্লুকগুলি যেমনভাবে এদিক-ওদিক করে আমার তাহা মনে পড়িত। যখন আমি অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করিতাম, তখন আমার প্রিয় প্রতিষেধক 'শিরশাসন' (মাটিতে মাথা রাখিয়া পদদ্বয় উত্তোলন) করিতাম।

রাত্রির প্রথমভাগ বেশ নিস্তব্ধ মনে হইত। নগরের শব্দ ভাসিয়া আসিত—ট্রাম গাড়ীর শব্দ, গ্রামোফোন অথবা দূরাগত সঙ্গীতধ্বনি। দূরাগত সঙ্গীতের মৃদু সুর শুনিতে ভাল লাগে। রাত্রে শান্তি পাওয়া যাইত না, অনবরত শান্ত্রীরা যাতায়াত করিত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক প্রকার পরিদর্শন চলিত। কোন কর্মচারী লণ্ঠন হাতে ঘুরিয়া দেখিতেন যে আমরা কেহ পলাইয়া গিয়াছি কিনা। প্রত্যহ রাত্রি তিনটার সময় বাসন মাজাঘসার তুমুল শব্দ উঠিত; বুঝা যাইত রান্নাঘরের

কাজ সুরু হইয়াছে।

আলীপুরে এবং প্রেসিডেন্সী জেলেও, ওয়ার্ডার সিপাহী শান্ত্রী, কর্মচারী ও কেরাণীর আয়োজন প্রচুর। এই দুইটি জেলের জনসংখ্যা প্রায় নৈনীর সমান হইবে,—২২০০ কি ২৩০০। কিন্তু নৈনী জেল অপেক্ষা এখানে কর্মচারীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী। ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার ও পেনসনপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারীও ইহার মধ্যে আছে। যুক্ত-প্রদেশ অপেক্ষা কলিকাতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাজকর্মের আয়োজন প্রচুর, ব্যয়ও বেশী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তির চিহ্ন ও তাহা বারম্বার স্মরণ করিবার জন্য উচ্চকর্মচারীদের সম্মুখীন হইলে কয়েদীদিগকে চীৎকার করিয়া বলিতে হয়, "সরকার সেলাম"। দীর্ঘায়ত স্বরে ঐ কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ প্রকার শারীরিক ভঙ্গীও করিতে হয়। কয়েদীদের এই চীৎকারধ্বনি দিনের মধ্যে বহুবার শুনিতে হইত, জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রাত্যহিক পরিদর্শনের সময় ইহা বিশেষভাবে শোনা যাইত। আমার ৭ ফুট উচ্চ দেওয়ালের উপর দিয়া সুপারিন্টেন্ডেন্টের মস্তকোপরি ধৃত বৃহদাকার রাজছত্র দেখিতে পাইতাম।

আমি বিস্ময়ের সহিত ভাবি, এই 'সরকার সেলাম' ধ্বনি এবং তাহার সহিত বিশেষ শারীরিক ভঙ্গী প্রাচীনকালের স্মৃতিচিহ্ন, না, কোন ইংরাজ কর্মচারীর আবিষ্কার? আমি ঠিক জানি না, তবে আমার মনে হয় ইহা কোন ইংরাজের আবিষ্কার। ইহার ধ্বনি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-পন্থী। সৌভাগ্যক্রমে যুক্ত-প্রদেশের জেলে ইহার প্রচলন নাই, সম্ভবতঃ বাঙ্গলা ও আসাম ছাড়া আর কোন প্রদেশেই ইহা নাই। 'সরকারের' প্রবল প্রতাপের নিকট এই ভাবে বলপূর্বক নতি স্বীকার করাইয়া লইবার ধ্বনি মানব-চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত অবনতিকর বলিয়াই আমার মনে হয়।

আলীপুরে একটি পরিবর্তন দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। এখানে সাধারণ কয়েদীদের খাদ্য যুক্ত-প্রদেশের জেলের খাদ্য অপেক্ষা অনেক ভাল। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় যুক্ত-প্রদেশের জেলের খাদ্য অনেকাংশে মন্দ।

দেখিতে দেখিতে শীত চলিয়া গেল, বসন্তকেও পশ্চাতে ফেলিয়া গ্রীষ্ম আসিল। প্রতিদিন গরম বাড়িতে লাগিল। কলিকাতার আবহাওয়া আমার ভাল লাগে না। এমন কি কয়েকদিনের মধ্যেই আমি কাহিল হইয়া পড়িলাম। জেলের মধ্যে অবস্থা স্বভাবতঃই অধিকতর মন্দ, আমার শরীর খারাপ হইতে লাগিল। ব্যায়াম করিবার স্থানের অভাব এবং এই আবহাওয়ায় দীর্ঘকাল তালাবন্ধ হইয়া থাকার দরুণ, আমার স্বাস্থ্য একটু খারাপ হইল, অতি দ্রুত শরীরের ওজন কমিতে লাগিল। এই তালা, লোহার কপাট, শিক, প্রাচীর দেখিলেই ঘৃণায় মন ভরিয়া উঠে।

আলীপুরে একমাস পর আমাকে উঠানের বাহিরে গিয়া ব্যায়াম করিতে দেওয়া হইত। এই পরিবর্তনে আমি খুসী হইলাম, প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় আমি প্রধান প্রাচীরের পার্শ্বে হাঁটিতাম। ক্রমে আলীপুর জেল ও কলিকাতার আবহাওয়া আমার সহিয়া গেল, এমন কি রন্ধনশালার চিমনীর ধোঁয়া এবং বাসন মাজার শব্দও এত বিরক্তিকর মনে হইত না। আমার মন বিষয়ান্তরে ধাবিত হইল, নানারূপ দুশ্চিন্তা আসিল। বাহির হইতে যে সকল সংবাদ পাইলাম, তাহা সুসংবাদ নহে।

গণতন্ত্র—প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে

আলীপুর জেলে আমি বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, আমার দণ্ডের পর আমাকে কোন দৈনিক কাগজ দেওয়া হইল না। বিচারাধীন আসামী রূপে আমি প্রত্যহ কলিকাতার 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পাইতাম কিন্তু যে দিন আমার বিচার শেষ হইল, তার পর হইতেই কাগজখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ১৯৩২ সাল হইতে সংযুক্ত প্রদেশে 'এ' ক্লাস কিম্বা প্রথম শ্রেণীর বন্দীদের জন্য একটি দৈনিক পত্রিকা (গভর্ণমেণ্টের পছন্দসই) দেওয়া হইত; অন্যান্য অধিকাংশ প্রদেশেই এই ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং আমার সম্পূর্ণ ধারণা ছিল যে, বাঙ্গলা দেশেও এই নিয়ম প্রচলিত। যাহা হউক, দৈনিক ষ্টেটস্‌ম্যানের বদলে আমাকে সাপ্তাহিক 'ষ্টেটস্‌ম্যান' দেওয়া হইত। স্পষ্টতঃই এই কাগজখানা তাঁহাদের জন্য, যাঁহারা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ অফিসার কিম্বা ইংলণ্ডের স্বগৃহে প্রত্যাগত ব্যবসায়ী। ভারতবর্ষের যে সমস্ত সংবাদ তাঁহাদের রুচিকর হইতে পারে এই পত্রিকাটিতে সাধারণতঃ তাহারই সারমর্ম থাকে। এই সংস্করণে একটি মাত্র বিদেশী সংবাদও নাই, অথচ বিদেশী সংবাদ খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়াই আমার অভ্যাস ছিল, ফলে বিদেশী সংবাদের অভাব আমি খুব বেশী পরিমাণে অনুভব করিতাম। সৌভাগ্যক্রমে 'সাপ্তাহিক মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' রাখিবার অনুমতি আমাকে দেওয়া হইল। এই পত্রিকাটি পড়িয়া আমি ইউরোপ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যোগ রাখিতাম।

ফেব্রুয়ারী মাসে আমার গ্রেফ্‌তার ও বিচারের সময় ইউরোপে নানা বিপর্যয় ও তিক্ত সংঘর্ষ চলিতেছিল। ফ্রান্সে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে ফাসিস্তরা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাইল এবং ন্যাশনাল বা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইল। অষ্ট্রিয়ার অবস্থা আরও শোচনীয়—চ্যান্সেলার ডলফাস শ্রমিকদিগকে গুলী করিয়া মারিতেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রবাদের যে বৃহৎ সৌধ সেখানে গড়িয়া উঠিতেছিল, তিনি তাহার ধ্বংস সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। অষ্ট্রিয়ার রক্তক্ষরণের এই সকল সংবাদে আমি অত্যন্ত বিমর্ষ হইলাম। এই পৃথিবী কি ভয়াবহ শোণিতসিক্ত স্থান! মানুষ তাহার কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য কত বর্বর হইতে পারে! লক্ষণ দেখিয়া মনে হইল ফাসিজম্‌ সমগ্র ইউরোপে ও আমেরিকায় অগ্রসর হইতেছে। হিট্‌লার যখন জার্মানীর শক্তিধর হইলেন, আমি তখন ভাবিয়াছিলাম যে, তাঁহার শাসন বেশী দিন টিকিবে না; কারণ জার্মানীর আর্থিক দুর্গতির কোন মীমাংসা তিনি করিতে পারেন নাই। অন্যান্য যে সমস্ত স্থানে ফাসিজমের বিস্তার হইয়াছিল, সেইসব রাজ্য সম্পর্কেও আমি এই বলিয়া নিজেকে প্রবোধ দিয়াছিলাম যে, প্রতিক্রিয়ার ইহাই শেষ অধ্যায়! ইহার পর নিশ্চয়ই দেখা দিবে গণ-মুক্তি। কিন্তু আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম আমি যাহা চাই তাহা হইতেই আমার এই প্রকার চিন্তার উদ্ভব হয় নাই তো? আমি কি এমন কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছি যে, এই ফাসিস্ত প্রতিক্রিয়ার ঢেউ এত সহজে এবং এত দ্রুত মিলাইয়া যাইবে? এমন কি ফাসিস্ত ডিক্টেটারদের পক্ষে চারিদিকের অবস্থা ও ঘটনাবলী যদি অসহনীয়ও হইয়া উঠে তথাপি কি তাঁহাদের স্বদেশকে এক ধ্বংসকর সংগ্রামে না লইয়া গিয়া তাঁহারা ডিক্টেটারি পরিত্যাগ করিবেন? এই প্রকার সংঘর্ষেরই বা কি পরিণতি হইবে?

ইতিমধ্যে ফাসিজম্ নানা আকারে ও প্রকারে দেখা দিতে লাগিল। যে স্পেনকে 'সংলোকদের নূতন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র'—los hombres honrados—অথবা কাহারও কাহারও মতে ইহাকে সমস্ত গভর্ণমেণ্টের "সেরা গভর্ণমেণ্ট" বলা হইত, তাহাও বহুদূর পশ্চাতে প্রতিক্রিয়ার গভীর পঙ্কে ডুবিয়া গেল। সেখানকার 'সং ও সাধু' লিবারেল নেতাদের যত কিছু মনোহর বক্তৃতা তাহাও তাহাকে পতনের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। সর্বত্রই দেখা গেল যে লিবারেলিজম বা উদারনীতিক মতবাদ আধুনিক অবস্থার সহিত লড়িতে গিয়া একেবারে ব্যর্থ হইতেছে। কারণ এই মতবাদ কেবল কথা ও বচন সমষ্টিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে; নেতারা ভাবিয়াছিলেন কাজের স্থলে কেবল কথার দ্বারাই কার্যোদ্ধার হইবে। কিন্তু যখন কোন সঙ্কট আসিল, তখন দেখা গেল যে, চলচ্চিত্রের পর্দার উপর যেমন শেষ ছবিখানি মিলাইয়া যায়, লিবারেলিজমও ঠিক তেমনই সহজে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

অস্ট্রিয়ার দুর্ঘটনা সম্পর্কে আমি 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধ-গুলি গভীর আগ্রহ ও প্রশংসমান দৃষ্টির সহিত পড়িতে লাগিলাম। "এ কোন্ অস্ট্রিয়া শোণিতসিক্ত সংঘর্ষ হইতে আবির্ভূত হইতেছে? ইউরোপে যাহারা সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া-পন্থী সেই ষড়যন্ত্রকারীদের রাইফেল ও মেশিনগানে শাসিত অস্ট্রিয়াকেই আজ দেখিতেছি।" "কিন্তু ইংলণ্ড যদি মানুষের স্বাধীনতারই রক্ষী হইয়া থাকে, তবে, তাহার প্রধানমন্ত্রীর কি কিছুই বলিবার নাই? তাঁহার মুখে আমরা ডিক্টেটারির গুণকীর্তন শুনিয়াছি, আমরা তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছি যে 'ডিক্টেটারগণ একটি জাতির আত্মাকে জীবন্ত করিয়া তোলেন, এবং "নূতন দৃষ্টি ও নূতন শক্তি তাঁহারা সঞ্চার করেন।" কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রীর পক্ষে এই সমস্ত অত্যাচার সম্পর্কে, সে অত্যাচার যে দেশেই ঘটুক না কেন, নিশ্চয়ই কিছু বলিবার থাকা উচিত। এই সমস্ত লাঞ্ছনা প্রায়শঃই দেহকে এবং তাহার চেয়েও বেশী সময় আত্মাকে হত্যা করে এবং এই মৃত্যু অধিকতর শোচনীয়।"

যদি 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' মানুষের স্বাধীনতার এত বড় রক্ষী হন, তবে ভারতের স্বাধীনতা যখন পিষ্ট ও চূর্ণ হইতেছে, তখন কি তাহার কিছুই বলিবার নাই? আমাদের পক্ষেও কেবল দৈহিক নির্যাতনই ঘটে নাই, আত্মার সেই কঠোরতর অগ্নি-পরীক্ষাও আমরা অনুভব করিয়াছি।

"অস্ট্রিয়ার গণতন্ত্রের ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু ধ্বংসের পূর্বে ইহা সংগ্রাম করিয়া অক্ষয়কীর্তি অর্জন করিয়া গিয়াছে। এই সংগ্রাম এমন এক কাহিনীর সৃষ্টি করিয়া গেল, যাহা কোন দূর ভবিষ্যতে ইউরোপীয় স্বাধীনতার সত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে।"

"স্বাধীনতাশূন্য ইউরোপের আর নিঃশ্বাস পড়িতেছে না। সুস্থ ও উৎসাহ-দীপ্ত মনের আদান-প্রদান বন্ধ হইয়াছে; তাহার নিঃশ্বাস যেন ক্রমে ক্রমে রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। যে মানসিক মূর্ছা সম্মুখে আসিতেছে, তাহার প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায় কোন নিরপেক্ষ আন্দোলন কিম্বা আভ্যন্তরীণ কোন বিপর্যয় এবং বাম ও দক্ষিণ উভয় দিক দিয়া উহার উপর আক্রমণ ও আঘাত।.....রাইন নদী হইতে উত্তরের গিরি-প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ এক বিরাট কারাগারে পরিণত হইয়াছে।"

আমার হৃদয় যেন এই সমস্ত জ্বলন্ত বচনের মধ্যে তাহার প্রতিধ্বনিকে খুঁজিয়া পাইল। কিন্তু আমি বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তে ভাবিলাম, ভারতবর্ষের বেলায়

কি? 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' কিম্বা তাহার মত আরও অনেক স্বাধীনতা-প্রেমিক ইংলণ্ডে আছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা আমাদের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে এতটা বিস্মৃতির মধ্যে আছেন কিরূপে? যাহা তাঁহারা এখানে দেখিতেই পান না, তাহাই তাঁহারা অন্যত্র এতটা দৃঢ়তার সঙ্গে নিন্দা করেন কিরূপে? ইংলণ্ডেরই একজন বিখ্যাত উদারনীতিক নেতা, যিনি উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতিতে মানুষ, যিনি স্বভাবতঃই সাবধানী এবং যাঁহার ভাষা সংযত, প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে বিগত মহাসংগ্রামের পূর্বমুহূর্তে তিনি বলিয়াছিলেন, "শান্তি ও শৃঙ্খলার উপর পাশবিক শক্তির এই শোচনীয় জয় নিঃশব্দে লক্ষ্য করার চেয়ে আমি বরং প্রার্থনা করি যে, আমার এই স্বদেশ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাউক।" বীর্যপূর্ণ এই চিন্তা, উচ্ছ্বসিত ভাষায় ইহার প্রকাশ—ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ বীর যুবক ইহারই রক্ষায় অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ভারতবাসী যদি মিঃ স্কুইবের মত এমন কথা বলিতে সাহসী হয়, তবে তাহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিবে?

জাতীয় মনোবিজ্ঞান একটা জটিল ব্যাপার। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই কল্পনা করেন যে আমরা কত ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ। আর যত কিছু দোষ, তাহা অন্য সমস্ত দেশের! আমাদের মনের অন্তরালে কোন এক জায়গায় এই বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, আমরা অন্যের মত নহি। এই বৈষম্যের ফলটা আমাদের ভদ্র জীবনযাত্রার জন্য আমরা সাধারণতঃ জোরের সঙ্গে প্রকাশ করি না। আর যদি আমরা এতটা সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকি যে, আমরা কোন সাম্রাজ্যের মালিক, অন্যান্য দেশের ভাগ্যের আমরা নিয়ামক, তবে এমন কথা আমরা বিশ্বাস না করিয়া পারি না যে, যথাসম্ভব এই সর্বোত্তম পৃথিবীর সমস্তই উত্তম। যাহারা ইহার পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করিতেছে, তাহারা আত্মস্বার্থান্বেষী কিম্বা বিভ্রান্ত মূর্খের দল—যে উপকার আমরা তাহাদের করিয়াছি, তাহার প্রতিও তাহারা অকৃতজ্ঞ।

ব্রিটিশ জাতি দ্বীপবাসী; দীর্ঘকালের সাফল্য ও ঐশ্বর্য তাহাদিগকে প্রায় সমস্ত জাতির প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি আনিয়া দিয়াছে। তাহাদের পক্ষে কোনও ভদ্রলোকের সেই উক্তিটা প্রযোজ্য—"ক্যালের কালে বন্দর হইতেই নিগ্রো বসতি আরম্ভ হইয়াছে।" কিন্তু এই প্রকার উক্তি অত্যন্ত ব্যাপক। বোধ হয় ইংলণ্ডের অভিজাত শ্রেণীর দৃষ্টিতে পৃথিবীর বিভাগটা কতকটা এই রকমের—(১) ব্রিটেন, তারপর দীর্ঘ ব্যবধান এবং তারপর (২) ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন (কেবল শ্বেতকায় জাতি অধ্যুষিত) ও আমেরিকা (কেবল অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি, দাগো বা ওয়াপ প্রভৃতি নহে) (৩) পশ্চিম ইউরোপ (৪) ইউরোপের বাকী অংশ (৫) দক্ষিণ আমেরিকা (লাটিন ভাষাভাষী জাতিসমূহ), তারপর দীর্ঘ ব্যবধান এবং তারপর (৬) এশিয়া ও আফ্রিকার কাল, বাদামী ও পীত রংয়ের মানুষ; এইগুলি অল্প-বিস্তর পরস্পরের সঙ্গে একত্র গ্রথিত।

ইহাদের মধ্যে সকলের শেষশ্রেণীতে আমরা—আমাদের শাসকেরা যে উচ্চ-শিখরে বাস করেন, তাহা হইতে আমরা কত দূরে! সুতরাং আমাদের দিকে তাকাইতে গিয়া যখন তাঁহাদের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসে কিম্বা যখন আমরা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা বলি, তখন যে তাঁহারা বিরক্তি বোধ করেন, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এই শব্দগুলি আমাদের জন্য তৈয়ারী হয় নাই। জন মর্লির মত একজন খ্যাতিমান উদারনীতিক নেতাও কি এমন কথা বলেন নাই যে, কোন সুদূর অস্পষ্ট ভবিষ্যতেও তিনি ভারতবর্ষে কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করিতে পারেন না? পশুর লোমে তৈয়ারী কানাডার কোট

কোটের মত গণতন্ত্রও ভারতের আবহাওয়ার পক্ষে অনুপযোগী। পরবর্তীকালে ব্রিটেনের শ্রমিক দল, যাঁহারা সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী, নির্যাতিতের যাঁহারা বান্ধব, তাঁহারাও তাঁহাদের জয়ের পরে ১৯২৪ সালে আমাদের জন্য বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স পুনঃপ্রবর্তিত করেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় গভর্ণমেণ্টের আমলে আমাদের অদৃষ্ট বরং আরও শোচনীয় হইয়াছিল। আমি নিশ্চয় জানি যে তাঁহারা আমাদের অশুভ কামনা করেন না। যখন তাঁহারা ধর্মযাজকের ভঙ্গীতে বক্তৃতার বেদীমঞ্চ হইতে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "হে আমাদের প্রিয় ভ্রাতৃগণ" তখন তাঁহারা সচেতন শুভবুদ্ধিরই উত্তেজনা অনুভব করেন! কিন্তু তাঁহাদের নিকট আমরা ও তাঁহারা এক নহি, সুতরাং অন্য কোন মানদণ্ড আমাদের বিচার করিতে হইবে। ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈষম্যের জন্য একজন ফরাসী ও একজন ইংরাজের পক্ষে যখন সমভাবে চিন্তা করা কঠিন, তখন একজন ইংরাজ ও একজন এশিয়াবাসীর বেলায় সেই বৈষম্য কত বৃহৎ।

সম্প্রতি লর্ড সভায় ভারতের শাসন-সংস্কার লইয়া বিতর্ক হইয়াছে। মাননীয় লর্ডগণ অনেক মনোহর বক্তৃতা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ভারতের কোনও প্রদেশের ভূতপূর্ব গভর্ণর লর্ড লিটন যিনি কিছুকাল বড়লাটের কার্য করিয়াছিলেন, তিনিও এক বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রকাশ যে, তিনি এই মর্মে বক্তৃতা* করিয়াছেন,—"সমগ্র ভারতের হিসাবে কংগ্রেস রাজনৈতিকগণের অপেক্ষা ভারতের গভর্ণমেণ্ট অনেক অধিক প্রতিনিধিস্থানীয়। অফিসারবর্গ, সমর-বিভাগ, পুলিশ, রাজন্যবর্গ, সেনাদল এবং হিন্দু ও মুসলিম পক্ষ হইতে ভারত গভর্ণমেণ্ট কথা বলিতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেস-রাজনীতিকগণ ভারতের একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেও প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন না।" তিনি তাঁহার বক্তব্যকে আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, "আমি যখন ভারতীয় জনমতের কথা বলি, তখন আমি তাঁহাদের কথাই বলি, যাঁহাদের সহযোগিতার উপর আমাকে নির্ভর করিতে হয় এবং যাঁহাদের সহযোগিতার উপর ভবিষ্যৎ লাট ও বড়লাটদিগকে নির্ভর করিতে হইবে।"

তাঁহার এই বক্তৃতায় দুইটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যাইতেছে :— প্রথম সেই ভারতবর্ষই হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশকে সাহায্য করে এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিস্থানীয়, সুতরাং ইহা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এমন ধরণের যুক্তিও যখন গুরুত্বের সহিত দেখান হয় তখন বুঝা উচিত যে সুয়েজ খাল পার হইয়া আসিলে ইংরাজী শব্দগুলিরও যেন অর্থের পরিবর্তন হয়। ইহার পর অনিবার্যরূপে এই যুক্তিই আসে যে, স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেণ্টই সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিমূলক এবং গণতান্ত্রিক ধরণের, কারণ সম্রাট সকলেরই প্রতিনিধিস্থানীয়। আমরা রাজাদের স্বর্গীয় অধিকারকে আবার ফিরিয়া পাইলাম, আর পাইলাম—"আমিই রাষ্ট্র"। প্রকৃত কথা এই যে সম্প্রতি বিশুদ্ধ স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদেরও সমর্থক জুটিয়া গিয়াছে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের উজ্জ্বল রত্ন স্যর মালকম হেলী গত ১৯৩৪ সালে ৫ই নভেম্বর বারাণসীতে যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণররূপে বক্তৃতা দিতে গিয়া দেশীয় রাজাসমূহের স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। কিন্তু এই উপদেশের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ কোন দেশীয় রাজাই স্বেচ্ছায় স্বৈরতন্ত্র পরিত্যাগ করিবেন এমন সম্ভাবনা নাই। বর্তমানে একটা মজার ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে

---

* লর্ড সভা, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪।

এই যে ইউরোপে গণতন্ত্রের পতন হইতেছে, এই ছ্তো দেখাইয়া স্বৈরতন্ত্রের প্রসারের চেষ্টা চলিতেছে। সর্বত্রই যখন পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটিতেছে তখন "চরম সংস্কারের সমর্থন" দেখিতে পাইয়া মহীশ্রের দেওয়ান স্যর মির্জা ইসমাইল তাঁহার "বিস্ময়" প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। "আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, রাজ্যের মধ্যে যাঁহারা সচেতন লোক, তাঁহারা অনুভব করিতেছেন যে আমাদের বর্তমান শাসনতন্ত্র সমস্ত প্রকার বাস্তব উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে গণতান্ত্রিক।"* মহীশ্রের "চেতনা" সম্ভবতঃ মহীশ্রের রাজা ও দেওয়ানের স্ব স্ব মনোভাবেরই একটা ছায়া মাত্র। সেখানে যে গণতন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে স্বৈরতন্ত্রের বৈষম্য নির্দেশ করা কঠিন।

যদি ভারতবর্ষের পক্ষে গণতন্ত্র উপযুক্ত না হয়, তবে বাহ্যতঃ উহা মিশরের পক্ষেও যোগ্য নহে। এইমাত্র আমি "ষ্টেটস্ম্যানে" † (কারাগারে ইদানীং আমাকে একখণ্ড দৈনিক সংস্করণ দেওয়া হইতেছে) প্রকাশিত কায়রো হইতে একটি দীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করিলাম। ইহাতে বলা হইয়াছে যে প্রধান মন্ত্রী নাশিম পাশা "তাঁহার এক ঘোষণার দ্বারা দায়িত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক মহলে কম আতঙ্ক জাগ্রত করেন নাই। কারণ এই ঘোষণায় তিনি রাজনৈতিক দলসমূহকে, বিশেষভাবে ওয়াফদদিগকে, পরস্পরের সহযোগিতায় আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেছে একটা নূতন শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা এবং তাহার জন্য একটা জাতীয় সম্মেলন অথবা গণ-পরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান। ইহার অর্থ হইতেছে পরিণামে জনসাধারণের গণতন্ত্রমূলক গভর্ণমেণ্টের আমলে ফিরিয়া যাওয়া। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় মিশরের পক্ষে এই প্রকার শাসন সর্বদাই সর্বনাশকর হইয়াছে, কারণ অতীতে ইহা জনতার সর্বাপেক্ষা নীচ প্রবৃত্তির খপ্পরে পড়িয়াছে। মিশরীয় রাজনীতির ও তাহার জনগণের ভিতরের কার্য-কলাপের সন্ধান রাখেন এমন যে কেহ নিঃসন্দেহে বলিতে পারিবেন যে, নির্বাচনের ফলে পুনরায় ওয়াফদ ক্ষমতায় আসীন হইবেন এবং তাঁহাদেরই সংখ্যাধিক্য হইবে। সুতরাং এই কার্য-পদ্ধতিকে নিবারণের জন্য যদি কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তবে আমরা শীঘ্রই এক অতিমাত্রায় গণতন্ত্রবাদী বিদেশী-বিদ্বেষী বৈপ্লবিক শাসনের সম্মুখীন হইব।"

এ সম্পর্কে এমন একটা প্রস্তাবও উঠিয়াছে যে, 'ওয়াফদীদের পাল্টাজবাবে শাসন বিভাগীয় 'চাপ' দিয়া নির্বাচন "অনুষ্ঠিত" হউক, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রধান মন্ত্রী "এত অতিরিক্ত রকমের আইননিষ্ঠ" যে তিনি তেমন কিছু করিতে চাহিতেছেন না। এই অবস্থায় একমাত্র উপায় ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভার হস্তক্ষেপ এবং "তাঁহাদের ঘোষণা করা উচিত যে তাঁহারা এই ধরণের কোন শাসনের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সহ্য করিবেন না।"

ব্রিটিশ মন্ত্রীরা কি করিবেন না করিবেন অথবা মিশরে কি ঘটিবে তাহা আমি জানি না।‡ সম্ভবতঃ কোন স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ এই যুক্তি দেখাইয়াছেন এবং এই যুক্তির দ্বারা আমরা ভারতীয় ও মিশরীয় অবস্থার জটিলতা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি। ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকা প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যেমন বলিতেছেন,—"যে ধরণের জীবনযাত্রা ও মনোবৃত্তি হইতে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে, তাহার সহিত

---

* মহীশ্রে ২১ জুন, ১৯৩৪। ৬২ অধ্যায়ে মন্তব্য দেখুন।

† ডিসেম্বর ১১, ১৯৩৪।

‡ ১৯৩৫-এর নভেম্বর মাসে মিশরে ব্রিটিশ বক্তব্যের প্রতিবাদে ব্যাপক রাজনৈতিক দাঙ্গা ঘটিয়াছিল।

একজন সাধারণ মিশরীয় ভোটদাতার জীবনযাত্রা ও মনোবৃত্তির কোন সামঞ্জস্য নাই, গোড়াকার গলদ এইখানে।" এই সামঞ্জস্যহীনতার আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, "ইউরোপে অনেক সময় গণতন্ত্রের পতন ঘটিয়াছে অতিরিক্ত সংখ্যক দলের জন্য, আর মিশরের পক্ষে বাধা এই যে সেখানে ওয়াফদ ছাড়া আর কোন দলই নাই।"

ভারতবর্ষে আমাদিগকে বলা হইয়া থাকে যে আমাদের গণতান্ত্রিক উন্নতির পথে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই প্রধান বাধা, সুতরাং অকাট্য যুক্তির দ্বারা এই সমস্ত বিপদই চিরকালের জন্য জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। আমাদিগকে আরও বলা হইয়া থাকে যে, আমাদের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য নাই। মিশরে কোন সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই এবং সেখানে যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ঐক্যের প্রশ্ন তাহাও প্রকাশমান। তথাপি এই ঐক্যই সেখানে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। গণতন্ত্রের পথ যে সোজা ও সঙ্কীর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচ্য দেশের গণতন্ত্রের জন্য কেবল একটা অর্থ আছে বলিয়া মনে হয়, সাম্রাজ্যবাদী শাসনশক্তির হুকুমগুলি মানিয়া চলা এবং তাঁহাদের কোন স্বার্থে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ না করা। এই সর্তাধীনে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অবাধে প্রসার লাভ করিতে পারে।

৬১

বিষাদ

"স্নিগ্ধ কোমল দূর্বাদলে
শয়নের জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল।
মাগো, তোমার চরণতলে পতিত ক্লান্ত
সন্তানের সকল স্বপ্নই ভাঙ্গিয়া গেল॥"

এপ্রিল আসিল। বাহিরের ঘটনাবলীর কিছু কিছু গুজব আলীপুরের কারাকক্ষে আমার কানে আসিল, কিন্তু এই গুজব অপ্রীতিকর এবং অশান্তি-জনক। একদিন কথায় কথায় জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাকে বলিলেন যে, মিঃ গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়াছেন। ইহার বেশী কিছু আমি জানিতে পারিলাম না। এই সংবাদ শুভ নহে, বহু বৎসর যাহাকে আমি এত গুরুত্ব দিয়া আসিতেছিলাম তাহার এই প্রকার উপসংহারে আমি অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিলাম। তথাপি আমি নিজে নিজে এই যুক্তি দিলাম যে, ইহার সমাপ্তি অনিবার্য ছিল। আমি মনে মনে জানিতাম যে, কোন না কোন সময়—অন্ততঃ সাময়িকভাবে হইলেও—আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষ ফলাফলের দিকে না তাকাইয়াও প্রায় অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আন্দোলন চালাইতে পারেন, কিন্তু জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে এইভাবে চলে না। অধিকাংশ কংগ্রেসসেবীর এবং দেশবাসীর হিত গান্ধীজী যে যথাযথ অনুধাবন করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। আমি এই নূতন অবস্থার সঙ্গে, অপ্রীতিকর হইলেও, নিজেকে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করিলাম।

পুরাতন স্বরাজ্যদলকে পুনরায় চালু করিয়া আইন-সভায় প্রবেশের যে নূতন চেষ্টা চলিতেছে, তাহারও বিষয় আমি কিছু কিছু অস্পষ্টভাবে শুনিলাম।

ইহাও আমার কাছে অনিবার্য মনে হইল, দীর্ঘকাল আমি এই মতই পোষণ করিয়াছিলাম যে, ভবিষ্যৎ কাউন্সিল-নির্বাচনে কংগ্রেস দূরে সরিয়া থাকিতে পারে না। যে পাঁচ মাস আমি কারাগারের বাহিরে স্বাধীন ছিলাম, তখন আমি এই মনোবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কারণ আমি ভাবিয়াছিলাম এবং অন্য দিকে নূতন সামাজিক পরিবর্তনের ভাবধারাকে, যে ভাবধারা লইয়া কংগ্রেসীমহল আন্দোলিত হইতেছে তাহার গতিকে ব্যাহত করিয়া আমাদের দৃষ্টিকে হয়ত ভিন্নপথে লইয়া যাইবে। আমি আরও ভাবিলাম, সঙ্কট যত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, আমাদের জনসাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ততই এই সমস্ত ভাবধারার বিস্তার হইবে এবং আমাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পশ্চাতে যে কঠিন বাস্তবতা আছে, তাহা আত্মপ্রকাশ করিবে। লেনিন যেমন এক জায়গায় বলিয়াছেন, "যে কোন রাজনৈতিক সঙ্কটের উপযোগিতা আছে, কারণ যাহা গুপ্ত ছিল, এই সঙ্কটের মুখে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, রাজনীতির সঙ্গে যে সমস্ত বাস্তব শক্তি জড়িত ছিল, সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে, বাক্য ও কল্পনার ফাঁকিবাজি এবং মিথ্যা ধরা পড়ে, প্রকৃত ঘটনাবলীকে ইহা সুস্পষ্টরূপে বুদ্ধির গোচর করে এবং প্রকৃত বাস্তবতার অর্থ কি, তাহা জনসাধারণকে জোর করিয়া বুঝাইয়া দেয়।" আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এই কার্যক্রমের ফলে কংগ্রেস একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়া থাকিবে, স্পষ্টমনা এবং অধিকতর সুসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠানরূপে দেখা দিবে। দুর্বলতার উপাদানগুলির কিছু কিছু ইহার ফলে ঝরিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এবং যখন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পুঁথিগত মতবাদের দিনও ফুরাইয়া আসিবে, আর তথাকথিত নিয়মতান্ত্রিক ও আইন মাফিক উপায়ের পুনঃপ্রবর্তন ঘটিবে, তখন কংগ্রেসের অগ্রগামী ও প্রকৃত কর্মনিরত অংশ এই সমস্ত উপায়কেও কাজে লাগাইবে আমাদের চরম লক্ষ্যের এক বৃহত্তর দৃষ্টি লইয়া।

বাহ্যতঃ সেই সময় আসিয়াছিল। কিন্তু আমি বিমর্ষ চিত্তে দেখিলাম যে, যাঁহারা আইন অমান্য আন্দোলনের এবং কংগ্রেসের সকল কর্মব্রতের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিলেন, তাঁহারাই পশ্চাতে হটিয়া যাইতেছেন, আর যাঁহারা তেমন কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারাই নেতৃত্বের ভার লইতেছেন।

কয়েকদিন পরে সাপ্তাহিক 'ষ্টেটস্‌ম্যান' আসিল, গান্ধিজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহা এই কাগজটিতে পাঠ করিলাম। নিতান্ত বিস্ময়ে এবং অবসন্নপ্রায় চিত্তেই পাঠ করিলাম। আমি পুনঃ পুনঃ এই বিবৃতি পড়িলাম, আইন অমান্য আন্দোলন ও অন্যান্য অনেক বস্তু আমার মন হইতে মুছিয়া গেল এবং তাহার স্থলে নানা বিরোধ ও সন্দেহ দেখা দিল। গান্ধিজী লিখিয়াছিলেন, "সত্যাগ্রহ আশ্রমের বাসিন্দা ও সহকর্মিগণের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আমি যে আলাপ করিয়াছি, এই বিবৃতির মূলে তাহার প্রেরণা রহিয়াছে। বিশেষভাবে এই প্রেরণার মূলে রহিয়াছে দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠাবান একজন প্রবীণের সহকর্মীর কথা, তাঁহার সম্পর্কে আমি কথায় কথায় এই তথ্যপূর্ণ সংবাদ পাইয়াছিলাম যে তিনি কারাগারের সম্পূর্ণ কর্তব্য পালন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাঁহার নির্দিষ্ট কাজের বদলে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত পড়াশুনাই বেশী পছন্দ করিতেন। নিঃসন্দেহে ইহা সত্যাগ্রহের মূলনীতি-বিরোধী। যে বন্ধুকে আমি ভালবাসি তাঁহার অসম্পূর্ণতার চেয়ে এই বার্তা আমার নিজের অসম্পূর্ণতা অধিকতর উদ্ঘাটিত করিল। বন্ধুটি বলিলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার দুর্বলতার কথা জানি। আমি অন্ধ ছিলাম এবং

কোন নেতার মধ্যে অস্পষ্টতা মার্জনীয় নহে। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম যে, নিশ্চয়ই আপাততঃ কিছু সময়ের জন্য সত্যাগ্রহের বাস্তব ক্ষেত্রে একমাত্র আমিই প্রতিনিধি থাকিব।”

'বন্ধুর' অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তবে তাহা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপারেই ছিল। আমি স্বীকার করি যে, আমি প্রায়শঃই এই অপরাধে অপরাধী ছিলাম এবং তজ্জন্য আমি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নহি। কিন্তু এই ব্যাপারটা যদি সত্যই একটা গুরুতর কিছু হইত, তথাপি এক বিশাল জাতীয় আন্দোলন, যাহার সহিত সহস্র সহস্র লোক মুখ্যভাবে এবং লক্ষ লক্ষ লোক গৌণভাবে জড়িত, সেই আন্দোলন কি কোন ব্যক্তির একটা ভুলের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে? আমার কাছে এমন প্রস্তাব বীভৎস এবং দুর্নীতিপূর্ণ মনে হইল। কিসে সত্যাগ্রহ হয় এবং হয় না, তেমন কথা আমি জানি বলিয়া ধরিয়া লইতেছি না, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমি আমার আচরণে কতকগুলি মূলনীতি অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু গান্ধিজীর এই বিবৃতির দ্বারা আমার সেই সমস্ত নীতি বিপর্যস্ত ও আহত হইল। আমি জানি যে, গান্ধিজী সাধারণতঃ তাঁহার সহজাত বুদ্ধির প্রেরণায় কাজ করিয়া থাকেন (inner voice বা 'অন্তরের আদেশ' কিম্বা কোন 'প্রার্থনার উত্তর' অপেক্ষা আমি ইহাকে 'সহজাত বুদ্ধি' বলাই অধিক পছন্দ করি) এবং প্রায়শঃ তাহা ঠিক হইয়া থাকে। জন-চিত্তকে অনুভব করিবার এবং তাহাদের মন বুঝিয়া উপযুক্ত মুহূর্তে কাজ করিবার পর উহা সমর্থন করিয়া যে সমস্ত যুক্তি তিনি পরে দেখাইয়া থাকেন, তাহা প্রায়শঃই তাঁহার পরবর্তী চিন্তা হইতে উদ্ভূত। এবং এই সমস্ত যুক্তি কাহাকেও খুব বেশী দূর অগ্রসর করিয়া দেয় না। কোন সঙ্কটের সময় কোনও জননায়ক কর্মী প্রায় সর্বদাই নিজের অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়া থাকেন এবং কাজের পর তিনি উহার যুক্তি খুঁজিয়া থাকেন। আমিও অনুভব করিলাম যে, সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিয়া গান্ধিজী ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু যে সমস্ত যুক্তি তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির পক্ষে অপমানকর এবং এতবড় জাতীয় আন্দোলনের নেতার পক্ষে এক বিস্ময়কর অভিনয় বলিয়া মনে হইল। তাঁহার আশ্রমের বাসিন্দাগণের আচরণকে যেভাবে খুসী বিচার করিয়া দেখার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহার আছে, আশ্রমবাসিগণ সমস্ত প্রকার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটা সুনির্দিষ্ট শাসন মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস তেমন কিছু করে নাই, আমিও তাহা করি নাই। কিন্তু যে সমস্ত যুক্তি আমার নিকট আধ্যাত্মিক এবং রহস্যাত্মক বলিয়া মনে হইল এবং যাহার সহিত আমার কোনই সম্পর্ক নাই, তাহারই জন্য আমাদিগকে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে কেন? কোন রাজনৈতিক আন্দোলন, এমন কোন ভিত্তির উপর চালান সম্ভব বলিয়া কল্পনাও করা যায় কি? আমি যতটা নিজে বুঝি (আমি স্বীকার করি যে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) তদনুসারে আমি সত্যাগ্রহের নৈতিক দিকটা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহার মূলনীতি আমার চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, ইহার দ্বারা রাজনীতি এক উচ্চতর ও মহত্তর স্তরে পৌঁছিবে। আমি ইহাও মানিয়া লইতে সম্মত যে, কেবল সমাপ্তি দেখাই যে কোন প্রকার উপায়কে সমর্থন করা যায় না। কিন্তু এই নূতন মতবাদ কিম্বা ইহার ব্যাখ্যা এমন একটা বস্তু যাহা বহুদূরপ্রসারী এবং ইহার মধ্যে এমন সম্ভাবনা রহিয়াছে, যাহা আমাকে ভীত করিয়া তুলিল।

এই সমস্ত বিবৃতি আমাকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও উৎপীড়িত করিল। এবং এই

বিবৃতির শেষে তিনি কংগ্রেসসেবকদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এই, "তাঁহারা আত্মত্যাগ ও স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের রীতি ও সৌন্দর্য অবশ্য শিক্ষা করিবেন। তাঁহারা অবশ্যই জাতি সংগঠনের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিবেন এবং এই পদ্ধতি হইতেছে,—নিজ হাতে সুতা কাটিয়া ও সুতা বুনিয়া খদ্দরের প্রচার, জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে পরস্পরের প্রতি অনিন্দ্যনীয় আচরণের দ্বারা অকৃত্রিম সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রসার, ব্যক্তিগত জীবনে কোন আকার ও প্রকারের সর্ববিধ অস্পৃশ্যতা পরিহার, মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন—বিভিন্ন নেশাসক্তের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়া এবং সাধারণতঃ স্বকীয় পবিত্রতার অনুশীলন করিয়া মাদক দ্রব্য বর্জনের প্রচার, এই সমস্ত কাজ ও সেবার দ্বারাই দরিদ্রের মত জীবনযাত্রা সম্ভব হইবে। কিন্তু যাঁহাদের পক্ষে এই দরিদ্র জীবন সম্ভব নহে, তাঁহারা জাতীয় উপযোগিতা-সম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রমশিল্প—যে শিল্প এখনও সংগঠিত হয় নাই, তাহাই অবলম্বন করিতে পারেন, ইহাতে অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী আয় হইবে।"

ইহাই হইতেছে রাজনৈতিক কর্মতালিকা এবং এই তালিকা আমাদের অনুসরণ করিতে হইবে! দেখা যাইতেছে গান্ধিজী ও আমার মধ্যে বহুদূর ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। অত্যন্ত বেদনাবিধুর হৃদয়ে আমি অনুভব করিলাম যে, বহু বছর ধরিয়া তাঁহার প্রতি আমার যে অনুরক্তির বন্ধন ছিল তাহা যেন ছিন্ন হইয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার মধ্যে এক মানসিক সংগ্রাম চলিতেছিল। গান্ধিজী এমন অনেক কিছু করিয়াছেন, যাহা আমি বুঝি নাই কিম্বা প্রশংসা করিতেও পারি নাই। তিনি উপবাস আরম্ভ করিলেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিবার সময় বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন, অথচ তাঁহার সহকর্মীরা আন্দোলনের সহিত যুক্ত রহিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত ও স্বেচ্ছাকৃত বন্ধনজাল, যাহার ফলে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে তিনি যখন কারাগারের বাহিরে থাকিবেন তখনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তাঁহার নূতন অনুরাগ ও নূতন সঙ্কল্প তাঁহার পুরাতন সঙ্কল্প ও কার্যপদ্ধতি ঢাকিয়া ফেলিল, অথচ বহুতর সহকর্মীর সহিত একযোগে তিনি যে সঙ্কল্প ও কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল, এ সমস্ত দেখিয়া আমি বিষণ্ণ হইলাম। আমার স্বল্পকাল কারামুক্তির সময় আমি ইহা অনুভব করিয়াছি এবং অন্যান্য পার্থক্যগুলিও গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। গান্ধিজী বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। সম্ভবতঃ উহা প্রকৃতিগত অপেক্ষাও অনেক অধিক, আমি জানি অনেক বিষয়ে আমার যে সকল স্পষ্ট ও নিশ্চিত ধারণা আছে তাহা তাঁহার বিশ্বাসের বিরোধী, তথাপি কংগ্রেস যে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য কার্য করিতেছে, তাহার প্রতি বৃহত্তর আনুগত্য প্রয়োজন এই ধারণায় আমি অতীতে আমার ঐ সকল ধারণা যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়াছি। আমার নেতা ও সহকর্মীদের নিকট অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি, কেন না আমার মানসিক গঠনই এইরূপ যে কোন আদর্শ এবং স্বীয় সহকর্মীদের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্যকে আমি অতি উচ্চস্থান দিয়া থাকি। আমার এই অন্তর্নিহিত বিশ্বাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম কতবার হইয়াছে, কতবার আমাকে নিজের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। পাকেচক্রে আমি আপোষ রক্ষা করিয়া লইয়াছি। সম্ভবতঃ আমি অন্যায় করিয়াছি, কেন না স্বীয় বিশ্বাসের আশ্রয় ত্যাগ করা কাহারও পক্ষে ভাল হইতে পারে না। কিন্তু আদর্শের সংঘাতের মধ্যেও আমি আমার সহকর্মীদের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিয়াছি এবং আশা করিয়াছি ঘটনার গতিপথে আমাদের জাতীয় সংঘর্ষের বিকাশের সহিত

বাধাগুলি অন্তর্হিত হইবে, আমার মানসিক দুশ্চিন্তা দূর হইবে, আমার সহকর্মীরা আমার মতবাদের নিকটবর্তী হইবেন।

কিন্তু এখন? আলীপুর জেলের সেলের মধ্যে বসিয়া সহসা আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করিতে লাগিলাম। জীবন তরু-গুল্মহীন ঊষর মরুভূমির মত নীরস মনে হইতে লাগিল। জীবনে যত কঠিন শিক্ষা পাইয়াছি তাহার মধ্যে কঠিনতম এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক শিক্ষার সম্মুখীন হইলাম, কোন চরম ব্যাপারে কাহারও উপর নির্ভর করা উচিত নহে। জীবনের পথে একাই চলা উচিত। অপরের উপর নির্ভর করাই আশাভঙ্গজনিত বেদনাকে আমন্ত্রণ করা।

আমার সঞ্চিত ক্ষোভের কিয়দংশ ধর্ম ও ধর্মভাবের উপর গিয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম, ইহা চিন্তার স্পষ্টতা এবং উদ্দেশ্যের একাগ্রতার এক মহাশত্রু; ইহার ভিত্তি কি কেবল ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির উপর নহে? আধ্যাত্মিক হইতে গিয়া ইহা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা এবং আত্মা হইতে কত দূরে সরিয়া যায়! পরলোকের দিক দিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া, মানুষের মূল্য, সমাজের মূল্য, সামাজিক সুবিচারের মূল্য সম্পর্কে ইহার ধারণা অতি অল্প। পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা লইয়া ইহা বাস্তবের প্রতি অন্ধ হইয়া থাকে, কেন না ইহাদের ভয় পাছে ধারণার সহিত ঘটনার অসামঞ্জস্য ঘটে। ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এইটুকু জানিয়াই ইহারা সবখানি জানা হইয়াছে মনে করে এবং অপরের নিকট তাহাই প্রচার করিয়া কর্তব্য শেষ করে। বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি ও সত্যানুসন্ধানের আগ্রহ এক বস্তু নহে। ধর্ম শান্তির বুলি আওড়ায়, অথচ এমন সব ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান সমর্থন করে, যাহা হিংসা ব্যতীত টিকিতেই পারে না। ধর্ম তরবারির হিংসার নিন্দা করিয়া থাকে, কিন্তু যে হিংসা নিঃশব্দ গতিতে শান্তির ছদ্মবেশ পরিয়া অনশন ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর গর্হিত উপায়ে বাহ্যতঃ শারীরিক আঘাত না করিয়া মনের উপর অত্যাচার করিতেছে, তেজোবীর্য পিষিয়া দিতেছে, হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে সম্বন্ধে ইহা একেবারেই নীরব।

আমার মনের মধ্যে এই সকল আলোড়নের কারণ যিনি, তারপর তাঁহার কথা আমি ভাবিলাম। যাহাই হউক, এই গান্ধিজী কি আশ্চর্য মানুষ, কি বিস্ময়কর অনিবার্য তাঁহার আকর্ষণ,—লোকের উপর তাঁহার প্রভাব কত সূক্ষ্ম! তাঁহার লেখা বা বক্তৃতা পাঠ করিয়া মানুষটিকে বুঝিবার উপায় নাই; লোকে যাহা ধারণা করে, তাহাপেক্ষাও তাঁহার ব্যক্তিত্ব অনেক বড়। তিনি ভারতের কি বিপুল সেবা করিয়াছেন! তিনি জনসাধারণের মধ্যে সাহস ও মনুষ্যত্ব সঞ্চার করিয়াছেন, শৃঙ্খলা ও সহ্যশক্তি শিখাইয়াছেন, স্বয়ং অতি বিনয়ী হইয়াও তাহাদিগকে গর্ব ও আনন্দের সহিত আত্মত্যাগ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলেন, সাহসই চরিত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি, সাহস ব্যতীত নীতি, ধর্ম, প্রেম কিছু থাকিতে পারে না। “যে ব্যক্তি ভয়াতুর, সে কখনও সত্য ও প্রেমের পথের পথিক হইতে পারে না।” হিংসা সম্পর্কে তাঁহার আতঙ্ক থাকিলেও তিনি আমাদের বলিয়াছেন, “কাপুরুষতা, হিংসা অপেক্ষাও ঘৃণার্হ।” যে ব্যক্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলে সে কর্মের রহস্য বুঝিয়াছে। আত্মত্যাগ, শৃঙ্খলা এবং আত্মসংযম ব্যতীত মুক্তি নাই, কোন আশা নাই। শৃঙ্খলাহীন আত্মোৎসর্গ নিষ্ফল।” এগুলি কেবল কথার কথা, সাধু বাক্য এবং অনেকটা দুর্বোধ্য বলে বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু এই সকল কথার পশ্চাতে শক্তি আছে, কেন না ভারতবর্ষ জানে এই ক্ষীণকায় মানুষটির বাক্যানুযায়ী কাজ করিবার সামর্থ্য আছে।

তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপেই আসিয়াছেন। এই প্রাচীন ও বিজিত

দেশের মর্মকথা তিনি আশ্চর্যর্পে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যেন ভারতের মূর্ত বিগ্রহ, এমন কি তাঁহার দুর্বলতাগুলিও ভারতীয় দুর্বলতা। তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা কদাচিৎ ব্যক্তিগত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা যেন জাতির অপমান; বড়লাট ও অন্যান্য অনেকে যখন তাঁহার প্রতি অহমিকাপূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে কী বিপজ্জনক বীজ তাঁহারা বপন করিতেছেন; ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে গোলটেবিল হইতে ফিরিবার পথে গান্ধিজী রোমে পোপের সহিত সাক্ষাৎকামনা করিলে তিনি অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, এই সংবাদ প্রথম শুনিয়া আমি যে কি মর্মাহত হইয়াছিলাম, তাহা এখনও ভুলি নাই। এই অস্বীকৃতি আমার নিকট ভারতের অপমান বলিয়াই মনে হইয়াছিল; তিনি ইচ্ছা করিয়াই দেখা করেন নাই তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে অপমানের কথা হয়ত ভাবিয়া দেখেন নাই। ক্যাথলিক চার্চ তাহার বাহিরে সাধু বা মোহান্ত থাকিতে পারে, ইহা মানেন না এবং যেহেতু কোন কোন প্রোটেস্টান্ট চার্চপন্থী গান্ধিজীকে ধর্মজগতের মহাপুরুষ এবং প্রকৃত খৃষ্টান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সেইজন্যই পোপ ঐ ধর্মবিরুদ্ধ পাপ হইতে দূরে থাকিবার অধিকতর প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন।

ঠিক এই সময় আলীপুর জেলে ১৯৩৪-এর এপ্রিল মাসে বার্ণাড শ'-এর কয়েকখানি নূতন নাটক পড়িয়াছিলাম। "অন দি রক্স"-এর ভূমিকায় যীশুখৃষ্ট ও পাইলেটের কথোপকথন পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। ইহার মধ্যে যেন আধুনিক অর্থও নিহিত রহিয়াছে, কেন না আর একটি সাম্রাজ্য আর একটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সম্মুখীন হইয়াছে। এই ভূমিকায় যীশু পাইলেটকে বলিতেছেন,—"আমি বলিতেছি, তুমি ভয় ত্যাগ কর। রোমের মহত্ত্ব লইয়া তুমি আমার নিকট বৃথা বাগাড়ম্বর করিও না। তুমি যাহাকে রোমের গৌরব বলিতেছ, তাহা ভয় ছাড়া আর কিছুই নয়, অতীতের ভয় এবং ভবিষ্যতের ভয়, দরিদ্রের জন্য ভয়, ধনীর জন্য ভয়, পুরোহিতের জন্য ভয়, শিক্ষিত বুদ্ধিমান ইহুদী ও গ্রীকদের ভয়, বর্বর গল, গথ ও হূনদের ভয়। কার্থেজের ভয় হইতে তোমরা পরিত্রাণ পাইবার জন্য উহা ধ্বংস করিয়াছ এবং তদপেক্ষাও অপকৃষ্ট ভয়ে তোমরা স্বহস্তে যে বিগ্রহ গড়িয়াছ সেই সাম্রাজ্যগর্বী সিজারের ভয়ে ভীত এবং উপহাসিত, নির্যাতিত কপর্দকহীন গৃহহারা আমার ভয়েও তোমরা ভীত; এক ঈশ্বরের নিয়ম ছাড়া তোমাদের সকল বস্তুকেই ভয়। স্বর্ণ, লৌহ ও রক্ত ছাড়া তোমাদের কিছুতেই বিশ্বাস নাই। তোমরা যাহারা রোমের সমর্থক, তাহারা সকলেই কাপুরুষ, আর আমি ঈশ্বরের রাজ্য চাহিয়াছি, সাহসের সহিত সব কিছুর সম্মুখীন হইয়াছি, সর্বস্ব হারাইয়াছি এবং এক চিরস্থায়ী মুকুট লাভ করিয়াছি।"

কিন্তু গান্ধিজীর মহত্ত্ব, তাঁহার দেশসেবা অথবা আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিকট কত ঋণী, প্রশ্ন তাহা নহে। ইহা সত্ত্বেও, অনেক ব্যাপারে তিনি মারাত্মক ভ্রম করিতে পারেন। যাহাই হউক, তাঁহার উদ্দেশ্য কি? বহু বর্ষ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াও তাঁহার উদ্দেশ্য আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি নাই। আমার সন্দেহ হয়, তাঁহার নিজেরও ধারণা স্পষ্ট কিনা? তিনি বলেন, আমার পক্ষে একপদ অগ্রসর হওয়াই যথেষ্ট, তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না অথবা কোন সুনির্দিষ্ট পরিণতি স্থির করেন না। তোমরা উপায়ের উপর দৃষ্টি রাখ, উদ্দেশ্য আপনা হইতেই সিদ্ধ হইবে, একথা পুনঃ পুনঃ বলিতে তিনি ক্লান্ত হন না। তুমি তোমার ব্যক্তিগত জীবনকে ভাল করিয়া তোল, আর সব আপনা হইতেই হইবে। ইহা রাজনৈতিক অথবা বৈজ্ঞানিক মনোভাব নহে কিম্বা সম্ভবতঃ নৈতিক মনোভাবও নহে। ইহা অতি সঙ্কীর্ণ নীতিবাদীর কথা এবং ইহাতে একটি

প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। সাধুতা কি? ইহা কি কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার, না, সামাজিক ব্যাপার? গান্ধিজী চরিত্রের উপরই বেশী জোর দেন, বুদ্ধির উৎকর্ষ-সাধন ও পরিপুষ্টিকে মোটেই কোন গুরুত্ব দেন না। চরিত্র ব্যতীত বুদ্ধি বিপজ্জনক হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিকে বাদ দিলে চরিত্রের মূল্য কি? কি ভাবে চরিত্র গড়িয়া উঠে? গান্ধিজীকে মধ্যযুগীয় খৃষ্টান সাধুদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; তাঁহার অনেক কথা উহার সহিত মিলিয়া যায়। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা ও উপায়ের সহিত উহা সামঞ্জস্যহীন।

ইহা যাহাই হউক, উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা আমার নিকট অতি শোচনীয়। প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করা কর্তব্য। জীবন ন্যায়শাস্ত্রের সূত্র নহে, মধ্যে মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য লক্ষ্যের পরিবর্তন করিতে হইবে, কিন্তু সব সময়েই চক্ষুর সম্মুখে একটা লক্ষ্য স্থাপন করিতে হইবেই।

আমার ধারণা এবং সময় সময় মনে হয়, গান্ধিজী উদ্দেশ্য সম্পর্কে ততটা অস্পষ্ট নহেন। তিনি আবেগের সহিত একটা বিশেষ পথে চলিতে চাহেন, কিন্তু তাহার সহিত আধুনিক ভাব বা অবস্থার সম্পূর্ণ অনৈক্য আছে এবং আজ পর্যন্ত তিনি এ দুই-এর সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন নাই অথবা তাঁহার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার আশু উপায়গুলি সমগ্রভাবে নির্দেশ করিতে পারেন নাই। এই কারণেই অস্পষ্টতা থাকে এবং তিনি স্পষ্টতা এড়াইয়া চলেন। যখন হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি তাঁহার দার্শনিক তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার পর হইতে পঁচিশ বৎসর কাল তাঁহার মনের গতি কোন্ দিকে তাহা অতিশয় স্পষ্ট। আমি জানি না তাঁহার প্রথম দিকের রচনাগুলির সহিত এখনও তাঁহার মতের মিল আছে কিনা। সন্দেহ হয়, হয়ত সমগ্রভাবে উহা তাঁহার আধুনিক মত নহে। কিন্তু উহা হইতে তাঁহার চিন্তার পটভূমিকা আমরা বুঝিতে পারি।

১৯০৯ সালে তিনি লিখিয়াছেন, "ভারত যদি মুক্তি চাহে তাহা হইলে গত পঞ্চাশ বৎসরে সে যাহা শিখিয়াছে তাহা ভুলিতে হইবে। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্, হাসপাতাল, উকীল, ডাক্তার এবং ঐ শ্রেণীর সমস্ত অবসান করিতে হইবে এবং তথাকথিত উচ্চশ্রেণীগুলিকে সচেতন ভাবে ধর্মানুরাগের সহিত কৃষকজীবনে অভ্যস্ত হইতে হইবে, জানিতে হইবে ঐ জীবনই প্রকৃত আনন্দের।" তিনি আরও লিখিয়াছেন,—"যতবার আমি রেলগাড়ীতে উঠি অথবা কোন মোটর বাস ব্যবহার করি, ততবারই মনে হয় আমি অন্তর্নিহিত সত্যের বিরুদ্ধে ব্যভিচার করিতেছি।" "অতিমাত্রায় কৃত্রিম দ্রুত যন্ত্রপাতির সাহায্যে জগতের সংস্কার চেষ্টা, অসাধ্য সাধনের চেষ্টা মাত্র।"

এই সকল মত ও পথ আমার নিকট ভুল ও অনিষ্টকর বলিয়াই মনে হয় এবং উহা কার্যে পরিণত করাও অসম্ভব। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে গান্ধিজীর দারিদ্র্য, দুঃখবরণ ও তপস্বী-জীবনের প্রতি অনুরাগ ও গৌরববোধ। তাঁহার মতে জনোন্নতি ও সভ্যতার অর্থ মানুষের অভাব বৃদ্ধি করাও নহে, জীবনযাত্রা প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন নহে; "পরন্তু দৃঢ়তার সহিত স্বেচ্ছায় অভাব কমাইতে হইবে, উহাই সুখ ও সন্তোষের পথ এবং সেবার শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে।" এই সকল পূর্ব-সিদ্ধান্ত একবার স্বীকার করিয়া লইলে গান্ধিজীর অন্যান্য চিন্তার অনুসরণ করা সহজ হইয়া উঠে এবং তাঁহার কর্ম-প্রণালীও বুঝিবার অধিকতর সুবিধা হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ঐ সকল পূর্ব-সিদ্ধান্ত মানিয়া লই না এবং তথাপি যখন দেখি যে তাঁহার কর্মপ্রণালী আমাদের

মনোমত নহে, তখন অভিযোগ করিতে থাকি।

দারিদ্র্য ও দ্ঃখভোগের প্রশংসা করা ব্যক্তিগতভাবে আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি উহা কাম্য বলিয়া কখনই মনে করি না। আমার মতে উহা বিল্প্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ভাল হইলেও, সামাজিক আদর্শ হিসাবে তপস্বী-জীবনের সার্থকতা আমি ব্ঝি না। আমি সারল্য, সাম্য, আত্মসংযমের ম্ল্য ও মর্যাদা ব্ঝি, কিন্তু দেহকে পীড়ন করিবার অর্থ ব্ঝি না। ব্যায়ামবীর যে ভাবে নিয়মের সহিত দেহ গড়িয়া তোলে, সেইভাবে আমি বিশ্বাস করি, মন ও অভ্যাসও নিয়ন্ত্রিত করিয়া আয়ত্তের মধ্যে আনিতে হয়। যে ব্যক্তি অতি মাত্রায় অসংযমী, সে সঙ্কটের সময়ে দ্ঃখ সহ্য করিবে কিম্বা অসাধারণ আত্ম-সংযম দেখাইবে অথবা বীরের মত ব্যবহার করিবে, ইহা অবিশ্বাস্য। শরীর ভাল করিতে হইলে যের্প নিয়ম পালন আবশ্যক, চরিত্র ভাল করিতে হইলেও সেইর্প নিয়ম আবশ্যক। কিন্তু তাহা যে তপস্বী-জীবন বা আত্মপীড়ন হইবে, এমন কোন অর্থ নাই।

সরল 'কৃষক-জীবন'কে আদর্শ করিয়া তোলার মর্মও আমি ব্ঝিতে পারি না। আমার উহা দেখিলে আতঙ্ক হয়, আমি কৃষকদিগকেই ঐ জীবন হইতে টানিয়া তুলিতে চাহি, আমি পল্লীকে সহর করিতে চাহি না, তবে সহরের স্খ স্বিধা ও সংস্কৃতি পল্লী অঞ্চলে লইয়া যাইতে চাহি। ঐ জীবন হইতে আমি প্রকৃত আনন্দ তো পাইবই না বরং আমার নিকট উহা কারাদণ্ডের মতই মনে হইবে। 'কোদাল হাতে মান্ষকে আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে রমণীয় করিয়া তুলিবার কি আছে? বহ্-কাল বংশপরম্পরায় শোষিত ও নির্যাতিত হইয়া তাহাদের সহচর পশ্ হইতে তাহাদের পার্থক্য বড় বেশী নাই।

"কে তাহাকে আনন্দবঞ্চিত ও তাহার স্কুমার বৃত্তিগ্লি হত্যা করিয়াছে। সে জড় বস্তুর মত শোকহীন, কখনও কিছ্ কামনা করে না, কে তাহাকে নির্বোধ ও বিম্ঢ় এবং বলীবর্দের ভ্রাতাস্বর্প করিয়া তুলিয়াছে?"

মান্ষের মন আধ্নিক সংস্কারম্ক্ত হইয়া আদিম অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে, আমার নিকট তাহা সম্প্র্ণ দ্বোধ্য। যাহা মান্ষের গৌরব ও জয়লব্ধ সম্পদ তাহারই নিন্দা করিতে হইবে, তাহার প্রতি নির্ৎসাহ প্রদর্শন করিতে হইবে এবং মনের পক্ষে অবসাদকর ও বিকাশের অবসরহীন এক বাহ্যব্যবস্থা আকাঙ্ক্ষার বলিয়া ভাবিতে হইবে। বর্তমান সভ্যতার অনেক দোষ আছে, আবার ইহার মধ্যে অনেক ভালও আছে এবং মন্দগ্লিকে অতিক্রম করিবার মত শক্তিও ইহার মধ্যে আছে। ইহাকে সম্লে ধ্বংস করিয়া ফেলিলে প্নরায় বিরস, নিরানন্দ একঘেয়ে অস্তিত্ব বহন করার অবস্থা আসিবে। যদি আধ্নিক সভ্যতাকে বর্জন করাই স্থির হয়, তাহা হইলেও তাহা এক অসম্ভব চেষ্টা মাত্র। এই পরিবর্তনের স্রোতধারা র্দ্ধ করা বা ইহা হইতে সরিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন এবং মানসিক অবস্থার দিক দিয়া আমরা যাহারা জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়াছি, তাহাদের পক্ষে উহা একেবারে ভুলিয়া দিয়া আদিম অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব।

এ বিষয় লইয়া আলোচনা করা কঠিন, কেন না দ্ইটি দৃষ্টিভঙ্গী সম্প্র্ণ স্বতন্ত্র। গান্ধিজী সর্বদাই ব্যক্তিগত ম্ক্তি ও পাপের দিক হইতে চিন্তা করেন এবং আমরা অধিকাংশই সামাজিক কল্যাণের দিক হইতে চিন্তা করিয়া থাকি। পাপবোধ ব্যাপারটা আমার পক্ষে ব্ঝা কঠিন এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই আমি গান্ধিজীর সাধারণ-দৃষ্টিভঙ্গী ব্ঝিতে পারি না। সমাজ অথবা সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তিনি ব্যক্তির জীবন হইতে পাপ উন্ম্লিত করিতে

চাহেন। তিনি লিখিয়াছেন, "স্বদেশীয় অনুগামিগণ কখনই জগতের সংস্কার করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করেন না, কেন না তাঁহাদের বিশ্বাস ঈশ্বর-নির্দিষ্ট নিয়মে জগৎ চলিতেছে এবং সর্বদাই চলিবে।" অথচ তিনি নিজে জগৎকে সংস্কার করিতে সততই সচেষ্ট। কিন্তু যে সংস্কার তাঁহার লক্ষ্য তাহা ব্যক্তির চরিত্র সংশোধন—ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং ভোগাকাঙ্ক্ষা জয় করা, কেন না উহা পাপ। একজন রোমান ক্যাথলিক লেখক ফাসিজম্ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া, স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনি তাহার সহিত একমত হইবেন। "পাপের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ছাড়া স্বাধীনতা আর কিছু নহে।" আর ঠিক এই ক[illegible] দুইশত বৎসর পূর্বে লণ্ডনের বিশপ লিখিয়াছিলেন, "খৃষ্টধর্ম যে স্বাধী[illegible] [illegible]য়, তাহা পাপ ও শয়তানের বন্ধন হইতে মুক্তি, মানুষের লালসা, রিপু ও অ[illegible]গত কামনা হইতে মুক্তি।*

এই মত যদি কেহ মানিয়া লয়, সে যৌন ব্যাপার সম্পর্কে গান্ধিজীর মনোভাব কিছু বুঝিতে পারিবে, আধুনিক সাধারণ লোকের নিকট তাহা যতই অসাধারণ বলিয়া মনে হউক না কেন। তাঁহার মতে "সন্তান কামনাহীন মিলন মাত্রেই পাপ।" এবং "কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ক্লৈব্য ও স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দিবে।" "কৃতকর্মের পরিণাম হইতে ত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা অন্যায় ও দুর্নীতিমূলক।...কাহারও পক্ষে রিপুর ক্ষুধাতৃপ্তির পরিণাম এড়াইবার জন্য বলকারক বা অন্যান্য ঔষধ সেবন অন্যায়। স্বীয় পাশবিক রিপু চরিতার্থ করিয়া তাহার পরিণাম ফল হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা আরও শোচনীয়।"

ব্যক্তিগত ভাবে এই মনোভাব আমার নিকট অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। যদি তাঁহার কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে আমি একজন অপরাধী এবং ক্লৈব্য ও স্নায়বিক দৌর্বল্যের সীমারেখায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। রোমান ক্যাথলিকেরাও অবশ্য জন্মনিয়ন্ত্রণের তীব্র বিরোধিতা করেন, কিন্তু তাঁহারা গান্ধিজীর মত তাঁহাদের যুক্তিজাল লইয়া ততটা অগ্রসর হন নাই। তাহারা কালের গতি বুঝিয়া তাঁহাদের ধারণানুযায়ী মনুষ্য-স্বভাবের সহিত আপোষ করিয়াছেন।†
কিন্তু গান্ধিজী তাঁহার যুক্তিজাল একেবারে চরমসীমায় লইয়া গিয়াছেন, পুত্র উৎপাদনের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে কোন প্রকার যৌন-মিলনের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন না। নরনারীর স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণও তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলিয়াছেন, "আমি যে নরনারীর মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ স্বীকার করি না, ইহাকে অনেকে অসম্ভব আদর্শ বলিয়াছেন। এ স্থলে উল্লিখিত যৌন-মিলনাকাঙ্ক্ষাকে স্বাভাবিক বলিয়া লোকে বিবেচনা করিবে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমরা যেন ধ্বংস হইয়া যাই। নরনারীর মধ্যে স্বাভাবিক অনুরাগ হইল, ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর, মাতার প্রতি পুত্রের, পিতার প্রতি কন্যার অনুরাগ। এই স্বাভাবিক আকর্ষণই জগৎকে রক্ষা করিতেছে।" তিনি আরও জোরের সহিত বলিয়াছেন,—"না, আমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া ঘোষণা করিব যে যৌন আকর্ষণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হইলেও

---

* "স্বর্গ কি?" এই অধ্যায়ে এই [illegible] হইতে [illegible] উদ্ধৃত হইয়াছে।

† পোপ একাদশ পায়াস, ১৯৩১-এর ৩১শে ডিসেম্বর "খৃষ্টীয়-বিবাহ" সম্পর্কে তাঁহার ঘোষণায় বলিয়াছেন, [illegible] হইতে পারে।

তাহা অস্বাভাবিক।”

এই 'ইডিপাস কমপ্লেক্স', ফ্রয়েড এবং মনোবিকলন তত্ত্বের ছড়াছড়ির যুগে এই সকল অতি-সাহসিক উক্তি অত্যন্ত আশ্চর্য ও সেকেলে শুনায়। লোকে ইহা হয় নির্বিচারে বিশ্বাস করিবে, নয়, অগ্রাহ্য করিবে। আমি গান্ধিজীর এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল মনে করি। তাঁহার উপদেশ ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কাজে লাগিতে পারে। কিন্তু সকলের জন্যই এই বিধান দিলে জীবনে ব্যর্থতার বেদনা, ইন্দ্রিয়দমনজনিত আক্ষেপ ও স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং নানা শ্রেণীর দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি দেখা দিবে। কামরিপু সংযত করা অবশ্যই ভাল, কিন্তু গান্ধিজীর পন্থা অনুসরণ করিলে ব্যাপকভাবে ঐ ফল লাভ হইবে কিনা সন্দেহ। ইহা একেবারে চরম মত, অধিকাংশ লোক উহা সাধ্যাতীত মনে করিয়া সাধারণভাবে চলিতে থাকিবে অথবা স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কলহ হইবে। দেখা যাইতেছে গান্ধিজী মনে করেন, জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় অবলম্বন করিলে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইবে এবং নর ও নারীর মধ্যে যৌন আকর্ষণ স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন পুরুষ যে কোন নারীর পশ্চাতে এবং নারী যে কোন পুরুষের পশ্চাতে ধাবিত হইবে, ইহার কোন অনুমানই যুক্তিসঙ্গত নহে এবং আমি বুঝিতে পারি না, যৌনসমস্যা তাঁহার মনকে এমন ভাবে অধিকার করিয়া বসিল কেন। অবশ্য বিষয়টি গুরুতর সন্দেহ নাই। তাঁহার নিকট ইহা 'কাল অথবা সাদার' সমস্যা; তিনি মাঝামাঝি কোন বর্ণ মানেন না। দুই প্রান্তেই তাঁহার মতবাদ চরম, আমার নিকট ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। আজকাল যৌন ব্যাপার সম্পর্কিত পুস্তকের যে বন্যা আসিয়াছে, সম্ভবতঃ ইহা তাহারই প্রতিক্রিয়া। আমি একজন স্বাভাবিক মানুষ, আমার জীবনেও ইন্দ্রিয় তাহার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে, কিন্তু ইহা আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই অথবা অন্যান্য কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। ইহা গৌণ ব্যাপার মাত্র।

যে সকল তপস্বী জগৎ ও জাগতিক ব্যাপার বর্জন করিয়াছেন, জীবনের স্বাভাবিক গতিকে অন্যায় মনে করিয়া বর্জন করিয়াছেন, তাঁহার মনোভাব অনেকটা সেইরূপ। একজন তপস্বীর পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু সাধারণ নরনারী যাহারা জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ করিয়া উহা যথাসম্ভব ভোগ করিতে চাহে, তাহাদের জীবনে ঐ নীতি প্রয়োগ করা কষ্টকল্পনা মাত্র এবং একটি অন্যায়কে ঠেকাইতে গিয়া, সে অন্যান্য অনেক গুরুতর অন্যায় সহ্য করে।

কথায় কথায় আমি বিষয়ান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু আলীপুর জেলের দুঃখময় দিনগুলিতে এই সকল ভাব ও কথা আমার মনে বিশৃঙ্খল সামঞ্জস্যহীন ভাবে উদিত হইত, সমস্ত কথা জট পাকাইয়া আমাকে বিহ্বল ও অবসন্ন করিয়া তুলিত। সর্বোপরি নিঃসঙ্গতা ও বিষাদ, আমার জনহীন ক্ষুদ্র সেল ও জেলের অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় মর্মান্তিক হইয়া উঠিত। বাহিরে থাকিলে ইহা আমার মনে এতটা আঘাত করিত না, আমি সহজেই উহা ভুলিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম এবং মনের কথা বলিয়া ও কাজ করিয়া আরাম পাইতাম। কিন্তু জেলের মধ্যে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নাই; কতকগুলি দিন আমাকে দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমার মন শান্ত হইয়া আসিল এবং নৈরাশ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। আমি মনের অবসাদ কাটাইয়া উঠিলাম এবং তখন জেলে কমলার সহিত একবার সাক্ষাৎ হইল। ইহাতে আমি অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলাম, আমার নিঃসঙ্গভাব দূর হইল। যাহাই ঘটুক, আমরা দুইজন অন্ততঃ পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে পারিব।

৬২

স্ববিরোধিতা

যে সকল লোক কখনও গান্ধিজীকে দেখেন নাই, কেবল তাঁহার লেখা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনে হইতে পারে, তিনি একজন পাদ্রী-শ্রেণীর লোক, অতি-মাত্রায় পবিত্রতাবাদী, গম্ভীরবদন, নিরানন্দ, একপ্রকার "কৃষ্ণবাস পরিহিত খৃষ্টান সাধুদের মত তিনি বিচরণ করিয়া থাকেন।" কিন্তু তাঁহার লেখা পড়িয়া তাঁহাকে ধারণা করিতে গেলে অবিচার করা হয়, তাঁহার লেখা অপেক্ষা তিনি অনেক বড়, তাঁহার কোন লিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সমালোচনা করা সঙ্গত ও শোভন নহে। তিনি খৃষ্টান সাধু পাদ্রীর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার স্মিতমুখ আনন্দ-দায়ক, তাঁহার হাস্যে যাদু আছে, তাঁহার কাছে বসিলে হৃদয় লঘু হইয়া যায়। তাঁহার শিশুর মত সারল্য সকলকে মুগ্ধ করে। তিনি যখন কোন কক্ষে প্রবেশ করেন তখন চারিদিক নির্মল ও স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে।

তাঁহার মধ্যে এক অনন্যসাধারণ স্ববিরোধিতা রহিয়াছে। আমার মনে হয়, প্রত্যেক বিখ্যাত ব্যক্তির মধ্যেই উহা অল্পবিস্তর থাকে। বহুবর্ষ আমি এই সমস্যা চিন্তা করিয়াছি যে, বঞ্চিত জনসাধারণের জন্য তাঁহার অসীম প্রেম ও ব্যাকুলতা সত্ত্বেও তিনি এমন এক ব্যবস্থা সমর্থন করেন যাহা অপরিহার্যরূপেই জন-সাধারণকে বঞ্চিত ও পীড়িত করে, অহিংসার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন এমন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সমর্থন করেন, যাহা সম্পূর্ণরূপে হিংসা ও পরপীড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত? সম্ভবতঃ তিনি ঐ শ্রেণীর ব্যবস্থা সমর্থন করেন, একথা বলা সঙ্গত হইবে না; তিনি অল্পবিস্তর একজন দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী। কিন্তু আদর্শ নৈরাজ্যবাদীর অবস্থা এখনও বহুদূরে, উহা সহজে প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে, কাজেই তিনি প্রচলিত ব্যবস্থা মানিয়া লন। তাঁহার নিকট আপত্তিজনক উপায়গুলির বিষয় আমি চিন্তা করিতেছি না, কেন না, হিংসামূলক উপায়ে পরিবর্তন সাধনের তিনি সর্বদাই বিরোধী। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইবে, সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, এক আদর্শ উদ্দেশ্য অবধারণ করা যাইতে পারে, যাহা অদূর ভবিষ্যতেই সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর।

সময় সময় তিনি নিজেকে 'সমাজতান্ত্রিক' বলেন, কিন্তু তিনি যে অর্থে ঐ শব্দটি ব্যবহার করেন তাহা তাঁহার নিজস্ব, তাহার সহিত সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে যাহা বুঝায়, সেই অর্থনৈতিক সমাজবিন্যাসের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া একদল বিখ্যাত কংগ্রেসপন্থীও ঐ শব্দটি ব্যবহার করেন, যাহার অর্থ এক প্রকার ভ্রান্ত মানবতাবাদ। এই অস্পষ্ট রাজনৈতিক নামটি যাঁহারা ব্যবহার করিয়া ভুল করেন, তাঁহাদের দলে অনেক গণতন্ত্রবাদীও আছেন, এবং তাঁহারা ব্রিটিশ ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।* আমি জানি গান্ধিজী এ বিষয়ে অজ্ঞ নহেন, তিনি অর্থনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক,

---

* ১৯০৫-এর জানুয়ারী মাসে [illegible] ইউনিয়নিস্ট [illegible] বিষয়ে এক বাণী দিতে গিয়া [illegible] লিখিয়াছিলেন,—[illegible] পূর্ণতা ও [illegible] হওয়া [illegible]। [illegible] এবং [illegible] এবং [illegible] আমার [illegible]।"

এমন কি, মার্কসীয় অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং উহা লইয়া অপরের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমি অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝিতেছি যে, কোন প্রধান ব্যাপারে মনের সম্মতির বিশেষ কোন মূল্য নাই। উইলিয়ম জেমস্ বলিয়াছেন, "যদি তোমার হৃদয় সায় না দেয় তাহা হইলে তোমার মস্তিষ্ক তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাইতে পারিবে না।" ভাবাবেগই আমাদের সাধারণ বিচার-বিবেচনা নিয়ন্ত্রিত করে এবং মনকে আয়ত্তের মধ্যে রাখে। সোপেনহাওয়ার বলিয়াছেন, "মানুষ যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু মানুষ কি ইচ্ছা করিবে, তাহা ইচ্ছামত স্থির করিতে পারে না।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম দিকে গান্ধিজী এক মহান দীক্ষা গ্রহণ করেন, এই পরিবর্তনে তাঁহার সমগ্র জীবনই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতেই তাঁহার সমস্ত ভাবের পশ্চাতে এই দৃঢ় স্থিরভূমি রহিয়াছে, যে কারণে তাঁহার মন নূতন কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। কেহ তাঁহার নিকট কোন নূতন প্রস্তাব করিলে তিনি অতিশয় ধৈর্য ও মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত সৌজন্যের মধ্যেও লোকে সহজেই বুঝিতে পারে যে সে বন্ধ দরজায় করাঘাত করিতেছে। তাঁহার ধারণাগুলি এতই বদ্ধমূল যে, অন্যান্য বিষয় তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, অন্যান্য গৌণ ব্যাপারের উপর জোর দিলে, বৃহত্তর পরিকল্পনা বিকৃত ও মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। মূল বিষয়টি ঠিক থাকিলেই অন্যান্য বিষয়ের যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান হইবে। যদি উপায় অভ্রান্ত হয়, ফলও অভ্রান্ত হইবেই।

আমার ধারণা ইহাই তাঁহার মনের প্রধান পটভূমিকা। হিংসার সহিত সম্পর্ক আছে বলিয়া তিনি সমাজতন্ত্রবাদকে—বিশেষভাবে মার্কসীয় মতবাদকে—সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। 'শ্রেণীসংগ্রাম' এই শব্দটাই তাঁহার নিকট হিংসা ও সংঘর্ষরূপে প্রতিভাত হয় এবং সেই কারণেই উহা তাঁহার নিকট বিরক্তিকর। তিনি জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা সাদাসিধা একটা নির্দিষ্ট হারের ঊর্ধ্বে উঠুক ইহা পছন্দ করেন না, কেন না বেশী প্রাচুর্য ঘটিলে বিলাসিতা ও পাপ বৃদ্ধি পাইবে। মুষ্টিমেয় ধনীরা যে বিলাস সম্ভোগ করে তাহাই অতি মন্দ, তাহার উপর তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে ফল শোচনীয় হইয়া পড়িবে। ১৯২৬ সালে তাঁহার লিখিত একখানি পত্র হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কয়লার খনির মজুরদের ধর্মঘটের সময় ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত একখানি পত্রের উত্তরে তিনি উহা লেখেন। পত্রলেখক এই যুক্তি দিয়াছিলেন যে, অত্যন্ত অধিকসংখ্যক বলিয়াই খনি-মজুরেরা হারিয়া যাইবে, অতএব জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাহাদের সংখ্যা কমান উচিত। উত্তর দিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ গান্ধিজী বলিয়াছিলেন, "শেষকথা এই, যদি খনির মালিকেরা অন্যায়কারী হইয়াও জয়লাভ করে, তাহার কারণ মজুরদের সন্তানসন্ততির সংখ্যা অধিক বলিয়া নহে, তাহার কারণ মজুরেরা এ পর্যন্ত সংযম শিক্ষা করে নাই। যদি শ্রমিকদের সন্তানসন্ততি না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা অবস্থার উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই করিত না, বেতন বৃদ্ধিরও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিত না। তাহারা কি মদ্যপান, জুয়াখেলা ও ধূমপান করে? খনির মালিকেরাও উহা করে অথচ স্বচ্ছন্দে আছে এই কথা কি উহার উত্তর হইবে? যদি ধনীদের অপেক্ষা খনির মজুরদের চরিত্র ভাল না হয়, তাহা হইলে জগতের সহানুভূতি দাবী করিবার তাহাদের কি অধিকার আছে? আমরা কি ধনীর সংখ্যা বাড়াইয়া ধনতন্ত্রকে শক্তিশালী করিব? ধনতন্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে জগৎ ভাল হইবে, এই আশ্বাসে আমরা ধনতন্ত্রের উপাসনা

করিতেছি। ধনী ও ধনতন্ত্রকে আমরা যে সকল অন্যায়ের জন্য দায়ী করিয়া থাকি, আমরা যেন ব্যাপকভাবে তাহা বৃদ্ধি না করি।"*

এই পত্র পড়িবার সময় আমার মানসপটে সেই ইংরাজ খনি-মজুর ও তাহাদের স্ত্রীপুত্রের ক্ষুধিত শুষ্ক মুখগুলি ভাসিয়া উঠিল। ১৯২৬ সালের গ্রীষ্মকালে আমি দেখিয়া আসিয়াছি, এক পীড়নমূলক পাশবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কি নৈরাশ্য লইয়া তাহারা এক বেদনাবহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে! গান্ধিজীর প্রদত্ত বিবরণ ঠিক নহে। মজুরেরা বেতনবৃদ্ধি চাহে নাই, তাহাদের বেতন কমাইয়া দেওয়ার প্রতিবাদের পরে, খনির মালিকেরা খনি বন্ধ করার ফলেই তাহারা সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমাদের আলোচনার সহিত এখন এবিষয়ের সম্বন্ধ নাই। মজুরদের জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, এ প্রশ্নও আমাদের আলোচ্য নহে। তবে কারখানার মালিক-মজুর-সংঘর্ষের প্রতিকারের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব অতি অভিনব! আমি গান্ধিজীর পত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, কেন না উহা হইতে আমাদের বুঝিবার সুবিধা হইবে যে, শ্রমিকদের ব্যাপারে এবং তাহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী উন্নত করার সাধারণ দাবী সম্পর্কে তিনি কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। গান্ধিজীর মনোভাব যেমন সমাজতন্ত্রবাদ হইতেও বহুদূরে, তেমনই ধনতন্ত্রবাদ হইতেও তাহার ব্যবধান তেমনই দূরবর্তী। বর্তমান জগতে যদি কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রতিবাদী না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান ও কলকারখানা-সহায়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহ দিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী বহুলাংশে উন্নত করা যাইতে পারে, এই সকল কথায় তাঁহার কোন আগ্রহ নাই, কেন না এক নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত কিছুর জন্য তিনি আগ্রহশীল নহেন। অতএব সমাজতন্ত্রবাদের সম্ভাবনার উপর তাঁহার কোন আগ্রহ নাই; ধনতন্ত্র অংশতঃ সহ্য করা যাইতে পারে, কেন না ইহা অন্যায়কে অনেক সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি দুই-ই অপছন্দ করেন, তবে তুলনায় কম অন্যায় বলিয়া শোষণটি সহ্য করেন, কেননা উহা রহিয়াছে এবং উহা তাঁহাকে মানিতেই হইবে।

. তাঁহার উপর এই সকল ভাব আরোপ করা সম্ভবতঃ আমার ভুল হইতে পারে। কিন্তু আমি গভীরভাবে অনুভব করি তাঁহার চিন্তাধারা ঐরূপ। তাঁহার উক্তির মধ্যে যে স্ববিরোধিতা ও বিভ্রান্তি দেখিয়া আমরা বিচলিত হই, তাহার কারণ তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দিক হইতে বিচার করেন। ক্রমবর্ধিত আরাম ও বিশ্রামের অবসরকে লোকে আদর্শ করিয়া তোলে ইহা তিনি চাহেন না; তাঁহার মতে লোকে নৈতিক জীবনের বিষয় চিন্তা করুক, তাহাদের কদভ্যাসগুলি বর্জন করুক, ভোগপ্রবৃত্তি দমন করুক এবং উহা দ্বারা নিজের আধ্যাত্মিকতা ও ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলুক। যাহারা জনসাধারণের সেবা করিবে, তাহারা আর্থিক উন্নতির চেষ্টার পরিবর্তে জনসাধারণের সমান স্তরে নামিয়া তাহাদের সহিত সমানভাবে মেলামেশা করিবে। এইভাবেই তাহারা জনসাধারণকে উন্নত করিতে পারে। তাঁহার মতে ইহাই প্রকৃত গণতন্ত্র। ১৯০৪-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি লিখিয়াছেন, "আমাকে ঠেকাইয়া রাখা সম্বন্ধে অনেকেই নিরাশ হইয়াছেন। আমার মত জন্ম হইতে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। দেশের সমাজের দরিদ্রতম ব্যক্তির সহিত এক হওয়া, তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জীবনযাপনে আকাঙ্ক্ষাহীনতা এবং লোকের সাধ্যমত সমানভাবে তাহাদের স্তরে থাকিবার চেষ্টা দ্বারা যদি কেহ নিজেকে গণতান্ত্রিক বলিয়া দাবী করিতে পারে,

* গান্ধীজীর আত্মজীবনী ও টেন্ডুলকরের মহাত্মা গ্রন্থ হইতে এই পত্রখানি উদ্ধৃত।

তবে আমিও সেই দাবী করি।"

এই যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত আধুনিক গণতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক কেহই একমত হইবেন না; তবে অনেকেই স্বীকার করিবেন যে জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিলাসভূষণের আড়ম্বর দেখান, বিশাল জনসঙ্ঘ, তাহাদের অতি প্রয়োজনীয় বস্তুরও অভাব, তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য লইয়া জীবনযাপন অন্যায় ও নিন্দনীয়। কিন্তু প্রাচীন ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তিরা গান্ধিজীর উক্তির মধ্যে কিছু ঐক্য খুঁজিয়া পাইবেন, কেন না উভয়েরই অতীতের প্রতি অনুরাগ রহিয়াছে এবং তাঁহারা সর্বদাই অতীতকালের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া থাকেন। যাহা আছে, যাহা হইবে অপেক্ষা যাহা ছিল তাহাতেই তাঁহাদের চিন্তা অধিক আবদ্ধ। অতীতের প্রতি দৃষ্টি আর ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি এই দুই মানসিক অবস্থার জন্যই জগতে সর্বপ্রকার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দরিদ্র জনসাধারণ চিরদিনই আছে। সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে মুষ্টিমেয় ধনীব্যক্তি একটা প্রধান অংশ, ধনোৎপাদন-ব্যবস্থার জন্য ইহাদের আবশ্যক। এই কারণে নীতিবাদী সংস্কারক এবং কোমলপ্রাণ ব্যক্তিরা উহাদের মানিয়া লন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি ধনীদের কর্তব্যও স্মরণ করাইয়া দেন। তাঁহাদিগকে দরিদ্রদের অছিস্বরূপ হইতে হইবে। তাঁহারা দয়ালু ও দাতা হইবেন। প্রত্যেক ধর্মের বিধানে দান একটি মহৎ কর্ম। সামন্ত নৃপতি, বড় জমিদার এবং ধনী বণিকদিগকে অছিস্বরূপ ভাবিবার উপর গান্ধিজী সর্বদাই জোর দিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি পরম্পরাগত ধার্মিক ব্যক্তিদেরই অনুসরণ করেন। পোপ ঘোষণা করিয়াছেন, "ধনীরা নিজেদের ঈশ্বরের দাস এবং তাহাদের ধনের রক্ষক ও বিতরণ-কর্তা বলিয়া মনে করিবে। তাহাদের হাতেই স্বয়ং যীশুখৃষ্ট দরিদ্রের ভাগ্য অর্পণ করিয়াছেন।" সাধারণ হিন্দুধর্ম এবং ইসলাম এই ভাবেরই কথা বলে এবং সর্বদাই ধনীদের দান করিবার জন্য প্রেরণা দেয় এবং ধনীরাও তদনুসারে মন্দির মসজিদ ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া অথবা তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য হইতে কিছু তাম্র বা রৌপ্যখণ্ড দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া নিজেদের ধর্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সুখী হন।

সেকালের ধার্মিক মনোভাবের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, ১৮৯১ সালের মে মাসে পোপ ত্রয়োদশ লিওর ধর্মযাজকদের নিকট প্রেরিত ও প্রচারিত ঘোষণাপত্রে। নূতন কলকারখানার জন্য পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

"অতএব দুঃখভোগ ও সহ্য করা মানুষের বিধিলিপি। মানুষ যতই কেন চেষ্টা করুক না, এমন কোন শক্তি নাই, এমন কোন কৌশল নাই, যাহা মনুষ্যজীবন হইতে দুঃখ ও দুর্দিনের প্রতিবন্ধ দূর করিতে সাফল্য লাভ করিবে। যদি কেহ ভিন্নরূপ ভাণ করে—যাহারা মানুষকে দুঃখদৈন্যমুক্ত বিরতিহীন শান্তি ও চির আনন্দ উপভোগের লোভ দেখায়—তাহারা জনসাধারণকে প্রতারণা করে, ছলনা করে এবং তাহাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফলে মানুষের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে মাত্র। এই জগৎ যেরূপ, সেইভাবেই ইহাকে গ্রহণ করা ভাল এবং ইহার দুঃখদৈন্যের প্রতিকার আমাদিগকে অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।" এই 'অন্যত্র' সম্পর্কে তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"যে জীবন আসিবে অর্থাৎ অনন্ত জীবনকে বাদ দিয়া জাগতিক বস্তুগুলির মূল্য বা তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা যাইতে পারে না। প্রকৃতি আমাদিগকে যে মহাসত্য শিক্ষা দিয়াছে, তাহাই মহান খৃষ্টীয় মতবাদ এবং সেই ভিত্তির উপরই

ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান জীবন আমরা যখন শেষ করিব, তখনই আমাদের প্রকৃত জীবন আরম্ভ হইবে। এই জগতের নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী বস্তুর জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই, স্বর্গীয় ও অনন্ত সম্পদ লাভের জন্যই আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া এইখানে আমাদের নির্বাসিত করিয়াছেন, ইহা আমাদের প্রকৃত দেশ নহে। অর্থ ও অন্যান্য বস্তু যাহা মানুষ ভাল বলিয়া কামনা করে, আমরা তাহা প্রচুর পাইতে পারি অথবা আমরা তাহা কামনা করিতে পারি। কিন্তু অনন্ত আনন্দের তুলনায় উহা কিছুই নহে...।"

এই ধর্মভাব অতি প্রাচীনকাল হইতে জগতের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বর্তমান দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার ভরসা একমাত্র পরলোক। যদিও অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, অতীতে কেহ যাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই, মানুষের বাহ্য সম্পদ তদপেক্ষাও বহুগুণে বাড়িয়াছে, তথাপি প্রাচীন সংস্কারের বন্ধন রহিয়া গিয়াছে এবং এখনও একপ্রকার অনির্দিষ্ট ও অনির্দেশ্য আধ্যাত্মিক মূল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ক্যাথলিকগণ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন—এই কালকে অন্যান্য সকলে "অন্ধকার যুগ" বলিলেও—খৃষ্টধর্মের পক্ষে উহা 'সুবর্ণ-যুগ',—যখন সাধুরা সমাদৃত হইতেন, খৃষ্টান নৃপতি ও শাসকগণ ধর্মযুদ্ধে (ক্রুসেড্) প্রবৃত্ত হইতেন এবং গথিক গীর্জাসমূহ নির্মিত হইত। তাঁহাদের মতে ইহাই ছিল, "প্রকৃত খৃষ্টান গণতন্ত্রের যুগ—মধ্যযুগীয় সমবায় সাহায্য প্রথার (গিল্ড) উহা নিয়ন্ত্রিত হইত,—যাহা পূর্বেও ছিল না এবং আর হয় নাই।" মুসলমানগণ আগ্রহের সহিত অতীতের দিকে চাহিয়া প্রথমদিকের খলিফাগণ নিয়ন্ত্রিত "ইসলাম গণতন্ত্র" নিরীক্ষণ করেন এবং তাঁহাদের জয়গৌরব দেখিয়া বিস্মিত হন। হিন্দুরাও তেমনি বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রামরাজত্বের ধ্যানে বিভোর হন। তথাপি সমস্ত ইতিহাস একবাক্যে বলিতেছে যে, ঐ অতীতকালে অধিকাংশ লোক অতি দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করিত, খাদ্যের অভাব, জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভাবে পীড়িত হইত। উপরের দিকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জীবন লইয়া বিলাস করিতেন, তাঁহাদের সে অবসর ও উপায় ছিল, অন্যান্য সকলে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য দুর্নিবার প্রয়াস ছাড়া আর কি করিত, কল্পনা করা কঠিন। ক্ষুধিত ব্যক্তির পক্ষে সংস্কৃতিগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর নহে, তাহার সমস্ত চিন্তা খাদ্য এবং উহা প্রাপ্তির উপায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে।

এই যন্ত্রযুগের সহিত অনেক অন্যায় আসিয়াছে, তাহা আমরা খুব বড় করিয়াই দেখিতে পাই, কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে জগৎকে সমগ্রভাবে দেখিলে, অন্ততঃ যেখানে যন্ত্রসভ্যতা সর্বাধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে সেই অংশে দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে ইহা বাহ্যজীবন যাপনের সুখ সুবিধার একটা ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে, যাহার ফলে অধিকাংশ ব্যক্তির সংস্কৃতিগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পরাধীন দেশে ইহা দেখা যায় না, কেন না, যন্ত্র-বিজ্ঞান দ্বারা আমরা লাভবান হই নাই। আমরা কেবল উহা দ্বারা শোষিত হইয়াছি মাত্র, অনেক দিক দিয়া—এমন কি বাহ্য সম্পদের দিক দিয়াও—আমাদের অবস্থা অবনত হইয়া পড়িয়াছে এবং আমাদের শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষতি হইয়াছে আরও বেশী। তথাকথিত পাশ্চাত্য প্রভাব, আমাদের সমাজিকভাবে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়াছে এবং আমাদের সমাজ-নীতি সমন্বয় করার পরিবর্তে উহাকে অধিকতর তীব্র করিয়া তুলিয়াছে মাত্র।

ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য কিন্তু ইহা দ্বারা আমরা যেন বর্তমান জগৎকে ভুল

করিয়া না দেখি। বর্তমান অবস্থায় কি ধন ও পণ্যোৎপাদনের, কি সমগ্র সমাজের পক্ষে, ধনী ব্যক্তিদের আর প্রয়োজন নাই, তাহারা বাঞ্ছনীয়ও নহে। ইহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভার মাত্র এবং উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ। ধনীদের দয়ালু হইতে উপদেশ দেওয়া আর দরিদ্রদিগকে অদৃষ্ট-নির্ভর, সন্তোষের সহিত ভাগ্যকে গ্রহণ, সঞ্চয়ী এবং সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়ার ধর্মপ্রচারকগণের প্রাচীন ব্যবসায় বর্তমান যুগে একান্তই অর্থহীন। মানবসাধ্য উপায়ের সংখ্যা আজ বহুগুণে বাড়িয়াছে, মানুষ আজ সাহসের সহিত জাগতিক সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইয়া তাহা সমাধান করিতে পারে। অধিকাংশ ধনীই আজ সমাজদেহের পরগাছায় পরিণত হইয়াছে এবং এই পরবিত্তজীবী শ্রেণীর অস্তিত্ব কেবলমাত্র বাধা নহে, উহা মানুষের সর্ববিধ সম্পদের অতি বৃহৎ অপচয় মাত্র। এই শ্রেণী এবং যে ব্যবস্থায় এই শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তাহা কার্যতঃ ধনোৎপাদন ও কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়াছে এবং একদিকে অপরের শ্রমার্জিত বিত্তভোগী, অপরদিকে ক্ষুধিত বেকার সৃষ্টি করিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে গান্ধিজীও লিখিয়াছিলেন,—"ক্ষুধিত ও কর্মহীন ব্যক্তিরা ঈশ্বরের একমাত্র নির্দেশ মানিতে পারে যে কর্মের বিনিময়ে খাদ্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি। ঈশ্বর মানুষকে শ্রম করিয়া খাদ্য সংগ্রহের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কর্ম ব্যতীত আহার করে, সে চোর।"

আধুনিক যুগের জটিল সমস্যাগুলি বুঝিতে গিয়া, যখন এই সকল সমস্যার অস্তিত্বই ছিল না, সেই প্রাচীনযুগের উপায় বা নির্দিষ্ট নিয়ম যদি প্রয়োগ করি, অথবা সেকালের বাঁধাবচন আওড়াই, তাহা হইলে আমরা বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ হইব। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা, যাহা কেহ কেহ জগতের এক মূল ধারণা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহারও প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হইয়াছে। এককালে দাসগণ সম্পত্তির মধ্যে গণ্য ছিল, স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে তাহাই ভাবা হইত, নববধূকে প্রথম রজনী উপভোগের অধিকার সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীর ছিল, রাস্তা, মন্দির, খেয়াঘাট, সেতু, সাধারণের ব্যবহারের ব্যবস্থা, ভূমি ও আকাশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। পশুপক্ষী এখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রহিয়াছে, তবে অনেক দেশে আইন করিয়া এই অধিকার সংযত করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় ক্রমাগতই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়া থাকে। আজকাল সম্পত্তি ক্রমেই সূক্ষ্ম হইয়া উঠিতেছে, যথা—কোম্পানীর শেয়ার, বিবিধ ঋণপত্র প্রভৃতি। সম্পত্তি সম্পর্কে ধারণা যতই পরিবর্তিত হইতেছে, জনমতের চাপে ততই নূতন নূতন আইন দ্বারা সম্পত্তির মালিকের অবাধ অধিকার সঙ্কুচিত করা হইতেছে। নানাবিধ গুরু করভার স্থাপন করিয়া (যাহা বাজেয়াপ্তির নামান্তর মাত্র) ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা অংশ লইয়া জনহিতকর কার্যে ব্যয় করা হইতেছে। সর্বজনীন কল্যাণকেই ভিত্তি করিয়া সাধারণ ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে এবং স্বীয় সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করিতে গিয়াও কেহ সর্বজনীন কল্যাণবিরোধী কার্য করিতে পারে না। যাহাই হউক, অধিকাংশ ব্যক্তির অতীতকালে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, তাহারাই ছিল অপরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বর্তমান কালেও অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই সেরূপ কোন অধিকার আছে। কায়েমী স্বার্থ সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই শুনিতে পাই। বর্তমানে আর এক কায়েমী স্বার্থের কথা সকলকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, প্রত্যেক নরনারীর বাঁচিবার এবং শ্রম করিবার ও শ্রমার্জিত ফল ভোগ করিবার অধিকার আছে। সম্পত্তি ও মূলধন সম্পর্কে এই পরিবর্তিত ধারণার ফলেও ঐশ্বর্য যখন বিলুপ্ত হইতেছে না বরং বিস্তৃত হইতেছে, অল্পসংখ্যক লোকের হাতে গিয়া ঐশ্বর্য জমা হওয়ার ফলে তাহারা অন্যের উপর

প্রভুত্ব করিতেছে, তখন সমাজ উহা সমগ্রভাবে তাহার নিজের হাতে ফিরিয়া পাইতে চাহে।

গান্ধিজী চাহেন ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধন দ্বারা বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন। তিনি চাহেন, লোকে কদভ্যাস ও বিলাস ব্যসন ছাড়িয়া পবিত্র হউক। তিনি কামেন্দ্রিয় উপভোগ-বিরতি, মদ্যপান ও ধূমপান বর্জন প্রভৃতির উপর বিশেষ জোর দেন। এই সকল ব্যসনের মধ্যে তুলনায় কোনটা অধিক নিন্দনীয় তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে যে ব্যক্তিগত দিক হইতেই হউক, অথবা ব্যাপকভাবে সামাজিক দিক হইতেই হউক, ঐ সকল ব্যক্তিগত দুর্বলতা অপেক্ষা, লোভ, স্বার্থপরতা, সম্পত্তি অধিকার করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত লাভের আশায় পরস্পরের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর দয়াহীন প্রচেষ্টা, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমন ও শোষণ, জাতিতে জাতিতে ভয়াবহ যুদ্ধ কি অধিকতর ক্ষতিকারক নহে? অবশ্য তিনি এই সকল হিংসা ও অধঃপতনমূলক সংঘর্ষ ঘৃণা করেন। কিন্তু বর্তমান ধনলোলুপ সমাজের মধ্যেই কি উহার বীজ নিহিত নাই,—ইহার আইনই হইল প্রবল দুর্বলকে শোষণ করিবে এবং উহার উদ্দেশ্য সেই প্রাচীনকালের "যাহার ক্ষমতা আছে সে গ্রহণ করুক এবং যে পারে সে রক্ষা করুক"? বর্তমান কালের লাভ করিবার লোভই সংঘর্ষের প্রসূতি। বর্তমান ব্যবস্থাই মানুষের লুণ্ঠন-প্রবৃত্তিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া সর্ববিধ সুবিধা প্রদান করে; অবশ্য ইহা অনেক সৎ প্রবৃত্তিকেও উৎসাহ দেয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকেই ইহা অধিকতর উৎসাহিত করে। এখানে সাফল্য বলিতে বুঝায় অপরকে ভূপাতিত করিয়া সেই পরাজিত ক্রীতদাসদের উপর আরোহণ করা। যদি সমাজ ঐ সকল প্রবৃত্তি ও উচ্চাশাকে উৎসাহ দান করে, যদি উহা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে আকর্ষণ করে তাহা হইলে গান্ধিজী কি মনে করেন যে এই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাঁহার আদর্শ নীতিপরায়ণ মনুষ্য সম্ভব? গান্ধিজী সেবাবৃত্তিকে বিকশিত করিতে চাহেন, কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে তিনি উহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন, কিন্তু যতদিন সমাজ এই ধনলোলুপ সমাজে জয়ী ব্যক্তিদের আদর্শরূপে তুলিয়া ধরিবে এবং যতদিন ব্যক্তিগত লাভই মানুষের মুখ্য প্রবৃত্তি থাকিবে, ততদিন অধিকাংশ মানুষ এই পথেই চলিবে।

কিন্তু সমস্যা এখন আর নৈতিক বা নীতিশাস্ত্রঘটিত নহে। আজকার সমস্যা বাস্তব ও ঐকান্তিক, সমগ্র জগৎ ইহা লইয়া বিভ্রান্ত। মুক্তির একটা উপায় বাহির করিতেই হইবে। একটা কিছু ঘটিবে এই আশায় আমরা অপেক্ষা করিতে পারি না। অথবা কেবলমাত্র নেতিবাচক ভাব লইয়া ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র, কম্যুনিজম প্রভৃতির মন্দ দিকগুলির সমালোচনা করিয়া আমরা বাঁচিতে পারি না, কিম্বা এমন প্রত্যাশাও করা উচিত নহে যে প্রাচীন ও নূতন সর্ববিধ ব্যবস্থাগুলির কেবলমাত্র ভালগুলিকে লইয়া একটা সন্তোষজনক আপোষ হইতে এক সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হইবে। আমাদিগকে রোগ নির্ণয় করিতে হইবে, আরোগ্যের উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে, তদনুসারে কার্য করিতে হইবে। আমরা পিছু হটিতে পারি, কিম্বা সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারি, কিন্তু কি জাতীয় কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা স্থির হইয়া একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না। সম্ভবতঃ এ বিষয়ে বিচার করিবার কিছুই নাই, কেন না পশ্চাদপসরণ করা আর সম্ভবপর নহে।

তথাপি গান্ধিজীর অনেক কার্যপদ্ধতি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন

যে তিনি একটা সীমাবন্ধ স্বয়ম্পূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহেন, তিনি কেবল জাতিকেই স্বয়ম্পূর্ণ দেখিতে চাহেন না, গ্রামকেও স্বয়ম্পূর্ণ করিতে চাহেন। আদিম যুগের মানব-সমাজে গ্রামগুলি স্বয়ম্পূর্ণ ছিল এবং অশন বসন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রামেই পাওয়া যাইত। এখানে প্রয়োজন বলিতে সর্বনিম্নস্তরের জীবনযাত্রা বুঝিতে হইবে। আমি মনে করি না যে গান্ধিজী স্থায়ীভাবে এই লক্ষ্যে কাজ করিতেছেন, কেন না, সে উদ্দেশ্য সাধন অসম্ভব। বর্তমানের বিশাল জনসঙ্ঘ কতকগুলি দেশে প্রাচীন পন্থায় জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইবে না এবং তাহারা অভাব ও ক্ষুধার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাহিবে না। আমি মনে করি, ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে যেখানে জীবনযাত্রা-প্রণালী অতি নিম্নস্তরের, সেখানে কুটীর শিল্পের উন্নতি হইলে জনসাধারণের অবস্থা সম্ভবতঃ উন্নত হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দেশের মতই আমরা অবশিষ্ট জগতের সহিত নানা সূত্রে আবন্ধ হইয়া পড়িয়াছি, সে বন্ধন ছিন্ন করা অসম্ভব। অতএব আমাদিগকে সমগ্র জগতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই চিন্তা করিতে হইবে, সংকীর্ণ স্বয়ম্পূর্ণতার প্রশ্ন উঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি সকল দিক দিয়াই ইহা অবাঞ্ছনীয় মনে করি।

অতএব সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা একমাত্র সম্ভবপর যে সিন্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, তাহা হইল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। প্রথমতঃ জাতীয় ভৌগোলিক সীমার মধ্যে এবং পরে সমগ্র জগতে ঐ ব্যবস্থা দ্বারা পণ্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সম্পদ সাধারণের কল্যাণের জন্য বণ্টন করা। কি উপায়ে ইহা সম্ভব সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাহারা বর্তমান ব্যবস্থার সুযোগে লাভবান হইতেছে, তাহাদের আপত্তির জন্য, একটা জাতি কিম্বা মনুষ্যজাতির কল্যাণের পথ অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না, ইহা স্পষ্ট। যদি রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি ইহার অন্তরায় হয়, তাহা হইলে উহা অপসারিত করিতে হইবে। এই বাঞ্ছনীয় ও কার্যকরী আদর্শকে ছোট করিয়া ঐগুলির সহিত আপোষ করিলে তাহা বিশ্বাসঘাতকতা হইবে। এই পরিবর্তন হয়ত অবশ্যম্ভাবীরূপে আসিবে অথবা জগতের অবস্থাধীনে অতি দ্রুত সাধিত হইবে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের অধিকাংশের সম্মতি ও আনুগত্য ব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে। অতএব তাহাদিগকে এই মতে আনয়ন করিয়া তাহাদের চিত্ত জয় করিতে হইবে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ষড়যন্ত্রমূলক হিংসানীতি দ্বারা ইহার কোন সহায়তা হইবে না। বর্তমান ব্যবস্থায় যাহারা লাভবান হইতেছে, তাহাদিগকেও এই মতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তবে তাহারা অধিকসংখ্যায় এই মত গ্রহণ করিবে কি না সন্দেহ।

গান্ধিজীর বিশেষ প্রিয় খাদি-আন্দোলন—চরকা ও তাঁত, পণ্যোৎপাদনের ব্যক্তিগত উদ্যমের উগ্র প্রচেষ্টা; অতএব ইহা পুনরায় প্রাক্-যন্ত্রযুগে ফিরিয়া যাওয়া। বর্তমানে কোন গুরুতর সমস্যা সমাধানের মধ্যে ইহার গুরুত্ব অধিক নহে এবং ইহার ফলে এমন এক প্রকার মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়, যাহা সঙ্গত পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে বিঘ্নকর হইতে পারে। তথাপি আমি বিশ্বাস করি, সাময়িকভাবে ইহাতে অনেক উপকার হইয়াছে এবং যতদিন পর্যন্ত না রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কৃষি ও শিল্পসমস্যা সমাধানের জন্য দেশব্যাপী কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, ততদিন তো ইহার কিছু উপযোগিতা থাকিবে। ভারতের বিপুল বেকারসমস্যার কোন হিসাব নাই এবং পল্লী অঞ্চলে তদপেক্ষাও বেশী আংশিক বেকারসমস্যা রহিয়াছে। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই বেকার-সমস্যা দূর করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই অথবা বেকারদিগকে সাহায্য করিবার কোন ব্যবস্থাও হয় নাই। আর্থিক দিক দিয়া খাদি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বেকারদিগকে কিছু সাহায্য করিয়াছে এবং

ইহা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নিজের চেষ্টা হইতে সৃষ্ট বলিয়া ইহা তাহাদের আত্ম-সম্মান ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়াছে। ইহার ফল মানুষের মনের উপরই বেশী প্রত্যক্ষ। নগর ও পল্লীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টায় খাদি কিছু সাফল্য-লাভ করিয়াছে। ইহা কৃষক ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়কে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনিয়াছে। বস্ত্র যে পরিধান করে এবং দেখে, উভয়ের মনেই ইহা একটা প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যশ্রেণী সরল শুভ্র খাদি পরিধান করিতে আরম্ভ করায়, বসন সহজ ও সরল হইয়াছে, স্থূলরুচির আড়ম্বর কমিয়া গিয়াছে এবং জন-সাধারণের সহিত ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নমধ্যশ্রেণীর লোকেরা আর ধনীদের বসনভূষণ হাস্যকরভাবে নকল করিবার চেষ্টা করে না এবং সস্তা কাপড় চোপড়ের জন্য লজ্জাবোধ করে না। তাহারা ইহার জন্য কেবল মর্যাদা বোধ করে না, বরং যাহারা রেশম-সাটিনের জাঁকজমক দেখায়, তাহাদের অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বোধ করে। এমন কি, দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও ইহার জন্য মর্যাদা ও আত্মসম্মান বোধ করে। খাদিপরিহিত বৃহৎ জনতার মধ্যে ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ বুঝা কঠিন এবং সহকর্মী-সুলভ অন্তরঙ্গতা সহজেই জাগ্রত হয়। খাদি কংগ্রেসকে জনসাধারণের চিত্ত স্পর্শ করিতে সহায়তা করিয়াছে নিঃসন্দেহ। ইহা জাতীয় স্বাধীনতার বিশিষ্ট পরিচ্ছদে পরিণত হইয়াছে।

খাদি দ্বারা মিল-মালিকদের কাপড়ের দাম বৃদ্ধি করিবার নিত্য-বিদ্যমান আকাঙ্ক্ষা সংযত হইয়াছে। অতীতে ভারতীয় কলওয়ালারা বিদেশী প্রতিযোগিতা, বিশেষভাবে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিযোগিতায় সংযত থাকিতেন। যখনই এই প্রতিযোগিতার অভাব হয়, যেমন বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইয়াছিল, তখনই ভারতে কাপড়ের মূল্য অসম্ভব হারে চড়িয়া যায় এবং ভারতীয় কলগুলি প্রচুর টাকা উপার্জন করে। স্বদেশী এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনেও ভারতীয় মিলগুলি যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে, কিন্তু খদ্দরের আবির্ভাবে এক নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, অন্য অবস্থায় কাপড়ের দাম যতটা চড়িতে পারিত, বর্তমানে তাহা আর সম্ভব নহে। অবশ্য মিল-মালিকেরা (এবং জাপানও) জনসাধারণের খাদি-প্রীতির সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর মোটা কাপড় তৈয়ারী করেন, যাহার সহিত খাদির পার্থক্য ধরা কঠিন। পুনরায় যদি কোন সঙ্কটকাল দেখা দেয়, যদি যুদ্ধ বাধিয়া বিদেশীবস্ত্র আমদানী না হয়, তাহা হইলে মিলের মালিকেরা ১৯১৪ সালের মত আর ক্রেতাদিগকে শোষণ করিতে পারিবে না। খাদি-আন্দোলন তাহা প্রতিরোধ করিবে এবং খদ্দর উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই অধিকতর বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

বর্তমানে খাদি-আন্দোলনের এই সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, ইহা সাময়িক মধ্যবর্তী ব্যবস্থামাত্র। পরে উন্নততর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় হয়তো ইহা একপ্রকার সহায়ক শিল্পরূপে টিকিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের মূল প্রচেষ্টা হইবে, ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার। জোড়াতালি দিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কৃষিঋণ কমাইয়া এবং উপরের দিকে তুচ্ছ সংস্কারের পরামর্শ দিয়া কিছুমাত্র ফল হইবে না। আমাদের ভূমি-সংক্রান্ত ব্যবস্থা আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ইহা উৎপাদন, সমষ্টিগত অথবা বৃহৎ আকারের বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থার অন্তরায় স্বরূপ। বর্তমান কালের উপযোগী করিয়া ইহার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে, সমবায় প্রথায় চাষ প্রবর্তন করিতে হইবে, তাহাতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও বাড়িবে, পরিশ্রমও কম হইবে। কৃষিকর্ম সকলকে কর্ম দিতে পারে না এবং বহু

বড় কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হইলে (যেমন গান্ধিজী আশঙ্কা করেন) কৃষিকার্যে কর্মীর সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে। অন্যান্য সকলের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র অংশ কুটীর-শিল্পে আত্মনিয়োগ করিবে, কিন্তু অবশিষ্ট বেশীর ভাগ লোককেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চালিত বৃহৎ কারখানা কিম্বা জনকল্যাণমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

কোন কোন অঞ্চলে খাদি যে লোকের অন্নসংস্থান করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু ইহার এই সাফল্যের মধ্যে বিপদের আশঙ্কাও রহিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে ইহা ধ্বংসোন্মুখ ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থাকে ঠেকা দিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে এবং কিয়ৎপরিমাণে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিলম্ব ঘটাইতেছে। ইহার ফলে কোন বড় রকম পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু তাহার ঝোঁক রহিয়াছে। প্রজা অথবা জমির মালিক কৃষকেরা জমি হইতে উৎপন্ন ফসলের যে অংশ পায়, তাহাতে বর্তমানে তাহারা যে শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও আর বজায় রাখিতে পারিতেছে না। তাহাকে তাহার সামান্য উপার্জনের সহিত আরও কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করিতে হয়। অথবা সাধারণতঃ তাহারা যাহা করে তাহাই অর্থাৎ ঋণ করিয়া খাজনা শোধ করিতে হয়। কাজেই অতিরিক্ত উপার্জনের সুবিধা জমিদার ও গভর্ণমেণ্ট ভোগ করেন; উহা হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া লন, অন্যথা তাঁহারা উহা করিতে পারিতেন না। যদি অতিরিক্ত রোজগার বেশ মোটা রকম হয়, তাহা হইলে উহার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া খাজনাবৃদ্ধিরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থায় কৃষকের অতিরিক্ত শ্রমার্জিত অর্থ এবং তাহার মিতব্যয়িতার ফলে পরিণামে জমিদারেরাই লাভবান হইয়া থাকেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, হেন্‌রি জর্জ তাঁহার "উন্নতি ও দারিদ্র্য" নামক গ্রন্থে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে—বিশেষতঃ আয়র্লণ্ডের—অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

গান্ধিজীর কুটিরশিল্প পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা, তাহার খাদি-কার্যেরই ব্যাপকতর ব্যবস্থা। ইহাতে আশু কিছু উপকার হইবে, ইহার কিয়দংশ অল্প-বিস্তর স্থায়ী কাজ; কিন্তু অধিকাংশই সাময়িক। ইহাতে বর্তমান দুরবস্থার মধ্যে কৃষকের কিছু সুবিধা হইবে এবং কতকগুলি কারুশিল্প ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু যন্ত্র অথবা কলকারখানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দিক দিয়া ইহার কোন সাফল্যের আশা নাই। কুটীরশিল্প সম্পর্কে গান্ধিজী সম্প্রতি হরিজন পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"যেখানে কাজ বেশী অথচ লোক কম, সেখানে যন্ত্রের ব্যবস্থা ভাল, কিন্তু ভারতের মত যেখানে কাজ অপেক্ষা লোকসংখ্যা বেশী, সেখানে উহা অনিষ্টকর।......পল্লীবাসী লক্ষ লক্ষ লোককে কিভাবে বিশ্রাম দেওয়া যায়, তাহা আমাদের সমস্যা নহে। আমাদের সমস্যা এই যে বৎসরে গড়পড়তা ছয় মাস অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, সেই সময়টা কিভাবে কাজে লাগান যায়।" যে সমস্ত দেশে বেকার-সমস্যা রহিয়াছে, সেই সকল দেশেই অল্পবিস্তর এই আপত্তি খাটে। কিন্তু করিবার মত কোন কাজ নাই, দোষ নিশ্চয়ই তাহা নহে; আসল দোষ হইল এই যে বর্তমান লাভমূলক ব্যবস্থায়, মালিকেরা লোক খাটাইয়া লাভ করিতে পারিতেছে না। অথচ চারিদিকে কত কাজ করিবার রহিয়াছে—রাস্তা তৈয়ারী, জলসেকের ব্যবস্থা, আবাস-গৃহ নির্মাণ, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা ও চিকিৎসার সুবিধা বিধান, কলকারখানা, বিজলী, সামাজিক উন্নতি ও সংস্কৃতি বিস্তার কার্য, শিক্ষাবিস্তার, জনসাধারণ যে সকল নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু পায় না, তাহার উৎপাদন-ব্যবস্থা। আমাদের লক্ষ লক্ষ নরনারীর আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া

কঠোর পরিশ্রম করিবার কত কিছু আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু লাভের লোভ হইতে নহে, সামাজিক উন্নতির প্রেরণা হইতেই ইহা সম্ভবপর, কিম্বা যদি লোক-কল্যাণকর কার্য করিবার সংকল্প লইয়া সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠে। রুশীয় সোভিয়েট রাষ্ট্রের আর যে কোন ত্রুটিই থাকুক না কেন, সেখানে কেহ বেকার নাই। আমাদের দেশে লোকে কাজের অভাবে বসিয়া থাকে না, কাজের সুবিধা তাহারা পায় না এবং তাহাদিগকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। অল্প-বয়স্কদিগকে শ্রমসাধ্য কর্মে নিয়োগ আইনদ্বারা রোধ করিলে এবং একটা যুক্তি-সঙ্গত নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, মজুরীর বাজারে লক্ষ লক্ষ ইচ্ছুক শ্রমিক অনেকটা আসন পাইতে পারে

চরকা ও তকলির কার্যকরী শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য গান্ধিজী চেষ্টা করিয়াছেন এবং কতকটা সফলকামও হইয়াছেন। যন্ত্র ও কলকব্জার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা এবং সে চেষ্টা যদি চলিতে থাকে, (কুটীরশিল্পও বৈদ্যুতিক শক্তি-বলে চালান যায়) তাহা হইলে, আবার সেই লাভের ইচ্ছা দেখা দিবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের সমস্যা ও বেকার-সমস্যাও দেখা দিবে। কুটীরশিল্পের মধ্যে আধুনিক শিল্পকৌশল প্রবর্তন না করিলে আমাদের প্রয়োজনীয় ও পছন্দমত পণ্য উহা দ্বারা প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা নাই। কলের সহিত উহা প্রতিযোগিতা করিতেও পারে না। আমাদের দেশে বৃহত্তর কল-কারখানাগুলির কাজ বন্ধ করা সম্ভব কি না এবং উচিত কি না? গান্ধিজী পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, কলকব্জা মাত্রেরই তিনি বিরোধী নহেন; তবে তিনি সম্ভবতঃ বিবেচনা করেন যে বর্তমান ভারতে উহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা কি লোহ ও ইস্পাতের মত মূল শিল্পের কারখানাগুলি এবং অন্যান্য ছোটখাট কারখানাগুলি বন্ধ করিয়া দিতে পারি?

তাহা আমাদের সাধ্যাতীত সন্দেহ নাই। যদি আমাদের রেলওয়ে, সেতু, যান-বাহনের সুবিধা প্রভৃতির প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে হয় সেগুলি আমাদের নিজেদের প্রস্তুত করিতে হইবে, নয়, তাহার জন্য অপরের উপর নির্ভর করিতে হইবে। যদি আমাদিগকে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে মূল শিল্প-গুলির প্রয়োজন তো হইবেই, তাহা ছাড়া কল-কারখানার প্রভূত উন্নতি করিতে হইবে। যে কোন মূল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহকারী ও পরিপূরক হিসাবে অন্যান্য কারখানার প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং পরিণামে আমাদিগকে নিজেদের কলকব্জা প্রস্তুতের কারখানাও স্থাপন করিতে হইবে। যদি এই প্রকার মূল শিল্পের কারখানা চলিতে থাকে, তাহা হইলে ছোট ছোট কারখানাও বিস্তার লাভ করিবেই। কলকারখানার বিস্তার বন্ধ হইতে পারে না; কেন না ইহার সহিত আমাদের আর্থিক ও সভ্যতার উন্নতি জড়িত এবং আমাদের স্বাধীনতাও উহার উপর নির্ভর করিতেছে। যতই বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিস্তৃতিলাভ করিবে, ততই সামান্য আকারের কুটীর শিল্পের তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন আকারে উহা টিঁকিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহা সম্ভবপর নহে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও যে সকল দ্রব্য অধিক সংখ্যায় কলে প্রস্তুত করা সম্ভব নহে, কুটীরশিল্প সেই সকল বিশেষ কারুকার্যের ভার লইবে।

কোন কোন কংগ্রেস নেতা যন্ত্রশিল্পের নামে আতঙ্কগ্রস্ত হন এবং মনে করেন যে বর্তমানে শিল্পবাণিজ্যে উন্নত দেশগুলিতে যে অশান্তি দেখা দিয়াছে তাহার কারণ কলকারখানায় দ্রুত এবং শাইকারী ভাবে পণ্যোৎপাদন। প্রকৃত অবস্থা

সম্পর্কে ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা।* জনসাধারণ যে সকল বস্তু পায় না, তাহা তাহাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা কি মন্দ? প্রচুর পণ্য উৎপাদন করা অপেক্ষা তাহারা অভাবের মধ্যেই থাকুক, ইহাই কি কাম্য? দোষ উৎপাদনপ্রণালীর মধ্যে নহে, বণ্টন-ব্যবস্থার নির্বোধ অসম্পূর্ণতাই উহার জন্য দায়ী।

গ্রাম্য শিল্পের উৎসাহ-দাতাদের সম্মুখে আর এক বিঘ্ন এই যে আমাদের কৃষি পণ্য জগতের বাজারের উপর নির্ভরশীল। জগতের বাজারদরের উপর নির্ভর করিয়া কৃষকদিগকে অর্থকরী কৃষিপণ্য বাধ্য হইয়া উৎপাদন করিতে হয়। পণ্য-মূল্যের তারতম্য ঘটিলেও তাহাকে নগদ টাকায় নির্দিষ্ট খাজনা ও ট্যাক্স জোগাইতে হয়। এই টাকা যে কোন প্রকারে হউক তাহাকে জোগাড় করিতে হইবে অথবা অন্ততঃপক্ষে সে চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই কারণেই যে ফসলে সর্বোচ্চ মূল্য পাওয়া যাইবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস সে তাহাই বপন করে। এমন কি, যে ফসলে তাহার পারিবারিক খাদ্যের সংস্থান হইবে, তাহা সে ইচ্ছা থাকিলেও উৎপন্ন করিতে পারে না।

অধুনা কয়বৎসরে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ কৃষক, বিশেষভাবে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে, ইক্ষুর আবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। চিনির উপর সংরক্ষণ-শুল্ক স্থাপিত হওয়ায় অনেক চিনির কল ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিয়াছে, কাজেই ইক্ষুর চাহিদা আছে। কিন্তু শীঘ্রই উৎপন্ন ইক্ষুর পরিমাণ চাহিদার অতিরিক্ত হইয়া পড়িল, কলের মালিকেরা নিষ্ঠুর ভাবে কৃষকদের শোষণ করিতে লাগিল, ইক্ষুর মূল্য পড়িয়া গেল।

এই সকল বিষয় ও অন্যান্য বহুতর বিষয় বিবেচনা করিয়া আমার মনে হইতেছে কোন সঙ্কীর্ণ বাঁধাধরা পথে আমাদের কৃষি শিল্পের সমস্যাগুলি সমাধানের সম্ভাবনা নাই এবং তাহা আকাঙ্ক্ষারও নহে। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক অবস্থার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। অর্থহীন ভাবুকতার বুলি আওড়াইয়া আমরা পরিত্রাণ পাইব না, আমাদিগকে ঘটনাবলীর সম্মুখীন হইতে হইবে এবং ঐগুলির সহিত নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে, যাহাতে আমরা ইতিহাসের নিয়ামক হইতে পারি, যেন উহার দ্বারা অসহায় ভাবে নিয়ন্ত্রিত না হই।

স্ববিরোধিতার মূর্ত প্রতীক গান্ধিজীর† কথা আবার আমার মনে পড়িল। তাঁহার এত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পদদলিত ও নির্যাতিতের অবস্থার উন্নতিকল্পে এত আগ্রহ, তিনি কেন এই ব্যবস্থা সমর্থন করেন, যাহা আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, যাহা বর্তমানের দুঃখ ও অপচয়ের স্রষ্টা? তিনি পথ

---

* সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১৯৩৫-এর ৩রা জানুয়ারী আহমেদাবাদে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "গ্রাম্য-শিল্পের উন্নতি সাধনই প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদ। পাশ্চাত্যদেশে বিপুল ভাবে পণ্য উৎপাদনের ফলে যে বিপর্যয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, আমরা আমাদের দেশে তাহার পুনরাভিনয় করিতে চাহি না।"

† ১৯৩১-এ গোলটেবিল বৈঠকের একটি বক্তৃতায় গান্ধিজী বলিয়াছেন, "সর্বোপরি কংগ্রেস মূলতঃ দশ কোটি মূক অর্ধভুক্ত জনসাধারণের প্রতিনিধি, যাহারা ব্রিটিশ-ভারত অথবা ভারতীয় ভারতের (দেশীয় রাজ্যের) সাত লক্ষ গ্রামে, ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। প্রত্যেকটি স্বার্থ, যাহা কংগ্রেসের মতে রক্ষা করা উচিত, তাহার স্থান মূক জনসাধারণের স্বার্থের নিম্নে; আপনারা প্রায়ই যে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত দেখিতে পান, তাহার মধ্যে যদি কোন প্রকৃত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে লক্ষ লক্ষ মূক জনসাধারণের স্বার্থের নিকট কংগ্রেস অন্যান্য সকলের স্বার্থ বলি দিবে।"

খুঁজিতেছেন, সত্য কথা, কিন্তু অতীতে ফিরিয়া যাইবার পথ কি চিরদিনের মত অবরুদ্ধ নহে? এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি অগ্রগতির অন্তরায়স্বরূপ দণ্ডায়মান প্রাচীন ব্যবস্থার প্রত্যেকটির নিদর্শনের কল্যাণ কামনা করিতেছেন—সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র, বৃহৎ জমিদারী ও তালুকদারী এবং বর্তমান ধনতান্ত্রিক প্রথা। একজন ব্যক্তির হস্তে অবাধ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য দিয়া প্রত্যাশা করিতে হইবে যে, সে উহা কেবলমাত্র জনসাধারণের কল্যাণেই নিয়োগ করিবে, এইরূপ অছি বা অভিভাবক-প্রথার উপর বিশ্বাস করা কি যুক্তিসংগত? আমাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা কি এত নিখুঁৎ যে তাঁহাদিগকে এই ভাবে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এমন কি প্লেটো-কল্পিত দার্শনিক রাজারাও এইরূপ ভার মর্যাদার স[illegible]ত বহন করিতে পারেন নাই। একজন দয়ালু অতিমানবের অধীনে থাকাই [illegible]ক লোকের পক্ষে কল্যাণকর? কিন্তু অতি-মানবও নাই, দার্শনিক রাজাও নাই, সকলেই দুর্বল মানব, সকলেই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা স্ব স্ব ধারণানুযায়ী [illegible] যেই সর্বসাধারণের কল্যাণ, ইহা চিন্তা না করিয়া পারে না। জন্ম, পদমর্যাদা ও অর্থনৈতিক শক্তির গতানুগতিকতাকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহার ফল অনেক দিক দিয়াই শোচনীয় হইয়াছে।

আমি পুনরায় বলিতেছি, কি উপায়ে পরিবর্তন সম্ভব, পথের বাধাগুলি কিসে অপসারিত হইতে পারে, বলপ্রয়োগে বাধ্য করা, না, হৃদয়ের পরিবর্তন, হিংসা না অহিংসা, এই সকল প্রশ্ন বর্তমান মুহূর্তে আমি বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই। এ বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করিব। কিন্তু পরিবর্তনের প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে এবং উহা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। যদি নেতা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইহাকে স্পষ্টভাবে না দেখেন এবং ব্যক্ত না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অপরকে স্বমতে আনয়ন করিবার প্রত্যাশা কিরূপে করিবেন অথবা অত্যাবশ্যক মতবাদ কি ভাবে জনসাধারণের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন? অবশ্য ঘটনাই সর্বাপেক্ষা শক্তিমান শিক্ষক, কিন্তু ঘটনারও কার্যকারণ সম্যকরূপে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইবে, যাহার ফলে কর্মধারা সম্যক পথে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হইবে।

আমার কথাবার্তায় ধৈর্য হারাইয়া আমার অনেক বন্ধু ও সহকর্মী প্রশ্ন করিয়াছেন, তুমি কি দয়ালু নৃপতি, দাতা জমিদার এবং উদারহৃদয় বিনয়ী ধনী দেখ নাই? নিশ্চয়ই দেখিয়াছি। যে শ্রেণীর মধ্যে আমার জন্ম, তাঁহারা ঐ সকল বড় জমিদার ও ধনীদের সহিত মেলামেশা করিয়া থাকেন। আমি নিজেই একজন খাঁটি বুর্জোয়া, বুর্জোয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছি এবং উহা হইতেই আমার প্রথম জীবনের সংস্কারগুলি গঠিত হইয়াছে। কম্যুনিস্টগণ যে আমাকে 'পেটি বুর্জোয়া' বলেন তাহা সর্বাংশে সত্য। সম্ভবতঃ এখন তাঁহারা আমাকে 'অনুতপ্ত বুর্জোয়া' বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন। কিন্তু আমি যাহাই হই, এখানে তাহা বিচার্য বিষয়ের বহির্ভূত। একজন ব্যক্তির মাপকাঠিতে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যাগুলি বিবেচনা করা অযৌক্তিক। যে সকল বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেন, তাঁহারা বারম্বার একথা শুনাইতে ভুলেন না যে আমাদের কলহ পাপকে লইয়া, পাপীকে লইয়া নহে। আমি অতদূরও অগ্রসর হইতে চাহি না। আমি বলি, আমার কলহ একটা বিশেষ ব্যবস্থার সহিত, কোন ব্যক্তির সহিত নহে। অবশ্য এই ব্যবস্থা ব্যক্তি বা শ্রেণীকে আশ্রয় করিয়াই রূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং এই সকল ব্যক্তি বা শ্রেণীকে হয় স্বমতে আনিতে হইবে, না, ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। যদি কোন

ব্যবস্থার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়া তাহা ভারস্বরূপ হইয়া উঠে, তাহা হইলে উহা বর্জন করিতে হইবে এবং যে সকল শ্রেণী বা গোষ্ঠী ঐ ব্যবস্থার সহিত জড়িত, তাহাদের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। যথাসম্ভব কম ক্লেশ ও দুঃখ দ্বারাই পরিবর্তন হওয়া উচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুঃখ ও বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। কোন ক্ষুদ্র অন্যায়ের ভয়ে আমরা বৃহত্তর অন্যায়কে সহ্য করিতে পারি না; কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যায়ের প্রতিকার অবশ্য আমাদের আয়ত্তের বাহিরেই থাকিয়া যাইবে।

রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক মানুষের সৃষ্ট প্রত্যেক প্রকার সঙ্ঘের পশ্চাতে একটা তত্ত্ব রহিয়াছে। যখন সঙ্ঘের পরিবর্তন হয় তখন উহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য এবং উহাকে সুপরিচালিত করিবার জন্য দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিরও পরিবর্তন আবশ্যক। কিন্তু ঘটনার সহিত তত্ত্ব সমান তালে চলিতে পারে না, ইহার ফলেই অশান্তি দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্র পাশাপাশি বর্ধিত হইয়াছে, কিন্তু একের সহিত অপরের প্রকৃতিগত ঐক্য নাই। উভয়ের মধ্যে দলগত বিরোধ রহিয়াছে, কেন না গণতন্ত্র অধিকাংশের হাতে ক্ষমতা দিতে চাহে, আর ধনতন্ত্র প্রকৃত ক্ষমতা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে রাখিতে চাহে। অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও এই দুইটি কোন প্রকারে কাজ চালাইতেছে, কেন না রাজনৈতিক পার্লামেণ্টি গণতন্ত্র একপ্রকার সীমাবদ্ধ গণতন্ত্র মাত্র, একচেটিয়া অধিকারের বিস্তার এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টার উপর ইহা হস্তক্ষেপ করে না।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও গণতন্ত্রের ভাব প্রসারলাভ করার ফলে বিচ্ছেদ অনিবার্য ও আসন্ন। পার্লামেণ্টি গণতন্ত্রের আজকাল কেহই প্রশংসা করে না এবং উহার প্রতিক্রিয়ার ফলে নানাবিধ মতবাদে আকাশ বাতাস ধ্বনিত। এই কারণেই ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছেন এবং ঐ ধুয়া ধরিয়া আমাদিগকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটা বাহ্য কাঠামো দিতেও অনিচ্ছুক। আশ্চর্য এই, দেখাদেখি ভারতীয় রাজারাও তাঁহাদের অবাধ স্বৈরাচার ঐ যুক্তি দ্বারাই সমর্থন করেন এবং দম্ভভরে ঘোষণা করেন যে, জগতের আর কোথাও না থাকিলেও, তাঁহাদের রাজ্যে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাই বলবৎ রাখিবেন।*

---

* ১৯৩৫-এর ২২শে জানুয়ারী দিল্লীতে নরেন্দ্র-মণ্ডলে চান্সেলর পাতিয়ালার মহারাজা, বক্তৃতাপ্রসঙ্গে, যাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতী এবং আশা করেন এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে, যাহার ফলে দেশীয় নৃপতিরাও তাঁহাদের রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী স্থাপন করিতে বাধ্য হইবেন সেই সকল ভারতীয় রাজনৈতিকের অভিমত উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন, "ভারতীয় নৃপতিরা তাঁহাদের প্রজাবৃন্দের পক্ষে যাহা সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তাঁহারা সর্বদা আগ্রহান্বিত। কিন্তু আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিব যদি ব্রিটিশ ভারত প্রত্যাশা করে যে আমাদের সর্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে তাহারা নিন্দিত ও পরিত্যক্ত কোন প্রকার রাজনৈতিক মতবাদ ঢুকাইয়া দিতে পারিবে, তবে সে প্রত্যাশা আকাশকুসুমে মাত্র (৬০ অধ্যায়ে মহীশূরের দেওয়ানের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।) ঐ দিনই নরেন্দ্রমণ্ডলে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বিকানীরের মহারাজা বলেন "ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ আমরা, তাহা বলে রাজোন্মত্ত হই নাই। আমি আপনাদের নিকট সর্বতোভাবে বলিব, আমরা বহু শতাব্দীর বংশানুক্রমিক সূত্রে, শাসনক্ষমতা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের রাজনীতিক অভিজ্ঞতাও কিছু আছে, তবে আমরা বিভ্রান্ত না হইয়া পড়ি অথবা সহসা কোন সিদ্ধান্ত না করিয়া বসি, সেদিকে আমাদের যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।.... .আমি বিনয়সহকারে বলিব, কাহারও দ্বারা নিজেদের বিনষ্ট হইতে দিবার অভিপ্রায় নৃপতিবৃন্দের নাই এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যদি সেই সময় আসে, যখন ব্রিটিশ-মুকুট আর আমাদের সন্ধির সর্তানুযায়ী, প্রয়োজনমত আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না, তখন রাজন্যবৃন্দ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়াই মরিবেন।"

অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া পার্লামেণ্ট গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় নাই, যথেষ্ট অগ্রসর না হওয়াতেই ইহা ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র নাই বলিয়া ইহা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নহে এবং ইহার ধীর মন্থর জটিল ব্যবস্থা এই দ্রুত পরিবর্তনের যুগের পক্ষে অনুপযোগী।

সম্ভবতঃ বর্তমানে দেশীয় রাজ্যগুলি জগতে স্বৈরশাসনের প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। অবশ্য এইগুলি সর্বদাই ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অধীন, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা অথবা উহার প্রসার সাধন ছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলিতে বড় একটা হস্তক্ষেপ করেন না, অতীত কালের এই সকল সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র চারিদিকে বৈদেশিক শাসন দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও, প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় কি ভাবে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যেখানে বাতাস ভারাক্রান্ত ও রুদ্ধশ্বাস, জল মন্থর গতিতে বহে, পরিবর্তন ও গতিতে অভ্যস্ত নবাগত কেহ সেখানে আসিলে উহার মধ্যে সম্ভবতঃ ক্লান্ত হইয়া উঠে, অবসাদ বোধ করে এবং এক মোহতন্দ্রা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এখানে কিছুই বাস্তব বলিয়া মনে হয় না, সময় যেন চিত্রার্পিতবৎ স্থির এবং একই অপরিবর্তিত দৃশ্য চোখে পড়ে। প্রায় অজ্ঞাতসারে তাহার মন অতীতে ভাসিয়া যায়। শৈশবের স্বপ্ন মনে পড়ে, মনে পড়ে মণিময় উষ্ণীষধারী অস্ত্র ও বর্মে সুসজ্জিত বীর, সুন্দরী নির্ভীক রাজকন্যার কথা, উচ্চগম্বুজমণ্ডিত রহস্যময় প্রাসাদ এবং বীরত্বগাথা! মনে পড়ে আত্মমর্যাদা ও আত্মাভিমানের অসম্ভব ধারণা এবং অতুলনীয় সাহস এবং মৃত্যুর প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন অবজ্ঞা। বিশেষভাবে সে যদি অলৌকিক বীরত্বের এবং নিষ্ফল ও অসম্ভব কাহিনীপূর্ণ রহস্যের লীলা-ভূমি রাজপুতানায় যায়।

কিন্তু অবিলম্বেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, নির্যাতনের অনুভূতি ফিরিয়া আসে; ইহার আবহাওয়া অবরুদ্ধ, শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় এবং নিম্নে জলস্রোত নিস্তব্ধ অথবা মন্দগতি হইলেও, তাহার মধ্যে বদ্ধজলের পঙ্কিলতা। প্রত্যেকে নিজের চারিদিকে গভীর সঙ্কীর্ণতা অনুভব করে, দেহ ও মন যেন শৃঙ্খলিত। নৃপতির ঐশ্বর্যের আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদের ঔজ্জ্বল্যের পার্শ্বেই লোকে দেখে জনসাধারণ কি অপরিসীম দারিদ্র্য ও অধঃপতনের মধ্যে বাস করিতেছে। রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য নৃপতির ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য সেই প্রাসাদে আসিয়া জমা হইতেছে; তাহার কতটুকু অংশ জনহিতকর কার্যের জন্য লোকে ফিরিয়া পায়! আমাদের নৃপতিদিগকে সৃষ্টি করা এবং ভরণপোষণ করা অতি ভয়াবহ রূপে ব্যয়বহুল। তাঁহাদের জন্য এত অধিক ব্যয়ভূষণের বিনিময়ে তাঁহারা কি দিয়া থাকেন?

এই সকল দেশীয় রাজ্য এক রহস্য-যবনিকায় আবৃত। সংবাদপত্র এখানে প্রশ্রয় পায় না, বড় জোর সাহিত্য বিষয়ক অথবা আধা-সরকারী সাপ্তাহিক পত্র চলিতে পারে। বাহিরের সংবাদপত্র প্রায়ই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ছাড়া (এখানে ব্রিটিশভারত অপেক্ষাও শিক্ষিতের হার অধিক) অন্যান্য রাজ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অতিশয় অল্প। দেশীয় রাজ্যের সর্বপ্রধান সংবাদ হইল, মহারাজের আগমন এবং অনুগমনের শোভাযাত্রা, সাজ-সজ্জার আড়ম্বর, দরবারের জাঁকজমক এবং পরস্পরের প্রশংসা-মূলক বক্তৃতা অথবা বিবাহোৎসবের অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য, অথবা রাজার জন্মদিনের উৎসব, কিংবা প্রজা-বিদ্রোহ। রাজাদিগকে সমালোচনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ আইন আছে, এমন কি ব্রিটিশ ভারতেও তাহা বিদ্যমান, রাজ্যের অভ্যন্তরে

অবশ্য অতি মৃদ্ সমালোচনাও কঠোরহস্তে দমন করা হইয়া থাকে। সাধারণ জনসভার কথা সেখানে লোকের অজ্ঞাত, এমন কি সামাজিক সম্মেলনও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।* বাহিরের প্রধান জননায়কদিগকে প্রায়ই রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ১৯২২ সালে মিঃ সি. আর. দাশ গুরুতর পীড়ার পর কাশ্মীরে বায়ুপরিবর্তনে যাইবার সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার কোন রাজনৈতিক অভিপ্রায় ছিল না। তিনি কাশ্মীরের সীমান্তে উপস্থিত হইলে তাঁহার গতিরোধ করা হয়। এমন কি মিঃ এম এ. জিন্নাও হায়দ্রাবাদে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত; শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বাড়ী হায়দ্রাবাদ সহরে হইলেও, দীর্ঘকাল তাঁহাকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

দেশীয় রাজ্যগুলির এই অবস্থায় কংগ্রেসের কর্তব্য ছিল, তত্রত্য প্রজাবৃন্দের মৌলিক সাধারণ অধিকার লাভের চেষ্টা করা এবং উহা অপহরণ করার সমালোচনা করা। কিন্তু দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে গান্ধিজী এক অভিনব নীতি কংগ্রেসে প্রবর্তন করিলেন—"দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করা।" দেশীয় রাজ্যে অত্যন্ত বেদনাজনক ঘটনা-সত্ত্বেও, এমন কি কংগ্রেসের উপর অহেতুক আক্রমণ সত্ত্বেও, তিনি এই চুপচাপ থাকিবার নীতি আঁকড়াইয়া থাকিলেন। বুঝা গেল কংগ্রেসের সমালোচনায় দেশীয় নৃপতি ও শাসকগণ ক্রুদ্ধ হইতে পারেন এবং তাহাতে তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন অধিকতর কঠিন হইবে এই আশঙ্কা ছিল। দেশীয় রাজ্যের প্রজা-সমিতির সভাপতি মিঃ এন. সি. কেলকারের নিকট ১৯৩৪-এর জুলাই মাসে গান্ধিজী যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি তাঁহার পূর্বমত সমর্থন করিয়া বলেন, হস্তক্ষেপ না করার নীতি অভ্রান্ত ও যুক্তিযুক্ত এবং দেশীয় রাজ্যগুলির আইনতঃ ও নিয়মতন্ত্রগত ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অতিশয় চমকপ্রদ। তিনি লিখিয়াছেন, "দেশীয় রাজ্যগুলির ব্রিটিশ আইনের অধীনে স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা রহিয়াছে। ভারতের যে অংশ ব্রিটিশ বলিয়া কথিত হয় সেই অংশের যেমন সিংহল বা আফগানিস্থানের উপর কোন ক্ষমতা নাই, তেমনি দেশীয় রাজ্যের শাসননীতি নির্ণয়ের কোন অধিকার নাই।" নরমপন্থী দেশীয় রাজ্যের প্রজা সম্মেলন এবং লিবারেলগণ যে গান্ধিজীর এই উক্তি ও পরামর্শে ব্যথিত হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

কিন্তু দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ এই মতবাদে সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। এক মাসের মধ্যেই ত্রিবাঙ্কুর দরবার তাঁহাদের এলাকার মধ্যে কংগ্রেসকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং উহার সভাসমিতি ও সদস্যসংগ্রহ বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, "দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নেতারাই এইরূপ করিবার উপদেশ দিয়াছেন"—ইহা যে

---

* ১৯৩৪-এর ৩রা অক্টোবরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হায়দ্রাবাদের একটি সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় বিবেকবর্ধিনী নাট্যমঞ্চে মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি উপলক্ষে একটি সাধারণ সভা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। হায়দ্রাবাদের হরিজন সেবক সঙ্ঘ এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন। সঙ্ঘের সম্পাদক সংবাদপত্রে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, সভারম্ভের নির্দিষ্ট সময়ের চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে কর্তৃপক্ষ জানান যে নিম্নলিখিত সর্তে সভা করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে যে, দুই হাজার টাকা নগদ জামীন স্বরূপ দিতে হইবে এবং লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে সভায় কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা হইবে না, সরকারী কর্মচারীদের, কোন সরকারী কার্যের সমালোচনা হইতে পারিবে না। সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের সহিত বন্দোবস্ত করা অসম্ভব বলিয়া সভা বন্ধ করিতে হইয়াছে।"

গান্ধিজীর বিবৃতির প্রতি ইঙ্গিত মাত্র, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ইহা উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটিশ ভারতে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি বর্জিত হওয়ার পর (দেশীয় রাজ্যগুলিতে আইন অমান্য আন্দোলন হয় নাই) এবং ভারত সরকার কর্তৃক কংগ্রেস পুনরায় বৈধ প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃত হওয়ার পর এই নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সে সময় স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার ত্রিবাঙ্কুর দরবারের প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন (এখনও আছেন)। ইনি পূর্বে কংগ্রেস ও হোমরুল লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, পরে লিবারেল বা মডারেট হন এবং ভারত-গভর্ণমেণ্ট ও মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গান্ধিজীর পরামর্শানুযায়ী কংগ্রেসের নীতি অনুসারে, সংগ্রাম অবস্থাতেও ত্রিবাঙ্কুর দরবারের কংগ্রেসের প্রতি এই অহেতুক আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা হইল না।* কোন কোন লিবারেল পর্যন্ত ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ইহা সত্য যে দেশীয়রাজ্য সম্পর্কে গান্ধিজীর নীতি লিবারেলদের অপেক্ষাও সংযত ও নরমপন্থী। সম্ভবতঃ প্রধান প্রধান জননায়কদের মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত মদনমোহন মালবাই (তাঁহার সহিত বহু দেশীয় নৃপতির ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা আছে) অনুরূপ সংযত এবং যাহাতে দেশীয় নৃপতিদের মনে কোনরূপ অসন্তোষের উদয় না হয়, সেজন্য তিনি সতত‌ই যত্নবান থাকেন।

দেশীয় নৃপতিবৃন্দ সম্পর্কে গান্ধিজী সর্বদাই এরূপ সাবধান ছিলেন না। ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উদ্বোধনের স্মরণীয় দিবসে এক দেশীয় নৃপতির সভাপতিত্বে আহূত সভায় তিনি এক বক্তৃতা করেন; ঐ সভায় আরও বহুতর নৃপতি উপস্থিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সদ্য দেশে আসিয়াছেন, ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব তখনও তাঁহার স্কন্ধে পতিত হয় নাই। তিনি মহাপুরুষোচিত আবেগময়ী জ্বলন্ত ভাষায় তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তাঁহাদের আত্মসংশোধন করিতে হইবে এবং বৃথা আড়ম্বর ও বিলাস বর্জন করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, "হে নৃপতিবৃন্দ আপনারা এখনই যান এবং আপনাদের মণিমাণিক্য বিক্রয় করিয়া ফেলুন।"—তাঁহারা মণিমাণিক্য অবশ্যই বিক্রয় করেন নাই, কিন্তু তখনই সভা-ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভয়চকিত নৃপতিরা একে একে উঠিয়া যাইতে লাগিলেন, এমন কি, সভাপতি পর্যন্ত বক্তাকে একক ফেলিয়া স্বদলের অনুসরণ করিলেন। ঐ সভায় মিসেস্ এনি বেশান্ত উপস্থিত ছিলেন, তিনিও বিরক্ত হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

মিঃ এন. সি. কেলকারের নিকট লিখিত পত্রে গান্ধিজী আরও বলিয়াছিলেন, —"আমার মতে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক স্বাতন্ত্র্য পাওয়া উচিত এবং দেশীয় রাজারা নিজেদের কার্যতঃ স্ব স্ব প্রজাবৃন্দের অছিস্বরূপে মনে করিবেন।......এই অছিগিরির আদর্শের মধ্যে যদি কিছু বস্তু থাকে তাহা হইলে ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট যখন নিজেদের ভারত-গভর্ণমেণ্টের অছি বলিয়া দাবী করেন, তখন আমরা আপত্তি করিব কেন? ভারতে তাঁহারা বিদেশী, ইহা ছাড়া আমি আর কোন আপত্তির কারণ দেখি না। গাত্রচর্মের বর্ণ জাতিগত এবং সংস্কৃতিগত

---

* ১৯৩৫ সালের ৬ই জানুয়ারী বরোদায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নিরপেক্ষতার নীতির উপর জোর দিয়া বলেন—"ভারতীয় [illegible] দেশীয় রাজ্যের [illegible] করা উচিত হইবে এবং [illegible] পরিবর্তে [illegible] সেই চেষ্টাই করা উচিত।"

অন্র্প ভেদ ভারতের বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।"

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় রাজ্যগ্লিতে অতি দ্রত ব্রিটিশ শাসনকর্তা ঢ্কাইয়া দেওয়া হইতেছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিচ্ছ্ক ও অসহায় ন্পতিদিগকে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইতেছে। ভারত-গভর্ণমেণ্ট উপর হইতে চিরদিনই দেশীয় রাজ্যগ্লি নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছেন, এখন কতকগ্লি প্রধান রাজ্যের অভ্যন্তরেও উহার অতিরিক্ত কর্তৃত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। সেই কারণে এই সকল রাজ্যের পক্ষ হইতে যে সকল কথা বলা হয়, তাহা ভারত-গভর্ণমেণ্টেরই র্পান্তরিত বাণী এবং উহাতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্র্ণ স্যোগ গ্রহণেরও অপ্রতুলতা নাই।

দেশীয় রাজ্যে বা অন্যত্র একই কার্যধারা অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে। ইহা আমি ব্ঝিতে পারি। এমন কি, ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগ্লিতেও কৃষিকার্য, শিল্পবাণিজ্য, সাম্প্রদায়িক ও শাসন সম্পর্কিত প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান, যাহার ফলে একই প্রকার কার্য-প্রণালী অবলম্বন স্বিধাজনক নহে। কিন্তু যদিও কার্য-প্রণালী নিশ্চয়ই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিবে, তথাপি আমাদের সাধারণ নীতি স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত নহে। একস্থানে যাহা মন্দ, অন্যত্রও তাহা নিশ্চয়ই মন্দ। অন্যথা আমাদের উপর এই অভিযোগ আসিবে এবং তাহা করাও হইয়া থাকে যে, আমাদের কোন স্নির্দিষ্ট নীতি অথবা আদর্শ নাই এবং আমরা কেবল নিজেদের ক্ষমতাব্দ্ধির ফিকির খ্ঁজিয়া থাকি।

ধর্মসম্প্রদায় বা অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন-প্রথার বির্দ্ধে অনেক সমালোচনা সঙ্গতভাবেই করা হইয়া থাকে। উহা গণতন্ত্রের সহিত সম্প্র্ণর্পে সামঞ্জস্যহীন একথাও বলা হয়। অবশ্য কি গণতন্ত্র, কি যাহাকে দায়িত্বপ্র্ণ শাসন-পদ্ধতি বলা হয়, তাহা কিছ্তেই সম্ভব নয়, যদি নির্বাচক-মণ্ডলীকে বিভিন্ন ধর্মের গণ্ডী দিয়া পৃথক করিয়া রাখা হয়। কিন্তু পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও হিন্দ্মহাসভার অন্যান্য নেতারা উহার অতিমাত্রায় উগ্র ও অবিশ্রান্ত সমালোচক হইয়াও, দেশীয় রাজ্যের ব্যবস্থাগ্লিতে মৌন-সম্মতি প্রদান করেন এবং দৃশ্যতঃ তাঁহারা দেশীয় রাজ্যের স্বৈরশাসনের সহিত অবশিষ্ট ভারতের গণতন্ত্রের (ইহাই বলা হইয়া থাকে) যুক্তরাষ্ট্রীক ঐক্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; ইহা অপেক্ষা সামঞ্জস্যহীন ও অযৌক্তিক ঐক্য কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু হিন্দ্-মহাসভার গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সমর্থক বীরগণ ইহা অক্লেশে গলাধঃকরণ করেন। আমরা ন্যায় ও সঙ্গতিরক্ষার কথা ম্খে বলি কিন্তু আসলে আমরা ভাবা-বেগে চালিত হই।

কংগ্রেস ও দেশীয় রাজ্যের স্ববিরোধিতার মধ্যে ফিরিয়া আসা যাউক। আমার মনে পড়ে টমাস পেইনের কথা,—প্রায় শতাব্দীপ্র্বে তিনি বার্ককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "তিনি পালকের জন্য দ্ঃখ করেন, কিন্তু মরণোন্ম্খ পাখীর কথা ভুলিয়া যান।" গান্ধিজী নিশ্চয়ই মরণোন্ম্খ পাখীর কথা ভুলেন না। কিন্তু পালকের জন্য এত বেশী দরদ প্রকাশ কেন?

তাল্কদারী বা বৃহৎ জমিদারী প্রথা সম্পর্কেও এই কথা অল্প-বিস্তর বলা চলে। এই সকল অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান য্গে অচল এবং ইহা উৎপাদন ও সাধারণ উন্নতির বিঘ্ন, ইহা লইয়া তর্ক করাও বিড়ম্বনা মাত্র। ক্রমবর্ধিত ধনতন্ত্রবাদের সহিত ইহার বিরোধিতা বিদ্যমান এবং প্রায় সমগ্র জগতে বৃহৎ জমিদারীপ্রথা ক্রমশঃ ল্প্ত হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কৃষক-মালিক শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। আমি সর্বদাই মনে করি ভারতে একমাত্র সম্ভবপর ও সঙ্গত

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইল ক্ষতিপূরণের কথা; কিন্তু গত বৎসর বা ইহার কাছাকাছি কোন সময়ে আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, তালুকদারী প্রথা বর্তমান আকারেই চলিতে থাকুক, ইহা গান্ধিজী অনুমোদন করেন। ১৯৩৪-এর জুলাই মাসে তিনি কাণপুরে বলিয়াছিলেন,—"জমিদার ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপন উভয় পক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন দ্বারা সাধন করা যাইতে পারে। যদি তাহা করা যায়, তাহা হইলে উভয়েই শান্তি ও সৌহার্দ্যের সহিত বাস করিতে পারে। তিনি কখনও তালুকদারী বা জমিদারী-প্রথা বিলোপের পক্ষপাতী নহেন এবং যাহারা মনে ভাবে উহা বিলুপ্ত করাই উচিত, তাহারা নিজেদের মনোভাবই বুঝিতে পারে না।" শেষোক্ত অভিযোগটি অন্ততঃ পক্ষে সুবিবেচনা নহে।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে,—"যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত ভূস্বামীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়ার দলে আমি নই। আমার উদ্দেশ্য হইল তোমাদের হৃদয়-স্পর্শ করিয়া তোমাদিগকে স্বমতে আনয়ন করা; (তিনি বড় জমিদারদের এক ডেপুটেশনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন) যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রজা-বৃন্দের অছিস্বরূপ সম্পত্তি রক্ষা কর এবং প্রধানতঃ তাহাদের কল্যাণের জনাই উহা ব্যয় কর।.........কিন্তু ধরিয়া লওয়া যাউক, যদি কেহ অন্যায়রূপে তোমা-দিগকে সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে, তাহা হইলে তোমরা দেখিবে, আমি তোমাদের হইয়া সংগ্রাম করিব। পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্রবাদ অথবা কম্যুনিজম এমন কতকগুলি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা আমাদের মূলবিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। উহাদের ধারণাগুলির মধ্যে একটি এই যে, উহারা মনুষ্যস্বভাবের মধ্যে স্বার্থপরতার প্রাধান্য বিশ্বাস করিয়া থাকে।. . ...আমাদের সমাজতন্ত্রবাদ বা কম্যুনিজম অহিংসার উপর এবং ধনী ও শ্রমিক, জমিদার ও প্রজার সামঞ্জস্য-পূর্ণ সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণাগুলির মধ্যে এরূপ মূলগত কোন পার্থক্য আছে কি না আমার জানা নাই। সম্ভবতঃ তাহা আছে। কিন্তু অল্পদিন হইল একটি দৃশ্য দেখিতেছি যে ভারতীয় ধনী ও জমিদারেরা, তাহাদের পাশ্চাত্য সমধর্মীদের তুলনায়, শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি অধিকতর উদাসীন। প্রজাবৃন্দের মঙ্গলের জন্য কোন জনহিতকর কার্যে অনুরাগ প্রদর্শনের কোন চেষ্টা ভারতীয় জমিদারগণ করেন না। পাশ্চাত্যদেশবাসী মিঃ এইচ. এন. ব্রেইলস্‌ফোর্ড অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,—"সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ভারতীয় মহাজন ও জমিদারদের মত অর্থগৃধ্নু পরগাছা আর কোথাও নাই।"* সম্ভবতঃ দোষ ভারতীয় জমিদারদের নহে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে তাঁহাদের ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে এবং বর্তমানে তাঁহারা এমন সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াছেন যে নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। অনেক বড় বড় জমিদারের ভূসম্পত্তি মহাজনের কবলে গিয়াছে, ছোটখাট জমিদার, যাঁহারা পূর্বে যে জমির মালিক ছিলেন এখন তাঁহারাই প্রজার স্তরে নামিয়া গিয়াছেন। সহরবাসী ধনী মহাজনেরা জমিদারী বন্ধক ও রেহান রাখিয়া টাকা দাদন করিয়াছেন এবং তারপর নিজেরা জমিদার হইয়া বসিয়াছেন। গান্ধিজীর মতে এই সকল ব্যক্তি যাঁহাদের জমি কাড়িয়া লইয়াছেন, তাঁহাদেরই অছিস্বরূপ হইবেন এবং প্রত্যাশা করিতে হইবে যে ইঁহারা ইঁহাদের উপার্জন প্রধানতঃ প্রজাসাধারণের কল্যাণে ব্যয় করিবেন।

যদি তালুকদারী প্রথা ভালই হয়, তাহা হইলে সমস্ত ভারতে উহা প্রবর্তন

---

* ব্রেইলস্‌ফোর্ড প্রণীত [illegible]

করা হয় না কেন? ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহ্ কৃষক-জমিদার হইয়াছে। গ্জরাটে বড় বড় জমিদারী বা তাল্কদারী স্ষ্টি করিতে গান্ধিজী রাজী হইবেন কি? আমার তো মনে হয় না। কিন্তু য্ক্ত-প্রদেশ, বাঙলা ও বিহারের পক্ষে এক-প্রকার ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থা ভাল কেন, আর কেনই বা গ্জরাট ও পাঞ্জাবের জন্য ভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা ভাল? ভারতের উত্তর, প্র্ব, পশ্চিম বা দক্ষিণের জনসাধারণের মধ্যে কোন মর্মান্তিক ব্যবধান নাই এবং তাহাদের ম্লধারণাগ্লির ভিত্তি এক। তাহা হইলে কথা এই দাঁড়ায় যে যাহা আছে তাহাই চলিতে থাকুক এবং বর্তমান ব্যবস্থা রক্ষা করিতেই হইবে। জনসাধারণের পক্ষ হইতে কি বাঞ্ছনীয় অথবা হিতকর সে সম্বন্ধে অর্থনৈতিক কোন অন্সন্ধানের প্রয়োজন নাই, বর্তমানে ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের কোন চেষ্টার আবশ্যক নাই; কেবল জনসাধারণের হ্দয়ের পরিবর্তন সাধন করাই প্রয়োজন। ইহা জীবন ও তাহার সমস্যাকে নিছক ধর্মের দিক হইতে দেখিবার চেষ্টা মাত্র। ইহার সহিত রাজনীতি, অর্থনীতি অথবা সমাজবিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই। তথাপি গান্ধিজী রাজনীতি ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে ইহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন।

অদ্যকার ভারতবর্ষ এই শ্রেণীর কতকগ্লি স্ববিরোধিতার সম্ম্খীন হইয়াছে। আমরা যে কোন প্রকারেই হউক কতকগ্লি জটিল বন্ধনে নিজেদের আবন্ধ করিয়াছি, এখন ঐগ্লি খ্লিয়া না ফেলিলে অগ্রসর হওয়া কঠিন। কেবল মাত্র ভাবাবেগের দ্বারা বন্ধনম্ক্তি আসিবে না। শ্রেষ্ঠতর কি? স্পিনোজা বহ্ প্র্বেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"জ্ঞান ও উপলব্ধির মধ্য দিয়া ম্ক্তি অথবা ভাবাবেগের বন্ধন?" তিনি প্রথমটিই লইয়াছিলেন।

৬৩

হ্দয়ের পরিবর্তন না বলপ্রয়োগ

ষোল বৎসর প্র্বে গান্ধিজী অহিংসা-নীতি প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে মন্ত্র-ম্গ্ধ করিয়াছিলেন। তখন হইতে ইহা ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে। বহ্ লোক চিন্তা না করিয়া ইহা সমর্থন করিয়াছে, কেহ বা ইহার সহিত তর্ক ও বিচার করিয়া আংশিক অথবা সমগ্রভাবে ইহা গ্রহণ করিয়াছে, কেহ প্রকাশ্যে ইহা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছে। আমাদের রাজনৈতিক ও সমাজ-জীবনে ইহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক এবং ইহা জগতের দ্ষ্টিও বহ্ল পরিমাণে আকর্ষণ করিয়াছে। অহিংসাতত্ত্ব অতি প্রাচীন, কিন্তু সম্ভবতঃ গান্ধিজীই প্রথম উহা ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে প্রয়োগ করেন। প্র্বে ইহা বিশেষভাবে ব্যক্তিগত এবং প্রধানতঃ ধর্মের সহিত য্ক্ত ছিল। ইহা ছিল ম্ক্তিকামীর বৈরাগ্য-সাধনার আত্মসংযম, যাহার সহায়ে সে জগতের স্বার্থসংঘাত হইতে নিজেকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া লইত। ব্হত্তর সামাজিক সমস্যা সমাধান অথবা সামাজিক পরিবর্তনের জন্য ইহার প্রয়োগ অপরিজ্ঞাত ছিল, থাকিলেও তাহা ছিল অত্যন্ত গৌণ ব্যাপার। সমস্ত বৈষম্য ও অবিচার-সহ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা প্রায় সকলেই মানিয়া লইত। ব্যক্তিগত জীবনের এই আদর্শকে গান্ধিজী সমাজের সমষ্টিগত আদর্শে পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন-প্রয়াসী এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি বিশেষ বিবেচনা সহকারে অহিংসানীতি ব্যাপক-

ভাবে এবং সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষেত্রে প্রবর্তন করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "মানুষের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে, সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি ব্যতীত তাহা সম্ভবপর নহে। দুই উপায়ে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে, বলপ্রয়োগ দ্বারা কিম্বা অহিংসা দ্বারা। হিংসার উৎপীড়ন দেহধারী মানুষ অনুভব করে; ইহা বলপ্রয়োগকারীকে অধঃপতিত করে, নিপীড়িতকে অবসন্ন করে; কিন্তু অহিংসার প্রভাব আত্মনিগ্রহ হইতে উৎসারিত (যেমন উপবাস) এবং ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপায়ে কার্য করে। ইহা দেহকে স্পর্শও করে না, যাহাদের বিরুদ্ধে ইহা প্রয়োগ করা হয়, তাহাদের নৈতিক বোধকে ইহা জাগ্রত করিয়া তোলে।"*

এই ভাবের সহিত ভারতীয় চিন্তাধারার কিছু সামঞ্জস্য আছে বলিয়া, ভাসা ভাসা ভাবে হইলেও, দেশ উৎসাহের সহিত ইহা গ্রহণ করিল। ইহার দূরপ্রসারী গভীরতা অল্প লোকেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তিও বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে ইহা একরূপ অস্পষ্টভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন কার্যের উৎসাহ শিথিল হইয়া আসিল, তখন লোকের মনে অগণিত প্রশ্ন জাগিতে লাগিল, তখন সকলের জিজ্ঞাসার সদুত্তর দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। এই সকল প্রশ্নের রাজনীতিক্ষেত্রে উপস্থিত উপায়ের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। অহিংস প্রতিরোধের ভাবের পশ্চাতে যে দার্শনিক তত্ত্ব রহিয়াছে, প্রশ্নগুলি তাহার সহিতই জড়িত। রাজনৈতিকভাবে এ পর্যন্ত অহিংস আন্দোলন সফলতা লাভ করে নাই, কেননা ভারত সাম্রাজ্যবাদের পাপ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সমাজেও ইহা কোন আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই। তথাপি যাঁহার সামান্য দূর-দৃষ্টিও আছে, তিনিই লক্ষ্য করিবেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে ইহা কি বিচিত্র পরিবর্তন, আনিয়াছে! ইহা তাহাদিগকে চরিত্রবল দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, আত্মনির্ভরতা শিখাইয়াছে, এই সকল গুণ ব্যতীত রাষ্ট্র ও সমাজে কোন উন্নতি সাধন বা রক্ষা করা কঠিন। ইহা অহিংসা হইতে উদ্ভূত, না, সংঘর্ষ হইতেই সম্ভব হইয়াছে, বলা কঠিন। হিংসামূলক সংঘর্ষেও বহু ব্যক্তি বহু ঘটনায় ঐ প্রকার গুণাবলী অর্জন করিয়াছে। তথাপি আমি দৃঢ়তার সহিত বলিব, অহিংস উপায়ে আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা অমূল্য। ইহা গান্ধীজী-কথিত সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে, অবশ্য মূলদেশে আলোড়নের কারণ ও অবস্থা বিদ্যমান ছিল, ইহাও নিঃসন্দেহ। তবে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পূর্ববর্তী আয়োজনে ইহা জনগণের মধ্যে গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে।

ইহা অহিংসার স্বপক্ষে অনুকূল যুক্তি হইলেও ইহা আমাদিগকে অধিক দূরে লইয়া যায় না। প্রকৃত প্রশ্নগুলি, প্রশ্নই রহিয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্যা সমাধানে গান্ধীজীও আমাদের সাহায্য করেন না। তিনি এ বিষয়ে বহুবার বলিয়াছেন, বহুবার লিখিয়াছেন, কিন্তু কি বৈজ্ঞানিক†, কি দার্শনিক ভাবে ইহার সমগ্র দিক প্রকাশ্যভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেন নাই। তিনি উদ্দেশ্য অপেক্ষা উপায়কে অধিক গুরুত্ব দিয়া তাহার উপর জোর দেন, পীড়ন অপেক্ষা হৃদয়ের পরিবর্তন উৎকৃষ্টতর বলেন এবং অহিংসার সহিত সত্য ও অন্যান্য সদ্‌গুণ প্রায় সমানার্থক করিয়া তোলেন। সময় সময় তিনি সত্য ও অহিংসা একই অর্থে

---

* ১৯৩২-এর ৪ঠা ডিসেম্বর গান্ধীজীর অনশনের প্রাক্কালে প্রদত্ত বিবৃতি হইতে গৃহীত।

† রিচার্ড বি. গ্রেগ তাঁহার "পাওয়ার অব্ নন-ভায়োলেন্স" পুস্তকে এই বিষয়টি বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থখানিতে চিন্তা করিবার অনেক কিছু আছে।

ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইহার সহিত একমত নহেন, তাঁহাদিগকে অন্তরঙ্গ-মণ্ডলীর বাহিরের লোক বলিয়া গণ্য করিবার ভাবও রহিয়াছে, যেন তাঁহারা নৈতিক বিধিভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। তাঁহার কোন কোন অনুগামী ইহাকে আত্ম-পবিত্রতাসাধন বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই বিশ্বাস দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অবশ্য বহুতর সংশয়ে পীড়িত হন। এই সন্দেহের সহিত উপস্থিত প্রয়োজনের সামঞ্জস্য নাই, কিন্তু মানুষ তাহার কর্মের এমন একটা সঙ্গতিবিশিষ্ট দর্শন চাহে যাহা ব্যক্তির দিক হইতে নৈতিক হইবে এবং সমাজ-জীবনে হইবে কার্যকরী। আমি অকপটে স্বীকার করিব যে, আমি এই সন্দেহ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই এবং সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধানও আমি দেখি না। আমি হিংসা অত্যন্ত অপছন্দ করিলেও আমার নিজের মন হিংসায় পরিপূর্ণ; জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমি অপরকে পীড়ন করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু গান্ধিজী যে ভাবে অপরকে মানসিক পীড়ন করেন তাহাপেক্ষা অধিক পীড়ন আর কি হইতে পারে? যাহার ফলে তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুগামী ও সহ-কর্মীদের মন একেবারে তালগোল পাকাইয়া যায়।

কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন এই—জাতীয় বা সামাজিক শ্রেণীগুলি কি ব্যক্তিগত অহিংসার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারে? কেন না, মনুষ্যজাতি প্রেম ও সততার উচ্চস্তরে উঠিলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। মনুষ্যজাতিকে ঐ উচ্চস্তরে তুলিয়া ঘৃণা, কদর্যতা ও স্বার্থপরতার অবসান করার চরম আদর্শ যে কাম্য, তাহা সত্য। ইহা সম্ভব কি অসম্ভব, কোন কালে ইহা হইবে কি না, তাহা অবশ্যই বিচারের বিষয়, কিন্তু এইরূপ আশা ব্যতীত জীবন লক্ষ্যহীন অর্থহীন কোলাহল মাত্র। ঐ আদর্শ লাভ করিতে হইলে কি আমরা প্রত্যক্ষভাবে ঐ সদ্‌গুণগুলি প্রচার করিব, বাধাগুলি গণনার মধ্যে আনিব না? কিন্তু দেখা যাইতেছে বাধাগুলি সাফল্যের অন্তরায় হইয়া বিপরীত প্রবৃত্তি জাগ্রত করিতেছে। অথবা সর্বাগ্রে বাধাগুলি দূর করিয়া, প্রেম, সৌন্দর্য ও সততার অনুকূল ও উপযোগী আবহাওয়া আমরা সৃষ্টি করিব? অথবা উভয় উপায় লইয়াই কার্য করিতে হইবে?

তার পর হিংসা ও অহিংসা, হৃদয়ের পরিবর্তন ও বলপ্রয়োগের মধ্যে সীমা-রেখা কি খুব স্পষ্ট? দৈহিক বলপ্রয়োগ অপেক্ষাও সময় সময় নৈতিক শক্তি অধিকতর পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। অহিংসা ও সত্য কি সমানার্থবাচক? সত্য কি, এই প্রাচীন প্রশ্নের সহস্র উত্তর দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রশ্ন, প্রশ্নই আছে। ইহা যাহাই হউক, নিশ্চয়ই ইহাকে অহিংসার সহিত একত্র করিয়া দেখা যায় না। হিংসা মন্দ হইলেও, ইহা স্বভাবতঃই দুর্নীতিমূলক একথা বলা যায় না। ইহারও নানা রূপ বা স্তর আছে, সময় সময় অধিকতর হীনকার্য হইতে হিংসা অবলম্বন প্রশস্ত। গান্ধিজী নিজেও বলিয়াছেন, কাপুরুষতা, ভয় ও দাসত্ব হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ; আরও অনেক অন্যায় এই তালিকায় জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। হিংসার সহিত প্রায়ই কুভাব জড়িত থাকে সত্য, কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে সর্বদাই যে ঐরূপ হইবে এমন কোন কথা নাই। সদিচ্ছা হইতেও হিংসা সম্ভব (যেমন অস্ত্রচিকিৎসক) এবং সদিচ্ছা যাহার ভিত্তি তাহা কখনও স্বরূপতঃ দুর্নীতি হইতে পারে না। যাহা হউক, সাধু ইচ্ছা ও কু-অভিপ্রায় এই দুইটিই হইল শিষ্টাচার ও নীতির চরম পরীক্ষা। নৈতিক যুক্তির দিক দিয়া হিংসা প্রায়ই অন্যায়, এমন কি বিপজ্জনকও হইতে পারে; কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যে হইবে এমন কোন কথা নাই।

সমস্ত জীবনই হিংসা ও সংঘর্ষে পরিপূর্ণ। হিংসা হইতে হিংসার উদ্ভব হয় এবং হিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করা যায় না, ইহাও সত্য। কিন্তু তথাপি শপথ গ্রহণ করিয়া ইহা সর্বতোভাবে বর্জন করিলে জীবনের সহিত সম্পর্কহীন এক নেতিবাচক অবস্থায় উপনীত হইতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার হিংসাই প্রাণবস্তু। রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগে বাধ্য করার ব্যবস্থাগুলি না থাকিলে ট্যাক্স আদায় হইত না, জমিদারেরা খাজনা পাইত না, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হইত। আইন সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর অপরের হস্তক্ষেপ নিবারণ করে। আক্রমণ ও প্রতিরোধ উভয়বিধ হিংসার উপরই জাতীয় রাষ্ট্রগুলি প্রতিষ্ঠিত।

গান্ধিজীর অহিংসা নিশ্চয়ই নিছক নেতিবাচক ব্যাপার নহে, ইহা সত্য। ইহা অপ্রতিরোধ নহে। ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অহিংস-প্রতিরোধ, ইহা প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয়। যাহারা প্রচলিত ব্যবস্থা নিরীহভাবে মানিয়া লয়, ইহা তাহাদের জন্য নহে। "সামাজিক আলোড়ন" আনিবার উদ্দেশ্যেই ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে, যাহা হইতে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হইবে। ইহার মধ্যে হৃদয়ের পরিবর্তনের যে প্রকার উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, বলপূর্বক বাধ্য করিবার পক্ষেও ইহা এক শক্তিশালী অস্ত্র, তবে ইহার বলপ্রয়োগভঙ্গী অতিমাত্রায় শিষ্ট এবং তাহাতে আপত্তি করিবার বিশেষ কিছু নাই। গান্ধিজী তাঁহার প্রথম দিকের লেখাগুলিতে "বাধ্য করা" এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। পাঞ্জাব সামরিক আইনের অন্যায় সম্পর্কে ১৯২০ সালে বড়লাটের (লর্ড চেমস্‌ফোর্ড) বক্তৃতার সমালোচনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"......আইনসভার উদ্বোধন করিয়া বড়লাট যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমি যে মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে কোন আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার কিম্বা তাঁহার গভর্ণমেণ্টের সংশ্রবে যাওয়া অসম্ভব।

"পাঞ্জাব সম্পর্কে মন্তব্যের অর্থ ক্ষতিপূরণ করিতে সরাসরি অস্বীকার। তিনি চাহেন আমরা আসন্ন 'ভবিষ্যতের' দিকে অধিকতর মনোযোগী হই। আসন্ন ভবিষ্যতে পাঞ্জাবের ঘটনার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুতাপ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পক্ষান্তরে বড়লাট তাঁহার সমালোচকদের উত্তর দিতে বিরত থাকিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতের মর্যাদার সহিত সংশ্লিষ্ট গুরুতর ব্যাপারগুলি সম্পর্কে তাঁহার মতের কোন পরিবর্তন হয় নাই। তিনি "ইতিহাস ইহার বিচার করিবে, এই ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত।" আমার মতে, এই শ্রেণীর ভাষা ভারতীয়দের মনকে অধিকতর ক্ষুব্ধ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে। ইতিহাসের সিদ্ধান্ত অনুকূল হইলেই বা তাহাদের কি আসে যায়, যাহারা অন্যায় সহ্য করিয়াছে এবং যখন যে সকল কর্মচারী দায়িত্বপূর্ণ বিশ্বস্তপদে থাকিবার অযোগ্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে, তাহাদেরই পায়ের তলায় এখনও থাকিতে হইতেছে? পাঞ্জাবের সুবিচারের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া, সহযোগিতার কথা উত্থাপন করা ভণ্ডামী মাত্র।"

গভর্ণমেণ্টগুলি অতি নিন্দনীয় হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল সমস্ত সৈন্য-বাহিনীর প্রকাশ্য হিংসার উপর নহে; অধিকতর ভয়াবহ হিংসা অতি সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহার অস্ত্র গোয়েন্দা, গুপ্তচর, প্ররোচক চর, শিক্ষাবিভাগ, সংবাদপত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিথ্যা প্রচারকার্য, ধর্ম ও অন্যান্য ভীতি, অর্থনৈতিক শোষণ এবং অনশন। দুইটি গভর্ণমেণ্টের মধ্যে, যুদ্ধ না থাকিলে সকল প্রকার মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতা সর্বদাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয়।

শান্তির সময়ও ইহা চলে, যুদ্ধের সময় তো কথাই নাই। তিনশত বৎসর পূর্বে স্যর হেনরী ওটন, কবি এবং স্বয়ং একজন ব্রিটিশ রাজদূত হইয়াও, রাজদূতের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন যে, "একজন সাধু ব্যক্তিকে, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য বিদেশে মিথ্যাপ্রচারের জন্য প্রেরণ করা হয়।" অধুনা রাষ্ট্রদূতগণ সামরিক, নৌ-বহর, ব্যবসায়-সংক্রান্ত পরামর্শদাতাদের লইয়া দূতাবাসে বাস করেন, তাঁহাদের প্রধান কার্যই হইল, ঐ দেশে গোয়েন্দাগিরি করা। তাঁহাদের পশ্চাতে থাকে, গুপ্তচর-বিভাগের সুবিস্তৃত দূরপ্রসারিত শাখাপ্রশাখার বেড়াজাল; কত ষড়যন্ত্র ও শঠতার আয়োজন, ইহার গোয়েন্দা এবং গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দা, সমাজের গোপন স্তরের অপরাধীদের সহিত সম্পর্ক, উৎকোচ ও মনুষ্যকে চরিত্রভ্রষ্ট করিবার আয়োজন এবং গুপ্ত হত্যাকাণ্ড। শান্তির সময় ইহা গর্হিত সন্দেহ নাই, কিন্তু যুদ্ধের সময় ইহার গুরুত্ব অতিমাত্রায় বাড়িয়া যায় এবং ইহার মারাত্মক প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় প্রচার-কার্যের কতকগুলি দৃষ্টান্ত আজকাল পড়িলে অবাক হইতে হয়, কি ভাবে শত্রু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা প্রচার করা হইয়াছে এবং ইহার জন্য ও গোয়েন্দা বিভাগের জন্য কি বিপুল অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। আজকাল শান্তির অর্থ দুইটি যুদ্ধের মধ্যে বিরাম মাত্র, যুদ্ধের আয়োজন চলিতে থাকে এবং কতক পরিমাণে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকে। বিজেতার সহিত বিজিতের, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত তাহাদের অধীন ঔপনিবেশিক দেশগুলির, সুবিধাবাদী শ্রেণীর সহিত শোষিত শ্রেণীর সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে। হিংসা ও মিথ্যার সমস্ত আয়োজন লইয়া যুদ্ধের আবহাওয়া, তথাকথিত শান্তির সময়ও বিদ্যমান থাকে; কি সৈনিক, কি সাধারণ কর্মচারী সকলকে এই একই অবস্থার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়। "যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কর্তব্য" শীর্ষক পুস্তকে লর্ড উলস্‌লে লিখিয়াছেন,—"আমরা সততই এই বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিব যে, 'সততাই সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি এবং ইহাই পরিণামে জয়ী হয়', এই সুন্দর বাক্যটি শিশুদের হস্তলিপি-পুস্তকে বেশ মানায়, কিন্তু সত্যই যুদ্ধে যে উহা প্রয়োগ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া রাখাই ভাল।"

জাতির বিরুদ্ধে জাতি, শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী লইয়া বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তিতে হিংসা ও মিথ্যা অপরিহার্য বলিয়াই মনে হয়। সুবিধাভোগী জাতি ও শ্রেণীগুলি তাহাদের ক্ষমতা ও সুবিধা বজায় রাখিবার জন্য এবং যাহাদের উপর তাহারা অত্যাচার করে, তাহাদের উন্নতির সুবিধাগুলি দাবাইয়া রাখিবার জন্য, হিংসা, বলপূর্বক বাধ্য রাখা এবং মিথ্যার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। জনমত শক্তিশালী হইলে এবং এই সংঘর্ষ ও দমন-ব্যবস্থার বাস্তব রূপ অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ হইলে, হিংসা মন্দীভূত হইতে পারে। ইহা সম্ভবপর। কিন্তু আধুনিক অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যতই শক্তিশালী হইতেছে, হিংসানীতিও ততই প্রবল হইতেছে। এমন কি, যখন প্রকাশ্য ভাবে হিংসা মন্দীভূত হইয়াছে, তখনই ইহা অধিকতর সূক্ষ্ম ও মারাত্মক রূপে প্রকাশ পাইতেছে। কি যুক্তিবাদের প্রসার, কি ধর্মজীবন, কি নৈতিক শিক্ষা কিছুতেই এই হিংসাপ্রবণতাকে সংযত করিতে পারিতেছে না। ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি হইয়াছে, মনুষ্যত্বের তুলাদণ্ডে তাহারা অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক আর যে কোন যুগের সহিত তুলনায় বর্তমান জগতে উন্নতমনা ব্যক্তির (সর্বোচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া) সংখ্যা অধিক, সমগ্রভাবে সমাজেরও উন্নতি হইয়াছে, কিয়ৎপরিমাণে আদিম ও বর্বর প্রবৃত্তি সংযত করার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর শ্রেণী বা

সম্প্রদায়ের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ব্যক্তিবিশেষ অধিকতর সভ্য হইয়া তাহারা আদিম প্রবৃত্তি ও পাপ সম্প্রদায়ের মধ্যেই ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। ঐ সকল সম্প্রদায়ের নৈতিক মাপকাঠিতে দ্বিতীয়শ্রেণীর লোকদের হিংসার প্রতি সর্বদাই অনুরাগ আছে বলিয়া, সম্প্রদায়গুলির প্রথম শ্রেণীর নরনারীরা কদাচিৎ নেতৃত্ব করিতে পারেন।

কিন্তু যদি আমরা ধরিয়াও লই যে, হিংসার চরম ও নিষ্ঠুর ব্যবস্থাগুলি ক্রমশঃ রাষ্ট্র হইতে অন্তর্হিত হইবে, তাহা হইলেও গভর্ণমেণ্ট ও সমাজ-জীবনের পক্ষে কি বল-প্রয়োগের প্রয়োজন থাকিয়া যাইবে? ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমাজ-জীবনের জন্য যে কোন আকারেই হউক গভর্ণমেণ্টের আবশ্যক এবং যে সকল লোকের হাতে ক্ষমতা থাকিবে তাহাদিগকে ব্যক্তি ব দলের প্রকৃতিগত স্বার্থপরতা সংযত ও দমন করিতেই হইবে, নতুবা সমাজের ক্ষতি হইতে পারে। সাধারণতঃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলপ্র য়োগ করে, কেন না ক্ষমতা চরিত্রকে কলুষিত ও অধঃপতিত করে। যাহা হউক, শাসকগণ যত স্বাধীনতা-প্রেমিক হউন এবং বলপ্রয়োগ যতই ঘৃণা করুন না কেন, বিশেষ বিশেষ বেয়াড়া ব্যক্তিকে শান্ত করিবার জন্য তাঁহাদের বলপ্রয়োগ করিতেই হইবে। যতদিন না রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসী সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও সর্বজনীন কল্যাণের অনুরাগী হইতেছে, ততদিন ইহার আবশ্যক। কিন্তু ঐ আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকগণকেও, বাহিরের পরধনলোভীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, বল লইয়াই বলের সম্মুখীন হইতে হইবে। যখন সমগ্র জগতে একরাষ্ট্র হইবে, তখনই ইহার প্রয়োজন অন্তর্হিত হইবে।

বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা রক্ষার জন্য যদি বল-প্রয়োগ এবং কঠোর ভাবে বাধ্য করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কোথায় সীমারেখা নির্দেশ করা যাইবে? রাইনহোল্ড নাইবুর* বলিতেছেন, "নীতিশাস্ত্র যদি একবার রাষ্ট্রনীতিকে এই চরম স্বাধীনতা দিয়া থাকে এবং বলপ্রয়োগ সামাজিক সাম্যরক্ষার প্রয়োজনীয় অস্ত্ররূপে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, হিংস কি অহিংস ধরণের বলপ্রয়োগ, গভর্ণমেণ্টের বলপ্রয়োগ কিম্বা বিপ্লবীর বলপ্রয়োগ, এই উভয়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন।"

আমি নিশ্চিতরূপে না জানিলেও আমার মনে হয়, গান্ধিজীও স্বীকার করিবেন, এই অপূর্ণ জগতে বাহির হইতে, অন্যায় আক্রমণ হইতে, আত্মরক্ষার জন্য যে কোনও জাতীয় রাষ্ট্রকে বাহুবল প্রয়োগ করিতে হইবে। অবশ্য সেই রাষ্ট্র, প্রতিবেশী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি শান্তিপূর্ণ মৈত্রীভাব প্রদর্শন করিবে, কিন্তু তথাপি আক্রমণের সম্ভাবনা একেবারেই অস্বীকার করা অযৌক্তিক। রাষ্ট্রকে কতকগুলি বলপ্রয়োগমূলক আইনও প্রণয়ন করিতে হইবে, একদিক দিয়া ঐগুলি কোন কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের কতকগুলি অধিকার ও সুবিধা হরণ করিবে এবং কাজকর্মের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিবে। সমস্ত আইনই [illegible] ভীতিপ্রদর্শনমূলক। কংগ্রেসের করাচী-সিদ্ধান্তে উল্লিখিত হইয়াছে, "জনসাধারণের শোষণের অবসান করিবার জন্য, রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে অনশনক্লিষ্ট কোটি কোটির প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও স্থান থাকিবে।" এই সাধু অভিপ্রায়কে, কার্যে পরিণত করিতে হইলে অতিরিক্ত-সুবিধাবাদীদের সুবিধাহীনদের জন্য কিছু ছাড়িতে হইবে। তাহা ছাড়া ইহাও বলা হইয়াছে যে, শ্রমিকেরা বাঁচিয়া থাকিবার

---

* মরাল ম্যান এণ্ড ইম্‌মরাল সোসাইটী।

মত মজুরী ও অন্যান্য সুবিধা পাইবে; ধনসম্পত্তির উপর বিশেষ কর ধার্য হইবে, "মূল শিল্পগুলি, সাধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবসায়, রেলওয়ে, জলপথ, নৌবাণিজ্য প্রভৃতি ও সাধারণের যানবাহনাদি রাষ্ট্রের অধিকারে আসিবে এবং নিয়ন্ত্রিত হইবে"; এবং "সর্ববিধ মাদক দ্রব্যের প্রচলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে"। বহু-সংখ্যক ব্যক্তিই এই সকলের প্রতিবাদ করিবে, সে সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহারা অধিকাংশের ইচ্ছার বশীভূত হইতে পারে, কিন্তু অবাধ্যতার পরিণাম চিন্তা করিয়া ভয়েই তাহারা ঐরূপ করিবে। গণতন্ত্রের অর্থই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলপ্রয়োগে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে নিরস্ত রাখে।

সম্পত্তির উপর অধিকার সঙ্কোচ করিয়া অথবা বহুলাংশে বিলোপ করিয়া, সংখ্যাগরিষ্ঠ যদি কোন আইন প্রণয়ন করে, তাহাকে বলপ্রয়োগ বলিয়া কি আপত্তি করা হইবে? প্রকাশ্য ভাবে তাহার উপায় নাই; কেন না গণতান্ত্রিক আইন এই প্রথাতেই প্রণীত হয়। বড় জোর বলা যাইতে পাইতে পারে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদল অন্যায় বা অনীতিক কার্য করিতেছেন। তখন বিবেচনার বিষয় হইবে এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদল নীতিশাস্ত্রের কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন কিনা? কে ইহার মীমাংসা করিবে? যদি ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে স্ব স্ব স্বার্থের অনুকূল করিয়া নীতিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অবসান হইবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা এই, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ফলে (খুব সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট সম্পত্তি ছাড়া) সমগ্র সমাজের উপর আধিপত্য করিবার মারাত্মক ক্ষমতা লোকের হাতে দেওয়া হয়, অতএব ইহা সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। আমি উহাকে মদ্যপান অপেক্ষাও দুর্নীতি বলিয়া মনে করি। কেন না, মদ্যপান দ্বারা সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিরই অধিক ক্ষতি হয়।

যাহা হউক, যাঁহারা অহিংসপন্থায় বিশ্বাসী এমন অনেক লোকের নিকট আমি শুনিয়াছি যে, মালিকের সম্মতি ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার চেষ্টা অহিংসনীতি-বিরোধী। এই কথা আমাকে এমন সব বড় জমিদার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া বলপূর্বক খাজনা আদায় করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, এমন সব বহু কারখানার মালিক বলিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদের এলাকার স্বাধীন শ্রমিকসঙ্ঘ গঠনের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন! জনসাধারণের অধিকাংশের পরিবর্তনের ইচ্ছা থাকিলেই চলিবে না, যে সকল ব্যক্তির ক্ষতি হইবে, তাহাদেরও হৃদয়ের পরিবর্তন করিতে হইবে; ইহাই কথা। কিন্তু এ ভাবে মুষ্টিমেয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে কোনও আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের গতি রোধ করিতে পারে।

ইতিহাসের মধ্যে এই সত্যটি ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, অর্থনৈতিক স্বার্থই দল বা শ্রেণীর রাজনৈতিক মত গড়িয়া তোলে। যদিও ইহা বিরল, তথাপি ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ের পরিবর্তন করা যাইতে পারে, তাহারা বিশেষ সুবিধা ত্যাগও করিতে পারে; কিন্তু দল বা শ্রেণী কখনও তাহা করে না। শাসক অথবা সুবিধাভোগী শ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্তন দ্বারা ক্ষমতা ও বিশেষ সুবিধা বর্জন করাইবার চেষ্টা এতাবৎ কাল ব্যর্থই হইয়াছে এবং এমন কোন যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না যে, ভবিষ্যতে তাহা সফল হইবে। রাইনহোল্ড নাইবুর তাঁহার পুস্তকে নীতি-বাদীদের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দিয়াছেন যে,—"যাহারা মনে করে যে, মানুষের আত্মাভিমান যুক্তিবাদের পরিপুষ্টির সহিত অথবা ধর্মচিন্তাপ্রসূত সদিচ্ছার দ্বারা অধিকতর সংযত হইবে এবং সমস্ত মনুষ্য-সমাজ ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সামাজিক সাম্য স্থাপনের জন্য এই উপায়েরই প্রয়োজন—এই সমস্ত নীতিবাদী, মনুষ্য-

সমাজে সুবিচারের জন্য আগ্রহের মধ্যে রাজনৈতিক প্রয়োজনগুলি গণনার মধ্যে আনিতে পারে না, তাহারা ইহাও বুঝিতে পারে না যে, মানুষের ব্যবহারের মধ্যে যে সকল বস্তু রহিয়াছে, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে বিস্তৃত এবং তাহা কখনও সম্পূর্ণরূপে যুক্তি বা বিবেকের আয়ত্তে আনা সম্ভবপর হইবে না। তাহারা ইহাও বুঝিতে পরে না যে, সম্মিলিত শক্তি, তাহা সাম্রাজ্যনীতিরই হউক আর শ্রেণী-প্রাধান্যেরই হউক, যখন দুর্বলকে শোষণ করে তখন তাহার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ব্যতীত উহাকে কিছুতেই স্থানভ্রষ্ট করা যায় না।" আরও বলিয়াছেন, "যখন দেখা যাইতেছে যুক্তি অনেকাংশে সামাজিক ও বিশেষ অবস্থা হইতে উদ্ভূত স্বার্থের দাস, তখন কেবলমাত্র নৈতিক বা যৌক্তিক প্ররোচনা দ্ব … কোন সামাজিক সুবিচারের মীমাংসা করা যায় না।......সংঘর্ষ অনিবার্য এবং এই সংঘর্ষে শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিই প্রয়োগ করিতে হইবে।"

অতএব কোন জাতি বা শ্রেণীর সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ের পরিবর্তন সম্ভব কিংবা যুক্তিসঙ্গত তর্ক বা সুবিচারের দোহাই দিয়া সংঘর্ষ নিবারণ সম্ভব, একথা যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা আত্মসম্মোহন করেন মাত্র। বলপ্রয়োগের সমতুল্য কার্যকরী চাপ না দিলে, কোন শ্রেণী তাহার সুবিধা ও উন্নত প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিবে অথবা কোন দেশের উপর প্রভুত্বের আসনে সমাসীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাহার ক্ষমতা ত্যাগ করিবে, এরূপ চিন্তা বাতুলতা মাত্র।

গান্ধিজী এইরূপ চাপই দিতে চাহেন, কিন্তু তাহাকে বলপ্রয়োগ বলিতে চাহেন না। তাঁহার মতে তাঁহার উপায় হইল আত্মপীড়ন। ইহা লইয়া বিচার করা কঠিন, কেন না ইহার মধ্যে এমন একটা দার্শনিক বস্তু আছে, যাহা কোন বাস্তব উপায়ে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রতিপক্ষের উপর ইহা প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে সন্দেহ নাই। ইহাতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যে নৈতিক যুক্তি দিতে অগ্রসর হয়, সে বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহার চিত্তে মানবোচিত ভাবের উদ্রেক হয়; ইহাতে আপোষের পথ সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে। প্রেম ও স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ, প্রতিপক্ষ এমন কি, দর্শকদের উপরও এক শক্তিশালী মানসিক প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধিকাংশ শিকারীই জানেন যে, বন্যপশুর সম্মুখীন হইবার ভঙ্গীর মধ্যে অনেক তারতম্য আছে। দূর হইতে সে হিংস্র উন্মাদনা অনুভব করিয়া তাহার প্রতিক্রিয়ার কার্য করিতে চায়। মানুষ ভয় পাইয়াছে, তাহা পশু বুঝিতে পারিয়াছে, অতি চকিতে সম্পূর্ণ অনুভব করিতে না করিতে, মানুষ ভয় পাইয়া আক্রমণ করিয়া বসে। সিংহশিকারী যদি এক মুহূর্তের জন্যও দুর্বলতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আক্রমণের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। অতি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা না ঘটিলে, সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক ব্যক্তির বন্য পশুর নিকট কদাচিৎ বিপদের আশঙ্কা থাকে। অতএব মানুষ যে মানসিক প্রভাবের দ্বারাও অভিভূত হইবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ প্রভাবিত হইলেও শ্রেণী বা দল প্রভাবিত হয় কিনা সন্দেহ। কেন না, কোন শ্রেণী সমগ্রভাবে অপর পক্ষের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে না; এমন কি, যে সমস্ত সংবাদ তাহারা শুনিতে পায়, তাহা আংশিক ও বিকৃত। যাহাই ঘটুক না কেন, কোন দল প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা শুনিবামাত্র লোকের মনে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং এই ক্রোধ এত বেশী হয় যে অন্যান্য ছোটখাট ভাবাবেগ তাহার মধ্যে তলাইয়া যায়। সমাজের ভালর জন্যই তাহাদের উন্নততর প্রতিষ্ঠা ও সুবিধা আবশ্যক, দীর্ঘকাল এই কথা যাহারা ভাবিতে অভ্যস্ত, তাহাদের কর্ণে বিপ্লবী যুক্তি, পাপীর কুযুক্তি বলিয়া মনে হয়। আইন, শৃঙ্খলা ও নিরা-

চরিত ব্যবস্থা রক্ষাই তাহাদের নিকট প্রধান ধর্ম হইয়া উঠে এবং ঐগ্বলির বির্দ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই মহাপাপ বলিয়া মনে হয়।

অতএব বির্দ্ধ পক্ষের দিক হইতে হ্দয়ের পরিবর্তন অধিকদ্রে অগ্রসর হয় না। সময় সময় তাহাদের প্রতিপক্ষের বিনয় ও সাধ্তাই তাহাদিগকে অধিকতর ক্রুদ্ধ করে, কেন না, উহাতে তাহাদেরই দোষী বলিয়া মনে হয়। যখন কোন ব্যক্তি সন্দেহ করে যে, তাহার স্কন্ধেই দোষ নিক্ষেপের চেষ্টা হইতেছে, তখন তাহার নৈতিক ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। তৎসত্ত্বেও অহিংসানীতির প্রয়োগ-কৌশলের ফলে বির্দ্ধ পক্ষের কতকগ্বলি লোক প্রভাবান্বিত হয় এবং তাহার ফলে বির্দ্ধতার শক্তি দ্বর্বল হইয়া পড়ে। তাহার উপর ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সহান্বভূতি আকর্ষণ করে এবং জগতের মতামতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার ইহা এক শক্তিশালী অস্ত্র। কিন্তু শাসক-সম্প্রদায় সংবাদ গোপন করিতে পারেন অথবা বিকৃত করিতে পারেন, সে সম্ভাবনাও রহিয়াছে; কেন না, বার্তাবাহী প্রতিষ্ঠান-গ্বলি তাঁহাদেরই হাতে বলিয়া প্রকৃত ঘটনা প্রচার হওয়া অসম্ভব। যাহা হউক অহিংস উপায় লইয়া যে দেশে কার্য করা হয়, সেই দেশের অসংখ্য উদাসীন নর-নারীর উপর ইহা দ্রপ্রসারী ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাহাদের নিশ্চয়ই হ্দয়ের পরিবর্তন হয় এবং তাহারা ইহার অন্ক্লে উৎসাহী হইয়া উঠে; কিন্তু যাহারা সাধারণতঃ উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে, তাহাদের বেশী হ্দয়ের পরিবর্তন আবশ্যক করে না। কিন্তু যাহারা পরিবর্তনে ভয় পায় তাহাদের উপর প্রভাব তত স্পষ্ট নহে। ভারতে অসহযোগ ও নির্পদ্রব প্রতিরোধের দ্রুত বিস্তার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অহিংস আন্দোলন বিশাল জনসঙ্ঘের উপর কি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে এবং বহ্ব সংশয়াতুরকে কি ভাবে বিশ্বাসী করিয়া তোলে। কিন্তু যাহারা স্চনা হইতেই ইহার প্রতি বির্দ্ধভাবাপন্ন, তাহাদের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। এমন কি, আন্দোলনের সাফল্যে তাহারা অধিকতর ভীত হয় এবং অধিকতর শত্র্ভাবাপন্ন হয়।

হিংসাম্লক উপায়ে তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রের য্বক্তিসঙ্গত অধিকার আছে, ইহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য অন্র্প হিংসা ও বলপ্রয়োগ অবলম্বন করা য্বক্তিসঙ্গত হইবে না কেন, ব্বঝা কঠিন। হিংসাম্লক উপায় অবাঞ্ছনীয় ও অন্বপযোগী হইতে পারে, কিন্তু উহা সম্প্র্ণর্পে অযৌক্তিক ও নিষিদ্ধ হইতে পারে না। গভর্ণমেণ্টই সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী অংশ এবং সশস্ত্র সৈন্যদলের নিয়ামক বলিয়া হিংসাম্লক উপায় প্রয়োগ করিবার অধিকার অন্যের তুলনায় তাহার বেশী হইতে পারে না। অহিংস বিপ্লব সাফল্য লাভ করিয়া যদি রাষ্ট্রের রশ্মি হস্তগত করে, তাহা হইলে প্র্বে তাহার যাহা ছিল না, সেই বলপ্রয়োগের অধিকার কি সে তৎক্ষণাৎ লাভ করিবে? ইহা প্রভুত্বের বির্দ্ধে যদি বিদ্রোহ হয়, তাহা হইলে কি দিয়া তাহা দমন করা হইবে? স্বভাবতঃই ইহা বলপ্রয়োগ করিতে অনিচ্ছ্বক হইবে এবং শান্তিপ্র্ণ উপায়ে সমস্যা মীমাংসার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাই বলিয়া সে তাহার বলপ্রয়োগের অধিকার ত্যাগ করিবে না। জনসাধারণের একাংশ নিশ্চয়ই পরিবর্তনের বিরোধী হইবে এবং প্র্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে। যদি তাহারা মনে করে যে, তাহাদের হিংসার বির্দ্ধে ন্তন রাষ্ট্র তাহার বল-প্রয়োগের শক্তিগ্বলি ব্যবহার করিবে না, তাহা হইলে তাহারা অধিকতর উৎসাহে উহা চালাইবে। অতএব মনে হয়, হিংসা ও অহিংসা, বলপ্রয়োগ ও হ্দয়ের পরিবর্তনের মধ্যে কোন স্বস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা কঠিন। রাজনৈতিক

পরিবর্তনের দিক দিয়া চিন্তা করিলে অসুবিধা তো আছেই; শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে ইহা আরও শোচনীয়।

কোন আদর্শের জন্য দুঃখবরণ সর্বদাই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে; প্রতিঘাত না করিয়া এবং সঙ্কল্পত্যাগ না করিয়া কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দুঃখবরণের মধ্যে এক মহত্ত্বের গরিমা আছে, যাহার নিকট অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা নত করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের জন্যই দুঃখবরণের সহিত ইহার প্রভেদ অতি সামান্য এবং এই শ্রেণীর আত্মনিগ্রহ বিষাদ-রোগে পর্যবসিত হয়, এমন কি ইহাতে একটু অধঃপতনও হয়। হিংসা যদি সচরাচর অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা হয় তাহা হইলে অহিংসাও তাহার নিষ্ক্রিয়তার দিক দিয়া অন্ততঃ উহার বিকৃতি সৃষ্টি করে। কাপুরুষতার ও অকর্মণ্যতার আবরণ রূপে এবং প্রচলিত ব্যবস্থা রক্ষা করিবার ইচ্ছাকে গোপন করিবার জন্য অহিংসা ব্যবহৃত হইতে পারে, সর্বদাই এরূপ সম্ভাবনা আছে।

ভারতে কয়েক বৎসর হইতে, যখন হইতে সামাজিক পরিবর্তনের ভাব কিছু গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, তখন হইতেই একদল লোক বলিয়া আসিতেছেন যে, বলপ্রয়োগ ব্যতীত ঐরূপ পরিবর্তন সম্ভব নহে, অতএব ওসব কথা না তোলাই ভাল। শ্রেণীসংঘর্ষের কথা (যদিও তাহা অতিমাত্রায় বিদ্যমান) উল্লেখ করা উচিত নহে। কেন না, তাহা সম্পূর্ণ সহযোগিতা—অহিংসার পথে উন্নতি অথবা ভবিষ্যতের যে লক্ষ্যই হউক না কেন, তাহার সহিত খাপ খায় না। কোন এক স্তরে বলপ্রয়োগ না করিয়া সামাজিক সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে না, ইহা সত্য, কেন না, সুবিধাভোগী সম্প্রদায় তাহাদের বর্তমান অবস্থা রক্ষা করিবার জন্য নিশ্চয়ই হিংসা-নীতি অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। কিন্তু মতবাদের দিক দিয়া যদি অহিংস উপায়ে রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হয়, তবে ঠিক সেই ভাবে উহা দ্বারা সামাজিক আমূল পরিবর্তন সম্ভব হইবে না কেন? অহিংস উপায়ে যদি আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারি, তাহা হইলে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ, জমিদারগণ ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলি অনুরূপ উপায়ে সমাধান করিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারিব না কেন? এ সকলই অহিংস উপায়ে সম্ভব কি না, তাহা মুখ্য প্রশ্ন নহে। প্রধান কথা এই যে, এই উভয় উদ্দেশ্যই অহিংসাদ্বারা সিদ্ধ করা সম্ভব কি অসম্ভব। একথা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে না যে, অহিংস উপায় কেবলমাত্র বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করিতে হইবে। বস্তুতঃ ইহা অধিকতর সহজে দেশের মধ্যে স্বদেশীয় স্বার্থপরতা ও বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কেন না অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা তাহাদের চিন্তা-রাজ্যে উহার প্রভাব অধিকতর হইবে।

কেবল অহিংসার বিরোধী কল্পনা করিয়া, রাজনীতি বা কোন উদ্দেশ্যকে নিন্দা করার ভাব, ভারতে অধুনা দেখা যাইতেছে, আমার মতে সমস্যাগুলিকে সত্যদৃষ্টিদ্বারা না দেখিয়া উহা সম্পূর্ণ উল্টা দিক হইতে দেখিবার মত। ১৫ বৎসর পূর্বে আমরা অহিংস অসহযোগ গ্রহণ করিয়াছিলাম, কেন না উহা আমাদিগকে সর্বাধিক বাঞ্ছনীয় ও সাফল্যের পথে লক্ষ্যস্থানে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। তখন লক্ষ্য অহিংসা হইতে স্বতন্ত্র ছিল, উহা অহিংসার শাখামাত্রও ছিল না, অথবা অহিংসা হইতে উহা উদ্ভূত হয় নাই। তখন কেহই একথা বলিতে পারেন নাই যে, স্বাধীনতা বা অধীনতা পাশ মোচন যদি কেবলমাত্র অহিংস উপায়ে সম্ভব হয়, তাহা হইলেই উহার জন্য চেষ্টা করা যাইতে পারে। কিন্তু

এখন আমাদের লক্ষ্যকেন্দ্র অহিংসার মানদণ্ডে বিচার করা হইতেছে এবং যাহা অহিংসার সহিত সামঞ্জস্যহীন তাহা অগ্রাহ্য করা হইতেছে। এইভাবে অহিংসা এক অনমনীয় যুক্তিহীন গোঁড়ামীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে, যাহার বিরুদ্ধে কোন প্রশ্নই তোলা সঙ্গত নহে। ইহার ফলে বুদ্ধির উপর ইহা প্রভাব হারাইয়া ফেলিয়া ক্রমে বিশ্বাস ও ধর্মের কোটরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এমন কি, কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ইহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া, ইহাকে বর্তমান ব্যবস্থা রক্ষা করার অনুকূলে ব্যবহার করিতেছে।

ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, কেন না আমি দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে অহিংস প্রতিরোধ এবং অহিংসামূলক উপায় দ্বারা সংগ্রামের ভারতে অত্যন্ত উপযোগিতা রহিয়াছে; জগতের অন্যান্য অংশের পক্ষেও তাহা সম্ভব। গান্ধিজী আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে উহা বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত করিয়া এক মহৎ কাজ করিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি ইহার ভবিষ্যৎ মহান। এমনও হইতে পারে যে মনুষ্যজাতি ইহা সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিবার মত উন্নত হয় নাই। এ. ই. লিখিত "ইনটারপ্রেটার্স" নাটকের একটি চরিত্রের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে, "তুমি অন্ধের হস্তে দর্শনের মোমবাতি তুলিয়া দিতেছ; অন্ধ ইহা লাঠি ছাড়া আর কিরূপে ব্যবহার করিতে পারে?" বর্তমানে এই নূতন নীতি হয়ত বিশেষ কার্যকরী হইবে না, কিন্তু অন্যান্য মহৎভাবের মত ইহার প্রভাব বর্ধিত হইবে এবং ইহা ক্রমশঃ আমাদের কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিবে। অসহযোগ, কোন দুর্নীতিপূর্ণ রাষ্ট্র বা সমাজের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার- এক শক্তিশালী এবং সক্রিয় ধারণা। এমন কি মুষ্টিমেয় চরিত্রবান ব্যক্তি যদি ইহা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে উহার প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং তাহা ক্রমেই বর্ধিত হইতে থাকে। অধিকাংশ ব্যক্তি যোগদান করিলে বাহ্যতঃ ইহা অধিক প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাহার ফলে মনের গতি অন্যান্য দিকে গিয়া নৈতিক একাগ্রতা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বিস্তৃতির ফলে ইহার গভীরতা কমিয়া যায়। সমষ্টি মানব ক্রমশঃ ব্যক্তিকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দেয়।

নিভাঁজ অহিংসার উপর অতি মাত্রায় জোর দেওয়ার ফলে ইহা জীবন হইতে স্বতন্ত্র ও দূরবর্তী হইয়া গিয়াছে, লোকে ইহা হয় অন্ধের মত ধর্ম ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রহণ করে, অথবা একেবারেই গ্রহণ করে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পশ্চাতে সরিয়া থাকেন। ১৯২০ সালে ইহা ভারতের টেররিস্টদের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, অনেকে দলত্যাগ করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাহা করেন নাই তাঁহারাও সন্দেহাতুর হইয়া হিংসামূলক কার্য হইতে বিরত ছিলেন। কিন্তু আজ ইঁহাদের উপর উহার সে প্রভাব আর নাই। এমন কি, কংগ্রেসের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রশংসার সহিত কার্য করিয়াছেন এবং অকৃত্রিম আগ্রহে অহিংসানীতিসম্মত জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকে অবিশ্বাসী মনে করিয়া বলা হইতেছে যে, যখন তাঁহারা অহিংসাকে জীবনের মূলনীতি অথবা ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তখন কংগ্রেসসম্মানীরূপে তাঁহাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই। অথবা যে একমাত্র লক্ষ্যের জন্য উদ্যম প্রকাশ করা তাঁহারা সার্থক বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা ত্যাগ করুন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সকলের জন্য সমান বিচার ও সমান সুবিধা, সুবিন্যস্ত সমাজ তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন [illegible] সম্পত্তির উপর অধিকার ও বিশেষ সুবিধাভোগ বিলুপ্ত হইবে। অথবা গান্ধিজী এক প্রবল শক্তিরূপেই বিদ্যমান থাকিবেন, তাঁহার অহিংসা কর্মপ্রবণ ও আক্রমণ-

শীল, কেহ জানে না, কখন তিনি সমস্ত দেশকে নূতন শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া আবার আন্দোলনে অগ্রগতি সঞ্চার করিবেন। সমস্ত মহত্ত্ব, সমস্ত স্ববিরোধিতা, জনসাধারণকে অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালনা করিবার সমস্ত শক্তি লইয়া তিনি সাধারণ মাপকাঠির অনেক ঊর্ধ্বে। অপরকে বিচার করিবার মাপকাঠি দিয়া তাঁহাকে পরিমাপ করা যায় না, বিচার করা যায় না। তাঁহার অনুগামী বলিয়া যাঁহারা দাবী করেন, তাঁহাদের অনেকেই অকর্মণ্য শান্তিবাদী অথবা টলষ্টয়-কথিত অ-প্রতিরোধী অথবা কোন সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের ভক্ত হইয়া পড়েন, জীবন ও বাস্তবের সহিত তাঁহাদের কোন যোগ থাকে না। তাঁহাদের চারিদিকে এমন কতকগুলি লোক জড় হয়, যাহারা বর্তমান ব্যবস্থা রক্ষার জন্য উন্মুখ এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অহিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে। এইভাবে সুবিধাবাদ দেখা দেয় এবং প্রতিপক্ষকে স্বমতে আনয়ন করিতে গিয়া অহিংসা নীতির খাতিরে তাঁহারাই নিজেদের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করেন এবং প্রতিপক্ষদলে গিয়া দণ্ডায়মান হন। যখন উৎসাহ কমিয়া আসে এবং আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি, তখন একটু পিছু হটিয়া আপোষ করিতে ইচ্ছা হয় এবং তাহাকে প্রতিপক্ষের চিত্ত জয় করিবার কৌশলরূপে অভিহিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। সময় সময় আমরা আমাদের পুরাতন সহকর্মীদের ত্যাগ করিয়াই ঐটুকু লাভের লোভে ছুটিয়া যাই। আমরা পুরাতন সহকর্মীদের যে সকল কথায় নূতন বন্ধুরা বিরক্ত হয় এবং তাহাদের বাড়াবাড়ির নিন্দা করি এবং দলের ঐক্য নষ্ট করিবার জন্য তাহাদের উপর দোষারোপ করি। সমাজব্যবস্থার প্রকৃত পরিবর্তনের পরিবর্তে, বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই, দয়াদাক্ষিণ্যের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়; কায়েমী স্বার্থ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করা হয় না।

উপায়ের গুরুত্বের উপর অধিক জোর দিয়া গান্ধিজী এক মহৎ কার্য করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। তথাপি আমার মনে হয় উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত লক্ষ্যের উপরও পরিণামে অনুরূপ জোর দিবার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। যদি আমরা উহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা লক্ষ্যহীন পথিকের মত হইবে, কতকগুলি অবান্তর বিষয় লইয়া আমরা বৃথা শক্তিক্ষয় করিব। কিন্তু উপায়কেও অবজ্ঞা করা যায় না, কেন না নৈতিক দিক ছাড়াও উহার একটি কার্যকরী দিক আছে। মন্দ ও দুর্নীতিপূর্ণ উপায় গ্রহণ করিলে অভিপ্রেত উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায়, অথবা নব নব সমস্যা তীব্রভাবে দেখা দেয়। যাহাই হউক, আমরা মানুষকে তাহার ঘোষিত উদ্দেশ্য দিয়া নহে, তাহার অবলম্বিত উপায় দিয়াই বিচার করিয়া থাকি। যে উপায় অবলম্বন করিলে অনাবশ্যক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ঘৃণা ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, তাহা লক্ষ্যকে দূরবর্তী ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ কঠিন করিয়া তোলে। উপায় ও উদ্দেশ্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে জড়িত, উভয়কে পৃথক করা যায় না। অতএব উপায় প্রধানতঃ এমন হওয়া উচিত, যাহা সংঘর্ষ ও ঘৃণাকে উগ্র হইতে দিবে না, অন্ততপক্ষে উহাকে যথাসাধ্য নির্দিষ্ট সীমার (কেন না, কিছুু পরিমাণে উহা অপরিহার্য) মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং সদিচ্ছা জাগ্রত করিতে প্রয়াসী হইবে। ইহা কোন নির্দিষ্ট কর্মপ্রণালী অপেক্ষা ব্যক্তির অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির উপরই অধিক নির্ভর করে। এই মনে অভিপ্রায়কেই গান্ধিজী অধিকতর গুরুত্ব দিয়া থাকেন এবং যদি তিনি মনুষ্য-চরিত্রে কোন বৃহৎ পরিবর্তন সাধনে অকৃতকার্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও লক্ষ লক্ষ নরনারী-চালিত বিরাট জাতীয় আন্দোলনকে ঐ অভিপ্রায় দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে তিনি আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

তিনি যে নৈতিক সংযম দাবী করেন, তাহারও বিশেষ প্রয়োজন আছে, তবে তাঁহার ব্যক্তিগত সংযমের আদর্শ, সম্ভবতঃ তর্কের বিষয়। তিনি আত্মগত পাপ ও দুর্বলতার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন, অথচ সামাজিক পাপগুলি প্রায় লক্ষ্যই করেন না। এই শৃঙ্খলা ও সংযমের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই; কেন না, এই মরুভূমি ত্যাগ করিয়া সুবিধাভোগী শ্রেণীর সহিত যোগ দিয়া প্রতিষ্ঠালাভের প্রলোভন অনেক কংগ্রেসপন্থীকে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। কেন না, বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীদের জন্য অনুগ্রহের দ্বার সর্বদাই খোলা।

সমগ্র জগৎ আজ বহুবিধ সঙ্কটের সম্মুখীন, কিন্তু মানবের প্রাণশক্তি ও সৃজনী প্রতিভার সঙ্কটই ইহার মধ্যে প্রধান। প্রাচ্যে ইহা অধিকতর প্রবল, কেন না, অধুনা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এশিয়ায় অতি দ্রুত পরিবর্তন চলিয়াছে এবং ইহার সহিত সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টার বেদনা প্রচুর। যে রাজনৈতিক সমস্যা আমরা অত্যন্ত মুখ্যরূপে দেখিতেছি, ইহার সহিত তুলনায় তাহার গুরুত্ব বেশী নহে, আমাদের নিকট ইহাই প্রাথমিক সমস্যা এবং ইহার সন্তোষজনক সমাধান ব্যতীত প্রকৃত প্রশ্নগুলিতে আমরা হস্তক্ষেপই করিতে পারিব না। যুগ যুগান্ত ধরিয়া আমরা এক পরিবর্তনহীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত এবং আমাদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে সমাজের উহাই সম্ভবপর ও সঙ্গত ভিত্তি এবং আমাদের ন্যায় অন্যায়ের ধারণাগুলিও উহার সহিত জড়িত। কিন্তু এই অতীত ভিত্তির উপর বর্তমানকে প্রতিষ্ঠা করিবার আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে: উহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ভেবলেন লিখিয়াছেন, "চরমে অর্থনৈতিক সন্নীতি, অর্থনৈতিক প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে।" বর্তমান প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নূতন নীতি আমাদিগকে নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। যদি আমরা জীবনের এই সঙ্কট হইতে নিস্কৃতির পথ খুঁজিতে চাহি, যদি বর্তমান যুগের প্রকৃত আত্মোন্নতির মূল্য বুঝিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে সরল সাহসের সহিত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে। কোন ধর্মের অযৌক্তিক মতবাদের গোঁড়ামির মধ্যে আশ্রয় খুঁজিলে চলিবে না। ধর্ম যাহা বলে তাহা ভাল বা মন্দ হইতে পারে; কিন্তু ইহা যে ভাবে বলে এবং আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলে, তাহা নিশ্চয়ই কোন সমস্যাকে বুদ্ধির দিক দিয়া বিচার করিতে সহায়তা করে না। ধর্মের বিচার-নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে যেমন ফ্রয়েড বলিয়াছেন, "উহা বিশ্বাস করিতেই হইবে, প্রথমতঃ যেহেতু আমাদের আদিম পূর্বপুরুষেরা উহা বিশ্বাস করিতেন, দ্বিতীয়তঃ অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে পরম্পরাক্রমে উহার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে এবং তৃতীয়তঃ যেহেতু ঐগুলির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা একেবারেই নিষিদ্ধ।" (দি ফিউচার অফ্ এন ইলিউসান)।

যদি আমরা অহিংসা ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি ধর্ম বা অনুরূপ মতবাদের দিক হইতে বিবেচনা করি, তাহা হইলে তর্ক করিবার কিছুই থাকে না। কোন সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ মতবাদে উহা পর্যবসিত হইলে লোকে উহা গ্রহণ করিতেও পারে, নাও পারে। উহার কার্যকরী শক্তি ইহাতে হ্রাস হয় এবং বর্তমান সমস্যাগুলিতে উহার প্রয়োগের সার্থকতা থাকে না। কিন্তু বর্তমান অবস্থার উপযোগী ভাবে যদি আমরা উহা লইয়া আলোচনা করি, তাহা হইলে জগতের পুনর্গঠন চেষ্টায় বহুল পরিমাণে উহা হইতে সাহায্য পাইব। সমষ্টি মানবের দুর্বলতা ও প্রকৃতির কথা মনেরাখিয়াই এই বিবেচনা করিতে হইবে। যে কোন ব্যাপক কাজ, বিশেষতঃ আমূল পরিবর্তনমূলক বৈপ্লবিক কার্যপদ্ধতি, কেবল নেতাদের চিন্তা-

ধারার উপর নির্ভর করে না, বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরও উহা নির্ভর করে; বেশীর ভাগ নির্ভর করে, যে সকল মানুষ লইয়া তাঁহারা কাজ করেন, তাহাদের মনোভাবের উপর।

জগতের ইতিহাসে হিংসানীতির অভিনয় বহুবার হইয়া গিয়াছে। বর্তমানেও ইহা সমান প্রবল, সম্ভবতঃ আরও দীর্ঘকাল ইহা ঐরূপই থাকিবে। হিংসা ও বলপূর্বক বাধ্য করিয়াই অতীতের প্রায় অধিকাংশ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ডব্লউ. ই. গ্লাডস্টোন একদা বলিয়াছিলেন, "আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, রাজনৈতিক সঙ্কটের সময় এই দেশের জনসাধারণকে আর কোন উপদেশ না দিয়া যদি বলা হইত যে, হিংসাকে ঘৃণা করিতে ভুলিও না, শৃঙ্খলা ভালবাসিও, সর্বদা ধৈর্যাবলম্বন করিও, তাহা হইলে এই দেশ কখনও স্বাধীনতা পাইত না।"

অতীত ও বর্তমান হিংসানীতির গুরুত্ব ভুলিয়া থাকা অসম্ভব, তাহা হইলে জীবনকেই অস্বীকার করিতে হয়। তথাপি হিংসা মন্দ এবং ইহা অশেষ অকল্যাণের প্রসূতি। ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা, প্রতিশোধ প্রবৃত্তি এবং শাস্তির ভাব হিংসা হইতেও শোচনীয়, কিন্তু এইগুলি প্রায়ই হিংসার সহিত জড়িত থাকে। হিংসা স্বরূপতঃ মন্দ না হইলেও ঐ সকল উদ্দেশ্যের জন্য মন্দ হইয়া পড়ে। ঐ সকল উদ্দেশ্য ব্যতীতও হিংসা সম্ভব এবং তাহার ভাল মন্দ দুই উদ্দেশ্যই থাকিতে পারে। কিন্তু ঐ সকল উদ্দেশ্য হইতে হিংসাকে স্বতন্ত্র করা অতিমাত্রায় কঠিন, অতএব যথাসম্ভব হিংসাকে পরিহার করাই ভাল। অবশ্য ইহাকে বর্জন করিতে গিয়া কেহ নিষ্ক্রিয় হইয়া অন্যবিধ এবং অধিকতর অন্যায় সহ্য করিতে পারে না। হিংসার নিকট বশ্যতা স্বীকার অথবা হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনপদ্ধতি গ্রহণ, অহিংসানীতির মূলতত্ত্ব অস্বীকারেরই নামান্তর। অহিংস উপায়ের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে হইলে উহাকে অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল এবং রাষ্ট্র বা সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তনে সক্ষম করিতে হইবে।

উহা দ্বারা সম্ভব কিনা তাহা আমি জানি না। আমার মনে হয় ইহা আমাদিগকে অনেক দূর লইয়া যাইতে পারে, তবে ইহা দ্বারা চরম লক্ষ্যে পৌঁছান সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। যে ভাবেই হউক, কিছু না কিছু বলপ্রয়োগ অপরিহার্য বলিয়াই মনে হয়, কেন না ক্ষমতা ও সুবিধা যাহাদের হাতে তাহারা বলপূর্বক বাধ্য না হইলে উহা ছাড়িতে চাহিবে না অথবা যতদিন পর্যন্ত না এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যায় যে, ক্ষমতা ও সুবিধা ছাড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা হাতে রাখাই তাহাদের পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক, ততদিন বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হইবে। বর্তমানে সমাজে যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, জাতীয় ও শ্রেণী সংঘর্ষগুলি বলপ্রয়োগ ব্যতীত সমাধান হইবে না। ব্যাপকভাবে হৃদয়ের যে পরিবর্তন আবশ্যক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কেন না, উহা ব্যতীত সামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলনের অন্য কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু কিয়দংশের উপর বলপ্রয়োগ করিতেই হইবে। মূলে যে সকল সংঘর্ষ রহিয়াছে, সেগুলি ঢাকিয়া রাখিয়া, তাহাদের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে শুভ নহে। ইহা কেবল সত্য গোপন করা নহে, ইহা বর্তমান ব্যবস্থাকে ঠেলিয়া উপরে তুলিয়া প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা এবং শাসক-সম্প্রদায় তাঁহাদের বিশেষ সুবিধাগুলির যৌক্তিকতা প্রমাণ করিবার জন্য যে নৈতিক ভিত্তি অন্বেষণ করেন, ইহা তাহাই যোগাইয়া দেওয়া। অন্যায় ব্যবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে উহা যে সকল মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা উদ্ঘাটিত করিতে হইবে এবং উহার স্বরূপ-মূর্তি প্রকাশ করিতে হইবে। অসহযোগের একটা প্রধান গুণ এই যে, উহা ঐ

সকল মিথ্যা প্রতিশ্রুতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয় এবং ঐগুলির বশ্যতা স্বীকার অথবা উহা কায়েম রাখিবার জন্য সহযোগিতা না করার ফলে মিথ্যাগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

আমাদের চরম উদ্দেশ্য হইল শ্রেণীবর্জিত সমাজ—যেখানে সকলের অর্থনৈতিক সুবিচার ও সুবিধা সমান হইবে। সমাজ এমন ভিত্তির উপর পরিকল্পনা করিতে হইবে যাহা মনুষ্যজাতিকে সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির উন্নততর স্তরে লইয়া যাইবে, মানসিক উৎকর্ষ বিধানের ব্যবস্থা করিবে, সহযোগিতা, নিঃস্বার্থপরতা ও সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত করিবে, সদিচ্ছা, প্রেম ও প্রকৃত কাজ করার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিবে—পরিণামে যাহা সমগ্র জগতের ব্যবস্থায় পরিণত হইবে। সম্ভব হইলে ভদ্রভাবে, প্রয়োজন হইলে বলপূর্বক, ইহার পথেব প্রত্যেকটি বাধা অপসারিত করিতে হইবে। বলপ্রয়োগ যে প্রায়ই দরকার হইবে, সে সম্বন্ধে অল্প সন্দেহই আছে। কিন্তু যদি বলপ্রয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তাহা ঘৃণা বা নিষ্ঠুরতার সহিত প্রয়োগ করা উচিত নহে, কেবল বাধা অপসারণের উত্তেজনাহীন আকাঙ্ক্ষা লইয়াই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা অতি কঠিন। ইহা সহজ কাজ নহে কিন্তু সহজ পথও নাই, পতনেব গহ্বর অগণিত। তবে বাধাবিঘ্ন পতনের গহ্বর, আমরা ভুলিবার ভাণ করিলেই অন্তর্হিত হইবে না ববং তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া লইয়া সাহসের সহিত উহার সম্মুখীন হইতে হইবে। এ সকলই অবাস্তব কল্পনা বলিয়া মনে হইবে এবং এই সকল মহৎ ভাব বহুলোকের চিত্ত বিগলিত করিবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এগুলি আমাদেব সম্মুখে রাখিতে হইবে ইহার উপর জোর দিতে হইবে এবং এমনও হইতে পারে যে যে সকল ঘৃণা ও রিপুর আবেগে আমরা বশীভূত, তাহা ধীরে ধীরে শিথিল হইবে।

আমাদের উপায়গুলি ঐ লক্ষ্যের অনুকূল এবং ঐ মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে জনসাধারণের মধ্যে মানব প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে সর্বদাই তাহারা আমাদের আবেদন ও অনুরোধে কর্ণপাত করিবে না অথবা উচ্চাশোর নৈতিক আদর্শানুযায়ীও কার্য করিবে না। হৃদয়ের পরিবর্তনের সহিত বলপ্রয়োগে বাধা করিবারও প্রয়োজন হইবে তবে আমরা এই মাত্র করিতে পারি যে, বলপ্রয়োগে বাধা করিবার কালে যতটা সম্ভব সীমাবদ্ধরূপে এমন ভাবে উহা প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে অন্যায়গুলি যথাসম্ভব কম হয়।

৬৪

পুনরায় দেরা জেলে

আলীপুর জেলে আমার শরীর ভাল ছিল না। আমার শরীরের ওজন অনেক কমিয়া গেল। কলিকাতায় গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কাতর হইয়া পড়িলাম। অপেক্ষাকৃত ভাল স্থানে আমাকে বদলী করার গুজব শুনিলাম। ৭ই মে আমাকে জিনিষপত্র গুছাইয়া জেলের বাহির হইবার নির্দেশ দেওয়া হইল। আমাকে দেরাদুন জেলে পাঠান হইতেছে। কয়েকমাস অপরিসর নির্জনতায় বাস করিবার পর, কলিকাতার মধ্য দিয়া মোটরে সান্ধ্য-সমীরণ অতিশয় ভাল লাগিল; বৃহৎ হাওড়া ষ্টেশনের জনতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।

এই বদলীতে আমি আনন্দিত হইলাম এবং দেরাদুন ও সন্নিহিত পর্বত-মালার জন্য ব্যাকুল হইলাম। আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এখান হইতে নয় মাস পূর্বে আমি যখন নৈনী গিয়াছিলাম, তখনকার ব্যবস্থা আর নাই। একটি পুরাতন গোশালা পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়া আমার নূতন বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হইল।

'সেল' হিসাবে ইহা মন্দ নহে, ইহার সহিত একটি ছোট বারান্দাও ছিল। সংলগ্ন উঠানটিও প্রায় পঞ্চাশ ফিট লম্বা হইবে। আমার দেরাদুনের পুরাতন বাসস্থান অপেক্ষা ইহা ভালই মনে হইল, কিন্তু কয়েকদিন পরেই বুঝিতে পারিলাম, অনেকগুলি পরিবর্তন মোটেই ভাল হয় নাই। চারিদিকে দশ ফুট উচ্চ প্রাচীর আমার সুবিধার জন্য আরও ৪।৫ ফুট উচ্চ করা হইয়াছে। ফলে আমার আকাঙ্ক্ষিত পর্বতের দৃশ্য একেবারেই ঢাকা পড়িয়াছে, কয়েকটি গাছের মাথা দেখা যায় মাত্র। এই জেলে তিন মাস কাটাইবার পরও একবার চকিতেও পর্বত দর্শন করিতে পারিলাম না। পূর্ববারের মত বাহিরে গিয়া জেলের দরজা পর্যন্ত আমাকে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হইত না। ব্যায়ামের পক্ষে আমার ক্ষুদ্র উঠানটাই যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল।

এই সকল ও অন্যান্য নূতন বিধি-নিষেধে আমি অত্যন্ত বিরক্ত ও নিরাশ হইলাম। আমি অধীর হইয়া উঠিলাম, এমন কি, আমার উঠানে সামান্য ব্যায়াম করার অধিকার থাকা সত্ত্বেও উহাতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। সমগ্র জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন এমন নিঃসঙ্গ নির্জনতা আমি জীবনে কমই অনুভব করিয়াছি। এই নির্জন কারাবাস আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল, আমার দৈহিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, প্রাচীরের অপর দিকে কয়েক গজ দূরেই নির্মল মুক্ত বায়ু, ফুলের সুবাস, মাটি ও ঘাসের গন্ধ, দীর্ঘ কান্তার ও গিরিমালা। কিন্তু উহা আমার আয়ত্তের বাহিরে, সর্বদা প্রাচীরে দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া আমার চক্ষুদ্বয় ভারাক্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া উঠিল। এমন কি কারাজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কোলাহলও আমার কানে আসিত না, আমাকে দূরে সরাইয়া স্বতন্ত্রভাবে রাখা হইয়াছিল।

ছয় সপ্তাহ পরেই গ্রীষ্ম শেষ হইয়া বর্ষা আসিল,--মুষলধারে বৃষ্টি! প্রথম সপ্তাহেই বার ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইল। আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা দিল,--যেন নবজীবনের কানাকানি চলিয়াছে,--শীতল বাতাসে শরীর জুড়াইল। কিন্তু চক্ষু ও মনের কোন আরাম মিলিল না। সময় সময় আমার ইয়ার্ডের লোহদ্বার খুলিয়া একজন ওয়ার্ডার যাতায়াত করিত, তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য চকিতে বাহিরের দৃশ্য দেখিতে পাইতাম—সবুজ ক্ষেত এবং তরুশ্রেণী, মুক্তাকণার মত বারিবিন্দু শোভিত হইয়া রৌদ্রালোকে অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে- কিন্তু কেবল মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই উহা বিদ্যুচ্চমকের মত মিলাইয়া যাইত। দরজাটি কখনও সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করা হইত না। বেশ বুঝিতে পারিতাম; ওয়ার্ডারের উপর আদেশ ছিল যে আমি নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিলে দরজাটি যেন না খোলা হয়, খুলিলেও, একটি মানুষ প্রবেশ করিতে পারে তাহার বেশী ফাঁক যেন না করা হয়। বাহিরের ঐ মুক্ত সবুজ শোভা ক্ষণিকের জন্য দর্শন করিয়া আমার তৃপ্তি হইত না। অথচ উহা আমার চিত্তে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগাইত, দরজাকে খোলা অবস্থায় দেখিতাম এবং দরজা খোলা হইলেও আমি ইচ্ছা করিয়াই সে দিকে তাকাইতাম না।

অবশ্য আমার এই সকল মনোবেদনার জন্য কারাগারই দায়ী নহে, উহাতে তীব্রতা বাড়িয়াছে মাত্র। ইহা বাহিরের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া—কমলার রোগ এবং

আমার রাজনৈতিক দুশ্চিন্তা। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, কমলা পুনরায় তাঁহার পুরাতন রোগের দ্বারা কবলিত, এ সময় তাঁহার কোন কাজে লাগিতে পারিলাম না ভাবিয়া এক অসহায় বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি এ সময় তাঁহার নিকটে থাকিলে তিনি অনেক উপশম বোধ করিতেন।

আলীপুরে যাহা পাইতাম না, দেরাদুনে আসিয়া সেই দৈনিক সংবাদপত্র পাইতে লাগিলাম এবং ইহাতে বাহিরের রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনার সহিত আমি যোগসূত্র রক্ষা করিতে পারিতাম। প্রায় তিন বৎসর পর পাটনায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন (ইহা পূর্বে বে-আইনী ছিল) আহূত হইল; ইহার বিবরণ পাঠ করিয়া আমি বিষণ্ণ হইলাম। আমি দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, এই প্রথম অধিবেশনে ভারত ও পৃথিবীতে এত ঘটনা ঘটার পরও, বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার কোন চেষ্টা হইল না। গতানুগতিকতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য কোন বিশদ আলোচনা হইল না। দূর হইতে গান্ধিজী আমার নিকট প্রাচীন ডিক্টেটরী মূর্তিতে প্রতিভাত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমার নেতৃত্ব যদি তোমরা গ্রহণ করিতে চাহ তাহা হইলে আমার সর্ত মানিতে হইবে।" তাঁহার এই দাবী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কেন না, আমরা তাঁহার নেতৃত্ব চাহিব এবং তাঁহাকে তাঁহার স্বকীয় গভীর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য করিতে বলিব, এরূপ হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে হইল, যেন উপর হইতে একটা ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইল, পরস্পরের আলোচনা ও ভাববিনিময় দ্বারা কোন কর্মপন্থা নির্ণয় করা হইল না। গান্ধিজী লোকের মনের উপর আধিপত্য করেন, আবার তিনিই জনসাধারণ অসহায় বলিয়া অভিযোগ করেন, ইহা আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। আমার মনে হয়, তাঁহার মত জনসাধারণের আনুগত্য ও গভীর শ্রদ্ধা অতি অল্প লোকেই লাভ করিয়াছেন, তিনি যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, জনসাধারণ তাহার যোগ্য হইতে পারে নাই বলিয়া তাহাদের নিন্দা করা, আমার বিবেচনায় সঙ্গত নহে। এমন কি, পাটনার সভায় তিনি শেষ পর্যন্ত থাকিলেন না, তাঁহার হরিজন আন্দোলন উপলক্ষ্যে ভ্রমণে চলিয়া গেলেন। তিনি নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিকে তৎপরতার সহিত কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া সভা ত্যাগ করিলেন।

সম্ভবতঃ ইহা সত্য যে দীর্ঘ আলোচনায় অবস্থার বেশী উন্নতি হইত না। সকলেই যেন হতবুদ্ধি, সদস্যদের চিন্তা যেন আচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট; অনেকে সমালোচনা করিতে উন্মুখ থাকিলেও, কাহারও কোন গঠনমূলক প্রস্তাব ছিল না। অবস্থাধীনে ইহা স্বাভাবিক, কেন না, সংঘর্ষের ভারের অধিকাংশ বিভিন্ন প্রদেশের এই সকল নেতার স্কন্ধে পতিত হইয়াছিল; তাঁহারাও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের মনও সতেজ ছিল না। তাঁহারা অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছিলেন যে, তাঁহাদিগকে সংঘর্ষের অবসান ঘোষণা করিয়া নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বন্ধ করিতে হইবে, কিন্তু তাহার পর? দুইটি দল দেখা গেল; একদল আইন-সভার মধ্যে নিছক নিয়মতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতির জন্য লালায়িত, অন্যদল সমাজতান্ত্রিক দিক দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সদস্য এ দুই-এর কোন দলভুক্তই নহেন। নিয়মতান্ত্রিকতার প্রত্যাবর্তনও তাঁহাদের মনঃপূত হইল না, পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রবাদ দেখিয়াও তাঁহারা ভীত হইলেন, ভাবিলেন ইহাকে প্রশ্রয় দিলে কংগ্রেসের মধ্যে ভেদ দেখা দিবে। তাঁহাদের কোন গঠনমূলক ধারণা ছিল না, তাঁহাদের একমাত্র আশা ও ভরসাস্থল গান্ধিজী। পূর্বের মতই তাঁহারা গান্ধিজীর মুখাপেক্ষী হইয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন, যদিও অনেকেই মনে মনে গান্ধিজীর

মতে সায় দিতে পারিলেন না। নিয়মতান্ত্রিক মডারেটগণ গান্ধিজীর সমর্থন পাইয়া নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি ও কংগ্রেসের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেন।

যাহা অপ্রত্যাশিত তাহাই ঘটিল। কিন্তু আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, প্রতিক্রিয়ার মুখে কংগ্রেস তদপেক্ষাও অধিক পিছাইয়া পড়িল। অসহযোগের পর গত পনর বৎসরের মধ্যে কখনও কংগ্রেস নেতারা এমন অতি-নিয়মতান্ত্রিক কায়দার কথা বলেন নাই। এমন কি বিংশ দশকের মধ্যভাগে প্রতিক্রিয়া হইতে উদ্ভূত স্বরাজ্য দলও, এই নবীন নেতৃমণ্ডলী অপেক্ষা বহু অগ্রগামী ছিলেন এবং স্বরাজ্যদলের প্রখর ব্যক্তিত্বশালী নেতৃত্বও বর্তমান ক্ষেত্রে ছিল না। যতদিন বিপদের সম্ভাবনা ছিল, ততদিন যাঁহারা সাবধানতার সহিত দূরে সরিয়া ছিলেন, আজ তাঁহারাই আসিয়া হোমরা-চোমরা হইয়া উঠিলেন।

গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের উপর হইতে বিধিনিষেধ তুলিয়া লইলেন, উহা পুনরায় বৈধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। কিন্তু কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ও অনুগামী বহু প্রতিষ্ঠান বে-আইনী হইয়াই রহিল। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী 'সেবাদল', বহু কৃষকসভা, ছাত্রসমিতি, যুবকসমিতি, এমন কি, কতকগুলি শিশুদের সমিতি পর্যন্তও বে-আইনী হইয়া রহিল। এই প্রসঙ্গে সীমান্ত প্রদেশের "খোদাই খিদ্‌মদ্‌গার" দল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানটি সীমান্ত প্রদেশের প্রতিনিধিরূপে ১৯৩১ সাল হইতে কংগ্রেসের অন্যতম শাখায় পরিণত হইয়াছিল। অতএব, কংগ্রেস যদিও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্যপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায় পুনরায় গ্রহণ করিল, তথাপি গভর্ণমেণ্ট আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য রচিত বিশেষ আইনগুলি প্রত্যাহার করিলেন না এবং কংগ্রেসের বহুতর শাখা-প্রশাখাকে বে-আইনী করিয়া রাখিলেন। কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে দমন করিবার ব্যবস্থা করা হইল, অথচ বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা তখন জমিদার ও ভূস্বামিবর্গকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল। জমিদারসভাগুলিকে সকল প্রকার সুবিধা দেওয়া হইতে লাগিল। যুক্ত-প্রদেশের দুইটি প্রধান সভার চাঁদা, সরকারের সহায়তায় খাজনা বা ট্যাক্সের সহিত একত্র আদায়ের ব্যবস্থা হইল।

আমার বিশ্বাস কি হিন্দু, কি মুসলমান কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের উপর আমার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, তথাপি একটি ঘটনায় হিন্দুমহাসভার প্রতি আমার চিত্ত বিশেষভাবে তিক্ত হইয়া উঠিল। উঁহার একজন সম্পাদক 'লালকোর্তা দল' বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করার সমর্থন করিয়া গভর্ণমেণ্টের কার্যের প্রশংসা করিলেন। যখন কোন আক্রমণশীল আন্দোলন নাই, তখন জনসাধারণের প্রাথমিক রাষ্ট্রিক অধিকার বঞ্চিত করার ব্যবস্থার এই সমর্থনে আমি বিস্মিত হইলাম। এই সকল মূলনীতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, সংঘর্ষের কালে কয়েক বৎসর সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা আশ্চর্য কৃতিত্বের সহিত কার্য করিয়াছে, ইহা সর্বজনবিদিত এবং তাহাদের নেতা, যিনি এখনও অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজবন্দী, ভারতের একজন সাহসী ও শক্তিশালী সন্তান। আমার মনে হইল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ইহার অধিক আর কি অগ্রসর হইতে পারে! আমি প্রত্যাশা করিলাম যে হিন্দু-মহাসভার নেতারা, উঁহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন। কিন্তু, আমি যতদূর জানি কেহই সেরূপ কিছু করিলেন না।

হিন্দুমহাসভার সম্পাদকের বিবৃতিতে আমি অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। ইহা নিশ্চয়ই মন্দ কিন্তু আমি ইহার মধ্যে দেখিলাম, দেশের মধ্যে হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে। জীবনের অপরাহ্নের উত্তাপে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছি, এমন সময় আমি

এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম। যেন আব্দুল গফুর খাঁ চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতেছি। আমি চৈতন্য পাইয়া অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিলাম, মন বিরস হইয়া গেল, আমার বালিস অশ্রুসিক্ত লক্ষ্য করিলাম। আমি আশ্চর্য হইলাম, কেন না জাগ্রত অবস্থায় আমি কখনও এরূপ ভাবাবেগে অধীর হই না।

এইকালে আমার স্নায়ুপুঞ্জ কিঞ্চিৎ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল; আমার সুনিদ্রা হইত না, ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং নানাপ্রকার দুঃস্বপ্নে চমকিত হইতাম। সময় সময় আমি ঘুমের মধ্যে চীৎকার করিতাম। একবার আমি অত্যন্ত অস্বাভাবিক জোরের সহিত চীৎকার করিয়াছিলাম, কেন না, প্রবল ঝাঁকুনীর সহিত আমি জাগিয়া উঠিয়া দেখি, দুইজন জেল ওয়ার্ডার আমার শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, আমার চীৎকার শুনিয়া তাহারা যে উদ্বিগ্ন হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিলাম। আমার যেন বুক চাপিয়া শ্বাসরোধ হইতেছে এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।

এই সময় কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির একটি প্রস্তাবেও আমি মর্মাহত হইয়াছিলাম। এই প্রস্তাবটিতে বিবৃত হইয়াছে যে, "ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং শ্রেণীসংঘর্ষের শিথিল আলোচনা হইতেছে দেখিয়া" এতদ্বারা কংগ্রেসপন্থী-দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, করাচী-সিদ্ধান্তে, "সঙ্গত কারণ ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কল্পনাও নাই, অথবা ইহা শ্রেণীসংঘর্ষেরও অনুমোদন করে না। কার্যকরী সমিতির আরও অভিমত এই যে, বাজেয়াপ্তকরণ অথবা শ্রেণীসংঘর্ষ কংগ্রেসের অহিংসানীতির বিরোধী।" এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত শিথিল ভাষায় রচিত এবং ইহার রচয়িতারা শ্রেণীসংঘর্ষ বুঝাইতে গিয়া অনেকাংশে অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। নবগঠিত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলকে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু কার্যতঃ, বর্তমান অবস্থায় শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব রহিয়াছে, ইহা প্রায়শঃ উল্লেখ ব্যতীত, ঐ দলের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সদস্যগণের পক্ষ হইতে বাজেয়াপ্ত করার কোন কথাই উঠে নাই। কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবের মধ্যে এই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট যে, যে কোন ব্যক্তি শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, সে কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যও হইতে পারিবে না। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী হইয়াছে, অথবা ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী, কেহই এরূপ অভিযোগ উপস্থিত করে নাই। কোন কোন সদস্য ঐরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন মাত্র, কিন্তু এখন দেখা গেল, এই সর্বশ্রেণীর সমবায়ে গঠিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সৈন্যসামন্তরূপেও তাহাদের স্থান নাই।

ইহা প্রায়ই ঘোষণা করা হয় যে, কংগ্রেস জাতির প্রতিনিধি, ইহাতে সকল দল, সকল স্বার্থ, রাজা ও প্রজা সকলেরই স্থান আছে। জাতীয় আন্দোলন সর্বদাই এইরূপ দাবী করিয়া থাকে এবং ইহাও ধরিয়া লওয়া হয় যে, তাহারাই দেশের অধিকাংশের প্রতিনিধি এবং সকল শ্রেণীর স্বার্থের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদের কর্মনীতি পরিচালিত হইতেছে। এই দাবী কোন মতেই যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, কেন না, কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই পরস্পরবিরোধী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। তাহা হইলে উহা বিশেষত্বহীন ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যহীন জড়পিণ্ডে পরিণত হয়। হয় কংগ্রেস এমন এক রাজনৈতিক দল, যাহার নির্দিষ্ট (অথবা অনির্দিষ্ট) লক্ষ্য আছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা-অর্জন করিবার এবং তাহা দ্বারা জাতীয় কল্যাণ করিবার নির্দিষ্ট মতবাদ আছে; নয়, ইহা এক দয়ালু জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান মাত্র, যাহার নিজস্ব কোন মত নাই, সকলের কুশল কামনাই

ইহার উদ্দেশ্য। ইহা কেবল তাহাদেরই প্রতিনিধি হইতে পারে, যাহারা ইহার লক্ষ্য ও মতবাদের সহিত সাধারণভাবে একমত। যাহারা ইহার বিরোধী—তাহাদিগকে জাতীয়তাবিরোধী, সমাজবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াপন্থী বিবেচনা করিয়া, নিজস্ব মতবাদ কার্যকরী করিবার জন্য, তাহাদের প্রভাব বিনষ্ট অথবা সংযত করিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একমত হইবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে, কেন না, ইহার সহিত সামাজিক সংঘর্ষগুলির সংস্রব নাই। এইভাবেই কংগ্রেস নানাভাবে ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশের প্রতিনিধি এবং এই কারণেই বিভিন্ন স্বার্থ সত্ত্বেও বিভিন্ন দল কেবল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ভিত্তিতে ইহাতে যোগদান করিয়াছে, কিন্তু এক্ষেত্রেও [illegible] দলের জোর দিবার ভঙ্গী স্বতন্ত্র। যাঁহারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মূলনীতি [illegible] ও সম্পর্কেও ভিন্ন মতাবলম্বী তাঁহারা কংগ্রেসের বাহিরেই আছেন এবং অল্পাধিকতর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপে কংগ্রেস এক স্থায়ী সর্বদলের কংগ্রেসে পরিণত হইয়াছে ইহার মধ্যে পরস্পরকে [illegible] করিয়া বহু দল অবস্থান করিতেছে, এক সাধারণ বিশ্বাসের সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ এবং গান্ধিজীর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ঐক্যবদ্ধ।

পরে কার্যকরী সমিতি শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কিত প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলেন। ঐ প্রস্তাবে গুরুত্ব তাহার ভাষায় নহে অথবা উহার বিষয়বস্তুতে নহে, আসলে কংগ্রেস কোন পথে চলিয়াছে উহা তাহারই ইঙ্গিত। আগতপ্রায় ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনে যাঁহারা ধনী সম্প্রদায়গুলির সমর্থন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কংগ্রেসের সেই নূতন পার্লামেণ্টি সাফাই ঐ প্রস্তাব রচনার প্রেরণা জোগাইয়াছিল। তাঁহাদেরই অভিপ্রায় অনুসারে কংগ্রেস দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং দেশের মডারেট ও রক্ষণশীল ব্যক্তিদের চিত্ত জয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাঁহারা অতীতে কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে সরকারপক্ষে যোগ দিয়াছেন, এমন কি তাঁহাদের পর্যন্ত মিষ্ট কথায় তুষ্ট করা হইতে লাগিল। বামমার্গীদের কোলাহল ও সমালোচনা এই মিলন বা "হৃদয়ের পরিবর্তনের" পথে অন্তরায়স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল এবং কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব ও অন্যান্য ব্যক্তিগত উক্তি হইতে বুঝা গেল যে, বামমার্গীদের বাধা সত্ত্বেও কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের এই নূতন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। যদি বামমার্গীদের আচরণ সংযত না হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে কংগ্রেসের দল হইতে বাদ দেওয়া হইবে। কংগ্রেসের পার্লামেণ্টি বোর্ড তাঁহাদের ঘোষণাপত্রে অতি সাবধানী যে কর্মপদ্ধতি জ্ঞাপন করিলেন, গত পনর বৎসরে তদপেক্ষা অধিক মডারেট কোন কর্মনীতি কংগ্রেস গ্রহণ করে নাই।

গান্ধিজীর কথা ছাড়িয়া দিলেও কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে এমন অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে কৃতিত্বের সহিত কার্য করিয়াছেন, যাঁহারা সততা ও নির্ভীকতার জন্য সমগ্র দেশে সম্মানিত। কিন্তু নূতন কর্মনীতির ফলে দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা সম্মুখে আসিল; এমন কি কংগ্রেসের সর্বাগ্রগামী দলেও এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদের কোনমতেই আদর্শ-বাদী বলা চলে না। কংগ্রেসের নানা স্তরে নিশ্চয়ই বহুসংখ্যক আদর্শবাদী আছেন, কিন্তু ভাগ্যান্বেষী সুবিধাবাদীদের কংগ্রেসে প্রবেশের পথ এক্ষণে পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইল। গান্ধিজীর দুর্বোধ্য এবং রহস্যময় ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছাড়িয়া দিলেও মনে হইতে লাগিল, কংগ্রেসের যেন দুইটি মুখ, একটি

নিছক রাজনৈতিক দিক, যাহা ক্রমশঃ উপদলীয় প্রভুত্বের চক্রান্তে পরিণত হইতেছে এবং অপর দিক একটি প্রার্থনাসভার মত দয়া দাক্ষিণ্য এবং ভাবুকতায় ভরপুর।

গভর্ণমেণ্টপক্ষে জয়ের উল্লাস, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ এবং তাহার আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলি দমন করিতে তাঁহাদের নীতি সফল হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা জয়গর্ব ঢাকিয়া রাখিতে পারিলেন না। অস্ত্রোপচার সফল হইয়াছে; আপাততঃ রোগী বাঁচুক কি মরুক তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস বহুল পরিমাণে পথে আসিলেও তাঁহারা এক আধটু রদবদল করিয়া ঐ নীতিই চালাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা জানেন যে, যতদিন মূল সমস্যাগুলি থাকিবে, ততদিন জাতীয় কর্মধারার এই পরিবর্তন সাময়িক এবং শাসনদণ্ড শিথিল করিলে যে কোন মুহূর্তে ইহা পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। সম্ভবতঃ তাঁহারা ইহাও চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের অধিকতর অগ্রগামী অংশ এবং শ্রমিক ও কৃষকদলের বিরুদ্ধে দমননীতি চালাইতে কংগ্রেসের সাবধান নেতারা বিশেষ বিরক্ত হইবেন না।

দেরাদুন জেলে আমার চিন্তাধারা কতকটা এইভাবে বহিতে লাগিল। ঘটনার গতি সম্পর্কে আমার পক্ষে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা কঠিন: কেন না আমি বিচ্ছিন্ন হইয়া আছি। আলীপুর জেলে আমি বাহিরের ঘটনাবলী হইতে সম্পূর্ণরূপেই বিচ্ছিন্ন ছিলাম, দেরাদুন জেলে গভর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত সংবাদপত্রে আমি আংশিক ও একদেশদর্শী সংবাদ কিছু কিছু পাইতাম। সম্ভবতঃ যদি বাহিরের সহকর্মীদের সহিত আমার যোগ থাকিত এবং ঘটনাবলী প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা পাইতাম, তাহা হইলে আমার মতের কোন কোন দিক পরিবর্তিত হইত।

ক্লেশকর বর্তমান ছাড়িয়া আমি অতীতের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম; আমার কর্মক্ষেত্রে আগমনের সূচনা হইতে অদ্যাবধি ভারতের কি রাজনৈতিক পরিবর্তন হইয়াছে? আমরা যাহা করিয়াছি তাহা কতখানি সঙ্গত হইয়াছে? কতখানি অসঙ্গত? আমার মনে হইল, যদি আমার চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, তবে তাহা সুবিন্যস্ত হইবে এবং প্রয়োজনে আসিবে। এইভাবে নিজেকে একটা নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত রাখিলে, মানসিক ক্লেশ ও অবসাদ হইতেও মুক্তি পাইব। এই ধারণা হইতেই আমি দেরাদুন জেলে ১৯৩৪-এর জুন মাসে এই "আত্ম-চরিত-বর্ণনা" লিখিতে আরম্ভ করি এবং গত আটমাস কাল যখনই মনে আবেগ আসিয়াছে, তখনই ইহা লিখিয়াছি। মাঝে মাঝে লিখিবার ইচ্ছা হইত না, তিনবার প্রায় এক মাস ধরিয়া কিছুই লিখি নাই। তথাপি আমি কোনমতে চালাইয়া গিয়াছি; আমার এই মানসপথে ভ্রমণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ইহার অধিকাংশই অত্যন্ত ক্লেশকর অবস্থার মধ্যে লিখিতে হইয়াছে; এই কালে আমি মানসিক অবসাদ ও বিবিধ ভাবাবেগে পীড়িত হইয়াছি। সম্ভবতঃ আমার লেখার মধ্যেও তাহার ছাপ পড়িয়াছে; কিন্তু এই লেখার দ্বারাই আমি নিজেকে বর্তমান ও তাহার বহুবিধ দুশ্চিন্তা হইতে অনেকখানি মুক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি যখন লিখিতাম তখন বাহিরের পাঠক-সমাজের কথা আমার কদাচিৎ মনে পড়িত; আমি নিজের সহিত বিচার করিতাম, আত্মকল্যাণের জন্যই প্রশ্ন গড়িয়া তুলিয়া তাহার উত্তর দিতাম, কখনও কখনও ইহাতে কৌতুকও অনুভব করিয়াছি। আমি যথাসম্ভব সরলভাবে চিন্তা করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং আমার মনে হয়, অতীতের এই আলোচনা, এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

জুলাই মাসের শেষভাগে কমলার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রাণসংশয় অবস্থা হইল। ১১ই আগস্ট সহসা আমাকে

দেরাদুন জেল ত্যাগ করিবার আদেশ দেওয়া হইল এবং সেই রাত্রেই পুলিশ পাহারায় আমাকে এলাহাবাদ পাঠান হইল। পরদিন অপরাহ্নে আমরা এলাহাবাদের প্রয়াগ ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম; সেখানে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে বলিলেন যে, আমার পীড়িতা পত্নীকে দেখিবার জন্য আমাকে সাময়িকভাবে কারামুক্তি দেওয়া হইতেছে। আমার গ্রেফ্‌তারের দিন হইতে আজ পর্যন্ত একদিন কম ছয়মাস হইল।

৬৫

এগার দিন

"তরবারী তাহার পিধান জীর্ণ করে এবং আত্মাও হৃদয়কে জীর্ণ করিয়া ফেলে"—বায়রণ।

আমার কারামুক্তি সাময়িক। আমাকে বলা হইল যে, ইহা একদিন অথবা দুইদিন হইতে পারে; অথবা ডাক্তারগণ যতদিন অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিবেন, ততদিনও হইতে পারে। এই অনিশ্চিত অবস্থা, অতিমাত্রায় অশান্তিজনক, স্থির হইয়া কোন কাজই করা যায় না। সময় নির্দিষ্ট হইলে নিজের অবস্থা বিবেচনায় কাজের ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। এ অবস্থায়, যে কোন দিন যে কোন মুহূর্তে আমাকে কারাগারে ফিরিয়া যাইতে হইতে পারে।

এই আকস্মিক পরিবর্তনের জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। নির্জন কারাবাস হইতে একেবারে ডাক্তার, নার্স, আত্মীয়স্বজনপূর্ণ গৃহে জনতার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমার কন্যা ইন্দিরাও শান্তিনিকেতন হইতে আসিয়াছিল। কমলার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইবার জন্য এবং আমার সহিত দেখা করিবার জন্য বহু বন্ধু আসিতে লাগিলেন। এখানে জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতন্ত্র, গৃহের আরাম ও ভাল খাদ্যের ব্যবস্থা। কিন্তু এ সকলের মূলে রহিয়াছে কমলার সঙ্কটজনক অবস্থার জন্য উদ্বেগ।

তাঁহার দেহ শীর্ণ দুর্বল, যেন কমলার ছায়ামূর্তি তাঁহার রোগের সহিত ক্ষীণভাবে সংগ্রাম করিতেছে; তাঁহাকে চিরদিনের মত হারাইব, এই চিন্তা অসহ্যরূপে মর্মান্তিক হইয়া উঠিল। আমাদের বিবাহের পর সাড়ে আঠার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; সেইদিনের কথা আমার মনে পড়িল,—তারপর দীর্ঘকালের কত স্মৃতি! আমার বয়স তখন ছাব্বিশ বৎসর, তাঁহার বয়স তখন প্রায় সতর,—যেন ভুল করিয়া বালিকা হইয়াছে; সাংসারিক ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ। আমাদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান প্রচুর, আমাদের মানসিক গঠনের পার্থক্য আরও বেশী; আমার মানসিক বিকাশ তাঁহার চেয়ে অনেক অধিক। তথাপি বাহ্যের জাগতিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভার সত্ত্বেও, আসলে আমি বালকের মত চপল ছিলাম এবং আমি বুঝিতেই পারি নাই যে, বালিকার কোমল ও ভাবপ্রবণ মন পুষ্পের মতই ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং সেজন্য কত যত্ন ও সস্নেহ আদর আবশ্যক। আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম এবং ভাল ব্যবহার করিতাম কিন্তু আমাদের মনের পটভূমিকা ছিল স্বতন্ত্র, সর্বদাই সামঞ্জস্যের অভাব বোধ করিতাম। এই সামঞ্জস্যের অভাব হইতে সময় সময় খোঁচাখুঁচি হইত এবং তুচ্ছ বিষয় লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহও হইত। কিন্তু বালক বালিকার এই মনোমালিন্য

ক্ষণস্থায়ী, দ্রুত মিলনের মধ্যে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিত। আমাদের উভয়েরই মেজাজ চড়া ও অনুভূতিপ্রবণ এবং আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে উভয়েরই ধারণা অত্যন্ত বালকোচিত ছিল। ইহা সত্ত্বেও আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তবে সামঞ্জস্যের অভাবে তাহা ধীরে ধীরে হইয়াছে। আমাদের বিবাহের একুশ মাস পরে আমাদের কন্যা ও একমাত্র সন্তান ইন্দিরার জন্ম হয়।

আমাদের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রক্ষেত্রে নবরূপান্তরের সূচনা হইল; আমি ক্রমে সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তখন হোমরুল আন্দোলনের দিন, কিছু পরেই আসিল পাঞ্জাবের সামরিক আইন ও অসহযোগ, আমি ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের কাজের ধূলিতলে গড়াইয়া পড়িলাম। এই সকল কাজে আমি এত বেশী জড়াইয়া পড়িলাম যে, একরূপ অজ্ঞাতসারেই আমি তাঁহার দিকে লক্ষ্যও করিতাম না; যখন আমার সঙ্গ তাঁহার অধিক প্রয়োজন ছিল, সেই সময়েই তিনি কেবল নিজেকে লইয়া থাকিতেন। তাঁহার প্রতি আমার ভালবাসা বরাবর ছিল, এমন কি বাড়িয়াছে: তিনি তাঁহার স্নিগ্ধ হৃদয় লইয়া সর্বদাই আমার সেবা ও সান্ত্বনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, একথা ভাবিয়া আমি অপূর্ব সন্তোষ লাভ করিতাম। তিনি আমাকে বল দিয়াছেন, কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি মনে দুঃখ পাইতেন এবং নিজেকে একটু অবজ্ঞাত মনে করিতেন। এই অর্ধ-বিস্মৃতি ও অনিয়মিত মনোভাব অপেক্ষা তাঁহার প্রতি দয়াহীন ব্যবহার হয়ত অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর হইতে পারিত।

তারপর আসিল তাঁহার ব্যাধি, আমার কারাদণ্ডজনিত দীর্ঘ অনুপস্থিতি— এইকালে আমাদের মধ্যে কেবল জেলে দেখাশুনা হইত। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি আমাদের সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনিও কারাদণ্ড লাভ করায় কত আনন্দিতা হইয়াছিলেন। আমরা যেন পরস্পরের অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিলাম। আমাদের পরস্পরের বিলম্বিত ও বিরল দেখা-সাক্ষাৎ কত দুর্লভ সম্পদ মনে হইত, আমরা ঐ দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া প্রত্যেকটি দিবস গণনা করিতাম। আমাদের দেখাসাক্ষাৎ কিম্বা পরস্পরের সহিত স্বল্প অবস্থিতিকালে আমরা কখনও পরস্পরের প্রতি বিরক্তিবোধ করিতাম না, ভাল লাগে না, এমন ভাব মনে উঠিত না, সর্বদাই অম্লান অভিনবত্ব উপভোগ করিতাম। আমরা পরস্পরের মধ্যে কত কি নূতন আবিষ্কার করিতাম, যদিও তাহার সবগুলি আমাদের পছন্দ হইত না। এমন কি বড় হইয়াও আমাদের কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে তাহার অনেকটা বালক-বালিকার মত মনে হইত।

আঠার বৎসর বিবাহিত জীবন যাপনের পরও তাঁহাকে ঠিক কুমারী কন্যার মত দেখায়; তাঁহার অবয়বে গৃহিণীর মাতৃরূপ নাই। দীর্ঘকাল পূর্বে তিনি যেমন বধূ-বেশে আমাদের গৃহে আসিয়াছিলেন, যেন অনেকটা তেমনই আছেন। কিন্তু আমার প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে; যদিও বয়সের তুলনায় আমার দেহ সুগঠিত স্বচ্ছন্দগতি ও কর্মক্ষম এবং লোকে বলে এখনও আমার মধ্যে কিছু কিছু বালকোচিত চাপল্য রহিয়াছে কিন্তু আমাকে দেখিলে তাহা বুঝা যায় না। আমার মাথায় আংশিক টাক পড়িয়াছে, চুল পাকিয়াছে, আমার মুখে কুঞ্চিত রেখাবলী ফুটিয়াছে; চক্ষুর চারিদিকে কৃষ্ণ ছায়া। গত চারি বৎসরের দুঃখকষ্ট ও দুশ্চিন্তা আমার উপর অনেক আঘাতের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। ইদানীং আমি ও কমলা কোন অপরিচিত স্থানে গেলে, লোকে তাঁহাকে আমার কন্যা বলিয়া ভ্রম করিয়াছে এবং আমি অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছি। তাঁহাকে ও ইন্দিরাকে দুই বোনের মত দেখায়।

আঠার বৎসরের বিবাহিত জীবন! কিন্তু ইহার মধ্যে কত দীর্ঘ বৎসর আমি কারাগারের অন্ধ-গৃহে এবং কমলা হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যনিবাসে কাটাইয়াছে! এখনও আমি পুনরায় কারাদণ্ড ভোগ করিতেছি, দুদিনের জন্য মুক্ত মাত্র, আর কমলা রোগশয্যায় জীবনের আশায় সংগ্রাম করিতেছে। তাঁহার নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলার জন্য আমি তাঁহার উপর একটু বিরক্ত হইলাম। কিন্তু তথাপি আমি কি করিয়া তাঁহাকে দোষ দেই? জাতীয় সংগ্রামে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবার দুর্নিবার আগ্রহে তিনি স্বীয় অক্ষমতা ও কর্মহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা দেহের সাধ্যায়ত্ত ছিল না তিনি যথাযথ ভাবে কাজও করিতে পারেন নাই, চিকিৎসাও করিতে পারেন নাই, এবং [illegible] ভিতরের অনলে দেহ জ্বলিয়া গিয়াছে।

এখনই যে তাঁহাকে আমার সর্বাধিক প্রয়োজন, তিনি কি আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন? আমরা যে এতদিনে পরস্পরকে জানিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি—আমাদের মিলিত জীবন এই তো আরম্ভ হইল! আমাদের পরস্পরের উপর এত নির্ভরতা, আমাদের একত্রে কত কিছু করিবার আছে!

দিনের পর দিন, দণ্ডের পর দণ্ড তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া এইরূপ কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল।

সহকর্মী ও বন্ধুরা আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। আমি যাহা জানিতাম না, এমন অনেক ঘটনার কথা তাঁহাদের নিকট শুনিলাম। তাঁহারা প্রচলিত রাজনৈতিক সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়া আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন। একে কমলার অসুখের জন্য মন বিক্ষিপ্ত, তাহার উপর জেলে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র থাকার দরুণ এই সকল সুস্পষ্ট প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই শিক্ষালাভ করিয়াছি যে, জেলে প্রাপ্ত সীমাবদ্ধ সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া কোন রাজনৈতিক অবস্থা বিচার করা সম্ভবপর নহে। মনকে আলোচনায় উন্মুখ করিয়া তুলিবার জন্য ব্যক্তিগত সংস্পর্শের প্রয়োজন, নতুবা মত প্রকাশ করিতে গেলে তাহা বাস্তবতাবর্জিত পাণ্ডিত্য আলোচনায় পর্যবসিত হইতে পারে। গান্ধিজী এবং কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সহকর্মীদের সহিত আলোচনা না করিয়া, কংগ্রেসের কর্মনীতি সম্পর্কে কোন নিশ্চিত মত প্রকাশ করিলে তাঁহাদের প্রতিও অবিচার করা হইবে। কংগ্রেসে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার সমালোচনায় আমার মন পরিপূর্ণ থাকিলেও, কোন প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তখন আমার কারামুক্তির সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া এই ধারায় চিন্তা করিতে পারি নাই।

আমার পীড়িতা পত্নীর রোগশয্যা পার্শ্বে আসিতে দিয়া গভর্ণমেন্ট যে সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সুযোগ লইয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন সঙ্গত হইবে না, এ ভাবও আমার মনের মধ্যে ছিল। ঐ শ্রেণীর কোন কাজ করিব না বলিয়া কোন লিখিত সর্ত অথবা প্রতিশ্রুতি অবশ্য আমি দেই নাই তথাপি পূর্বোক্ত কারণে আমার মনে সঙ্কোচ আসিত।

কয়েকটি মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ ছাড়া আমি কোন বিবৃতি প্রচার করি নাই। এমন কি ঘরোয়া ভাবেও আমি কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির কথা বলি নাই, কিন্তু অতীত ঘটনা সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে সমালোচনা করিয়াছি। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল তখন সবেমাত্র গঠিত হইয়াছে এবং আমার অনেক অন্তরঙ্গ সহকর্মী উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। আমি যতদূর জানিতে পারিলাম তাহাতে উহার

মোটাম্টি কর্মনীতি আমার নিকট সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইল। কিন্তু ইহা এমন এক বিচিত্র ও বিমিশ্র দল বলিয়া মনে হইলে যে যদি আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনও থাকিতাম, তাহা হইলেও আমি সহসা ইহাতে যোগ দিতাম না। স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাকে কিছু সময় দিতে হইল, কেন না অন্যান্য স্থানের ন্যায় এলাহাবাদেও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন লইয়া এক অভূতপূর্ব তীব্র আন্দোলন সুরু হইয়াছিল। ইহার মধ্যে নীতিগত কোন ব্যাপার ছিল না; ইহা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র এবং কতগুলি ব্যক্তিগত কলহ মীমাংসার সাহায্যের জন্য আমার ডাক পড়িয়াছিল।

এই সকল ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়িতে আমার ইচ্ছাও ছিল না, তথাপি কতকগুলি ব্যাপার দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। স্থানীয় কংগ্রেসের নির্বাচন লইয়া লোকের এত উত্তেজনা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহারা অনেকেই সংঘর্ষ হইতে নানা ব্যক্তিগত কারণ দেখাইয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বর্জিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কারণগুলিরও কোন গুরুত্ব রহিল না এবং তাঁহারা সহসা বাহির হইয়া আসিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে অতি তীব্র এবং অশিষ্ট আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। অন্য দলকে দাবাইয়া দিবার ঐকান্তিক আগ্রহে মানুষ কি ভাবে অতি সাধারণ শিষ্টাচার পর্যন্ত ভুলিয়া যায়! আমি দেখিয়া মর্মাহত হইলাম যে স্থানীয় নির্বাচনে জয় লাভের উদ্দেশ্যে কমলার নাম, এমন কি, তাঁহার পীড়ার কথা পর্যন্ত ব্যবহার হইতে লাগিল।

ব্যাপক প্রশ্নগুলির মধ্যে ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিষয় আলোচিত হইতে লাগিল। যুবকের দল এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। কেন না তাহাদের মতে ইহা নিয়মতান্ত্রিক আপোষের পথে প্রত্যাবর্তন মাত্র। কিন্তু ইহার পরিবর্তে তাহারা কোন কার্যকরী উপায় নির্দেশ করিতে পারিল না। প্রতিবাদীরা কেহ কেহ উচ্চাঙ্গের নীতির কথা তুলিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য দলের নির্বাচনে যোগ দেওয়ায় তাহাদের কোন আপত্তি ছিল না। দেখিয়া মনে হইল তাহাদের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির পথ সুগম করিয়া দেওয়া।

এই সকল স্থানীয় কলহ রাজনীতির গতি ও পরিণতি দেখিয়া আমি অতি-মাত্রায় বিরক্ত হইলাম। তাঁহাদের সহিত আমার যেন প্রাণগত যোগ নাই এবং আমার নিজের জন্মভূমি এলাহাবাদে আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ অপরিচিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম যখন এই সকল ব্যাপারে যোগ দিবার সময় আসিবে, তখন এই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমি কি করিব?

আমি গান্ধিজীকে কমলার অবস্থা লিখিয়া জানাইলাম। আমাকে শীঘ্রই জেলে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং শীঘ্রই আর সুযোগ নাও পাইতে পারি, ইহা মনে করিয়া আমার মনের ভাবও ঐ পত্রে জানাইলাম। আধুনিক ঘটনাগুলিতে আমার মন বিশেষরূপে তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমার পত্রে তাহারও আভাস ছিল। কি করিতে হইবে, কি হওয়া উচিত অথবা কি হওয়া উচিত নয় আমি তাহা লিখিবার চেষ্টা করি নাই, কেবল যাহা ঘটিয়াছে তাহাই কতকাংশে লিখিয়াছিলাম। এই পত্র আমার অবরুদ্ধ ভাবাবেগের নিদর্শন মাত্র এবং পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে গান্ধিজী ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন।

দিনের পর দিন আমি কারাগারের আহ্বান অথবা গভর্নমেন্টের নিকট হইতে

অন্য কোন প্রকার সংবাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, মাঝে মাঝে আমাকে সংবাদ দেওয়া হইতে লাগিল যে পরদিবস অথবা তৎপর দিবসই আমাকে সরকারী নির্দেশ জানান হইবে। ইতিমধ্যে আমার পত্নীর অবস্থার বিবরণ প্রত্যহ জানাইবার জন্য ডাক্তারদিগকে অনুরোধ করা হইল। আমার আগমনের পর কমলার অবস্থার অতি সামান্য উন্নতি দেখা গেল।

সাধারণের মনে ধারণা হইল, এমন কি যাঁহারা সাধারণতঃই গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন তাঁহারাও মনে করিতে লাগিলেন যে দুইটি আসন্ন ঘটনা না হইলে আমাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দেওয়া হইত; আগামী অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ের কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন এবং নভেম্বর মাসে ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচন। জেলের বাহিরে থাকিলে এই সকল ব্যাপারে আমি উপদ্রব সৃষ্টি করিতে পারি এই কারণে সম্ভবতঃ আমাকে আরও তিন মাসের জন্য জেলে রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য আমাকে পুনরায় জেলে পাঠান হইবে না, এই সম্ভাবনাও ছিল এবং এই বিশ্বাসই দিনে দিনে বর্ধিত করিতে লাগিল। আমি স্থায়ীভাবে কাজকর্মে মনোযোগ দিবার সঙ্কল্প করিলাম।

আমার মুক্তির এগার দিন পর ২৩শে আগস্ট পুলিশের গাড়ী উপস্থিত হইল। পুলিশ কর্মচারী আমাকে বলিলেন যে আমার সময় শেষ হইয়াছে, আমাকে এখনই নৈনী জেলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি আত্মীয়বর্গের নিকট বিদায় লইলাম। আমি পুলিশের গাড়ীতে যাইতেছি এমন সময় আমার রুগ্না মাতা বাহুবিস্তার করিয়া আমার নিকট দৌড়াইয়া আসিলেন। তাঁহার সেই মুখ দীর্ঘকাল আমার স্মৃতি-পটে উদিত হইয়া মন বিষন্ন করিয়া তুলিত।

৬৬

কারাগারে প্রত্যাবর্তন

"অন্ধকারের একই রূপ, তাহার পথ অবিমৃত্ত, কিন্তু সূর্যালোকই তাহার গতি-পথে শত শত বিভিন্ন বর্ণে প্রতিভাত হয়। দুঃখ ও সুখের মধ্যেও সেই পার্থক্য; সুখের পথে দুঃখের আঘাত-বেদনার প্রচুর বাধা।"—রাজতরঙ্গিণী।

আমি পুনরায় নৈনী জেলে ফিরিয়া আসিলাম, মনে হইতে লাগিল যেন আমি এক অভিনব দণ্ডাদেশ লইয়া কারাগারে আসিয়াছি। ভিতর বাহির, বাহির ভিতর করিতে করিতে আমি যেন বালকের ক্রীড়াকন্দুকে পরিবর্তিত হইয়াছি। এই শ্রেণীর আকস্মিক পরিবর্তনে স্নায়ুপুঞ্জে যে আবেগের সঞ্চার হয়, পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের মধ্যে তাহাকে শান্ত করিয়া আনা কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য নহে। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, আমাকে নৈনীতে পুরাতন জেলে রাখা হইবে। ইতিপূর্বে দীর্ঘ অবস্থিতিকালে আমি উহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। সেখানে আমার ভগ্নীপতি রঞ্জিত পণ্ডিতের রোপিত কিছু ফুলগাছ ছিল এবং একটি সুন্দর বারান্দা ছিল। কিন্তু এই পুরাতন ৬নং ব্যারাকে তিন বিভাগ ও তিন কারাদণ্ডে আটক একজন রাজবন্দী ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার সাহচর্য অভিপ্রেত নহে বলিয়া আমাকে জেলের অন্য প্রান্তে লইয়া রাখা হইল। এই

স্থানটি অনেক বেশী আবৃত এবং ফুলবাগানের কোন চিহ্ন সেখানে ছিল না।

কিন্তু যে স্থানেই আমি দিবারাত্র যাপন করি না, কোন কিছুই আসে যায় না, কেন না আমার মন ছিল অন্যত্র। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল, কমলার অবস্থার যেটুকু উন্নতি হইয়াছিল, আমার পুনরায় গ্রেফ্‌তারের আঘাতে সেটুকু থাকিবে না। ঘটিলও তাহাই। কয়েকদিন আমাকে কারাগারে ডাক্তারদের সংক্ষিপ্ত দৈনিক বিবরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ইহা অনেক হাত ঘুরিয়া আসিত। ডাক্তার টেলিফোন যোগে ইহা পুলিশের সদর অফিসে জানাইতেন, তাহারা আবার উহা কারাগারে পাঠাইয়া দিত। জেল কর্মচারীদের সহিত ডাক্তারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কর্তৃপক্ষের ভাল লাগে নাই। দুই সপ্তাহ কাল অনিয়মিত হইলেও আমি প্রত্যহ এই বিবরণ পাইয়াছি। তাহার পর উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অথচ তখন কমলার অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছিল।

দুঃসংবাদ এবং সংবাদের জন্য প্রতীক্ষা দিবসকে অসহনীয় রূপে দীর্ঘ করিয়া তুলিত এবং রাত্রি অধিকতর অসহনীয় বলিয়া বোধ হইত। সময় যেন স্থির অথবা শম্বুকের মত মন্থর গতি, একটি ঘণ্টা যেন আর একটি ঘণ্টার উপর দুঃস্বপ্নের দুর্বহ বোঝা। জীবনে কখনও আমি উহা এত তীব্র ভাবে অনুভব করি নাই। তখন আমি মনে ভাবিতাম যে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের পরেই মাস দুইয়ের মধ্যে আমি মুক্তি লাভ করিব। কিন্তু এই দুই মাস অনন্তকাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

আমার পুনরায় গ্রেফ্‌তারের ঠিক এক মাস পরে একদিন একজন পুলিশ কর্মচারী আসিয়া আমার পত্নীর সহিত কিছু কাল সাক্ষাতের জন্য আমাকে কারাগার হইতে লইয়া গেলেন। আমি শুনিলাম আমাকে সপ্তাহে দুইবার করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে। এমন কি, সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। আমি চারিদিন অপেক্ষা করিলাম, কেহ আমাকে লইতে আসিল না; পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম দিনও অতিবাহিত হইল। প্রতীক্ষা করিতে করিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তাঁহার অবস্থা পুনরায় সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাইলাম। আমাকে সপ্তাহে দুইবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে লইয়া যাওয়া হইবে, এই কথা বলিয়া পরিহাস করিবার কি প্রয়োজন ছিল?

অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসও অতিবাহিত হইল। এমন দীর্ঘতম ক্লেশকর ত্রিশটি দিন জীবনে আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।

অনেক মধ্যস্থের মারফতে আমাকে এরূপ পরামর্শ দেওয়া হইল যে যদি আমি প্রতিশ্রুতি দেই, এমন কি মৌখিক প্রতিশ্রুতিও দেই যে আমার কারাদণ্ডকাল পর্যন্ত আমি রাজনীতি হইতে দূরে থাকিব তাহা হইলে কমলার শুশ্রূষার জন্য আমি মুক্তি পাইতে পারি। সে মুহূর্তে আমার চিন্তার কোন রাজনীতি ছিল না, বিশেষতঃ এপার দিন বাহিরে থাকিয়া যে রাজনীতি আমি দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতেই আমার মন তিক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিব! আমার নিজের সংকল্পের প্রতি, উদ্দেশ্যের প্রতি, আমার সহকর্মীদের প্রতি, আমার নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব? যাহাই ঘটুক না কেন ইহা অসম্ভব সর্ত! ইহা করার অর্থ নিজের সত্তার ভিত্তিকে মর্মান্তিক আঘাত করা, আমার মধ্যে যাহা কিছু পবিত্র বলিয়া আমি মনে করি, তাহারই অপমান করা। আমি শুনিলাম, কমলার অবস্থা দিনে দিনে মন্দ হইয়া পড়িতেছে। এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আমার অবস্থিতিও তাঁহাকে অনেকখানি সান্ত্বনা দিতে পারিত। আমার ব্যক্তিগত অহমিকা ও গৌরব-বুদ্ধিই বড়, না, তাঁহাকে সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা

বড়? অমঙ্গলের এই পূর্বাভাস আমার নিকট অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অন্ততঃ তখন আমি এ ভাবে এই সমস্যার সম্মুখীন হই নাই। আমি জানিতাম আমি কোন সর্তে আবদ্ধ হইলে কমলা নিজেই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন এবং আমি যদি ঐরূপ কিছু করিতাম তাহা হইলে তিনি আহত হইতেন এবং তাহাতে তাঁহার অনিষ্টই হইত।

অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে আমাকে পুনরায় তাঁহাকে দেখিতে লইয়া যাওয়া হইল। প্রবল জ্বরে তিনি মূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া আছেন। তিনি আমাকে নিকটে রাখিবার জন্য ব্যাকুলতা দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া ত[illegible]ক জেলে ফিরিয়া যাইতেই হইবে। তিনি মুখে সাহস আনিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিলেন এবং আমাকে মস্তক অবনত করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি ঐরূপ করিলে তিনি কানে কানে কহিলেন, "গভর্ণমেণ্টের নিকট তুমি প্রতিশ্রুতি দিবে? এ কি সব শুনিতেছি? তুমি কিছুতেই উহা করিও না।"

আমার এগার দিন জেলের বাহিরে থাকার সময় স্থির হইয়াছিল যে, কমলা একটু সুস্থ হইলেই তাঁহাকে কোন উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। তখন হইতে তাঁহার অপেক্ষাকৃত ভাল হওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতেছি, কিন্তু ভাল হওয়া তো দূরের কথা, ছয় সপ্তাহ পরে তাঁহার অবস্থা অধিকতর মন্দ হইয়া পড়িল। এ ভাবে তাঁহার ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া, এই অবস্থাতেই তাঁহাকে ভাওয়ালী পাঠান স্থির হইল।

তাঁহার ভাওয়ালী যাত্রার পূর্বদিন আমাকে জেল হইতে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইল। আমি তাঁহাকে আবার কবে দেখিতে পাইব, ভাবিয়া কূল পাইলাম না। তাঁহাকে কি আর দেখিতে পাইব? কিন্তু সেদিন তাঁহাকে বেশ হাসিখুসী দেখিয়া আমি বহুদিন পর সন্তোষলাভ করিলাম।

তিন সপ্তাহ পরে কমলার নিকটে থাকিবার জন্য আমাকে আলমোড়া জেলে বদলি করা হইল। ভাওয়ালীর পথে বলিয়া আমি ও আমার রক্ষী পুলিশ কর্মচারী কয়েক ঘণ্টা সেখানে রহিলাম। কমলার অনেক উন্নতি হইয়াছে দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইল, লঘু হৃদয়ে আমি আলমোড়া যাত্রা করিলাম। তবে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই গিরিশ্রেণী দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল।

পর্বতের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া আমার কত আনন্দ! আমাদের মোটরগাড়ী সর্পিল পথে চলিয়াছে, প্রভাতের শীতল বায়ু, পর পর উদ্ঘাটিত দৃশ্যরাজি, কত মনোহর! আমরা ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিলাম, পর্বত-সঙ্কটের গভীরতা বাড়িতে লাগিল, শৃঙ্গমালা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়িল। নব নব তরুলতা দেখিতে দেখিতে আমরা দেবদারু ও পাইনের রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। রাস্তার বাঁক ঘুরিলেই অভিনব বিশাল গিরিশ্রেণী চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, নিম্নে উপত্যকায় কলনাদিনী ক্ষুদ্র তটিনী। দেখিয়া আশা মিটে না, ক্ষুধিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহি, এইরূপে স্মৃতিসম্পুটে ভরিয়া লইতে চাহি; যখন এই দৃশ্য আমার চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যাইবে, তখন যেন স্মৃতি-পটে ইহা পুনরায় দেখিতে পাই।

পর্বতগাত্রে কুটীরশ্রেণী—তাহা ঘিরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যক্ষেত্র, কত পরিশ্রমে পর্বতের গাত্রে এগুলি খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইয়াছে। দূর হইতে এগুলি অলিন্দের মত দেখায়, কখনও বা মনে হয় দীর্ঘ সোপানাবলী নিম্নভূমি হইতে শীর্ষে উঠিয়া গিয়াছে। অনাবিল কর্ষিত মুষ্টিমেয় মানব প্রকৃতির নিকট হইতে অতি সামান্য শস্য পাইবার জন্য কি অসামান্য পরিশ্রম করিয়াছে! তাহাদের

প্রয়োজনের পক্ষেও যাহা পর্যাপ্ত নহে, তাহাই পাইবার জন্য কত দীর্ঘকালব্যাপী অবিরত শ্রম ইহারা করিতেছে। পর্বতের পার্শ্বে সমতলভূমির কর্ষিত ক্ষেত্রগর্লি, গার্হস্থ্য জীবনের আভাস বহিয়া আনে, তাহারই পার্শ্বে, ঊর্ধ্বে, কৃষ্ণ অরণ্যানীর সম্পূর্ণ বিভিন্ন আশ্চর্য রূপ!

দিবাভাগ অত্যন্ত আরামপ্রদ—বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্বতে পর্বতে জীবনের স্পন্দন জাগিল; দূরত্বের ব্যবধান যেন রহিল না, তাহাদের সহিত পরিচিত বন্ধুর ঘনিষ্ঠতা অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু দিবাবসানে তাহাদের এই প্রসন্ন মূর্তির কি আমূল পরিবর্তন! "জগতের উপর দিয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে রজনীর যাত্রারম্ভের" সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকের পর্বতমালা শীতল গাম্ভীর্যে ভরিয়া উঠে, জীবন গুহার অতলে আত্মগোপন করে, কেবল বন্যপ্রকৃতি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। চন্দ্রালোকে অথবা তারকার মৃদুভাতিতে পর্বতমালা, চরাচর পরিব্যাপ্ত ভীতি-মিশ্রিত রহস্যময় বলিয়া মনে হয়; কঠিন বাস্তব বলিয়া যেন মনে হয় না, উপত্যকা হইতে উপত্যকায় বাতাস কাঁদিয়া ফেরে। একক পথিক জনহীন পথে ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে, সে সর্বত্র দেখে আতঙ্কের ছায়া। এমন কি, বায়ুর শব্দ উদ্ধত পরিহাসের মত মনে হয়। কখনও বা বায়ুহীন শব্দহীন নিষ্কম্প নিস্তব্ধতায় বক্ষ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কেবল টেলিগ্রাফের তার হইতে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠিতে থাকে, তারাগুলি অধিকতর উজ্জ্বল ও নিকটবর্তী বলিয়া মনে হয়। পর্বতমালা নিষ্করুণ গাম্ভীর্যে চাহিয়া থাকে, তাহার রহস্যের সম্মুখে মুখামুখি দাঁড়াইতে ভয় হয়। পাস্কালের মতই মনে হয়, "এই অসীম বিস্তারের অনন্ত নিস্তব্ধতায় আমি ভীত।" সমতলক্ষেত্রে রজনী এত নিস্তব্ধ নহে; কীটপতঙ্গ ও পশুপক্ষীর শব্দে রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া যায়।

কিন্তু শীতরজনীর নিরানন্দ আবির্ভাব তখনও বহুদূরে, আমরা মোটরে আলমোড়ায় চলিয়াছি। আমাদের গন্তব্যস্থান নিকটবর্তী, এমন সময় পথের মোড় ঘুরিতেই মেঘমুক্ত এক অপূর্ব দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইল। আমি বিস্মিত আনন্দে চাহিয়া দেখিলাম। তুষার-মৌলী হিমগিরির শৃঙ্গরাজি, অরণ্যানীমণ্ডিত পর্বত-মালার ঊর্ধ্বে সমুন্নত-শির। যুগযুগান্তের জ্ঞানগম্ভীর প্রশান্তি লইয়া ইহারা যেন বিশাল ভারতের শিয়রে সদাজাগ্রত প্রহরী। ইহাদের দেখিয়া হৃদয় ও মন জুড়াইল; সমতলক্ষেত্রে অগণিত পল্লী নগরের ক্ষুদ্র সংঘাত ও ষড়যন্ত্র, লোভ ও মিথ্যা,—এই অনন্তের সম্মুখে তুচ্ছতম বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

আলমোড়ার ক্ষুদ্র জেলটি পর্বতগাত্রে অবস্থিত। একটি নবাবী ধরণের ব্যারাক আমাকে দেওয়া হইল। একান্ন ফিট লম্বা সতর ফিট চওড়া কাঁচা ঘর, মেঝে অসমান, উই-এ খাওয়া ছাদ হইতে অনবরত কুটা ও ধূলি ঝরিয়া পড়ে। পনরটি জানালা, একটি দরজা। এগুলিকে জানালা না বলিয়া দেওয়ালে বড় বড় শিক দেওয়া ফাঁক বলা সঙ্গত। অতএব নির্মল বায়ুর অভাব নাই। শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ফাঁক চটের পর্দা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। এই বিস্তীর্ণ স্থানে (ইহা দেরাদুন জেলের যে কোন ইয়ার্ড হইতে বড়) আমি নির্জন গরিমায় বাস করিতে লাগিলাম। এখানে আমি একা ছিলাম না, বহু চড়াই পাখী জাল্লা ছাদের ফাটলে বাসা বাঁধিয়াছিল। সময় সময় ভাসমান মেঘ মুক্ত অবকাশ দিয়া আমার ঘরে আসিত—সিক্ত কুয়াসায় চারিদিক আচ্ছন্ন হইত।

বৈকালে সাড়ে চারটার সময় নৈশ আহারের সহিত কড়া চা পান করিবার পর পাঁচটার সময় আমাকে তালাবন্দী করা হইত। সকালবেলা সাতটায় দরজা খোলা হইত। আমি ব্যারাকে বসিয়া অথবা সংলগ্ন উঠানে বসিয়া রৌদ্র পোহাইতাম।

প্রাচীরের উপর দিয়া এক মাইল বা অনুরূপ দূরবর্তী এক পর্বত দেখিতাম—ঊর্ধ্বে নীলাকাশ, বিক্ষিপ্ত মেঘমালা। মেঘগুলি ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপ গ্রহণ করিত, সেই বিবর্তনলীলা দেখিয়া আমি কখনও ক্লান্তিবোধ করিতাম না। আমি উহাদের মধ্যে নানাবিধ পশু প্রাণী কল্পনা করিতাম। কখনও বা মেঘে মেঘ মিশিয়া মহাসমুদ্রের মত মনে হইত। কখনও উহাদের মধ্যে বিস্তীর্ণ বেলাভূমি দেখিতাম। অনিলান্দোলিত দেবদারু কুঞ্জের মর্মরে, সমুদ্রের দূরাগত ধ্বনি শুনিতাম। কোন কোন মেঘখণ্ড নির্ভয়ে আমার নিকট আসিত। দূর হইতে যাহা কঠিন পদার্থ বলিয়া মনে হইত, তাহাই তরল বাষ্পের মত অ...ক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত।

যদিও অপরিসর স্থান হইতে এখানে অধিকতর নিঃ...তা অনুভব করি, তথাপি ক্ষুদ্র সেল অপেক্ষা এই প্রশস্ত ব্যারাক অনেক ভাল। এমন কি বৃষ্টির সময়ও আমি যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারি। কিন্তু শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা নিরানন্দদায়ক হইয়া উঠিল; শীত যখন শূন্য ডিগ্রীর কাছাকাছি, তখন নির্মল-বায়ুর জন্য বা বাহিরে যাইবার কোন আগ্রহ হয় না। কিন্তু নববর্ষের প্রারম্ভে তুষারপাত হইল; নীরস কারাগারের চারিদিকও সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিল দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বিশেষ ভাবে জেলের বাহিরে দেবদারু-শ্রেণীর তুষারমণ্ডিত দেহ কি সুন্দর শোভাময়!

কমলার অনিশ্চিত অবস্থার জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। মন্দ সংবাদ পাইলেই আমি বিচলিত হইতাম; কিন্তু হিমালয়ের শীতল বাতাসে দেহ মন স্নিগ্ধ ও শান্ত হইয়া উঠিল, আমি পুনরায় আমার চিরাভ্যস্ত সুষুপ্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। নিদ্রিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে কতদিন বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছি কি রহস্যময় এই নিদ্রা! কেন এই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়? যদি আমার এই নিদ্রা না ভাঙ্গে!

এই কালে কারাগার হইতে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতে লাগিলাম। বোম্বাই কংগ্রেস শেষ হইয়াছে; নভেম্বর আসিয়া চলিয়া গেল। ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনের উত্তেজনাও শেষ হইয়াছে। আমি অনতিবিলম্বে কারামুক্তির প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম।

একদিন খাঁ আবদুল গফুর খাঁর গ্রেপ্তার ও কারামুক্তির অপ্রত্যাশিত সংবাদ আসিল এবং অল্প কয়েক দিনের জন্য ভারতে আগত সুভাষ বসুর উপর অতি আশ্চর্য নিষেধাজ্ঞার খবরও পাইলাম। এই আদেশের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও সুবিবেচনা বলিয়া কিছু ছিল না। যিনি তাঁহার দেশের জনসঙ্ঘের শ্রদ্ধাভাজন, যিনি নিজের পীড়া সত্ত্বেও মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতাকে দেখিতে আসিয়াও দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার উপরই ঐরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। ইহাই যদি গভর্ণমেণ্টের মনোভাব হয়, তাহা হইলে আমার শীঘ্র কারামুক্তির কোন আশাই নাই। পরে সরকারী ঘোষণায় তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল।

আমার আলমোড়া জেলে আসিবার একমাস পর আমাকে ভাওয়ালিতে লইয়া গিয়া কমলার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইল। তাহার পর হইতে তিন সপ্তাহ পর পর তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন যে, আমাকে আমার স্ত্রীর সহিত সপ্তাহে একবার কি দুইবার দেখা করিতে দেওয়া হয়। তিনি যদি বলিতেন, মাসে দুই বার কি একবার, তাহা হইলেই তিনি অধিকতর সত্য বলিতেন। আলমোড়ার সাড়ে তিন মাসের মধ্যে তাঁহার সহিত আমার মাত্র পাঁচবার দেখা হইয়াছে। আমি অভিযোগ

করিবার জন্য এই কথা উল্লেখ করিতেছি না; কেন না, কমলার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা দিয়া গভর্ণমেণ্ট আমার প্রতি অনন্যসাধারণ সুবিবেচনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার সহিত এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের সুযোগ আমার পক্ষে দুর্লভ সৌভাগ্য, সম্ভবতঃ তাঁহার পক্ষেও। আমাদের সাক্ষাতের দিন ডাক্তারেরা তাঁহাদের বাঁধাধরা নিয়ম স্থগিত রাখিতেন এবং আমি অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত আলাপের সুবিধা পাইতাম। আমরা পরস্পরের গাঢ় সান্নিধ্য অনুভব করিতাম, তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবার সময় বেদনা অনুভব করিতাম। আমাদের মিলন যেন বিচ্ছিন্ন হইবার জন্যই। তখন আমার বেদনার সহিত মনে পড়িত, এমন দিন আসিবে যখন আমাদের আর সাক্ষাৎ হইবে না।

আমার মাতা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া চিকিৎসার্থ বোম্বাই গিয়াছিলেন। শুনিলাম তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইতেছে। জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে একদিন প্রভাতে তারযোগে এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ পাইয়া আহত হইলাম। তাঁহাকে পক্ষাঘাত রোগ আক্রমণ করিয়াছে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার বোম্বাই জেলে বদলী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার অবস্থার একটু উন্নতি হওয়ায় আমাকে সেখানে পাঠান হইল না।

জানুয়ারী গিয়া ফেব্রুয়ারী আসিল। বাতাসে বসন্ত আগমনের কানাকানি শুনিলাম। বুলবুল ও অন্যান্য পাখী আসিয়া পুনরায় কূজন আরম্ভ করিল, ক্ষুদ্র তৃণাঙ্কুরগুলি রহস্যের অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া আশ্চর্য পৃথিবীর দিকে নির্নিমেষে চাহিতে লাগিল। রডোডেণ্ড্রন গুচ্ছ, পর্বতগাত্র শোণিতাভ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিল এবং তরুরাজিতে নবপল্লব ফুটিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া দিন গণি, কবে আবার ভাওয়ালীতে যাইব। বিরহ, নিষ্ঠুরতা ও ব্যর্থতার পর জীবনে মহার্ঘ পুরস্কার আনে, এই কথার মধ্যে কি সত্য আছে, আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি। সম্ভবতঃ উহা ব্যতীত পুরস্কারের যোগ্য মূল্য আমরা বুঝিতে পারিতাম না। চিন্তাকে স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্য যেমন দুঃখের প্রয়োজন আছে, কিন্তু দুঃখের আতিশয্য মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করিতে পারে। কারাগারে মানুষকে আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত করে। আমি কারাগারের দীর্ঘ বর্ষগুলিতে আপনাতে আপনি সমাহিত হইতে বাধ্য হইয়াছি। স্বভাবতঃ আমার প্রকৃতি অন্তর্মুখী নহে, কিন্তু কারাজীবন কড়া কফি অথবা সেঁকো বিষের মত মানুষকে অন্তর্মুখী করিয়া তোলে। সময় সময় নিজেকে লইয়া কৌতুক করিবার জন্য আমি অধ্যাপক ম্যাকডুগালের পদ্ধতিতে অন্তর্মুখ অবস্থা পরিমাপ করিতাম এবং আমি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতাম যে কত দ্রুত তাহার অবস্থান্তর ঘটে।

কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

"রজনীর যাত্রাপথ উষার অরুণরাগে রঞ্জিত হয়, কিন্তু আমাদের জীবনের দিন আর ফিরিয়া আসে না। দূরে দিগ্বলয়রেখায় চক্ষু ভরিয়া উঠে, কিন্তু বেদনার উৎস হৃদয়ের গভীর অতলে সমাহিত থাকে।"—লি তাই-পো।

সংবাদপত্র হইতে বোম্বাই কংগ্রেসের বিবরণ জানি' পারিলাম। ইহার রাজনীতি এবং কে কি করিলেন তাহা জানিবার জন্য আ'ার স্বভাবতঃই আগ্রহ ছিল। বিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলে কংগ্রেসের ''হিত আমার প্রাণগত যোগ অতি নিবিড়। আমার ব্যক্তিত্বকে প্রায় উহার মধ্যেই ' সর্জন দিয়াছি। কোন পদ বা দায়িত্ব অপেক্ষা এই মহান প্রতিষ্ঠান এবং আমার সহস্র সহস্র পুরাতন সহকর্মী বন্ধুর সহিত স্নেহবন্ধন অধিকতর শক্তিশালী। কিন্তু ইহার বিবরণ পাঠ করিয়া আমি উৎসাহ বা উত্তেজনার কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। কয়েকটা উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ব্যতীত সমগ্র ব্যাপারটাই নিরানন্দ ও অবসাদজনক। আমার মনে হইল, আমি সেখানে থাকিলে কি করিতাম। নূতন অবস্থা এবং আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমার চিত্তে কি ভাবের উদয় হইত তাহা বলা কঠিন। জেলে বসিয়া নিজের মনকে জোর করিয়া কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য করা অত্যন্ত অযৌক্তিক; কেন না এরূপ সিদ্ধান্তের এখন কোন প্রয়োজন নাই। সময় আসিলে আমাকে তৎকালীন সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইয়া কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। কি করিব, তাহা পূর্ব হইতে কল্পনা করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র। এমন কি, কোন কিছু ঠিক করার পূর্বেই আমার মনের মধ্যেও ভাবান্তর ঘটিতে পারে।

এই দূর হিমগিরির কোলে বসিয়া যতদূর সম্ভব আমি কংগ্রেসের দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলাম। এক গান্ধিজীর ব্যক্তিত্বের অসামান্য প্রভাব, অপর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং শ্রীযুত আনের ক্ষীণ দুর্বল সাম্প্রদায়িক প্রতিবাদ। যাঁহারা ভারতীয় জনসাধারণ ও মধ্যশ্রেণীর মানসিক গতি-প্রকৃতি অবগত আছেন, গান্ধিজীর ভারতবর্ষের উপর এই অতুলনীয় প্রভাব দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন না। সরকারী কর্মচারীরা এবং কোন কোন রাজনৈতিক কল্পনা করেন এবং ভাবিয়া আনন্দিত হন যে রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধিজীর খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে, অন্ততঃপক্ষে তাঁহার প্রভাব বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু তিনি যখন পুরাতন কর্মশক্তি ও প্রভাব লইয়া পুনরায় আবির্ভূত হন, তখন তাঁহারা এই দুশ্যমান পরিবর্তনের নূতন কারণ খুঁজিতে আরম্ভ করেন। তিনি যে কংগ্রেস ও দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহার কারণ তাঁহার কোন বিশেষ মত নহে (সাধারণতঃ অবশ্য এরূপই ধরিয়া লওয়া হইয়া থাকে)। তাহা তাঁহার অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের জন্য। ব্যক্তিত্বের প্রভাব সর্ব দেশেই বিদ্যমান, তবে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতেই ইহার প্রভাব সর্বাধিক দৃষ্ট হয়।

তাঁহার কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ এই [illegible] এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাহ্যতঃ ইহা দ্বারা কংগ্রেসী আন্দোলনের ইতিহাসের এক মহান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিল। কিন্তু মূলতঃ ইহা তত বৃহৎ ব্যাপার নহে। কেন না তিনি ইচ্ছা করিলেও এই নেতৃত্বের আসন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। তাঁহার এই

প্রতিষ্ঠা কোন পদগৌরব বা অন্য কোন প্রকার যোগাযোগের উপর নির্ভর করে না। অদ্যকার কংগ্রেসে পূর্বের মতই তাঁহারই মতবাদ প্রতিবিম্বিত; কংগ্রেস যদি তাঁহার নির্দিষ্ট পথ হইতে সরিয়াও যায় তাহা হইলেও গান্ধিজীর প্রভাব কংগ্রেস ও দেশের উপর বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকিবে। এই ভার ও দায়িত্ব হইতে তিনি নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন না। ভারতে প্রচলিত অবস্থা হইতে উদ্দেশ্য-গুলির দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার ব্যক্তিত্ব যে কোন ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং তাহা ভুলিবার উপায় নাই।

বর্তমানে কংগ্রেস যাহাতে বিব্রত না হয় এই জন্যই তিনি উহা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনপ্রকার প্রত্যক্ষ উপায় অবলম্বনের চিন্তা করিয়াছেন যাহার ফলে গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। ইহাকে তিনি কংগ্রেসের মধ্য দিয়া পরিচালনা করিতে চাহেন না।

দেশের শাসনতন্ত্র নির্ণয়ের জন্য কংগ্রেস গণপরিষদের আদর্শ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত হইলাম। আমার মনে হয় সমস্যা সমাধানের অন্য কোন পথ নাই এবং আমার বিশ্বাস, কোন না কোন সময়ে ঐরূপ পরিষদ আহ্বান করিতে হইবে। যদি কোন বিপ্লব সাফল্যলাভ করে, সে স্বতন্ত্র কথা, অন্যথা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত ইহা অবশ্য হইতে পারে না এবং ইহাও স্পষ্ট যে, বর্তমান অবস্থায় এইরূপ সম্মতি পাওয়া যাইবে না। অতএব প্রকৃত পরিষদ আহ্বান করিতে হইলে দেশের মধ্যে প্রকৃত শক্তির উদ্বোধন হওয়া আবশ্যক। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উহা ব্যতীত রাজনৈতিক সমস্যাগুলিরও সমাধান হইবে না। কোন কোন কংগ্রেস নেতা গণপরিষদের আদর্শ গ্রহণ করিলেও উহাকে পুরাতন ছাঁচের এক বৃহৎ সর্বদল-সম্মিলনীতে নামাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। কেন না স্বয়ং নির্বাচিত সেই পুরাতন ব্যক্তিরা আসিয়া মিলিত হইবেন এবং কিছুতেই একমত হইবেন না। গণপরিষদের মর্মকথা এই যে উহা ব্যাপকভাবে গণসাধারণ কর্ত্তৃক নির্বাচিত হইবে এবং গণসাধারণ হইতে উহা প্রেরণা এবং শক্তি সংগ্রহ করিবে। এইরূপ সম্মেলন সোজাসুজি প্রকৃত সমস্যা-গুলির সম্মুখীন হইতে পারিবে এবং পূর্বের মত সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনপ্রকার বাধা রাস্তার থাকিবে না।

এই প্রস্তাবে সিমলা ও লণ্ডনে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। আধা-সরকারীভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল যে গভর্ণমেণ্টের ইহাতে কোন আপত্তি নাই; তাঁহারা মুরুব্বির মত ইহা অনুমোদনও করিলেন। কেন না তাঁহাদের আশা ছিল যে পুরাতন ধরণের সর্বদল-সম্মিলনীর মত ইহা ব্যর্থ হইবেই এবং তাহাতে তাঁহাদেরই শক্তি বাড়িবে। পরে অবশ্য তাঁহারা এই প্রস্তাবের বিপদ-সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত জোরের সহিত ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

বোম্বাই কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচন আসিল। কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক কার্যপ্রণালীর প্রতি আমার নিরুৎসাহ সত্ত্বেও আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম এবং কংগ্রেসপ্রার্থীদের সাফল্য কামনা করিতে লাগিলাম, অথবা আরও সত্য করিয়া বলিলে বলিতে হয় আমি তাহাদের বিরোধীদের পরাজয় প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম। এই সকল বিরোধীদের মধ্যে ভাগ্যান্বেষী সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল এবং ইহারা গভর্ণমেণ্টের দমননীতি দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই যে পরাজিত হইবে সে সম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মূল লক্ষ্য দুর্নিরীক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহাদের অনেকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সুবিস্তৃত পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও কংগ্রেস আশ্চর্য সাফল্যলাভ করিল এবং আমি দেখিয়া সুখী হইলাম যে বহু অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করিতে পারিল না।

তথাকথিত কংগ্রেস জাতীয়দলের মনোভাব আমার নিকট অতিমাত্রায় শোচনীয় মনে হইল, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতি তাঁহাদের তীব্র বিরোধিতার অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির আশায় অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত মিলিত হইলেন। এমন কি, ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়া সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াপন্থী সনাতনীদের সহিত, এবং সেই সঙ্গে বহু নিন্দিতচরিত্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াপন্থীর সহিত একত্র মিলিত হইলেন। বাঙ্গলাদেশে অবশ্য কতকগুলি বিশেষ কারণে একটা শক্তিশালী কংগ্রেসী দলের সমর্থন তাঁহারা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ছাড়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সকল দিক দিয়াই কংগ্রেস-বিরোধী ছিলেন। এমন কি, অনেকেই ছিলেন খ্যাতনামা কংগ্রেস-বিদ্বেষী। এই সকল বিরুদ্ধ-শক্তি এবং জমিদার ও লিবারেলগণের এবং সরকারী কর্মচারিগণের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও কংগ্রেসপ্রার্থীরা অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মনোভাব অদ্ভুতপূর্ব, তথাপি অবস্থা বিবেচনায় ইহার অতি অল্প ইতরবিশেষই হইতে পারিত। ইহা তাহাদের অতীতের নিরপেক্ষ দুর্বলনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল। সূচনাতেই আশু পরিণাম গ্রাহ্য না করিয়া দৃঢ়তার সহিত কর্মপন্থা নির্বাচন করিয়া লইলে তাহা অধিকতর মর্যাদাসূচক এবং নির্ভুল হইতে পারিত। কিন্তু কংগ্রেস উহা করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় বর্তমান সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোন পথ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং উহা মানিয়া লওয়া অসম্ভব; কেন না যতদিন উহা বিদ্যমান থাকিবে ততদিন কোন স্বাধীনতাই সম্ভবপর নহে। ইহার কারণ ইহা নহে যে মুসলমানদিগকে অনেক বেশী দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন, ভিন্ন প্রকার উপায়েও তাহা দেওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে কতকগুলি স্বতন্ত্রভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভারসাম্য রক্ষা করিবে এবং একে অন্যের প্রভাব হ্রাস করিবে, যাহাতে বৈদেশিক ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণই সর্বেসর্বা হইয়া থাকিতে পারেন। ইহাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি নির্ভরতা অনিবার্য।

বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে ক্ষুদ্র ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে অধিক সংখ্যক আসন দিয়া হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছিল। এই প্রকার বাঁটোয়ারা অথবা সিদ্ধান্ত অথবা ইহাকে যাহাই বলা হউক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে তিক্ত ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইবেই এবং ইহা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া যাইতেও পারে অথবা রাজনৈতিক কারণে সাময়িকভাবে লোকে ইহা সহ্যও করিতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে নিরত সংঘর্ষের সম্ভাবনা বিদ্যমান। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ইহার অন্তর্নিহিত অন্যায়ই ইহার একটা অনুকূল দিক, কেন না এই অন্যায় কোন কিছুর স্থায়ী ভিত্তি হইতে পারে না।

জাতীয়দল এবং তদপেক্ষাও অধিকভাবে হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বভাবতঃই এই বলপ্রয়োগে ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সমালোচনার প্রকৃত ভিত্তি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মতবাদের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহার সমর্থকগণও উহাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার বল

হইল এই যে তাঁহারা এমন এক আশ্চর্য কর্মনীতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন যাহা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত সন্তোষের বিষয়। বাঁটোয়ারা লইয়া অতিমাত্রায় মাতামাতির ফলে অন্যান্য গুরুতর ব্যাপারে তাঁহাদের বিরুদ্ধতা মন্দীভূত হইল এবং তাঁহারা আশা করিতে লাগিলেন যে উৎকোচ দিয়া অথবা তোষামোদ করিয়া গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাঁহাদের অনুকূলে বাঁটোয়ারা পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইবেন। এইপথে হিন্দু মহাসভা সকলের চেয়ে অধিক অগ্রসর হইলেন। কিন্তু একথা তাঁহাদের মনে হইল না যে ইহা কেবল অপমানজনক অবস্থা নহে, পরন্তু ইহার ফলে বাঁটোয়ারার পরিবর্তন অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিবে, কেন না ইহাতে কেবলমাত্র মুসলমানেরা অধিকতর বিরক্ত হইবে এবং আরও দূরে সরিয়া যাইবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে জাতীয়তাবাদের চিত্ত জয় করা অসম্ভব—ব্যবধান অতি বৃহৎ এবং বিপরীত স্বার্থের সংঘাতও স্পষ্ট, অতি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ব্যাপারেও তাহাদের পক্ষে হিন্দু এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদিগকে সমানভাবে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। একটাকে বাছিয়াই লইতে হইবে এবং তাঁহাদের দিক হইতে তাঁহারা মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া ঠিকই করিয়াছেন। মুষ্টিমেয় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীকে দলে টানিবার জন্য তাঁহারা কি এই সুনির্দিষ্ট লাভজনক নীতি ত্যাগ করিবেন এবং মুসলমানদিগের মনে ব্যথা দিবেন?

সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রসর এবং তাহারাই বিশেষভাবে জাতীয় স্বাধীনতার দাবী করিয়া থাকে। এই ঘটনাই তাহাদিগকে অনুগ্রহ না করিবার প্রধান কারণ, কেন না ছোটখাট সাম্প্রদায়িক অনুগ্রহ (ছোটখাট ছাড়া উহা আর কিছুই হইতে পারে না) দ্বারা রাজনৈতিক বিরোধিতার কোন ইতর বিশেষ হইবে না। তবে ঐ সকল অনুগ্রহ দ্বারা মুসলমানদিগের মনোভাবের সাময়িক পরিবর্তন হইতে পারে মাত্র।

ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা এবং মুস্লিম কন্‌ফারেন্স এই দুই অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে যে সকল লোক আছেন তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহাদের প্রার্থী এবং সমর্থকগণ বড় জমিদার অথবা ধনী মহাজনশ্রেণীর। আধুনিক ঋণলাঘব বিলগুলির তীব্র বিরোধিতা করিয়া মহাসভা মহাজনশ্রেণীর প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন। হিন্দুসমাজের উপরের স্তরের এক সামান্য অংশ লইয়া হিন্দু মহাসভা গঠিত এবং উহারই আর এক অংশ কতকগুলি বৃত্তিজীবী ব্যক্তিসহ লিবারেল দল নামে পরিচিত। হিন্দুদের মধ্যে নিম্ন-মধ্যশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সচেতন বলিয়া উহাদের গুরুত্ব অধিক নহে। কলকারখানার মালিকেরাও ইহাদের মধ্য হইতে নিজেদের স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন। কেন না উদীয়মান কলকারখানার দাবীর সহিত অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থের বিরোধ রহিয়াছে। কলকারখানার মালিকেরা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অথবা অন্য কোনপ্রকার বিপজ্জনক উপায় গ্রহণ করিতে সাহস পান না, তাঁহারা জাতীয়তাবাদ এবং গভর্ণমেণ্ট উভয়ের সহিত সদ্ভাব রাখিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা মডারেট অথবা সাম্প্রদায়িক দলগুলির প্রতিও বড় বেশী আগ্রহশীল নহেন। কলকারখানার উন্নতি এবং মোটা রকমের লাভ এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা পরিচালিত হন।

মুসলমানদের মধ্যে নিম্ন ও মধ্যশ্রেণীতে এখনও জাগরণ আসে নাই এবং শিল্পবাণিজ্যেও তাহারা পশ্চাৎপদ। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই, অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াপন্থী সামন্ততান্ত্রিক এবং পেন্সনভোগী সরকারী কর্মচারীরা তাহাদের

সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত করেন এবং সম্প্রদায়ের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন। মুসলিম কনফারেন্স একদল নাইট, ভূতপূর্ব মন্ত্রী এবং জমিদার লইয়া গঠিত, তথাপি আমার বিবেচনায় মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু জনসাধারণের অপেক্ষাও অধিকতর প্রসুপ্ত শক্তি রহিয়াছে, কেন না সামাজিক ব্যাপারে তাহাদের কতকগুলি স্বাধীনতা আছে এবং ইহারা যদি একবার চলিতে সুরু করে, তাহা হইলে তাহারা সমাজতান্ত্রিক পথে অধিকতর দ্রুত অগ্রসর হইবে। কিন্তু বর্তমানে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা কি মানসিক কি দৈহিক উভয় দিকেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া আছেন, ইঁহাদের মধ্যে কোন গভীর চাঞ্চল্য নাই, ইঁহারা পুরাতন মুরুব্বীদের প্রশ্ন করিতেও সাহস পান না।

রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রগামী বৃহৎ দল কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলীও, জনসাধারণের অবস্থার অনুপাতে প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিক সাবধান। তাঁহারা জনসাধারণের সমর্থন চাহেন, কিন্তু কদাচিৎ তাহাদের মতামতের উপর নির্ভর করেন, অথবা তাহাদের অভাব-অভিযোগ অনুসন্ধান করেন। ব্যবস্থাপরিষদের নির্বাচনের পূর্বে, তাঁহারা অ-কংগ্রেসী মডারেটদিগকে দলে টানিবার জন্য কার্যপদ্ধতি যথাসম্ভব নরম করিবার চেষ্টা করিলেন। এমন কি, মন্দির-প্রবেশ বিলের মত ব্যাপারেও তাঁহাদের মধ্যে নানারূপ মত দেখা গেল, মাদ্রাজের গোঁড়া সনাতনীদের মন ভিজাইবার জন্য আশ্বাস দেওয়া হইল। সরল নির্ভীক এবং আক্রমণশীল কর্মপদ্ধতি উপস্থিত করিলে, দেশে অধিকতর উৎসাহ দেখা যাইত এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষারও সহায়তা হইত। কিন্তু কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেণ্ট কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করায় ফলে, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থগুলির সহিত, ব্যবস্থা-পরিষদে কয়েকটি ভোটের আশায়, নানাভাবে আপোষ-রফা করিতে হইবে এবং তাহার ফলে জনসাধারণ ও কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে ব্যবধান আরও প্রশস্ত হইবে। চমৎকার বক্তৃতা হইবে, পার্লামেণ্ট আদবকায়দার অনুকরণ চলিবে,—মাঝে মাঝে গভর্ণমেণ্ট পরাজিত হইবেন--এবং অতীতের মতই এই সকল পরাজয় গভর্ণমেণ্ট অনুদ্বিগ্ন চিত্তে উপেক্ষা করিবেন।

যখন কংগ্রেস আইনসভাগুলি বর্জন করিয়াছিল, সেই কয় বৎসর সরকারপক্ষের লোকেরা আমাদের প্রায়ই শুনাইয়াছেন যে, ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলি জনসাধারণের যথার্থ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং এইখানেই জনমত প্রতিফলিত হয়। কিন্তু যখন অগ্রগামী দল গিয়া ব্যবস্থাপরিষদে প্রভাব বিস্তার করিলেন তখন সরকারী মতেরও পরিবর্তন হইল। যখনই নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যের কথা উঠে, তখনই অপর পক্ষ বলেন নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা অতিশয় কম—৩২ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৩০ লক্ষ ভোটার। যে কোটি কোটি লোকের ভোটাধিকার নাই, তাহারা সরকারপক্ষের মতে একযোগে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিয়া থাকে। সহজেই ইহার প্রতিকার হইতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীদের ভোটাধিকার দিলেই অন্ততঃ আমরা ঐ সকল লোকের চিন্তাধারা বুঝিতে পারিব।

ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে জয়েন্ট পার্লামেণ্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। ইহার বহুবিধ ও ব্যাপক সমালোচনার মধ্যে একটি ত্রুটি ব্যবস্থার উদ্ঘাটিত করিয়া দেখান হইতে লাগিল যে, ভারতবাসীর প্রতি "সন্দেহ" ও "অবিশ্বাস" লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে। আমাদের জাতীয় ও সামাজিক সমস্যার দিক হইতে দেখিলে ঐ বক্তব্য অত্যন্ত বিস্ময়কর। আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের মধ্যে কি

মর্মগত কোন বিরোধ নাই? মুখ্য প্রশ্ন হইল যে কোন্‌টা টিকিবে? সাম্রাজ্যনীতি চালাইবার জন্যই কি আমরা স্বাধীনতা চাহিতেছি? অন্ততঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ঐরূপই ধারণা; তাঁহাদের মতে ব্রিটিশ-নীতির প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আমরা যতদিন সম্ভাবে স্বায়ত্ত-শাসনে আমাদের যোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা করিব, ততদিন "রক্ষাকবচ"গুলি ব্যবহার করা হইবে না। যদি ব্রিটিশ-নীতিই ভারতে চলিতে থাকে, তাহা হইলে শাসন-রশ্মি আমাদের হাতে আনিবার জন্য এত চীৎকারের আবশ্যক কি?

এক ভারতীয় বাণিজ্য* ব্যতীত, ওট্টাওয়া চুক্তিতে ইংলণ্ডের বিশেষ আর্থিক লাভ হয় নাই, ইহা সর্বজনবিদিত। ভারতীয় রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ীদের মতে, ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষতি সাধন করিয়া ইহা দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু উপনিবেশগুলিতে—বিশেষভাবে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায়—অবস্থা হইয়াছে বিপরীত। তাহারা ব্রিটেনের সহিত দরকষাকষি করিয়া ব্রিটেন অপেক্ষাও অনেক বেশী সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছে ইহা সত্ত্বেও তাহারা ওট্টাওয়া চুক্তির বন্ধন হইতে সততই মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছে; কেন না তাহারা নিজেদের শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি চাহে এবং স্বাধীনভাবে অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে চাহে।‡ কানাডার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী লিবারেল দল, যাহারা শীঘ্রই গভর্ণমেণ্টের ভার গ্রহণ করিবে এরূপ সম্ভাবনা আছে, তাহারা ওট্টাওয়া চুক্তির অবসান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।§ অষ্ট্রেলিয়ায় ওট্টাওয়ার কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া কোন কোন শ্রেণীর কার্পাসবস্ত্র ও সুতার উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলওয়ালারা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং

---

* ভারতীয় বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়া স্যার উইলিয়ম কারী বলেন, ওট্টাওয়া চুক্তির ফলে ব্রিটেন সুনিশ্চিত সুবিধা পাইয়াছে।—১৯৩৪-এর ৫ই ডিসেম্বর লণ্ডনে পি এণ্ড ও জাহাজ কোম্পানীর সভায় স্যার উইলিয়ম সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

† দি লণ্ডন ইকনমিষ্ট (জুন, ১৯৩৪) বলিতেছেন, "ওট্টাওয়া বৈঠক সার্থক হইতে পারিত যদি ইহা দ্বারা সাম্রাজ্যের অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইত অথচ অবশিষ্ট জগতের সহিত সাম্রাজ্যের বাণিজ্য হ্রাস না হইত। কার্যতঃ ইহা দ্বারা সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কিছু বাড়িলেও, সাম্রাজ্যের সর্বমোট বাণিজ্য হ্রাস হইয়াছে। এবং এই পরিবর্তনে গ্রেট ব্রিটেন অপেক্ষা উপনিবেশ-গুলিরই সুবিধা হইয়াছে বেশী। সাম্রাজ্য হইতে আমাদের আমদানী ১৯৩১ সালে ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৯৩৩ সালে ২৪ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু আমাদের রপ্তানি ১৭ কোটি ৬ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৬ কোটি ৩৫ লক্ষ পাউণ্ডে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৭ এবং ৩৩-এর মধ্যে সাম্রাজ্যে আমাদের রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ৫০·১ ভাগ কমিয়াছে, কিন্তু সাম্রাজ্য হইতে আমাদের আমদানী মাত্র ৩২·১ ভাগ কমিয়াছে। অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রে আমাদের রপ্তানী তত বেশী কমে নাই, তবে ঐ সকল দেশ হইতে আমদানী বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।"

‡ মেলবোর্ণ 'এজ' ওট্টাওয়া চুক্তি পছন্দ করেন না। ইহার মতে ঐ চুক্তি "সর্বদাই বিরক্তির কারণ এবং ক্রমেই বুঝা যাইতেছে যে উহা এক প্রকাণ্ড ভুল।" (১৯৩৪, ১১শে অক্টোবর, সাপ্তাহিক ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান হইতে উদ্ধৃত।)

§ এমন কি কানাডার বর্তমান রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী মিঃ বেনেট পর্যন্ত বাণিজ্যব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পথে কণ্টকস্বরূপ। এখন তিনি "নিউডিলের" কথা বলিতেছেন এবং অতি আশ্চর্যরূপে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ লিটভিনভ, স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস এবং মিঃ জন স্ট্রেচির ভয়াবহ প্রভাবের ফলে তিনি এখন "কালেক্টিভিস্ট" হইয়াছেন। ইহা হইতে রক্ষণশীল, উদারনৈতিক, সিভিল সার্ভিস প্রভৃতি সকলেরই সাবধান হওয়া কর্তব্য, অন্যথা তাঁহারাও ঐ সকল বিপজ্জনক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন। (এই কথা লিখিবার কালে মিঃ কিংএর নেতৃত্বে কানাডায় উদারনৈতিক দল ভোটাধিক্যে জয়ী হইয়া শাসনভার অধিকার করিয়াছেন।)

ইহাতে ওট্টাওয়া চুক্তি ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া নিন্দা করিতেছেন। ইহার প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ লইবার জন্য ল্যাঙ্কাশায়ারে অস্ট্রেলিয়ান পণ্য বয়কটের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই ভীতিপ্রদর্শনে অস্ট্রেলিয়া মোটেই বিচলিত হয় নাই বরং তাহারাও প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।*

কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের ব্রিটেনের প্রতি যে কোন বিদ্বেষ ভাবই থাকুক না কেন, অর্থনৈতিক সংঘর্ষের কারণ তাহা নহে। অবশ্য আয়র্লণ্ডের ক্ষেত্রে এই বিদ্বেষ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়। স্বার্থের বিরোধ হইতেই সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং এইরূপ সংঘর্ষ যদি ভারতে দেখা যায় সেই আশঙ্কায় ব্রিটিশ স্বার্থকেই প্রাধান্য দিবার জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এবং সকলের নিকট গোপন রাখিয়া অথচ ব্রিটিশ বণিকদিগের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে অধুনা যে ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যচুক্তি হইল, যাহা ব্যবস্থা-পরিষদে অগ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট ত্যাগ করিতেছেন না, তাহা হইতেই বুঝা যায় "রক্ষাকবচের" গতি কোন্ দিকে। মনে হয়, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ঐ শ্রেণীর 'রক্ষা-কবচের' অধিক আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কেবল বাণিজ্য ব্যাপারে নহে, সাম্রাজ্যের ঐক্য ও নিরাপত্তার অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ঐ সকল উপনিবেশের অধিবাসীরা যাহাতে বিরোধিতা না করে, সেজন্যও 'রক্ষাকবচ' আবশ্যক।†

সাম্রাজ্য ঋণগ্রস্ত; অতএব যাহাতে সাম্রাজ্যবাদী মহাজন, তাহার দুর্ভাগা খাতকের উপর আধিপত্য এবং তাহার বিশেষ স্বার্থ ও ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে পারে, সেই জন্যই 'রক্ষা-কবচের' ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এমন কথাও শুনা যায়, গান্ধিজী ও কংগ্রেস এই শ্রেণীর 'রক্ষাকবচে' সম্মত হইয়াছেন, কেন না ১৯৩১-এর দিল্লীচুক্তিতে "ভারতের স্বার্থের জন্য রক্ষাকবচ" গ্রহণের নীতি স্বীকৃত হইয়াছিল, সরকারপক্ষ হইতে এই আশ্চর্য যুক্তি বারম্বার বলা হইয়াছে।

যাহাই হউক, ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত রক্ষাকবচগুলি এবং ওট্টাওয়া চুক্তি তুলনায় অতি সামান্য ব্যাপার মাত্র।‡ ভারতবাসীর উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রত্যেকটি মূল ক্ষমতা ও অধিকার কায়েম করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ঐগুলি বিশেষ ভাবে মারাত্মক। কেন না, অতীতে ও বর্তমানে উহা এই দেশ শোষণে সহায়তা করিয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা ও

---

* দি মেলবোর্ন 'এজ' ঘোষণা করিয়াছেন যে, যদি ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রস্তাবিত বয়কট নীতি প্রত্যাহৃত না হয়, তাহা হইলে এখনও ল্যাঙ্কাশায়ারের যেটুকু বাণিজ্য অবশিষ্ট আছে, অস্ট্রেলিয়া তাহার উপর কঠোর আঘাত করিবে। 'এই কথা [illegible] সহিত উল্লেখ করিয়া, ল্যাঙ্কাশায়ারের জবাব দিতে হইবে।' (১৯৩৪-এর নভেম্বরের সাপ্তাহিক ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান হইতে উদ্ধৃত)।

† দক্ষিণ আফ্রিকার দেশরক্ষা-সচিব মিঃ ও পিরো বলিয়াছেন, ইউনিয়ন সাম্রাজ্যের সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যে কোন অংশ গ্রহণ করিবে না এবং বৈদেশিক কোন যুদ্ধে বিলাত যোগ দিলেও ইউনিয়ন যোগ দিবে না। যদি গভর্ণমেণ্ট ইংল্যাণ্ডের সহিত কোন বৈদেশিক যুদ্ধে লিপ্ত হন, তাহা হইলে দেশব্যাপী অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। সম্ভবতঃ গৃহযুদ্ধও বাধিতে পারে। অতএব গভর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যের কোন সাধারণ ব্যবস্থার অংশ গ্রহণ করিবেন না।" প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্টজগ এই ঘোষণা সমর্থন করিয়া বলেন যে ইহাই ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের নীতি। (রয়টার প্রেরিত সংবাদ, কেপটাউন, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)।

‡ দি লণ্ডন টাইমস (অক্টোবর, ১৯৩৪) বলিয়াছেন,—"কিছু দেখা যাইতেছে, ব্রিটিশ [illegible] মধ্যে, [illegible] ল্যাঙ্কাশায়ারের [illegible] "ওটাওয়ার" উপর [illegible] [illegible] অর্থ-নৈতিক [illegible] [illegible]।

'রক্ষাকবচ' যতদিন থাকিবে, ততদিন কোন দিকে কোন উন্নতি অসম্ভব। কোন পরিবর্তন করিবার নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টার স্থান ইহাতে নাই। ঐর়ূপ প্রত্যেকটি চেষ্টা 'রক্ষাকবচের' কঠিন প্রাচীরে ব্যাহত হইবে এবং দিনে দিনে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে যে, যাহা একমাত্র সম্ভবপর পথ, তাহা নিয়মতান্ত্রিক নহে। রাজনৈতিক দিক দিয়া, পৈশাচিক যন্ত্ররাষ্ট্রসহ প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র অস্বাভাবিক এবং অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক দিক হইতে ইহা অতিশয় নিকৃষ্ট ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রের পথ ইচ্ছা করিয়াই রুদ্ধ করা হইয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে অনেকখানি দায়িত্ব হস্তান্তরিত করা হইয়াছে (তাহাও অবশ্য "নিরাপদ" শ্রেণীর হস্তে) কিন্তু কোন প্রকৃত কাজ করিবার ক্ষমতা বা উপায় দেওয়া হয় নাই। উলঙ্গ স্বৈরাচারের লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরা লেংটির ব্যবস্থাও করা হয় নাই। প্রত্যেকেই জানেন, বর্তমান যুগে শাসনতন্ত্র এমন হওয়া উচিত, যাহা জগতের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন এবং তাহা কার্যে পরিণত করার ক্ষমতা আবশ্যক। এমন কি, পার্লামেণ্টি গণতন্ত্র, যাহা এখনও কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশে আছে, তাহা বর্তমান জগতের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অতি-আবশ্যক পরিবর্তন সাধন করিতে পারে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমাদের দেশে এ প্রশ্ন উঠে না, কেন না এখানে শৃঙ্খল ও বেড়ী দিয়া সর্ববিধ গতি ইচ্ছা করিয়া রোধ করা হইয়াছে এবং আমাদের সম্মুখে সমস্ত দরজা সাবধানতার সহিত অবরুদ্ধ। আমাদিগকে এমন একখানি গাড়ী দেওয়া হইয়াছে, যাহার এঞ্জিন নাই অথচ থামাইবার অসংখ্য ব্যবস্থা রহিয়াছে। যে সকল ব্যক্তির মন সামরিক আইনে ভরপুর, তাঁহারাই এই শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছেন। বাহুবলে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে হয় সামরিক আইন, নয় মৃত্যু, কোনও মধ্যপথ নাই।

ব্রিটেন কতখানি স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা মাপিতে গেলে দেখা যায় যে, মডারেট অপেক্ষাও মডারেট এবং রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বাধিক পশ্চাৎপদ দলগুলিও ইহাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। যাহারা সর্বদা সকল অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের সমর্থন করিয়া থাকে, তাহারাও সসম্ভ্রমে নতজানু হইয়া ইহার সমালোচনা করিয়াছে। অন্যান্য সকলের সমালোচনা অধিকতর তীব্র।

এই সকল প্রস্তাব দেখিয়া লিবারেলগণও প্রমাদ গণিলেন। ভারতকে ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে স্থাপনকারী ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয় দূরদর্শিতার উপর তাঁহাদের অটল বিশ্বাস পূর্ণর়ূপে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। তাঁহারা তীব্র সমালোচনা করিলেন; কিন্তু বাস্তবের প্রতি অবজ্ঞা লইয়া এবং বাঁধাবুলি ও উদার 'ইঙ্গিতে'র প্রতি অনুরক্তিবশতঃ তাঁহারা রিপোর্টে অথবা বিলে "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্" এই শব্দটি না দেখিয়া মাতামাতি করিতে লাগিলেন, ইহা লইয়া তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল, সার স্যামুয়েল হোর তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য একটা বিবৃতি দান করিলেন। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এক অজ্ঞাত ভবিষ্যতের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি হইতে পারে, সেই দূর হইতেও দূরতর দেশে আমরা কোনকালে পৌঁছাইতে নাও পারি, কিন্তু অন্ততঃপক্ষে আমরা তাহার স্বপ্ন দেখিতে পারি এবং উহার বহুমুখী সৌন্দর্য বর্ণনায় মুখর হইয়া উঠিতে পারি। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ সম্পর্কে সম্ভবতঃ সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া সার তেজ বাহাদুর সপ্রু ব্রিটিশ রাজমুকুটের মধ্যে সান্ত্বনা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি একজন প্রতিভাবান ব্যবহারজীবী, তিনি আমাদিগকে এক

অভিনব নিয়মতান্ত্রিক পথ দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং জনসাধারণ ভারতের জন্য যাহাই কিছু করুক আর নাই করুক, "সকলের ঊর্ধ্বে রহিয়াছেন ব্রিটিশ, রাজমুকুট, যিনি ভারতীয় প্রজাদের স্বার্থ এবং ভারতবর্ষের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য স্বতঃই আগ্রহশীল।"* ইহা অতিশয় সান্ত্বনার পথ, এখানে নিয়মতন্ত্র, আইন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার কিছুই নাই।

কিন্তু লিবারেলগণ প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের প্রতি তাঁহাদের বিরুদ্ধতা শিথিল করিয়াছিলেন একথা বলিলে অন্যায় করা হইবে। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতের উপর জোর করিয়া এই অনভিপ্রেত পুরস্কার চাপাইয়া দেওয়া অপেক্ষা, মন্দ হইলেও তাঁহারা বর্তমান ব্যবস্থা ভাল মনে করেন। এই কথার উপর জোর দেওয়া ব্যতীত আর কিছু করা তাঁহাদের নিয়মবিরুদ্ধ। তবে তাঁহারা যে ক্রমাগত এই কথার উপর জোর দিতে থাকিবেন ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। একটি পুরাতন প্রবচনকে আধুনিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে তাঁহাদের মূল নীতি এই দাঁড়ায় যে—"যদি তুমি প্রথমে সাফল্য লাভ না কর, তাহা হইলে পুনরায় ক্রন্দন কর!"

লিবারেল নেতাগণ এবং কতিপয় কংগ্রেসপন্থীসহ অন্যান্য অনেকের এক ভরসা ও আশা এই যে ব্রিটেনে শ্রমিকদল জয়লাভ করিয়া শ্রমিক গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিলেই একটা সুরাহা হইবে। ব্রিটেনের অগ্রগামী দলগুলির সহিত সহযোগিতা করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা অথবা শ্রমিক গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার সুবিধা গ্রহণ করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষের না করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু ইংলন্ডের ভাগ্যচক্র বিবর্তনের উপর অসহায়ভাবে নির্ভর করা মর্যাদাসূচকও নহে কিম্বা জাতীয় সম্মানের সহিত সঙ্গতিসূচকও নহে। মর্যাদার কথা ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ বুদ্ধিরও কিছু ইহাতে নাই। কেন আমরা ব্রিটিশ শ্রমিকদলের নিকট অধিক প্রত্যাশা করিব? আমরা দুই-দুইবার শ্রমিক গভর্ণমেন্ট দেখিয়াছি এবং তাঁহারা ভারতবর্ষকে যে পুরস্কার দিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ আমরা ভুলিব না। মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড শ্রমিকদল পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার পুরাতন সহকর্মীদের অধিক পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯৩৪-এর অক্টোবর মাসে, সাউথপোর্ট শ্রমিকদল সম্মেলনে মিঃ ভি. কে. কৃষ্ণমেনন প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মনিয়ন্ত্রণের অলঙ্ঘনীয় নীতি অনুসারে ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য।" মিঃ আর্থার হেন্ডারসন প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন এবং অত্যন্ত সরলভাবে স্বীকার করেন যে, শ্রমিকদলের কার্যকরী সমিতির পক্ষ হইতে ভারতে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি পরিচালন করিবার কোন প্রতিশ্রুতি দিতে তিনি অক্ষম। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা অতি স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছি যে আমরা সম্ভব হইলে সকল শ্রেণীর ভারতীয়দের সহিতই আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতেই সকলের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।" সম্ভবতঃ এই সন্তোষ আরও গভীর হইবে, কেন না, অতীতের শ্রমিক গভর্ণমেন্ট ও ন্যাশনাল গভর্ণমেন্টও উহাই ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে গোলটেবিল বৈঠক, হোয়াইট পেপার, জয়েন্ট কমিটির রিপোর্ট এবং অবশেষে ইন্ডিয়া অ্যাক্ট।

সাম্রাজ্যনীতির ব্যাপারে, ইংলন্ডে শ্রমিক বা রক্ষণশীলের মধ্যে পার্থক্য নাই

---

* ১৯৩৫-এর ২১শে জানুয়ারী লক্ষ্ণৌ-এ এক জনসভার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে।

বলিলেই হয়। শ্রমিকদলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে অনেকে অনেক বেশী অগ্রসর হইলেও, তাঁহাদের রক্ষণশীল নেতৃত্বের উপর বড় বেশী প্রভাব নাই। এমন হইতে পারে যে, বামপন্থী শ্রমিকদল শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, কেন না অধ্না অবস্থার অতি দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু জাতীয় ও সামাজিক আন্দোলনগ্রলি কি হাত গ্রটাইয়া ঘ্রমাইয়া পড়িবে এবং অন্যত্র সমস্যাসঙ্কুল পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করিবে?

আমাদের দেশে লিবারেলদের, ব্রিটিশ শ্রমিকদলের উপর নির্ভরতার একটি কৌতুককর দিক আছে। যদি দৈবক্রমে এই দল বামপন্থী হইয়া ইংলন্ডে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, তাহা হইলে ভারতে আমাদের লিবারেল ও অন্যান্য মডারেট দলগ্রলির উপর তাহার কি প্রতিক্রিয়া হইবে? ইঁহাদের অধিকাংশই সামাজিক ব্যাপারে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। তাঁহারা শ্রমিকদলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখিয়া অপ্রসন্ন হইবেন এবং ভারতে উহা প্রবর্তনের ভয়ে ভীত হইবেন। এমন কি, ব্রিটিশ সম্পর্কের প্রতি তাঁহাদের অন্রাগ একেবারেই ভিন্ন আকার ধারণ করিবে, কেন না সে অবস্থায় ব্রিটিশ সম্পর্কের অর্থই হইবে সামাজিক ওলট-পালট। তখন এমনও হইতে পারে, আমার মত যাহারা জাতীয় স্বাধীনতাকামী ও ঐ সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চাহে, তাহাদের মনোভাব পরিবর্তিত হইবে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্রিটেনের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিবে। ব্রিটিশ জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করিতে আমাদের কাহারও নিশ্চয়ই কোন আপত্তি নাই। তাহাদের সাম্রাজ্যবাদের বির্দ্ধেই আমাদের আপত্তি। যেদিন তাহারা উহা পরিত্যাগ করিবে, সেইদিনই সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু মডারেটগণ তখন কি করিবেন? সম্ভবতঃ ন্তন ব্যবস্থাকেও তাঁহারা বিধির আর এক রহস্যময় নির্দেশর্পে বরণ করিয়া লইবেন।

য্ক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব এবং গোলটেবিল বৈঠকের এক প্রধান পরিণতি হইল এই যে, ভারতের দেশীয় ন্পতিব্ন্দকে ঠেলিয়া সম্মুখে খাড়া করা হইল। গোঁড়া রক্ষণশীলদের তাঁহাদের জন্য এবং তাঁহাদের 'স্বাধীনতার' জন্য ব্যাকুলতা, ন্পতিদের মধ্যে এক ন্তন প্রাণের সঞ্চার করিল। ইতিপ্র্বে তাঁহাদিগকে কখনও এতটা প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। ইতিপ্র্বে তাঁহারা ব্রিটিশ 'রেসিডেন্টের (রাজদ্ত বলিয়া অভিহিত) ইঙ্গিতের উত্তরে 'না' বলিতে সাহস পাইতেন না এবং অগণিত ন্পতিব্ন্দের প্রতি ভারত গভর্ণমেন্টের মনোভাব প্রকাশ্যভাবেই অবজ্ঞাপূর্ণ ছিল; তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সর্বদাই হস্তক্ষেপ করা হইয়া থাকে, অবশ্য তাহা প্রায়ই য্ক্তিয্ক্ত সন্দেহ নাই। এমন কি, বর্তমানেও বহ্ রাজ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ কর্মচারী দ্বারাই (ইঁহাদিগকে রাজ্যের অন্রোধে ও প্রয়োজনে "ধার" দেওয়া হয়) শাসিত হয়। কিন্তু মিঃ চার্চিল ও লর্ড রদারমিয়ারের প্রচারকার্যের ফলে ভারত গভর্ণমেন্ট একট্ ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয় এবং দেশীয় রাজ্যগ্রলির সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিতে ইদানীং তাঁহারা একট্ সাবধান হইয়াছেন। ন্পতিরাও ইদানীং মাথা তুলিয়া কথা বলিতেছেন।

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের এই সকল বাহ্যলক্ষণগ্রলি আমি কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি; তথাপি আমি জানি যে এগ্রলি অবাস্তব, এবং ইহার পশ্চাতে যে ভারত রহিয়াছে, তাহার কথা ভাবিলে অবসন্ন হই। সেখানে চলিয়াছে সর্ববিধ স্বাধীনতা দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা, ব্হৎপীড়ন ও ব্যর্থতা, সদিচ্ছার বিকৃতি এবং বহ্ অন্যায় প্রব্ত্তিকে উৎসাহ দান। বহ্ ব্যক্তি কারাগারে বসিয়া তাহাদের তর্ণ জীবন বৎসরের পর বৎসর ক্ষয় করিতেছে,

হৃদয় তাহাদের জরাজীর্ণ হইয়া গেল।* তাহাদের পরিবারবর্গ, বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তির চিত্ত তিক্ত হইয়া আছে। তাহারা যে পাশব শক্তির দ্বারা কবলিত হইয়াছে, তাহার সম্মুখে নিরুপায় শক্তিহীনতা ও তীব্র অপমান-বোধ ছাড়া আর কিছু নাই। সাধারণ অবস্থাতেও বহুতর সমিতি ও প্রতিষ্ঠান বে-আইনী করিয়া রাখা হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টের অস্ত্রাগারে "জরুরী ক্ষমতা", "শান্তিরক্ষা আইন" প্রভৃতি স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিয়াছে। স্বাধীনতাসঙ্কোচক ব্যবস্থাগুলিই যেন সাধারণ নিয়মের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বহুসংখ্যক পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এবং "সামুদ্রিক বাণিজ্য আইন" দ্বারা ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কাহারও নিকট "ভয়াবহ" পুস্তক বা লেখা পাওয়া গেলে তাহার দীর্ঘকাল কারাদণ্ড হয়, সাময়িক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করাতে অথবা রুশিয়ার সামাজিক ও সংস্কৃতিগত ব্যাপারে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করাতে, 'সেন্সর' তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুশিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার পর রুশিয়া সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন, ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশ করার জন্য, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট "মডার্ণ-রিভিয়ু" পত্রিকাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। পার্লামেণ্টে সহকারী ভারত-সচিব আমাদের সংবাদ দিয়াছিলেন যে, "ঐ প্রবন্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সাফল্যগুলি সম্পর্কে বিকৃত মত প্রচার করা হইয়াছে" বলিয়াই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।† সাফল্যগুলির একমাত্র বিচারক 'সেন্সর', আমাদের ভিন্নমত থাকাও উচিত নহে, তাহা প্রকাশ করাও উচিত নহে। আবার লণ্ডনে "সোসাইটি অফ্ ফ্রেণ্ডস্"এর নিকট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরিত একটি সংক্ষিপ্ত বার্তাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মত ঋষিতুল্য ব্যক্তি, যিনি রাজনীতি হইতে ইচ্ছা করিয়াই দূরে থাকিয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত ব্যাপার লইয়া আছেন, যিনি জগদ্বিখ্যাত এবং ভারতের সর্বত্র সম্মানিত, তাঁহার লেখাই যখন বন্ধ করিবার চেষ্টা হয়, তখন সাধারণ লোকের কি কথা?‡ কার্যতঃ প্রত্যক্ষভাবে দমন করা অপেক্ষা যে ভীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা অধিকতর শোচনীয়। এই অবস্থার মধ্যে সততার সহিত সংবাদপত্র পরিচালন সম্ভবপর নহে অথবা ইতিহাস, অর্থনীতি,

* ১৯৩৪-এর ২০শে জুলাই স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যর হ্যারী হেগ ব্যবস্থা-পরিষদে বলিয়াছেন যে, জেলে ও বিশেষ বন্দিশালায় বিনাবিচারে আটক বন্দিসংখ্যা, বাঙ্গলায় ১৫০০ হইতে ১৬০০ শত, দেউলীতে ৫০০ শত, মোট ২০০০ কি ২১০০ শত। ইহা ছাড়া কারাদণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দী আছে; তাহাদের অধিকাংশই দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ইদানীং কলিকাতার একটি মামলায় এ. পি. সংবাদ দিতেছেন (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৪), বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র ও গুলী ইত্যাদি রাখিবার অপরাধে হাইকোর্ট একজনকে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি রিভলভার ও দুইটি কার্তুজসহ ধৃত হইয়াছিল।

† ১২ই নবেম্বর, ১৯৩৪।

‡ ১৯৩৫-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ভারতে সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদে সরকারপক্ষ হইতে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। উহাতে প্রকাশ ১৯৩০ সাল হইতে এ পর্যন্ত ৫১৪টি সংবাদপত্রের নিকট জামানতের টাকা দাবী ও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। উহার মধ্যে জামানতের টাকা না দিতে পারায় ৩৮৪টি সংবাদপত্র বন্ধ হইয়াছে এবং ১৬৬ খানি সংবাদপত্র মোট ২,৫২,৮৫২ টাকা জামানত জমা দিয়াছে।

ইদানীং (১৯৩৫-এর সেপ্টেম্বরে) স্বাধীনতা সঙ্কোচক কতকগুলি আইন পুনরায় পাকাপাকিভাবে করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বপ্রধান সংশোধিত ফৌজদারী আইন—ইহা সমগ্র ভারতেই প্রযোজ্য। ব্যবস্থা-পরিষদে ইহা পরিত্যক্ত হইলেও, বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা বলে উহা আইনে পরিণত করেন। প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতেও এইরূপ আইন পাস হইয়াছে।

রাজনীতি অথবা সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে সম্যক আলোচনা বা শিক্ষাদানও কঠিন। শাসন-সংস্কার এবং দায়িত্বপূর্ণ শাসনপদ্ধতি বা ঐরূপ কিছু প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইহা এক অপরূপ ব্যবস্থা।

প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে বর্তমান জগৎ, বুদ্ধিভেদজনিত চাঞ্চল্য পীড়িত, ইহার অনুভূতি কোথাও বা মৃদু কোথাও বা তীব্র, কিন্তু যাহাই হউক, বর্তমান অবস্থার প্রতি প্রবল অসন্তোষ সর্বত্রই বিদ্যমান। আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই এই ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিতেছে, ভবিষ্যতে ইহা যে রূপই গ্রহণ করুক না কেন, ইহা খুব দূরবর্তী নহে। ইহা এমন একটা দূর ভাবী কালের বিষয় নহে, যাহা লইয়া অনাসক্তভাবে দার্শনিক, সমাজনীতিক এবং অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ গবেষণা করিতে পারেন। ইহার সহিত প্রত্যেক মানবের শুভাশুভ জড়িত। ইহার মধ্যে যে সকল শক্তি কার্য করিতেছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা এবং বুঝিয়া স্বীয় কর্তব্য স্থির করিয়া লওয়া প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। পুরাতন জগতের অবসানের উপর এক নূতন জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে। কোন সমস্যার উত্তর খুঁজিতে হইলে তাহা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। সমস্যাকে জানা এবং তাহার সমাধান অন্বেষণ করা উভয়ের গুরুত্বই সমান।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের রাজনীতিকগণ জগতের ঘটনাবলী সম্পর্কে অতি আশ্চর্যরূপে অজ্ঞ অথবা উদাসীন। সম্ভবতঃ এই অজ্ঞতা ভারতের শাসক-শ্রেণীর অধিকাংশের মধ্যেও রহিয়াছে; কেন না আমাদের দেশের সিভিলিয়নগণ তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ নিজস্ব জগতে সুখ ও সন্তোষ লইয়া বাস করেন। কেবলমাত্র উচ্চতম সরকারী কর্মচারীদিগকে এই সকল সমস্যা ভাবিতে হয়। অবশ্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট জগতের ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করিয়াই তদনুসারে তাঁহাদের কর্মনীতি নিরূপণ করিয়া লন। ভারতের উপর কর্তৃত্ব এবং উহা রক্ষা করার দ্বারা যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহা সকলেই জানেন। কয়জন ভারতীয় রাজনীতিক জানেন যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ অথবা সোভিয়েট রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধিত শক্তি অথবা সিংকিয়াং-এ ইংরাজ-রুশ-জাপানের কূট-চক্রান্ত, অথবা মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান ও পারস্যের ঘটনাবলী ভারতীয় রাজনীতিতে কি প্রভাব বিস্তার করে? মধ্য এশিয়ার পরিস্থিতির প্রভাব কাশ্মীরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং উহা ব্রিটিশ-নীতি ও ভারতরক্ষার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সমগ্র জগতে অতি দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গুরুত্ব অনেক বেশী। আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যবস্থার দিন চলিয়া গিয়াছে, বর্তমানের প্রয়োজন পূরণে উহার কোন সার্থকতা নাই। এক নজির হইতে অন্য নজিরে উপনীত হওয়ার যে আইনজীবি-সুলভ মনোবৃত্তি ভারতে বিদ্যমান, যেখানে অতীতের কোন নজির নাই, সেখানে উহা কোনই কাজে লাগিবে না। লৌহবর্ত্মের উপর গরুর গাড়ী চাপাইয়া দিয়া উহাকে আমরা রেলগাড়ী বলিতে পারি না। উহা বর্তমান যুগে অচল বলিয়া বাতিল করিতেই হইবে। রুশিয়া ছাড়িয়া দিলেও অন্যত্র আমরা 'নিউডিল' ও অন্যান্য বিপুল পরিবর্তনের আলোচনা দেখিতেছি। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রনায়ক রুজভেল্ট, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষা এবং উহা শক্তিশালী করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াও সাহসের সহিত যে সকল বিপুল পরিকল্পনার প্রবর্তন করিতেছেন তাহার ফলে আমেরিকার জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিবর্তন হইতে পারে। "অতিরিক্ত সুবিধাভোগীদের উচ্ছেদ এবং সুবিধা-বঞ্চিতদের অবস্থার উন্নতি সাধন" এই শ্রেণীর কথাও তিনি বলিতেছেন। তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন, নাও হইতে

পারেন, কিন্তু তিনি একজন সাহসী পুরুষ এবং তিনি যে তাঁহার স্বদেশকে গতানুগতিকতা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তিনি তাঁহার কর্মনীতির পরিবর্তন অথবা ভুল স্বীকার করিতে ভীত নহেন। ইংলণ্ডেও মিঃ লয়েড্ জর্জ এক "নিউডিল" (নূতন ব্যবস্থা) প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতেও আমাদের অনেক "নূতন ব্যবস্থা" আবশ্যক। "যাহা জানিবার তাহা জানা হইয়াছে, যাহা কিছু করার ছিল, তাহাও করা হইয়া গিয়াছে" এই প্রাচীন ধারণার মত ভয়ঙ্কর নির্বুদ্ধিতা আর কিছু নাই।

আমাদিগকে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং আমরা নিশ্চয়ই সাহসের সহিত ঐগুলির সম্মুখীন হইব। বর্তমান সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির টিকিয়া থাকিবার কি অধিকার আছে, যদি না ঐগুলি জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়? অন্য কোন ব্যবস্থার মধ্যে কি ব্যাপক উন্নতির সম্ভাবনা আছে? কেবলমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তন কতখানি সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সক্ষম? যদি কায়েমী স্বার্থগুলি, অতিমাত্রায় আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের বিরোধী হয় তাহা হইলে জনসাধারণের দুঃখদারিদ্র্য সত্ত্বেও ঐগুলি রক্ষা করার চেষ্টা কি দূরদর্শিতা অথবা নীতিজ্ঞানের পরিচায়ক হইবে? কায়েমী স্বার্থের ক্ষতি হউক আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই এরূপ নহে; উহারা যাহাতে অপরের ক্ষতি না করিতে পারে তাহাই নিবারণ করিতে হইবে। যদি কায়েমী স্বার্থগুলির সহিত কোন আপোষ করা সম্ভব হয়, তদপেক্ষা আকাঙ্ক্ষার কিছুই নাই। ইহার ন্যায় ও অন্যায় লইয়া মতভেদ ঘটিতে পারে, কিন্তু অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই আপোষের সমীচীনতায় সন্দেহ প্রকাশ করিবেন। এক প্রকারের কায়েমী স্বার্থের অবসান করিয়া অন্য শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করা নিশ্চয়ই ঐ আপোষের লক্ষ্য নহে। যেখানে সম্ভবপর এবং প্রয়োজন, সেখানে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ করা যাইতে পারে, কেন না সংঘর্ষ দ্বারা কিছু করিতে গেলে অনেক বেশী ব্যয় হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্ত ইতিহাস একবাক্যে বলিতেছে যে কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই শ্রেণীর আপোষে কখনও রাজী হয় না। যে সকল শ্রেণীর সমাজের উপর প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দূরদর্শিতার অভাব। তাহারা হয় ষোল আনা নয়, কিছুই না, এই পণ লইয়া জুয়াখেলায় প্রবৃত্ত হয় এবং এই কারণেই ধ্বংস পায়।

বাজেয়াপ্ত বা ঐ শ্রেণীর 'শিথিল কথা' (কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির ভাষায়) অনেক হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তিতেই রহিয়াছে অবিরত ঐকান্তিক-ভাবে পরধন শোষণ—উহার অবসানকল্পেই সামাজিক পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। শ্রমিকের শ্রমজাত উৎপন্ন-দ্রব্যের অংশ প্রত্যহই বাজেয়াপ্ত করা হইতেছে। ক্রমবর্ধিত খাজনা ও অন্যান্য দাবী পূরণ করিতে অক্ষম হওয়ার ফলে কৃষকের জমি প্রায়ই বাজেয়াপ্ত হইতেছে। অতীতে সাধারণের জমি ব্যক্তিবিশেষ বাজেয়াপ্ত করিয়াই বৃহৎ জমিদারী করিয়াছে এবং এই ভাবে কৃষক-মালিকেরা লুপ্ত হইয়াছে। বাজেয়াপ্ত করাই বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তি ও প্রাণস্বরূপ।

উহার আংশিক প্রতিকারের জন্য সমাজও নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, যাহা এক প্রকার বাজেয়াপ্ত ছাড়া কিছুই নহে—উচ্চহারে টেক্স, মৃতের সম্পত্তির উপর শুল্ক, ঋণ-সালিশ আইন, অত্যধিক নোট বা কাগজের মুদ্রা প্রচলন প্রভৃতি। অধুনা আমরা দেখিতেছি, বিপুল জাতীয় ঋণ পরিশোধ অস্বীকার করা হইতেছে; কেবল সোভিয়েট ইউনিয়ন নহে, বড় বড় গণতান্ত্রিক রাজনীতিক তাহা করিতেছেন। ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত যে ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন—ভারতের সম্মুখে ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত! কিন্তু এই বাজেয়াপ্ত বা ঋণ-পরিশোধে অস্বীকৃতি দ্বারা অতি সামান্য সুবিধাই হয়, মূল কারণ দূর করা যায় না। নূতন করিয়া গড়িতে হইলে মূল কারণ দূর করা আবশ্যক।

বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের উপায় আলোচনা কালে আমাদিগকে বাহ্য সম্পদ ও মানসিক দিক দিয়া কি মূল্য দিতে হইবে, তাহাও পরিমাপ করা আবশ্যক। আমাদের অদূরদর্শী হইলে চালবে না। আমাদিগকে দেখিতে হইবে পরিণামে উহা দ্বারা মানুষের সুখ সমৃদ্ধি, মানসিক ও সাংসারিক উন্নতির কি সহায়তা হইবে। আবার আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে, বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন না করিয়া আমরা কি ভয়াবহ মূল্য দিতেছি, আমাদের অদ্যকার সমাজে কত নিষ্ফল বঞ্চিত ও বিকৃত জীবনের দুর্বহ ভার, কত দুঃখ দৈন্য অনশন, কি শোচনীয় মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন। বারম্বার বন্যার মত, বর্তমান অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার সংকটগুলি অসংখ্য মানবকে প্রতিনিয়ত ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। এই বন্যা আমরা ঠেকাইতে পারি না; অথবা কতকগুলি লোক কলসী লইয়া বন্যার জল সরাইয়া মানুষকে বাঁচাইতে পারে না। আমাদের বাঁধ বাঁধিতে হইবে, খাল কাটিতে হইবে, বন্যার জলের ধ্বংস-শক্তিকে আয়ত্তে আনিয়া মানুষের উপকারে লাগাইতে হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদ যে বিপুল পরিবর্তনের প্রস্তাব লইয়া সাহসের সহিত অগ্রসর, সহসা কয়েকটি আইন প্রণয়ন করিয়া তাহা প্রবর্তন করা যায় না। ভিত্তিতেই এমন আইন ও ক্ষমতার প্রয়োজন যাহার বলে অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং নূতন সমাজ বিন্যাসের ভিত্তি স্থাপন করা যায়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ পুনর্গঠন করিতে হইলে দৈবের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, আকস্মিক উত্তেজনা বা মাঝে মাঝে প্রাচীন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও উহা সম্ভব হইবে না। আসল বাধাগুলি অপসারিত করিতে হইবে। উদ্দেশ্য হইবে কাহাকেও বঞ্চিত করা নহে, সকলের অভাব পূরণ করা, বর্তমানের অভাব অনটনকে ভবিষ্যতের প্রাচুর্যে ভরিয়া তোলা। ইহা করিতে গেলে পথের বাধাগুলি দূর করিতে হইবে, যে সকল স্বার্থপরতা সমাজকে অবনত করিয়া রাখিয়াছে তাহা অপসারিত করিতে হইবে। যে পথ আমরা গ্রহণ করিব, তাহা ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করিবে না, এমন কি সূক্ষ্ম ন্যায়বিচারের দিক হইতে দেখিলেও চলিবে না; দেখিতে হইবে, অর্থনীতির দিক দিয়া তাহা অভ্রান্ত কিনা, পরিবর্তিত ব্যবস্থায় তাহা দ্বারা উন্নতি ও সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব কি না, অধিকাংশ মানবের পক্ষে উহা কল্যাণকর কিনা।

স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কোন মধ্যপথ নাই। আমাদের প্রত্যেকে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিব, তাহা বাছিয়া লইতে হইবে। বাছিয়া লইবার পূর্বে আমাদিগকে জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে। সমাজ-তন্ত্রবাদের ভাবাবেগ জাগ্রত করাই যথেষ্ট নহে। তর্ক, যুক্তি, তথ্য এবং বিশদ সমালোচনা দ্বারা, উহাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া তুলিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে এ সম্বন্ধে বহু পুস্তক আছে, ভারতে তাহার একান্ত অভাব এবং অনেক ভাল ভাল বই এদেশে আনিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু কেবল অন্যান্য দেশের বই পড়িলেই চলিবে না। ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ গড়িয়া তুলিতে হইলে, ভারতীয় অবস্থার মধ্য দিয়াই উহাকে বিশ্লেষিত করিতে হইবে, অতএব ভারতীয় অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভই হইল গোড়ার কথা। আমরা এমন সব বিশেষজ্ঞ চাহি যাহারা

অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করিয়া বিশদ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বিশেষজ্ঞগণ অধিকাংশই সরকারী চাকুরীয়া অথবা আধা-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী করেন, তাঁহারা এ দিকে অগ্রসর হইতে সাহস পান না।

বুদ্ধির পটভূমিকাই সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। অন্যান্য শক্তিও আবশ্যক। তবে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস ঐ পটভূমিকা ব্যতীত বিষয়টি আমরা সম্যক আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিব না, কিম্বা কোন শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারিব না। বর্তমানে ভারতে কৃষকদের সমস্যাই প্রধান সমস্যা এবং ইহা সম্ভবতঃ মুখ্য হইয়াই থাকিবে। কিন্তু কলকারখানার গুরুত্ব কম হইলেও, উহা বাড়িতেছে। আমাদের উদ্দেশ্য কি,—কৃষক-রাষ্ট্র, না কলকারখানার শ্রমিক-রাষ্ট্র? আমাদিগকে প্রধানতঃ কৃষিকার্যই করিতে হইবে; তবে অন্যান্য অনেকের মত আমিও মনে করি, আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিও করিতে হইবে।

আমাদের কলকারখানার পরিচালকগণের ধারণা কত সেকেলে ধরনের, তাহা দেখিয়া অবাক হইতে হয়, এমন কি তাঁহারা আধুনিক ধনতান্ত্রিকও নহেন। জনসাধারণ এত দরিদ্র যে তাহাদিগকে ইঁহারা তাঁহাদের পণ্যের ক্রেতা হিসাবে দেখেন না, বেতন বৃদ্ধি অথবা কাজের সময় কমাইবার প্রস্তাব উঠিলেই ইঁহারা প্রাণপণে প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কাপড়ের কলে কাজের সময় দশ ঘণ্টা হইতে কমাইয়া নয় ঘণ্টা করা হইয়াছে। ইহাতেই আহম্মদাবাদের কলওয়ালারা শ্রমিকদের বেতন কমাইয়া দিয়াছেন, এমন কি ঠিকাকাজের মজুরীও হ্রাস করিয়াছেন। অতএব কাজের সময় কম করার অর্থই উপার্জন কম এবং দরিদ্র শ্রমিকের জীবিকা নির্বাহের অবস্থাও অবনত করা। যাহা হউক, কারখানায় বৈজ্ঞানিক সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা অগ্রসর হইতেছে, তাহার ফলে শ্রমিকদের উপর চাপ পড়িতেছে, তাহাদের ক্লেশ বাড়িতেছে, কিন্তু সে অনুপাতে তাহাদের বেতন বাড়িতেছে না। আমাদের দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের মত। সুযোগ পাইলে তাঁহারা প্রচুর লাভ করিয়া থাকেন, শ্রমিকদের অবস্থা পূর্ববৎই চলিতে থাকে এবং যখন মন্দা উপস্থিত হয় তখন মালিকেরা বলেন যে বেতনের হার না কমাইলে ব্যবসা চালান যায় না। তাঁহারা কেবল যে রাষ্ট্রের সাহায্য পাইয়া থাকেন, তাহা নহে, আমাদের দেশের মধ্যশ্রেণীর রাজনীতিকেরাও স্বভাবতঃ তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তথাপি বোম্বাই ও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা আহম্মদাবাদের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের ভাগ্য অনেকটা ভাল। বাঙ্গলার পাটকলের শ্রমিক এবং খনির শ্রমিকগণ অপেক্ষা কাপড়ের কলের শ্রমিকদের অবস্থা অনেক ভাল। ছোট ছোট অনিয়ন্ত্রিত কলকারখানার মজুরদের বেতনের হার তুলনায় নূন্যতম বলিলেই চলে। চটকল ও কাপড়ের কলের মালিকদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, তাঁহাদের বিলাস ও আড়ম্বরের জাঁকজমকের সহিত, জীর্ণ কুটীরবাসী অর্ধনগ্ন শ্রমিকদের জীবনযাত্রার তুলনা করিলে, অনেক শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা এই নিদারুণ অসামঞ্জস্য অতি স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করি; উহাতে আমাদের চিত্তে কোন ভাবোদ্রেক হয় না।

ভারতীয় শ্রমজীবীদের ভাগ্য মন্দ হইলেও, উপার্জনের দিক দিয়া তাহাদের অবস্থা কৃষকদের অপেক্ষা বহুগুণে ভাল। কৃষকদের একটা সুবিধা আছে তাহারা প্রচুর আলোক ও বাতাসে বাস করে, বস্তীর কদর্য জনপদ সেখানে নাই। কিন্তু তাহাদেরও অবস্থা এত মন্দ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা প্রত্যেকটি গ্রামকে, গান্ধিজীর ভাষায়, "গোবরগাদা" করিয়া তুলিয়াছে। সহযোগিতা অথবা সমবেত চেষ্টার সম্প্রসারণ অথবা শ্রেণীগত উন্নতির কোন ধারণাই তাহাদের মধ্যে নাই।

তাহাকে নিন্দা বা ভর্ৎসনা করা সহজ, কিন্তু সেই দর্ভাগা জীব কি করিবে? জীবন তাহার নিকট এক বিরামহীন তিক্ত সংগ্রাম, প্রত্যেকের হাত তাহার বির্দ্ধে উত্তোলিত রহিয়াছে। কেমন করিয়া সে বাঁচিয়া আছে, ইহা এক পরম রহস্য। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পাঞ্জাবের এক সাধারণ কৃষক পরিবারের মাথা পিছু উপার্জন প্রায় নয় আনা (১৯২৮-২৯)। ইহাই ১৯৩০-৩১এ জন প্রতি তিন পয়সায় নামিয়াছে! বাঙ্গলা, বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের কৃষকগণ অপেক্ষা পাঞ্জাবের কৃষকদের অবস্থা অনেক ভাল বলিয়া ধরা হয়। যুক্ত-প্রদেশের পূর্ব-প্রান্তের জিলাগুলিতে (গোরক্ষপুর প্রভৃতি) মন্দার পূর্বের ভাল সময়ে জন-মজুরদের দৈনিক মজুরী ছিল দুই আনা। এই ভয়াবহ অবস্থায় দয়াল্ ব্যক্তিদের দান এবং পল্লীর উন্নতিমূলক স্থানীয় চেষ্টা দ্বারা উন্নতি হইবে, একথা বলিলে কৃষক এবং কৃষকের দুঃখকে ব্যঙ্গ করা হয়।

এই কর্দম-গহ্বর হইতে আমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাইব? উপায় অবশ্য নির্ধারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণকে এই গভীর অতল হইতে টানিয়া তোলা কঠিন। পরিবর্তনবিরোধী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট শ্রেণী হইতেই প্রকৃত বাধা আসিয়া থাকে; সাম্রাজ্যনীতির অধীনতায় কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রশ্নই উঠে না। ভারত ভবিষ্যতে কোন্ দিকে দৃষ্টিপাত করিবে? একদিকে কম্যুনিজম, অন্য দিকে ফাসিজম্, এই দুই-ই আজকাল প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং এ দুইএর মধ্যবর্তী অনিশ্চিত দলগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। স্যর ম্যালকম হেইলী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ন্যাশনাল সোস্যালিজম গ্রহণ করিবে অর্থাৎ কোন না কোন আকারে ফাসিজম্ গ্রহণ করিবে। আশু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্ভবতঃ তাহার উক্তি সত্য। ভারতের যুবকযুবতীদের মধ্যে ফাসিস্ত মনোবৃত্তি স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। বাঙ্গলায় বিশেষভাবে এবং কতক পরিমাণে অন্যান্য প্রদেশে এবং কংগ্রেসের মধ্যেও উহার প্রতিচ্ছায়া দেখা যাইতেছে। ফাসিজম-এর সহিত অতি উৎকট হিংসানীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া অহিংসাপন্থী প্রাচীন কংগ্রেসনেতারা স্বাভাবিকরূপেই উহাকে ভয় করিয়া থাকেন। কিন্তু ফাসিজমের পশ্চাতে তথাকথিত দার্শনিক তত্ত্ব—সমবায়নীতিতে চালিত রাষ্ট্র যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকিবে, কায়েমীস্বার্থ বিলুপ্ত না করিয়া তাহা সীমাবদ্ধ করা হইবে,—ইহার প্রতি সম্ভবতঃ তাঁহাদের আকর্ষণ আছে। প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়, পুরাতন ব্যবস্থাকে রক্ষা করিয়াও নূতন সৃষ্টির পক্ষে ইহা প্রশস্ত রাজপথ। কিন্তু উভয়েরই সমান উদর-পূর্তি সম্ভবপর কিনা, সে স্বতন্ত্র কথা।

কিন্তু ফাসিজম-এর প্রকৃত শক্তি আসিবে, মধ্যশ্রেণীর যুবকদের নিকট হইতে। কার্যতঃ বর্তমানে ভারতে মধ্যশ্রেণীর একটা অংশই বৈপ্লবিক ভাবে চিন্তা করে। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে উহা ততটা নাই, তবে শ্রমিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবের সম্ভাবনা অনেক অধিক। এই জাতীয়তাবাদী মধ্যশ্রেণী ফাসিস্ত আদর্শ প্রচারের অনুকূলক্ষেত্র। কিন্তু যতদিন বৈদেশিক গভর্ণমেণ্ট থাকিবে, ততদিন ইউরোপীয় ধরণের ফাসিজম বিস্তার লাভ করিতে পারে না। ভারতীয় ফাসিজম নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাহিবে, সে কখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু হইতে পারে না। ইহাকে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে হইবে। যদি ব্রিটিশ কর্তৃত্ব পূর্ণভাবে অপসারিত হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ ফাসিজম অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করিবে এবং মধ্যশ্রেণীর ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা যে ইহার প্রধান সমর্থক হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃত্ব সরিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই এবং ইতিমধ্যে ব্রিটিশ

গভর্ণমেণ্টের তীব্র দমননীতি সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক এবং কম্যুনিষ্ট মতবাদ দ্রুত প্রচারলাভ করিতেছে; কম্যুনিষ্ট-দল বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং ঐ নামটি অতি শিথিল ভাবে ব্যবহার করা হয়, সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির, অথবা অগ্রগামী কর্মপদ্ধতির সমর্থক শ্রমিক-সঙ্ঘগুলিও উহার আওতায় পড়ে।

ফাসিজম ও কম্যুনিজম-এর মধ্যে আমরা সহানুভূতি সর্বতোভাবে কম্যুনিজম এর দিকে; কিন্তু এই গ্রন্থখানি পড়িলেই বুঝা যাইবে, আমি কম্যুনিষ্ট হইতে অনেক দূরে রহিয়াছি। আমার মূল অংশতঃ এখনও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে রহিয়াছে। এবং আমি মানবতার উদারনৈতিক ভাবধারার দ্বারা এত বেশী প্রভাবান্বিত যে উহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাই নাই। আমার চারিদিকে এই বুর্জোয়া প্রতিবেশ দেখিয়া স্বভাবতঃই অনেক কম্যুনিষ্ট বিরক্তি বোধ করিয়া থাকেন। আমি মতবাদের গোঁড়ামী ভালবাসি না। কার্ল মার্কস-এর রচিত পুস্তক এবং অন্যান্য গ্রন্থকে ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্মশাস্ত্রের মত বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে, সৈনিকের মত উহা মানিতে হইবে, অন্যথা করিলে পাষণ্ড বলিয়া অভিহিত হইতে হইবে, আধুনিক কম্যুনিজম্-এর ইহা এক লক্ষণরূপে পরিণত হইয়াছে। রুশিয়ার অনেক ব্যাপার, বিশেষতঃ সাধারণ অবস্থায়ও অতিমাত্রায় বলপ্রয়োগ, আমার ভাল লাগে না। কিন্তু তথাপি আমি ক্রমশঃ কম্যুনিষ্ট দর্শনের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি।

মার্কস্-এর কতকগুলি বিবৃতি অথবা তাঁহার 'মূল্য নিরূপণ' বিষয়ক গবেষণা ভুল হইতে পারে, সে বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু মনে হয়, সামাজিক ব্যাপারে তাঁহার অনন্যসাধারণ দূরদৃষ্টি ছিল এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিতে গিয়াই তিনি এই দূরদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। এই উপায়ে আমরা অতীত ইতিহাস ও বর্তমান ঘটনাবলী অন্যান্য উপায় অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গতরূপে বুঝিতে পারি, এই কারণেই মার্কস্পন্থী লেখকগণ বর্তমান জগতের পরিবর্তনের ধারাগুলি অধিকতর নিপুণ উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়া উহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন। পরবর্তী কতকগুলি সামাজিক প্রবণতা মার্কস্ উল্লেখ করেন নাই, অথবা ঐগুলিকে সম্যক গুরুত্ব প্রদান করেন নাই, ইহা সহজেই দেখান যাইতে পারে,—যেমন মধ্যশ্রেণী হইতে বৈপ্লবিক অংশের অভ্যুত্থান যাহা আজকাল আমরা দেখিতে পাইতেছি। কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জোর দিতে গিয়া, বিশিষ্ট বিচার প্রণালী এবং কোন কার্যের প্রতি মনোভাব সম্পর্কে মার্কস্পন্থার কোন স্থানে কোন মতবাদের গোঁড়ামী নাই এবং ইহাই উহার প্রকৃত মূল্য বলিয়া আমার মনে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমরা সমসাময়িক সামাজিক ব্যাপারগুলি বুঝিতে পারি: কর্তব্য কি, পরিত্রাণের পথ কোথায়, তাহারও নির্দেশ পাই।

এই কর্মপদ্ধতিরও কোন বাঁধাধরা বা অপরিবর্তনীয় পথ নাই—অবস্থার সহিত উহার সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। অন্ততঃপক্ষে ইহাই লেনিনের মত ছিল এবং তিনি পরিবর্তিত অবস্থার সহিত অতি সুষ্ঠুভাবে কর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন—"কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন বাস্তব অবস্থার তৎকালীন গতি ও প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পরীক্ষা না করিয়া সংঘর্ষের সুনিশ্চিত উপায় কি সে প্রশ্নের হাঁ, কি না, উত্তর দিবার চেষ্টা করার অর্থ মার্কসীয় ভূমি হইতে একেবারেই দূরে সরিয়া যাওয়া।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"কিছুই চরম নহে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে আমাদের সতত শিক্ষা লাভ করিতে হইবে।"

এই উদার ও দূরপ্রসারী দৃষ্টির জন্যই একজন কম্যুনিষ্ট, অপরাপর-[illegible]

আবদ্ধ সমাজ-জীবনের সমগ্র রূপ বুঝিতে পারে। রাজনীতি তাহার নিকট কেবল মাত্র সুবিধাবাদীদের ব্যাপার নহে, অন্ধকারে হাতড়ানও নহে। আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া সে কাজ করে, তাহারই আলোকে সংঘর্ষের মর্মকথা বুঝিতে সমর্থ হয় এবং স্বেচ্ছায় ত্যাগস্বীকার করে। সে জানে মানব-নিয়তি বা ভাগ্যকে অন্বেষণের জন্য বহির্গত বিপুল বাহিনীর সে অন্যতম সৈনিক, সে বুঝে যে, 'ইতিহাসের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া সে অগ্রসর হইতেছে।'

অধিকাংশ কম্যুনিস্টই এই ভাবে অনুপ্রাণিত নাও হইতে পারেন। সম্ভবতঃ একজন লেনিনই মানবজীবনের সমগ্রতা পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহার প্রত্যেকটি কার্য সার্থক ও সফল হইয়াছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম হইলেও, প্রত্যেক কম্যুনিস্টের উহা আছে এবং সে তাহার কর্মের মর্মগত তত্ত্ব ভাল করিয়াই জানে।

এমন অনেক কম্যুনিস্ট আছেন, যাঁহাদের সহিত আলোচনাকালে ধৈর্যরক্ষা করা কঠিন, অপরকে বিরক্ত করিবার এক অভিনব কৌশল তাঁহারা আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা অনেক আঘাত সহ্য করিয়াছেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বাহিরে তাঁহাদিগকে বিপুল বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। আমি তাঁহাদের সাহস ও ত্যাগ স্বীকারের সর্বদাই প্রশংসা করিয়া থাকি। যেমন লক্ষ লক্ষ নরনারী দুর্ভাগ্যক্রমে নানা ভাবে বহু দুঃখ সহ্য করিতেছে, তেমনই তাঁহারাও দুঃখ সহ্য করেন, তবে তাঁহারা অপমানকর সর্বশক্তিমান ভাগ্যকে অন্ধভাবে গ্রহণ করেন না। তাঁহারা মানুষের মত দুঃখ সহ্য করেন, তাহার মধ্যে এক মহিমান্বিত বেদনা রহিয়াছে।

রুশিয়ার সমাজগঠনের পরীক্ষামূলক কার্যগুলির সাফল্য বা ব্যর্থতার দ্বারা মার্কসীয় মতবাদের সত্যতার কোন অপচয় ঘটে না। কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রে অথবা বিবিধ বিরুদ্ধ শক্তির সম্মেলনে এই পরীক্ষাকার্য বিপর্যস্ত হইতে পারে,—যদিও তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি উহা কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি ঐ সকল সামাজিক আলোড়নের যথার্থ মূল্য সর্বদাই থাকিবে। সেখানকার অনেক ঘটনার প্রতি আমার প্রকৃতিগত যত আপত্তিই থাকুক না কেন, তাহারা আজ জগতের সম্মুখে এক বৃহৎ আশার আলোক তুলিয়া ধরিয়াছে। আমি এত বেশী জানি না যে তাহাদের কার্যের বিচার করিতে পারি। আমার প্রধান আশঙ্কা, অতি-মাত্রায় বলপ্রয়োগ ও দমননীতি তাহার পশ্চাতে যে অন্যায়ের রেশ রাখিয়া যাইবে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান রুশিয়ার পরিচালকদের স্বপক্ষে একটা বড় কথা বলিবার আছে যে, তাঁহারা কখনও ভুল স্বীকার করিতে ভীত নহেন। তাঁহারা পিছনে হটিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তোলেন এবং তাঁহাদের আদর্শ সর্বদাই সম্মুখে থাকে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট সঙ্ঘ দ্বারা অন্যান্য দেশে তাঁহাদের প্রচারকার্য নিষ্ফল হইয়াছে, কিন্তু আজকাল দেখা যায়, ঐ সকল কার্যপদ্ধতি যথাসম্ভব কমাইয়া ফেলা হইয়াছে।

ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, বাহিরের ঘটনার স্রোত গতিবেগ সঞ্চার না করিলে, এখানে কম্যুনিজম সোস্যালিজম অনেক দূরের কথা। আমাদের সমস্যা 'কম্যুনিজম' নহে। উহার সহিত আর দুই একটি অক্ষর জুড়িয়া দিয়া আমাদের সমস্যা হইল 'কম্যুনালিজম'। সম্প্রদায় হিসাবে ভারতবর্ষ এখনও অন্ধকারময় মধ্যযুগে রহিয়াছে। এখানে কাজের লোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়, ষড়যন্ত্র ও কৌশল লইয়া বৃথা শক্তিক্ষয় করেন এবং পাল্লা দিয়া একে অন্যের উপরে উঠিতে চাহেন। জনতার কল্যাণ করিবার আগ্রহ ইঁহাদের মধ্যে অতি অল্প

লোকেরই আছে। সম্ভবতঃ এই সাময়িক অবস্থা শীঘ্রই দূর হইবে।

এই সাম্প্রদায়িক অন্ধকার হইতে কংগ্রেস বহুল পরিমাণে বাহিরে আছে, তবে ইহার দৃষ্টিভঙ্গী 'পেটি বুর্জোয়া' শ্রেণীর। সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যান্য সমস্যার প্রতিকারোপায় তাঁহারা 'পেটি বুর্জোয়া' শ্রেণীর স্বার্থের দিক হইতে অন্বেষণ করেন। কিন্তু এ পথে সাফল্যলাভ সম্ভবপর হইবে না। কংগ্রেস অধুনা নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি, বর্তমানে এই শ্রেণীই সচেতন এবং বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহাকে যতটা প্রধান বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা আসলে তাহা নহে। ইহাকে দুই দিক হইতে দুই শক্তি চাপ দিতেছে এক শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ ও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, অপর শক্তি দুর্বল হইলেও দ্রুত বলসঞ্চয় করিতেছে। বর্তমানে নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ভবিষ্যতে ইহার কি অবস্থা হইবে তাহা বলা কঠিন। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের ঐতিহাসিক অভিপ্রায় পূর্ণ না করিয়া ইহা প্রথমোক্ত সঙ্ঘবদ্ধ শ্রেণীর সহিত যোগ দিতে পারে না। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বেই অন্যান্য শক্তি বলশালী হইয়া ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং ক্রমশঃ উহার স্থান অধিকার করিতে পারে। যাহা হউক, মনে হয় যতদিন জাতীয় স্বাধীনতার অনেকখানি না পাওয়া যাইতেছে, ততদিন কংগ্রেস ভারতবর্ষে এক প্রধান শক্তিরূপে কার্য করিবে।

কোন প্রকার হিংসামূলক কার্যের কথা উঠিতেই পারে না, উহা অনিষ্টকর পণ্ডশ্রম মাত্র। স্থানবিশেষে নিষ্ফল হিংসামূলক কার্যের বিরল দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও আমার বিবেচনায় ভারতে সকলেই পূর্বোক্ত মতে বিশ্বাসী। ঐ পথে অগ্রসর হইলে আমরা হিংসা ও প্রতিহিংসার এমন এক নৈরাশ্যজনক গোলকধাঁধায় পড়িয়া যাইব, যাহা হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইবে।

অনেকে আমাদের সকল দল ঐক্যবদ্ধ করিয়া, 'ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট' গঠন করা উচিত, বলিয়া থাকেন। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু তাঁহার কবি-হৃদয়ের আবেগ-মণ্ডিত ভাষায় ইহার কথা বলেন। তিনি কবি,—দ্বন্দ্ব, মিলের সৌন্দর্যের তিনি প্রশংসা করিবেনই। কিন্তু ঐ শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার অর্থ ও উদ্দেশ্য উপরের দিকের কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে চুক্তি বা আপোষ-রফা মাত্র। এই ভাবে মিলিত হইলে অতি সাবধানী মডারেটগণ আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত করিবেন, এবং অগ্রগতি মন্দীভূত করিবেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে কোন প্রকার আন্দোলনই পছন্দ করেন না। অতএব তাহার ফল হইবে এক ঐক্যবদ্ধ জড়ত্ব। ঐক্যবদ্ধ হইয়া সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে আমরা সমারোহ সহকারে ঐক্যবদ্ধ পশ্চাদ্দেশ প্রদর্শন করিব।

অবশ্য আমরা অপরের সহিত সহযোগিতা অথবা আপোষ করিব না, একথা বলা নির্বুদ্ধিতা। আমাদের জীবন ও রাজনীতি এত জটিল ব্যাপার যে সব সময় সরলরেখার চিন্তা করা যায় না। এমন কি অনমনীয় লেনিন পর্যন্ত বলিয়াছেন,—"কোন প্রকার আপোষ না করিয়া, পথে কোন মোড় না ঘুরিয়া কেবলই সম্মুখে অগ্রসর হওয়া, মূর্খের বালকোচিত চাপল্য মাত্র, ইহা বৈপ্লবিক শ্রেণীর সুসম্বদ্ধ কৌশল নহে।" আপোষ রফা আসিবেই, তবে উহা লইয়া অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে। আমরা আপোষই করি অথবা উহাকে অস্বীকার করি, মূখ্য বিষয়ই প্রথম আলোচ্য বিষয়, উহা ছাড়িয়া কোন গৌণ ব্যাপারকে প্রথম স্থান দিতে আমরা প্রস্তুত নহি। যদি আমাদের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট থাকে, তাহা হইলে কোন সাময়িক আপোষে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমাদের দুর্বলহৃদয় নেতারা অসন্তুষ্ট হইবেন, এই ভয়ে আমরা মূলনীতি ও উদ্দেশ্যকে

কলঙ্কিত করিয়া ফেলিতে পারি,—বিপদ তাহাই। অপরকে অসন্তুষ্ট করা অপেক্ষা বিপথে চালিত হওয়া অধিক মন্দ।

প্রচলিত ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আমার লেখা অনেকটা অস্পষ্ট ও অনুশীলন-মূলক হইল। আমি নিরপেক্ষ দর্শকের আসন হইতে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যখন কর্মের ডাক আসে, তখন স্বভাবতঃই আমি দর্শকরূপে থাকিতে পারি না; আমার অপরাধ, লোকে বলে, উত্তেজনার প্রচুর কারণ না থাকিলেও আমি নির্বোধের মত ছুটিয়া যাই। আমি এখন কি করিব? আমার দেশবাসীকে কি করিতে বলিব? সম্ভবতঃ যাঁহারা সাধারণের কাজ লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহাদের স্বভাবের মধ্যে একটা সাবধানী ভাব থাকে, সেইজন্যই আমি যত শীঘ্র কিছু বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছি। কিন্তু যদি অকপটে সত্য কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিব, আসলে আমি কিছুই জানি না এবং অন্বেষণ করিবার চেষ্টাও করি না। আমি যখন কাজ করিতে পারিতেছি না, তখন কেন দুশ্চিন্তা করিব? কিন্তু আমাকে অনেক দুশ্চিন্তাই করিতে হয়, কিছুতেই এড়াইতে পারি না। অন্ততঃ যতদিন আমি জেলে আছি ততদিন আমাকে আশু কর্তব্যের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে না।

কারাগারে বসিয়া কর্মক্ষেত্র বহুদূরবর্তী বলিয়া মনে হয়। মানুষ ঘটনার অধিপতি না হইয়া, ঘটনার বিষয় হইয়া উঠে এবং একটা কিছু ঘটিবার প্রত্যাশায় অপেক্ষার অন্ত থাকে না। আমি বসিয়া বসিয়া ভারত ও জগতের রাজনৈতিক ও সামাজিক-সমস্যার বিষয় লিখিতেছি, কিন্তু আমার দীর্ঘকালের আবাসভূমি স্বয়ম্পূর্ণ কারা-জগতে তাহার মূল্য কতটুকু? বন্দি-জীবনের একমাত্র মুখ্য বিষয় কারামুক্তির দিবস।

নৈনী জেলে এবং এই আলমোড়া জেলে অনেক কয়েদী আসিয়া "জুগ্‌লী"র কথা আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিত। প্রথমে আমি ঐ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি নাই, পরে বুঝিলাম যে, তাহারা জুবিলীর কথা বলিতেছে। রাজা জর্জের রজত-জুবিলীর গুজব শুনিয়াই তাহারা উহা অনুমান করিয়াছে, কিন্তু সে বিষয়ে তাহারা বিন্দু-বিসর্গও জানে না। অতীতের স্মৃতি হইতে ঐ শব্দের একটি মাত্র অর্থ তাহারা জানে—অনেকের কারামুক্তি অথবা কারাদণ্ড হ্রাস। প্রত্যেক কয়েদী—বিশেষভাবে দীর্ঘ কারাদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিরা—এই কারণে 'জুগ্‌লী' সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের নিকট পার্লামেণ্টে শাসনসংস্কার আইন, সমাজতন্ত্রবাদ বা কম্যুনিজম অপেক্ষা জুগ্‌লী অনেক বড় জিনিষ।

৬৮

উপসংহার

"কর্মে আমাদের অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম শেষ করিবার অধিকার আমরা পাই নাই।"—তালমুদ

আমার কাহিনী ফুরাইল। আমার জীবনের যাত্রাপথে এই আত্মকাহিনী আজ আলমোড়া জেলে ১৯৩৫-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিন মাস পূর্বে এই দিবস কারাগারে আমার পঞ্চচত্বারিংশৎ জন্মদিন পূর্ণ

হইয়াছে। আমার মনে হয়, আমাকে আরও দীর্ঘকাল বাঁচিতে হইবে। সময় সময় বয়োধিক্যের ক্লান্তিবোধ করিয়া থাকি, অন্য সময়ে নিজেকে বেশ সুস্থ-সবল বলিয়াই মনে হয়। আমার দেহ বেশ সুগঠিত, আঘাত সহ্য ও অতিক্রম করিবার মত মানসিক বলও আমার আছে। এই কারণে আমি ভাবি, কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা না ঘটিলে আমাকে আরও দীর্ঘকাল বাঁচিতে হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা লিখিবার পূর্বে আমাকে জীবন যাপন করিতে হইবে।

সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে রোমাঞ্চকর দুঃসাহসের কিছুই নাই, দীর্ঘ বহু বর্ষ যে জীবন কারাগারে কাটিল, তাহার মধ্যে রোমাঞ্চকর কি-ই বা থাকিতে পারে! ইহার মধ্যে বিশেষ অভিনবত্বও কিছু নাই, কেন না আমার [illegible] সহস্র স্বদেশবাসী নরনারীর জীবনের উত্থান ও পতন, হর্ষ ও বিষাদ, আনন্দ ও অবসাদ, তীব্র কর্মপ্রবণতা ও পরবশ নিঃসঙ্গতার সহিত মিলিয়া মিশিয়া আমার এই সকল বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। আমি জনসাধারণের একজন হইয়া তাহাদের সহিত একত্রে চলিয়াছি। কখনও বা তাহাদের পরিচালিত করিয়াছি, কখনও তাহারা আমাকে প্রভাবিত করিয়াছে; তথাপি অন্যান্য সকলের মতই ব্যক্তিগত ভাবে আমি জনতার মধ্যেও আমার স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিয়াছি। সময় সময় আমাদিগকে অভিনেতার মত সচেতন ভঙ্গীতে মনোভাব প্রদর্শন করিতে হইয়াছে, কিন্তু আমরা যাহা করিয়াছি তাহা কঠোর সত্য এবং অকৃত্রিম। ইহা দ্বারাই আমরা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র অহমিকার ঊর্ধ্বে উঠিয়াছি এবং বল ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছি, হয়ত ক্ষেত্রান্তরে তাহা সম্ভব হইত না। কার্যের সহিত আদর্শের ঐক্যসাধন করিতে গিয়া জীবনের পূর্ণতার যে অনুভূতি আসে, সৌভাগ্যক্রমে কখনও কখনও আমরা সে অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছি এবং আমরা নিঃশেষে বুঝিয়াছি, এই সকল আদর্শহীন অন্য যে কোন প্রকার জীবন এবং প্রবলতর শক্তির নিকট নিরীহ বশ্যতা স্বীকার করিলে জীবন নিষ্ফল অতৃপ্ত ও বিষাদময় হইয়া উঠিত।

এই দীর্ঘকালে আমি অনেক কিছুর সহিত এক বহুমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছি। আমি জীবনকে যতই দুর্লভের আকাঙ্ক্ষার অভিযানরূপে দেখিয়াছি, ততই বুঝিয়াছি, ইহার মধ্যে কত কিছু জানিবার আছে, কত কিছু করিবার আছে। প্রতিদিনই অবিরত আমি বর্ধিত হইতেছি, এই ধারণা আমার মধ্যে এখনও রহিয়াছে, ইহাই আমার প্রতিকর্মে বল সঞ্চার করে। এই আগ্রহেই আমি পুস্তকাদি পাঠ করি এবং জীবন আমার নিকট সাধারণতঃ সার্থক বলিয়া মনে হয়।

এই কাহিনী লিখিতে গিয়া আমি প্রত্যেক ঘটনার সময় আমার মনোভাব ও চিন্তা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, বিশেষ ঘটনায় আমার মনে কি ভাবের উদ্রেক হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়াছি। অতীতের কোন মনোভাব ফিরিয়া পাওয়া কঠিন এবং পরবর্তী ঘটনাগুলি ভুলিয়া যাওয়াও সহজ নহে। আমার প্রথম জীবনের বর্ণনা অনিবার্যরূপেই পরবর্তীকালের ভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, প্রধানতঃ আত্মকল্যাণের জন্য স্বকীয় মানসিক বিকাশের ধারা অনুসন্ধান করা। সম্ভবতঃ আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে আমার প্রকৃত স্বরূপ ফুটে নাই; হয়ত বা আমি যাহা হইতে চাহিয়াছি অথবা নিজেকে যাহা কল্পনা করিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি।

কয়েকমাস পূর্বে সার সি. পি. রামস্বামী আমার প্রকাশ্যে বলিয়াছেন, আমি জনসাধারণের মনোভাবের প্রতিনিধি নহি, তথাপি আমি অধিকতর বিপজ্জনক; কেন না আমার স্বার্থত্যাগ, আদর্শবাদ এবং আমার বিশ্বাসের জোর আছে; ঐগুলিকে তিনি "আত্মসম্মোহন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি

"আত্মসম্মোহিত" সে কখনও নিজেকে বিচার করিতে পারে না এবং যে কোন কারণেই হউক ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি রামস্বামীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল দেখাশুনা নাই; কিন্তু বহুকাল পূর্বে এমন এক সময় ছিল যখন আমরা হোমরুল-লীগের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলাম। তাহার পর অনেক কিছুই ঘটিয়াছে, রামস্বামী বর্তুলাকার পথে শিরোঘূর্ণনকারী ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়া গিয়াছেন, আমি মাটির মানুষ, মাটিতেই আছি। আমরা একই দেশের অধিবাসী ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনও ঐক্য নাই। আজ তিনি ব্রিটিশ শাসনের একজন উৎসাহী সমর্থক, বিশেষতঃ গত কয়েক বৎসরে তাঁহার উৎসাহ অধিক বাড়িয়াছে, তিনি আজ ভারতে ও অন্যত্র ডিক্টেটরীর অনুরাগী এবং স্বয়ং দেশীয় রাজ্যের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনের এক উজ্জ্বল রত্নরূপে শোভা পাইতেছেন। আমাদের মধ্যে মতভেদ প্রচুর, কিন্তু একটা সামান্য বিষয়ে আমাদের মতের ঐক্য আছে। আমি যে জনসাধারণের মনোভাবের প্রতিনিধি নহি, একথা বলিয়া তিনি নিঃসন্দেহে সত্য কথা বলিয়াছেন। আমার মনে সেরূপ কোন মোহ নাই।

নিশ্চয়ই, আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি আমি কাহারও প্রতিনিধি নহি। যদিও অনেকে আমার প্রতি সদয় ও বন্ধুভাবাপন্ন তথাপি আমি তাহাদের প্রতিনিধি নহি, ইহাই ভাবিতে চাহি। আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক অদ্ভুত মিশ্রণ, সর্বত্রই আমি অপরিচিত, কোথাও আমার গৃহ নাই। সম্ভবতঃ আমার চিন্তা ও জীবনকে দেখিবার ভঙ্গীর, প্রাচ্য অপেক্ষা যাহাকে পাশ্চাত্য বলা হয়, তাহার সহিতই ঘনিষ্ঠতা অধিক। কিন্তু ভারতমাতা আমাকে ক্রোড়ে করিয়া আছেন; যেমন তিনি তাঁহার সমস্ত সন্তানকে অগণিত উপায়ে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন এবং আমার পশ্চাতে মনের অবচেতন অংশে রহিয়াছে, শত-পুরুষ কিম্বা সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, বংশানুক্রমিক ব্রাহ্মণের স্মৃতি। আমি অতীতের সেই কৌলিক স্মৃতি এবং আমার আধুনিক শিক্ষাসংস্কৃতি কোনটাই অতিক্রম করিতে পারি না। ইহারা আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যদিও ইহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়দিক হইতেই আমি সাহায্য পাইয়া থাকি, তথাপি ইহার ফলে কি বাহিরের কাজে, কি নিজের জীবনে এক মানসিক নিঃসঙ্গতা অনুভব করিয়া থাকি। পাশ্চাত্যদেশে আমি একজন অপরিচিত বিদেশী মাত্র; আমি তাহার হইতে পারি না। আমার স্বদেশেও সময় সময় নিজেকে নির্বাসিত বলিয়া মনে হয়।

দূরবর্তী পর্বত দেখিয়া মনে হয়, অতি সহজেই আরোহণ করা যায়, পর্বত-শৃঙ্গ ইঙ্গিতে আহ্বান করে! কিন্তু মানুষ নিকটবর্তী হইলেই বাধাবিঘ্ন দেখা দেয়, সে যতই উঠিতে থাকে ততই আরোহণ ক্লেশকর হইয়া উঠে, পর্বতশৃঙ্গ মেঘে ঢাকা পড়িয়া যায়। তথাপি এই আরোহণের উদ্যমের সার্থকতা আছে এবং ইহার বিশিষ্ট আনন্দ ও তৃপ্তিও আছে। সম্ভবতঃ সংগ্রামের মধ্যে জীবনের যে গৌরব, পরিণাম-ফলের মধ্যে ততটা নহে। প্রকৃত সত্য পথ কি, সকল সময় তাহা বুঝা কঠিন, তবে সময় সময় কি সত্য নয় তাহা বুঝা সহজ এবং তাহা হইতে দূরে থাকাও ভাল। অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আমি মহাপ্রাণ সক্রেটিসের সর্বশেষ বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, "মৃত্যু কি আমি জানি না—হইতে পারে ইহা ভাল এবং আমি উহাতে ভীত নহি। তবে আমি নিশ্চয় করিয়া জানি যে নিজের অতীতকে বর্জন করা মন্দ; অতএব যাহা আমি মন্দ বলিয়া জানি তাহার পরিবর্তে যাহা ভাল হইতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিব।"

কত বৎসর কারাগারে কাটিল! একাকী বসিয়া একান্তে চিন্তা করিয়াছি; কত ঋতু আসিয়া গেল, একের পর আর বিস্মৃতির অতলে মিলাইয়া গিয়াছে! কত চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি আমি লক্ষ্য করিয়াছি এবং কতবার অজস্র নক্ষত্রপুঞ্জ নিঃশব্দ গতিতে মহিমময় শোভায় চলিয়া গিয়াছে! আমার যৌবনের কতদিন এই কারাগারে সমাধিসুপ্ত; সময় সময় সেই মৃত দিবসগুলির প্রেতমূর্তি তীব্র স্মৃতি লইয়া জাগিয়া উঠে, কানে কানে বলে, "ইহার কি কোন সার্থকতা আছে?" এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার কোন দ্বিধা নাই। যদি আমার বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লইয়া জীবনপথে আর একবার যাত্রার সুযোগ পাইতাম, তাহা হইলে আমার ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কিছু পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিতাম সন্দেহ নাই, পূর্বে যাহা করিয়াছি, তাহা আরও ভাল করিয়া করিতে পারিতাম; কিন্তু জনসাধারণের কাজে আমার প্রধান সিদ্ধান্তগুলি একই থাকিত। অবশ্য আমি উহা পরিবর্তন করিতে পারি না, কেন না ঐগুলি আমা অপেক্ষাও শক্তিমান এবং আমার আয়ত্তের অতীত এক শক্তি আমাকে ঐগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

অদ্য কারাগারে এক বৎসর পূর্ণ হইল। আমার দুই বৎসর কারাদণ্ডের মধ্যে এক বৎসর অতিবাহিত হইল। আরও পূর্ণ এক বৎসর, কেন না ইহা অশ্রম কারাদণ্ড, ইহাতে দণ্ড মকুবের কোন বিধান নাই। এমন কি, যে এগার দিন আমি বাহিরে ছিলাম, তাহাও আমার দণ্ডকালের সহিত পুনরায় যোগ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ বৎসরও কাটিবে এবং আমি বাহিরে যাইব—কিন্তু তারপর? আমি জানি না, তবে জীবনের এক অধ্যায় শেষ হইয়া অপর অধ্যায়ের সূচনা হইল। ইহা যে কি হইবে আমি ধারণা করিতে পারি না। জীবন-পুঁথির পাতাগুলি বন্ধ!

পুনশ্চ

বাডেনওয়েলার, সোয়ার্জওয়াল্ড
২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৫

মে মাসে আমার পত্নী ভাওয়ালী হইতে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাত্রা করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে ভাওয়ালী যাওয়ার আর কোন প্রয়োজন রহিল না, পনর দিন পর পর জেলের বাহিরে পার্বত্য পথে মোটরে ভ্রমণ শেষ হইল। ইহার ফলে, আলমোড়া জেল আমার নিকট নীরস ও নিরানন্দকর হইয়া উঠিল।

কোয়েটার ভূমিকম্পের সংবাদ আসিল, কিছুকালের জন্য অন্য সব কিছু ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু বেশী দিনের জন্য নহে, ভারত গভর্ণমেন্ট আমাদিগকে তাঁহাদের ভুলিয়া থাকিতে অথবা তাঁহাদের কাজ করার অদ্ভুত ব্যবস্থা ভুলিয়া থাকিতে দেন না। আমরা শুনিলাম, কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং ভূমিকম্পের সাহায্য-কার্যে ভারতে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে সেবাকার্যের জন্য কোয়েটায় যাইতে দেওয়া হইল না। এমন কি, গান্ধিজী ও অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিদেরও যাইতে দেওয়া হইল না। কোয়েটার ভূমিকম্প সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিয়া অনেক ভারতীয় সংবাদপত্রের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইল।

কি ব্যবস্থা-পরিষদ, কি গভর্ণমেন্টের শাসন-বিভাগ, কি সীমান্ত প্রদেশে বোমা নিক্ষেপ—সর্বত্রই একই সামরিক মনোবৃত্তি, একই পুলিশী দৃষ্টিভঙ্গী।

মনে হয় যেন ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট, ভারতীয় জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের সহিত স্থায়ীভাবে সংগ্রামে রত রহিয়াছেন।

পুলিশের প্রয়োজন ও আবশ্যক আছে; কিন্তু পুলিশ কনেষ্টবল ও রেগুলেশান লাঠি-বোঝাই জগৎ বসবাসের পক্ষে খুব প্রীতিকর নহে। একথা সর্বত্রই শোনা যায় যে, অবাধ বলপ্রয়োগের ফলে যে বলপ্রয়োগ করে তাহারও অধঃপতন হয় এবং যাহার উপর বলপ্রয়োগ করা যায়, সেও অপমানিত ও অধঃপাতিত হয়। ভারতের বড় চাকুরীয়া মহলে—বিশেষভাবে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের—নৈতিক ও বুদ্ধিগত ক্রমাবনতির মত প্রত্যক্ষ ব্যাপার অদ্যকার ভারতে অতি অল্পই আছে। বড় চাকুরীয়া মহলে ইহা সর্বাধিক প্রত্যক্ষ হইলেও, সূত্রের মত ইহাতে সমস্ত চাকুরীয়া মাত্রেই গ্রথিত। যখনই বড় চাকুরীতে কাহাকেও নিয়োগের কথা উঠে, তখন এই নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ব্যক্তিকেই যোগ্যতম বলিয়া নিয়োগ করা হয়।

আমার পত্নীর অবস্থা সঙ্কটজনক এই সংবাদ আসায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর সহসা আমাকে আলমোড়া জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। জার্মানীর সোয়ার্জওয়াল্ডের বাডেনওয়েলারে তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছিল। আমি শুনিলাম আমার কারাদণ্ড "স্থগিত" রাখা হইল এবং আমার কারাদণ্ড শেষ হইবার সাড়ে পাঁচ মাস পূর্বেই আমি মুক্ত হইলাম। বিমানপোতে আমি ইউরোপে ছুটিলাম।

ইউরোপ বিক্ষুব্ধ, যুদ্ধভীতি ও কোলাহলময়, দিকচক্রবালে অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘনাইয়া আছে। আক্রান্ত আবিসিনিয়ার জনসাধারণের উপর বোমাবর্ষণ চলিতেছে; বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘাত এবং পরস্পরের প্রতি ভীতিপ্রদর্শন চলিতেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংলণ্ড শান্তি ও রাষ্ট্রসংঘের সমবেত নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহা বোমাবর্ষণ এবং তাহার অধীন জাতি-গুলিকে নির্মমভাবে দমন করিতেছে। কিন্তু এই রুক্ষ অরণ্যের মধ্যে কি নিস্তব্ধ শান্তি, এমন কি, 'স্বস্তিক'ও বড় বেশী দেখিতে পাই না। উপত্যকা হইতে কুয়াসা ঘনাইয়া উঠে, ফ্রান্সের সীমান্ত ও কান্তার আবৃত হইয়া যায়; আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি, উহার পশ্চাতে কি রহিয়াছে!

পাঁচ বৎসর পর

সাড়ে পাঁচ বৎসর পূর্বে আলমোড়া জেলের বন্দীশালায় বসিয়া, আমার আত্ম-চরিত লেখা শেষ করিয়াছিলাম। আট মাস পরে জার্মানীর বাডেনওয়েলার হইতে লিখিত পুনশ্চ উহার সহিত যোগ করি। এই আত্ম-চরিত ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইবার পর, বিভিন্ন দেশের নানাশ্রেণীর লোকের সহৃদয় অভ্যর্থনা লাভ করে এবং আমি দেখিয়া সুখী হইয়াছিলাম যে, আমার রচনা ভারতকে বহু বিদেশী বন্ধুর নিকট ঘনিষ্ঠ করিয়াছে এবং আমাদের স্বাধীনতা সংঘর্ষের অন্তর্নিহিত মর্মকথা তাঁহারা কিয়দংশে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

সম্প্রতি আমার প্রকাশক, পুস্তকখানিকে অধিকতর সমসাময়িক করিবার জন্য আমাকে একটি নূতন অধ্যায় যোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ যুক্তিসঙ্গত এবং আমি তাহা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু ঐ অনুরোধ পালন করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য নহে। আমরা এক আশ্চর্য সময়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছি; এখন জীবনের স্বাভাবিক গতিধারা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও এক গুরুতর বাধার সম্মুখীন হইলাম। বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কারাগারে বসিয়াই আমি সমগ্র আত্ম-চরিত লিখিয়াছি। অন্যান্য বন্দীদের মত আমিও নানাবিধ বৈকল্যের পীড়াবোধ করিতাম কিন্তু ক্রমশঃ আমার মধ্যে আত্মানুসন্ধানের ভাব জাগ্রত হইল এবং কতকাংশে মনও শান্ত হইল। সেই মানসিক অবস্থায় কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইব, কেমন করিয়া সেই বর্ণনার সহিত নিজের সামঞ্জস্য বিধান করিব? আমার পুস্তকখানির উপর চোখ বুলাইলেই আমার মনে হয়, যেন অন্য কেহ বহুদিন পূর্বে এই কাহিনী লিখিয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে পৃথিবীতে কত পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহা আমার উপরও রেখাপাত করিয়াছে। দেহের দিক দিয়া আমার বয়স নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে, কিন্তু একমাত্র মনই বারম্বার আঘাত ও অনুভূতি সহ্য করিয়াছে, ফলে উহা কঠিন হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ প্রবীণও হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডে আমার পত্নীর মৃত্যুতে আমার জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হইয়াছে এবং আমার সত্তার একটি অংশ আমার জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি আর নাই ইহা ধারণা করা কঠিন এবং নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাও সহজ নহে। আমি কাজের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম, উহার মধ্যেই সান্ত্বনা অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন কি আমার প্রথম জীবনের দিনগুলি অপেক্ষাও, আমার জীবনে আজ পর্যায়ক্রমে বিশাল জনসঙ্ঘ, তীব্র কর্মপ্রবণতা এবং নিঃসঙ্গ একাকিত্ব। আমার মাতার মৃত্যুর পর অতীতের সহিত সর্বশেষ বন্ধনও ছিন্ন হইয়া গেল। আমার কন্যা অক্সফোর্ডে পড়িতেছিল; পরে সে চিকিৎসার জন্য ইয়োরোপে এক স্বাস্থ্যনিবাসে চলিয়া যায়। নানাস্থানে ভ্রমণের পর অনিচ্ছার সহিত আমি গৃহে ফিরিয়া আসিতাম, জনহীন ভবনে আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতাম; লোকের সাক্ষাৎকারও এড়াইয়া চলিতাম। জনসঙ্ঘের পর—আমি কামনা করিতাম শান্তি।

কিন্তু আমার কাজে অথবা মনে কোথাও শান্তি ছিল না এবং যে দায়িত্ব আমি স্বস্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম, তাহা দুর্বহ হইয়া আমাকে পীড়া দিত। বিভিন্ন দল ও উপদলের সহিত আমি একাত্ম হইতে পারি না, এমন কি আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের সহিতও আমি খাপ খাওয়াইতে পারি না। আমি যে ভাবে কাজ করিতে চাই তাহাও পারি না, অপরকেও তাহাদের ইচ্ছামত কাজ করিবার পক্ষে

প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করি। একটা চাপা অস্বস্তি ও ব্যর্থতার ভাব বাড়িতে লাগিল, জনসাধারণের কাজে আমি একক হইয়া পড়িলাম। তথাপি বিশাল জনতা আমার কথা শুনিবার জন্য একত্রিত হয় এবং আমার চারিদিকে জলন্ত উৎসাহ।

ইউরোপ এবং পূর্ব এশিয়ার ঘটনার গতি অন্যান্য অনেকের অপেক্ষা আমাকে অধিকতর অভিভূত করিল। মিউনিকের ব্যাপারে আমি কঠিন আঘাত পাইলাম; স্পেনের বিয়োগান্তক ঘটনায় আমি ব্যক্তিগতভাবে বিষণ্ন হইলাম। বৎসরের পর বৎসর এই সকল বিভীষিকা এবং এক প্রলয়ঙ্কর সম্ভাবনার আভাস আমাকে অভিভূত করিল এবং জগতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপর আমার বিশ্বাস স্তিমিত হইয়া গেল।

প্রলয়ের দিন আসিয়া পড়িল। ইউরোপের আগ্নেয়গিরিগুলি হইতে অগ্নি ও ধ্বংস উদ্গীরিত হইতে লাগিল এবং এখানে, ভারতে আমি আর একটি আগ্নেয়-গিরির পার্শ্বে বসিয়া, জানি না ইহা কখন ফাটিয়া পড়িবে। বর্তমানের সমস্যা-গুলি হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, অতীত ঘটনাবলীর মধ্যে ফিরিয়া গিয়া, গত পাঁচ বৎসরের ঘটনাবলী শান্তভাবে লেখা কঠিন। যদি আমি তাহা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাকে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হইত, কেননা অনেক কিছুই লিখিবার আছে। অতএব আমি সংক্ষেপে কতকগুলি ঘটনা ও তাহার বিস্তার সম্পর্কে সাধ্যমত আলোচনা করিব, যেগুলির সহিত আমি জড়িত বা যাহা আমাকে প্রভাবিত করিয়াছে।

১৯৩৬-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী লোজানে আমার পত্নীর মৃত্যুর সময় আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে সংবাদ পাইলাম, আমি দ্বিতীয়বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছি। শীঘ্রই আমি বিমান যোগে ভারতে ফিরিয়া আসিলাম এবং পথে রোমে আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইল। আমার যাত্রার কয়েকদিন পূর্বে আমাকে সংবাদ দেওয়া হইল যে আমি রোম অতিক্রম করিবার কালে সেনর মুসোলিনী আমার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ফাসিস্ত রাজত্বের প্রতি আমার তীব্র অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ভাবে সেনর মুসোলিনীর সহিত দেখা করিতে আমার আগ্রহই ছিল। যে মানুষটি জগতের ঘটনাবলীতে এক প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন তিনি কেমন মানুষ তাহা জানিবার আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু তখন দেখাসাক্ষাৎ করিবার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। তখন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ চলিতেছিল ইহাও আমার দেখাসাক্ষাতের পক্ষে অধিকতর অন্তরায়স্বরূপ এবং আমার সন্দেহ হইল এরূপ সাক্ষাৎকার অনিবার্যরূপেই ফাসিস্ত প্রচারকার্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে। আমার পক্ষ হইতে কোন প্রকার অস্বীকৃতিও এক্ষেত্রে মূল্যহীন। আমার মনে আছে, ১৯৩১ সালে গান্ধিজী যখন রোম হইয়া ফিরিতেছিলেন, তখন 'জিওরনাল দ' ইতালিয়া' একটি ভুয়া সাক্ষাৎকারের সহিত তাঁহাকে জড়িত করে। এরূপ আরও কতকগুলি দৃষ্টান্ত আমার মনে আছে। ইতালী পরিদর্শনকারী অনেক ভারতীয়কে তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফাসিস্ত প্রচারকার্যে ব্যবহার করা হইয়াছে। আমাকে আশ্বাস দেওয়া হইল যে, আমার সম্পর্কে ঐরূপ কিছু ঘটিবে না এবং আমাদের সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণরূপে গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। তথাপি আমি ইহা এড়াইবার সিদ্ধান্তই করিলাম এবং তাহা দুঃখ প্রকাশ করিয়া সেনর মুসোলিনীকে জানাইলাম।

রোমের মধ্য দিয়া যাওয়া পরিহার করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা, আমি যে ডাচ বিমানের যাত্রী তাহা একরাত্রি সেখানে বিশ্রাম করিবে। আমি রোমে

উপস্থিত হইবামাত্র একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন এবং সেই সন্ধ্যায় সেনর মুসোলিনীর সহিত দেখা করিবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণপত্র দিলেন। তিনি বলিলেন যে ইহা পূর্ব হইতেই স্থির হইয়াছে। আমি বিস্মিত হইলাম এবং বলিলাম যে আমি পূর্বেই অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছি। সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমরা উভয়ে প্রায় এক ঘণ্টা তর্কবিতর্ক করিলাম এবং তারপর আমি অব্যাহতি পাইলাম। কোন সাক্ষাৎকার হইল না।

আমি ভারতে ফিরিয়া আসিয়া আমার কর্মের মধ্যে ডুবিয়া গেলাম। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিন পরেই আমাকে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিতে হইল। কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি প্রধানত কারাগারেই দিন কাটাইয়াছি, বাহিরের ঘটনাবলীর সহিত আমার যোগ ছিল না। আমি অনেক পরিবর্তন দেখিলাম, নূতন দলানুগত্য এবং কংগ্রেসের মধ্যে দলগত ভেদ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সর্বত্র সন্দেহ, তিক্ততা এবং সঙ্ঘর্ষের আবহাওয়া। আমি ইহা লঘুভাবে গ্রহণ করিলাম; এই অবস্থার সম্মুখীন হইবার মত আত্মশক্তির উপর আমার বিশ্বাস ছিল। কিছুকালের জন্য মনে হইল আমি আমার অভিপ্রায় মত কংগ্রেসকে পরিচালনা করিতে পারিব। কিন্তু অবিলম্বেই আমি বুঝিতে পারিলাম যে সঙ্ঘর্ষের মূল গভীর এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং কংগ্রেসপন্থীদের মধ্যে তিক্ততা দূর করা সহজ নহে। আমি সভাপতির পদ ত্যাগ করিবার জন্য উন্মুখ হইলাম কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম তাহাতে অবস্থার আরও অবনতি হইবে, আমি আত্মসংবরণ করিলাম।

আগামী কয়েক মাস ধরিয়া আমি বারংবার পদত্যাগের প্রশ্নটি বিবেচনা করিতে লাগিলাম। আমি দেখিলাম, কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে আমার সহকর্মীদের সহিত সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়া কঠিন এবং ইহাও দেখিলাম যে তাঁহারা আমার কার্যকলাপ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। কোন বিশেষ কাজে তাঁহারা যে আপত্তি করিয়াছিলেন এরূপ নহে, কাজের সাধারণ ধারা ও নির্দেশগুলি তাঁহারা অপছন্দ করিতেন; যেহেতু আমার দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র সেই কারণে তাঁহাদের আপত্তির কিছু যৌক্তিকতা ছিল। আমি সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেস সিদ্ধান্তগুলির অনুগত হইয়াও উহার কতকগুলি দিকের উপর বেশী জোর দিতাম, পক্ষান্তরে আমার সহকর্মীরা অন্যান্য বিষয়ের উপর জোর দিতেন। অবশেষে আমি পদ-ত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম এবং তাহা গান্ধিজীকে জানাইয়া দিলাম। তাঁহার নিকট লিখিত পত্রে অন্যান্য বিষয়ের সহিত আমি লিখিলাম যে, "আমার ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতে আমি দেখিতেছি কার্যকরী সমিতির সভায় আমি অতিমাত্রায় ক্লান্ত হইয়া পড়ি; আমাকে উহা নিস্তেজ করিয়া ফেলে এবং প্রত্যেক নূতন অভিজ্ঞতার পর আমার মনে হয় যে আমার বয়স কয়েক বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। আমার সহকর্মীদের মনোভাবও যদি ঐরূপ হয় তবে আমি বিস্মিত হইব না। ইহা এক অস্বাস্থ্যকর অভিজ্ঞতা এবং সার্থকতার সহিত কাজ করিবার বিঘ্নস্বরূপ।"

কিছুকাল পরেই ভারতবর্ষের সহিত বিচ্ছিন্ন এক দূরবর্তী ঘটনা আমাকে অভিভূত করিল এবং আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলাম। ইহা স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহের সংবাদ। এই অভ্যুত্থানের পশ্চাতে আমি দেখিলাম, জার্মানী ও ইতালীর সাহায্য, যাহা পরিণতির মুখে ইউরোপব্যাপী এমন কি বিশ্ব-সংঘর্ষে পরিণত হইতে পারে। ভারত বাধ্য হইয়াই এই আবর্তের মধ্যে গিয়া পড়িবে এবং আমি আমাদের প্রতিষ্ঠানকে বিচ্ছেদে দুর্বল করিতে

পারি না এবং পদত্যাগ করিয়া আভ্যন্তরীণ সঙ্কট সৃষ্টি করিতেও পারি না। এখন আমাদের সকলে একত্রিত হইয়া থাকাই বড় কথা। অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমি সম্পূর্ণরূপে ভুল করি নাই; তবে আমি ঘটনা ঘটিবার পূর্বেই দ্রুত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, যাহা কয়েক বৎসর পরে কার্যে পরিণত হইয়াছিল।

স্পেনীয় যুদ্ধে আমার মনের উপর প্রতিক্রিয়া হইতে বুঝা যাইবে যে, আমি সর্বদাই ভারতের সমস্যাগুলিকে বিশ্ব-সমস্যার সহিত যুক্ত করিয়া দেখি। চীন, আবিসিনিয়া, স্পেন, মধ্য ইউরোপ, ভারত বা অন্যস্থানের পৃথক সমস্যাগুলি আমি যতই চিন্তা করি, এগুলি এক এবং অভিন্ন বিশ্বসমস্যা রূপেই আমার নিকট প্রতিভাত হয়। মূল সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্যাগুলির কোনটারই চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে না। কিন্তু সম্ভবতঃ কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হইবার পূর্বেই আলোড়ন ও সর্বনাশ দেখা দিবে। বলা হইয়া থাকে বর্তমান জগতে শান্তি অবিভাজ্য, সেইরূপ স্বাধীনতাও অখণ্ড; এক অংশ স্বাধীন অপর অংশ অধীন এইভাবে জগৎ চলিতে পারে না। ফাসিজম, নাৎসীবাদের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদেরই স্পর্ধিত অভিযান। ইহারা যমজ ভ্রাতা, পার্থক্য এই, সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ এবং অধীন দেশসমূহে রাজত্ব করে, আর ফাসিবাদ ও নাৎসীবাদ স্বদেশে ঐ ব্যবস্থাই চালায়। যদি জগতে স্বাধীনতাই প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে ফাসিস্ত নাৎসীবাদের অবসান ঘটাইলেই চলিবে না, সাম্রাজ্যবাদকেও বিলুপ্ত করিতে হইবে।

বৈদেশিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া কেবল আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না। কতকাংশে ভারতে অন্যান্য অনেকে এইভাবেই চিন্তা করিতে লাগিল এবং এমন কি জনসাধারণও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। চীন, আবিসিনিয়া, প্যালেস্টাইন এবং স্পেনের জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য কংগ্রেস কর্তৃক অনুষ্ঠিত সহস্র সহস্র সভা ও শোভাযাত্রা জনসাধারণের আগ্রহকে উদ্দীপ্ত রাখিল। চীনে ও স্পেনে খাদ্য ও ঔষধ পাঠাইবার জন্য আমরা কিছু চেষ্টা করিলাম। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এই উদার আগ্রহ আমাদের জাতীয় সংঘর্ষকে উচ্চতর স্তরে লইয়া গেল এবং জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক লক্ষণ সঙ্কীর্ণতা কতকাংশে শিথিল হইল।

কিন্তু অনিবার্যরূপেই, বৈদেশিক ঘটনাগুলি সাধারণ মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে না, সে তাহার নিজের বিঘ্ন বিপদের মধ্যেই ডুবিয়া থাকে। কৃষকদের দুঃখ বাড়িতে লাগিল, তাহার শোচনীয় দারিদ্র্য এবং বহুতর দুর্বহ ভারে সে পিষ্ট। যাহা হউক, কৃষক-জীবনের সমস্যাই ভারতের মুখ্য সমস্যা এবং কংগ্রেস ক্রমে কৃষকদের উন্নতির জন্য যে কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বহুলাংশে অগ্রগতি হইলেও বর্তমান কাঠামোকে সে গ্রহণ করিয়াছিল। কলকারখানার শ্রমিকদের অবস্থা কিছু ভাল হইলেও, সেখানে ধর্মঘট লাগিয়াই আছে। বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারতের উপর যে নয়া শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিয়াছে, তাহা লইয়া রাজনীতি-ঘেঁষা ব্যক্তিরা আলোচনা করেন। এই শাসনতন্ত্রে প্রদেশগুলিকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইল কিন্তু আসল ক্ষমতা বৃটিশ-গভর্ণমেন্ট এবং তাহাদের প্রতিনিধিদের হাতেই রহিল। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে সামন্ততান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী রাজ্যগুলিকে অর্ধ-গণতান্ত্রিক প্রদেশগুলির সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল এবং ইহার উদ্দেশ্য হইল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঠাট বজায় রাখা। ইহা এক অসম্ভব ব্যাপার, ইহা কখনও কার্যকরী হইতে পারে না এবং ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য মানুষের বুদ্ধি যত রকম কল্পনা করিতে পারে সে সমস্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা

হইল। এই শাসনতন্ত্র কংগ্রেস ক্ষোভের সহিত প্রত্যাখ্যান করিল, কার্যতঃ ভারতে ইহার গুণগান করিবার মত একজন লোকও মিলিল না।

প্রথমতঃ শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য করা সত্ত্বেও আমরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলাম। ইহা দ্বারা আমরা লক্ষ লক্ষ ভোটার এবং অন্যান্য সকলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে পারিব। আমি নিজে নির্বাচন প্রার্থী ছিলাম না, আমি কংগ্রেসী প্রার্থীদের অনুকূলে সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম এবং আমার ধারণা এই নির্বাচন-ব্যাপারে আমি একপ্রকার 'রেকর্ড' সৃষ্টি করিয়াছি। চার মাস কালে আমি প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছি, সকল রকম যান-বাহন ব্যবহার করিয়াছি এবং এমন দূরতর পল্লী অঞ্চলে গিয়াছি, যেখানে যানবাহনের প্রায় কোন ব্যবস্থাই নাই। এরোপ্লেন, রেলওয়ে, মোটরগাড়ী, লরী, বিভিন্ন প্রকারের ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, বাইসাইকেল, হাতী, উট, ঘোড়া, স্টীমার, নৌকা এবং পদব্রজে আমি ভ্রমণ করিয়াছি।

আমি মাইক্রোফোন ও লাউড্-স্পীকার সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম, দিনে দশ বারটা সভায় বক্তৃতা করিতে হইত, পথের ধারে সমবেত জনতাকেও কিছু বলিতে হইত। স্থানে স্থানে বিশাল সভায় লক্ষ লোকের সমাবেশ হইত, গড়ে বিশ হাজার লোক প্রত্যেক সভাতেই উপস্থিত থাকিত। প্রত্যহ সভাগুলির সমবেত লোকসংখ্যা এক লক্ষের মত হইত, কখনও বা এই সংখ্যা ছাড়াইয়া যাইত। মোটামুটি হিসাবে সভাগুলিতে এক কোটি লোক আমার বক্তৃতা শুনিয়াছে এবং পথে পথে আমার ভ্রমণকালে সম্ভবতঃ আরও লক্ষ লক্ষ লোক আমার সংস্পর্শে আসিয়াছে।

ভারতের উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত স্থান হইতে স্থানান্তরে আমি দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিয়াছি; বিশ্রামের অবকাশ অল্প, মুহূর্তের উত্তেজনা ও আমার চারিদিকে বিপুল উৎসাহ-উত্তেজনায় মগ্ন থাকিতাম। শারীরিক সহন-শীলতার অসাধারণ দৃষ্টান্তে আমি চমৎকৃত হইলাম। এই নির্বাচন উপলক্ষ্যে বহু লোক আমাদের পক্ষে প্রচারকার্যে যোগ দিয়াছিলেন এবং দেশব্যাপী উৎসাহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সর্বত্র এক নবজীবনের সঞ্চার প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। নির্বাচনী প্রচারকার্য ছাড়াও ইহা আমাদের নিকট আরো কিছু বেশী ছিল। তিন লক্ষ ভোটার ছাড়াও ভোটাধিকারহীন লক্ষ কোটি নরনারী ছিল আমাদের লক্ষ্য।

এই ব্যাপকতর ভ্রমণের আর একটা দিক আমাকে বড় বেশী আকর্ষণ করিল। আমার পক্ষে ইহা ভারতবর্ষ এবং তাহার জনগণকে আবিষ্কার করিবার পরিব্রাজক-ব্রত। মহার্ঘ বৈচিত্র্যে ভরা আমার স্বদেশের শত সহস্র রূপ দেখিলাম, তথাপি ভারতীয় ঐক্যের ছাপ সর্বত্র সুস্পষ্ট। আমার প্রতি লক্ষ লক্ষ প্রীতি-প্রসন্ন বিস্ফারিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া আমি উহার অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। ভারতবর্ষকে আমি যতই দেখি, ততই মনে হয়, ইহার অনন্ত সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের আমি কতটুকুই বা জানি, আবিষ্কার করিবার মত আরও কত কিছুই না আছে। মনে হয় তিনি (ভারত) প্রায়ই আমার দিকে চাহিয়া হাসা করেন, কখনো আমাকে বিদ্রূপ করেন; কখনও মোহিনী মায়ায় আকর্ষণ করেন।

যদিও সুযোগ বিরল, তথাপি উহার মধ্যে একদিনের জন্য অবকাশ লইয়া কতকগুলি নিকটস্থ বিখ্যাত স্থান দেখিয়াছি—অজন্তার গুহাগুলি এবং সিন্ধু উপত্যকার মোহেঞ্জো-দারো। কয়দিনের জন্য আমি অতীতের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম, বোধিসত্ত্ব এবং অজন্তার গুহাগাত্রে চিত্রিত সুন্দরী নারীরা আমার মন জুড়িয়া

তুলিল। কয়েকদিন পর কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত এবং পল্লীর কূপ হইতে জল তুলিতেছে, এমন কয়েকজন নারীকে দেখিয়া আমার অজন্তার নারীদের কথা মনে পড়িল, আমার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হইল এবং প্রদেশগুলিতে আমাদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা উচিত হইবে কিনা, এই তর্ক তুমুল হইয়া উঠিল। বড়লাট কিম্বা গভর্ণরেরা হস্তক্ষেপ করিবেন না, এই বোঝাপড়ার সর্তে আমরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হইলাম।

১৯৩৭-এর গ্রীষ্মকালে আমি বার্মা ও মালয় ভ্রমণে গেলাম। এখানেও ছুটি নাই, বিশাল জনতা এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান সর্বত্রই আমার পিছনে চলিল। তথাপি এই পরিবর্তন আনন্দদায়ক, বার্মার পুষ্প-পেলব তারুণ্যে উচ্ছলিত মানুষগুলির দর্শন ও সঙ্গ আমার ভাল লাগিল, অবয়বে প্রাচীনকালের চিহ্ন অঙ্কিত ভারতবাসী হইতে ইহারা নানা দিক দিয়া কত পৃথক!

ভারতে আমাদের সম্মুখে নূতন সমস্যাগুলি দেখা দিল। অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইল এবং অধিকাংশ মন্ত্রীই ইতি-পূর্বে দীর্ঘকাল কারাগারে কাটাইয়াছেন। আমার ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত যুক্ত-প্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী হইলেন—ইনিই ভারতে প্রথম মহিলা মন্ত্রী। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল প্রতিষ্ঠা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সর্বত্র একটা স্বস্তির ভাব দেখা দিল, যেন এক বৃহৎ ভার নামিয়া গিয়াছে। সমগ্র দেশে এক নবজীবনের সঞ্চার হইল এবং কৃষক ও শ্রমিকেরা অবিলম্বে একটা বৃহৎ পরিবর্তন প্রত্যাশা করিতে লাগিল। রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তিলাভ করিল এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার সীমা বহুল পরিমাণে প্রসারিত হইল, যাহা পূর্বে কখনো ছিল না। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা কঠিন পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, অপরকেও অনুরূপভাবে খাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে গভর্ণমেণ্টের প্রাচীন যন্ত্র লইয়াই কাজ করিতে হইল এবং ইহা যে কেবল বিদেশী তাহা নহে, প্রায়শঃই শত্রুভাবাপন্ন। এমন কি উচ্চ কর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। দুইবার গভর্ণরের সহিত মতভেদের ফলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতে চাহিলেন। গভর্ণর মন্ত্রীদের মত মানিয়া লইয়া সঙ্কট এড়াইলেন। কিন্তু প্রাচীন সরকারী বিভাগগুলির—সিভিল সার্ভিস, পুলিশ ও অন্যান্য—গভর্ণরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শাসনতন্ত্রের রক্ষাকবচের বলে—শক্তি ও প্রভাব প্রচুর এবং বহুতর উপায়ে তাহারা তাহা অনুভব করাইতে পারে। উন্নতি অতি মন্থর হইল এবং অসন্তোষ দেখা দিল।

এই অসন্তোষ কংগ্রেসের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল এবং অধিকতর প্রগতিশীল অংশ অধীর হইয়া উঠিলেন। ঘটনার গতি দেখিয়া আমিও অসুখী বোধ করিতে লাগিলাম এবং আমি লক্ষ্য করিলাম, আমাদের উৎকৃষ্ট সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান ক্রমে একটি নির্বাচন পরিচালনা যন্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মনে হইল, স্বাধীনতার সংঘর্ষ অনিবার্য এবং এই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেস মন্ত্রীদের কার্য সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া আমি গান্ধিজীর নিকট এক পত্র দিলাম। "তাঁহারা পুরাতন ব্যবস্থার সহিত নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করিতেছেন এবং তাহা সমর্থন করিয়া যুক্তিও দিতেছেন। মন্দ হইলেও এ সমস্ত হয়তো সহ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিকতর মন্দ এই যে বহু পরিশ্রমে জনসাধারণের হৃদয়ে আমরা যে উচ্চ আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, আমরা তাহা হারাইতে বসিয়াছি। আমরা অতি সাধারণ রাজনৈতিকের পর্যায়ে নামিয়া যাইতেছি।"

হয়তো আমি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের উপর অকারণে কঠোর হইয়াছিলাম; পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সাধারণভাবে দেশের অবস্থাই হয়তো এই ত্রুটির জন্য দায়ী। জাতীয় কর্মধারার বহুক্ষেত্রে মন্ত্রীরা অনেক বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের কতক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কাজ করিতে হইত এবং আমাদের সমস্যাগুলি এই সীমা অতিক্রম করিবারই নির্দেশ দেয়। তাঁহারা যে সমস্ত ভাল কাজ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কৃষকদের দুঃখ কতকাংশে লাঘব করিবার জন্য আইন প্রণয়ন এবং বনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তন। বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল, দেশের শিশুদিগকে ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স, এই সাত বৎসর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা। ইহার লক্ষ্য হইল কোন কারিগরী শিল্পের সহিত আধুনিক প্রথায় শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষার উৎকর্ষ খর্ব না করিয়াও, শিক্ষার ব্যয়ভূষণ বহুলাংশে কমাইয়া ফেলা। ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশে লক্ষ লক্ষ শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থায়, খরচের কথাটা মুখ্য প্রশ্ন। এই ব্যবস্থার ভারতের শিক্ষা-নীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হইয়াছে এবং ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনেকখানি।

উচ্চ শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের উপর খুব বেশী জোর দেওয়া হইল; কিন্তু পদত্যাগ করিবার পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টগুলির উদ্যম খুব বেশী ফলপ্রসূ হয় নাই। যাহা হউক প্রাপ্তবয়স্কদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা উৎসাহের সহিত অনুসৃত হইয়াছিল এবং ভাল ফলও পাওয়া গিয়াছিল। পল্লীর পুনর্গঠনের উপরও বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল।

কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টগুলির কাজের তালিকা সামান্য নহে কিন্তু এই সকল ভাল কাজ ভারতের মূল সমস্যা সমাধান করিতে পারে না। উহার জন্য আরও গভীর এবং মূলগত পরিবর্তন আবশ্যক; সকলশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের রক্ষক সাম্রাজ্য-বাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।

অতএব কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ধীরপন্থী ও অধিকতর প্রগতিপন্থীদের বিরোধ বাড়িতে লাগিল। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির সভায় এই বিরোধ সঙ্ঘবদ্ধভাবে অভিব্যক্ত হইল। ইহাতে গান্ধিজী নিরতিশয় উদ্বেগ বোধ করিলেন এবং তিনি ঘরোয়াভাবে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। পরে তিনি এক প্রবন্ধে লিখিলেন যে, কংগ্রেসের সভাপতিরূপে আমার কতিপয় কার্য তিনি অনুমোদন করেন না।

আমি অনুভব করিলাম, কার্যকরী সমিতির সদস্যের দায়িত্ব লইয়া কাজ করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নহে; কিন্তু আমি স্থির করিলাম যে কোন সঙ্কট সৃষ্টি করা সমীচীন হইবে না। আমার কংগ্রেসের সভাপতির কার্যকালও শেষ হইয়া আসিল এবং আমি নিঃশব্দেই সরিয়া যাইব। পর পর দুই বৎসর আমি সভাপতি আছি এবং তিনবার আমি সভাপতি হইয়াছি। আমাকে আর একবার সভাপতি নির্বাচন করিবার কথা উঠিল, কিন্তু আমি পুনরায় প্রার্থী হইব না এ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় ছিলাম। এই সময় আমি এক চাতুরী দেখাইয়া নিজেই কৌতুক অনুভব করিলাম। আমার লেখা একটা প্রবন্ধ বেনামীতে কলিকাতার "মডার্ণ রিভিয়ু" পত্রিকায় প্রকাশিত হইল; তাহাতে আমি আমার পুনর্নির্বাচনের প্রতিবাদ করিলাম। কেহ এমন কি স্বয়ং সম্পাদকও জানিতেন না যে লেখক কে এবং আমি আমার সহকর্মী ও অন্যান্যের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। প্রবন্ধের লেখক কে, তাহা লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা চলিল, কিন্তু জন গান্থার তাঁহার "ইনসাইড এশিয়া" গ্রন্থে না লেখা পর্যন্ত অতি অল্প

লোকই সত্য কথা জানিত।

পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষ বসু সভাপতি নির্বাচিত হইলেন এবং হরিপুরায় উহা অনুষ্ঠিত হইল এবং ইহার পরেই আমি ইউরোপ যাত্রার সংকল্প করিলাম। আমার কন্যার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আমার ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত মনকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা।

কিন্তু শান্তভাবে চিন্তা করা বা মনের অন্ধকার কোণগুলি আলোকিত করিয়া তুলিবার স্থান ইউরোপ নহে। এখানে বিষাদের কৃষ্ণচ্ছায়া এবং আসন্ন ঝটিকার পূর্বের নিস্তব্ধতা। ইহা ১৯৩৮ সালের ইউরোপ; মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের তোষণনীতি পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে, বলদর্পিত পদক্ষেপে বিভিন্ন জাতির দেহের উপর দিয়া—কেহ কৃতঘ্নতায় পরিত্যক্ত, কেহ পদদলিত—সর্বশেষ পরিণতি মিউনিকের অভিমুখে। এই সংঘর্ষভরা ইউরোপে আমি বিমানযোগে বার্সিলোনায় উপনীত হইলাম। এখানে আমি পাঁচ দিন থাকিয়া প্রতি রাত্রিতে বোমাবর্ষণ লক্ষ্য করিলাম। এখানে আরও অনেক কিছু দেখিলাম, যাহা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিল; এই অভাব ও ধ্বংসের মধ্যে, ঘনায়মান মহা সর্বনাশের মধ্যে, ইউরোপের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা আমি মনের মধ্যে অধিকতর শান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। এখানে আলোক আছে, সাহস ও দৃঢ়সংকল্পের আলোক এবং কাজের মত কাজ করিবার আগ্রহ।

আমি ইংলণ্ডে গিয়া একমাস কাটাইলাম এবং এখানে নানা মতের নানা শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ হইল। সাধারণ লোকের মধ্যে আমি পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম এবং ইহা ভালর দিকে বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু উপরের দিকে কোন পরিবর্তন নাই, যেখানে চেম্বারলেন-বাদ বিজয়মহিমায় উপবিষ্ট। ইহার পর আমি চেকোশ্লোভাকিয়ায় গেলাম এবং নিকট হইতে দেখিলাম, উচ্চতম নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইবার ভান করিয়া যে আদর্শ তোমরা সমর্থন কর, তাহার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি কৃতঘ্নতার কঠিন ও জটিল চাতুরীর খেলা। লণ্ডন, পারী ও জেনেভা হইতে মিউনিক সংকটে এই খেলার গতি লক্ষ্য করিলাম এবং আমার মনে বহুপ্রকার বিচিত্র সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইল। সংকটের মুহূর্তে তথাকথিত প্রগতিশীল মানুষ ও দলগুলির শোচনীয় ধরাশায়ী অবস্থা দেখিয়া আমি অতি-মাত্রায় চমৎকৃত হইলাম। জেনেভা আমার মনে প্রাচীনকালের ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষের স্মৃতি জাগ্রত করিল। শত শত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মৃত-দেহগুলি তাহাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়গুলিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যুদ্ধের ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে, অতএব আর কিছু ভাবিবার দরকার নাই, লণ্ডনে এই মনোভাব অতিমাত্রায় প্রবল। মূল্য যখন অপরে দিল, তখন আমাদের কি আসে যায়, কিন্তু এক বৎসর না শেষ হইতেই দেখা গেল, কতখানি আসে যায়। মিঃ চেম্বারলেন ঊর্ধ্বে উঠিতেছেন, কিন্তু প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরও শুনা যাইত। পারী দেখিয়া, বিশেষভাবে এখানকার মধ্য শ্রেণীকে দেখিয়া আমি ব্যথিত হইলাম, ইহারা বিশেষ কোন প্রতিবাদও করে না। ইহাই বিপ্লবের জন্মভূমি পারী; সমস্ত জগতের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার প্রতীক!

বহু কল্পিত ধারণা মন হইতে দূর হইয়া গেল, আমি বিষণ্ণ হৃদয়ে ইউরোপ হইতে ফিরিলাম। ফিরিবার পথে আমি মিশরে আসিলাম, এখানে ওয়াফদ দলের নেতারা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদের সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া আমি আনন্দিত হইলাম এবং বর্তমান জগতের দ্রুত পরিবর্তিত ঘটনার আলোকে আমাদের সাধারণ সমস্যাগুলি আলোচনা করিলাম। কয়েকমাস

পর, ওয়াফদ দলের পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি ভারতে আসিয়াছিলেন এবং আমাদের কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন।

ভারতে পুরাতন সমস্যা ও দ্বন্দ্বগুলি একইভাবে চলিতেছিল এবং আমি আমার সহকর্মীদের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের পুরাতন বিঘ্নের সম্মুখীন হইলাম। আমি দেখিয়া ব্যথিত হইলাম, জগদ্ব্যাপী বিপর্যয়ের পূর্বমুহূর্তে অনেক কংগ্রেস-পন্থী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত রহিয়াছেন। অবশ্য কংগ্রেসের মধ্যে উপরের দিকের কংগ্রেসপন্থীদের কতকাংশে মাত্রাজ্ঞান ও পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়ার ভাব ছিল। কংগ্রেসের বাহিরে অবস্থার অবনতি অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ। সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা ও মন কষাকষি বাড়িয়া চলিয়াছে। হিংস্রভাবে জাতীয়তাবাদবিরোধী এবং সঙ্কীর্ণমনা মুসলিম লীগ মিঃ এম. এ. জিন্নার নেতৃত্বে এক বিস্ময়কর পথে চলিতে লাগিল। এখানে কোন গঠনমূলক প্রস্তাব নাই, মাঝামাঝি রক্ষা করিবার কোন আগ্রহ নাই; আসলে তাঁহারা কি চাহেন, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবর্ধিত অভ্যুদয় আমাদের জাতীয় জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিল, তাহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অবশ্য বহু মুসলিম প্রতিষ্ঠান এবং বহু মুসলমান মুসলিম লীগের কার্যধারা অনুমোদন করিতেন না এবং তাঁহাদের সহানুভূতি কংগ্রেসের দিকেই ছিল।

এই ধারায় চলিতে চলিতে মুসলিম লীগ অধিকতর বিপথগামী হইল এবং অবশেষে ইহা ভারতে গণ-তন্ত্রের প্রকাশ্য বিরোধিতা করিতে লাগিল, এমন কি দেশবিভাগ দাবী করিয়া বসিল। ব্রিটিশ-শাসকেরা এই সকল দাবীর পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তিগুলিকে দিয়া কংগ্রেসের প্রভাব খর্ব করা। কোন জাতি-সঙ্ঘের মণ্ডলীভুক্ত না হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির জগতে কোন স্থান থাকিবে না, যখন এই সত্য প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, সেই সময় ভারত বিভক্ত করার দাবী অতি বিস্ময়কর। সম্ভবতঃ এই দাবীর পশ্চাতে কোন আন্তরিকতা নাই, কিন্তু মিঃ জিন্না প্রচারিত দুইজাতি-তত্ত্বের ইহাই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি, সাম্প্রদায়িকতা-বাদের এই নূতন পরিণতির সহিত ধর্মভেদের সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। ইহার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করা যাইতে পারে। আসলে ইহা দুইটি পক্ষের রাজনৈতিক সংঘর্ষ; একপক্ষ চাহে স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ গণ-তান্ত্রিক ভারত, অপরদিকে প্রতিক্রিয়া-শীল ও সামন্ততান্ত্রিক অংশ, ধর্মের মুখোশ পরিয়া তাহাদের বিশেষ স্বার্থগুলি রক্ষা করিতে চাহে। বিভিন্ন মতবাদের সমর্থকদের এই ভাবে ধর্মকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা আমার নিকট অভিশাপ বলিয়াই মনে হয় এবং ইহা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ। যে ধর্মকে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ভ্রাতৃভাবের উৎসাহদাতা বলা হয়, তাহাই ঘৃণার উৎস, সঙ্কীর্ণতা, নীচতা এবং নিকৃষ্টতম বিষয়াসক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

১৯৩৯ সালের প্রথমভাগে সভাপতি নির্বাচন লইয়া কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যক্রমে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রার্থী হইতে অস্বীকার করিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সুভাষচন্দ্র বসু জয়ী হইলেন। ইহার ফলে নানাপ্রকার জটিলতা ও অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল যাহা কয়েকমাস ধরিয়া চলিয়াছিল। ত্রিপুরী কংগ্রেসে কতকগুলি অশোভনীয় ব্যাপার ঘটিল। এই সময় আমি অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিলাম, কাজ করিতে গেলেই ভাঙিয়া পড়িব বলিয়া আশঙ্কা হইত। রাজনৈতিক ঘটনাবলী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপার-গুলি নিশ্চয়ই আমাকে নাড়া দিত, কিন্তু বন্ধু কমরেডদের সহিত [illegible]

কাজের কোন সম্পর্ক ছিল না। আমি নিজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলাম এবং সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধে লিখিলাম, “আমি তাহাদিগকে (সহকর্মীদের) অল্পই সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছি, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই, কেন না, আমি নিজের প্রতি তাহাপেক্ষাও কম সুবিচার করিয়াছি। এমন বস্তু লইয়া নেতৃত্ব করা চলে না, এই কথাটা আমার সহকর্মীরা যত শীঘ্র বুঝিতে পারেন, ততই তাঁহাদের ও আমার পক্ষে কল্যাণ। মন যোগ্যতার সহিত কাজ করে, বুদ্ধিও অভ্যাসের মধ্য দিয়া সুনিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু যে উৎস হইতে কর্মের মধ্যে প্রাণ ও জীবনী-শক্তির প্রেরণা আসে, মনে হয় তাহাই শুকাইয়া গিয়াছে।”

সুভাষ বসু সভাপতির পদত্যাগ করিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করিলেন, উদ্দেশ্য হইল কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানরূপে উহাকে গড়িয়া তোলা, কিছুদিন পর ইহা স্বাভাবিক কারণে ভাঙিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু ইহা বিভেদসৃষ্টির প্রবণতা ও সাধারণ অবনতির সহায়ক হইল। উচ্চাঙ্গের বুলি আওড়াইয়া ভাগ্যান্বেষী ও সুবিধাবাদীরা জনসভায় আসিতে লাগিল এবং জার্মানীতে নাৎসীদলের কথা অনিবার্যরূপেই আমার মনে পড়িতে লাগিল। তাহারা এক কার্যক্রমের ভিত্তিতে জনসাধারণের সমর্থন সংগ্রহ করিত, পরে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিত।

আমি ইচ্ছা করিয়াই কংগ্রেসের নূতন কার্যকরী সমিতি হইতে বাহিরে রহিলাম। আমি ভাবিলাম উহার মধ্যে আমি বেমানান হইব এবং এমন অনেক কিছু করা হইয়াছে, যাহা আমার ভাল লাগে নাই। রাজকোটের ব্যাপার লইয়া গান্ধিজীর অনশন এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাগুলিতে আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলাম। তখন আমি লিখিয়াছিলাম,—“রাজকোটের ঘটনাগুলির পর একটা অসহায় মনোভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। যেখানে আমি বুঝি না, সেখানে আমি কাজ করিতে পারি না এবং যাহা কিছু ঘটিল তাহার যৌক্তিকতা আমি উপলব্ধি করিতে পারি না।” আমি আরও লিখিলাম, “কোন একটি বাছিয়া লওয়া আমাদের অনেকের পক্ষেই কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে এবং ইহা দক্ষিণ কি বাম, এমন কি কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কথাও নহে। সিদ্ধান্তগুলি নির্বিচারে মানিয়া লইতে হইবে, প্রায়শঃই ঐগুলি স্ববিরোধী এবং উহার কোন যুক্তিসঙ্গত পরিণতি নাই, বিরোধিতা নাই অথবা নিষ্ক্রিয়তা নাই। ইহার কোন একটা ধারাই সহজে স্বীকার করা যায় না, বুঝিতে না পারিয়াও নির্বিচারে গ্রহণ করা অথবা স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হওয়ার অর্থ মানসিক মেদরোগ অথবা পক্ষাঘাত সৃষ্টি করা। ইহার ভিত্তিতে কোন বৃহৎ আন্দোলন চলিতে পারে না, গণতান্ত্রিক আন্দোলন তো নহেই। যেখানে বিরুদ্ধতার অর্থ নিজেদের দুর্বল করা এবং বিরুদ্ধপক্ষকে সাহায্য করা, সেখানে উহা কত কঠিন। যখন চারিদিক হইতে কাজের আহ্বান আসিতেছে, তখন নিষ্ক্রিয়তা হইতে নৈরাশ্য এবং নানাবিধ মনোবিকার সৃষ্টি হয়।”

১৯৩৮-এর শেষভাগে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুইটি ব্যাপারে আমি জড়িত হইলাম। লুধিয়ানায় নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্যের গণ-সম্মেলনে আমি সভাপতিত্ব করিলাম এবং ফলে অর্ধসামন্ততান্ত্রিক ভারতীয় রাজন্যদের প্রগতিশীল আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলাম। অধিকাংশ রাজ্যেই অসন্তোষ ক্রমে বাড়িতেছিল, মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষের সহিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংঘর্ষ হইত এবং এই সংঘর্ষে প্রায়ই ব্রিটিশ সৈন্যদল সাহায্য করিত। এই সকল রাজ্য সম্পর্কে অথবা রাজন্যদের এই নিদর্শনগুলি রক্ষার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট

যে খেলা খেলেন, সে সম্বন্ধে সংযত ভাষায় কিছু লেখা কঠিন, সম্প্রতি একজন লেখক সঙ্গতভাবেই বলিয়াছেন, এগুলি বৃটেনের পঞ্চমবাহিনী। কোন কোন আধুনিক শিক্ষিত রাজাও আছেন, যাঁহারা জনসাধারণের পক্ষ লইয়া ভালরকম শাসনসংস্কার প্রবর্তন করিতে চাহেন কিন্তু ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতা তাহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। কোন গণ-তান্ত্রিক রাজ্য পঞ্চমবাহিনীর কাজ করিতে পারে না।

এই প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্য রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে পরিচালিত হইতে পারে না, ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট সামন্ততান্ত্রিক ঘাঁটিরূপেও গণতান্ত্রিক ভারতে থাকিতে পারে না। কয়েকটি রাজ্য ম· একটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গণতান্ত্রিক অংশরূপে থাকিতে পারে, কিন্তু আধি·ত্যের আত্মবিলোপ অনিবার্য। কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কারে সমস্যার সমাধান হইবে না। এই দেশীয় রাজ্য প্রথার বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা বিলুপ্ত হইবে।

আমার অপর কাজ হইল জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির সভাপতিত্ব; ইহা কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির সহযোগিতায় গঠিত হইয়াছিল। আমরা কাজ আরম্ভ করার পর হইতেই ইহার পরিধি বাড়িতে লাগিল এবং ক্রমে জাতীয় জীবনের সমস্ত কর্মধারাকেই ইহা বেষ্টন করিল। বিভিন্ন বিভাগের জন্য আমরা ২৯টি সাব-কমিটি গঠন করিলাম—কৃষি, বস্ত্রশিল্প, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মূলধন—এবং এই সকল বিভিন্ন কর্মধারার সহিত যোগ-সূত্র স্থাপন করিয়া, ভারতের জন্য একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। আমাদের এই খসড়ায় এখন অবশ্য কেবল মূল প্রস্তাবগুলিই থাকিবে, পরে উহা বিশদ করিয়া লওয়া হইবে। এখনও পরিকল্পনা কমিটির কাজ চলিতেছে এবং শেষ হইতে আরও কয়েক মাস সময় লাগিবে। আমি এই কাজে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম এবং ইহা হইতে অনেক কিছুই শিখিয়াছি। অবশ্য একথা সত্য যে আমরা যে কোন পরিকল্পনাই প্রস্তুত করি না কেন, তাহা কেবলমাত্র স্বাধীন ভারতেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কোন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইলে অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমাজতান্ত্রিক করিতে হইবে, ইহাও সুস্পষ্ট।

১৯৩৯-এর গ্রীষ্মকালে আমি সিংহলে গেলাম; সেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের সহিত গভর্ণমেণ্টের মনোমালিন্য চলিতেছিল। এই সুন্দর দ্বীপে পুনরায় আসিয়া আমি হৃষ্ট হইলাম। আমার আগমনের ফলে, মনে হইল, ভারত ও সিংহলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত হইল। সিংহল গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণসহ সকলেই আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। ভবিষ্যতের ব্যবস্থায় সিংহল ও ভারত যে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হইবে সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। আমি যুক্তরাষ্ট্রের যে ভবিষ্যৎ চিত্র দেখি, তাহার মধ্যে চীন, ভারত, বর্মা, সিংহল, আফগানিস্থান এবং অন্যান্য দেশও রহিয়াছে। যদি বিশ্বরাষ্ট্র সম্ভব হয়, তাহাও কাম্য।

১৯৩৯-এর আগস্ট মাসে ইউরোপের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল, এই সঙ্কটের মধ্যে আমার ভারত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য চীনে যাইবার ইচ্ছা প্রবল ছিল। অতএব আমি বিমানযোগে চীনযাত্রা করিলাম এবং ভারত ত্যাগ করিবার দুইদিন পরেই চুংকিঙে উপস্থিত হইলাম। আসিবার পরেই, ইউরোপের সংগ্রামের সূচনা হইয়াছে সংবাদ পাইয়া আমি ভারতে ফিরিয়া

আসিলাম। স্বাধীন চীনে আমি প্রায় দুই সপ্তাহ ছিলাম, কিন্তু এই দুইটি সপ্তাহ আমার পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে এবং ভারত ও চীনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের দিক দিয়া স্মরণীয় ঘটনা। আমার অভিপ্রায় ছিল, চীন ও ভারত পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হউক, আমি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম চীনের নেতারাও অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। বিশেষতঃ সেই শক্তিমান পুরুষ যিনি একাধারে চীনের ঐক্য ও মুক্তি কামনার মূর্ত প্রতীক, তাঁহার মনোভাবও ঐরূপ। আমার সহিত মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাইশেকের বহুবার সাক্ষাৎ হইল; আমরা উভয় দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। চীন এবং চীনজাতির, পূর্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগী হইয়া আমি ভারতে ফিরিয়া আসিলাম। নবযৌবনে অনুপ্রাণিত এই প্রাচীন জাতির মনোবল কোন দুর্ভাগ্য ভাঙ্গিতে পারে, ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

যুদ্ধ এবং ভারত। আমরা কি করিব? অতীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা ইহা চিন্তা করিয়াছি এবং আমাদের নীতি ঘোষণা করিয়াছি। ইহা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় পরিষদ, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলি কিম্বা জনসাধারণের মতামত গণনার মধ্যে না আনিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই অবজ্ঞা সহসা পরিপাক করা কঠিন, কেননা ইহার ইঙ্গিত হইল ভারতে সাম্রাজ্য-নীতি একই ভাবে অব্যাহত আছে। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে, কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি এক সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করিলেন, উহাতে আমাদের অতীত ও বর্তমান নীতি পরিষ্কার করিয়া বলা হইল এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং বিশেষভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে আহ্বান করা হইল, আমরা বারম্বার ফাসিবাদ ও নাৎসীবাদের নিন্দা করিয়াছি, কিন্তু যে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, আমরা মুখ্যভাবে তাহার সহিতই সংশ্লিষ্ট। এই সাম্রাজ্যবাদ কি অপসারিত হইবে? তাঁহারা কি ভারতের স্বাধীনতা এবং গণ-পরিষদের দ্বারা তাহার শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার স্বীকার করিবেন? জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট পরিচালনের জন্য এখনই কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে? সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের সম্ভবপর আপত্তি সম্পর্কে গণ-পরিষদের অভিপ্রায় পরে আরও বিশদ করিয়া বলা হইল। বলা হইল, সংখ্যালঘুদের দাবী উক্ত পরিষদ সংশ্লিষ্ট সংখ্যালঘুদের ভোটেই নির্ণীত হইবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা নহে। এই সকল বিষয় লইয়া যদি কোন মীমাংসা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ইহা এক নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করা হইবে। গণতন্ত্রের দিক হইতে এরূপ প্রস্তাব করা নিরাপদ নহে। তথাপি সংখ্যালঘুদের মন হইতে সন্দেহ দূর করিবার জন্য তাঁহারা যতদূর সম্ভব অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উত্তর অতি পরিষ্কার। আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিলাম, তাঁহারা যুদ্ধের লক্ষ্য পরিষ্কার করিয়া ঘোষণা করিতে প্রস্তুত নহেন অথবা গভর্ণমেণ্ট পরিচালনের দায়িত্বও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। যে ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহাই চলিতে থাকিবে এবং ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা যায় না। ফলে প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিলেন, যেহেতু ঐ সর্তে যুদ্ধ পরিচালনায় সহযোগিতা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না। শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া স্বৈরশাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। নির্বাচিত পার্লামেণ্টের সহিত রাজার স্বৈরক্ষমতার অতীতকালের

নিয়মতান্ত্রিক সংঘর্ষে, ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে দুইজন রাজাকে মস্তক দিতে হইয়াছিল, ভারতে সেই অবস্থাই হইল। কিন্তু এই নিয়মতান্ত্রিক দিক ছাড়াও আরও বেশী কিছু ছিল। আগ্নেয়গিরি এখনও নিস্তব্ধ, কিন্তু উহা বাস্তব এবং ভূগর্ভের আলোড়ন-ধ্বনি কানে আসে।

অচল অবস্থা চলিতে লাগিল এবং ইতিমধ্যে নূতন আইন ও অর্ডিন্যান্স আমাদের উপর জারী হইতে লাগিল; কংগ্রেসপন্থী এবং অন্যান্য অনেকে ক্রম-বর্ধিত হারে গ্রেফ্‌তার হইতে লাগিলেন। ক্রোধ বাড়িতে লাগিল এবং আমাদের দিক হইতে কার্যতঃ কিছু করিবার দাবী উঠিল। কিন্তু যুদ্ধের গতি ও ইংলণ্ডের বিপদ দেখিয়া আমরা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। কেননা গান্ধীজীর পুরাতন শিক্ষা আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারি না যে: প্রতিপক্ষের বিপদের সুযোগ লইয়া তাহাকে বিব্রত করা আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

যুদ্ধ অগ্রসর হইতে লাগিল, নূতন সমস্যা দেখা দিল, অথবা পুরাতন সমস্যাই নূতন আকার লইল এবং পুরাতন সমাবেশ দুশ্যতঃ পরিবর্তিত হইতে লাগিল, প্রাচীন বিচারের মানদণ্ডগুলি নিষ্প্রভ হইয়া গেল। বহু আঘাত আসিতে লাগিল, সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন। রুশ-জার্মান চুক্তি, সোভিয়েটের ফিনল্যান্ড অভিযান, জাপানের সহিত রাশিয়ার মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা। এই জগতে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের কোন মানদণ্ড, কোন নীতি কি আছে? না, সমস্তই নিছক সুবিধাবাদ?

এপ্রিল আসিল, নরওয়ে ডুবিয়া গেল। মে মাসে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে ভয়াবহ বর্বরতার প্লাবন আসিল। জুন মাসে ফ্রান্সের আকস্মিক পতন এবং গর্বিত ও সুন্দর নগরী, স্বাধীনতার শৈশবাগার প্যারী পদদলিত ভূলুণ্ঠিত হইল। ফ্রান্স যে কেবল সামরিক ভাবে পরাজিত হইল তাহা নহে, তাহার আত্মিক অধীনতা ও অধঃপতন অধিকতর শোচনীয়। ভিতরে ভিতরে পচিয়া না উঠিয়া থাকিলে ইহা কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি। ইহা কি সত্য যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যে প্রাচীন ব্যবস্থার প্রধান প্রতিনিধি, তাহার অবসানের সময় আসিয়াছে বলিয়াই তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিল না? সাম্রাজ্যবাদ যাহা দৃশ্যত ইহাদের শক্তি যোগায়, তাহাই কি এই শ্রেণীর সংঘর্ষে তাহাদের দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে? নিজেদের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে পারে না এবং তাহাদের সাম্রাজ্যবাদ নির্লজ্জ ফাসিবাদে পরিণত হয়, ফ্রান্সে ইহাই ঘটিয়াছে। মিঃ নেভিল চেম্বারলেন এবং তাঁহার পুরাতন নীতির ছায়া এখনও ইংলণ্ডের উপর রহিয়াছে। জাপানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্রহ্ম-চীন রাজপথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এখানে, ভারতবর্ষে পরিবর্তনের কোন ইঙ্গিত নাই, এবং আমাদের স্বেচ্ছাকৃত সংযম, কার্যকরী কিছু করিবার অক্ষমতা-রূপে বিবেচিত হইতে লাগিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দূরদৃষ্টির অভাব দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম, কালের লিখন পাঠ করিতে তাঁহারা অক্ষম এবং ঘটনার গতির সহিত নিজেদের সামঞ্জস্য বিধানের ধারণাও করিতে পারেন না। ইহা কি কোন প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম যে, কার্য অবশ্যম্ভাবীরূপে কর্মফলকে অনুসরণ করিয়া থাকে, যাহার ফলে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, তাহা বুদ্ধির সহিত নিজেকে রক্ষা করিতেও পারে না?

যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই বুঝিতে বিলম্ব করেন এবং অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা লাভ করিতে অলস হন, তাহা হইলে ভারত গভর্নমেন্ট সম্পর্কে আর কিই বা বলা যায়? এই গভর্নমেন্টের কার্যকলাপ কতকটা হাস্যকর (কমিক) কতকটা বিয়োগান্ত (ট্র্যাজিক) কেননা কিছুতেই ইহাদের দীর্ঘকালের আত্মসন্তোষ

নড়িয়া উঠে না—ন্যায় নহে, যুক্তি নহে, বিপদের আশঙ্কায় নহে, এমন কি সর্বনাশেও নহে। ইহা চলমান হইয়াও, শিমলা শৈলে রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মত নিদ্রিত।

যুদ্ধের অগ্রগতি ও অবস্থা কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সম্মুখে নূতন প্রশ্ন উপস্থিত করিল। গান্ধিজী কমিটির নিকট প্রস্তাব করিলেন, অহিংসার যে মূলনীতি অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছি, স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনায় তাহাই প্রয়োগ করা। স্বাধীন ভারত এই নীতি অবলম্বন করিয়াই বাহিরের আক্রমণ এবং ভিতরের অশান্তি হইতে আত্মরক্ষা করিবে। এই সময় এই প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মন ইহাই অধিকার করিয়াছিল এবং তিনি ভাবিলেন, এই কথাটা পরিষ্কার করিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। আমাদের সংঘর্ষে এতকাল আমরা যে অহিংসা নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি, তাহার প্রতি অনুরক্ত থাকিব, এ সম্বন্ধে আমরা সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলাম। ইউরোপের যুদ্ধ আমাদের এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করিল। কিন্তু ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রকে এই নীতির মধ্যে আবদ্ধ করা, আর এক কথা এবং অতি কঠিন ব্যাপার; যাহারা রাজনীতিক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে ইহা সহজ নহে।

গান্ধিজী অনুভব করিলেন, সম্ভবতঃ সত্যভাবেই অনুভব করিলেন, তাঁহার জগৎকে দিবার যে বার্তা আছে, তাহা তিনি ত্যাগও করিতে পারেন না, অথবা নরম করিয়াও আনিতে পারেন না। ইহা নিজের ইচ্ছামত প্রচার করিবার স্বাধীনতা তিনি চাহেন এবং রাজনীতির গরজে তিনি ইহা চাপিয়া রাখিতে চাহেন না। এই সর্বপ্রথম তিনি ও কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি স্বতন্ত্র পন্থা লইলেন। ইহাতে তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইল না, কেননা বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়; এবং একথা নিঃসন্দেহ যে তিনি নানাভাবে উপদেশ দিতে থাকিবেন; প্রায়শঃ পরিচালনাও করিবেন। তথাপি ইহা সত্য যে তাঁহার আংশিক অপসারণের ফলে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের একটা সুনিশ্চিত অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিল। ইদানীং কয়েক বৎসর হইল আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, তাঁহার মধ্যে একটা কাঠিন্য প্রবেশ করিতেছে এবং অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা কমিয়া আসিতেছে। তথাপি সেই প্রাচীন মোহিনী শক্তি সেই পুরাতন যাদু এখনও সক্রিয় এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং মহত্ত্ব সকলের বহু ঊর্ধ্বে। কেহ যেন মনে না করে যে ভারতের লক্ষ কোটি মানবের উপর তাঁহার প্রভাব বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইয়াছে। গত বিশ বৎসর বা ততোধিক কাল তিনিই ভারতের ভাগ্যকে গড়িয়া তুলিতেছেন এবং তাঁহার কাজ এখনও শেষ হয় নাই।

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর পরামর্শে কংগ্রেস ব্রিটেনের নিকট আর একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিল। রাজাগোপালাচারী কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী বলিয়া পরিচিত, তাঁহার সমুজ্জ্বল বুদ্ধি তাঁহার নিঃস্বার্থ চরিত্র এবং বিশ্লেষণ কালে মূলদেশ পর্যন্ত দেখিবার শক্তি, আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে এক মহতী সম্পদ। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের আমলে তিনি মান্দ্রাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য তিনি একটি প্রস্তাব করিলেন, যাহা তাঁহার কতিপয় সহকর্মী ইতস্ততঃ করিয়া গ্রহণ করিলেন। এই প্রস্তাব হইল, ব্রিটেন ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইবেন এবং অবিলম্বে কেন্দ্রীয় পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল একটি অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন। ইহা যদি করা হয়, তাহা হইলে এই গভর্ণমেণ্ট দেশরক্ষায় দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং যুদ্ধায়োজনে সহায়তা করিবেন।

কংগ্রেসের এই প্রস্তাব সর্বাংশেই কার্যকরী এবং কোন কিছু বিপর্যস্ত না করিয়া অবিলম্বেই প্রবর্তন করা যাইতে পারে। এই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সংখ্যালঘুদলগুলির পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব সহ সকলের সম্মেলনে গঠিত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। প্রস্তাবটি নিশ্চয়ই অতি নরম। দেশরক্ষা ও যুদ্ধায়োজনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ইহা অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ যে, কার্যতঃ কিছু করিতে গেলে জনসাধারণের বিশ্বাস ও সহযোগিতা আবশ্যক, একমাত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই ইহা পাইবার সম্ভাবনা আছে। সাম্রাজ্যনীতির মধ্য দিয়া ইহা সম্ভবপর নহে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ অন্যদিক দিয়া চিন্তা করে এবং কল্পনা করে ইহা জনসাধারণকে ভয় দেখাইয়া, তাহার ইচ্ছামত চালিত করিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে পারে। এমন কি যখন বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে, তখনও ইহা এমন সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত নহে, যদি তাহার ফলে ভারতের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব হারাইতে হয়। যদি ভারত এবং অবশিষ্ট সাম্রাজ্যের প্রতি ইহা সম্যক ব্যবহার করিত, তাহার ফলে যে নৈতিক মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইত, তাহার প্রতিও ইহার আগ্রহ নাই।

আজ ১৯৪০-এর ৮ই আগস্ট, আমি ইহা লিখিতেছি, বড়লাট আমাদিগকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উত্তর দিয়াছেন। ইহা সাম্রাজ্যবাদের সেই পুরাতন ভাষা, ইহার বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই। ভারতে ইউরোপে এবং জগতে কালের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে।

আমার বহু সহকর্মীই কারাগারে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমি ঈর্ষানুভব করিতে লাগিলাম। সম্ভবতঃ, যুদ্ধ ও রাজনীতি, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত পৃথিবী হইতে, কারাগারের নির্জনতায় বসিয়া জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সহজ।

অল্পদিনের জন্য হইলেও, এই পৃথিবী হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যায়। গত মাসে আমি তেইশ বৎসর পর কাশ্মীরে ফিরিয়া গেলাম। আমি মাত্র বারদিন ছিলাম। কিন্তু এই দিনগুলি এবং এই মনোরম ভূমির লাবণ্যধারা আমি পান করিলাম। উপত্যকায়, সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গে এবং চিরতুষার ক্ষেত্রে আমি ভ্রমণ করিলাম এবং বুঝিলাম জীবনের সার্থকতা আছে।

এলাহাবাদ
৮ই আগস্ট, ১৯৪০

জওহরলাল নেহরু

পরিশিষ্ট—ক

স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্প-বাক্য

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০

আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগলাভের জন্য অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের ন্যায় ভারতবাসীদেরও স্বাধীনতা লাভ করিবার, স্বীয় শ্রমার্জিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবন ধারণের উপযোগী উপকরণ পাইবার অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদি কোনও গভর্ণমেণ্ট কোন জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাকে নির্যাতন করে, তবে সেই গভর্ণমেণ্টকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করিবার অধিকারও সেই জাতির আছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে শুধু স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াই বিরত হয় নাই, অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপরই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাজনীতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্মসমুন্নতির সর্বনাশ করিয়াছে, সুতরাং ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

ভারতের অর্থনৈতিক সর্বনাশ হইয়াছে। আয়ের তুলনায় অত্যধিক পরিমিত রাজস্ব আমাদের দেশের লোকের নিকট আদায় করা হয়। আমাদের দৈনিক আয় গড়পড়তা সাত পয়সা মাত্র। আমরা যে গুরু করভার বহন করিতে বাধ্য হই, তাহার শতকরা বিশ টাকা কৃষকদের নিকট হইতে ভূমি-কর স্বরূপ এবং শতকরা তিন টাকা লবণ শুল্ক বাবদ আদায় করা হয়। এই শুল্কভারে দরিদ্র জনসাধারণ অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে।

সুতা-কাটা প্রভৃতি গ্রাম্যশিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়া তাহার পরিবর্তে অন্যান্য দেশের ন্যায় কোনও নূতন শিল্পের প্রবর্তন করা হয় নাই, ফলে দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে বৎসরে অন্ততঃ চারি মাস কাল অলসভাবে সময় কাটাইতে হয় এবং শিল্প-নৈপুণ্যের অভাবে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও খর্ব হইতেছে।

বাণিজ্য-শুল্ক এবং মুদ্রা-নীতি এরূপ চতুরতার সহিত পরিচালিত করা হইতেছে যে তাহার ফলে কৃষকদের বোঝা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশের আমদানী পণ্যের মধ্যে অধিকাংশই ইংলণ্ডে প্রস্তুত। বাণিজ্য-শুল্ক ধার্য করিবার পদ্ধতি ব্রিটিশ শিল্পের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এবং উক্ত শুল্কলব্ধ রাজস্ব দরিদ্রের দুঃখ নিরাকরণের জন্য ব্যয়িত না হইয়া ব্যয়বহুল শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। মুদ্রা-বিনিময়-নীতি আরও অধিক যথেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক; ইহার ফলে কোটি কোটি টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা যত হীন হইয়াছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই। কোন প্রকার শাসন-সংস্কারই ভারতবাসীকে প্রকৃত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে নাই। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে পর্যন্ত বিদেশী শাসকগণের নিকট অবনত হইতে হয়। আমরা স্বাধীন মত-প্রকাশ এবং স্বাধীন-ভাবে সঙ্ঘ সমিতি গঠনের অধিকারে বঞ্চিত। আমাদের দেশের অনেককেই নির্বাসিত অবস্থায় বিদেশে কাল কাটাইতে হইতেছে। তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন না। শাসনকার্য পরিচালনার উপযোগী সমস্ত প্রতিভার বিলোপ

সাধনের ফলে জনসাধারণকে শুধু কেরানীগিরি এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়া, বৈদেশিক শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদিগকে আমাদের বিশিষ্ট ভাবধারা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ফলে যে শৃঙ্খল আমাদিগকে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই শৃঙ্খলকেই আমরা আদর করিতে শিখিয়াছি।

বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ আমাদের নৈতিক সর্বনাশ করিয়া আমাদিগকে নির্বীর্য করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাকে নিষ্পেষণ করিবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বিজাতীয় সৈন্যদলের উপস্থিতি· মারাত্মক ফল এই হইয়াছে যে, উহাদিগকে দেখিয়া আমরা মনে করি যে, বিদেশীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে, এমন কি, চোর, ডাকাত, গুণ্ডা প্রভৃতির হস্ত হইতে নিজেদের গৃহ রক্ষা করিতেও আমরা অসমর্থ।

যে শাসন-পদ্ধতি আমাদের দেশের এই চতুর্বিধ সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, সেই শাসন-পদ্ধতির অধীনে আর মুহূর্তকাল বাস করা আমরা মনুষ্য ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া মনে করি। এ কথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, হিংসাই স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃষ্টতম পন্থা নহে; সুতরাং আমরা ব্রিটিশের সহিত সর্বপ্রকার স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা যথাসাধ্য বর্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব এবং কর প্রদান বন্ধ ও অন্যান্য উপায়ে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, উত্তেজনার কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি হিংসামূলক উপায় অবলম্বন না করিয়া স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা বর্জন করিতে পারি এবং করপ্রদানে বিরত হই, তাহা হইলে এই অমানুষিক শাসনতন্ত্রের অবসান সুনিশ্চিত। অতএব এতদ্দ্বারা আমরা শান্ত ও সংযত দৃঢ়তার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস যখন যেরূপ নির্দেশ দিবেন, আমরা সেই নির্দেশ ঐকান্তিকভাবে পালন করিব—বন্দে মাতরম্!

পরিশিষ্ট—গ

এরোড়া জেল হইতে ১৯৩০-এর ১৫ই আগস্ট কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু ও মিঃ এম. আর. জয়াকরের নিকট শান্তি স্থাপনের জন্য সর্ত সম্পর্কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন।

এরোড়া সেন্ট্রাল জেল

১৫ই আগস্ট, ১৯৩০

প্রিয় বন্ধুগণ,

কংগ্রেস ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আপোষ সাধনের জন্য আপনারা যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, সেজন্য আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের সহিত বড়লাটের যে পত্র-বিনিময় হইয়াছে তাহা উত্তম-রূপে পাঠ করিয়া আপনাদের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনার সুযোগ পাইয়া এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের দেশের পক্ষে সম্মানজনক আপোষের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। গত পাঁচ মাসের গণ-জাগরণ অতীব বিস্ময়কর; নানাশ্রেণীর নানামতের জনসাধারণ অকাতরে দ্ঃখবরণ করিয়াছে; তথাপি আমাদের মনে হয় আশ্ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে এই দ্ঃখবরণও পর্যাপ্ত নহে, কিম্বা দৃঢ় নহে। নির্পদ্রব প্রতিরোধ-নীতির ফলে দেশের অনিষ্ট হইয়াছে, ইহা সময়োপযোগী হয় নাই এবং ইহা নিয়মতন্ত্রবিরোধী, আপনাদের এবং বড়লাটের এই মতের সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই একথা বলাই বাহ্ল্য। ইংলন্ডের ইতিহাস রক্তাক্ত বিপ্লবের দৃষ্টান্তে প্র্ণ, ইংরাজগণ ঐগ্লির অজস্র প্রশংসাবাদ করেন এবং আমাদিগকেও ঐর্প করিতে শিখাইয়াছেন। অতএব যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য শান্তিপ্র্ণ এবং কার্যক্ষেত্রেও যাহা বিপ্লভাবে প্রমাণিত হইয়াছে তাহার নিন্দা করা বড়লাট কিম্বা কোন ব্দ্ধিমান ইংরাজের পক্ষে অশোভনীয়। যাহা হউক বর্তমান নির্পদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সরকারী বা বে-সরকারী নিন্দাবাদের সহিত কলহ করিবার কোন অভিপ্রায় আমাদের নাই। এই আন্দোলন জনসাধারণ যের্প বিপ্ল উৎসাহে বরণ করিয়াছে, আমাদের মতে ইহার যৌক্তিকতার তাহাই চ্ড়ান্ত প্রমাণ। যাহা হউক আসল কথা এখানে এই যে, যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে নির্পদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন বন্ধ বা স্থগিত রাখিবার জন্য আমরা আপনাদের সহিত আনন্দ সহকারে একমত হইতাম। আমাদের দেশের নরনারী, বালক বালিকাদিগকে অহেতুক কারাদন্ড, যষ্টিপ্রহার ও অধিকতর দ্ঃখের সম্ম্খে ঠেলিয়া দেওয়ার মধ্যে আমাদের কোন আনন্দের কারণ থাকিতে পারে না। অতএব আপনারা আমাদের কথা বিশ্বাস কর্ন এবং অপনাদের মারফৎ বড়লাটকেও বিশ্বাস করিতে বলি যে, আমরা সম্মানজনক আপোষের প্রত্যেকটি পথ ও উপায় তুলম্ল করিয়া বিচার করিয়াছি, কিন্তু আমরা অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, এখনও আমরা দ্রে দিগ্বলয়ে কোন আশার চিহ্ন দেখিতেছি না। ভারতের নরনারীরাই ভারতের পক্ষে কি ভাল তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র অধিকারী, এই মত ইংরাজ চাকুরীয়ামন্ডলী মানিয়া লইয়াছেন, এমন পরিবর্তনের কোন লক্ষণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। সরকারী কর্মচারীদের উদার ঘোষণাগ্লি সাধ্ ইচ্ছা ও অকপট আগ্রহ হইতে প্রকাশিত হইলেও, আমরা উহাতে অবিশ্বাস করি। দীর্ঘকাল যাবৎ এই প্রাচীন ভূমির জনসাধারণ ইংরাজগণ কর্তৃক শোষিত হওয়ার ফলে আমাদের দেশের নৈতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক কি ধ্বংসসাধন হইয়াছে তাঁহারা তাহা দেখিতে অক্ষম। তাঁহারা কিছ্তেই নিজেদের ব্ঝাইয়া উঠিতে পারিবেন না যে তাঁহাদের একমাত্র পথ আমাদের স্কন্ধ হইতে নামিয়া যাওয়া এবং অতীতের অন্যায়ের ক্ষতিপ্রেণ করিবার জন্য, এক শতাব্দী ধরিয়া ব্রিটিশ প্রভুত্বের ফলে আমাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার পাইতে সাহায্য করা।

কিন্তু আমরা জানি যে আপনারা এবং আমাদের অনেক বিজ্ঞ স্বদেশবাসী ভিন্নভাবে চিন্তা করেন। আপনারা বিশ্বাস করেন হৃদয়ের পরিবর্তন হইয়াছে; অন্ততঃপক্ষে প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগদান করিবার মত পরিবর্তন হইয়াছে। অতএব আমাদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সাধ্যমত আমরা আপনাদের সহিত সানন্দে সহযোগিতা করিব।

আমরা বর্তমানে যে অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, তাহাতে আমরা কতদ্র অগ্রসর হইতে পারি সে সম্বন্ধে আমাদের নিম্নলিখিত মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি।

(১) আমাদের মনে হয় প্রস্তাবিত বৈঠক সম্পর্কে আমাদের নিকট লিখিত

পত্রে বড়লাট যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এত অস্পষ্ট যে গতবৎসর লাহোরে গৃহীত জাতীয় দাবীর সহিত তুলনা করিয়া তাহার মূল্যনির্ণয়ে আমরা অক্ষম হইতেছি। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির নিয়মিত সভা ব্যতীত এবং প্রয়োজন হইলে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন ব্যতীত কংগ্রেসের তরফ হইতে কোন কথা বলা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পক্ষ হইতে আমরা বলিতে পারি, কোন মীমাংসাই সন্তোষজনক হইবে না, যদি না,—

(ক) ভারতের ইচ্ছামত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইবার অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

(খ) ভারতীয় সৈন্যদলের উপর কর্তৃত্ব, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং বড়লাটের নিকট লিখিত পত্রে গান্ধিজীর এগার দফা দাবীসহ জনমতের নিকট দায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে ভারতে প্রবর্তন করা হয় এবং

(গ) জাতীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট যাহা অন্যায় বিবেচিত হইবে অথবা যাহা ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল নহে; ভারতের ঋণসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রভৃতির ব্রিটিশ দাবী সম্পর্কে প্রয়োজন হইলে কোন নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার ভারতকে দেওয়া হয়।

মন্তব্য—ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার কালে ভারতের স্বার্থের জন্য যে সকল অদল বদল প্রয়োজন হইবে তাহা ভারতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই নির্ণয় করিবেন।

(২) যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই সকল বিষয় সমীচীন মনে করেন এবং ঐ মর্মে সন্তোষজনক ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয়, তাহা হইলে আমরা আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার জন্য কার্যকরী সমিতিকে পরামর্শ দিব। অর্থাৎ অমান্য করিবার জন্যই যে সকল আইন অমান্য করা হইতেছে তাহা প্রত্যাহৃত হইবে। কিন্তু যতদিন গভর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিদেশীবস্ত্র ও মদ্য রহিত না করেন ততদিন শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চালান হইবে। জনসাধারণ কর্তৃক লবণ তৈয়ার চলিবে এবং লবণ আইনের দণ্ডমূলক ধারাগুলি প্রয়োগ করা হইবে না। গভর্ণমেণ্টের অথবা কাহারও লবণের গোলার উপর উপদ্রব করা হইবে না।

(৩) আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে—

(ক) দণ্ডিত অথবা বিচারাধীন সত্যাগ্রহী ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দী, যাহারা কোন হিংসামূলক অপরাধ বা হিংসামূলক কার্যে প্ররোচনা দিবার অপরাধে অপরাধী নহে তাহাদিগকে মুক্তির আদেশ দিতে হইবে।

(খ) লবণ আইন, প্রেস আইন, খাজনা আইন এবং অনুরূপ আইনবলে যে সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(গ) দণ্ডিত সত্যাগ্রহীর নিকট অথবা প্রেস আইনবলে যে জরিমানা আদায় কিম্বা জামিনের টাকা লওয়া হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(ঘ) আইন অমান্য আন্দোলনকালে যে-সকল সরকারী কর্মচারী ও গ্রাম্য তহশিলদার প্রভৃতি পদত্যাগ করিয়াছেন অথবা কর্মচ্যুত হইয়াছেন তাঁহারা পুনরায় সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

মন্তব্য—এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের ব্যাপারও ধরিতে হইবে।

(৪) বড়লাট কর্তৃক জারীকৃত সমস্ত অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(৫) এই বিষয়গুলির প্রাথমিক সন্তোষজনক মীমাংসা হইলেই প্রস্তাবিত

বৈঠকের গঠন ও উহাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি প্রেরণের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

মতিলাল নেহর়ু
এম. কে. গান্ধী
সরোজিনী নাইডু
বল্লভভাই প্যাটেল
জয়রামদাস দৌলতরাম
সৈয়দ মহম্মদ
জওহরলাল নেহর়ু

পরিশিষ্ট—গ

স্মারক-প্রস্তাব

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩১

......অধিবাসিবর্গ আমরা গর্ব ও কৃতজ্ঞতা সহকারে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত ভারতের পুত্রকন্যাদিগকে প্রশংসা করিতেছি; তাঁহারা মাতৃভূমির মুক্তির জন্য ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ করিয়াছেন, আমাদের মহান্ ও প্রিয় নেতা মহাত্মা গান্ধী মহান্ উদ্দেশ্য ও উচ্চতর কর্তব্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া আমাদিগকে সতত অনুপ্রাণিত করিতেছেন, আমাদের শত শত সাহসী যুবক স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবনদান করিয়াছেন। পেশোয়ার, সমগ্র সীমান্তপ্রদেশ, শোলাপুর, মেদিনীপুর জেলা এবং বোম্বাই-এর শহিদগণকে আমরা শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিতেছি। যে শত-সহস্র ব্যক্তি শত্রুপক্ষের হস্তে বর্বর যষ্টি প্রহারের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছেন; গাড়োয়ালী সৈন্যদলের এবং গভর্ণমেন্টের পুলিশ ও সমর-বিভাগের যে সকল কর্মচারী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে গুলি-বর্ষণ করিতে বা হস্ত উত্তোলন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, গুজরাটের যে সকল সাহসী কৃষক বহুপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়াও অদম্য উৎসাহে অটল রহিয়াছেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহসী ও দীর্ঘকাল দুঃখভোগী কৃষক-মণ্ডলী, যাঁহারা দমননীতির বহুতর আয়োজন সত্ত্বেও বর্তমান সংঘর্ষে সম্পূর্ণ-রূপে যোগ দিয়াছেন; যে সকল ব্যবসায়ী এবং বণিক-সমাজের যে সকল ব্যক্তি নিজেদের ক্ষতি করিয়াও জাতীয় সংগ্রামে সাহায্য করিয়াছেন, বিশেষভাবে বিদেশীবস্ত্র ও ব্রিটিশ পণ্যবর্জনে সহায়তা করিয়াছেন; যে লক্ষাধিক নরনারী কারাগারে গিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন এবং কখনও বা কারাপ্রাচীরের মধ্যেও প্রহার ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন; যে সকল সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক, ভারতের প্রকৃত সৈনিকের ন্যায়, যশঃ ও পুরস্কারের প্রত্যাশা না করিয়া, মহান্ উদ্দেশ্যের সেবায় একাগ্রচিত্তে অবিরত শান্তিপূর্ণ ভাবে কার্য করিয়াছেন, দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতের নারীজাতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। মাতৃভূমির সঙ্কটকালে তাঁহারা অন্তঃপুর ও গৃহের আরাম ত্যাগ করিয়া ভারতের জাতীয় সৈন্যদলের পুরোভাগে আসিয়া পুরুষের সহিত কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহাদের সহিত একত্রে সংঘর্ষের জয় ও আত্মত্যাগে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপূর্ব সাহস ও দুঃখ-সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের গর্ব ও গৌরবের স্থল যুবকগণ ও বানরসেনাকেও আমরা অভিনন্দিত করিতেছি, যাহারা কিশোর বয়সের হইলেও, সাহসের সহিত আন্দোলনে যোগ দিয়াছে এবং মহান্ উদ্দেশ্যের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছে।

এবং আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে লক্ষ্য করিতেছি ভারতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সম্প্রদায়গুলি একযোগে সংঘর্ষে যোগ দিয়াছেন এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া কার্য করিতেছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিশেষভাবে মুসলমান, শিখ, পার্শী, খৃষ্টান ও অন্যান্য অনেকে তাঁহাদের মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করিয়া তুলিতে সাহায্য করিতেছেন, ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ও রক্ষাকল্পে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন, এবং নবলব্ধ স্বাধীনতাদ্বারা সকল বন্ধন, সকল শ্রেণীর ভারতীয়ের মধ্যে অনৈক্য ও ভেদ দূর করিয়া মনুষ্যত্বের চরম উদ্দেশ্যেরই সেবা করিতেছেন। ভারতের কল্যাণের জন্য আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের এই মহনীয় দৃষ্টান্তে আমরা অনুপ্রাণিত হইতেছি এবং পূর্ণ স্বাধীনতালাভের সঙ্কল্পবাক্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া সঙ্কল্প করিতেছি, ভারত সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালাইতে থাকিব।

পরিশিষ্ট—ঘ

জীবনের পথ পরিক্রমা

১৮৮৯, ১৪ই নভেম্বর : জন্ম। জন্মস্থান—এলাহাবাদ শহর। পিতা—মতিলাল নেহরু। মাতা—স্বরূপরানী নেহরু।

১৯০৫ মে : বিলাত যাত্রা। হ্যারোতে ভর্তি।

১৯০৭ অক্টোবর : কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। ১৯১০ সালে প্রকৃতি বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ।

১৯১২ : ব্যারিস্টারী পাস ও ভারতে প্রত্যাবর্তন।

১৯১৬ : লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান। গান্ধিজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। এই বছরেই বসন্ত-পঞ্চমীর দিনে দিল্লীতে শ্রীমতী কমলা কাউলের সঙ্গে বিয়ে।

১৯১৮ : নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যরূপে মনোনীত।

১৯২২ মে : প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কারাবরণ। আগস্ট মাসে মুক্তিলাভ। অক্টোবর মাসে বিদেশী বস্ত্র বয়কট উপলক্ষে পুনরায় গ্রেপ্তার।

১৯২৩ : নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে গ্রেপ্তার বরণ।

১৯২৭ ডিসেম্বর : মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে স্বাধীনতার দাবী পেশ। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯২৯ : কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৩০ এপ্রিল : লবণ সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করে ছয় মাস কারাদণ্ড লাভ।

১৯৩১, ৬ই ফেব্রুয়ারী : পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর লোকান্তর।

১৯৩১ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশের ভূমি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার বরণ ও দুই বছরের কারাদণ্ড লাভ।

১৯৩৪, ১৬ই ফেব্রুয়ারী : কলিকাতায় "আপত্তিকর বক্তৃতা" দানের জন্য দুই বছরের কারাদণ্ড।

১৯৩৪, ১১ই আগস্ট : কমলা নেহরুর কঠিন পীড়ার জন্যে ১১ দিনের জন্য জেল থেকে ছুটি।

১৯৩৬, ২৮শে ফেব্রুয়ারী : সুইজারল্যাণ্ডে কমলা নেহরুর মৃত্যু।

১৯৩৬ ডিসেম্বর : নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৩৭ : জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে পুনর্নিয়োগ।

১৯৪০ : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ ও কারাবরণ।

১৯৪১ : জেলের মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই মুক্তিলাভ।

১৯৪২ : বিখ্যাত 'আগস্ট বিপ্লব' শুরু হওয়ার প্রাক্কালে গ্রেপ্তার বরণ।

১৯৪৫ : তিন বছর পরে বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ।

১৯৪৫ : আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের বিচার। শ্রীনেহরুর সওয়াল।
১৯৪৬ জুলাই : চতুর্থবারের জন্য নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৪৬ সেপ্টেম্বর : দিল্লীতে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান।
১৯৪৭ মার্চ : নয়াদিল্লীতে ‘এশিয়া সম্মেলন’ আহ্বান।
১৯৪৭, ১৫ই আগস্ট : ভারত বিভাগ। বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা লাভ। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ।
১৯৫০ মে : পাক-ভারত বিরোধ অবসানের উদ্দেশ্যে করাচী যাত্রা। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি।
১৯৫১ অক্টোবর : নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের নয়াদিল্লী অধিবেশন। সভাপতির ভাষণ।

১৯৫৩ এপ্রিল : ভারতের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা।
১৯৫৪ জুলাই : পাঞ্জাবে ভাকরা নাঙ্গল খালের উদ্বোধন।
১৯৫৪ অক্টোবর : ডাকটিকিট শতবার্ষিকী (১৮৫৪-১৯৫৪)র উদ্বোধন। চীন যাত্রা। পথে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নেহরু ও চু এন-লাই যুক্ত বিবৃতি। পঞ্চশীলের ঘোষণা।
১৯৫৫ এপ্রিল : ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি রাষ্ট্রের সম্মেলন। নেহরুর অংশ গ্রহণ ও ভাষণ দান।
১৯৫৫ জুন : ‘মিত্রতা কি যাত্রা’ নেহরুর সোভিয়েট দেশ ও পূর্ব ইউরোপ সফর।
১৯৫৫ ডিসেম্বর : নয়াদিল্লীতে নেহরু কর্তৃক ক্রুশ্চফ ও বুলগানিনের সম্বর্ধনা।
১৯৫৬ আগস্ট : লোকসভায় নেহরু কর্তৃক ব্রিটেন ও ফরাসীর সুয়েজ খাল এলাকা আক্রমণের তীব্র নিন্দা।
১৯৫৭ এপ্রিল : দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস দলের নেতা হিসাবে শ্রীনেহরুর মন্ত্রিসভা গঠন। স্বাধীনতা সংগ্রাম শতবার্ষিকী উৎসবে শ্রীনেহরুর ভাষণ।
১৯৫৭ সেপ্টেম্বর : দামোদর ভ্যালি করপোরেশন ও মাইথন বাঁধের উদ্বোধন।
১৯৫৮ ফেব্রুয়ারী : নয়াদিল্লীতে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
১৯৫৮ মে : দিল্লীতে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মেন্ডারেস ও শ্রীনেহরুর সাক্ষাৎকার।

১৯৫৮ সেপ্টেম্বর : দিল্লীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুনের সঙ্গে আলোচনা ও সীমান্ত বিষয়ক যুক্ত ইস্তাহার।
১৯৫৯ জানুয়ারী : তিব্বতের দলাই লামার ভারত প্রবেশ। নেহরু কর্তৃক ভারতে আশ্রয়দানের কথা ঘোষণা।
১৯৫৯ নভেম্বর : চীন-ভারত সীমানা নির্দেশে ম্যাকমাহন লাইন হতে উভয় পক্ষের সৈন্য সরিয়ে নিতে রাজী হয়ে চীনের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শ্রীনেহরুকে পত্র প্রদান।
১৯৬০ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত ভ্রমণ। দিল্লীতে নেহরুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা।
১৯৬০ মে : লণ্ডন যাত্রা।
১৯৬০ মে : কায়রোতে নেহরু-নাসের আলোচনা।

১৯৬০ সেপ্টেম্বর : শ্রীনেহরুর পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণ। সিন্ধুনদের জলচুক্তিতে স্বাক্ষর দান। রাষ্ট্রসভার সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিউইয়র্ক যাত্রা। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ।

১৯৬০-১৯৬১ মার্চ : কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিতে লণ্ডন যাত্রা।

১৯৬১ সেপ্টেম্বর : বেলগ্রেডে নিরপেক্ষ শীর্ষসম্মেলনে যোগদান।

১৯৬১ নভেম্বর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো সফর।

১৯৬২ এপ্রিল : তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর তৃতীয়বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

১৯৬২ মে : আকস্মিক অসুস্থতা, রোগমুক্তির পর বিশ্রাম গ্রহণার্থ কাশ্মীর যাত্রা।

১৯৬২ সেপ্টেম্বর : কলম্বো যাত্রা; চীনকে ভারতভূমি থেকে বিতাড়নের কড়া হুকুম।

১৯৬২ অক্টোবর : চীনের ভারত আক্রমণ, নেহরুর নূতন ভূমিকা।

১৯৬৩ আগস্ট : কামরাজ পরিকল্পনায় নেহরুর আগ্রহ।

১৯৬৪ জানুয়ারী : ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে অসুস্থতা।

১৯৬৪, ২২শে মে : দীর্ঘকাল পর নেহরুর সাংবাদিক সম্মেলন।

১৯৬৪, ২৭শে মে : বেলা ২টা ১ মিনিটের সময় নয়াদিল্লীতে পরলোকগমন।